প্রেম নেই

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিজন ভট্টাচার্য

আওরতে হাসিনা

বিশ্বাসবাড়ির ছোট মেয়ে টগর জলে ডাগর ডাগর ঢেউ তুলে চারপাশটা বেশ পরিষ্কার করে নিল তারপর ভুসভুস করে গোটা কতক ডুব দিয়ে শরীরটা ঠান্ডা করেই দেখতে পেল হাজী নিকিরির মেয়ে, তার গোলাপ ফুল হন্তদন্ত হয়ে ঘাট বেয়ে নেমে আসছে। কোনো কথা না বলেই বিলকিস খাতুন—ছবি—ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুহাতের আঁজলা দিয়ে গোলাপ ফুলের চোখে মুখে দেদার জল ছিটোতে লাগল।

টগর কোনোমতে সামলে নিয়ে বললে, "মর ছুঁড়ি। সুহাগ একেবারে উথ্‌লোয়ে উঠতিছে। কিলো, বর আয়েছে বুঝি।'

বিলকিস্‌ ঠোঁট উলটিয়ে বলল, "বয়ে গেছে আমার বরের আসতি। আমি কি আর তুমার মতন নসিব করে আইছি ভাই গুলাপফুল, যে এবেলা ওবেলা বরের গলা ধরে ঝুলতি পারব? আমার নসিব বড় খারাপ।"

টগর খুব রাগ দেখাতে গেল কিন্তু গলায় রাগ তেমন ফুটল না। বলল, "দ্যাখ্‌ লো, পরের গাছের কামরাঙাডারে সব সুমায় মিষ্টি বলে মনে হয়। বুঝলি।"

এক মুখ জল কুলকুচো করে ফেলে দিয়ে বিলকিস নিতান্ত গোবেচারার মত জিজ্ঞেস করল, "তোর কামরাঙাডা বুঝি খুব টক?"

টগর খরখর করে বলে উঠল, "ক্যান্‌ রে ছুঁড়ি, কামড় বসাতি ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বিলকিস বলল, "তওবা তওবা। তোর মুখির আর খিল নেই। তোর কামরাঙায় তুই দাঁত বসা। আমি আমার দাঁত টকাতি যাবো কোন্‌ দুঃখি।"

তারপর দুজনেই হেসে ফেলল। তারপর তালগাছের এক গুঁড়ির উপর বসে বসে দুজনে গুজ্‌ গুজ্‌ গল্প জুড়ে দিল।

হঠাৎ টগরের গালাটা একটু চড়ল, "তোর কী, তোর তো আর মদ্দ নিয়ে ঘর করতি হচ্ছে না। তুই তো ও কথা বলবিই। গোরু শুধু দুধই দ্যায় না মনি, চাঁটও ছোঁড়ে। শুধু তো সুহাগটা দেখলি চলবে না, মদ্দগের শরীলি রাগও যে পুরো। তার ব্যালায় কী? পান থেকে চুন খসলিই মদ্দর শরীল রাগ উঠে আসে ভাই। তা জানিস। মাঝে মাঝে রাজী হইনে বলে সে কী রাগ? একদিন তো পাশ ফিরে শুয়েই থাকল সারা রাত। কী? উ' পায়ে ধরে সাধব! ওরে আমার সুখির শুকুনি রে, আমারে তুমি ত্যামন বান্দা পাওনি! হ্যাঁ। আমিও পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম। তারপর শোন্‌? মাঝ রাত্তির দেখি, ওমা, গায়ে গা ঠ্যাকায়ে শুলো। আমিও ঘাপটি মা'রে শুয়ে আছি। তখন আমারে আবার শুনয়ে শুনয়ে কওয়া হচ্ছে, ইবার গঞ্জে গিয়ে আরাকটা বিয়ে যদি না করি তো কি বলিছি। আমিও কোল বালিশটারে শুনয়ে দিলাম, আমিও বিশ্বেসের বিটি, আঁইশ বঁটি দিয়ে যদি সে হতভাগীর গলাডা সঙ্গে সঙ্গে না কা'টে ফেলিছি তো কি বলিছি। তা মদ্দ আবার শুনোলেন, মানুষ মারলি ফাঁসীতি ঝুলতি হয়, সিডা যেন জানা থাকে। আমিও কলাম, খুব জানি খুব জানি। ফাঁসী যাতি হয় যাব তা ব'লে আমি বাঁচে আছি আর এক আবাগী সতীন আ'সে আমার বুকির উপর শিল কোটবে, সিডা আমি হতি দেব না, দেব না।"

ওদের এই ঝগড়ার কথা শুনে বিলকিসের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল। ভয়ে-বিস্ময়ে মেশা গলায় বলে উঠল, "সোয়ামীর মুখি মুখি তুই তক্‌কো জুড়ে দিলি। হায় আল্লা! করিছিস কী? তোর যে গুনাহ্‌ হবে। তুই তো আওরতে হাসিনা হতি পারবি নে ভাই। তুমি যদি দোজখের আগুনি পুড়ে ভাজা ভাজা না হতি চাও তো তুমারে নেক্‌কার স্ত্রীলোক হয়ে থাকতি হবে।"

বিলকিসের গলা দিয়ে অমন উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে টগর একটু থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "সিডা আবার কী?'

বিলকিস বলল, "সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। আব্বাজান একবার আমাগের বাড়িতি মৌলুদ মহফিল বসায়েছেলেন। সেখানে খালেক মুন্সি নেক্‌কার স্ত্রীলোক কিরূপ হওয়া উচিত তা বলিছিলো ভাই। শুনা ইস্‌তক বড্ড ডরে-ভয়ে আছি। খালেক মুন্সি বলিছিলো, যারা সোয়ামীর সঙ্গে দিনরাত মারামারি, কাটাকাটি, চোখ রাঙারাঙি, ডাঙাডাঙি কাজিয়া ঝগড়া করে তাগের আর রক্ষে নেই। দোজখের আগুনি তাগেরে জ্যান্ত ভাজা হবে। হবেই। বুঝিছ?"

টগর এবার ঘাবড়ে গেল। তার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। বরের কথা বলতে টগরের মুখে খৈ ফোটে। গম্ভীরভাবে পায়ে ঝামা ঘষতে ঘষতে বলল, "তারপর তোর মুন্সি ছাহেব আর কি কলেন?"

বিলকিস এবার এক মস্ত মৌলবী সাহেবের মতই কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট গাম্ভীর্য এনে বলল,

"সোয়ামীর খেদমত ও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে যদি নফল এবাদতসমূহ না করা যায়, তাহাও ভাল, কিন্তু সোয়ামীরি সন্তুষ্ট রাখাই চাই।"

টগর বলল, "বটে। তারপর?'

বিলকিস ওর গোলাপফুলের কাটা কাটা কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল না সে রেগে গিয়েছে কিনা। তাই এবার একটু ইতস্তত করতে লাগল।

টগর একটু অধৈর্য হয়ে উঠল। বলল, "কিরে, তোর মুছল্লি ছাহেবের ঝুলি খালি হয়ে গেল?"

এতক্ষণে বিলকিস টের পেল টগর মুছল্লি ছাহেবকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। সে একটু গরম হয়ে উঠল। বলল, "দ্যাখ গুলাপফুল, মুরুব্বিদের নিয়ে ঠাট্টাবাজী একদম ভালো না। দোজখের আগুনি দগ্ধে দগ্ধে মত্তি হয়, জানিস।"

টগর বলল, "না ভাই, ঠাট্টা করব ক্যান? তোমাগের মুছল্লি ছাহেবের মুখি আর কোনো কতা নেই? খালি সোয়ামীর তুষ্ট রাখার কতা। তোর মুছল্লি ছাহেবের কয়ডা বিবি ক'দিনি?"

"তা কেন, আওরতে হাসিনা হওয়া কি", বিলকিস্ ঠেস দিয়ে বলল, "অতই সুজা? যদি কোনও সোয়ামীর শরীল থেকে পুঁজ রক্ত সব সুমায় বেরোতি থাকে তবে তার বিবি যদি নেককার হতি চায় তবে সেই বিবিরি সেইসব পুঁজ রক্ত জিভ দিয়ে চাটে সাফ করে দিতি হবে।"

টগর ওয়াক থুঃ ওয়াক থুঃ করতে লাগল।

বিলকিস এবার সত্যিই অপ্রস্তুত হল। আসলে এই কথাটা সে শোনাতে চাইছিল না। কারণ সেও প্রথমদিন যখন কথাটা শোনে তখন তারও গা গুলিয়ে উঠেছিল। দাদী সেকথা শুনে আল্লাতা'লার কাছে তার অজ্ঞ এবং নিতান্ত দুধের বাচ্চা নাতনীর গোস্তাকির জন্য বারবার মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন এবং বিলকিসকে একটা হেকায়েত শুনিয়েছিলেন। তাই বিলকিস তার প্রাণের বন্ধু গোলাপফুলের জন্য বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। মনে মনে বার কয়েক আল্লাতা'লার কাছে তার গোলাপফুলের অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

তারপর টগরকে বলল, "গুলাপফুল, মোল্লা-মুছল্লির কথা শুনে ওয়াক তুললি গুনাহ্ হয়। বুঝিছ। আমার দাদী আমারে যে হেকায়েতডা শুনোয়েছিল সিডা, সেই গল্পডা মন দিয়ে শোনো। তালি বুঝবানে যে নিজির কী সব্বোনাশডা তুমি কত্তি যাচ্ছ। দাদী কয়েছে এই গল্পডা জন্নতুন্নেছা কিতাবে লিখা আছে।"

"হজরতের জমানায় এক বুড়ী একদিন খোয়াবে তার মরা মেয়েডারে দ্যাখে যে দোজখে এট্টা বড় আগুনির কুণ্ডির মধ্যি সে দগ্ধ হতিছে। ফেরেশ্‌তারা ডাণ্ডস মা'রে মারে তার মাথায় লুহার গজাল ঢুকোয়ে দেচ্ছে। তার হাতে আগুনির হাতকড়া, পায়ে আগুনির বেড়ি লাগান আছে। আর সে কেবলই চিক্কর ছাড়ে কাঁদতিছে। বুড়ী তারে জিজ্ঞেস করল, মা তুমার এই দুদ্দশা ক্যান্? মেয়ে তখন কাঁদতি কাঁদতি ক'লো, মা আমি দুনিয়াতে ধম্ম বল, এবাদত বল, কিছুই কম করিনি। কিন্তু আমার শরীলি রাগডা ছিল বিজায় বেশী আর সোয়ামীরি রাগের মাথায় গা'লমন্দ করিছি, তাই বোধহয় খুদাতা'লা আমার উপর রা'গে আছেন। আর সেই জন্যিই আ'জ আম'র এই অবস্থা। তখন বুড়ী ক'লো, মা, তুমার মাথায় গজাল মারা হচ্ছে ক্যান্? মেয়ে জবাব দিল, আমি আমার সোয়ামীর সঙ্গে রাগ ক'রে কড়া কড়া কথা কতাম, তাই আমার মাথায় গজাল মারা হচ্ছে। তখন বুড়ী ক'লো, মা তুমার হাতে আগুনির হাতকড়া পরানো রয়েছে ক্যান্? মেয়ে জবাব দিল, তুমার জামাইরি জিজ্ঞেস না করেই তার ঘরের জিনিসপত্তর অন্য লোকিরি দিয়ে দিতাম, তাই আমার হাতে আগুনির হাতকড়া পরানো আছে। আরও বলি শোনো। এই যে দেখতিছ আমার পায়ে আগুনির বেড়ি, তুমার জামাইর বিনা হুকুমিই পাড়া বেড়াতি যাতাম, তার জন্যিই এই পায়ের বেড়ি। আমার মাথায় আর বুকি কাপড় ঠিক রাখতি কিছুতিই মনে থাকতো না তাই ফেরেশ্‌তারা আমারে আরু নানা রকম সাজা দিয়ে যাতিছে। বুড়ী বিজায় ভয় পা'য়ে জিজ্ঞেস করল, তালি মা এখন উপায়? মেয়ে ক'লো, এখন আমার সোয়ামী যদি আমারে মাফ করে তালি খুদাতা'লাও আমারে মাফ করে দেবেন। আর তখন আমার দোজখ যন্তন্নাও শেষ হবে। তারপর বুড়ী তার জামাইর কাছে যায়ে সব বিত্তান্ত কয় আর সেই জামাই রসুলির কথায় তার বিবিরি মাফ করে দেয়, তারপর বুড়ীর সেই মেয়ে উদ্ধার পায়।'

টগরও বিলকিসের মুখে বুড়ীর মেয়ের দোজখে এই রকম সাংঘাতিক সাজা পাওয়ার কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। সত্যি বলতে কি, টগর আর বিলকিসের বিয়ে প্রায় এক সময়েই হয়েছে। তা তিন বছর তো পুরে গেল। কিন্তু বিলকিসের বর বিয়ের পরই বড় বড় পাস দেওয়ার জন্য সেই যে চলে গিয়েছে কলকাতায় আজও ফেরেনি। এবং সেই কারণে এতদিন বিলকিসের জন্য মনে মনে দুঃখ পেতো টগর। কিন্তু এখন বিলকিসের মুখে এই নিদারুণ কাহিনীটা শুনে একবার টগরের মনে হল, ওরে বাবা, এই যদি পরিণাম হয় তবে তো বিলকিসই ওর চাইতে ভালো আছে। যেহেতু বিলকিস ঘরই করেনি তার সোয়ামীর সঙ্গে, কাজেই সোয়ামীর মুখে মুখে তক্কো ঝগড়াঝাটি এসব তার কিছুই করতে হয়নি। তাই ওর মাথায় নরকের গজালও কেউ ঠুকবে না আর অগ্নিকুণ্ডে কেউ তাকে পোড়াবেও না।

কিন্তু টগরের কথা স্বতন্ত্র। মাত্র তিন বছর বিয়ে হলে কি হবে টগরের। বরের সঙ্গে ওর

ভাবও যত, ঝগড়াও তত। কিন্তু ভাবের কথা এখন ভুলে গেল টগর। ঝগড়ার একটা তালিকা সে মনে মনে ছকে নিতে গিয়েই তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। যে-সব সাজার কথা বিলকিস বলে গেল, টগর বেশ করে খতিয়ে দেখল সব কটাই তার খাতায় জমা পড়ে গিয়েছে।

বেশ ভারী গলায় টগর বলল, "কী হবে রে ভাই গুলাপফুল। আমাগের তো পিরায় দিনই ঝগড়াঝাঁটি হয়। তাহালি আমারেও কি আগুনির কড়াইতি ভাজবে। মাথায় গজাল ঠোকবে! ওরে বাবা!"

বিলকিস গম্ভীরভাবে মুছল্লি ছাহেবের ধরন ধারণ নকল করে বলল, "তুমি কি বিনাবাক্যে তোমার সোয়ামীর খেদমত করিয়াছ এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, হে নারী তুমি তোমার দেলে এই কথা সর্বদা চিন্তা করিবা।"

টগর জিজ্ঞেস করল, "সোয়ামীর খেদমত মানে কী?"

বিলকিস বলল, "মুছল্লি ছাহেব কয়েছেন, এট্টা হাদিছে আছে, যে-স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে সাতদিন তাহার স্বামীর খেদমত করিবে, তাহার জন্য বেহেশ্তের সাতটি দরওয়াজা খোলা থাকিবে, সুতরাং সে যে দরওয়াজা দিয়া ইচ্ছা করিবে সেই দরওয়াজা দিয়াই ঢুকিতে পারিবে।"

টগর হাঁফ ছেড়ে বলল, "তবু ভালো যে এতক্ষণে স্বগ্‌গে যাবার পথটাও দেখালি। বাব্‌বাঃ, যা ভয় দেখায়ে দিছিলি, উঃ! আমি তো ভাবিছিলাম, ইবার তালি মন্দর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি করেই দিতি হবে। মুখ খুললিই যেখেনে বাধে যায়, সেখেনে মুখি কুলুপ আঁটাই ভালো। নাহলিই তোর দোজখের ডাণ্ডস।"

টগরের হালকাভাব দেখে বিলকিসও নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "যত সাজা মেয়েমানুষির নসিবি। ক্যান্‌রে বাপু?"

টগর বলল, "ভগবানের বস্ড এক চোখোমি। ঝগড়া কি আমি একা বাধাতি যাই। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়াডা বাধাবা তুমি, আর যেই আমি জবাব দিতি গেলাম অমনি নরকের আগুনি আমারেই নিয়ে ভাজবে। বাঃ রে তোগের আল্লার বিচার! বলিহারি।"

"অবিশ্যি," বিলকিস বলল, "কাটানও আছে, জানিস গুলাপফুল। আল্লা মেহেরবানও তো বটেন। তিনি নাফরমানি দেখলিই শুধু রাগ করেন। তুই যদি নেক্‌কার স্ত্রীলোক হো'স তা'লি তোর আর ভয়ডা কী?"

"কী রকম?"

বিলকিস বলল, "যে-স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে নিজের স্বামীর কাপড় ধোত করিয়া দিবে আল্লাতা'লা তাহার আমলনামা হইতে দুই হাজার গুনাহ্‌ কাটিয়া দিবেন আর আসমান ও জমিনের বাসিন্দা ফেরেশ্‌তাগণ তাহার জন্য নেক দুয়া করিতে থাকিবেন। আমি একথা দাদীর মুখি শুনিছি।"

এতক্ষণে টগরের বুক হালকা হয়ে গেল। তার মুখে হাসিও ফুটে উঠল। সে এত সহজে পার পেয়ে যাবে তা ভাবেনি। সে মহিন্দিরির জামা কাপড় সব নিজের হাতে কাচে।

টগর বলল, "উডা আমি করি। রোজ আমার বরের জামা কাপড় কা'চে দিই।"

চোত মাসের এলোমেলো বাতাসে জলে ঢেউ উঠছে। ঘাটের গুঁড়িতে ঢেউ লেগে মাঝে মাঝে খলাত খলাত শব্দ হচ্ছে। নিকারিদের ঘাটে বাঁধা নৌকোগুলো যেন অবিরত নাচছে। একটা মাছরাঙা ঝুপ করে জল থেকে একটা মাছ মুখে করে এনে একটা খুঁটির উপর বসল।

টগরের মুখে চোখে আবার নিশ্চিন্ত ভাবটা ফিরে আসতে দেখে বিলকিসের খুশির ভাবটাও ফিরে এল।

বিলকিস উৎসাহভরে তার বিদ্যা জাহির করতে লাগল, "দাদী ক'য়েছে যে আমাদের হাদিছে আছে, সে-স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে দেখিলেই খুশি হইয়া সম্মুখে হাজির হয় ও মার্‌হাবা মার্‌হাবা বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে, সে জেহাদের অর্ধেক ছওয়াব পাইবে।"

টগরের একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গিয়েছে। তার বরের একটা কীর্তির কথা। গোলাপ-ফুলকে সেটা শোনাবার জন্য মন আঁকুপাঁকু করছে। এদিকে গোলাপফুল তার কোনও সুযোগই দিচ্ছে না। খালি তখন থেকে শাস্তর ঝেড়ে চলেছে।

টগর তাই অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "বলিহারি তোগের শাস্তর ভাই। একদিকে কচ্ছেন, স্বামীকে দেখিলেই খুশি হইয়া সম্মুখে যাইবা, তারপরই আবার কচ্ছেন, মারবা মারবা বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিবা। আমি হাসিমুখ নিয়ে সোয়ামীর সামনে যাব, তারে কব আমারে মারবা আমারে মারবা, তারপর তিনি আমার উপর হাতের সুখ উঠোয়ে নেবেন আর আমি সন্তোষ প্রকাশ করব, অমন সন্তোষে আমি ঝাঁটা মারি।"

বিলকিস তার গোলাপফুলের মুখে হাদিছের অমন উদ্ভট এক ব্যাখ্যা শুনে তো আকাশ থেকে পড়ল।

ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ও গুলাপফুল তুমি মারামারির কথা পা'লে কনে?"

টগর এবার বেশ গরম। বলল, "তুই-ই তো কলি।"

"আমি কলাম!" বিলকিস অবাক হল। "আমি আবার কলাম কখন?"

টগর খ্যারখ্যার করে উঠল, "দ্যাখ, কথা ঘুরোতি যায়ে না। আমি স্পষ্ট নিজির কানে শুনিছি তুমি কুলে, তুমার দাদী কয়েছে, যে স্ত্রীলোক তাহার সোয়ামীকে দেখিলেই খুশি হইয়া

সামনে আসে তারপর মারবা মারবা বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করে—কী কওনি এ কথা?"

এতক্ষণে বিলকিস বুঝতে পারল কী হয়েছে। বুঝা মাত্র সে খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল।

"হি হি হি ও গুলাপফুল হি হি হিহিহি হিহিহি কথাটা হিহি হিহি হি হি হি হি উঃ মারবা হা হা হা হিহি হিহি আল্লাহ!"

টগর বিলকিসকে ঐ রকম পাগলের মত হাসতে দেখে প্রথমে অপ্রস্তুত হল, তারপরে একটু অবাক, কেন না বিলকিস স্বভাবত শান্ত ও মৃদু স্বভাবের মেয়ে, তারপর একটু গরম হল টগর, কেননা সে গোলাপফুলের এরকম ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না।

কাজেই সে এবার ধমক দিল, "বলি এত হাসি কিসির লা? মরণ! বলি পাগল হয়ে গেলি না কী?"

ধমক খেয়ে অতি কষ্টে হাসির দমক সামাল দিল বিলকিস। তবে তখনও খিক খিক করে হেসে উঠছে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে।

"বলি তোর হোলো কী?" টগর বলল, "ক' না?"

বিলকিস বলল, "কথাটা মারবা নয়। মারহাবা। উডা একডা ভাল কথা। মানে হচ্ছে, তুমার ভালো হোক। সোয়ামী বাড়ি আসা মাত্তরই তুই যদি, হাসিমুখি গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াস আর মারহাবা মারহাবা ব'লে যদি তাঁর খাতির করিস তা'লি তুই তাঁর সুহাগ পাবি, তুই তখন খসম-পিয়ারী হবি, কেননা আল্লা আমাগের এই কাজ করারই হুকুম দিয়েছেন।"

এই পর্যন্ত বলেই বিলকিসের সংযম ভেঙে গেল। সে টগরের আওয়াজ নকল করে বলে উঠল, "মারবা, মারবা," তারপরই খিলখিল করে হেসে উঠল। এবার টগরও। তারপর গুম করে গোলাপফুলের পিঠে এক কিল মেরে ওর গায়ে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিল।

তারপর বলল, "বলিছি বেশ করিছি। আমি তো আর মোল্লা-মুছল্লির মেয়ে না যে ওসব কথা জানব। আমার কোনও পাপ হবে না দেখিস। এখন শোন একটা কথা বলি। সরে আয়, কানে কানে কব। কিন্তু খবরদার, গুলাপফুল, একটা কথাও কাউরি ক'বানা। তালি কিন্তু জম্মেও আর তুমার সঙ্গে কথা ক'বনা। তা কয়ে দিলাম।"

বিলকিস দুষ্টু হেসে বলল, "দুলাভাই আবার বুঝি নতুন কোনো দিল্লাগী করিছে?"

টগরের মুখটা চট করে শরম-রাঙা হয়ে উঠল। সে বিলকিসের গলা জড়িয়ে ধরল তারপর অদ্ভুত এক আদুরে গলায় বলে উঠল, "কী করে জানলি গুলাপফুল?"

বিলকিসের এই মুহূর্তগুলো আল্লার সবথেকে বড় আশীর্বাদ বলে মনে হয়। টগর ওকে আবেগে জড়িয়ে ধরে, কানে কানে তার দাম্পত্যজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বলে যায়, কোনো কোনো কথা শুনে বিলকিসের কান লজ্জায় গরম হয়ে যায়, কখনো তার শরীর পুলকে শিরশির করতে থাকে, কখনো বা উত্তেজনায় বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে। টগরের বর টগরের সঙ্গে যা করে তার কাছে আরব্যরজনীর রগরগে কেচ্ছাও আলুনি হয়ে ওঠে। বিলকিস ভাবে সব পুরুষই এই রকম বেশরম নাকি? তারপরই ওর বরের কথা মনে পড়ে যায় তার। তাকে বিলকিসের খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। গোলাপফুলের গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে চায়, খোদাতা'লার কাছে মনে মনে মোনাজাত করে, তার গল্পও জমে উঠুক। সেও যেন তার বরের দিল্লাগীর কথা এমনিভাবেই গোলাপফুলের গলা জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে বলে বলে জিন্দগী পার করে দিতে পারে। তাতে যদি কিছুটা বেশরমি প্রকাশ পায় তা সে জানে যে তার ঐটুকু অপরাধ খোদা মেহেরবান নিশ্চয়ই মাফ করে দেবেন। কেননা খোদা তো জানেন গত তিন বছর ধরে দাদীর কথামত আওরতে হাসিনা হবার জন্য সব কটা নছিহতই পালন করার চেষ্টা করে চলেছে।

আল্লা তুমি তারে তাড়াতাড়ি আনায়ে দ্যাও। তুমি এক লহমায় দুনিয়া বানায়ে দিতি পারো আর তুমার একটা বান্দারে তাড়াতাড়ি উকালতি পাস করায়ে দিতি পারো না? খুব পারো।

টগর কখনো হেসে হেসে কখনো ঢলে ঢলে, কখনো গলা দিয়ে কবুতরের মত আহ্লাদী আহ্লাদী আওয়াজ বের করে যতক্ষণ ওর বরের সঙ্গে টগরের সাম্প্রতিকতম সব খুনসুটির বিবরণ বিলকিসের কানে ফিস ফিস পেশ করে যাচ্ছিল ততক্ষণ বিলকিস মনে মনে আল্লার ঠিকানায় তার প্রার্থনা আকুলভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।।

টগর হঠাৎ কোত্থেকে একখণ্ড বঙ্গলক্ষ্মী টারকিশ বাথ্ সোপ বের করে বলল, "একবার শুঁকে দ্যাখ গুলাপফুল?"

বলেই সাবানটা বিলকিসের নাকে চেপে ধরল। সত্যিই গন্ধটা ভাল।

টগর বলল, "আয় দুজনে মাখি।"

বিলকিস বাধা দেবার আগেই টগর এক খাবলা জল বিলকিসের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে সাবান ঘষতে লাগল। আর বকবক করতে লাগল, "অমন সুন্দর চুল, তার ছিরিখান দ্যাখ দিনি, পাখির বাসা করে রাখিছে। চোখ বুঁজে থাক। এতক্ষণ আবার শান্তর আওড়ালেন মেয়ে, যে স্ত্রীলোক সোয়ামীরি দেখলিই খুশি হয়ে সামনে আসে দাঁড়ায়, এই ছিরি নিয়ে একবার বর আলি সামনে যায়ে দাঁড়ায়ে দেখো, বর উলটোমুখি পিটটান। মাথা উঁচু কর। ইস্ কত ময়লা। নে ইবার

ডুব দিয়ে আয়। তারপরে ভাই আমার মাথার মাথায়ে দিবি। সেদিন চুলির মদ্যি হাত ঢুকোয়েই মন্দ আমাকে খোঁটা দেলেন, এঃ চুলি কি চামসে গন্ধ। চামচিকে পুষিছ নাকি চুলি? নাকি ছারপুকার বাথান হয়েছে? কুথাকার ভূত। আমিও বিশ্বেস বাড়ির মেয়ে। ছাড়িয়ে বান্দা নই। কলাম এতই যদি শখ চুলির মদ্যি গুলাপের গন্ধ পাওয়ার তো ব্যবস্থা করলিই পারো। সাবান, গন্ধ তেল, গুলোপ জল আ'নে দিলিই পারো। আমি তাই দিয়ে চান সা'রে পাটে বসে থাকতি পারি। যার মুরোদ নেই এককড়া, তার ফুটুনি ষোল দড়া।"

"যেই না কওয়া, বুঝলি গুলাপফুল," টগর বলল, "ওমনি যেন জোঁথির মুখি চুন প'ড়লো। কাল রাত্তিরি শুয়ার আগে কলেন, চোখ বোজো, আমি চোখ বুজলাম। কলেন হাত পাতো, হাত পাতলাম। তারপর হাতে সাবানডা দিয়ে কলেন ইবার শুঁকে দ্যাখোদিন। কী সুন্দর গন্ধটা না ভাই গুলাপফুল?"

বিলকিস ভুস ভুস করে ডুব দিয়ে এসে ততক্ষণে টগরের চুল নিয়ে পড়েছে। সাবানের ফেনা দিয়ে তার চুল ঘষে দিতে দিতে বিলকিস বলল, "আমার গা দিয়ে এমন বাসই বেরুচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন আর কারু গা।"

টগর ততক্ষণে আয়েসে চোখ বুজে ফেলেছে। হঠাৎ ফিক ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, "বলব কি ভাই তোরে গুলাপফুল, লোকটার পেটে পেটে শয়তানি। আমারে ক'লো, কী পছন্দ হয়েছে তো। আমি সরল মনেই কলাম, হ্যাঁ, জিনিসডে খুবই ভালো। তা তিনি কলেন, এ আর কী। এর চাইতিউ ভালো জিনিস আমার কাছে আছে। চোখ বোজো। আমি সরল মনে আবার চোখ বুজলাম। ওমনি না আমার ঠোঁটের উপর—কী অসভ্য ক'দিনি, ঘরে হেরিকেন জ্বলতিছে, বাইরি সবাই জা'গে রয়েছেন। এই রকম করে জ্বালায়। বুঝলি।"

টগর কেমন অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল। বিলকিসের বুকের মধ্যে কেমন তোলপাড় করতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই রকমই তো হওয়া উচিত। এই রকমই তো হয়। তারও হবে। নিশ্চয়ই হবে। আল্লাহ্।

হঠাৎ বিলকিসের মনে হল, গোলাপফুল যেভাবে সাবানটা তার বরের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে তাতে আবার খোদার প্রতি নাফরমানি করা হয়নি তো? খোদার হুকুম না মানাই তো নাফরমানি। ১৩নং নছিহতে স্পষ্টই আছে, বিলকিসের মনে পড়ল, "স্বামী যদি অর্থশালীও হয়, তথাপি তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনও আপনার জন্য কোন জিনিস আনিতে ফরমায়েশ করিও না। বরং সবুর করিয়া থাকো। স্বামী যদি ভালো লোক হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা তোমাদের অবস্থার উপর নজর রাখিবেন। নচেৎ এই কষ্টের জন্য ভালো নেয়ামত খোদার কাছেই তো পাইবে।"

তাহলে কি কাজটা ভালো করেছে গোলাপফুল? ওর বর যদি নিজে থেকে এনে দিত সাবান তাহলেই কি ভালো হত না? কিন্তু বিলকিস্. ১৩নং নছিহতে যাই থাক, এটা সিদ্ধান্ত নিতে পারল না যে তার গোলাপফুল কোনো অন্যায় কাজ করেছে। বিশেষ করে গোলাপফুলের বরটা দ্বিতীয়বার গোলাপফুলকে চোখ বন্ধ করতে বলে যা দিল্লাগীটা করল, তাতে কি একথা বলা যাবে যে লোকটা "তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাবানটা আনিয়া দিয়াছে?" না, বিলকিস বেশ করে ভেবে রায় দিল, সাবানটা গোলাপফুলের বর মোটেই অনিচ্ছাসত্ত্বে এনে দেয়নি। তাই এক্ষেত্রে গোলাপফুলের কোনও গুরুতর গুনাহ্ হয়নি। বিলকিসের ভারাক্রান্ত দিলটা অনেক হালকা হয়ে এল। কিন্তু যদি ওর বর সাবানটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই এনে দিত, কিম্বা দিতই না এবং গোলাপ-ফুলকে ফরমায়েশ করতে হত, তাহলেই কি গুনাহ্ হত?

বিলকিসের মনে এই প্রশ্নটা লাফিয়ে উঠল। গোলাপফুল সাবান না পেলে চুলের বদবু ভালো করে দূর করতে পারত না। ফলে ওর বর ওর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠত। এবং তার ফলে গোলাপফুলকে আবার ১৪নং নছিহত অমান্য করার পাপে লিপ্ত হতে হত। কেননা উক্ত নছিহতে সাফ্ বলা আছে, "সর্বদাই নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া চলো। কেননা ময়লা কুচ্ছলা ও অপরিষ্কার থাকিলে হয়তো স্বামীর মন অসন্তুষ্ট হইতে পারে।"

এতো দেখছি ভালো জ্বালা! ওর শরীর দিয়ে যখন বঙ্গলক্ষ্মী টারকিশ বাথ্ সাবানের নতুন গন্ধ ভুরভুর করে ভেসে চলেছে এবং যখন ওর মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস চেপে বসেছে যে আজ ওর মানুষটাও ওকে এই অবস্থায় কাছে পেলে গোলাপফুলের বরের মতই দিল্লাগী করত, নির্ঘাৎ করত, আল্লাহ্, তখন ওকে দুই নছিহতের দুই রকম নির্দেশ রীতিমত বিভ্রান্ত করে তুলল।

চেরাগী ফকিরের মুখে নবীর বচন সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে বিলকিস। নুরভর্তি মুখ। কপালের উপর লাল কাপড়ের ফেট্টি, পরনে মিশ্‌কালো আলখাল্লা, গলায় নানারঙের হরেক কিসিমের মালা। ফকিরের এক হাতে বাঁকানো লাঠি আরেক হাতে চেরাগ। চেগারের বাইরে দাঁড়িয়ে চেরাগটা মুখের কাছে এনে বচন পড়ত ফকির আর ওরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে বচন শুনত। প্রথম যেবার বচন শোনে বিলকিস, ফকিরের চেহারা দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল, ছোট খালার আঁচল ছাড়েনি কিছুতেই। তার গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ফকিরের বচন পড়ার সুরের মধ্যে একটা জাদু ছিল। তার টানে, যতই ভয় করুক, বিলকিস না এসে পারত না। ফকিরের প্রতি এখন সে খুবই আকৃষ্ট।

ফকিরের গলাটা ছিল ভরাট, যদিও ফোকলা মুখ আর বয়েস এই দুইই তাকে খানিকটা টস্‌কে দিয়েছে এখন, তবুও তা এখনও সুরেলা। গোলাপফুলের মাথা যত্ন করে ঘষে দিতে দিতে সাবানটা আরও বারদুয়েক শুঁকে নিল বিলকিস। সন্দেহ নেই গন্ধটা তার বেশ ভালো লাগছিল। এমন কি কেন যেন ওর মনে হচ্ছিল, ওর বরেরও এই গন্ধটা ভাল লাগত। যদিও বিলকিস মনে করতে পারল না, কেন একথা ওর মনে হল। বরকে যতটুকু ওর মনে আছে তাতে তাকে একটা গম্ভীর প্রকৃতির, ভাবিযুক্ত মৌলভী-মোল্লা কছমের লোক বলেই মনে হয়। ঐ লোক দিল্লাগী করবে তা তো মনেও হয় না। দাদী এখন তাকে ঐ বরের উপযুক্ত করে গড়ে পিটে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এটা করো, ওটা করো না, তাহলে আর আওরতে হাসিনা হতে পারবে না। উকিল ছাহেব হবেন ঈমানদার মানুষ। তার বিবি হওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। ফকিরের বচন শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে বিলকিসের। কথা সুর সব।

কোরাণের বাণী আর নবীর বচন।
মন প্রাণ দিয়া আরও শুন বিবিগণ॥
যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে।
কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে॥
শতশত সাপ বিচ্ছু কাটিবেক তথা।
দিবানিশি আগুনেতে জ্বলিবেক সেথা॥
আরও কত কষ্ট তার নাহিক শুমার।
সে সব কষ্টের কথা কি বলিব আর॥

তোমাকে আর বলতে হবে না। যে মেয়ের তিন বছর বিয়ে হয়েছে অথচ সোয়ামী ঘরে আসেনি, সে দিনরাত দোজখের জ্বালা অনুভব করে। কিম্বা দোজখের আগুনেও এত জ্বালা আছে কিনা সন্দেহ। বিলকিস্ ফকিরের উদ্দেশে কতবার একথা বলেছে। আমি কী গুনাহ্ করিছি ও-ফকির, কওনা? তা'লি ক্যান আমারে এত সাপ বিচ্ছু দিনরাত কাটতিছে? আল্লাহ্। ফকির চেরাগের কাছে মুখখানা এনে ফোক্‌লা দাঁত নেড়ে নেড়ে যখন বলে,

দেল জান দিয়া তাঁর মন যোগাইবে।
পতিরে প্রাণের চেয়ে মমতা করিবে॥

তাঁর মন যোগাবার জন্য বিলকিসের দেল জান দুইই তো তৈরি, কিন্তু যাঁর মন যোগাব, ফকির, তিনি কোথায়? তাঁকে এনে দ্যাও না। বচন শুনতে শুনতে বিলকিস কতদিন ফকিরকে মনে মনে এই প্রার্থনা জানিয়েছে। পাঁচ ওখ্‌ত নমাজ সেরে এই প্রার্থনাই আল্লাতালার কাছে ও রোজ জানায়। রোজ দুপুরে জোহরের নমাজের শেষে মুশকিল আসানী এবং বালা-মুসিবত দূর করার জন্য সাত দিন ধরে ফকিরের দেওয়া "ইয়া হাকীমু" মন্তরটা এক হাজার বার পাঠ করেছে। ফকির বলেছিল, এটা খুবই তেজী। সাত দিন আমল করতে পারলে খোদার মেহেরবানী তার যাবতীয় বালা-মুসিবত দূর করে দেবে, সকল মুশকিল আসান হয়ে যাবে। কিন্তু কই, ফকির যেমনভাবে এই ইস্‌মে পাকের আমল করতে বলেছে, সে তো সেইভাবেই আমল করেছে, ফল হ'ল কোথায়? কার বদ্ দোওয়া যে ওর উপর পড়েছে কে জানে? দূর, আর ভালো লাগে না। আল্লার দোয়া আদায়ের জন্য এত মেহনত করার ফল যদি এই হয়—তওবা তওবা, বিলকিস সামলে গেল। সর্বনাশ। আল্লার কাজের সমালোচনা করতে যাচ্ছিল সে! সোবানাল্লা। তাতেও ভয় কাটল না বিলকিসের। তারপর আবার এখন তার মনে পড়ল, ফকিরের নির্দেশ মত "ইয়া হাকীমু' ইসিম আমল করে সে কোনো ফলই পায়নি বলে যা ভাবছিল তা ঠিক নয়। তার বর আসেনি বটে তবে তার একখানা চিঠি এসে পেঁৗছেছিল।

না, তাকে লেখা নয়, তার আব্বার কাছে লেখা। বাবা যেহেতু পড়তে পারেন না তাই মেয়েকেই পড়ে শোনাতে হল। ঐ বিলকিস প্রথম ওর বরের হাতের লেখা দেখল। একেবারে মুক্তোর মত লেখা। জামাই শ্বশুরকে লিখেছেন, আল্লা-রসুলের মর্জি হইলে এবং বান্দার প্রতি তাঁহার নেক্‌নজর থাকিলে ওকালতি তিনিই পাস করাইয়া দিবেন অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। আপনি আমার পিতৃতুল্য এবং মুরুব্বি আপনার নিকট আমার আরজ এই যে আমি যেন নিজের হিম্মতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারি আমার উপর এই দোয়া রাখেন। পড়াশুনা আমল করিতে, বিশেষত আমার ন্যায় দরিদ্রের সন্তানের, সময় একটু বেশি লাগে। আপনার কন্যা যেন অধৈর্য না হইয়া উঠে আপনি তাহাই মেহেরবানি করিয়া তাহাকে বুঝাইবেন। আর একটা কথা, কলিকাতায় আসিয়া দেখিতেছি মুসলিম সমাজে বেশ জাগরণ হইতেছে। আপনি যদি পারেন আপনার কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবেন। বিদ্যা আমাদের চক্ষুস্বরূপ, ইহা ক্রমেই বুঝিতেছি। উহা যত আমল হইবে দুনিয়াকে ততই সাফ দেখা যাইবে।

এই চিঠিখানার কথা মনে পড়তেই বিলকিস্ আল্লার কাছে তার বেয়াদবির জন্য মাফ চাইতে লাগল। সে মনে মনে দোয়া চাইতে লাগল: "ছোবহানাল্লাহি ওয়াল্ হামুদ লিল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; ওয়া আল্লাহু আকবর্।" আল্লাহ্‌তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। আল্লাহ্‌তা'লা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ অতি মহান্। জামাইয়ের পত্তর পাওয়ার পর থেকে মেয়েকে তালিম দেবার জন্য ছবির বাবা নতুন

উৎসাহে তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। ফলে মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে ছবিকে কেবল কোরাণে আর নসিহতে পাঠ নিতে হয়েছে। প্রার্থনা করতে করতেই বুকের যাবতীয় পাষাণভার চোখের পানি হয়ে গলে গলে বিলকিসের বুক ভিজিয়ে দিতে লাগল। পাছে ওর কান্না গোলাপফুলের নজরে পড়ে তাই সে ঝপাং করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর ভুসভুস ডুব দিয়ে শরমের সব চিহ্ন মুছে ফেলতে লাগল।

টগর চোখ খুলতে পাচ্ছে না, কেননা চোখে সাবান।

গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হলো, ও গুলাপফুল, জলে ঝাঁপ দিলি যে বড়?"

বিলকিসের মন এখন একেবারে হাল্কা হয়ে উঠেছে। সে দুষ্টু হাসি ঠোঁটে এনে বলল, "তুমার সাবানডা জলে প'ড়ে গেল, তাই খুঁজতিছি।"

"অ্যাঁ, সব্বোনাশ!" বলেই চোখ খুলে দেখে বিলকিস দাঁত বের করে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ বন্ধ করল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। টগরের চোখে সাবানের ফেনা ঢুকে গিয়েছে।

আর টগর চেল্লাচ্ছে, "মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়ি! তুমার চালাকি করা ঘুচোচ্ছি। আজ যদি তুমারে না চুবোই তো আমার নামে কুকুর পুষিশ্।"

বিলকিস ততই হাসছে আর বলছে, "আয় না। চুবো না। ড্যাংগায় বসে ন্যাজ নাড়তিছিস ক্যান্?"

এতক্ষণে টগর নরম হল। "ও গুলাপফুল, চোখি যে কিছু দেখতি পাতিছি নে। তোরে ব্যাগ্যাতা কত্তিছি আমারে হাত ধরে জলে নামায়ে দে। শিগগির কর। চোখ জ্বলে গেল।"

টগরের রকম দেখে খুব মজা পেল বিলকিস। বলল, "তুই আমারে কিছু কবি নে তো?"

টগর উঃ আঃ চোখ গেল রে করতে করতে জবাব দিল, "মাইরি, মা কালীর দিব্যি, তোগের আল্লার কিরে, তোরে কিচ্ছু করব না। তুই আমারে রক্ষে কর।"

বিলকিস দেখল ওর গোলাপফুলের চোখ দিয়ে দর দর করে জল বের হচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি টগরের হাত ধরে গলা জলে নিয়ে এল তারপর চোখে জলের ঝাপটা মারতে লাগল। এতটা হবে বিলকিস বুঝতে পারেনি। সে একটু অপ্রস্তুত হল।

গোলাপফুলের চোখে ঝাপটা মারতে মারতে ক্রমাগত জিজ্ঞেস করতে থাকল, "ও গুলাপফুল, জ্বলুনি কমিছে?"

টগরের কথা প্রায় কান্নার মত শোনাল, "ন্ না।"

বিলকিস বলল, "তাকা দিকিনি ভালো ক'রে, তাকা, তাকা না?"

টগর বলল, "চোখ খুলতি পারলি তো তাকাব। বড্ড জ্বলতিছে।"

বিলকিস বলল, "সুহাগের ছ্যাঁকা মাঝে মদ্যি একটু জ্বলে থাকে।"

টগর এবার ফিক্ করে হেসেই চোখ মেলল। আর বিলকিস আস্তে আস্তে জলের ঝাপটা মারতে থাকল। টগরের চোখের জ্বলুনি সত্যিই কমে এল। টগর বলল, "সুহাগের ছ্যাঁকা কেমন লাগে, তুই জানলি কী করে?"

বিলকিস্ মুখ টিপে মুচকি হেসে বলল, "সুহাগের সাবানের কামড়ানি দেখেই সিডা আন্দাজে বুঝে নিলাম।"

টগর ভুস করে একটা ডুব দিয়ে উঠে দুহাত দিয়ে কপালের উপর থেকে চুল সরাতে সরাতে খুব আস্তে বলল, "এট্টু টক ঝালেই সুহাগ জমে ভাল, জানিস। মন্দর ঐরকম ব্যাভার। এই গা জ্বলায়ে দ্যায়, আবার পরক্ষণেই কী যে সব করে ভাই, সব যেন জুড়োয়ে যায়।"

টগর আবার ডুব দিতে শুরু করল।

বিলকিস্ বলল, "ডুব দিয়ে দিয়ে তো মাথার বাস সব উবোয়ে দিলি। দুলাভাইর সাবান কিনার পয়সাডাই বরবাদ হয়ে যাবেনে। নে ওঠ্। নাহলি হয়ত গঞ্জের থে সতীন কিনে আনবেনে তোর বর।"

টগর হাসতে হাসতে বলল, "ইল্লি, সুখির আমার সুখতুলি রে। ঝাঁটা মা'রে বিষ ঝাঁড়ে দেবো না।"

বিলকিস্ও হাসতে হাসতে বলল, "তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।"

টগর বলল, "এর আবার সাহসই কি, ভয়ই বা কি। তোর মন্দ যদি তোর ঘরে সতীন আ'নে হাজির করে তো তুই কি করিস? সহ্য করবি?"

"আমি?"

বিলকিস্ প্রশ্নটা শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গেল। আমি? আমি কী করব? এর কী জবাব হতে পারে, সে বুঝতেই পারল না। দাদী বা বাড়ির অন্যদের মুখে যা শুনেছে, কেতাবে একটু আধটু যা পড়েছে, ও সরলভাবে তাই বলল।

"আমাগের আর কী করার আছে? যখন মেয়ে হয়ে জন্মাইছি তখন কেতাবে যা লেখা আছে সেইভাবেই চলতি হবে। তুমি যদি আওরাতে হাসিনা হতি চাও, তা'লি তুমারে আল্লাহ্ আর সোয়ামীরি মানতিই হবে। কেতাবে লেখা আছে, যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া সবুর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লা শহীদের তুল্য ছওয়াব

দান করিবেন।"

টগর ওর মুখের কাছে হাত নেড়ে বলল, "ওলো সোয়ামীর রস পা'সনি তাই মুখি অমন শাস্তরের খই ফোটছে। সোয়ামী কী জিনিস একবার বুঝতি পারলি আর ভাগের কথা মুখি ফুটত না। সোয়ামীর গা দিয়ে পুঁজ গড়াবে তা জিভ দিয়ে চাটতি হবে, সোয়ামী সতীন আনবেন আর সুনা হেন মুখ ক'রে তারে সোয়ামীর খাটে তুলে দিতি হবে তবে আমি হাসিনা হবো, আহা, মরে যাই চোখ চা'টে খাই, অমন হাসিনাগিরির মুখি মারি ঝাঁটা।"

বিলকিসের কাছে তার গোলাপফুলের এই জোরালো সওয়ালের ভালো জবাব ছিল না। শাড়ি দিয়ে শরীরটা ভালো করে ঢাকা দিতে দিতে বলল, "চল ভাই চল। দেরি হয়ে গেল।"

তারপর ঘাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে টগর বিলকিসের খুব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, "একটু শুঁকে দ্যাখতো গুলাপফুল, সাবানের গন্ধটা কি মিলোয়ে গেছে না আছে? তোর গায় কিন্তু লা'গে আছে।"

টগর একটা ঘড়া এনেছিল। সে ওটায় জল ভরতে গেল। বিলকিস্ টগরের সাবানটা তালগাছের গুঁড়ির উপর থেকে যত্ন করে তুলে নিয়ে গোটাকতক পৈঁঠা বেয়ে খানিকটা উপরে উঠে ওর গোলাপফুলের জন্য দাঁড়িয়ে থাকল। টগরও উঠে এল। তারপর দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি উঠে এল ঘাটের উপরে।

বিলকিস কিছু না ভেবেই টগরের হাতে সাবানটা গুঁজে দিয়ে বলে উঠল, "গুলাপফুল, এই নে তোর সুহাগের সাবান। রাত্তির খাটে উঠার আগে এই সাবান দিয়ে হাত মুখডা ভালো করে ধুয়ে নিস্। গা দিয়ে সুহাগের বাস ভুরভুর করে বেরোবেনে।"

সাবানটা হাতে নিয়ে টগর বলল, "তা না হয় হ'লো। কিন্তু তুই ইডা কি করলি ক'দিনি? আমার কাঁখে জলের ঘড়া আর তুই আমারে ছুঁয়ে দিলি?"

বিলকিসের মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেল।

বলল, "সত্যি গোলাপফুল একেবারেই খিয়াল ছিল না। এখন কি হবে?"

টগর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলল, "কী আবাব হবে, কাজডা বাড়ায়ে দিলি, আর কী? ভাগ্যিস্ পিতলের ঘড়া আনিছিলাম তাই রক্ষে। মাটির কলসি হলি ফেলে দিতি হতো। যা, তুই বাড়ি যা। আমি যাই, ঘাটে নামি। ঘড়াটা মা'জে আবার একটা ডুব দিয়ে জল ভরে নিয়ে আসি গে।"

টগর কাঁখ থেকেই ঘড়া উপুড় করে ঘড়ার জল ফেলে দিতে লাগল। অপ্রস্তুত বিলকিস করুণ চোখে দেখতে লাগল টগরের ঘড়ার জল গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন মোটা একটা দাগ কেটে নদীর দিকেই নেমে যাচ্ছে।

॥ ২ ॥

গোলাপফুল 'কাল আসিস কিন্তু' বলে জল আনতে আবার এতটা কষ্ট করে ঘাটে নেমে গেল। তার মুসিবত বাড়িয়ে দেবার জন্য সত্যিই খুব কষ্ট পেল বিলকিস্। সঙ্গে সঙ্গে ভাবল সাবানটাও কি গোলাপফুল ধুয়ে নেবে? না না। তা হলে কি আর নিজে ইচ্ছে করে সে ওর গায়ে সেটা মাখিয়ে দেয়? সাবান ছুঁলে নিশ্চয়ই ওদের দোষ হয় না। পানি ছুঁলে হয়।

"আর এতক্ষণ যে এক পানিতি দু জনে মিলে গোসল করলাম, তার ব্যালা?" নিজের মনেই বলে উঠল, "ও গুলাপফুল, ঘড়ার পানি তো ফেলে দিলে, নদীর পানি ফ্যালবা কনে, সিডা এখন আমারে কও দিনি?"

কথাটা নিঃশব্দে টগরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

সত্যি গোলাপফুলের বরটা, কী দিল্লাগীটাই না করে ওর সঙ্গে! কথাটা মনে হতেই বিলকিসের গুলদাস্তার একটা কাহিনী মনে পড়ে গেল। কুলসুম আর আব্বাসের কাহিনী।

কুলসুমের নিঃসঙ্গ মন সেই প্রথম দৃষ্টিতে আব্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই কথাটা পড়ে বিলকিসের শরীরটা কেমন চনমন করে উঠেছিল, হঠাৎ তার শরীরটা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কী জাদুই না লুকিয়ে ছিল, এস ওয়াজেদ আলির লেখা ঐ একটি ছত্রের মধ্যে। বিলকিস গল্পটা পড়ে পড়ে একেবারে মুখস্ত করে রেখেছে।

এই দিব্যকান্তি মার্জিতরুচি মিশর-যুবকটির পরিচয় লাভের জন্য তার মনেও এক তীব্র কৌতূহল জেগে উঠেছিল। দুর্জয় লজ্জা এসে কিন্তু তাদের পরিচয়ের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো।

বিলকিস দিব্যকান্তি মার্জিতরুচি সেই মিশর যুবকটির একটা চেহারা মনে মনে আঁকবার চেষ্টা করত। চেনা জানা কারোর সঙ্গেই মিশরের সেই আব্বাসের চেহারা মিলত না। তার বর শফিকুল মোল্লার আদলের পাশেও সে আব্বাসকে দাঁড় করিয়ে দেখেছে। কিন্তু হতচ্ছাড়া বেল্লাল্লেলে লেখক আব্বাসের চেহারা কেমন তার বর্ণনা শুধু দিব্যকান্তি আর মার্জিতরুচি এই দুটো কথা দিয়েই সেরে রেখেছেন। ব্যস এখন তুমি বোঝ? গ্রামের মেয়ে, রসকসহীন বুড়ো

মৌলভীর কাছে যে লেখাপড়া শিখেছে, শিখছে, সে দিব্যকান্তিই বা কী বুঝবে আর মার্জিতরুচির মানেই বা কোত্থেকে জানবে? ওর ফুফাতো ভাই ইয়াকুব ঝিনেদায় লেখাপড়া করে। বইখানা সেই এনেছিল। তার সিগারেট ফোঁকার কথা আব্বাজানকে বলে দেবে না এই কড়ারে বিলকিস বইখানা প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছে।

যদিও সব কথা ভাল বুঝতে পারে না বিলকিস, কিন্তু এই বই তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ বাড়িতে পড়াশুনোর পাট একেবারেই নেই। এক ইয়াকুব ভাই ভরসা। মাঝে মাঝে বই-টই সেই এনে দেয়। সে জন্য বিলকিস তার কাছে কৃতজ্ঞ। ইয়াকুব ভাই বাড়ি এলে তার সিগারেট দেশলাই এখন বিলকিসই নিজের বাক্সে লুকিয়ে রাখে। আর হ্যাঁ, আর কৃতজ্ঞ সে তার বরের কাছে। কারণ জামাই-এর চিঠি পড়ার পরই তার আব্বা আবার তার লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু সে আর আরবি পড়বে না, আলিফ বে তে ছে তার মাথায় একদম ঢোকে না, সে বাংলা পড়বে, একথা শুনে মৌলভী ছাহেব তো ভির্মি খেয়ে পড়েন আর কি। মুসলমানের মেয়ে আরবি পড়বে না তো পাক্ কোরান তেলায়েত করবে কি করে? কিন্তু বিলকিস যখন জিদ্ ধরল, সে বাংলাই পড়বে এবং ওর আব্বা বললেন, মেয়ে যা চায় তাই পড়ুক তখন মৌলভী ছাহেব ইনশাল্লাহ বলে ওকে বাংলাই পড়াতে লাগলেন।

মৌলভী ছাহেবের মুখে শুধু কারুনের কেচ্ছা, মান্নত কছম ও কাফ্ফারার মাছায়েল, খাছ স্ত্রীলোকদিগের জন্য প'য়ত্রিশ নছিহত, স্বামীর হক্ বা স্ত্রীর কর্তব্য, তালিমোন্নেছা এমন কি আলিফ লায়লা আর হালাতুন্নবী শুনে শুনে বিলকিস যখন ক্লান্ত, এমন সময়, পিপাসার্ত লোকের কাছে ঠাণ্ডা জলভর্তি গেলাসের মত, গুলদাস্তা বইখানা তার হাতে এসে পড়ল। এ একেবারে অন্য জগত! তখন গোলাপফুল বাপের বাড়ি আসেনি।

কোথা দিয়ে যে দুই সপ্তাহ কেটে গেল, কেউ জানতেও পারলে না। জাহাজ শেষে লণ্ডনের বন্দরে এসে পৌঁছুল। কুলসুম একটি ট্যাক্সি করে হোটেল সেসিলে গেল, আর আব্বাস গেল হোসেন পাশার সঙ্গে সেভয় হোটেলে। হোসেন পাশা অনেক কথা জেনেছিলেন, কিন্তু স্টিমার ছাড়বার পূর্বেকার রাত্রে আব্বাস এবং কুলসুম যে পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, আর আব্বাস কুলসুমের হাতে (এই জায়গাটা যত এগিয়ে আসে বিলকিসের বুকের ঢিস্‌ঢিসানি ততই বাড়তে থাকে) বিদায়-চুম্বন দিতে গিয়ে (বিলকিসের চোখ মুখ দিয়ে যেন চৈতি দুপুরের গরম হাওয়ার হল্কা ছোটে) যে তার অধরে চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করে ফেলেছিল, (বেশরম! বিলকিস রীতিমত হাঁফাতে থাকে) সেই গোপন কথাটি তাকে বলেনি।

কোন্ মুখ নিয়ে এই বেহায়ারা আপনাকে সে কথা বলবে? মাঝে মাঝে বিলকিস হোসেন পাশাকে বলে। কে আব্বাস, কে কুলসুম, কোথায় লনডন, কোথায় বা মিশর আর স্টিমার বস্তুটাই বা কী, কিছুই জানে না বিলকিস। বিদায়-চুম্বন কী, তাও না। তবুও আব্বাস আর কুলসুমের বেহায়া কাজকর্ম দেখে সে অবাক হয়ে যায়। আব্বাস পুরুষ, তার কথা থাক, কিন্তু কুলসুম, মুখপুড়ি, তোর কাণ্ডটা কী? ছি। গোলাপফুল তার বাপের বাড়িতে না যদি আসত, না যদি বলত অমন অকপটে ওদের দাম্পত্য জীবনের কথা, বিলকিস ধরেই নিত এসব দিল্লাগীর কথা বই-এর পাতাতেই লেখা থাকে, মানুষের জীবনে ঘটে না।

কিন্তু তবু কেন বিলকিস্ এই গল্পটা এতবার করে পড়ে? এক ধরনের উত্তেজক আমেজের উথাল পাথাল ঢেউ-এর দোলায় কেন এত নাকানি চুবানি খেতে ভালোবাসে? আর তার চাইতেও শরমের কথা, কেন যে ঐ বেশরম কুলসুমটার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজেকে এক করে ফেলে? তার ভালো লাগে। কেন, কিছুতেই তা বুঝতে পারে না বিলকিস্। এতে গুনাহ্ হয় কি না, তাও না। নেকি আর বদির দ্বন্দ্ব তাকে অস্থির করে তোলে। আল্লাহ্।

"বিচারী গুলাপফুল! আমার অসাবধানির জন্যি তুমার কষ্টটা আবার বাড়ায়ে দিলাম।" বিলকিস মনে মনে খুব আফসোস করতে লাগল।

এই সময় কোকিলগুলোও বোধ হয় পাগল হয়ে যায়। বিলকিস ওদের বাড়ি ঢোকার মুখে বড় আমগাছটার দিকে ভালো করে নজর দিল। ফুরফুরে বাতাস আমগাছের ডগার পাতার ভিতর যেন আঙুল ঢুকিয়ে বিলি কেটে দিচ্ছে। কোন্ পাতার আড়ালে বসে যে দুটো কোকিল বিরামবিহীন কেবল কুউ কুউ ডেকেই চলেছে, অনেক চেষ্টাতেও তা দেখতে পেল না।

হঠাৎ তার নজর পড়ল দূরে, গুপালপুরির হাটের দিক থেকে একটা লোক, এক হাতে সুটকেশ আরেক বগলে একটা ছোট্ট বিছানার বাণ্ডিল, এদিকেই হনহন করে এগিয়ে আসছে। না, হাঁটার ভঙ্গিতে ভুল নেই। ওর বুক ধক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর বুঝি বন্ধই হয়ে এল। আল্লাহ্। বুক চিরে এক সকাতর কৃতজ্ঞতা বেরিয়ে যেতেই বিলকিসের যেন শ্বাস প্রশ্বাস আবার চালু হল। মুখের উপর লম্বা করে আবরু টেনে দিয়ে বিলকিস তাদের বাড়ির দহলিজের পাশ কাটিয়ে দ্রুত ভিতরে ঢুকে গেল।

"দাদীজান দাদীজান" বলেই বিলকিস্ ভিজে কাপড়েই দাদীর ঘরে ঢুকে পড়ল। দাদী বসে বসে তখন তস্‌বি জপ করছিলেন। বিলকিস হাঁফাতে হাঁফাতে একেবারে তার কোলের উপরে গিয়ে যেন আছাড় খেয়েছে, উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার কাপড় খুলে একরাশ ভিজে চুল দাদীর কোলের উপর ছড়িয়ে পড়ল। বিলকিসের ঐ অবস্থা দেখে বুড়ীর বুকটা ছ্যাঁক

করে উঠল। তসবি একপাশে সরিয়ে রেখে একবার দোয়া করে নিয়েই বুড়ী শশব্যস্তে বলে উঠল, “কী হলো, কী হলো? ও দিদিসুনা? প'ড়ে গে'লে না কি? ও মণি?”

কী হয়েছে, কী হচ্ছে, বিলকিস নিজেই কি জানে যে বলবে। শুধু টের পাচ্ছে ওর শরীরে ওর মনে কেমন একটা তোলপাড় শুরু হয়েছে। ও চলতে পারছে না, দাঁড়াতে পারছে না, বসতে পারছে না। ওর কান, না না শুধু কান নয়, সমস্ত শরীরটাই উৎকর্ণ হয়ে আছে, দহলিজে কোনো শোরগোল পড়ে কিনা, বাড়িতে কোনো কথা ওঠে কিনা তা শোনবার জন্য। কিন্তু যদি না হয়, যদি ভুল হয় তার। আল্লাহ্।

“কী হলো, কী হলো, ও দিদি, ও মণি, ও সুনা, ও ছবি, কথা ক'স্ নে ক্যান? আছাড় খালি নাকি?”

বিলকিস কথা বলল না। দাদীর কোলে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল সে পড়ে যায়নি। বুড়ী একটু স্বস্তি পেল।

“অ'লি এই অবেলায় ভিজে কাপড় না ছা'ড়ে ঠাস করে আমার কোলের উপর আ'সে পড়লি ক্যান? ওঠ, কাপড় ছাড়।”

কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সদরেও যেমন সব চুপচাপ, অন্দরেও তেমন সব শান্ত। আসমান-জমিনের মধ্যে যত আওয়াজ ছিল, শয়তান বুঝি সব শুষে নিয়েছে। বুকের ভিতর একটা প্রবল উত্তেজনা এবং তীব্র হতাশা এই দুইয়ের ঠেলাঠেলিতে এমন একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণার সৃষ্টি হল যে বিলকিসের মনে হতে লাগল তার দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

হঠাৎ ওর দাদীর মনে হল বিলকিসের উপর হয় জাদুর কিম্বা জিনের আসর হয়েছে আর নয় নির্ঘাৎ কোনো রকম বদ দোয়া লেগেছে। না হলে জলজ্যান্ত মেয়েটা কোনোদিন এমন করে না আজই বা এমন করছে কেন? বিলকিসের মাথার কাছে নিজের মুখটা এগিয়ে আনতেই তার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। জিন। তাঁর আদরের নাতনির মাথায়, চুলে, সারা গায়ে কিসের একটা গন্ধ, যা তাঁর এতখানি জিন্দিগিতে কোনো দিনই পাননি। এ জিন। জিন না হয়ে যায় না। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এই দুধের বাচ্চা তোমারই বাঁদী। মালেক, তুমি ওর মুসিবত ভালো করে দাও, ওর এই শক্ত মুশকিল দূর করে দাও।

বুড়ী তাড়াতাড়ি ওঁর তস্‌বিগাছটা হাতে তুলে নিলেন। বিলকিসের মাথা চুল আর শরীরের বিভিন্ন জায়গা আবার বেশ বার কয়েক শুঁকে নিলেন। তারপর এই গন্ধওয়ালা জিনটাকে বেকায়দায় ফেলবার জন্য পবিত্র তসবিটা শক্ত হাতে ধরে বিলকিসের মাথার উপর খত্‌মে-তসমিয়া পড়ার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

একবার ডাকলেন, “ছবি, ও ছবি, ও দিদি, ও মণি, ও সুনা, ওঠো, ভিজে কাপড়ডা ছাড়ো?”

বিলকিস উত্তর দিল না। সে তখন নিঃশব্দে কাঁদছে।

বুড়ী এবার ডাকলেন, “বউ, ও বউ, বউ-বিটি!”

সাড়া পেলেন না।

বুড়ী আর দেরি না করে খত্‌মে-তসমিয়া পড়তে শুরু করে দিলেন। বিপদে আপদে এর চাইতে ভালো আর কিছু নেই। সোয়া লক্ষ বার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এই নাম পড়ে যেতে পারলে যে কোনও শক্ত মুশকিল দূর হয়ে যায়। যাতে বিলকিস আর তার ঘাড়ে চাপা গন্ধওয়ালা সেই জিনটাও শুনতে পায় তাই বুড়ী বিলকিসের মাথার উপর তস্‌বি ঘোরাতে ঘোরাতে বেশ জোরেই পড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণ খত্‌মে-তসমিয়া পড়ার পর দাদী আরেকটা দোয়াও পড়ে দিলেন, “আউজুবিল্লাহে-মিনা শ্বাই তা নিররিজম”।

বিলকিসও চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মনে মনে দাদীর সঙ্গে গলা মেলাল, “বিতাড়িত শয়তানের দুষ্টামি হইতে আমি খোদা তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।”

ও বাড়ির ঝি মোছফেকা হন্তদন্ত হয়ে দাদীবিবির ঘরে ঢুকে দুজনকে ঐ অবস্থায় দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “দাদীজান, আপনারা কান্তিছেন কী এখেনে!”

বুড়ী মালা ঘুরোতে ঘুরোতে বললেন, “ও নফরের মা আসে পড়িছ, ভালোই হয়েছে। এখন শিগগির যাও, দহলিজি যায়ে ছবির বাবারে ডা'কে আনো গে। ছবির উপর জিনির আসর হয়েছে।”

মোছফেকা তো আকাশ থেকে পড়ল, “কী কলেন দাদীজান, জিন! হায় আল্লা! জিন আর আসর করার সুমায় পা'লো না। অ্যাদ্দিন পরে বাড়িতি জামাই আলো, আর মেয়েডারে জিনি ধ'রলো। হায় নসিব।”

বিলকিস নিঃশব্দে আল্লাহ বলে ডাক দিয়ে দাদীর কোল ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, “আমারে জিনি ধরিছে তুমারে ক'লো কিডা? অ্যাঁ?” বিলকিসকে এক লাফে উঠে দাঁড়াতে দেখে, ওকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখে বুড়ীর তো তসবি ঘুরোনো আটকে গেল। ফ্যালফ্যাল করে এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখতে দেখতে বুড়ী

বিবি আমতা আমতা করে বললেন, "তোরে জিনি যদি নাই ধরবে তো সারাডা গায় জিনির গন্ধডা আ'লো কনথে শুনি? ও নফরের মা, শুঁকে দ্যাখ দিন ওর গাডা, গন্ধ 'পা'স্' কিনা?"

মোছফেকা ভয়ে ভয়ে বিলকিসের গা শুঁকতে গিয়েই এক ধমক খেল।

বিলকিস বলল, "জিবনির গন্ধ না তুমার মাথা। ও তো সাবানির গন্ধ।"

বুড়ী বিবি বললেন, "সোবানাল্লা! সাবানির গন্ধ! তা আমার কোলে আ'সে দাদীজান করে ঠাস হয়ে পড়লি ক্যান?"

এতক্ষণে বিলকিসের মুখে হাসি ফুটল।

বলল, "বেশ করিছি, যাও।"

বুড়ী বিবি বললেন, "তা হলি এতক্ষণ ধরে যে দিদিরে সুনারে কয়ে অ্যাতো ডাকাডাকি করলাম, ভিজে কাপড় ছাড়তি কলাম, তার একডাউ জবাব দিলি নে ক্যান?"

"কব না, যাও।"

বলেই বিলকিস কাপড় ছাড়তে চলে গেল।

মোছফেকা আর বুড়ি বিবি দুজনে দুজনের দিকে বোকার মত চেয়ে রইলেন।

॥ ৩ ॥

আছরের নমাজ শেষ হবার পর থেকে হাজী সাহেবের দহলিজে বসে খালেক মুছল্লি সমানে বক বক করে যাচ্ছিলেন। আর হাজী সাহেব চুপ করে তা শুনছিলেন। আর একমনে আলবোলায় টান দিচ্ছিলেন। খালেক মুছল্লিও হুঁকো টানছিল। মাঝে মাঝে বাড়ির ভিতর থেকে একটা কুকড়ো কক্ কাকিয়ে উঠেই যা একটু শান্তি ভঙ্গ করছিল। এ ছাড়া বাড়িটায় বিশেষ কোনও সাড়া শব্দ নেই।

খালেক মুছল্লি বললেন, "বোঝলেন বড় মিঞা, আপনি মুরুব্বি লোক, আপনার উপর খোদার অশেষ মেহেরবানী।"

গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে হাজী সাহেব বললেন, "কি রকম?"

খালেক বললেন, "মুসলমানের পাঁচ ফরজ। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ আর জাকাত। এই পাঁচটা পিরাতিজ্জে যে মুসলমান পুরো কত্তি পারে আল্লার হাজার শোকর সব সুমায় তার মাথার উপর থাকে। তা আপনি হজ করে আ'সে তো পাঁচটা ফরজ পুরো ক'রে দেলেন।"

হাজী সাহেব বললেন, "সবই আল্লার ইচ্ছে। তিনি মালিক, আমি বান্দা। তিনি তাঁর বান্দারে যেমন চালায়ে নেচ্ছেন তেমনি ভাবেই চলতিছি। না হলি যার পেটে এক ফোঁটা এলেম নেই তার কী সাধ্য, এই সব কাম হাছিল করে।"

খালেক মুছল্লি হাজী সাহেবের এই ধরনের কথা শুনে মারহাব্বা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বললেন, "বড় মিঞা এই তো হোলো গিয়ে ঈমানের কথা। এইডেই তো আসল কথা। কেতাবেও কয়েছে, আ-মান্তু বিল্লা-হে কামা হুয়া বে-আছমা-য়েহী, ওয়া ছেফাতেহী ওয়া কাবিলতু জামিয়া আরকা-নেহী, ওয়া আহকা-মিহী। অর্থাৎ কিনা সর্বপ্রকার নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহ্-তা'লার উপর ঈমান অর্থাৎ কিনা বিশ্বাস আনিলাম ও তাঁহার যাবতীয় আদেশ ও ব্যবস্থা সমূহ কবুল করিলাম।"

হাজী সাহেব ফরাশির নলটা মুখ থেকে নামিয়ে একবার "জাল্লা শা-নুহু" বলে নিয়ে আবার তামাক টানতে লাগলেন। আল্লার নাম কানে ঢুকলেই হাজী সাহেব আজকাল মৃদুস্বরে একবার কথাটা উচ্চারণ করে নেন।

হুঁকোয় গোটা কতক টান দিয়ে খালেক দেখলেন ফসফস আওয়াজ ছাড়া আর কিছু বের হচ্ছে না। কল্কেটা খুলে নিয়ে নিবোল্ত টিকেটাকে এদিক ওদিক করে তারপর এক মনে ফুঁ দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "ফু ফু হাদিছে আছে ফুউউ ফুউউ যে ব্যক্তি কোরান পাঠ ফুউ ফুউ করে এবং তদনুযায়ী কার্য ফুউ ফু ফুউ-উ করে ফু কেয়ামতের দিবস তাহার পিতামাতাকে ফুউউ ফুউউ ফুউস সূর্য অপেক্ষাও জ্যোতির্ময় টুপী পরান হইবে। ফুউউ ফুউ ফুউউ..."

হাজী সাহেব বললেন, "ও কল্কেয় কি আর রাখিছ কিছু যে ফুঁ দেচ্ছ অত। উডারে তো অ্যাকেবারে বামুনচুষা কল্কে ক'রে ছা'ড়ে দেছ। ওরে নফরা, নফরা, কল্কেডা সা'জে দে দিন ভালো ক'রে।"

নফর কাছেই ছিল। ডাক শুনে আদাব করে দাঁড়াল এসে।

বলল, "জে?"

হাজী সাহেব বললেন, "মুছল্লির কল্কেডা ভালো ক'রে সা'জে দে।"

নফর কল্কে সাজতে বসে গেল। লাল ঝুঁটি একটা বিরাট মোরগ কোঁ কোঁ কোঁ করে যেন কার দিকে তেড়ে গেল।

হাজী সাহেব বললেন, "খালেক তুমি এলেমদার লোক। লিখতি পড়তি পারো। কত জিনিস জানো! আল্লার-কুদরতে টাকা পয়সা কিছু তো হ'লো। কিন্তু ঐ এলেমডা আর এ

জন্মেউ হ'লো না। রসুল কয়েছেন, যে লোক কোরান পড়াতি পারে আর অন্য লোকিরি পড়াতি পারে সেই লোকের জায়গা সগলের উপরে। বুঝিছ। তা নিকিরির ছাওয়াল, মাছ মারা ছাড়া আর তো কিছুই শেখলাম না। মনে মনে কই, এও তুমারই ইচ্ছে মালিক। যা করাবা তাই তো করব।"

খালেক বললেন, "সোবানাল্লা। এর উপর আর কথা কী?"

হাজী সাহেব বললেন, "যাক গে যাক। আল্লার মনে যা আছে তাই হবে। এখন তুমি এটটু পুঁথি শুনোউদিনি। তুমি যেমন পুঁথি পড়, এক ফকির ছাড়া তেমনডা আর কেউ পারে না।"

খালেক বললেন, "কার সংগে কার কথা। ফকির ছাহেব হলেন বুজুর্গ উস্তাদ্। উনার কাছে কিডা লাগে। ওঁর বয়েস যে কত তাউ কেউ কতি পারে না। আপনি আমারে ভালবাসেন। আপনার মুহব্বতই আমার দেলে শক্তি জোগায়। তাই যা করি তাই আপনার কানে ভালো শোনায়। না হলি আমি আর কী? আপনার উপর আল্লার হাজার শোকর, হাজার আশীর্বাদ পড়ুক। এখন কন কোন পুঁথি কব।"

হাজী সাহেব বললেন, "ঐ যে সেদিন শুরু গেলে, কাসাসুলআম্বিয়া শুনাবা। ওব মদ্যিই তো পয়গম্বরের কথা আছে?"

খালেক বললেন, "জে হাঁ।"

হাজী সাহেব বললেন, "তালি ঐডেই পড়ো।"

খালেক হাটু গেড়ে বসে হাতের চেটো দুটো উপরের দিকে তুলে তার স্বভাবসিদ্ধ সুরেলা কণ্ঠে শুরু করল, "বিসমিল্লা হি রাহমানির রাহিম।"

খালেক কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে সম্ভবত একটু মনঃসংযোগ করে নিলেন। তারপর সুরেলা পয়ারে "কাসাসুলআম্বিয়া" পুঁথি থেকে অনায়াসে আবৃত্তি করে যেতে লাগলেনঃ

হজরত জিবরিল তবে হুকুমে রব্বের।
বলিলেন সাপ আর ময়ূর খাতের॥
নেকলিয়া যাও সবে জন্নত হইতে।
গোজরান কর গিয়া দুনিয়া বিচেতে॥
তারপরে বলিলেন আদম হাওয়ারে।
জন্নত হইতে যাও দুনিয়ার পরে॥
শুনিয়া আদম হাওয়া লাগিল কান্দিতে।
জন্নতের মায়া তারা না পারে ছাড়িতে॥
আফছোছ করিয়া ছফি কান্দে জারজার।
শোগেতে কলিজাচুর হইল তাহার॥
জৈতুন গাছের ডাল পড়িয়া আছিল।
হজরত আদম তায় আশা বানাইল॥
সে আশার গুণ আমি না পারি লেখিতে।
আখেরেতে গেল আশা মুছার হাতেতে॥
জিবরিল ময়ূর আর সাপের তরেতে।
দোঁহাকে ফেলিয়া দিল জংগল বিচেতে॥
সরন্দীপে ফেলে আদম ইবলিচেব তরে।
হাওয়া বিবিকে ফেলে জেদ্দার শহরে॥

সত্যিই খালেক মুন্সি পুঁথি ভালো পড়ে। পাছে তার সুরেলা উঁচু নিচু ঢেউ ওঠা আবৃত্তিতে কোনও রকম ব্যাঘাত ঘটে তাই হাজী সাহেব এমন আলতোভাবে গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন যে তা থেকে কিছুমাত্র শব্দ উঠছিল না।

খালেক পড়ছিলেন,

সরন্দীপে কেন্দে ফিরে হজরত আদম।
হাওয়া বিবির কারণেতে বড় করে গম॥
আদম কান্দিয়া ফিরে দরিয়া ধারেতে।
আঁখি হইতে আঁছু যার পড়ে যেখানেতে॥
খোরমা লবংগের গাছ যেখানেতে হইল।
যে আঁছু দরিয়ায় গিয়ে মতি হয়ে গেল॥
এইরূপে আদম ছফি কান্দিয়া বেড়ায়।
তিন সও সাল এয়ছা গোজারিয়া যায়॥

খালেক এই পর্যন্ত আসতে না আসতেই বড় মোরগটা কোঁকর কোঁ করে বিকট ডাক ছেড়ে চেগারের বেড়ার দরজার দিকে তেড়ে গেল। "আরে মোরগ বা, বাড়ির লোককেই দেখি ঠোকর মারতে শিখেছে" বলতে বলতে এক বগলে বিছানা'র বাণ্ডিল তাতে একটা বদনা ঝোলানো আর এক হাতে টিনের সুটকেস বয়ে নিয়ে শফিকুল বেশ খোশ মেজাজেই শ্বশুর বাড়ি ঢুকল।

দহ্‌লিজের ডুয়ার উপরে সুটকেশ বিছানা রেখে “আস্‌সালামু আলায়কুম” বলে শ্বশুরের পা ছুঁয়ে কদমবুছি করতে গেল। হাজী সাহেব “ওয়া আলাইকুমস্‌সালাম” বলে তাড়াতাড়ি তখ্‌তপোষের উপর থেকে উঠেই জামাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কিছুক্ষণ বাদে শ্বশুরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার পর ফটিক মিঞা, শফিকুল তার গ্রামে এই নামেই পরিচিত, “আস্‌সালাম্‌ আলায়কুম” বলে খালেক মুছল্লির দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিল। খালেক তার হাত দুটো ধরে বললেন, “ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম।”

হাজী সাহেব বললেন, “পথে কষ্ট হয়নি তো বাপ?”

ফটিক মিঞা বলল, “জে না।”

হাজী সাহেব হঠাৎ মোছফেকাকে যেতে দেখে হাঁক ছাড়লেন, “কিডা, নফরের মা নাকি? ভিতরে যায়ে খবর দ্যাও আমাগের জামাই-বাপ আ'সে গেছেন। ছবির মারে নাস্তা-পানির ব্যবস্থা কত্তি কও গে।”

মোছফেকা ঘোমটাটাকে আরও লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্দরে ছুটল।

হাজী সাহেব বললেন, “এই ব্যাটা নফ্‌রা, সারাদিন ব'সে ব'সে একটা কল্কেয় ফুঁ দিয়ে কাটালিই চলবে? যা জামাইর বিছানা সুটকেশ ভিতরে রা'খে আয়।”

নফর বিছানার বাণ্ডিল আর সুটকেশ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

হাজী সাহেব ধমক দিলেন, “আরে বিটা যা'স কনে?”

নফর অবাক হয়ে বলল, “জে, ভিতরে যাচ্ছি। এগুলোরে রা খে আসি।”

হাজী সাহেব বললেন, “বিটার খালি চোখির আড়াল হবার মতলব। সাত তাড়াতাড়ি বিছানা সুটকেশ ভিতরে পাঠাবার জন্যি তুমার এত তাড়া ক্যান। বলি ওগুলো কি তুমারে কামড়াচ্ছে। রাখ ওগুলো। যা বদনা ভরে পানি আনেক আগে। বাপ আমার হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হোক।”

নফর মুখ ব্যাজার করে বিছানা আর সুটকেশ নামিয়ে রেখে বড় বদনাটা তুলে নিয়ে টিউকলের ঠাণ্ডা পানি আনবে বলে সেই দিকেই এগুলো।

হাজী সাহেব বললেন, “আবার যা'স কনে?”

নফর বলল, “জে, টিউকলের ঠাণ্ডা পানি এক বদনা আ'নে দিই দুলা ভাইরি?”

হাজী সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, “থাক আর বুদ্ধি খরচ করে কাজ নেই। এখন ঐ পাখাখান দিয়ে বাপজানের এটটু বাতাস কর দিনি। বলি চোখির মাথা খা'য়ে ব'সে আছো না কী?”

নফর কালবিলম্ব না করে, শফিকুলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, একখানা তালপাতার পাখা দিয়ে জোরে হাওয়া করতে শুরু করল।

খালেক মুছল্লি বললেন, “আল্লার রহমত তুমার উপর চিরদিন থাহুক। আল্লার হাজার শোকর তুমার উপব চিরদিন থাহুক। তুমি লায়েক হ'য়ে ফিরিছ, বাপ, তুমি এলেমদার হ'য়ে ফিরে আইছো, এর চাইতি খোশ্‌ খবর আর কি হতি পারে? এখন কওম আর মজ্‌হবের তরক্কির চিন্তায় আর ইসলামের খেদমতে মন দ্যাও, এই আমাগের বুড়ো বয়সের আরজ। হজরত রসুল কয়েছেন যে লোক দীন ইসলাম তাজা করার মতলব নিয়ে এলেম শিক্ষা করে ও এমতাবস্থায় মরে যায়, তা হলি বেহেশ্‌তে তার আর নবীগের মধ্যি কেবল একটা মাত্তর দরজার ফারাক হবে। অর্থাৎ কিনা সে লোকটা একটা নবুওয়াতের দরজা ছাড়া পয়গাম্বরগের আর সব দরজাগুলোই পায়ে যাবে। এলেম এমনই জিনিস বাপ। ওর কাছে ধন বলো দৌলত বলো ওসব কিছু না। খোদা তুমারে খুশ্‌ হালে রাখুন।”

একটু দম নিয়ে খালেক জিজ্ঞাসা করলেন, “তা বাপের আমার এখন আসা হচ্ছে কন্‌ থে?”

ফটিক মিঞা বলল, “জে, কলকাতার থেকে।”

খালেক বললেন, “তালি তো বাপের পরেশান হয়েছে জবর। মুখখানা শুকনো শুকনো লাগতিছে।”

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাজী সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, “ওরে ও নফরা ওখেনে সঙের মত দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কত্তিছোডা কী, অ্যাঁ?”

নফর হাত পাখা জোরে চালাতে চালাতে বলল, “জে, এই যে দুলা ভাইরি বাতাস কত্তিছি।”

হাজী সাহেব এবার রুদ্রমূর্তি ধরলেন, “বাতাস কত্তিছি! কম্মের একেবারে গুরুঠাউর। বাতাস কত্তিছি। বাপজান আমার এই রোদি তা'তে পুড়ে সেই কলকাতার থে আ'লো, কলকাতা কি এহেনে, কুথায় তারে ঠাণ্ডা করাবি, মুখ হাত ধুবার পানি আ'নে দিবি, একটু ঠাণ্ডা মিছরির পানা-টানা ক'রে খাওয়াবি, তা না, হতভাগা বসে বসে ল্যাজ নাড়তিছেন। যা যা বদনায় বেশ ঠাণ্ডা পানি ভরে নিয়ে আয়।”

হাজী সাহেবের ঐ এক মেয়ে ছবি অর্থাৎ বিলকিস। আর ছেলেপুলে নেই। তাই তাকে একটু বেশী বয়সেই, বিলকিসের বয়স তখন তের, বিয়ে দেন। লাগোয়া গ্রামের ছেলে শফিকুল। তারই ছেলেবেলার বন্ধুর ছেলে। অবস্থা ভালো না। শফিকুলের বাবা সাজ্জাদ গরিব চাষী। যাকে নাঙলা-চাষা বলে, তাই। এখনও সে চাষ করে। তবে হ্যাঁ, ঈমানদার মুসলমান। লোক ভাল। আর ফটিকের তো কথাই নেই। ঐ দিগরে অমন ছেলে আর দুটো নেই। দেওয়ান বাড়ির মেজোকর্তার সাগরেদ। এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজের মাতব্বর মেম্বা সাহেব ফটিক মিঞাকে জামাই করবার জন্য

খুব ঝোঁক ধরেছিলেন। কোশিশ্‌ও কম করেননি। কিন্তু ফটিক মিঞা ঘরজামাই হতে কিছুতেই রাজি হয়নি। সবাই তখন অবাক হয়েছিল। এ রকম হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলতে পারে, এদিকের লোক কি হিন্দু কি মুসলমান, কেউ এর আগে তা দেখেনি। মেন্দা সাহেব উপযাচক হয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে এক নাঙলা-চাষার ছাওয়ালের বিয়ের প্রস্তাব করছেন, এটা যেমন ফলাও করে রটবার মত খবর, তেমনি শফিকুল যে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বসল, সেটা ততোধিক ফলাও করে রটনা হয়ে গেল। বলাই বাহুল্য মেন্দা সাহেব ফটিকের উপর কিঞ্চিৎ রুষ্ট হলেন। ছবি তখন সাত আট বছরের। তারপর ফটিক মিঞা মোক্তারি পাশ করল, আই-এ বি-এ পাশ করল। মাস্টারি করল গ্রামের মাইনর ইশকুলে। গোলাম আব্বাস নির্কিরি তখনও হাজী হননি। হজ করে আসা ইস্তক ঠিক করলেন মেয়ের বিয়ে দেবেন। পাত্র তো তাঁর চোখের উপরই ঘুরছে। ছবির বয়স তখন তের। আর দেরি করা উচিত নয়। খোদা ভরসা করে ফটিকের বাপের কাছেই কথাটা পাড়লেন। না মেন্দা সাহেবের মত নিজের দহ্‌লিজে ডেকে আনেন নি ফটিক বা তার বাপকে।

নিজেই ফটিকের বাড়িতে গেলেন। তার বাপের কাছে কথাটা পাড়লেন। এও জানালেন, ফটিক যা বলবে, তাই তিনি মেনে নেবেন। তাঁর মেয়েকে যদি বিয়ে-শাদির পর নিজের বাড়িতেই এনে তুলতে চায় ফটিক তুলুক না, হাজী সাহেবের কোনও আপত্তিই নেই। নিজের অতীত তিনি ভুলে যাননি। এই রকম ঘর থেকেই তিনি আল্লার মেহেরবানীতে আজ উঠেছেন। তাঁর বাড়িতে আজ পাঁচখানা টিনের ঘর। আল্লার মর্জি হলে, কোঠাবাড়ি বানাবার খায়েশটাও তাঁর পুরো হতে পারে। এর উপর ফটিক আর কথা বলতে পারেনি। শুধু দুটো কথা বলেছিল। বিয়ে করার পরই সে ওকালতি পড়তে কলকাতায় যাবে, পাশ না করে ফিরবে না। ততদিন ছবি বাপের বাড়িতেই থাকুক। আর ছবিকে যেন এর মধ্যে লেখাপড়া কিছু শেখানো হয়।

সেই জামাই আজ বাড়িতে ফিরে এসেছে। কী করে যে হাজী সাহেব তাকে যত্ন করবেন বুঝতে পারছেন না।

নফর বদনায় পানি ভরে নিয়ে এল। ফটিক বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হল। সত্যিই তার আরাম হল।

হাজী সাহেব এবার একটু মোলায়েম স্বরে নফরকে বললেন, “যা বিটা ভিতরে যা। ছবির মারে ক'গে ঐ যে ইয়াকুবির বাপ রোজা ভাঙার জন্যি এক বোতল রুহ্‌ আব্‌জা আ'নে দিইছিল তাই দিয়ে বাপজানের জন্যি বেশ ভালো করে এক গিলাস সরবৎ যেন বানায়ে দ্যায়। টিউকলের ঠাণ্ডা পানি দিয়ে যেন বানায়, বুঝলি?”

রুহ্‌ আব্‌জার-প্রতি হাজী সাহেবের দুর্বলতার কথা বাড়ির সকলেই জানে। তাই নফর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, “জে, শুধু এক গিলাস বানাতি কব?”

হাজী সাহেব বললেন, “ফেরেশতা জিবরিলউ যদি আসে তবু বিটার আক্কেলের গুড়োয় পানি ঢালতি পারবে না। তুমি ছবির মারে গিয়ে কওগে যাও। তারপর তিনি যদি এক গিলাস পাঠান, এক গিলাস আনবা, যদি তিন গিলাস পাঠান তবে তাই আনবা। ইবার মাথায় ঢুকিছে তো? তবে যাও বাপ, এখেনে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে আর ল্যাজ না'ড়ে না।”

কলকাতা ফেরৎ ওকালতি পাশ দেওয়া জামাই-এর কি ভালো লাগে আর কি লাগে না, হাজী সাহেব বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই তাঁর উদ্বেগ বাড়ছিল।

॥ ৪ ॥

বাড়িতে হুট্‌ করে জামাই এসে পড়েছে শুনেই ছবির মা নয়মোন বিবি পাশের বাড়ি থেকে ওর ছোট দুই বোনকে ডাকিয়ে আনলেন। তারা এসে ছবিকে নিয়ে পড়ল। বাড়িতে একেবারে হুল্লোড় পড়ে গেল। এদিকে বার-বাড়িতে জামাই নিয়ে মিঞা সাহেব বসে আছেন তো বসেই আছেন, ভিতরে এসে একবার উঁকিও মারলেন না, কাজের মধ্যে কেবলই হুকুম পাঠাচ্ছেন এটা পাঠাও ওটা পাঠাও। আল্লার দয়ায় নয়মোন বিবির ভাঁড়ারে জিনিসের তেমন অকুলান নেই। তা বলে এতদিন পরে জামাই এসেছে, কাঁচা জিনিস তো আর জামাই-এর মুখে তুলে দেওয়া যায় না। এখন নাস্তা বানাতি হবে। চত্তির মাসের দিন। জামাই সেই কত দূর থেকে আসছে। আজ সারাদিন পথে খাওয়া হয়েছে কিনা তাই বা কে জানে? তাই বলে তো আবার এমন নাস্তাও দেওয়া চলে না যা খেয়ে জামাই হয়তো রাত্তিরে খেতেই চাইবে না। রাত্তিরের খাবারেরই বা কি ব্যবস্থা করা যায়। বিরিয়ানির কথা একবার মনে হয়েছিল নয়মোন বিবির। দুটো কথা মনে হতেই পিছিয়ে গেল। ভালো বিরিয়ানি রাঁধে যে বাবুরচি সে থাকে মধুপুরে। তাকে খবর দিয়ে আনাতেই রাত পুইয়ে যাবে। তা ছাড়া, সন্ধ্যের মুখে ভালো রকম নাস্তা খাওয়ার পর রাত্তিরে বিরিয়ানির মত ভারি জিনিস জামাই আবার খেতে পারবে কি না কে জানে? তার চাইতে কাল দুপুরেই বিরিয়ানি হোক। বরং এখনই গোফুর বাবুর্চিকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হোক।”

নয়মোন বিবি ডাকলেন, “মোছফেকা?”

মোছফেকা এসে দাঁড়াল। দু হাত দিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে।

নয়মোন বিবি বললেন, "হাতে জল ক্যান্ ?"

মোছফেকা বলল, "আন্ডাগুলো জলে চুবোয়ে পরখ করে নিচ্ছিলাম বড়ভাবী।"

"তা বেশ করেছিস। এখন শোন। তোর ছাওয়ালরে একবার ডা'কে আ'নে ক'য়ে দে দিন, বড় মিঞারে যায়ে যেন কয়, এখনই গোফুর বাবুর্চির খবর পাঠাক। কা'ল যেন ভোর হতি না হতিই চলে আসে। আর রিয়াজুদ্দির খাসি দুটো এই ব্যালা কিনে ফ্যালায় যেন। আর দ্যাখ, ভালো ক'রে ময়দা মাখে দে। পরোটা ভাজব। আর আন্ডার শুখা দম। আর ক্ষীর। কী কো'স ?"

মোছফেকা বলল, "তা নাস্তা হিসেবে ভালোই।"

"আর শোন, তোর ছাওয়ালরে ক, গুটা তিনিক কুক্‌ড়ো মারুক। ছালুন রাঁধি। আর মাছ তো রয়েইছে। আর দ্যাখ দিনি ঘরে কাঁচা আম আছে নাকি, না থাকলি পাড়াতি ক গুটা কতক। মুশুরির ডাল দিয়ে রাঁধে দিই।"

"বউ-বিবি" বলে একটা লম্বা ডাক দিয়ে ছবি এক দৌড়ে তার মার পিঠে এসে মুখ গুঁজে দাঁড়াল।

"ক্যান্ গো শাউড়ি সুনা ?"

"তুমার বুনিগের বারণ করে দ্যাও কচ্ছি, আমার পিছনে যেন অমন করে না লাগে ?"

"ক্যান্, কি হইছে ?"

"উরা আমারে সব যা তা কচ্ছে।"

বলতে বলতেই মায়ের পিঠে মুখ লুকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল ছবি। তারপর দৌড়ে দাদীর ঘরে আশ্রয় নিতে ছুটল। নয়মোন বিবি দেখলেন, তার মেয়ের গালে সিঁদুরে আমের রঙ ধরেছে। ওঁর মুখে খুশির ঢেউ বয়ে গেল। মনে মনে বললেন, "আল্লাহ্", তারপর রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিলেন।

॥ ৫ ॥

নয়মোন বিবির একেবারে ফুরসৎ নেই। চরকির মত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এ বাড়িতে যখন এসেছিলেন নোলকপরা ছোট্ট এক খুকি। বাপ বদরুদ্দি শেখ, দু বছর হল তাঁর এন্তেকাল হয়েছে, ধর্মভীরু গরীব চাষী, হাজী সাহেবের বাপ মরহুম বরকতুল্লা নিকিরির একেবারে দেলজানের বন্ধু। নয়মোনের যেমন বাপের ঘর তেমনি শ্বশুর ঘর, যদিও এ-পাড়া আর ও-পাড়া, চাল চুলো দুইই ছিল বটে তবে নামমাত্তর। বরকতুল্লার এক ছেলে, কিন্তু নয়মোনরা ছয় ভাই বোন। দু বোনের বিয়ে পাশের বাড়িতেই হয়েছে, হাজী সাহেবেরই চাচাতো ভাই-এর দুই ছেলের সংগে। নয়মোন দুই বোনকে ডাকিয়ে এনেছে। সলিমা আর নাজমা—ছুটকি আর ফুটকি। এদের তেমন বয়েস নয়। বিলকিস থেকে পাঁচ ছয় বছরের বড় ছুটকি। ফুটকির সংগে বয়েসের তফাৎ দু বছরেরও নয়, তাই ছবি তাকে মোটেই মানে না। ছবির ওরা একদিকে খালা আরেক দিকে ভাবী। তা ছবি তাদের সেই ছোটবেলা থেকেই ছুটকি আর ফুটকি ছাড়া কিছুই বলে না। এ নিয়ে অশান্তি কম হয়নি। ছবির শাদী হবার পর ওরা হাল ছেড়ে মেনে নিয়েছে। ছবি ওর মাকেও কোনোদিন মা বলেনি, দাদীর সংগে সংগে সেও বরাবর বউবিবি বলে এসেছে। ছবি খুব পয়মন্ত মেয়ে। এক ছেলে হয়েই মরে যাবার পর অনেক দিন আর ছেলেপুলে হয়নি। তখন নয়মোন আশা ছেড়েই দিয়েছিল। সোয়ামীকে সতীন আনার পরামর্শ দিয়েছিল। আবার আজমীর শরিফে মানতও করে রেখেছিল। গোলাম আব্বাস আল্লার উপর ভরসা করে তাঁর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছিল। নয়মোনের কথায় কান দেয়নি।

উত্তরে নয়মোনকে বলেছিল, "তুই থাম তো। দুই জুড়া জুতো কি এক পায় পরা যায় ? পারিস্ যদি প'রে দেখা। আমি তার পর দিনই একটা চকচকে বিবি আনে ফ্যালবানে।"

সেই রাত্তিরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। নয়মোন জীবনে ভুলবে কি সে কথা ? সে আর গোলাম পাটি আর বালিশ নিয়ে একটু শুকনো জায়গার খোঁজে বলে সারা ঘর চষে বেড়াচ্ছিল। ঘর ছাইবার পয়সাও তখন ছিল না। গোলাম নয়মোনকে বলেছিল, "বিষ্টি হলি ঘরে একডা বিবিরই রাখার জায়গা পাইনে। এর উপর আরাকডা বিবি আনলি তারে কি চালের বাতায় গুঁজে রাখব ?" গোলামের কথাবার্তার ধরন তখন এই রকমই ছিল। বলত কি, "মোল্লা মুন্সিরা তো কয় শুনি যে আল্লা তোর সংগে আমার জোড় বাঁধার জন্যি আমার শরীলির আধখানা দিয়ে তোরে বানাইছেন। তা'লি আমার থা'কলো আর আধখানা। তা আরাকডা বিবির জন্যি আমার শরীলির বাকি আধখানা যদি দিয়ে দিতি হয় তা'লি আমারই বা থাকে কী, আর তোর জন্যিই বা রাখি কী ? ওরে ও বুকো মাথাই, এই কথাডার জবাব আমারে দে দিন।" নয়মোন খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। আর সারা রাত ওরা পিঠে পিঠ দিয়ে বসে রাত কাটিয়েছিল। আর চাঁদ-কপালির তখন বিয়োবার দিন ঘনিয়ে এসেছিল। বেচারি সারা রাত ভিজতে ভিজতে হ্বা—আ—আ হ্বা—আ—আ মাঝে মাঝে কাতর স্বরে ডাক ছাড়ছিল। শেষ রাত্তিরে বৃষ্টি চেপে এলে গোলাম তাকে তাদের সেই ঘরেই ভিজতে ভিজতে গিয়ে নিয়ে এসেছিল। নয়মোনকে উদ্বেগের তাগিদে বলে উঠেছিল, "বিবি আগুন

কর্। চাঁদ-কপালি শিটোয়ে গেছে। সে'ক দে, শিগগির সে'ক দে।"

এ যেন সেদিনের কথা। আজ নয়মোনের চার পুতায় চারখান ঘর। টিনের চালে ছাওয়া। দহলিজ্, গোয়াল সব আলাদা আলাদা। গোয়ালের পাশে ঢেঁকিঘর। ই'দারা শান বাঁধানো। একটা টিউকলও বাড়িতে বসেছে। মিঞার এখন ইচ্ছে কোঠাবাড়ি বানায়। পা'ক পাড়ায় যেমন বাবুগের বালাখানা তেমনি। আল্লাহ্ সব খায়েশ পূর্ণ করেছেন। আর সব হ'ল বিলকিস্ পেটে আসবার পর। ছবি খুব পয়মন্ত মেয়ে।

ডালে কাঠি দিতে দিতে নয়মোন বিবি ডাকলেন, "ও মোছফেকা ঘরখানা ভালো ক'রে ঝাড়পোঁছ করে দে। আর ছুটকি ফুটকিগের ডাক দিনি একবার। উরা বিছানাডা ভালো ক'রে ঝা'ড়ে দিক। আর তোর ছাওয়ালরে দিয়ে মিঞারে ক'য়ে পাঠা, উনার হাউসির বাতিডে যেন বের করে দ্যান। উডা আ'জ জামাইর ঘরে জ্বালায়ে দিবানে। আর জামাইরি ইবার ছা'ড়ে দিতি ক। বাপ্ আমার এত দূরির থে তাতে পু'ড়ে আ'লো, তারে কি সারা রাত দহ্লিজে বসায়ে রাখবে না কি? নাশ্তাডা পর্যন্ত ভিতরে আসে খাতি দিল না। লোকের আসার আর বিরেম নেই। বাপ্ আমার এট্টু হাত পা ছড়ায়ে জিরোয়ে নেবে তা নয়।"

"বউ বিটি ও বউ বিটি।"

শাশুড়ির ডাক শুনেই নয়মোন সে ঘরে ছুটলেন।

বুড়ি-বিবি বললেন, "ও বউ, আমারে এট্টু পান ছা'চে দিবা? আর ঐ ঘরে যাও, দ্যাহ তুমার বিটির কান্ড। আমার শুবার ঘরে একবার ঢুকে দ্যাহ। উস্থুম কুস্থুম লা'গে গেছে।"

নয়মোন বিবি শ্বাশুড়ির ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন সেখানে হুলুস্থুলু কান্ড চলেছে। ছবি বেজায় খেপে গিয়ে একটা বালিশ নিয়ে ফুটকিকে তাড়া করেছে আর ফুটকি আত্মরক্ষার জন্য খাটের চারদিকে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আর ছুটকি একটু দূরে দাঁড়িয়ে "আঃ, কত্তিছিস কী তোরা? এখন থামেক দিন!" বলে ধমকে যাচ্ছে।

নয়মোন ঢোকামাত্র তিনজনে একসঙ্গে নালিশ জানাতে ছুটে এল।

ছুটকিঃ দ্যাহ বড় বু দুটোর কান্ড দ্যাহ।

ছবিঃ বউ বিটি তুমার বুনিগের সামলাও। ভালো হবে না কয়ে দিচ্ছি।

ছুটকিঃ আ মর ছুঁড়ি। আমি তোর কী করিছি?

ছবিঃ তুমার কথা কইছি নাকি। ঐ ফুটকিরি আমার পিছনে লাগতি বারণ করে দ্যাও।

ফুটকিঃ আমি কি তোরে নিজির কথা কচ্ছি? যারা ফট্কেরে নিজির চোখি হাঁটতি দেহিছে তারাই কয়েছে।

ছবিঃ তারা ছাই দেখিছে। তারা কি চোখে ঠুলি প'রে ঘোরে? তাগের চশমা নিতি কও গে যাও।

নয়মোন বিবিঃ বলি ব্যাপারটা কী? কিসির দ্যাখাদেখি?

ফুটকিঃ একজন দেহিছে যে ফটিক মিঞার বাঁ পা খান ডান পা'র চাইতি খানিকটে ছোট হয়ে গেছে। এই এট্টুস খানি।

নয়মোন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যান্?"

ফুটকি গম্ভীরভাবে বলল, "ক্যান্ তা আমি জানি কী? তবে ফটিক মিঞা নাকি কারে কয়েছে ক'লকাতা শহরে নাকি অনেক মটোর গাড়ি চলে। মটোর গাড়ির শব্দ আচমকা লাগলি নাকি, যে পায় লাগে সেই পা খান ছোট হয়ে যায়। তখন সেই লোক হা'টে গেলি মনে হয় যেন ঢেঁকিতে চি'ড়ে কুটতিছে। ঢে'কুস্ কুস্ ঢে'কুস্ কুস্।

নয়মোন ফ্যাল ফ্যাল করে একবার ছবির দিকে আর একবার ফুটকির দিকে চাইতে লাগলেন।

ছবি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল, "নাগো বউ-বিটি মিথ্যে কথা। তুমার এই মিথ্যুক বুনিরি ফেরেশ্তারা কেয়ামতের দিনি যদি চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যায়ে দোজখের আগুনি না ভাজে তো আমার নামে কুকুর পু'ষো।"

ছুটকি সরলভাবে বলল, "ফুটকি যে মিছে কথা কচ্ছে তুই তা জানলি কি করে?"

ছবি রাগের মাথায় বলে ফেলল, "নদীর ঘাটের থে গোসল করে আসার সুমায় আমি বুঝি আর দেখিনি, কই তখন তো ঢেঁকিতে চি'ড়ে কুটতি দ্যাখলাম না।"

"উরি বিচ্ছু মেয়ে, বেশরম, এর মদ্যি বেগানা মরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চুকোয়ে ফেলিছ।"

ছবি এতক্ষণে বুঝল রাগের মাথায় ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ে সে একেবারে ওদের ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। ওর মুখ লজ্জায় আরও লাল হয়ে গেল। সে বেকুবের মত মাথা নিচু করে অসহায়ভাবে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল।

ওর দাদী এগিয়ে এসে বললেন, "বিসমিল্লা! নিজির মরদ বেগানা মরদ হতি যাবে কোন্ দুঃখি, ওরে ছুঁড়ি। নিজির মরদরে দেহিছে বেশ করিছে। ওরে ও মোছফেকা, ইবার বুঝা গেল আমাগের বিবিজানরি কোন জিনি ধরিছিল। এ বড় বেয়াড়া জিন্। একেবারে কাঁঠালির আঁঠা। লাগলি আর ছাড়তি চায় না।"

সকলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

ছবি বেজায় রেগে গেল।

"দা-দী-জা-ন্! যাও, তুমার সংগে আড়ি। আড়ি আড়ি। তুমার সংগে কথা কব না, তুমার সংগে শোব না—"

"শুয়ার জন্যি, হায় আল্লাহ্, আর এই বুড়ির বিছানার যেন কোনোদিন দরকার না হয়। দিদি সুনা তুমার দেলজানের হেফাজতকারী তো আসেই গেছে ভাই, ইবার সব জিম্মা তার। আল্লাহ্ তারে আর তুমারে যে জোড় বানায়ে দেছেন তা জমিনে আর আসমানে সুমানভাবে যেন বহাল রাখেন।"

ফুটাকি ফুট কাটল, "কিডা যেন কচ্ছিল, কলকাতায় নাকি পর্দা নেই। হুর পরীর মত বিবিজানরা বেপর্দা রাস্তাঘাটে [illegible] বেড়ায়। আর মিঞা ছাহেবরা কারে ফেলে কারে দেখে, তাই চোখ নাকি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে [illegible] হরবখত ডাইনি বাঁয়ে ঘুরাতি থাকে। তাই কলকাতায় বেশীদিন থাকলি মিঞাগের চোখ নাকি [illegible] হয়ে যায়। তা ফটিক মিঞা তো অ্যাদ্দিন ক'লকাতায় কাটায়ে আ'লো, ও ছবি, কী দেখলি, মিঞা ছাহেবের চোখ সুজাই আছে না ট্যারা হয়ে গেছে?"

ছবি কাঁদো কাঁদো মুখে "দা-দী-জা-ন" বলে চেঁচিয়ে উঠেই বুঝল, ওরা ওকে খেপাচ্ছে। তারপর ফস্ করে বলে বসল, "হ্যাঁ দেখিছি। বাঁ চোখটা ডা'ন দিকি আর ডা'ন চোখটা বাঁ দিকি ঘুরে গেছে। ক'লকাতার থে ঘুরে আসার পর তোর বরের যেমন হয়েছে ঠিক তেমনি।"

বলতে বলতে ও নিজেই খিলখিল করে হেসে ফেলল। দেখাদেখি অন্যরাও।

নয়মোন বিবি বললেন, "ও ছুটাকি জামাইর ঘরে বিছানাডা ভালো ক'রে পা'তে ফ্যাল দিনি। আমার ঘরে আড়ার উপর সিলেটের সরু শীতলপাটিডে আছে, বড় মিঞা কিনে আনিছেলেন, উডা পা'ড়ে আন। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ভালো ক'রে মুছে উডা বিছানার উপর পা'তে দিতি হবেনে। আর আলমারির থে ভালো একডা দস্তরখানও বের ক'রে রাখিস্। জামাইর খাওয়ার সুমায় পা'তে দিতি হবে। কাঁচের বাসনগুলোও বের করিস্। তোর ছাড়া আর কারউ হাতে ওগুলো দিয়ে ভরসাও পাইনে। সিবার নফরের মা অমন সুন্দর পল তুলা কাঁচের বাটিডে ভাংগেই ফেলে দিল। যা যা আর দেরি করিস নে। বিছানাডা পাতা হলি জামাইরি ডা'কে পাঠাই। কাপড় জামা ছাড়ুক। গোসল করতি চায় তো করুক। কতক্ষণ আর বাইরি ব'সে থাকবে। যত বুড়ো হচ্ছে মানুষডার হ'ুশ পরব তত গায়েব হচ্ছে। জামাইডারে ভিতরে পাঠায়ে দেবে, তা সে হ'ুশই নেই।"

ফুটাকি বলল, "জামাইর জন্যি তো তরিবত খুবই কচ্ছ। মেয়েডার দিকি নজর দেছো। একেবারে তো রুপির ধুচুনী হয়ে ব'সে আছেন। মিঞারে আর কাছে যাতি হবে না। দুরির থেই পেত্নী ভাবে সে পগার পার হবে।"

ছবির থুতনি ধরে মুখখানা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে ফুটাকি মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠল, "আহা ছুরতের কি বাহার! বিলকিস বিবির এই ছুরত দেখে ক'লকাতার বিবি দেখনে-অলা মিঞার চোখ একেবারে সিধে কপালে উঠে যাবে তখন আম-পাড়া কুট দিয়ে তা'রে টা'নে নামাতি হবে।"

ছবি ফুটাকি বিবির পিঠে গুম্ করে এক কিল বসিয়ে "তাতে তুমার কী" বলেই ছুটে পালাল।

নয়মোন বিবি হাসতে হাসতে বললেন, "তা'লি আর তুরা আছিস ক্যান্। ঘ'ষে মা'জে পাগলিডার ছুরতখান ফিরোয় দে না।"

॥ ৬ ॥

এতক্ষণে ফটিক মিঞার কিঞ্চিৎ ক্লান্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল। হাজী সাহেবের দহলিজে পুরো মজলিসটাই সরগরম হয়ে উঠেছে। একে একে সবাই ফটিককেই দেখবার জন্য এসেছিল। ঘন ঘন হাত বাড়িয়ে এক এক জনের হাত চেপে ধরতে হচ্ছিল, এই রকম মোসাফা করতে করতে আর সালাম দিতে দিতে ফটিকের হাত আর মুখ দুইই প্রায় ব্যথা হয়ে গেল। কেউ বললেন "আস্সালা-মু আলায়কুম", কেউবা "সেলামালেকুম" আবার কেউ বললেন, ছালাম আলেকুম। তারপর কারো মুখে শোনা গেল, "ওয়া আলাইকুমুস্সালাম", আবার কারো কারো মুখে বা "ওয়ালেকুম সালাম।" তারপর পরিচিত মুরুব্বিদের অনেকেই ফটিককে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। ফটিকও বয়ঃকনিষ্ঠ দু একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বাকিরা হাতে হাত রেখে মোসাফা করে একে একে গিয়ে ফরাশের উপর গ্যাঁট হয়ে বসলেন। ঘন ঘন তামাক আসতে লাগল। হ'ুকোর ভুড়ুক ভুড়ুকে ফটিকের একবার মনে হল যেন ঘোর বর্ষায় মত্ত দাদুরীর ডাক শুরু হয়েছে।

আছো কেমন, ছিলে কেমন, ক'লকাতার খাস খবর কী, খোশ খবর কী, ইত্যাকার জিজ্ঞাসাবাদও এক সময় শেষ হল। তারপর মজলিসের অধিকাংশ লোকই ফটিকের উপর নজর দেওয়া থেকে হ'ুকোর উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবং মজলিসের আলোচনা ক্রমে কলকাতা ফটিক ইত্যাদি বিষয় অতিক্রম করে একেবারে গ্রামের কথায় চলে এল। কলকাতার ব্যাপারে কৌতূহল ছাড়তে পারছিল না কেবল বাইজদ্দি মোল্লা। বাইজদ্দিই হচ্ছে হাজী সাহেবের ডান হাত। তাঁর যতগুলো মাছের আড়ত আছে, সে সবের দেখাশোনা বাইজদ্দিই

করে। তাই তাকে কখনো মাগরো, কখনো ঝিনেদা, কখনো যশোর, কখনো চুয়াডাঙ্গা, কখনো রাজবাড়ি, কখনো বা গোয়ালন্দের মোকামগুলোয় যেতে হয়। রাণাঘাট পর্যন্ত ঘুরে এসেছে বাইজুদ্দি। কলকাতায় যায়নি। বিভিন্ন মোকামে এমন সব লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে যারা আজগুবি সব গল্প শুনিয়েছে তাকে। সেখেনে নাকি এমন রেলগাড়ি আছে যার মাথায় টিকি যা বিনা ইনজিন চলে। আবার যাত্রা থিয়েটার হয় তাতে নাকি মানুষ পাট করে না। সব নাকি ছবিতে করে। তার নাম নাকি টকী। বাইজুদ্দির দৃঢ় বিশ্বাস ওসব জিন পরীর কেরদানি। এইসব কথা একটু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে বলে বাইজুদ্দি ফাঁক খুঁজছিল।

হঠাৎ বদর গাজী বলে উঠল, "ইবার গুপাল [illegible] তেজ ভাঙবে। শুনিছেন তো চাচা অশ্বিনী দারোগা বদলি হয়ে গেছে।"

জয়নুদ্দি বলে উঠল, "সোবানাল্লা। বিটা ইবলিসির বাচ্চা, আমাগের একেবারে হাড় জ্বালায়ে খায়েছে। পান থেকে চুন খসলিই একেবারে পাছমুড়া দিয়ে বাঁধে নিয়ে গেছে।"

সবুরালি মোল্লা বলল, "ঈমানের দাম আছে বুঝিছ। পাঁচ পীরির দরগায় সিন্নি মানত করিছিলাম, তা কি বেথা হবে? আল্লা আরজ শুনিছেন। ঐ জন্যিই বুঝিছ, আল্লারে মা-লিকু ইয়াওমুদ্দিন কয় অর্থাৎ কিনা আল্লাই বিচার দিবসের অধিপতি। কোরানে তাঁরে বলা হয়েছে, হুয়াল্লাতিফুল খাবীর, অর্থাৎ কিনা তিনিই সূক্ষ্মসতর্কশীল। তাঁর চোখরি ফাঁকি দিয়া খুব শক্ত।"

বাইজুদ্দি বলল, "তুমি পাঁচ পীরির দরগায় সিন্নি মানত করিছ! ইডা তো ভাই নতুন কথা শুনা'লে সবুর মিঞা।"

সবুর মোল্লা হুঁকোয় লম্বা টান দিয়ে হুঁকোর গা থেকে লালা মুছতে মুছতে বলল, "এর মদ্যি নতুন কথাডা পা'লে কনে শুনি?"

বাইজুদ্দি বলল, "দ্যাখো সবুর মিঞা তুমি পিঁপড়ের পাছা টিপে গুড় বা'র ক'রে খাও, সে-কথা এই গিরামের কিডা না জানে? তাই এটুটা নয়, দুটো নয় একেবারে পাঁচ পাঁচটা পীরির দরগায় সিন্নি চড়াবার মানত ক'রে ফেললে কিনা, ঐ কথাডা নতুন লা'গলো।"

মজলিসে হাসির গররা উঠল।

খালেক মুন্সি জিজ্ঞেস করলেন, "ও মিঞা, কী এমন মুসিবতে প'ড়লে যে পাঁচ পীরির দরগায় সিন্নির মানত করে ব'সলে, এর মদ্যি তো তুমার কোনো রকম বিপদ আপদের কথা কিছু শুনিনি।"

সবুর মোল্লা বলল, "এর মদ্যিই ভুলে গেলে? তামুকটা তো বড় জবর আনিছেন বড় মিঞা, ক'লকাতার তামুক না কি?"

হাজী সাহেব বললেন, "আতরটা ক'লকাতার থে আনাইছি। আগ্রার আতর। তামুকটা এখেনেই বানায়ে নিছি। তেমন কড়াউ না, আবার একেবারে ন্যাতানোও না।"

সবুরালি এক মনে হুঁকো টানছিল, বলল, "আগ্রার আতর। তাই বলি, এমন খোশবাই ছাড়ে কিসি?"

বাইজুদ্দি বলল, "আতরের খোশবাইর কথা ছাড়ো দিনি মিঞা। তুমার মুসিবতের কথাডা কও।"

সবুর বলল, "বাইজুদ্দি ভাই কী আশ্চয্যি, কথাডা তুমিই ভুলে মা'রে দিলে? হায় আল্লা। ভুবনপুরির বাওড় নিয়ে নমসুদ্দুরগের সঙ্গে যে দাঙ্গা কা'জেটা হ'ল সিবার, তাতে আমাগের গিরামের সব কডারি চালান ক'রে দিল না, বিটা মালাউন, ঐ অশ্বিনী দারোগা, সেইবারই তো আমি মানত করলাম, হে আল্লা, হে রহিম, হে লা-শরিক খোদা, হে মেহেরবান, হে আছমান আর জমিনের মালিক, যদি আমি সাচ্চা ঈমানদার হয়ে থাকি, আমার ওয়াদা পুর্ণ করে থাকি, তোমার নিশানের সম্মান করে থাকি, পায়খানা পিশাব করার পর হরবখত ঢিলা কুলুখ ব্যাভার করে শরীলডারে পাক সাফ করে রাখি, তা'লি যেমনভাবে জালিম ফেরাউনগেরে শায়েস্তা করিছ তেমনিভাবেই তুমি অশ্বিনী দারোগারেউ শায়েস্তা করবা। যেদিন আমার নিয়েত পুর্ণ হবে আমি সেই দিন পাঁচ পীরির দরগায় সিন্নি চড়াব।"

খালেক মুন্সি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আরে সে তো দু বছর আগের কথা।"

বাইজুদ্দি বলল, "তুমার নিয়েত পুরুতি দু বছর লা'গলো, বলি মানতটা কি খোদার কাছে বিয়ারিং পোস্টোয় পাঠাইছিলে?"

সবুর বলল, "দ্যাখ বাইজুদ্দি, আমার পুঙায় আজ অ্যাতো কাঠি দেচ্ছ ক্যান্ কও দিনি। আমি কি তুমার পাকা ধানে মই ডলিছি?"

বাইজুদ্দি বলল, "আমার পাকা ধানে মই ডলবা ক্যান্, পাঁচ পীরির দরগায় সিন্নি চড়াইছ।"

এতক্ষণে হাজী সাহেব বললেন, "অশ্বিনী দারোগার কুষ্টি তো খুব কাটতিছ। বলি দাঙ্গাটা বাধাইছিল কিডা? তুমরা না অশ্বিনী দারোগা? মাথা গরম ক'রে তুমরা লাঠি শড়কি নিয়ে কা'জে বাধাতি গেলেই বা ক্যান?"

সবুরালি বলল, "বাঃ, আপনি কন্ কি চাচা। আমরা নিকিরি, ঐ বাওড়ডা পালি তবে আমরা খায়ে বাঁচতাম। আমরা দখল নেবো না।"

হাজী সাহেব বললেন, "আল্লা তোমাগেরই শুধু পেট দেছেন, আর যাগের গিরামের কাছে বাওড়, সেই জা'লেগের পেট দ্যান নি?"

হঠাৎ হাজী সাহেবের মুখে এই ধরনের কথা শুনে সবুরালি একটু থতমত খেয়ে গেল। ফটিকও এতক্ষণ পরে নড়ে চড়ে বসল। বেশ বুঝমানের মত কথাটা বলেছেন হাজী সাহেব।

হাজী সাহেব বললেন, "জলে রয়েছে মাছ। তুমরা নিকিরি, উরা জা'লে। তুমরা যাবা জাল নিয়ে, তা না, গেলে ঢাল-সড়কি-লাঠি নিয়ে। উরাও লা'ঠেল ডা'কে নিয়ে আ'লো। বাওড়ের মাছ বাওড়েই থা'কল, বা'ধে গেল ফৌজদারি। অ্যাতো ক'রে মাথা ঠাণ্ডা রাখতি কলাম। অ্যাতো কলাম আমি ও জলকর জমা নিয়ে দিচ্ছি। তুমরাও মাছ ধর, উরাউ ধরুক। কইছিলাম না যে মাছউ আমি কিনে নেবো। তা তুমাগের সব জিহাদী রক্ত গরম হয়ে উঠল। গাজী হবার সাধ জা'গলো। কই, সেই কা'জেই তো মনসুর আর নছরা গাজী হ'লো। এখন তাগের বউ বিটিগেরে কিডা দ্যাখে? সেই যিনি জিহাদ করার মতলব দিচ্ছিলেন, তিনি গ্যালেন কনে?"

সবুরালি হুকো টানতে টানতে বলল, "চাচা আমরা একে মুখ্যু তায় রক্ত গরম। মুরুব্বিরা যা কন, আমরা তাই বিশ্বাস করি। আমরা তখন শুনিছিলাম, সিডা নাকি আমাগের ঈমান আর হকের লড়াই। হিন্দুরা আমাগের মুখির গিরাস কা'ড়ে নিবার জন্যি ষড়যন্তর আঁটতিছে। ভুবনপুরির বাওড়ের জমা কোনো মুছলমানে যাতে না নিতি পারে, গুপাল বিশ্বেসরা তারই জুগাড় কত্তিছে। শুনে আমরা তাই বিশ্বাস করলাম। তারপর শুনলাম গুপাল বিশ্বেস ঐ বাওড়াডা জমা নিবার ব্যবস্থা সব ক'রে ফেলিছে। এখন লাঠি ধরা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। আবার মা'গরোর মৌলবী সাহেব আ'সে মজলিস ডাকে কলেন, ভাই মুসলমান ইডা হল মজহবের সওয়াল। হক্ আর ঈমানের সওয়াল। দুনিয়ার ইসলামের নিশান উ'চুতি থাকবে না মাটিতি লুটোয়ে পড়বে তা ঠিক হবে এই বাওড়ের উপর ইসলামের নিশান ওড়বে না কাফেরের ঝাণ্ডা গাড়া হবে তার উপর।"

নাজেম নিকিরি এতক্ষণ চুপ ক'রে হুকো টানছিল। এবার মুখ তুলে বলল, "সবুর ভাই ঠিক কথাই কয়েছে বড় মিঞা। এমনিতিই আমাগের রক্ত আগুন হয়ে উঠিছিল। তার উপর মা'গরোর মৌলবী সাহেব মেন্দা সাহেবের মজলিসে দেলেন তারে উস্কোয়ে। কোরান শরীফ খুলে আল্লার নাম নিয়ে কতি থাকলেন, ভাই মুসলমান আজ ইসলামের বিজায় বিপদ। যে আল্লা তুমাগের জন্যি জমিনের বিছানা আর আসমানের ছাদ বানায়ে দেছেন, সেই আসমান আর জমিনের যিনি মালিক আল্ হামদো লিল্লা-হে রাব্বিল আ-লামীন, সব রকম প্রশংসা-ই আল্লার জন্য যিনি দীন দুনিয়া পালন করেন সেই তাঁর হুকুম শোনোঃ হে ঈমানদারগণ! যে সব কাফের তুমাগের আশে পাশে আছে তাগের সঙ্গে যুদ্ধ করো। ব্যস্ অ্যাকে মা মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ। আর দ্যাখে কিডা, আমরা যার হাতের কাছে যা পালাম তাই নিয়ে কা'জে কত্তি ছোটলাম। দু দুটো জুয়ান ঘায়েল হলো। তারপর থানা পুলিশ কোর্ট কাছারি আর মামলা। ঐ মামলায়. মামলায় সব গেল। ঘর বাড়ি সব দিনার দায়ে বন্ধক।"

হাজী সাহেব শুধু "আল্লাহ্" বলে একটা ডাক ছাড়লেন। সবাই চুপ।

ভালো করে ফু দিয়ে একটা নতুন কল্কে সেজে বাইজদ্দি সবুরালিকে দিল।

তারপর বলল, "ভাই, সাজতি বেশ মেহনত হয়েছে, অ্যাকাই চুষে শেষ ক'রে না।"

হঠাৎ ফটিক নাজেম নিকিরিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের তো ঘর বাড়ি বাঁধা পড়ল, কিন্তু যাঁর বাড়ি থেকে জেহাদের আওয়াজ ছাড়া হল, তাঁর কী হ'ল? আর যে মৌলবী সাহেব সুরা তওবা আউড়ে তোমাদের তাতিয়ে দিয়ে কাজিয়াটা বাধালেন, তাঁরই বা কী হল?"

নাজেম নিকিরি ফটিকের প্রশ্নে অবাক হল।

বলল, "তাগের? তাগের আবার হবে কী!"

বাইজদ্দি বলল, "মিঞা তুমি জানো কচু। মেন্দা সাহেব হলেন লোকাল বোরডের পিরসি-ডেনট আর জিল্লা বোরডের মেমবার। কেননা, এই দিগরে চাউর হয়ে গেল, মেন্দা সাহেব ছেলেন বলেই এখানকার মুসলিম জাহান বাঁ'চে গেল। খুব ভোট উনি কুড়োলেন। আর বাওড়ডা বন্দোবস্ত নিল মা'গরোর মৌলবী সাহেবের ভাতিজা। এখন মাছ ধরতি মা'গরোর জা'লে আর নিকিরিরে আসে। আর অশ্বিনী দারোগা আ'সে মেন্দার বাড়ি নাস্তা করে। পান তামুক খায়।"

বদর গাজী বলল, "বাঃ তবে যে শুনলাম অশ্বিনী দারোগারে মেন্দাই সরা'লেন।"

এর জবাব দেবার আগেই মসজিদ থেকে মাগরেবের নামাজের আজান ভেসে এল "আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর।" তখন সবাই নামাজের জন্য তৈরি হবার জন্য বদনার থেকে পানি ঢেলে ঢেলে অজু করতে বসে গেলেন।

হাজী সাহেবের দহলিজে সবাই মাগরেবের নামাজ শেষ করে ক্ষীর পিঠা খেয়ে যে যার বাড়ি চলে যেতেই বৈঠকখানা ফাঁকা হয়ে গেল। নফর ভিতর থেকে এসে হাজী সাহেবকে বলল, "বড় মিঞা, কত্তাবিবি খুব গোস্সা কত্তিছেন।"

হাজী সাহেব ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যান্ আম্মাজানের আবার কী হ'লো?"

নফর বলল, "দুলা মিঞা আ'সে ইস্তক এখেনেই ব'সে আছেন। ভিতরে যান নি। নাস্তাউ এখেনেই খালেন। কলকাতার থে আসতি পরেশান হয়েছে তো। তাই—"

হাজী সাহেব বলে উঠলেন, "হায় আল্লা! তাই তো। এঃ! যাও বাপ্, সত্যিই তো তুমারে এতক্ষণ এখেনে বসায়ে রাখে নাঃ বয়েস হলি হুঁশ্ বুদ্ধি লোকেরে ছাড়ে চলে যায়।"

হাজী সাহেব নফরকে তেড়ে গেলেন, "তুমি শয়তান কী কত্তিছিলে, অ্যাঁ, অ্যাতক্ষণ ভ্যারেন্ডা ভাজতিছিলে? বাপ্‌জানেরে অন্দরে নিয়ে যাতি পারোনি? আক্কেলডারে কি গুলে খায়েছো?"

নফর বলল, "জে, আপনি যে তখন কলেন, এখন লোকজন আয়েছে, অকম্মার ঢেঁকী কুথাও যায়ে না। কেবল তামুক সাজবা। তাই ব'সে বসে খালি তামুক সাজতিছিলাম।"

হাজী সাহেব বললেন, "তুড়ুক জবাব দেখি মুখে লাগেই আছে। যা যা বাপজানরে শিগগির অন্দরে নিযে যা। আম্মাজানের হাতে হাওলা করে দিয়ে তবে আসবি। যাও বাপ্ যাও যাও। আরে ঐ আহাম্মক, নলি জামাইরি খাওয়ান দাওয়ানের বন্দোবস্ত হচ্ছে তো, ছবির মারি জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করিছিস্ কিছু আনতি টানতি হবে কিনা? না খালি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুত্তিছ।"

নফর বলল, "জে, বউবিবি আপনারে জানাতি কলেন, আপনারে ওর জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। সব এন্তেজাম তিনি করে রাখিছেন।"

হাজী সাহেব বললেন, "ঐ একটা লোক বাড়িতি আছে তাই ফিরাই মারে ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

তারপর জামাইকে আন্তরিকভাবে বললেন, "আজ আমার এই যা দেখতিছ, সব ঐ একটা লোকির জন্যি, ঐ ছবির মা, বুদ্ধি বলো পরামর্শ বলো, সব ঐ, ঐ তুমার শাউড়ি, আল্লা য্যানো ওর জন্যি বেহেশ্‌তের সব কটা দরজা খুলে রাখেন। ছবি যদি ওর মার মত হতি পাবে, আল্লার মর্জি, তুমার তালি আর কোনও মুসিবত হবে না। যাও বাপ অন্দরে যাও তুমার বড় পরেশান হয়েছে, দ্যাখ বাপ্ একটা কথা কই, তুমি আমার খালি জামাই না তুমি আমার বিটাও, তুমার বাপ আর আমি সেই ছোট বয়েসের থে দেলজানের দোস্ত, এক সাথে রাখালি করিছি, তুমার বাপ আমার সব জানে, আমিউ তুমাগের সব কথা জানি, তুমার বাপের মত ঈমানদার মুসলমান আমাগের ধারে কাছে নেই, খোদার খাস মহলে সে জায়গা করে নেবে, কেন না কিতাবে কয়েছে, আলিফ্ লাম্ মীম্, , এই কিতাবরে সন্দেহ করবা না, পরহেজগার মানুষরি এ ভালো পথ দেখায়, যারা গায়েবের পর ঈমান আনিছে বাপ্ আর যারা নামাজ করে আর খোদা তাদেরে যে রেজেক দেছেন তার থে দান খয়রাত করে আর যারা তাগের উপর আগে যা নাজিল হয়েছে আর তাগেরউ আগে যা নাজিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনে আর আখেরাতের প্রতি পুরো একিন রাখে, তারাই বুঝবা বাপ খোদার ঠিক পথে আছে। তুমার বাপ যেমন আছে। আর দেখবা শেষ পর্যন্ত তারাই সাভেব কড়ি ঘরে তোলবে, লাহ্ওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহেল আলিউল আজিম, বুঝলে বাপ, মুসলমানের পক্ষে এইটেই হল আসল কথা যে সর্বশক্তিমান আল্লা ছাড়া ভয় করবারউ কেউ নেই, সাহায্য করবারউ কেউ নেই। তা একথা তুমারে আর কি বুঝোবো, তুমি কি কম এলেম শিখে আসিছ, এই দিগরে তুমার মত এলেমদার এদিকি মাগরোয় কও আর ওদিকি ঝিনেদায় কও এর মদ্যি মুসলিম সমাজে আর নেই, যাও বাপ অন্দরে যাও, এই বুড়োর বকবকানি আর কতক্ষণ শুনবা। মেন্দা পাঁচ বছর আগে তার সাজে মেয়ের সঙ্গে তুমারে বিয়ে দেবে ঠিক করে তার কাছারিতি তুমার বাপরে ডাকে পাঠালো, তার কাছে তুমার বাপের বিঘে তিনেক জমি বন্ধক ছিল, তা সত্ত্বেও তুমার বাপ এক কথায় মেন্দার কথা নাকচ ক'রে দিল, তুমার বাপ বলিছিল, আপনার পয়সা আছে সাহেব কিন্তু আপনার তমিজ নেই, মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করার জন্যি ছেলের বাপরে যে মেয়ের বাপ পিয়াদা পাঠায়ে ডাকে আনে তার ঘরে আমি [illegible] বিয়ে দিইনে, তবে ছেলে উপযুক্ত হয়েছে আপনি তার সঙ্গে কথা কয়ে দেখতি পারেন, এমনি তেজ তুমার বাপের। দিনার দায়ে সেই জমি যখন মেন্দা কিনে নিবার চিন্তা ক'রল আমি টাকা দিতি চালাম সে জমি ছাড়ায়ে নিবার জন্যি, কিছুতিই নিল না, তখন কলাম জমি আমার কাছে বন্ধক রাখো তখন তুমার বাপ রাজি হলো, সেই জমি আমার কাছ থে ছাড়ায়ে নিয়ে ছবিরি দেন-মোহর দেছে, তুমি সেই বাপের ছাওয়াল, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয় বাপ, ছবিরি যদি গ'ড়ে পিটে নিতি পারো ও তুমার হাসিনা আওরত হবে বাপ, পড়া লিখার দিকিউ ওর খুব ঝোঁক, আমি তো চোখ থাকতিউ কানা, আমার চিঠিপত্তর ঐ তো সব লিখে দ্যায়, যাও যাও বাপ অন্দরে যাও, তুমার দাদীজান আবার আমারে খায়ে না ফ্যালে।"

শফিকুল অন্দরমুখো পা বাড়াবে অমনি "মুশকিল আসান" ডাক ছেড়ে চেরাগে ফকির এসে হাজির হল। কত বছর পরে দেখা! ফকিরকে তার ফেরেশ্‌তা জিবরাইল বলেই মনে হয়। এই সেই জ্ঞানের দূত। ফটিক দেখল ফকির খুব ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে। শরীর বেশ ভেঙেই পড়েছে। যে ফকির চেরাগ জ্বালিয়ে সব সময় সোজা হয়ে দাঁড়াত, সে আজ নুয়ে পড়েছে।

ফটিক একেবারে সামনে গিয়ে বলল, "আস্‌সালামু আলাইকুম্ ফকির সাহেব।"

ফকির বলল, "ওয়ালেকুমুস্‌সালাম্। আ'সে পড়িছ বাপ। আয় খোদা মেহেরবান। মেয়েটার দেলের আগুন ইবার তালি নেববে। চোখির পানি ইবার তালি বন্ধ হবে। বেটির উপর আল্লার হাজার রহমত পড়ুক।"

ফটিক বুঝতে পারল কার কথা বলছে ফকির। ছবির কথা। ছবি! বিলকিস বেগম! তার বিয়ে করা বিবি! তিন বছর আগে নিতান্ত এক বালিকাকে বিয়ে করে আইন পড়ার জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছিল। কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষার তাগিদ আর দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরত সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায়

যার কথা একবারও মনে পড়েনি ফটিকের। আজও এই এতক্ষণের মধ্যেও যার সম্পর্কে সে প্রায় অচেতনই ছিল বলতে গেলে। ফকিরের হাঁপানী-আক্রান্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ফটিকের চোখে বিরহকাতরা, আবছা এক কিশোরীর ছবি ভেসে উঠল। যার মুখখানা, তিন বছর আগে দেখা, লজ্জায় মাথা গ‍ুঁজে বসে থাকা, নোলক দোলানো এক কচি বালিকার সঙ্গে বেশ যেন মিশ খেয়ে গেল।

ফটিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল "ফকিরকে এবার বড্ডই কাহিল করেছে দেখছি।"

ফকির বলল, "আল্লা ডাক পাঠায়েছেন বাপ। তৈরি হয়ে ব'সে আছি। দুনিয়াদারী তো বহুত হ'ল। আমার কথা ছাড়ো। বিমারে ধরিছে। মালোয়ারী। ভালুকির মত কম্প দিয়ে জ্বর আসে, ঘাম দিয়ে ফের ছাড়ে যায়। সে কথায় আর রস কী আছে? ইবার একটু জওয়ানীর রীত পিরিকিতির কথা শুনোই। তাই শোনো।"

ফকির বার দুই গলা খাঁকারি দিয়ে গলা কাঁপিয়ে বলতে লাগল,

"শুন হে রসিক লোক বয়ান কেচ্ছার।
রোখাম সাহার লেড়কি ছিল এ প্রকার॥
চৌদ্দ পনের সাল বিবির বয়েস।
পাও পরে গিরিয়াছে মস্তকের কেশ॥
এয়ছা বাহারের কেশ না হয় বয়ান।
ছলেতে বান্দিয়া লেয় আসকের জান॥
যখন বান্ধেন খোপা কেশ বিনাইয়া।
ভ্রমর ভ্রমরী বৈসে আমোদিত হইয়া॥"

ফকির বলল, "শুনলে তো বাপ ভ্রমর সোন্দর এখন যাও বিবির খুপাব উপবে মন ভোমরাডারে নিয়ে যায়ে বসাও গে যাও।"

ফটিক বলল, "ও ফকির", হঠাৎ যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠল সে, 'তাহলে কড়িনামাটাও শুনিয়ে দাও।"

ফকির বলল, "অ্যাতো অ্যাতো ল্যাখাপড়া শিখে আ'লে বাপ, তবু এখনউ ফাহিরির মুহির বচন শুনার খায়েশ মিটল না।"

হাজী সাহেব ডাক দিলেন, "আ'সো ফকির, আ'সো। ব'সো। অনেকদিন দেখিনি যে।"

ফকির বলল, "ফুরফুরার মেলায় গিছিলাম। যায়ে বিমারে পড়ি। তাই দ্যাখেন নি হুজুর।"

হাজী সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "হুজুর! চিরকাল তুমার খেদমত ক'রে গেলাম। এর মদ্যি আবার হুজুর ছিলাম কবে।"

ফকির দহলিজের পাটিতে গিয়ে বসে কাঁধের ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমার উপর আপনার এই মুহব্বতি, এর আর শেষ নেই। তবুও হুজুর হুজুর বলি ক্যান্ শোনবেন। তা'লি একটু পানি খাওয়ান। জ্বরডা তালি ছাড়তিছে বোধ হয়।"

ফটিক ফকিরের গায়ে হাত দিয়ে দেখল ঘাম দিচ্ছে।

বলল, "ফকির, আজ তুমি বড় পরেশান আছো। আজ আর কড়িনামা বলার দরকার নেই।"

ফকির বলল, "বাপজান তুমার মুখ দিয়ে আল্লা ফরমায়েশ পাঠায়েছেন, তাঁর হুকুম না মা'নে পারি।"

নফর পানি এনে দিল। ঢক ঢক করে অনেকটা পানি খেয়ে ফকির "আঃ" বলে আরামের ডাক ছাড়ল। তারপর ফটিকের দিকে চেয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "বিটা এখন কত বড় হয়ে গেছে অ্যাঁ। সেই বিটা, এই অ্যাত্তটুকুন ছাওয়াল, কোমরে ঘুনশি বাঁধে পাঁচন বাড়ি হাতে নিয়ে ছাগল চরাতো আর আমার দ্যাহা পালিই ছুটে আ'সে জড়ায়ে ধরে কেবল বায়না ধরত, ও ফাহির বচন কও, ও ফাহির বচন কও। আল্লাহ্, কী তোমার কুদরত! সেই ছাওয়াল অজ এলেমদার জোয়ানমর্দ। খোদা হাতের পাঁচনবাড়ি কা'ড়ে নিয়ে কলম গুঁজে দেলেন। কলেন, যা ব্যাটা, এবার নতুন খ্যালা খ্যাল্। বিস্মিল্লাহ্। তা হাজী হুজুর কাজডা ভালোই করিছেন। আক্কেলমন্দ জামাই আনিছেন আমার আম্মাজানের জন্যি। ও বেটি বড়ই শরীফ্ লেড়কি। দেহো বাপ, বেটির যেন অনাদর না হয়। হাদিছে আছে বাপ্, মান্ আকরাতামা যৌজাতাহু আকারমাহুল ল্লাহু তায়ালা। যিনি আপন বিবির মান ইজ্জৎ দান করেন, খোদাতালাউ তাঁরে মান ইজ্জৎ দান করেন।"

ফকির আরও খানিকটা পানি খেয়ে হাজী সাহেবের দিকে রহস্যময়ভাবে চেয়ে মিটি মিটি হাসল তারপর বলল "হাজী ছাহেব, হুজুর আপনারে কইনে, কই আপনার কড়িরি। তা'লি অ্যাখন কড়িনামাই শোনেনঃ

মুছলমান ভাই যারা, আল্লার পিয়ারা তারা
কহি শোন কড়ির বয়ান।
আখেরী জমানা হইল, কড়িতে সকলি গেল
কড়ি হইল কুলপতি সার॥

কড়ি বুঝে কড়ি মান, কড়িতে হুরমত জান,
কড়ি হৈলে রণের ছিপাই।
কড়িয়ে সকলই করে বেটা দিয়া বাপ মারে,
ভাই দিয়া ভাইরে লড়ায়॥
কড়ি হৈলে ভালা নারী, কড়িয়ে রহাব জারি,
কড়ি হৈলে ইজ্জৎ বেকার।
কড়ি নাই বিছানা জুদা, কড়ি হৈলে ছাহেবজাদা,
কড়ি হৈলে হস্তীর আম্বার॥
হীন জনের হয় কড়ি, সবে ডাকে মিঞা বলি,
নাম তার খন্‌কার বাহাদুর।
যাহার সভাতে যায়, বিছানা ছেড়ে তারে দ্যায়,
ছালামের শুরু ঠাঁই গোল॥
হাজী হাজী করে সবে, জোনাব আসিলা কবে,
আমরা সবের আজব নছিব।
হেলানদার চৌকী আন, মিয়া বড় পেরেশান,
পাংখা লইয়া করয় তদবির॥

* * *

আজিদিন কড়ি যার, বহুত বড়াই তার,
পায়ের নাম জুনাব শরীফ।
সে যদি মরিয়া যায়, লোকে বলে ওফাত পায়,
মরে বান্দা কড়ি নাই গরীব॥
কড়ি নাই পুরুষ যারা ভবে সে থাকিয়া মরা,
জাতে কিবা সকলের হীন।
ঘরে গেলে কত জ্বালা, তিরিয়ে তারে ডাকে শালা,
নিরবধি ক্রন্দনে যায় দিন॥"

হাজী সাহেব বললেন, "মারহাবা মারহাবা। বড়ই ভালো বলিছ। এখন আমার একটা আরজি আছে। আজ ভালো দিনিই তুমি আ'সে পড়িছ। জামাই আইছেন। ছবির মা আ'জ তুমারে খাওয়াতি পারলি খুবই খুশি হবেনে। তাই আমি বলি কি আজ রা'তটা তুমি এই গরিবখানায় কাটায়ে কা'ল যেখেনে যাবার চ'লে যা'য়ো।"

ফকিরের মুখে সেই রহস্যময় হাসিটা ফুটে উঠল। বলল, "আল্লা যার রুটি যেখেনে বানায়ে রাখেন আর যার বিছানা যেখেনে পা তে রাখেন তা ছা'ড়ে কি কারুর যাবার ক্ষ্যামতা আছে। এ যে কিতাবের কথা, যিনি সকল নামের নামী যিনি সকল গুণের গুণী সেই আল্লাহুতায়ালার উপর বিশ্বাস রাখলাম আর তাঁর যাবতীয় হুকুম ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সবই কবুল করলাম।"

ফকির বলল, "আল্লার কি কুদরত। ফটিকের বাপ আর হাজী সাহেব, এই দু ইমানদার বান্দার একজনের ঘরে দেলেন দৌলত আর একজনের ঘরে দেলেন এলেম, এখেনেই খেলা শেষ হ'ল না আবার দ্যাহ দৌলতের সংগে এলেমের ক্যামন জোড়ও বাঁধে দেলেন, হায় হায় কী খোদকারী!

কি যে লীলা তব, তুমি জান রহমান
এসব বুঝার সাধ্য সবার কি সমান?
এ বান্দা এই সব বুঝিবে কি করে
বুঝিবার শক্তি তুমি দিয়াছ কি তারে?
এলাহি আলামিন আল্লা কুদরত কামাল
জলিল জব্বার তুমি আল্লাহু জালাল॥
দুনিয়ার মালেক তুমি অগতির গতি
তোমার বান্দার তুমি লা-শরিক পতি॥
প্রভু হে, রহমত তব এন্তেহা অবধি
নিশ্চয়ই পাইব আশা রাখি নিরবধি।"

ভিতর থেকে ডাক পেয়ে নফর ফিরে এসে বলল, "বড় মিঞা, কত্তা-বিবি আপনারে কলেন, দুলা মিঞা, ফকির সগলরে নিয়েই আপনি ভিতরে চলে যান।"

হাজী সাহেব বললেন, "বেশ তো, বেশ তো, চল যাই ভিতরে যায়েই বসি।"

চুল বাঁধা নিয়ে বিলকিস আর ফুটকির মধ্যে খুব হুল্জোত চলছিল। ফুটকি যতবার তার মাথায় চিরুণী চালাতে যায় বিলকিস ততবার উঃ আঃ করে এমন কান্ড করছিল যেন কেউ তাকে ভোঁতা ছুরির দিয়ে জবাই করতে বসেছে। এতেও ফুটকির ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না যদি না বিলকিস এমন করে মাথা সরিয়ে সরিয়ে নিত। ফুটকির প্রায় গলদঘর্ম অবস্থা।

শেষ পর্যন্ত ঠাস করে কাঁকইটা বিলকিসের কোলের উপর ফেলে দিয়ে ফুটকি বলে উঠল, "তা'লি তুই নিজি নিজিই তোর চুল বাঁধ, হায় আল্লা এমন তরাসি মেয়েই ল্যাম বাপের জন্মে দেখিনি। উঃ আঃ, মাথায় চিরুণী ঠেকলি য্যানো ফুস্কা পড়তিছে।"

বিলকিস বলল, "তুই আমার মাথায় ইচ্ছে ক'রে ব্যথা দিতিছিস।"

ফুটকি বলল, "আমার দায় পড়িছে। তোর সারা মাথায় জট। জট ছাড়াতি গেলি অ্যাক আধটু লাগবে না! সব্বারই লাগে। তাই বলে তোর মতন চ্যাচায়ে পাড়া মাথায় করতিউ কারু দেখিনি। মেয়ে একেবারে ফুলির ঘায় মুচ্ছো যায়। তুমার আসল মতলবডা কি, তা বুঝতি পারিনি ভাবতিছ? তুমি থাকো ডালে ডালে তো আমি থাকি পাতায় পাতায়।"

বিলকিস বলল, "মাথায় ব্যথা লাগতিছে তাই চিল্লাতিছি, এর মদ্যি আবার মতলবডা কী দেখলি তুই?"

ফুটকি বলল, "মাথায় ব্যথা লাগতিছে না ছাই। বিবির চুল বাঁধার ছুতো ধরে একটু চ্যাচাবার সাধ জাগিছে মিঞা ছাহেবের কানে যাতে মধু বর্ষণ হয় সেই জন্যি। মিঞা ছাহেব দ'লিজে বসে বসে বিবি ছাহেবার গলার আওয়াজখান পাচ্ছেন আর ভাবতিছেন, বাঃ হাজী ছাহেব তো দেহি দিব্যি এট্টা হাঁড়ি চাঁছারে পোষ মানায়ে বাড়িতি আ'নে রাখিছেন।"

"দ্যাখ ফুটকি," বিলকিস চোখ পাকিয়ে বলল, "মিছে কথা ক'সনে। মিছে কথা কলি দোজখে সারাজীবন তুমিই দগ্ধাবা, আমার কী। হজরত কয়েছেন, মিথ্যেই হ'লো গিয়ে সকল গুণাহের আম্মাজান। সিডা বুঝে কাজ করবা।"

"থাম, আর মোলবীগিরি কত্তি হবে না।" ফুটকি চিড়বিড়িয়ে উঠল। "চুল বাঁধতি ব'সে অ্যাতো আঃ উঃ বাপরে মারে ব'লে কাতরানি হচ্ছে ক্যান আমরা য্যানো তা আর কেউ বুঝিনে। আমরা না হয় ল্যাখাপড়া জানিনে, তোর মতন বরেরে চিঠিউ লিখতি শিখিনি, তাই ব'লে আমরা ঘাসেউ মুখ দিয়ে চলিনে। বুঝিছ মোলবী ছাহেবা?"

বিলকিস্ চুলের ফিতেটার এক মুড়ো শক্ত করে ধরে বলল, "আমি বরেরে চিঠি লিখি তোরে ক'লো কিডা?"

ফুটকি বলল "নে চুল বাঁধবি তো বাঁধ. না বাঁধিস তো ক, চলে যাই বড় বুর কাছে। গুচ্চের কাজ প'ড়ে আছে।"

বিলকিস মুখ লাল করে বলল, "আমি বরেরে চিঠি লিখি তোরে ক'লো কিডা? কথাডা এড়ায়ে যাচ্ছো ক্যান? তুমার মুখি ফেরেশ্‌তারা আগুনির নুড়ি জ্বা'লে দেবে। কেয়ামতের দিনডা আসতি দ্যাও।"

ফুটকি বলল, "আর কেয়ামতের দিন জিবরিল ফেরেশ্‌তা আ'সে তুমার মুখি ক্ষীর-পীঠের বাটি তুলে ধরবে। তাহলি হবে তো? দ্যাহ, আমারে বেশি ঘাটাস নে। বুকি হাত দিয়া কও দিনি মনি, মোলবী ছাহেবের কাছে অ্যাতদিন যে ঘষ পা'ড়লে, অ্যাত অ্যাত বই মুখি দিয়ে দিন কাটালে, ফটিক মিঞারে একখান চিঠিউ লেখনি? কও দিনি ইবার। মনে রাখবা আছমানে আল্লা সদা সর্বদা প্যাট প্যাট ক'রে তুমার দিকি তাকায়ে আছেন।"

বিলকিস্ চুপসে গেল। ক্ষীণস্বরে বলল, "চুলডা বাঁধে দিবা কিনা কও।"

ফুটকি বলল, "ক্যান, ইবার আমার কথাডার উত্তর গলা দিয়ে সরতিছে না ক্যান? কও বরেরে চিঠি লিখিছ না লেখনি?"

বিলকিস্ মুখ গোঁজ ক'রে বসে থাকল। ওর চোখ ছল ছল করে উঠল। ফুটকি পিছনে বসে থাকায় বিলকিসের এই ভাবান্তর তার চোখে পড়ল না। সে বুঝল বিলকিসকে এবার কোণঠাসা করেছে। শিকারী বেড়াল যেমন তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ফুটকি সোল্লাসে আক্রমণ করল বিলকিস্‌কে।

"তুমি নিজিরি খুব চালাক ভাবো। ডুবে ডুবে জল খাও, ভাবো. আল্লামিঞার বাপউ টের পায় না। অ্যাঁ। বিবিজান ইবারে কও, হ্যাঁ কি না, বরেরে চিঠি লিখিছ কি না। খোদা কছম. সত্যি কথা কবা। তুমার মোলবীগিরি আজ বের কত্তিছি। দাঁড়াও।"

হঠাৎ ফুটকির উল্লাস মাঝপথে থেমে গেল। বিলকিস্ ওর দিকে মুখ ফিরিয়েছে। বিলকিসের দুচোখে জলের ধারা দর দর ধারায় নামছে।

ও বলল, "মিছে কথা কবনা। মাত্তর দুখানা লিখিছিলাম। কিন্তু আল্লায় জানে ছি'ড়ে ফেলিছি। তারে পাঠাইনি।"

বলেই ফুটকির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে কে'দে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বিল্‌কিস্ বলে উঠল, "ও খালা তোরে ব্যাগ্যাতা করিছি, কাউরি একথা ক'স্‌নে। আল্লার দোহাই।"

এমনটা হবে ফটিক ভাবেনি। ও সত্যিই অবাক হয়ে গেল। এই প্রথম ছবি তাকে খালা বলে ডাকল। খালা! বিশ্বাস হচ্ছিল না ফটিকের। বিলকিসের মনে একটা এত বড় ক্ষত যে লুকিয়েছিল, তাই তো জানত না ওরা কেউ। সেই ক্ষতে অজানতে খোঁচা দেওয়ায় বিলকিসের উপর দরদে ওর বুকটাও টনটন করে উঠল।

ব্যথাভরা কণ্ঠে ফটিক আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, "ক্যান, চিঠি ছিঁড়ে ফেলালি ক্যান?"

এবার ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতে বিলকিস বলে উঠল, "ভয়ে খালা ভয়ে। যদি আমারে বেশরম ভাবে, যদি আমারে পছন্দ না করে। আমার বড় ডর লাগতিছে খালা। যদি আমারে পছন্দ না করে।"

"ফটিক মিঞা তোরে চিঠি দ্যায়নি কোনো?"

বিলকিসের চোখে তখন ভরা শ্রাবণের ধারা নেমেছে। কথা বলল না। শুধু মাথা নেড়ে জানালো, না।

ফটিক এবার বিলকিসকে গভীর মমতায় বুকে টেনে নিল। যেন তার ছোট্ট মেয়ে। নিজের আঁচল দিয়ে বিলকিসের মুখখানা ভালো করে মুছিয়ে ছোট বাহারি আয়নাটা তার মুখের কাছে ধরল।

তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ইশ্ পছন্দ হবে না। চায়ে দ্যাখ দিনি অ্যাকবার। এই মুখ দেখা মাত্তর মিঞা ছাহেব যাতে গিলে খাতি আসে আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তুই একটু থির হয়ে বো'স দিনি।"

বিলকিসকে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে ফটিক কাঁকইটা তুলে নিয়ে তার চুলের জট ছাড়াতে বসল।

"তুই কিছু ভয় করিস নে ছবি, মিঞারা হ'লো বিড়ালির জা'ত। মোচের রোঁয়া যতই তোরিয়া থাক, দুধির বাটি সামনে পালি মোচ না ভিজোয়ে কি পারে? তুই কিছু ভাবিস্‌নে। আয় তোরে খা'জুরছড়ি খুপা বাঁধে দিই।"

বিলকিস আয়নার সামনে স্থির হয়ে বসে জাদুকরী ফটিকের কেরদানি দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেল। ছবির এক রাশ চুল থেকে ছোট ছোট গুছি বের করে নিয়ে প্রথমে সরু সরু বিনুনি বাঁধতে লাগল আর সমানে ধমক দিতে লাগল, "আঃ করিস কী! আবার মাথা নাড়ায়! আবার ঘাড় নিচু করে!" তারপর কয়েকটা বিনুনি একসংগে গেঁথে এক একটা খেজুরের ছড়া তৈরি করল, তারপর সেইগুলোকে জড়িয়ে ফুল-কাঁটা গুঁজে গুঁজে সুন্দর একটা চ্যাটালো খোঁপা বেঁধে দিল। মুহূর্তে মুহূর্তে তার চেহারা যে এমনভাবে বদলে যেতে পারে ছবি তা ধারণাই করতে পারেনি। খোঁপা বেঁধে, ফটিক ওর খোঁপায় একটা সোহাগ চিরুণী, আর সিঁথির পাশে যখন একটা রুপোর ঝাপটা ঝুলিয়ে দিল তখন কাঁচ বসানো ফ্রেমের আয়নায় বিলকিস তার মুখ দেখে তাজ্জব। আবার চোখে যখন সুরমা আর চোখের পাতার উপর হাল্কা করে একটু আফ্‌সাঁর গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল ফটিক, তখন বিলকিস দেখল তাকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। তারপর নাকে নোলক আর তার কানে পাশা মাকড়ি যখন দুলতে লাগল বিলকিস সত্যিই বুঝি নিজেকে আর চিনতে পারে না। সেমিজের উপর একটা পাফ্-হাতা জামা চাপিয়ে ডুরে শাড়ি যখন পরানো শেষ হয়ে গেল তখন ফটিক ভালো করে বিলকিসকে দেখে নিল। তারপর কপালে দিল সবুজ একটা টিপ পরিয়ে, তখন ওর মুখে চোখে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব জেগে উঠল।

বলল, "কি লো, আয়নাখানা ইবার একবার দ্যাখ। পছন্দ হবে না! মিঞা ছাহেবের মুণ্ডু একেবারে মড়াৎ করে ঘুরে যাবে। সে মুণ্ডু আবার সুজা হলি হয়।"

ফটিকের কথার ধরনে বিলকিস হেসে ফেলল।

ফটিক বলল "তুই ব'সে থাক। আমি ছুটকি, বড়বু আর কত্তাবিবিরি ডা'কে আনি।"

ফটিক চলে যেতেই ছবি আয়নাখানা আবার তুলে নিল। সে যেন এক নতুন আমিকে দেখছে। আর আশ্চর্য ওর চোখে নিজের চেহারাখানা দেখতে দেখতে কেমন ঘোর এসে যাচ্ছিল। কে এ তার সামনের আয়নায়? মিশরের সেই মেয়ে কুলসুম? না কি বিবি জোলায়খা? ও চোখ ফেরাতে পারছিল না। আয়নাটার ফ্রেমেও ডায়মণ্ড কাটা ছোট ছোট আয়না বসানো। হেরিকেন লণ্ঠনটা আরো একটু কাছে এনে সে দেখল, দেখতে লাগল আয়না ভরতি শুধু ছবি আর ছবি। এমন অদ্ভুত কাণ্ড আর কখনও দেখেনি ছবি। যার চোখ আছে, ছবির মনে একটা ঝিলিক দিল, সে কি না পছন্দ করে পারে? সে কি চোখ ফিরিয়ে নেবে? নিতে পারবে? আল্লাহ্!

॥ ৯ ॥

শীতল পাটি বিছানো তোষকে শুয়ে ফটিক সহজ হতে পারছিল না। এত বড় খাটে সে আর আগে কখনও শোয়নি। বিয়ের দিনের ঘটনা তার বিশেষ মনে নেই। কারণ তখন তার কলকাতায় যাওয়ার তাড়া। হাজী সাহেবের বাড়িতে বিয়ের মজলিসে বরকর্তা বর নিয়ে হাজির হবার পর কাজী সাহেবের সামনে উকিল-সাক্ষী ঠিক হল। তাঁরা ভিতরে গেলেন। তাঁরা ফিরে

এসে হাজিরানা মজলিসে জানালেন, ছবি ছুটকির বর, ছবির চাচাতো ভাই, নেয়ামত মিঞাকে তার উকিল হিসেবে মেনে নিয়েছে। কনে পক্ষে সাক্ষী ছবির ফুফাতো ভাই ইয়াকুব আর বরপক্ষের সাক্ষী ফটিকের মামা দুদু মিঞা। কাজী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা মজলিসের সামনে সকলকেই শুনিয়ে কবুল করলেন যে, তাঁরা স্বকর্ণে স্পষ্টভাবে শুনেছেন যে বিলকিস বিবি এই উকিলকে মেনে নিতে রাজী আছেন কিনা, এর জবাবে 'রাজী' কথাটা স্বেচ্ছায় উচ্চারণ করেছেন। তারপর খাতায় সই সাবুদ হবার পর কাজী সাহেব বিয়ের মন্ত্র আক্‌তখানি পড়িয়ে দিলেন। তারপর খোতবা পড়লেন এবং মিঞা বিবিকে দোয়ারে-খায়ের এবং মোনাজাত করে আশীর্বাদ করলেন। ব্যস্‌ চুকে গেল বিয়ে।

কথাটা, বিশেষ করে বিলকিস্‌ বিবি "স্বেচ্ছায় রাজী" কথাটা উচ্চারণ করেছেন, এই কথাটা মনে হতেই কেন জানিনে ফটিক মিঞা মজা পেল। বেশ গরম, বেশ ঘামছিল সে। ঝালর দেওয়া পাখাটা তুলে নিতে গিয়ে ফটিক লক্ষ্য করল ওর বালিশের পাশে আরেকজনের বালিশ পাতা আছে। পাখা নেড়ে বাতাস খেতে খেতে খালি বালিশটার দিকে ফটিক কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইল।

বিলকিস বিবি। বুদ্‌বুদের মত নামটা আরেকবার ওর মনে ভেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে জলুয়ার অর্থাৎ শুভদৃষ্টির দৃশ্যটা। কে একটা মুখরা মেয়ে ওদের সামনে আয়না ধরে বলল, "ন্যান মিঞা, চটপট বিবির সঙ্গে শুভদিষ্টিটা সারে ফ্যালেন।" ফটিক আয়নায় চেয়ে দেখল নোলক-দোলা একটা বালিকার ভয়ে লজ্জায় কৌতূহলে মেশানো দুটো ড্যাবডেবে চোখ ওকে দেখছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। ফটিকও চোখ সরিয়ে নিল।

বিলকিস্‌ বিবি। এই তার বিবি! বিলকিসের কথা বা তার প্রসঙ্গ গত তিন বছরে যখনই তার মনে বা বন্ধু মহলে উঠেছে, ফটিকের মনে মাত্র এই একটি দৃশ্যই ভেসে উঠেছে।

"আপনি বিবাহিত? সত্যি?"

হাইকোরটের নামী উকিল, ওদের অধ্যাপক পি এন পালিতের মেয়ে, ওর সহপাঠিনী মিস্‌ লতিকা পালিত তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল। গোটা কলকাতার অনাত্মীয় মরুভূমিতে ফটিকের মনে হত লতিকা পালিতই একমাত্র ওয়েসিস। কলকাতা ফটিকের কাছে অসহ্য হয়ে উঠত মিস পালিত না থাকলে। ওর দারিদ্র্য, কলকাতায় ওর নিরন্তর টিঁকে থাকার দুঃসহ সংগ্রাম, ওর গ্রাম্যতা, ওকে একেবারে আত্মমুখী করে রেখেছিল। ওকে ভেঙে পড়তে দেয়নি শুধু ওর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। ওর প্রতি লতিকার দৃষ্টি প্রথম পড়ে ইন্‌টারমিডিয়েট ইয়ারে। এমনি মুখচোরা গেঁয়ো চেহারার লোকটা। কিন্তু সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে প্রিলিমিনারি পাশ করল। তারপর মুট্‌ কোরটেও একদিন অসাধারণ সওয়াল করল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বড্ড আত্মমুখী লোক। সহপাঠিদের এড়িয়ে যেতেই পছন্দ করত। আর আশ্রয় ছিল তার লাইব্রেরি। যখনই লাইব্রেরিতে যেত লতিকা তখনই একটা একাগ্র মুখ গভীর অধ্যয়নে তন্ময়, প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যই বলা যেতে পারে, লতিকার নজরে পড়ত। সেও খুব খাটিয়ে মনোযোগী ছাত্রী। কিন্তু ফটিকের যেমন পড়াটা তপস্যা, ওর অতটা নয়। তবে একটা মিল দুজনের মধ্যে ছিল সেটা তাদের মুখচোরা ভাব, কেননা দুজনেই খুব আত্মসচেতন ছিল। একজন গেঁইয়া ও গরিব, আরেকজন রূপের বাজারে অচল। আশ্চর্য মেয়ে বটে লতিকা। কারো সঙ্গেই প্রায় মিশত না। ফটিকের কাছেই তার সংকোচ ছিল না। ফটিক লতিকাকে প্রথম দিকে বুঝতেই পারত না। ভয় পেতো। এড়িয়ে চলত।

"আপনি বিবাহিত? সত্যি?"

"আপনার সন্দেহ করার কী কারণ?"

কথা বলার ভঙ্গী থেকে গ্রামের গন্ধ মুছে ফেলতে শফিকুল হিমসিম খেয়ে যেত। লতিকার জন্যই ওকে প্রাণান্ত পরিশ্রমে জবান সাফ করতে হয়েছে, এজন্য শফিকুল লতিকার কাছে সত্যিই ঋণী।

শফিকুল সতর্কভাবে উচ্চারণ করে কথা বলে তাই ওর কথাবার্তার মধ্যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা এসে যায়।

বলল, "আমার কি বিয়ের বয়স হয়নি? না আমি মুসলমান নই? কোন্‌টায় আপনার সন্দেহ?"

লতিকা বলল, "আপনি যে মুসলমান সে বিষয়ে লোককে নিশ্চিন্ত করার জন্য আপনার সর্বাঙ্গে এত বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে রেখেছেন, এর পরেও আর সেটা অস্বীকার করি কী করে? এত বড় দাড়ি, তারপর পরণে লুঙি। উঃ প্রথম যখন ক্লাসে ঢুকলেন, কী সোরগোলই তুলে দিয়েছিলেন। আলালের ঘরের দুলালদের সে কী অবস্থা! কারো বাবা, কারো শ্বশুর লিডার অব্‌ দি বার, আর তাদের কপালে জুটল কিনা আপনার মত ক্যাডাভ্যারাস এক লুঙিপরা সহপাঠী। আপনি যে মুসলমান সেটা আমরা সেইদিনই বুঝে গিয়েছিলাম।"

"তবে কি বিয়ের বয়েস সম্পর্কে সন্দেহ? জানেন তো মুসলমান সমাজে ছেলে হয়ে জন্মান মাত্র তার বিয়ে করার হক্‌ জন্মে যায়। জানেন তো আমাদের হাদিসে বলেছে আশ্‌রারোকুম্‌ উজ্জাবোকুম। যার সরলার্থ, যে বিয়ে করে না, সে বড় বদলোক। আমাকে বদলোক বলে আপনার ধারণা করার কারণ কী?"

"বদলোক নয়," লতিকা বলল "আপনি যা কাঠখোট্টা, আপনাকে কে বিয়ে করেছে সেটাই জানার ইচ্ছে ছিল।"

শফিকুল বলল, "দেখুন মিস পালিত, আমাদের সমাজে মেয়েরা বিয়ে করার অধিকার পায় না, তাদের বিয়ে হয়। আর আমি ধর্মরক্ষার্থে বিয়ে করেছি, তাই বলে আপনি আমাকে কাঠমোল্লা বলবেন? জানেন, এতে কাঠমোল্লারা তাঁদের অপমান করা হয়েছে বলে ইনডিয়ান পেনাল কোডের ৫০০ ধারায় আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনতে পারেন। কিংবা ধর্মে আঘাত দেওয়া হয়েছে বলে আপনার বিরুদ্ধে আই-পি-সির ১৫৩-এর ক ধারায় মামলা দায়ের করতে পারেন। টরুট মোতাবেকও আপনাকে সোপর্দ করা যেতে পারে। কিংবা জেহাদ। কেননা এখনও পর্যন্ত মাত্র একটা বিয়েই করেছি আর তাতে আমার শুধু অর্ধেক এবাদতের পুণ্য লাভ হয়েছে। দুটো করলে পুণ্যটা পুরো হবে। চারটেতে কিঞ্চিৎ সারপ্লাস হবে। এবাদতের পুণ্য বিবাহের দ্বারা সারপ্লাস করতে না পারলে কাঠমোল্লা হওয়া যায় না।"

"বাঃ!" লতিকা বিস্মিত হয়ে বলল, "কাঠমোল্লা আবার কখন বললাম।"

শফিকুল বলল, "আমার নাম শফিকুল মোল্লা। আবার জুনিয়ার মাদ্রাসা পাস, জলপানি পেয়েছিলাম তার রেকরড আছে। আপনি আমার সম্পর্কে উইলফুলি অ্যানড ইনটেনশনালি কাঠখোট্টা কথাটা ব্যবহার করেছেন। টু প্লাস টু যেমন ফোর হয়, তেমনি সিকস্ মাইনাস টু-তে ফোর হয়। সুতরাং কাঠখোট্টা প্লাস মোল্লা অতি সহজেই কাঠমোল্লা হয়ে যায় কিনা নিজে কষে দেখে নিন।"

লতিকা বলল, "শুধু আইন নয়, অঙ্কের জ্ঞানও দেখি বেশ টনটনে।"

শফিকুল বলল, "গুরু ট্রেনিং পাশ, মিডিল ইংলিশ ইশকুলে অংক পড়াতে হয়েছে যে। চার বছর ছাত্র চরিয়েছি।"

"তা গুণনিধি গুরুমশাই," লতিকা জিজ্ঞাসা করল, "আর কি চরিয়েছেন শুনি?"

শফিকুল হাসতে হাসতে বলল, "হাতে খড়ি হয়েছে ছাগল চরানো দিয়ে। সাত আট বছর বয়েস পর্যন্ত বনে বাদাড়ে ছাগল চরিয়েছি মিস পালিত। এখন মক্কেল চরাবার কায়দা কৌশল রপ্ত করবার জন্যই কলকাতায় এসে আপনাদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে লেগেছি। কী জানি, কী হবে?"

"আপনার যেমন প্রতিভা," লতিকা বলল, "আপনার সিদ্ধি অনিবার্য। এখন বৌ-এর কথা বলুন। ওঁর নাম কী?"

"বিলকিস বেগম।"

ঠকাস্ করে পাখাটা মাটিতে পড়ে যেতে ফটিকের তন্দ্রা ছুটে গেল। বড় গরম। বড্ড ঘামছে সে। পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার বাতাস খেতে শুরু করল।

আসার আগে কদিন এত ব্যস্ত ছিল ফটিক যে কথা দিয়েও আর প্রোফেসার পালিতের বাড়িতে গিয়ে বিদায় নিয়ে আসা হল না।

হাতের পাখা অতি দ্রুত লয়ে চলছিল, কিন্তু ক্রমশ ঢিমে হয়ে আসতে লাগল।

"আচ্ছা, আপনি আমাকে মিস্ পালিত বলে ডাকেন কেন বলুন তো?"

শফিকুল সোজা প্রশ্ন করল, "তাহলে কী বলে ডাকব? আমি গেঁয়ো মানুষ। চাষার ছেলে। কখনো তো অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে ওঠাবসা করিনি। সকলেই মিস পালিত বলেন। আমি ভাবি ঐটেই বুঝি আদব। তাই আমিও বলি।"

লতিকা ফটিকের সোজা সরল কথা শুনে হেসে ফেলল।

বলল, "তাও তো বটে। আপনার পক্ষে আমাকে আর কী ভাবেই বা ডাকা সম্ভব। আচ্ছা মিঃ মোল্লা—"

লতিকা কি প্রতিশোধ নিচ্ছে? ওর মুখ থেকে হঠাৎ মিঃ মোল্লা সম্বোধন ফটিকের কানে অদ্ভুত শোনালো।

ফটিক হেসে বলল, "গ্রামে আমাকে সবাই ফটিক বলে। খাতির করে কেউ কেউ আবার ফটিক মিঞাও বলে।"

লতিকা হেসে বলল, "বাড়িতে আমাকে সবাই লতু বলে ডাকে।"

ফটিক হেসে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমার জবান দিয়ে ও ডাক কিছুতেই বেরুবে না। যেমন কলকাতার অর্ধেক উচ্চারণ বেরই হয় না। আমি চাষার ছেলে। ফারস্ট জেনারেশনের লেখাপড়া আমার। এই কথাটা স্মরণ রেখে আশা করি একটা ওয়েটেজ্ আমাকে দেবেন।"

"দিতে পারি," লতিকা বলল, "যদি আমার কয়েকটা অশোভন প্রশ্নের উত্তর দেন।"

"আমার কাছে আপনার কোনও প্রশ্নই অশোভন নয়। আপনি সর্বদাই নিঃসংকোচে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"আচ্ছা আপনি কথায় কথায় আমি মুসলমান, আমি চাষার ছেলে এ কথাগুলো বলেন কেন? লোককে ইম্প্রেস করতে?"

শফিকুল স্থির শান্ত চোখে কিছুক্ষণ লতিকার দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সহজভাবেই বলল, "কলকাতায় আপনি ছাড়া খোলাখুলি কথা কইবার লোক আর

কেউ নেই, আমার একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। আর আপনাকে কথা দিয়ে ইম্প্রেস করব, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়? আমি মুসলমান, আমি চাষার ছেলে, এসব যে বলি, তা কাউকে ইম্প্রেস করার জন্য নয়, কথাগুলো সত্য বলে। এই যেমন আপনি অ্যাডভোকেটের মেয়ে, মিঃ এলাইজা ব্যারিসটারের ছেলে, চঞ্চল মিত্তির অ্যাটর্নির জামাই, ঠিক তেমনি আমিও প্র্যাকটিসিং চাষার ছেলে। আমার আব্বাজান সাজ্জাদ মোল্লা হয়ত এই মুহূর্তে লাঙ্গল ঠেলছেন।"

লতিকা বলল, "মানলাম আপনি খুবই অরিজিন্যাল। আপনি লুঙ্গি পরেন খদ্দরের, পাঞ্জাবী পরেন খদ্দরের, আপনি কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী নাকি?"

শফিকুল বলল, "না। খদ্দরের তহবন্ধ্ পরি আমি গরিব বলে। একটা ধুতি কাটলে দুখানা তহবন্ধ্ হয়। আর আমি চরকায় আমার জামাকাপড়ের সুতো আমি নিজেই কেটে নিই। সুতোর বদলে কাপড় কিনলে বেশ শস্তা পড়ে। আপনার জেরা শেষ?"

"উহুঁ", লতিকা বলল, "এবার আপনার বাড়ির কথা বলুন। আপনার স্ত্রী বিলকিস্ বেগমের কথা বলুন।"

বিলকিস্ বেগম।

পাখাটা এবার বিলকিস্ বেগমের বালিশের উপরেই পড়েছে। ঘামে ফতুয়াটা ভিজে সপসপ করছে। ফটিক মিঞা এবার বিছানার উপর উঠে বসল। নিজেকেই একবার প্রশ্ন করল, বিলকিস্ বেগমের কথা আমি কী জানি? নাঃ, একবার গোসল করে নিতে পারলে ভালো হত। এখানে এর মধ্যেই কত রাত যেন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কলকাতায় এখন সন্ধ্যার ট্রিপের সিনেমাই ভাঙেনি।

তাঁর ছেড়ে আসা আনটুনি বাগানের মুসলিম মেসের ইদ্রিস মিঞা এখন হয়ত কোনো সিনেমার উদ্বোধন দিবসের নাইট শো-তে যাবার জন্য সঙ্গী খুঁজে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত বাতিক ইদ্রিস মিঞার। যে-কোনো ছবির প্রথম নাইট শো, তাও ফোরথ্ ক্লাসের টিকিট কিনে তার দেখাই চাই। এর জন্য ওর ঘরের ক্যালেনডারে তারিখগুলো সব দাগে দাগে ভর্তি। কোন ছবির, বিশেষ করে বাংলা, কবে উদবোধন কোন সিনেমায়, ক্যালেনডারে তা মার্কা করা। কলকাতা ছাড়ার কিছুদিন আগেই দেবদাস দেখার অভিজ্ঞতা ফটিক জীবনে ভুলবে না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুনো মাত্র ইদ্রিস মিঞার হাঁকডাকে মেস সরগরম হয়ে ওঠে।

কাগজ পড়েই এক হাঁক, "আরে ঐ বরকইতা দ্যাখ্‌চস্‌নি। অখনি লেইখা ফ্যালা। দ্যাবদাস, শুভ উদ্বোধন ৩০ মারচ ১৯৩৫ শনিবার। ৩টা ৬।টা ও ৯৷৷টা। তিরিশা মারচের নিচে ৯৷৷টা লিখ্যা থো।"

এই হল প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে ফোরথ ক্লাস টিকিট কাউনটারে অভিযান। যে-কয়জন ইদ্রিসের সঙ্গী হবে তাদের টিকিটের দাম মাথা পিছু সাড়ে চার আনা করে মেসেই সংগ্রহ করে নেওয়া হল। ইদ্রিস মিঞা আনডারওয়ারের বদলে একটা জিনের হাফ প্যানট পরে নিল। তার উপরে সৌখিন লুঙ্গি। আর গায়ে স্যানডো গেনজি আর পাঞ্জাবী। একটা এক্‌সট্রা গেনজি সঙ্গে নেওয়া হল। আর ওর সাগরেদ সঙ্গে নিল ছোট্ট একটা ফার্‌সট এইড বক্‌স। রাত ৩টা নাগাত ওরা গিয়ে চিত্রার সামনে উপস্থিত হল। সেই তখনই কাউনটারে ভিড়ের বহর দেখে ফটিকের তো চক্ষুস্থির। ইদ্রিস মিঞা নির্বিকার। ফটিক সিনেমা টিনেমা বেশী দেখেনি। ও বড় বড় পোসটারের ছবি দেখতে লাগল। ছিপ হাতে প্রমথেশ বড়ুয়া—উদ্‌ভ্রান্ত দেবদাস, তারপর ঘড়া কাঁখে যমুনা—পার্বতী, (পারু! আহা, কি মিষ্টি ডাক। চোখের সামনে ভেসে উঠছে, দেবদাস পারুর গালে সপাৎ করে লিকলিকে হুইল-ছিপের একটা ঘা কষাল। কালশিটের দাগ পড়ল গালে। পারু কঁকিয়ে উঠল, দেবদা! উদ্‌ভ্রান্ত দেবদাস বলল, বাড়ি যা পারু। চাঁদের যেমন কলঙ্ক থাকে, তোর গালেও তেমনি কলঙ্ক এঁকে দিলাম।) পোসটারের আরেক পাশে চন্দ্রাবতী—সতী সাধ্বী বেশ্যা চন্দ্রমুখীর কী মহিমময়ী ভঙ্গিমা!

ফটিকের চমক ভাঙল ইদ্রিস মিঞার বাজখাঁই হাঁকে, "আরে অই মিঞা, বাইরে অ্যাতো দ্যাখনের আছে কী? আগে ভিতরে ঢুকো, তবে স্যান্ তামশা দ্যাখবা। লও, এই লুঙ্গি আর পিরান ধর, খবরদার পিরানের ইস্তরি ব্যান্ ঠিক থাকে। আমি টিকিট কাইট্যা আনি।" বলে হাফ প্যান্‌ট আর স্যানডো গেনজি পরিহিত ইদ্রিস মিঞা পাকা সেনাপতির মত সেই জনব্যূহের দুর্বলতম স্থানটি খুঁজে বের করল। তারপর ভিড়ের মধ্যে দুটো হাত ঢুকিয়ে দিল। এক হাতের মুঠোয় টিকিটের টাকা। তারপর ইদ্রিস মিঞা একটা বাজখাঁই হাঁক ছাড়লঃ মুছলমানে বল আল্লা হিন্দু বল হরি, টিকিট কাটনে যাই আমি, মারি কিম্বা মরি। বদর, বদর।

অমনি চারদিকে হৈ হুল্লা লেগে গেল। "অ্যাই রে, বদরু শালা এয়েছে।"। "জায়গা দিবি না শ্লাকে।" "মার শালাকে, জান নিকলে দে। দে শ্লার মাজাকি জন্মের মত শেষ করে।"

তারপরে "ওঃ শালা পাঁজরা ভেঙ্গে দিলে। মাইরি পা গেল পা গেল।" "উঃ আঃ হটো শ্লা।" কিন্তু ইদ্রিস মিঞার আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। ওদিকে ধুপধাপ মারের শব্দও কানে এল। আর তার কিছুক্ষণ পরে ইদ্রিস মিঞা বেরিয়ে এল। সারা গায়ে আঁচড় কামড়ের দাগ। গেনজিটা ফালা ফালা। বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তেজনাবিহীন ইদ্রিস মিঞা টিকিট কিনে বেরিয়ে এল।

বলল, "আরে বরকইতা আইডিন লাগা আইডিন লাগা। কুত্তাগুলান্ খেইপ্যা গিয়া আচড়াইয়া

কামড়াইয়া আর বাকি রাখে নাই কিছু।"

"বুঝচেন নি মিঞাবাই," প্রাথমিক শুশ্রূষা সমাপ্ত হবার পর এক্সট্রা গেনজিটা গায়ে গলাতে গলাতে ইদ্রিস বলল, "এই খেল্ ভারি জমবো। হাতি মার্কা ছবি, নিউ থিয়েটারস, তারপর হালায় প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি, আমি কাটিং দেখছি, হালায় কানাকিস্টো গান যা করছে না চইক্ষের পানি সামাল দিবার পারবেন না। এ আমি গ্যারান্টি দিয়া কইবার পারি।"

॥ ১০ ॥

কর্ত্তা-বিবির ঘরের দাওয়ায় বসে চেরাগে ফকির বলল, "আল্লার মর্জি আল্লাই ভালো জানেন। বান্দারা কি মালেকের ইচ্ছের নাগাল পাতি পারে? মালেক যে কোন্ মতলবে কোন্ কাম করেন, বান্দাগের দিয়ে করান, তা কি কেউ কতি পারে? তবে হ্যাঁ, তিনি যা করেন তা আমাগের ভালোর জন্যিই করেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আল্লার রহমতে আপনি এখন আছেন ক্যামন্ কন।"

"আলহামদু লিল্লাহ্, আমার আর থাকাথাকি কী", কর্ত্তাবিবি বললেন, "চোখি আমন আর দেখতি পাইনে। মাজার বিদ্না চাগাড় দিলি সুজা হয়ে দাঁড়াতি পারিনে। আল্লাই ভরসা। নাতিন ডে মুখ শুকনো শুকনো করে বেড়াতো, দেখে দেলে বড় চোট লাগতো।"

"আল্লার রহমতে তো ফটিক বাপউ বাড়ি আসে গেছে। আপনার নাতিনের দেলে মেঘ কাটে ইনশাল্লা এখন তো রোদ উঠার কথা।" চেরাগে ফকির জিজ্ঞেস করল, "তা বিবিজান গ্যালেন কনে? জুয়ান বরির পায়ে বুঝি আর বুড়ো বরির ভুলেই গ্যালেন।"

কর্ত্তা-বিবি বললেন, "যাবেন আবার কনে। ঐ তো ঘরের মদ্যি। লজ্জা হচ্ছে বিবির বাইরি আসতি।"

ফকির ছড়া কাটল:

হুকুর হুকুর কাশে বুড়ো
হুকুর হুকুর কাশে।
নিকের নামে হাসে বুড়ো
ফুকুর ফুকুর হাসে॥

ফকির বলল, "বিবিজান, জুয়ান বর হ'লো গে চিতোই পিঠে। শক্ত পোক্ত বটে, তবে তাতা রসে ডুবোয়ে না খালি ভালো সোয়াদ লাগে না। আর বুড়ো বর হ'লো রসবড়া। গা দিয়ে সব সুমায় রস গড়ায়ে পড়তিছে। বাছে ন্যাও কোন্ডা নিবা?"

দরজার আড়াল থেকে বিলকিস্ বলল, "ও ফকির জহুরা বিবির কাঁদনের কেচ্ছাডা শুনাও।"

"ক্যান্ বিবিছাহেবা, আজ আবার জহুরাবিবির কাঁদনের কথা শুনবা ক্যান্?" ফকির বলল, "বাদশাজাদা বারাম তো আগেই গেছেন উজিরজাদী জহুরাবিবির ঘরে। ও কেচ্ছা আজ কি জমে?"

"তা হোক," বিলকিস্ বলল, "ফকির তুমি কও। উডা আমার বড় ভালো লাগে।"

ফকির বলল, "আজ তিন বছর ধরে জহুরাবিবির কেচ্ছা শুনতিছ বিবি, আজউ খায়েশ মিটল না। মালেক যখন তুমার মুখ দিয়ে হুকুম পাঠায়েছেন, বান্দারে তা তামিল করতিই হবে। তা'লি শোন—"

কান্দেন জহুরা বিবি — এলাহি আলমিন ভাবি
ঘোড়া হইতে জমিনে নামিয়া।
দুনু আংখে আছু জারি — বুকেতে পাথর মারি
দম ঢালে বারাম বলিয়া॥
কহে কি করিমু হায় — এখন হইল দায়
জান মেরা না হয় কয়ার।
কি করিলে আল্লাতালা — নেকি বদি বুরা ভালা
সব করা তেরা এক্তিয়ার॥
আমি অধমের তজ্ঞ — বাঁচাইবে পরওয়ারে
তেরা নাম গফুরর রহিম।
পেগাম্বর খলিলেরে — আতস হইতে বাঁচাইলে
সবইতি তেরা এক্তিয়ার॥
পেগাম্বর ইউছুফেরে — ভাই সবে কুয়ায় ফেলে
তারে তুমি করিলে আছান।
পেগাম্বর রছুলেরে — মেহেরাজে যবে নিলে
সাথী দিলে ছিদ্দিক-আকবর॥

কলিম মছুার তরে   আশাতে দছুর দিলে
তুমি আল্লা করিম রহিম।
আমি নাপাকের তরে   কৃপা কর নৈরাকারে
তবে মোর বাঁচেত হুরমত॥

ফকির বলল, "দুঃখির কেচ্ছা আর শুনে কাজ নেই। তার চাইতি কলিকালের বিবি আর ত.র শাউড়ির কেচ্ছা কই, সিডা শোনো।"

ফকির সুর পালটে বলতে লাগল,

শা'শোড়ি অতি যতন ক'রে কয়
দ্যা'লো বউ উ'ঠে দুটো ভা-ত খা না।
বিবি কয় দ্যাখ্ বুড়ি ফের যদি কো'স কথা
তোর মাথার চুল থোবো না
শা'শোড়ি অতি যতন করে কয়
ওলো বউ উঠে একটা পা-ন খা না
বিবি কয় দ্যাখ্ বুড়ি ফের যদি কো'স্ কথা
তোর মুখি দাঁ-ত থোবো না
কলিকালের বউ-ঝিরি কোনো কথা বলা যাবে না
ফুলির ঘায় মছো যায় বিবি বেড়িয়ে ব্যাড়ান পাড়া
শাউড়ি হ'লো কিনা বাঁদী সুয়ামি হ'লো ভ্যাড়া
কথায় কথায় অ্যালায়ে পড়েন বিবির জুড়া খাটে গা
দোড়োয়ে আ'সে খছম মিঞা টিপে দেচ্ছে পা
হায়রে কলি কি আর বলি
কলিকালের বউ-ঝিগেরে কোনো কথা বলা যাবে না।"

নয়মোন বিবি সকলকে খাইয়ে দাইয়ে মোছফেকাকে নিয়ে রান্নাঘরের কাজ সব সেরে রাখছিলেন। কাল জামাই আসা উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া হবে। তারই জোগাড়ে ব্যস্ত। জামাইয়ের শরীরটা বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে। ফটিক ওর চেনা ছেলে। এক সময় আসা যাওয়াও ছিল তার। অবিশ্যি ছবি হওয়ার আগে। ছবি যখন হল তার আগে থেকেই ফটিকের যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কথায় কথায় অ্যালায়ে পড়েন
বিবির জুড়া খাটে গা
দোড়য়ে আ'সে খছম মিঞা
টিপে দেচ্ছেন পা

ফকিরের ছড়া শুনে মোছফেকা হেসে উঠল। নয়মোনও হাসি চাপতে পারলেন না। কত্তা-বিবির ঘর থেকে বিলকিসের হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল।

মোছফেকা বলল, "কলিকালের মিঞা কলিকালের বিবির পা টিপে দেচ্ছেন, মিঞার গলায় দড়ি জোটে না।"

হঠাৎ ঝিলিক দিল, একটু পরেই কড় কড় মেঘ ডেকে উঠল।

নয়মোন বললেন, "ছুটকিরা বাড়ি যায়নি? দিয়া বড় জবর ডাক ছাড়লো। আবার বিষ্টি না হয়।"

মোছফেকা বলল, "উরা তো কখন চ'লে গেছে। রা'ত কি কম হ'লো?"

"তা'লি নফরোরে ক'দিনি ফকিরির বিছানা দা'লিজি পা'তে দিক।" নয়মোন বললেন, "ফকিরির চিহারাডা অ্যাকেবারে ভা'ঙে পড়িছে। খাতি কত ভালবা'সতো ফকির। আ'জ মুখি কিছু দিতিই চা'লো না।"

মোছফেকা বলল, "বয়েসডা কি কম হ'লো নাকি? আমি তো জম্মে ইস্তক উনারে দেখতিছি। আমার আম্মাজান যখন ছোট, সেও নাকি ফকিরির এই রকমই দেখিছে। উনার উমর নাকি দশ কুড়ি। উনি না কি পানির উপর দিয়ে হাঁটে নদী পার হয়ে যান। সাঁকো নৈকো কিছু লাগে না। জিনপরী সাপ বাঘ সব উনার হুকুমি চলে, নফরার বাপ আমারে কয়েছে। তবে ইবার দ্যাখলাম বিমারে উনারে কাবু ক'রে ফেলিছে।"

"ছবি সেই ছোটবেলার থে চিরাগে ফকির বলতি পাগল। ফকির আ'সে দাঁড়ানো মাত্তর সেই যে কাছ ঘে'সে আ'সে দাঁড়াবে আর নড়াচড়ার নাম নেই। ইডা কও সিডা কও ক'রে অস্থির করে ছাড়বে। দেখতিছিস তো কান্ডখানা। জামাই অ্যাদ্দিন পরে আ'লো তা মেয়ের আমার হু'শই নেই। ফকিরির নিয়ে পড়িছে। শুতি টুতি যাবে, না কী?"

"ও মোছফেকা!" কত্তা-বিবির ডাক।

নয়মোন বললেন, "যা মোছফেকা, কত্তা-বিবির এশার নামাজের সুমায় হ'য়ে গেছে। অজু করার পানি, বিছানা সব ঠিক করে দিয়ে আয়। আমার নামাজের বিছানাডা এখেনেই আনিস। আর নফরারে দিয়ে ফকিরির দ'লিজি পাঠায়ে দে। অজুর পানিটানি যানো ঠিক করে দেয়।

বড় মিঞা কি করবেন, জিজ্ঞেস কত্তি ক। জামাইর কি লাগবে টাগবে সিডাও ব্যানো জা'নে ন্যায়। ও মোছফেকা জামাইর ঘরে পানি গিলাশ সব রা'খে দিছিস্ তো?"

হাজী সাহেব অজু করে তাঁর ঘরেই নামাজে বসে গেলেন। মেঘ বেশ জোরে ডেকে উঠল।

হাজী সাহেব নামাজ শুরু করলেন, "নাওয়াইতু-আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বায়া রাক্‌য়াতে ছালাতিল এশায়ে ফর্‌জুল্লাহে..."

একটা দমকা হাওয়ার ধাক্কা লেগে কত্তা-বিবির পিক'দানটা উল্টে গেল। কত্তা-বিবি আর বিলকিস্ পাশাপাশি নামাজ পড়তে বসেছিল কত্তা-বিবির ঘরে। আজ বিলকিসের ভক্তি কিছু বেশী। তবুও পিক্‌দান পড়ার ঠনাৎ শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে চাইল।

কত্তা-বিবি বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিলেন, "আমি আল্লার ওয়াস্তে কেবলা-রোক দাঁড়াইয়া এশার ওয়াক্তের আল্লার ফরজ চার রাকয়াত নামাজ পড়িতেছি........."

টিনের চালে চড়বড় চড়বড় আওয়াজ হতে লাগল। শিল পড়ছে।

নফ্‌রার বাপ ছাগল দুটোকে ঘরে তুলেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পেরে মোছফেকার অস্বস্তি হতে লাগল। যা কাছাখোলা লোক। সে একটা বড় ডেক্‌চি মুছতে লাগল। ছাগল দুটো ভিজে না মরে।

নয়মোন নামাজ পড়ছিলেন,... "আমি আল্লার ওয়াস্তে" কাল যদি বিষ্টি হয় তবে কি আর মধুপুরির বাবুরচি আসতি পারবে "কেবলা-রোখ দাঁড়াইয়া" ছুটকিকে বলে দিলিই হ'ত ওর বরের খুব ভোরেই একবার পাঠায়ে দিতি "এশার ওয়াক্তের রছুলের ছুন্নত দুই রাক্‌য়াত নামাজ পড়িতেছি।"

........."তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান," চেরাগে ফকির দ'লিজে নামাজের বিছানায় বসে হৃদয় উজাড় করে দিয়ে নামাজ পড়ে চলেছে, হঠাৎ কম্প দিয়ে তার জ্বর এসে গেল. ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কাতর স্বরে ফকির দিনের শেষ নামাজ পড়ে চলল, "এলা জিহ্‌তিল কা'বাতে শবারিফাতে আল্লাহু আক্‌বার।"

নফরা এতক্ষণ দহ্‌লিজের এক কোণায় এক মনে বসে কলকে সাজছিল। টিকেটা ধরিয়ে গোটা কতক ফু দিয়ে কলকেটা সবে ধরিয়েছে—এই তার নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাবার সময়, কত্তার গড়গড়ায় তামুক টানে আর বাইজদ্দির সদ্য লতিয়ে-ওঠা মেয়ে সাকিনা খাতুনকে নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব খওয়াবের জাল বোনে—অমনি ফকিরের মুখে আল্লাহু আক্‌বার শুনে সে নিজেও একবার আল্লাহু আক্‌বার বলে নিল। তারপর শরীরটা আরামে এলিয়ে দিয়ে ফরশি টানতে টানতে সাকিনাবিবিকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল।

ফটিক অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আজ বেশ ধকল গিয়েছে। গরমে এতক্ষণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। এক পেট খাবার পর ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেই আর চোখ মেলে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

কাঁপুনির সঙ্গে ফকিরের কেমন শ্বাসকষ্ট শুরু হল।

নামাজ শেষে হাঁটু গেড়ে বসে ফকির একবার উপরের দিকে তাকিয়ে মুখের সামনে দুহাত তুলে বলল, "হে খোদা, এখানেই যদি তুমি আমার আখেরির বিছানা পা'তে রা'খে থাকো, তবে তোমার ইচ্ছে-ই বহাল থাকুক।"

তারপর সমস্ত শক্তি একত্র করে ফকির মোনাজাত করতে শুরু করল, "আল্লা-হোম্মা আন্তাস্‌সালামু। ওয়া-মিন্‌কাস্‌সালাম ওয়াদ্‌খিল্ না দ-রাস্‌সালামা তাবারাক্তা রাব্বানা ওয়া তায়ালাইতা ইয়া জাল জালালে ওয়াল্ ইকরাম। হে প্রভু! তুমিই শান্তি এবং তোমা হতেই শান্তি। আমাদিগকে বেহেশ্‌তে দাখেল করিও, হে প্রভু! তুমিই উচ্চ ও বরকতপূর্ণ। (হে দয়াময়) তুমিই বুজুর্গ ও সম্মানী।"

হঠাৎ ভারি জোরে বৃষ্টি এল। ফকিরের প্রার্থনা ধীরে ধীরে বৃষ্টির বাজনার মধ্যে ডুবে গেল। ব্যাঙের ডাক, ঝড়ের শব্দ, বৃষ্টির বাজনা, ফকিরের প্রার্থনার সঙ্গে মিশে একটা ঐকতান সৃষ্টি হল। মেঘ ঘন ঘন ডেকে উঠছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ তীব্রভাবে ছোবল মারছিল।

দাদীর ঘর থেকে উঠান পেরিয়ে তার ঘরে যেতে হয়, কিন্তু যা বৃষ্টি, অসম্ভব, ভিজে একশা হয়ে যাবে, ওর সব সাজ নষ্ট হয়ে যাবে, বিলকিস্ তাই দাদীর ঘরেই বসে রইল বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। চারদিকে বেশ ব্যাঙের ডাক শুরু হয়ে গিয়েছে। টিনের চালে বৃষ্টি যেন ঢাকে কাঠি দিয়ে চলেছে। দূর! বিলকিস্ মলিন মুখে অসহায়ভাবে বৃষ্টির হাতে আত্মসমর্পণ করে দিল।

আল্লার আবার এ কী রসিকতা!

॥ ১১ ॥

বিলকিস্ মাথার ঘোমটা লম্বা করে টেনে দিয়ে যখন আস্তে দরজাটা বন্ধ করে ঘরে ঢুকল তখন বৃষ্টি একটু ধরেছে, উঠোনে বেশ জল। পা মুছে নিঃশব্দে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল। ভয়ে উত্তেজনায় ওর বুক কাঁপছে। আর তেষ্টা পাচ্ছে। গোলাপফুল হলে কী করত এমন

অবস্থায়? বিলকিস্ ভাবতে চেষ্টা করল। কোনও পথ পেল না। তাই ঢিপঢিপ বুকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর যদিও তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও তার শরীর ক্রমশ বেশ ঘেমে উঠতে লাগল।

ফটিক মিঞা ঘুমোচ্ছিল এবং ফকির তাকে বলছিল, এই কথাডা মনে রাখবা বাপ, এমন নেক্‌কার হাসিনা বিবি যখন তুমার নসিবি জুটিছে, তাতে বুঝা যায় আল্লা তুমার উপর খুবই খোশ আছেন। আমার বিটির দেলে কখনোই দুঃখু দিবা না। রসুল কয়েছেন, তুমাগের মদ্যি সেই লোকই ভালো যে নিজির নিজির বিবিগের সংগে খুশি খোশরাজিতি ঘর সংসার করে। রসুল নিজিউ তাঁর বিবিগের সংগে খুশি খোশরাজিতি জিন্দিগী গুজার ক'রে গেছেন। তিনি চিরকাল যেন আমাগের পথ দ্যাখাতি থাকেন।

যাহাদের স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁহারা যখন বিদেশ হইতে বাড়ি আসিবেন, বিলকিসের "খাছ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ৩৫টি নছিহত" মনে পড়ে গেল, মৌলবী সাহেব তাকে মুখস্ত করিয়ে ছেড়েছিলেন, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া বসিতে আসন দিউন পায়ে ধরিয়া সালাম করুন, গরম বোধ করিলে পাখার দ্বারা বাতাস দিতে থাকুন এবং ক্ষুধার্ত হইলে তাড়াতাড়ি খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিউন। তৎপর মিষ্টি মিষ্টি আলাপে খোশ মেজাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকুন। খবরদার খবরদার, বিলকিসের মৌলবী সাহেব তাকে নসিহত শিক্ষা দেবার সময় বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, তখন এই রকম কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবা না যে এতদিনের পর বিদেশ হইতে বাড়ি আসিয়াছেন, আমার জন্য কি আনিয়াছেন? মৌলবী সাহেবের তিন নমবর বিবি তাঁকে যে হেনস্থা করে এ কথা গ্রামের লোক সবাই জানে। ফটিক বলেছিল বুড়ো মৌলবীর মেয়ের বয়েসী এই বিবি পান থেকে চুন খসলেই বুড়োকে পাখাপেটা করে। এমন কথাও জিজ্ঞাসা করিবা না, মৌলবী সাহেবের করুণ মুখখানা বিলকিসের মনে ভুস করে একবার ভেসে উঠল, কত টাকা রোজগার হইল? ছেলেমেয়েদের জন্য কি আনিয়াছেন? কত টাকা খরচ হইল? টাকাগুলি দেন তো গণিয়া দেখি। সাবধান বিবি! ঐ রকম কথা বলিলে মিঞার দেল তোমার উপর একেবারেই নাখোশ হইয়া যাইতে পারে।

শোনো বাপ, তুমার বিবি এখন বড়সড় হয়েছে, তারে আর কখনোই চা'র মাসের বেশী ছা'ড়ে থাকবা না। বুঝিছ?

তুমি যা বল ফকির। তুমি আমার চোখ ফুটিয়েছ। হাতের পাঁচন-বাড়ি ছাড়িয়ে কলম ধরিয়েছ। ফকির তুমি বললে, আমার পিঠের চামড়া খুলে তাই দিয়ে তোমার পায়ের জুতো বানিয়ে দিতে পারি। তাতেও তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।

রসুলাল্লা কয়েছেন, যখন তুমি দু মুঠো খাবা তখন তুমার বিবিরিউ দু মুঠো খাওয়াবা। ওয়াদা কর, তুমিউ এই পথে চলবা।

চলব ফকির।

তুমি যখন পুষাক পরবা তুমার বিবিরিউ পুষাক পরাবা।

পরাবো ফকির।

তুমার বাড়ি ছাড়া তুমার বিবিরি আর কুথাউ রাখবা না।

রাখব না ফকির।

তুমার বিবিরি কখনো গালি দিবা না।

না ফকির, কখনো দেবো না।

হুন্না লেবাসুল্লাকুম্ ওয়া আন্তুম্ লেবাসুল্লা হুন্না। তুমি এই আয়াতের মানে জানো?

জানি ফকির। উহারা (পত্নীগণ) তোমাদের আচ্ছাদনস্বরূপ এবং তোমরা উহাদের আচ্ছাদনস্বরূপ।

ইডা কার কথা?

খোদাতা'লার কথা ফকির।

এ কথা সব সুমায় মা'নে চলবা।

চলব ফকির, কিন্তু দোহাই তোমার, আমার বিবির সংগে আমাকে একটু আলাপ করিয়ে দাও।

সে কী! আপনার বউ-এর সংগে আপনার আলাপই হয়নি?

বিশ্বাস করুন, সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

আপনি সত্যিই একটা আজব চীজ্। লতিকা হেসে উঠল জোরে। হাসতে লাগল জোরে।

মিস্ পালিত, শুনুন মিস পালিত, বিপন্ন হয়ে ফটিক যে কথাই বলতে যায় লতিকার কান ফাটানো হাসির দমকে তার সব কথা ঢাকা পড়ে যায়।

ফটিক পাশ ফিরল।

ঘোমটা এবার খানিকটা তুলে দূর থেকে বিলকিস তার বরকে দেখতে লাগল। জুলুয়ায় আয়না দেখার পর এই আবার। বেশ রোগা রোগা লাগছে। নড়েছে। এবার কি তবে ওর ঘুম ভাঙবে? বিলকিসকে ডাকবে আদর করে? তারপর বিলকিস ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর বুকে? জোলায়খা বিবি যেমন, ইউসুফ জোলায়খার কেচ্ছায় আছে, ইউসুফের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? তেমনি

করেই বলবে?—

ছাড়িব না তোরে আমি প্রতিজ্ঞা আমার
যদিও কাটহ শির কৃপাণে হাজার।
কেন না যে দহে প্রাণ না দেখে তোমায়
বলহ যাইয়া আমি থাকিব কোথায়?

বিলকিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর বরের মুখ দেখে তো মনে হয় কোনো রকম দিল্লাগী করার লোক এ নয়। সে বেজায় ঘাবড়ে গেল। ফটিককে পাশ ফিরতে দেখে তার যাও বা আশা জেগেছিল প্রাণে, ব্যাঙের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফটিককে আবার নাক ডাকাতে দেখে সেটুকুও চুপসে গেল। হাতের পানের খিলি দুটো এক জায়গায় রেখে দিল। বুঝল, দরকার হবে না। ও এখন কী করবে? দাদীর ঘরে ফিরে যাবে? মেঝেয় শোবে?

কিন্তু বিলকিসের দোষ কোথায়?

যাহাদের স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁহারা যখন বিদেশ হইতে বাড়ি আসিবেন তখন তাড়াতাড়ি বসিতে আসন দিউন। মৌলবী সাহেব তো বলেই খালাস।

কিন্তু যিনি আলেন তিনি যদি সারাক্ষণ দ'লিজে ব'সে সুমায় মাটান তা'লি তাঁরে বসিতে আসনডা দেব কনে? বাড়ির মেয়ের কি বেগানা পুরুষগের সামনে বেরোতি আছে যে দ'লিজি যায়ে তিনারে বসিতে আসন দেবো? আল্লাহ্ তুমি তো সাক্ষী, মানুষটারে দূরির থে আসতি দেখেই দাদীরি খবর দিতি ছুটিছিলাম। আমার কী দোষ? তা তুমি মানুষটারে দ'লিজি বসায়ে রা'খলে ক্যান্?

পায় ধরিয়া সালাম করুন।

এখন করব? ঘুমন্ত ফটিকের পায়ের দিকে চেয়ে আল্লাকেই সরলভাবে জিজ্ঞেস করল ছবি। সুড়সুড়ি লা'গে যদি জাগে যায়? রা'গে যায় যদি? ওর মাথার কাপড় খসে পড়েছে এখন। মেঘ সরে যাওয়া চাঁদের মতন বেরিয়ে পড়েছে ছবির সাজিয়ে দেওয়া সুন্দর মুখ। কেউ দেখবে না? প্রচণ্ড অভিমানে চোখে জল এসে যাচ্ছে প্রায়। প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখছে সে। কেননা, নসিহতে আছে, তৎপর মিষ্টি মিষ্টি আলাপে খোশ মেজাজের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকুন। চোখে টলটল জল নিয়ে কি আর মিষ্টি মিষ্টি আলাপে খোশ মেজাজের কথা জিজ্ঞেস করা যায়? আল্লাহ্।

পাযে ধরে সালাম করব? তারপর কাঁচা ঘুম ভা'ঙে গেলি যদি রা'গে ওঠে। সোয়ামি নাখোশ হয়ে উঠলিউ তো আবার মুসলমানের মেয়েগের গুনাহ্ হয়। তা'লি কী করব কয়ে দ্যাও? আল্লাকেই আবার প্রশ্ন করল ছবি।

খুব জোরে সোরে বাজ ডাকল। বাজের ডাকে ওর বড় ভয়। বাজ ডাকলেই ও দাদীকে জড়িয়ে ধরে কানে হাত চাপা দেয়। আজ ছবি কাতরভাবে আশ্রয় নেবার জন্য যার দিকে চাইল সে তখন ঘুমে অচেতন। আবার বৃষ্টি শুরু হল। ফটিকের ঘুম ভাঙল না। ছবি ঘরে ঢুকে যে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়েছিল সেটা আবার খুলে দিল। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে সেই দরজাটা এবার বেশ শব্দ করে বন্ধ করল।

ফটিকের ঘুম ভাঙল না।

ঘরের শেড্ দেওয়া কেরোসিনের বাতিটা যতটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় ছবি তা বাড়িয়ে দিল। ঘর আলোয় ভরে গেল। ওর তো চোখে আলো লাগলেই ঘুম ভেঙে যায়।

ফটিকের ঘুম ভাঙল না।

বিলকিস এক গেলাস জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল। ঠকাস করে গেলাসটা রাখল। ফটিকের ঘুম ভাঙল না।

খুব জোরে জোরে বাতাস দিয়ে, পাথায় যতটা শব্দ করা যায় তা করে, মশারি ফেলে দিল বিলকিস্। এবার ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল। চোখ মুছতে মুছতে মশারি গুঁজে চেয়ে দেখল ফটিক এমনভাবেই শুয়েছে যে তার পাশে আর শোবার জায়গা নেই। ছবি অনেকক্ষণ মশারির মধ্যে বসে থাকল। ফটিককে দেখতে লাগল। তারপর ঢুলতে লাগল। পায়ের দিকে জায়গা ছিল। আল্লাহ্ বলে সেখানেই গা বাঁচিয়ে শুয়ে পড়ল। আর বাধা মানল না। ছবি উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার খোঁপা ঢিলে হয়ে গেল। চিরুণী খসে পড়ল। সুরমা গলে গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে সেও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফটিক ওর বিবিকে চিনতে পারছে না। কোন্ কামরায় যে উঠিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে পারছে না। খালি দৌড়োদৌড়ি করছে। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছে। গারড সাহেব হুইসিল দিয়েছে। সবুজ নিশান দোলাচ্ছে। কামরা থেকে কামরায় ছুটে বেড়াচ্ছে ফটিক। বিবিকে খুঁজে পাচ্ছে না। কোন্‌জন তার বিবি? ট্রেন ধাক্কা মারল পিছনে। গাড়িটাকে টানবার জন্য ইনজিন দম করে নিচ্ছে। এইবার হুশ হুশ করে গাড়ি এগোতে লাগল। কামরায় কামরায় কত বিবির মুখ। ফটিক প্ল্যাটফরমে দৌড়চ্ছে।

"দুলো ভাই!"

ট্রেনের জানলায় বিবিদের মুখগুলো সব হাসছে। ফটিক প্রাণপণে দৌড়চ্ছে।

"দুলা ভাই!"

ট্রেনটার গতি দ্রুত হচ্ছে ক্রমশ। দৌড়তে ওর দম বেরিয়ে যাচ্ছে। তাল রাখতে পারছে না। কামরাগুলো ওকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে একে একে। বিবি বিবি! ও প্রাণপণে ডাকছে। ফটিক দৌড়চ্ছে। বিবি বিবি! আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কামরার বিবিরা হাসছে। ফটিক দৌড়চ্ছে। একটার পর একটা কামরা বেরিয়ে যাচ্ছে। কামরায় কামরায় বিবিরা হেসে লুটিয়ে পড়ছে। ফটিক দৌড়চ্ছে। গারড-সাহেবের গাড়িতে বসে আছে বিলকিস্। ফটিকের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে।

"দুলা ভাই, দুলা ভাই!"

এতক্ষণ নজরে পড়েনি ফটিকের। বিবির মুখ মনে পড়ছিল না তার, নাম মনে আসছিল না। গারডের গাড়িতে যেই নোলক দোলা একটা বাচ্চা মেয়ের অতিশয় ভালো মানুষ ভালো মানুষ কচি মুখ দেখেছে অমনি দৌড়েছে ফটিক। ঐ তো বিলকিস্ বেগম। তার বিবি। এতক্ষণে বিবির নামটাও মনে পড়ে গিয়েছে তার। বিলকিস বিবি বিলকিস বিবি নেমে পড়। নেমে এসো। খুব জোরে ডেকে উঠেছে ফটিক। ক্রমাগত ডেকে চলেছে। ওর চোখে মুখে উদ্বেগ। বিলকিসও তাকিয়েছে। বিলকিস্ হাসছে। ঝুঁকে পড়েছে। সবুজ ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছে বিলকিস। ওর দিকে হাত বাড়াল বিলকিস। ফটিক নাগাল পাচ্ছে না। দৌড়চ্ছে। ফটিক হোঁচট খেলো। পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। খুব সামলে নিয়েছে।

"দুলা ভাই।"

অস্পষ্ট ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। "দুলা ভাই", এবার ডাকটা স্পষ্ট। ধড়মড় করে উঠে বসতেই সে দেখল তার পায়ের কাছে একটা পরী গুটিশুটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। না কি এই সেই এরেমের শাহার বেটি জৈগুন বিবি? ছোট বেলায় সে যার প্রেমে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল? চোখ কচলে চেয়ে দেখল, তার বিবি। গালে একটা মোটা জলের ধারা চোখ থেকে বেরিয়ে শুকিয়ে রয়েছে। ঘরের উজ্জ্বল কেরাসিন বাতিটার মায়াবী আলোয় সাজগোজ তচনচ হওয়া বিলকিসের সুন্দর মুখখানা দেখে ফটিক কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এবং বিস্মিত। এই তার বিবি! এই সেই সেদিনের খুকী! নোলক-দোলা মেয়েটার এ কী আশ্চর্য পরিবর্তন! ফটিক খুশি হল না অনুতপ্ত, নিশ্চয়ই মেয়েটা দুঃখ পেয়েছে তার ব্যবহারে চোখের জলই সাক্ষী, সদ্য ঘুম ভাঙা ভোঁতা মনে তা ঠাহর পেল না।

"দুলা ভাই!"

ডাকটা এবার জোরে আসতেই, এবং তার সঙ্গে দরজায় ধাক্কা, বিলকিসের ঘুমটা ভেঙে গেল! চোখ মেলতেই ছবি দেখল, ফটিকের ঘোর-লাগা দুটো চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। লজ্জা পেয়ে সে ধড়মড় করে উঠে বসল। গায়ের কাপড় সামলে নিল। তারপর ফটিকের পায়ে ধরে সালাম করল।

ফটিক কিছু না ভেবেই ছবির মুখটা দু হাতে তুলে ধরে চেয়ে থাকল। বিলকিসের সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে এল। চোখ বুজে এল। সে ধীরে ধীরে একটা মাটির তাল হয়ে ফটিকের বুকে ভেঙে পড়ল। ফটিক জীবনে এই প্রথম মেয়ের ঠোঁটে ঠোঁট লাগালো। প্রথমে আলতোভাবে, তারপর হঠাৎ পাগলের মত জোরে।

"দুলা ভাই! দুলা ভাই! দুলা মিঞা।"

এবার দুজনেই চমকে উঠল। বিলকিস ছিটকে দূরে সরে গেল। তার ঠোঁটে দুটো অদৃশ্য ঠোঁট তখনও চেপে আছে। সে হাঁপাচ্ছে।

ফটিক বলল, "কে?"

"আমি নফর। শিগগির বাইরি আসেন। ফকির সাহেবের অবস্থা ভাল না। দেখতি চান তো এখনই চলে আসেন।"

॥ ১২ ॥

ফটিক আর ছবি যখন দহলিজে এসে পৌঁছুলো ততক্ষণে হাজী সাহেব, নয়মোন বিবি এমন কি কত্তাবিবিও ফকিরের বিছানার কাছে এসে জমায়েত হয়েছেন। এতক্ষণ একটা টেমি জ্বলছিল। নফর একটা হারিকেন লণ্ঠনও তেল ভরে নিয়ে এল। সলতেটা উস্কে দিতেই ফকিরের মুখটা পরিষ্কার দেখা গেল। কত্তা-বিবি একটু ঝুঁকে দেখে নিয়েই নয়মোন বিবিকে ডাকলেন।

"বউ বিটি, যাও তাড়াতাড়ি সরবত পানি ক'রে নিয়ে আ'সো। আল্লার বান্দার আল্লার কাছে চ'লে যাবার সুমায় হয়ে আয়েছে।" ছেলেকে বললেন, "তুমরা উনারে পশ্চিম-রোখ করে শুয়ায়ে দ্যাও।" বলেই তিনি কলেমা শাহাদত পড়তে শুরু করে দিলেন।

নফর আর ফটিক কত্তা-বিবির নির্দেশমত ফকিরকে পশ্চিম-রোখ করে শুইয়ে দিল।

ফকির চোখ মেলে চাইল। তার ঘোর-ঘোর ভাবটা একটু কাটল।

বলল, "বুড়োবিবি, আল্লা আমার আখেরি বিছানা এই বাড়িতেই পা'তে রা'খেছেন। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর্‌রাছুলুল্লাহু।"

কত্তা-বিবি কলেমা শাহাদত পড়ে দিলেন, "আশহাদ্ আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াদদাহ্ লাশরিকা লাহ্ ওয়া-আশদাহ্ আন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই। তিনি একা, তাঁহার কোনও শরিক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই তাহার বান্দা ও রসুল।)" তারপর ফকিরের দিকে চেয়ে বললেন, "আল্লাতা'লা তুমারে শান্তি দেন। আল্লার প্রিয় রসুল চেরাগ ধ'রে তুমারে জান্নাতের পথ দ্যাখায়ে দ্যান। আল্লাহ্ সব সুমায়ই মেহেরবান।"

ফকির বলল, "কত্তা-বিবি, বড় মিঞা তুমরা সবাই আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দ্যাও।"

কত্তা-বিবি আর হাজী সাহেব বললেন, "আমরা তুমার গুনাহ্-খাতা মাফ ক'রে দিলাম ফকির।"

নয়মোন বিবি সরবত পানি এনে শাশুড়ির হাতে দিলেন।

কত্তাবিবি বললেন, "বিস্মিল্লাহ্, এই সরবত পানি খাও ফকির। আমি যতদিন ধ'রে তুমারে দেখতিছি, ফকির, এই গিরামের আর কেউ তা দ্যাখেনি, আমি তুমারে যত জানি ফকির আর কেউ তুমারে তা জানে না। এপার ছা'ড়ে ওপারে যাওয়ার জন্যি আমিউ পা বাড়ায়ে রাখিছি। যার যখন ডাক আসবে, সেই তখন যাবে। খাও ফকির, অনেক দুরির রাস্তায় যাবা। আমার হাতের থেই সরবত পানি খায়ে ন্যাও।"

ফকির বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে সরবত পানির গেলাসে চুমুক দিল। তারপর বলল, "বউ-বিবি, আমার গুনাহ্-খাতা মাফ ক'রে দ্যাও।"

নয়মোন বললেন, "আমি তুমার গুনাহ্-খাতা মাফ ক'রে দিলাম।"

কত্তা-বিবি বললেন, "আমি জানি ফকির, তুমি কখনোই কারু ভালো ছাড়া বুরা করনি। গোফুরুর রাহিম তুমার জন্যি জান্নাতের সব দরজা খুলে রা'খে দেবেন।"

ফকির সরবত খেয়ে একটু তাজা হল বলে যেন মনে হল।

বলল, "আল্লার হাজার রহমত তুমাগের সকলের উপর পড়ুক। বাপ, আমার বাপ কই?"

ফটিকের কানে এ ডাক ঢুকল না। ও তখন দাঁড়িয়ে দেখছে, ছয় বছরের ল্যাংটো একটা ছেলে ছাগল চরাতে এসে দুপুর রোদ্দুরে কাদের যেন একটা পড়ো বাগানের পেয়ারা গাছে উঠেছে। তখন সব সময় ছেলেটার ক্ষিধে লেগেই থাকত। সেই সাতসকালে পান্তা ভাত দিয়ে নাস্তা করে বেরুতো আর ফিরত সন্ধ্যের মুখে। হঠাৎ দেখল দূরে মাঠ ভেঙে হনহন করে ফকির আসছে।

লাফ দিয়ে নিচে পড়ল ছেলেটা। ও ফকির! ও ফকির!

দৌড়ে গিয়ে ফকিরকে জাপটে ধরল। ও ফকির পিয়ারা খাও। এই ন্যাও তুমার জন্যিই রা'খে দিছি।

না বাপ তুমি খাও।

আমার জন্যিও আছে। তবে ভালোডা তুমার জন্যি রাখিছি।

চল বাপ, বড্ড রো'দ। ঐ পুকুরির ঘাটলায় ছায়া আছে। ওখেনে গিয়ে বসি।

ফকিরের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে সাজ্জাদ চাষার ছাওয়াল ছাগলের রাখাল ফট্‌কে চলেছে, হাজী গোলাম আব্বাসের দহলিজে দাঁড়িয়ে শেষ রাত্রের এই রকম জমাট অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর একমাত্র জামাই জনাব শফিকুল মোল্লা বি-এ বি এল দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পেল।

"দূরি দাঁড়ায়ে ক্যান্ বাপ", ফকির বরাবরকার মত স্নেহমাখানো স্বরে ডাকল, "কাছে আ'সো। সে বিটি কনে। আ'সো, কাছে আ'সো, দূরি ক্যান?"

ফটিক চটকা ভেঙে এগিয়ে গেল, তার পাশে বিলকিস।

"বাপ্ আমার, বিটি আমার, তুমরাও আমার গুনাহ্-খাতা মাফ ক'রে দ্যাও।"

ফটিক বলল, "এ তুমি কী বলছ ফকির? তুমি আমার গুরু। মুর্শেদ। তুমি আমার মুরুব্বি। আমার কাছে কি তোমার কোনও গুনাহ্ থাকতে পারে?"

ফকির বলল, "কেয়ামতের বিচার বড় কড়া বাপ, বড় চুলচেরা। কোথায় যে কার কখন কি হয়ে থাকে তা কি কেউ কতি পারে? তুমি এলেম শিখিছ, তুমারে আর কি কব? তুমরা আমার গুনাহ্ মাফ না করলি তো চলবে না বাপ।"

ফটিক বলল, "আমি তোমার গুনাহ্ মাফ করে দিলাম ফকির।"

ফকির, ও ফকির, আ'জ জৈগুন বিবির কেচ্ছাডা একবার শুনাবা?

না বাপ, খোদা তুমারে আক্কেলমন্দ্ ক'রে পাঠায়েছে। আমি যা বলি খোদার কুদরতে সংগে সংগে তোমার দেলে তা জমা পড়ে যায়। আ'জ তুমি কও আমি শুনি।

তা'লি আটকায়ে গেলি তুমি কয়ে দিও।

তারপর ফকিরের শিশু শাগরেদ বাঁশির মত গলায় জৈগুন বিবির কেচ্ছা শোনাতে বসল।

জৈগুন নামে এরেমের শাহার এক বেটী।
শুন সেই বিবির রুপের পরিপাটি॥
যখন জন্মিল বিবি এরেমের ঘরে।
আইল রুপের বান ছুরত বন্দরে॥

হুর পরী মোহ তার ছুরত দেখিয়া।
না যায় তাহার কাছে সরম লাগিয়া॥
এয়ছাই ছুরত আল্লা দিয়াছিল তায়।
রূপের জোয়ার যেন বহে তার গায়॥
মা বাপ পালন করে জৈগুন খাতির।
বান্দি লেউন্ডি দাই কত খেদামতে হাজির॥
কতদিন যায় তার পালন করিতে।
সেয়ানা হইল বিবি দেখিতে দেখিতে॥

ফকির তার এই শিশু শাগরেদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে আনন্দে গদগদ হয়ে "মারহাবা মারহাবা, সাবাস বিটা, জিতা রহ" বলে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, বড় হলি এই রকম আওরাতের সঙ্গে শাদি করায়ে দেব। তারপর দুজন জোরে হেসে উঠল।

ফকির বলল, তুমি খুব ভালো পুঁথি পড়তি পারবা, আল্লা তুমারে সেই খ্যামতা দিয়ে এই দুনিয়ায় পাঠায়েছেন বাপ। কিতাবে কয়েছে বাপ, নূর বলো, জ্যোতিঃ বল, আলো বল সবই সেই আল্লাহ্। তিনি যারে ইচ্ছে করেন তারে নিজির আলোর থে পথ দেখান। তুমারিও দ্যাখাবেন। তুমি বাপ এলেম শিক্ষে করার চিন্তা কর। খোদার নূর তুমার দেলে এলেমের চেরাগ জ্বালে দেবে।

সে কবেকার কথা! কিন্তু ফটিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

মুমূর্ষু ফকির বিলকিসকে বলছে, "বিটি আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দাও।"

বিলকিস ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে, "ফকির!"

বিলকিস আর বলতে পারছে না, ওর গলা আটকে গিয়েছে, দু চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কর্ত্তাবিবি একাগ্র চিত্তে কলেমা শাহাদত পড়ে চলেছেন আশহাদু আল্লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু...। কর্ত্তাবিবি বলছেন বউবিটি ফকিরবির আবেকটু সরবত পানি দ্যাও। নয়মোন ফকিরের মুখে সরবত পানি দিচ্ছে। ফকিব সরবত খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে বলছে, "বিটি কাঁদ ক্যান এই বুড়োর অনেক দিনির থে নিকেয় বসার শখ ইবার এই অ্যাদ্দিনি পয়গান আ'লো ইরার নিকে কবার খায়েশডা মেটবে। তুমি আমার গুনাহ্-খাতা মাফ ক'রে আমারে তাড়াতাড়ি ছাড়ে দ্যাও। জানো তো বুড়ো ববগেব তব সয় না হুকুর হুকুর কাশে বুড়ো হুকুর হুকুর কাশে নিকের নামে হাসে বুড়ো ফুকুর ফুকুব হাসে। আল্লা সব তুমারি ইচ্ছে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।" বিলকিস্ বলছে, "ফকিব তুমার গুনাহ্-খাতা আমি মাফ ক'রে দিলাম।" বিলকিস কাঁদছে ফকির কী যেন বলল বুড়ো বিবি কী যেন বললেন ফটিক শুনতে পেল না হাজী সাহেব কী যেন বললেন ফটিক শুনতে পেল না একটা দমকা ঝড়ে দহলিজেব ভিতরে কয়েকটা হুঁকো গড়িয়ে এধাব ওধাব ছড়িয়ে পড়ল ফটিক কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না। নফর ঘরে লোবান জ্বালিয়ে দিল। সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। ফটিক টের পেল না।

শফিকুল মোল্লা বি এ বি এল তখন শতচ্ছিন্ন দোলাই গায়ে ফটকে এক রাখাল মাত্র, শীতের এক সন্ধ্যোয় একপাল ছাগল চরিয়ে বাড়ি ফিরছে। সেই ভোবে খানিকটা পান্তা নুন আর লংকা দিয়ে খেয়ে বেরিয়েছিল, এখন এক পেট ক্ষিধে, বাড়ি ফেরার তাড়ায় প্রায় দৌড়চ্ছে। সঙ্গে ছাগলের পাল আর এরেমের বাদশাজাদী জৈগুন বিবি। জৈগুনের যেমন রূপ তেমনি গুণ। সে ঘোড়া চালাতে ওস্তাদ, তরোয়াল চালাতে ওস্তাদ, কুস্তিতে পালোয়ান-পালোযান সব মর্দকে নিমেষে হারিয়ে দেয। ফটিক সুর করে জৈগুন বিবির কেচ্ছা আওড়াতে আওড়াতে ছাগল খেদিয়ে তখন বাড়ি ফিরছে। কজটা নেহাত সহজ নয়। সুমুন্ধির ছাগল (তখন শালা সুমুন্ধি ছাড়া কথাই বলতে পারত না ফটিক) খালি এদিক ওদিক ছোটে। বাগে রাখা দায়।

আক্কেল ফেরেক তার হইল এয়ছাই।
মর্দানা লেবাছ পিন্ধে হইল ছেপাই॥
আছিল বিবির কাছে পাহালওয়ানি দাই।
পাহালওয়ানি বন্দ যত শেখে তার ঠাঁই॥

হিররুর্ হেই হেই করতে করতে ফটিক ছুটল। বিষ্টু নাপিতের ছাগলটা সরষের খেতে ঢুকে পড়েছে।

দাই বুড়ি কুস্তিগিরি হেকমত একে একে।
তিন শও আট বন্দ শেখাইল তাকে॥
ভাল ভাল মাওদান ঘোড়া মাঙ্গাইয়া।
ছওয়ারি শেখায় বিবি জৈগুন লাগিয়া॥

ফটিক ভেবে দেখল তাদের গ্রামে জৈগুনের মত বিবি একটাও নেই। না কেউ দেখতে ঐ রকম, না কারো তেজ ঐ রকম। সে ঠিক করে ফেলল জৈগুনকে সে নিকেই করে ফেলবে। তারপর দুজনে মিলে ছাগল চরাবে। কিংবা সারা দুপুর ওরা দুজন খেলতেও পারে। তলোয়ার নেজা তীর কিম্বা গোর্জের লড়াই। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছাগল পেঁৗছে দিয়ে মার কাছে এসে ফটিক বলল, আম্মাজান, আমি জৈগুন বিবির নিকে করব।

ছেলে খাবে, ছেলের বাপও এক পেট ক্ষিধে নিয়ে এই এসে পড়ল বলে। ফটিকের মা চাঁদ বিবি হাঁড়িতে জাউ চাপিয়েছে। ছেলে বাড়ি এসে খেতে না চেয়ে যেই নিকের কথা পাড়ল, চাঁদ বিবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বেতের ধামিতে গোটা কতক মুড়ি দিয়ে ছেলেকে উনুনের ধারে বসিয়ে দিল।

তারপর জিজ্ঞেস করল, ক্যান বাপ, জৈগুন বিবির মদ্দি্য কী এমন গুণ তুমি দেখলে যে তারে নিকে কত্তি চাচ্ছো।

চাঁদ বিবি জানে, ছেলের এখন আর খিদের কথা মনে থাকবে না। সে কেচ্ছা আউড়াবে।

জৈগুন বিবি কেমন্ তলোয়ার বাজি নেজা বাজি তীর বাজির খেল জানে শুনবি?

কও বাপ, শুনি?

উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে ফটিকের মুখে যেন কথার বান এসে গেল।

পহলে তলোয়ার ঢাল তার হাতে দিয়া।
তলোয়ার বাজির বন্দ দিল শেখাইয়া॥
নেজা বাজি তীর বাজি গোর্জের লড়াই।
কোমর বন্দ ধরাধরি শেখায় এয়ছাই॥
কশাকশি দিয়া ফাঁসী গর্দানে ঢালিয়া।
মহিমের যত বন্দ দিল শেখাইয়া॥
জোরে জোরওয়ার বিবি হইল এয়ছাই।
তার মত পাহালওয়ান এ দেশেতে নাই॥

চাঁদ বিবি ততক্ষণে জাউ-এর হাঁড়ি নামিয়ে ফেলেছে। তার আর ভয় নেই। ছেলের কথায় হেসে ফেললে।

বলল, এ বিবি তো মস্ত পালোয়ান বাপ। ঘুড়ায় চাপে ঘুরে বেড়ায়। হাতে সব সুমায় হয় তরোয়াল, নয় ন্যাজা, নয় তীর, নয় গোর্জ। এরে সামাল দেবে কিডা? আমার গলায় যদি ঘ্যাচ ক'রে তরোয়ালের কোপ কি ন্যাজার খোঁচা বসায়ে দ্যায়?

ফটিক মুড়ি খেতে খেতে মার কথাটা কিছুক্ষণ ভেবে নিল। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তারপর হঠাৎ একটা সমাধান ওর মাথায় খেলে গেল।

ইশ্, ফটিক বলল, আমি না আমির হামজা। আমার সংগে জৈগুন বিবি পারবে না। আমি ওরে হারায়ে দেবো। তুই যদি আমারে একটা ঘুড়া কিনে দিস, তালি আমিই তোরে পাহারা দেবো। তোর দিকি তরোয়াল তুললি আমি মারব এক গোর্জের বাড়ি। কিম্বা সকালে উঠে পান্তা খায়ে আমরা দুজন ছাগল চরাতি বেরোয়ে যাব।

"আমারে এট্টু তুলে ধরবা বাপ," ফকিরের ক্ষীণকণ্ঠ শফিকুলের চটকা ভেঙে দিল, "যাবার আগে তুমাগের মুখগুলোন একসংগে একবার দেখে নিই।"

শফিকুল ফকিরের শিওরে বসে ওর মাথাটা পরম যত্নে কোলে তুলে নিল। ফকির মিন মিন করে বলল, "আমার সংগে জোরে জোরে পড়ে যাও বাপ—লা'হ্ওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহেল আলিউল আজিম।"

শফিকুল সবল কণ্ঠে পরিষ্কার উচ্চারণে আয়াতটা আবৃত্তি করল। তারপর কি ভেবে বিলকিসের অবিশ্রান্ত দরদর ধারায় ভেসে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, "সর্বশক্তিমান আল্লা ছাড়া ভয় করবার কেউ নেই, সাহায্য করবারও কেউ নেই।"

ফকিরের গলার স্বর আরও স্পষ্ট হয়ে এলো। মুখের কাছে কান নিয়ে ফটিক শুনল, ফকির প্রার্থনা শুরু করেছে, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আলা গাম্‌রাতিল্ মওতে ওয়া সাকরাতিল মওত।"

শফিকুল স্পষ্ট উচ্চারণে এই আয়াতটাও আবৃত্তি করতে চাইল। কিন্তু ওর গলা আবেগে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

"আল্লাহ্" শফিকুলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, "আমার মৃত্যুক্লেশ ও মৃত্যু যন্ত্রণায় আমাকে সাহায্য কর।"

না বাপ, আল্লা তুমারে ছাগল চরাবার জন্যি পাঠান নি। আরউ বড় কিছু করার জন্যি পাঠায়েছেন।

সেদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। ওরা হবিবপুরের হাটের এক শূন্য চালার নিচে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করছে। ও আর ফকির। ছাগলগুলো ওদের চার পাশে গাদাগাদি, কেউ বসে। সকলেরই মুখ চলছে। মাঝে মাঝে দু একটা ছাগল বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগায় ম্যা-আ করে কাতর ডাক ছাড়ছে। হাটের শূন্য চালা থেকে তেল বেনেতি মসলা আর মাছের আঁশটে গন্ধ মিশিয়ে বৃষ্টি ভেজা কেমন এক অদ্ভুত গন্ধ নাকে লাগছে।

ফটিকের ছোট্ট মনটাও আজ বেদনায় টনটন করছে। আজ সোহ্‌রাব-রোস্তমের কেচ্ছা শেষ করেছে ফকির এই একটু আগে। রোস্তম পাহালওয়ান জানে না সে যাকে গোর্জের ঘায়ে ঘায়েল করেছে সেই তার একমাত্র ছেলে সোহ্‌রাব।

বল বাপ, কী শুনলে বল। ফকির ওকে উৎসাহ দিল।

বৃষ্টির ঝাপটা, শীত শীত ভাব, সব উপেক্ষা করে ফটিক সোহ্‌রাবের খেদ আবৃত্তি করল:

একে মেরা দেহ ছেড়ে চলিল পরাণ।
আইস বাপ দেখা দেহ জুড়াক পরাণ॥
তুমি এয়ছা পাহালওয়ান জাহানের বিচে।
জের তেরা কত দেশ তেরা তেগ নীচে॥
আমি হেথা মারা যাই না জান খবর।
সেতাব আসিয়া বাপ দাদ লেহ মোর॥
ইহা বলে কেন্দে কহে রোস্তমের তরে।
শুন পাহালওয়ান তুমি মারিলে আমারে॥
দরিয়াতে থাক কিম্বা থাক আকাশেতে।
বাপ মেরা এ খবর পাইলে শুনিতে॥
যেখানেতে থাক তুমি মারিয়া তোমারে।
লিবে সে আমার দাদ বুঝিবে আখেরে॥

কে তোমাব বাপ? এই প্রশ্নের উত্তরে সোহ্রাব যখন জানালেন যে তার বাপই রোস্তম, তখন রোস্তম শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। ফটিক বলল, রোস্তমের কথাডা তুমিই শুনাও ফকির।

ফকির রোস্তমের বিলাপ বর্ণনা করতে লাগল। বৃষ্টি বেশ চেপে এল।

জমিনে গিরিয়া গেল বেহাল হইয়া।
ছের ঠোকে ঘন হাঁকে সোহ্রাব বলিয়া॥
কহে হায় হায়রে সোহ্রাব কি করিনু।
বিনা দোষে আমি তুঝে খঞ্জর মারিনু॥
জেগর কাটিয়া তেরা কৈনু পারাপারা।
শোগের জওহরে ছিনা চাক হৈল মেরা॥
যতদিন বেঁচে রব ছিনা হৈতে মোর।
বাহির নাহিক হবে ছিনার খঞ্জর॥
কেয়ামত তক ছিনা জ্বলিবে আমার।
নাহিক হৈবে ঠান্ডা শোগেতে তোমার॥
ছিনা চাক দেখি তেরা ছাতি মোর জ্বলে।
হায়রে সোহ্রাব এই আছিল কপালে॥

হায়রে সোহ্রাব এই আছিল কপালে—এই ছত্রটিকে রপ্ত করতে ফটিকের অনেকদিন লেগেছিল। ফকিরের মুখে হায়রে সোহ্রাব কেমন একটা বুকফাটা হাহাকার মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ফটিক আর চোখের জল চেপে রাখতে পারে না। কিন্তু ফটিকের মুখে সেই একই হায়রে সোহ্রাব কেমন হাল্কা, কেমন ফঙ্গবেনে হয়ে যায়। কেন কে জানে? দেওয়ান পাড়ার বষ্টোম দিদির মুখে "তোর ছরিলে দয়া নেই রে নিমাই তোর ছরিলে আর মায়া নেই" গানের এই জায়গাটা এলেই, শোনা মাত্তর ফটিকের প্রাণটা হুহু করে ওঠে, আর ওর চোখ দিয়ে আঁসু গড়িয়ে পড়ে। বোষ্টুমি দিদি তাই দেখে ফটিকের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, আহা রে গুপাল আমার শচীমাতার দুঃখি কাঁদে ভাসায়ে দিলো। আহা গুপাল, পরের দুঃখি যে কাঁদতি পারে সেই তো প্রেমিক।

"শোন বাপ", ফটিকের কোলে শুয়ে ফকির ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল, "শোনেন হাজী মিঞা, আমার আওলাদ ওয়ারেশ কেউ কুথথাও নেই। এই বাপই আমার সব।"

প্রচন্ড একটা বিজলীর ঝলক, একটু পরেই মেঘের গর্জন এবং তারপরেই টিনের চালে বাজনা বাজিয়ে ঝেপে বৃষ্টি নামল।

ফকির বলল, "আমার কবরে যেন মাজার হয় না, সিডা দ্যাখবা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আলা গামরাতিল মওতে ওয়া সাকরাতিল মওত। আল্লাহ্।"

ফকির তারপর ফটিকের কোলে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল।

কত্তা বিবি বললেন, "ইবার মুর্দারে কোলের থে নামায়ে দ্যাও।"

ফটিক ফকিরকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। তখনও ফকিরের দেহে বেশ উষ্ণতা আছে।

কত্তা বিবি বললেন, "ইবার মুর্দার চোখের পাতা দুটো আস্তে করে টানে টানে বুজোয়ে দ্যাও।"

কত্তাবিবি ততক্ষণে কলেমা তমজীদ পড়তে শুরু করেছেন, আর বাকি সকলে তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন: লা-ইলা-হা, ইল্লা আন্তা নুরাইয়াহ্... তুমি ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নাই। তুমিই জ্যোতিঃ, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন নিজ জ্যোতিঃ হইতে পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্র প্রেরিত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বার্তাবহ পয়গাম্বরগণের ইমাম ও শেষ-নবী।

ফটিক তারপর কত্তাবিবির কথা মত ফকিরের চোখের পাতা দুটো অত্যন্ত যত্নে টেনে টেনে বন্ধ করে দিল।

তুমারে বাপ, লেখাপড়া শিখতিই হবে। ফকির বলল। সন্ধ্যের মুখে ছাগল তাড়িয়ে ফটিক বাড়ি ফিরছে। সঙ্গে ফকির।

বলল, বাপ, বিদোই হলো গিয়ে আমাগের আসল চোখ। এলেম যত আমল হবে দুনিয়াডারে ততই সাফ দেখা যাবে। আল্লাহ্ সবারই সব চিজ দ্যান না, তুমারে তার নুর দেছেন। উডা কাজে লাগাতি হবে। আজ তুমার বাপার কব, তুমারে যেন মক্তবে ভর্ত্তি করায়ে দ্যায়।

কর্ত্তাবিবি বললেন, "মুর্দার হাত পা এই বেলা টানে সুজা করে দ্যাও। দাড়িডে ভালো করে বাঁধে দ্যাও। তারপর মুর্দারে ঢাকে রাখে গিরামের সবাইর খবর পাঠাও।"

হাজী সাহেব মায়ের কথামত সব কাজ পালন করে নফরকে পাঠালেন গ্রামের সবাইকে খবর দিতে। বৃষ্টি তখনও পড়ছে আর মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়ার গুঁতো।

ফাকর আর ফটিকের বাপ সাজ্জাদ হুঁকো খাচ্ছে। ফটিক তার মার কাছে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে।

সাজ্জাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বুঝি তো সব। কিন্তু গরিবির ছাওয়ালের ল্যাহাপড়া শিখোনোর কথা ভাবা আর আসমানের চাঁদ ধরার চিন্টা করা একই কথা।

বাপু, অন্য কেউ হলি তুমারে একথা কতাম না। দু বছর ধ'রে তুমার ছাওয়ালরে দেখতিছি, ফকির বলল, ফটিক বাপের মতন আক্কেলমন্দ্ ছাওয়াল লাখে একটা মেলে। আমি জিন্দিগী ভর যে-সব পুঁথি শিখিছি, ও দু বছরে তার প্রায় আধ্ধেক শিখে ফেলিছে। এ কী কম কথা! খোদার রহমত ওর উপর আছে। খোদার ইচ্ছে বাপ্ আমার এলেমদার হয়। তুমি আর দোনামনা ক'রে না বাপ আমার। মৌলবী আবু তালেবের মক্তবে ওরে ভর্ত্তি করে দ্যাও।

সাজ্জাদ বলল, হায় আল্লা! ফাহির, ফটিক বাপেরে যে দুবেলা ভালো ক'রে খাতিউ দিতি পারিনে।

চাঁদ বিবি বেড়ার আড়াল থেকে বলল, ফহির যখন কচ্ছেন আপনি তখন আর অমত করবেন না। সারা জীবনই তো দুঃখ কাটতিছে। আল্লা ভরসা করে দ্যান ফটিকরি মক্তবে ভর্ত্তি ক'রে। আল্লার কাজ আল্লাই চালায়ে নেবেন। আমি না হয় আরু বেশি করে ভারা ভানবানে।"

কে তার শিক্ষক? চেরাগে ফকির না মৌলবী আবু তালেব না সেকেন্ড্ মৌলবী খোন্দকার জালালুদ্দিন? না কি তারিণী শিকদার না দেওয়ান বাড়ির মাজেবাবু? চাদর ঢাকা দেওয়া চেরাগে ফকিরের মৃত শীতল দেহটার দিকে চেয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করল ফটিক, কিছুক্ষণ আগেও যে দেহটা উষ্ণ ছিল তার কোলের উপর, যার তখনও একটা পরিচয় ছিল, ফকির, চেরাগে ফকির। কিন্তু এখন? এখনও তো সেই হাত সেই পা, সেই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্ব ত্বক—সবই আছে। নেই শুধু ফকির, চেরাগে ফকির। এখন এই শীতল দেহটা শুধু মুর্দা। আচ্ছা, এই মুর্দাটা এখন কী? হিন্দু না মুসলমান? একটা দেহ কতক্ষণ হিন্দু থাকে, কতক্ষণই বা মুসলমান? ফকির গোরে যাবে। মিশে যাবে মাটিতে। সেই মাটি কি মুসলমান? হিন্দুর মড়া দাহ হবে, ভস্মরাশ মিশে যাবে বাতাসে অথবা ধুয়ে যাবে জলে। সেই বাতাস, সেই জল কি হিন্দু?

আবার ফকিরের দিকে চাইল ফটিক। তারপর বাইরের দিকে চাইল। অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ নেই। বিলকিস্ তখনও ফোঁপাচ্ছে। একবার মেঘ ডাকল মৃদুস্বরে। বাতাসে তখনও খানিকটা জোর আছে।

অকস্মাৎ সেই ভোর রাত্রির অন্ধকার চিরে মোয়াজ্জেনের গলার আজান সকলের কানে এসে পৌঁছুতে লাগল।

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার—আল্লাহ মহান, আল্লা মহান।

আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও উপাস্য নাই।

আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (দঃ) নিশ্চয়ই আল্লার প্রেরিত রসুল।

হাইয়া আলাচ্ছালাহ্—নামাজের জন্য প্রস্তুত হও।

ফটিকের চোখের সামনে মৌলবী আবু তালেবের মক্তবের ছবিটা ভেসে উঠল। মক্তব শুরুই হত আল্লাহু আকবর দিয়ে। ছাত্ররা সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে মৌলবী সাহেব যা বলতেন তা আবৃত্তি করে যেত। মৌলবী সাহেব তীক্ষ্ণভাবে তাঁর কান দুটোকে সজাগ রাখতেন উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কিনা জানবার জন্য। কালো দোহারা চেহারা আবু তালেব মৌলবীর, কালো টিকিওলা লাল ফেজটুপী পরে ক্লাসে আসতেন। যখন পড়াতেন বা তহজীব ও তমদ্দুন সম্পর্কে তারস্বরে বক্তৃতা দিতেন তখন ফেজের কালো টিকি এদিক ওদিক ঝাপটা মারত। ফটিক বেজায় ভয় খেতো তাকে। বহুদিন বাদে কলকাতায় ওকালতি পড়ার সময় তার মেসের ইদ্রিস মিঞার পাল্লায় পড়ে নাট্য নিকেতনে একবার আলিবাবা দেখতে গিয়েছিল। সেখানে আবদাল্লারূপী কোহিনুরবালাকে দেখে শফিকুল চমকে উঠেছিল। একেবারে আবু তালেব মৌলবী! আবু তালেব আবেগ ভরে বলতেন, হাদিছে আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এই কোর্আনের উছিলায় কতক শ্রেণীকে অবনত ও কতক শ্রেণীকে উন্নত করিবেন। সুতরাং যাহারা কোর্আন মজিদ শিক্ষা করিয়া ও করাইয়া এবং আমল করতঃ উহার কাঠিন্য সহ্য করিয়া সম্মান বজায় রাখিতে পারিবেন, তাঁহারাই উন্নত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে। মক্তবের ছাত্ররা কতটা মনোযোগ তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যের জন্য দিত আর কতটাই বা তাঁর ফেজের টিকির আন্দোলনের জন্য, ফটিকের পক্ষে আজ আর তা বলা সম্ভব নয়। তবে মৌলবী আবু তালেব যখন যা বলেছেন ফটিক তা মনে করে রেখেছে যথাঃ যে ব্যক্তি কোর্আন

শিক্ষা করিয়াছে ও দিয়াছে, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্ট। অথবাঃ যে ব্যক্তি কোর্‌আন শরীফের একটি অক্ষর পাঠ করিবে, সে দশটি নেকী পাইবে। আমি বলি না যে আলিফ, লাম ও মিম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর ও মিম একটি অক্ষর। সুতরাং এই তিনটি অক্ষর পাঠ করিলেই ত্রিশটি নেকী পাওয়া যাইবে।

মোয়াজ্জেনের আজান কানে ঢুকতে ফটিক আবার সম্বিত ফিরে পেল। তথাপি ও অনুভব করতে লাগল ও যেন এখানে নেই, মৌলবী আবু তালেবের মক্তবের কাতারেই দাঁড়িয়ে আছে।

হাইয়া আলাল্‌ ফালাহ্‌—শুভ কাজের জন্য প্রস্তুত হও।

মৌবলী আবু তালেবের মক্তব শুরুই হত এই আজান মুখস্ত করানো দিয়ে।

মৌলবী সাহেব পশ্চিম দিকে মুখ করে কেবলা-রোখ ওদের দাঁড় করিয়ে আজানের বাণী বলে যেতেন পরে সমস্বরে ওদের সেটা বলতে হত। ওর মধ্যেই, আশ্চর্য ক্ষমতা ওঁর, উচ্চারণ কারো একটু এদিক ওদিক হলেই ঠিক তারই পিঠে পড়ত বেতের বাড়ি।

মৌলবী সুর করে বলতেনঃ হাইয়া আলাল ফালাহ্‌।

ওরা সমস্বরে আবৃত্তি করতঃ হাইয়া আলাল ফালাহ্‌।

মৌলবীঃ আচ্ছালা-তো খাইরেম্‌ মিনান্নাউম—নিদ্রা হইতে নামাজ উত্তম।

ওরাঃ আচ্ছালা-তো খাইরোম মিনান্নাউম।

মৌলবীঃ ক্বদ্‌-কা-মাতেচ্ছালাহ—এইমাত্রই নামাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ওরাঃ ক্বদ্‌-কা-মাতেচ্ছালাহ্‌।

মৌলবীঃ আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আক্‌বার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। কারণ জানত এইটেই শেষ পাঠ। এবার ওরা বসতে পারবে।

তাই কলজের যত জোর আছে তাই দিয়ে ওরা চেঁচাতঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ মহান আল্লাহ মহান আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নাই।

তাঁর ছাত্রদের ঈমানদার মুসলমান করে তোলার চেষ্টার কোনও কশুর করতেন না মৌলবী আবু তালেব। ইসলামের তহ্‌জীব ও তমদ্দুন শিখবার উপযোগী বাংলায় ভালো পাঠ্য পুস্তক না থাকাটা তাঁর প্রাণে বড় বাজত।

তাঁর ছাত্ররা তাঁর কথার কোনও মানে আদৌ বুঝতে পারছে কিনা সে সম্পর্কে মৌলবী সাহেবের মাথা ব্যথা ছিল না। তাঁর শিক্ষানীতি, বড় হয়ে ফটিক যা বুঝেছে তা ছিল ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যাচ্‌ দেম্‌ ইয়ং, তাই। সরলমতি শিশু হৃদয়েই তিনি ইসলামের বীজ বপন করে তক্ষুণি সেই বীজ মহীরূহে পরিণত করতে চাইতেন।

হে ঈমানদার বান্দাগণ! ছাত্ররা আজান সেরে বসে পড়ামাত্র মৌলবী সাহেব শুরু করতেন, আমি তোমাদিগকে এমন কোনও ব্যবসায়ের শিক্ষা দিব নাকি যদ্দ্বারা তোমরা দোজখের কঠিন শাস্তি হইতে নিস্তার পাইতে পার। উহা কী? আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার হুকুম আহকাম মানিয়া লইয়া ও তাঁহার সহিত শরিক না করিয়া খাঁটি ঈমানদার হওয়ার জন্য আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিব না কি? নিশ্চয়ই দিব। কোর্‌আন শরীফের সুরা সাফ এই কথা—এই এই সোলেমান, বেতমিজ ছাওয়াল তুমার পিঠে আজ এই বেতখান ভাঙব। এই ওরে ধরে আন এখেনে। ততক্ষণে সোলেমান দুই লাফে মক্তবের বাইরে। তারপর মাঠের আল ধরে হাওয়া। তার পিছনে এক পাল ছেলে। ওকে ধরবার নাম করে দৌড়ে আধ মাইলটাক দূরে গিয়ে ভাঙা নীলকুটির বাগানের গাছে উঠে সব জামরুল খেতে শুরু করেছে। ফটিক একা মক্তবে বসে পড়ত। মৌলবী আবু তালেব এই জন্য ওকে খুব ভালবাসতেন।

হাজী সাহেব বললেন, "আম্মাজান ভিতরে যায়ে ফজরের নামাজটা সা'রে ন্যান্‌ গে। আমরা অজু করে নামাজের বিছানাটা এখেনেই পা'তে নিই। উরা সব একটু পরেই আ'সে পড়বেনে। কাফনের কাপড় বাড়িতি আছে কিনা দেখে নেবেন?"

নয়মোন চোখ মুছে বললেন, "কাফনের কাপড় আছে।"

বিলকিসকে নিয়ে কর্তাবিবি আর নয়মোন ভিতরে চলে গেলেন। হাজী সাহেব আর ফটিক অজু করে দহলিজেই ফজরের নামাজটা সেরে নিলেন। হাজী সাহেবের চাচাতো ভাই রহমান নির্কার তার দুই ছেলে নেয়ামত আর দাউদকে নিয়ে সকলের আগে এসে হাজির হলেন।

তারপর কল্কে সেজে নিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে সাব্যস্ত হল ফকিরের যখন আওলাদ ওয়ারিশ কেউ নেই তখন ফটিক মিঞাই তার শেষ কাজ করুক। আর খালেক যখন এই সব ব্যাপারের মাসলা মাসায়েল সবই জানে তখন মুর্দা গোসল করানো ও কাফন পরানোর কাজটাও সেই করে দেবে।

বলতে না বলতে খালেক এসে হাজির। এবং খালেক কাজের লোক। এসেই মুর্দাকে গোসল দেবার জোগাড় করে ফেলল।

বলল, "বড় মিঞা কাফনের কাপড় আর কাফুর আতর আনায়ে দ্যান। আর বড় বড় চারখানা চাদর।"

চাদর আসতেই খালেক চাদর চারখানা অদ্ভুত কৌশলে বেঁধে একটা বড় ঘেরাটোপ বানিয়ে

ফেলল। নেয়ামত, দাউদ, রহমান আর শফিকুলকে চারটে কোণা ধরে দাঁড়াতে বলে তাই দিয়ে মুর্দাকে ঘিরে দিল। তারপর ভিতরে ঢুকে মুর্দাকে প্রথামত গোসল দিয়ে পাক-সাফ করে মুর্দার সেজদার জায়গায়, কপালে, হাতে পায়ে, হাঁটুতে, সিনায় ও দাড়িতে কাফুর ও আতর লাগিয়ে দিল। তারপর নগ্ন মুর্দাকে কাফনের তিনখানা কাপড় দিয়ে আগে পিরহান ও পরে ইজার ও লেফাফা দিয়ে ঢেকে দিল।

বলল, "রহমান ভাই, ন্যান, ইবার চাদর সরায়ে ন্যান। চালি কি তৈরি হয়ে গেছে?"

বাইজুদ্দিরা এসেই ঐ কাজে লেগে গিয়েছিল। হাজী সাহেবের ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে মুর্দা বইবার জন্য বেশ সুন্দর একটা চালি তৈরি করে ফেলল। নফর এক ধামা নকলদানা কিনে নিয়ে এল।

তারপর ফকিরকে ওরা চালির উপর তুলে জানাজার নামাজের জন্য নিয়ে চলল।

শববাহকদের কাঁধে চালি ওঠার পর সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর্ রাসুলুল্লাহ্।

বাপ্!

ফটিক চমকে উঠে চালির দিকে চাইল।

আমার আওলাদ ওয়ারিশ কেউ নেই। তুমিই আমার সব। দ্যাখবা যেন আমার কবরে মাজার পূজা না হয়।

খবরদার ভাই মোমিন মুসলমানগণ, ফটিক মৌলবী আবু তালেবের বজ্র নির্ঘোষ শুনতে পেল, কোর্আন শরীফে ছুরা ফাতেহায় আছে, আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। এই আয়াতের দ্বারা সাফ বুঝা যাইতেছে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য মান্নত করা কিংবা কাহাকেও প্রকৃত বিপদ মোচনকারী ধারণা করা, যথা— মাদার পীর, সত্যপীর, সেখলালের দরগায় মান্নত পূজা বা সিরনী দেওয়া বা খোদা-বেটা, খোদা-বাবা, খোদা-কানা বা খোদা-বহেরা ইত্যাদি বলা শিরকী। কিংবা হে পীরবাবা, হে মা কালী আমায় উদ্ধার কর, এই কথা বলিলে সরাসর কাফের হইয়া যাইবে। নাউজুবিল্লাহে মিন্ জালিক্।

মৌলবী আবু তালেবের ধারণা, হিন্দুদের প্রভাবে পড়েই মুসলমানরা আজ ঈমান হারিয়ে জাহান্নমী হয়ে যাচ্ছে।

মক্তবের পাঠ্য পুস্তকে তিনি প্রাণপণে হিন্দুয়ানীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন।

এই ছাওয়াল, সাত বারের নাম বল্?

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ......

ছপাৎ করে পিঠে এক বেতের বাড়ি।

চোখ লাল করে মৌলবী বলতেন, শুরুতিই বা কাফেরী নামগুলো মনে পড়ে ক্যান্? নিজিগের নামগুলো কতি মুসলমানের ছাওয়ালের জিভ টানে ধরে কিডা? মুসলমানগের সাত বারের নাম ক ঠিক করে। বাতাসে শপ করে আওয়াজ তুলে বেতটা বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

ফটিক কাঁপতে কাঁপতে বলে চলল, এতোয়ার, পীর, মঙ্গল, বুধ, জুম্মারাত, জুম্মা, শনীচর।

বারো মাসের নাম কী?

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ......

ছপাৎ। ওতো হিঁদুগের মাস। সে বেলায় তো দেখি মিঞা সাহেবগের জিবখান রেলগাড়ির মত গড়গড়ায়ে ছোটে। আমাগের মাসের নাম কি এট্টা হিঁদুতিউ কতি পারে? আমাগের মাসের নামগুলো ক?

মহরম—

মৌলবী হুঙ্কার দিলেন, মহরম। তারপর?

সফর।

তা থামছ ক্যান, কয়ে যাও।

রবিয়ুসসানি।

রবিয়ুসসানি! তুমার মাথা! রবিয়ুলআউয়ল। তারপর রবিয়ুসসানি। তারপর বলে যাও? জমাদিয়ুলআউয়ল, জমাদিয়ুসসানি, রজব, শাবান, রমজান, শওয়াল, জেলকদ, জেলহজ।

দেড় মাইল দূরে মক্তব, পেটে খিদে, হাতে বেতের ক্ষত। বাড়ি ফিরছে ফটিক। ফকিরের সঙ্গে দেখা।

কী বাপ? খবর কী?

আচ্ছা ফকির, হিন্দুর মাস আর মুসলমানের মাস দুটো দু রকম ক্যান্ কতি পারো? বোশেখ জষ্টি কি আমাগের মাস নয়?

ক্যান্ বাপ, একথা কচ্ছ ক্যান্?

মৌলবী সাহেব কন, হিঁদুর মাসের নাম তুমাগের মুখি আগে বেরোয় ক্যান্। কাজে কম্মে সব সুমায় এই মাসের কথা শুনি, তাই ওগুলো বেশি মনে থাকে। এতে কি গুনাহ্ হয়?

বাপ আমার বড় জবর সওয়াল তুলে ধরিছ। চাঁদ সুরুজ হিঁদু না মুসলমান, একদিন হয়ত এই সওয়ালও তুলা হবে। ফকির হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

॥ ১৩ ॥

খিড়কি পুকুরের ঘাটে ফটিকের ছাড়া জামা কাপড় নিয়ে এসেছিল বিলকিস। ওর নিজের কাপড়জামাও ছিল। এজমালি পুকুর। অনেক শরিক। আর সকলেরই কাঁচা ঘাট। শুধু হাজীবাড়ির ঘাটটাই বাঁধানো। হাজী সাহেবই বাঁধিয়েছেন। খিড়কির পুকুর। মেয়েরাই ব্যবহার করে। পুরুষের প্রবেশ এদিকে নিষেধ। তাই পুকুরটাকে সাফ করার গরজ কারো দেখা যায় না। ঘাট বাঁধানো নিয়েও নিকিরি পাড়ায় ঘোঁট নিতান্ত কম হয় নি। নয়মোন একবার বর্ষাকালে কলসী কাঁখে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট লাগিয়েছিল। পড়েছিল বিছানায়। হাজী সাহেব তখনও হাজী হন নি। মাত্রই গোলাম নিকিরি, তবে কারবার ফেঁপে উঠছে, পয়সা আসছে ঘরে। কেউ কেউ বড় মিঞা বলে ডাকতে শুরু করেছে।

কর্তাবিবি একদিন নয়মোনের কোমরে লাল কেরোসিন ডলতে ডলতে আক্ষেপ করছিলেন, "না বউ, তুমি উঠে না। এখন কাজ কাম করতি শুরু করলি তুমার মাজার ব্যথা আর জম্মেউ সারবে না। যত বয়েস বাড়বে কোমরের বিদনা ততই চাগাড় দেবে। শেষে বুড়ো বয়সি প'ড়ো হয়ে থাকলি কিডা তুমারে দ্যাখবে। মুসলমানের বাড়ি মেয়ে হয়ে জম্মাইছো, আজউ তুমার চোখের পানি পড়েনি, তুমি খুব ভাগ্যবান, ভালো নসিব নিয়েই জম্মাইছ বিটি। আরউ কদিন শুয়ে থাকো। আমার ছাওয়ালের এখন আমদানী হচ্ছে, বাইরি বালাখানা উঠতিছে, কিন্তু পুকুরির ঘাট বাঁধায়ে দিবার টাকা জোটছে না। ঐ যে কথায় বলে, বাইরি মিঞার বালাখানা, ঘরে বিবির চট-বিছানা।"

হাজী সাহেবের কানে কথাটা যেতেই সখের দহ্‌লিজের কাজ বন্ধ রেখে আগে খিড়কি পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দেন। গোলাম মিঞাকে এই ফালতু ব্যাপারে টাকা নষ্ট করতে দেখে জ্ঞাতগুষ্ঠির সবাই অবাক হয়ে যায়। অনেকে হাজী সাহেবকে এ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করেছিল। বিশেষ করে ওঁর নিকট জ্ঞাতিরা। পারে নি। তারপর রটে গেল নয়মোন বিবির কুপরামর্শেই মিঞা সাহেব এই কাজ করছেন। তাতে আরও শোরগোল উঠল দিন কতক। মুসলমান হয়ে জ্যান্ত বিবির আরামের জন্য কোনও মিঞা ঘাট বাঁধিয়ে দেয় একথা এ গ্রামের লোক কখনও শোনেনি। তবে হ্যাঁ, মরা বিবির জন্যি কিছু কর, সে আলাদা কথা। এই তো পাশের গ্রামের মেন্দা সাহেব, মরহুম খান বাহাদুর আবদুল জব্বার মৃধা, ওরা তো খানদানি বড়লোক, ওদের বাড়ির বিবিরা বেঁচে থাকতে কই, কেউ তো তাদের নিয়ে কখনও আদিখ্যেতা করেনি। তারা খায় কি না-খায়, বাঁচে না মরে, কীভাবে বাঁচে মিঞারা তার খোঁজ কি নেয়? তাদের কি কাজকাম নেই! কিন্তু খান বাহাদুরের এক বিবির হঠাৎ যখন এন্তেকাল হল, তখন গ্রামের লোক জানল বটে মেন্দা সাহেবের কত বড় পিয়ারী বিবি একজন ছিল। ভাগ্য বটে শাবানা বিবির। যদিও এই বিবির বাপ যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি মেয়েকে দিয়েই বিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিবি খুবই খুব-সুরৎ ছিলেন তথাপি তিনি যথেষ্ট শরীফ ঘরের মেয়ে নন এই অপরাধে মেন্দারা তাঁকে কখনো তাঁর বাপের বাড়ি যেতে দেন নি বা বাপ ভায়ের সঙ্গে দেখা করতেও দেন নি। খানদানের ইজ্জতের নিশান তাঁরা এইভাবে উঁচুতে তুলে ধরে রেখেছিলেন। তার জন্য সবাই মেন্দাদের, যদিও এখন আর আগের রবরবা নেই, অবস্থা পড়ে এসেছে, এখনও এত মানে। খানদানের ইজ্জত রাখবার জন্য মেন্দা সাহেবের বাপ একটার পর একটা নিকে করে গিয়েছেন। লোকে বলে তিনি তাঁর শাবানা মনজিলে ছোটখাট একটা হারেম পুষতেন। তাতে তাঁর মানসম্মান বেড়েই গিয়েছিল। শরীফ মুসলমান বলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে যাবার আরও একটা প্রধান কারণ এই যে, তিনি কঠোর পর্দা মানতেন। তাঁর জেনানা মহলে সূর্য এবং বাতাস ঢোকার ব্যবস্থাও তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শরীফ মেন্দাদের শাবানা মনজিলে যেমন একপাল গোরু মোষ ছিল, ছাগল ছিল, হাঁস মুরগি ছিল, তেমনি একপাল বিবিও ছিল। তবে এদের মধ্যে মস্ত একটা তফাত ছিল। গোরু মোষ ছাগল হাঁস মুরগি এরা রোদে বাতাসে যথেচ্ছ চরে বেড়াতে পারত। বিবিদের সে অধিকার ছিল না। কেননা, শরাফতে বিশ্বাসী খানবাহাদুরের মোল্লা মৌলবীর প্রতি বিশ্বাস ছিল অগাধ। শরীয়ত বিরোধী কোনও কাজ তিনি কখনো করেন নি। বরদাস্তও করতেন না।

বিশেষ করে তিনি শ্রদ্ধা করতেন অত্যন্ত সুপুরুষ দেখতে সৈয়দ বংশীয় এক মাঝবয়সী মৌলবী সাহেবকে। মাঝে মাঝে তিনি আসতেন। দিন কয়েক শাবানা মনজিল দীন-ইসলাম এবং তার তহ্‌জিব ও তমদ্দুন, তার বর্তমান অধঃপতনের কারণ এবং তার তরক্‌কির পথ সম্পর্কে আলোচনায় মুখর হয়ে উঠত। মিলাদ মহ্‌ফিলে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে মাত করে রাখতেন। মৌলবী সাহেব তাঁর মেজবান মেন্দা মিঞাকে স্ত্রীলোকদের আচার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ করে হুঁশিয়ার থাকতে বলতেন। বক্তৃতার সময় প্রায়ই বলতেন, স্ত্রীলোকেই শরীয়ত বিরোধী কাজ বেশী করে, বেশী গুনাহ্‌ করে, এবং সর্বদাই নানা রকম দোষ করে দোজখ্‌ খরিদ করে নেয়, এবং এই ব্যাপারে এক জবরদস্ত প্রমাণ তাঁর হাতে আছে। কী প্রমাণ? না হজরত মেরা'জে গিয়ে স্বয়ং দেখে এসেছেন যে দোজখে যারা শাস্তি পাচ্ছে তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এর চাইতে আর অকাট্য প্রমাণ কী হতে পারে? অতএব এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, মেয়েরাই বেশী পাপ করে। তাই তিনি যখন উদাত্ত কণ্ঠে ভাই মোমেন মুসলমানদের সম্বোধন করে বলতেন যে, মেয়েরা হাঁটতে শেখা থেকে শুরু করে গোরের মাটি গায়ে ঢাকা

দেওয়ার সময় পর্যন্ত তাদের অবরোধে রাখা উচিত বলে তিনি মনে করেন, কেননা এর দ্বারাই ইসলামকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানো যাবে, তখন মহ্‌ফিলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠত মারহাবা মারহাবা।

শাবানা মনজিলের বিবি অর্থাৎ বেগম মহলেও মৌলবী সাহেবের খুব পসার ছিল। কেননা, তাবিজ কবজের জন্য অনেকেই মৌলবী সাহেবের কাছে গোপনে ধর্না দিত। আবার চিকের আড়ালে বসে তারা আগ্রহ ভরে খাস স্ত্রীলোকদের কর্তব্য সম্পর্কে মৌলবী সাহেবের মুখ থেকে সদুপদেশ গ্রহণ করে ধন্য হত। তিনি যখন হুংকার ছেড়ে বলতেন, হে বিবিগণ, তোমরা যাহারা নামাজে ছুস্তি করিয়া থাকো, দাঁড়াইবার শক্তি থাকিলেও বসিয়া নামাজ পড়, তোমরা যাহারা শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়গুলি, যেমন কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব, হলাল, হারাম, মকরুহ, মোবাহ, পাকী, নাপাকী, পর্দা-পুশিদা, হায়েজ-নেফাছ, স্বামী-স্ত্রীর, পিতা-মাতার, ছেলেমেয়ের কর্তব্য সকল, ১০৩ ফরজ, বিবাহ, আকিকা, কোরবানী, জানাজা, ফিৎরা, দোয়া, তাবিজাত, খতমাত, হাকিকত, মারিফত, ওয়াজ-নছিহত ইত্যাদি বিষয়ের মাছলা-মাছায়েলগুলির কিছুই জান না, সাবধান সাবধান, হুঁশিয়ার হে নারী, তোমাদের জন্য দোজখের সকল দরজাই খোলা থাকিবে, দোজখের ভীষণ সেই আগুনের হাত হইতে কেহই তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না—তখন চিকের অন্তরালবর্তী বেগম মহলে একটা নিদারুণ ভয় ও ত্রাসের ভাব ছড়িয়ে পড়ত। দোজখের আগুন লক্‌লক্‌ করে তেড়ে আসছে, এমন ভয়াবহ দৃশ্য কেউ কেউ দেখতেও পেত।

মৌলবীর গলার স্বর এবার গম্ভীর এবং কিছুটা নরম হয়ে আসত। বলতেন, তাই বলি হে বিবিগণ, সময় হেলায় হারাইও না, আখেরাতের কথা স্মরণ রাখিয়া ইসলামি আদব তরবিয়ত সময় থাকিতে এমনভাবে শিখিয়া লও যাহাতে সন্তানদিগকেও তোমরা শিখাইতে পার। ইহাই বেহেশতের পথ।

আর হাঁ, খবরদার, খবরদার, স্বামীকে কখনো নিজের উপর অসন্তুষ্ট হইতে দিবে না। কেননা, স্বামী অমূল্য ধন। তিনি যে ইশারায় চালাইতে চাহেন, সেই ইশারাতেই চলিতে থাকো। তোমাদের স্বামী যদি তোমাকে বলে তুমি দুই হাত বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকো, তাহা হইলে তোমরা সেই কাজই করিবা। তাহা হইলে খোদা ও রসুলে তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তখন তোমার বেহেশতের দরজাগুলি খুলিয়া যাইবে। বলেই মৌলবী সাহেব গজলের সুরে একটা উপদেশ বিতরণ করতেন:

নারীর মোর্শেদ স্বামী শের-তাজ জানিবে,
মোর্শেদের মত নারী পতিকে ভজিবে।

এমনই ধর্মপ্রাণ ছিলেন মরহুম মেন্দা মিঞা। খান সাহেব সাদিক মেন্দার বাবা। এবং শাবানা বিবি ছিল তাঁর যে কত পেয়ারের তা জানা গেল বিবি সাহেবার এন্তেকালের পর। এক রাতে বিবি হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। চল্লিশ দিন শোক প্রকাশের পরই তাঁর বাড়ির নামটাই তিনি রেখে দিলেন শাবানা বিবির নামে। সেই থেকে শাবানা মনজিল। তার কবরের উপর উঠল একটা নকশা-কাটা ইটের ইমারত। আর বিবির কবরও দেওয়া হল শাবানা মনজিলের দুই বিঘের হাতার মধ্যেই। এবং কড়া পর্দা বজায় রেখে। তখন ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল ইটের ঐ শাবানা মহলের জন্য। চেরাগে ফকির গ্রামের নামের ছড়া শোনাতো। সে শাবানা মহলকে শেখপুরের তাজমহল বলত। লোকে আসত দেখতে। জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সাহেব, সরকারী উকিল দাওয়াত পেয়ে শাবানা মনজিলের সেই তাজমহল দেখে গিয়েছেন। শুধু কয়েকদিন একটা কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল। শাবানা বিবির নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। সৈয়দবংশীয় সুপুরুষ মৌলবী সাহেবকে নাকি এক রাত্তিরে শাবানা বিবির ঘরে দেখা যায়। এবং সেই অবস্থায় হঠাৎ ধরা পড়েন। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল জানা যায় নি। তবে এমনও হতে পারে দোজখের ত্রাসে সর্বদা প্রপীড়িতা না-পাকী বিবির মনে কিছুটা আদব তরবিয়ত ঢুকিয়ে দেবার জন্য কিংবা বেহেশতে পৌঁছুবার কোনও সহজ তরিকা বাতলে দেবার কারণেই বিবির ঘরে মৌলবী সাহেবের শুভ পদার্পণ ঘটত বা সেইদিনই ঘটেছিল। তবে এটা শোনা যায় যে, তিনি বেগানা পুরুষ হয়ে জেনানা মহলে ঢুকলেও পর্দার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি, কেননা তিনি বোরখা পরিহিত অবস্থাতেই শাবানা বিবির ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তবে এটা শত্রুপক্ষের রটনাও হতে পারে। কেননা, এই ঘটনার প্রধান দুজন সাক্ষীর একজন শাবানা বিবি, মৃত, অন্যজন মৌলবী সাহেব, নিখোঁজ।

শুধু সোনা মিঞা বলে, মৌলবী সাহেব নিখোঁজ হবে ক্যান, শাবানা বিবির কবরের নিচেয় আর একটা কবর আছে। সেই সিন্দুক কবরের মধ্যে মৌলবীও শুয়ে আছে। মৌলবীর জন্যি সিন্দুক কবর আর তার উপরে শাবানা বিবির জন্যি বাক্‌স কবর খানবাহাদুরের খাস খানসামা গহরালি নিজে খুঁড়েছে। সত্যি মিথ্যে জানার উপায় নেই। কারণ, ঐ ঘটনার পরেই গহরালির উপর জিনের আছর পড়ে, ফলে বেচারার জিভটা কাটা পড়ে বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। যতীন ডাক্তারের চেষ্টায় বেচারা জানে বেঁচে যায় বটে, তবে চিরকালের মত একেবারেই বোবা। সোনা মিঞার কথা এই কারণেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ একে তো ওর মেন্দারের উপর ভয়ানক

রাগ, আর দ্বিতীয়ত সোনা মিঞার খবরের সূত্রে গুংগা গহরালি। বিশেষ কেউ তাই ওর কথায় কান দেয়নি। এবং মেন্দাদের নাম ও প্রভাব আরও ছড়িয়েছে।

কিন্তু গোলাম নিকারির এ কী ব্যবহার! বিবি জল আনতে গিয়ে আছাড় খেয়েছে বলে খিড়কি পুকুরের ঘাট শান বাঁধিয়ে দিচ্ছে! প্রথম আপত্তি উঠেছিল ওরই চাচাতো ভাই রহমান নিকারি, তার নিকটতম প্রতিবাসী, একেবারে বাড়ির গায়ে বাড়ি, সেই তার কাছ থেকে। তার প্রধান আপত্তি, ওখানে বাড়ি ঘরের কাজ সারার অছিলায় মেয়েদের গুলতানি হবে খুব। পরচর্চা, পরনিন্দা, একের কথা অন্যের কাছে বলে দেওয়া, চুগলি করা, এমন কি পতিনিন্দার মত মহাপাতক প্রভৃতি যে-সব দোষ সচরাচর মেয়েমানুষের থাকে, শান বাধানো ঘাট পেলে সেগুলো সব বেড়ে যাবে। ফলে ঐ সব মেয়েদের যে গুনাহ্ হবে তার একটা বড় অংশ ফেরেশ্তারা গোলাম নিকারির খাতায় জমা করে দেবে। অতএব এমতাবস্থায় ঘাট বাঁধিয়ে দিয়ে মেয়েদের বেশি লাই না দেওয়া এবং নিজের গুনাহের খাতায় পাপের বোঝা না বাড়ানোই ভাল।

কিন্তু গোলাম নিকারি কারোর কথায় কান দেন নি। নিজের ঘাটটা শান বাঁধিয়ে দিয়েছেন। ফলে কেউ বলেছে আদিখ্যেতা, কেউ বলেছে টাকার গরম। এমন কি প্রথম দিকে রাগ করে বিলকিসের চাচীরা, চাচাতো বোনেরা ওদের বাধানো ঘাটে আসতো না। আসলে তাদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। পর্দার ব্যাপারটা অবিশ্যি ওরা তেমন বড় করে দেখে না। যে-সব নিকারি গরিব, ঘরে পুরুষ মানুষ নেই, তারা মাছ বেচতে বের হয়। টাকা বেশী যাদের, এমন লোকের সংখ্যা অবিশ্যি খুবই কম, তাদের আদবকায়দা খানিকটা বদলায়। তবে মেয়েরা ঘেরাটোপ বেশী পছন্দ করে না। যতটুকু না হলে নয়, ব্যস্ ততটুকু।

নিকারি সমাজে গোলামের উত্থান, সত্যিই অবাক হবার মত। নিজে ব্যাপারী। তাই অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। হিন্দু মুসলমান নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছেন। লেখাপড়া না জানলেও কুপমণ্ডুকতা তাকে ছুঁতে পারেনি। এক ধরনের সাধারণ বুদ্ধি ওর প্রখর। গোঁড়ামী নেই কিন্তু ধর্মভীরু। পাপ পুণ্যের বোধ আছে যেমন, তেমনি আবার তার তলায় স্নেহ প্রেম মায়া মমতাকে চাপা দিয়ে ফেলে নি। হজ্ করতে যাওয়াটা তার পক্ষে খুবই উপকারী হয়েছে। কত বিচিত্র মানুষ দেখলেন, দেখলেন শরীফ ঘরের মেয়েদের, কই মক্কা কি মদিনায় তো কেউ পর্দা-পুশিদার কথা তোলে নি। মেয়েরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রখর সূর্যালোকে। হজ্ করে ঘুরে এসে গ্রামের লোকেদের চালচলন দেখেই বরং তার মনে হল এটা যেন অন্ধকূপ। তাই ওর মেয়েকে একটু একটু লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার চলাফেরায় বাধা বিশেষ দেননি। একটা বিদ্বান জামাই এনেছেন ধরে। তার মনের ইচ্ছে জামাই এখন তাঁর ব্যবসার ভারটা নিক। কিন্তু সে-কথা বলার ভরসা তাঁর নেই। শফিকুল সম্পর্কে তার মনে অগাধ ভালোবাসাই শুধু নেই, একটা কেমন সম্ভ্রমের ভাবও আছে। যে ছেলে শ্বশুরের পয়সা আছে এবং শ্বশুর আনন্দের সঙ্গে তা দিতে রাজি, একথা জেনেও নিজের ভরসায় দাঁড়াতে চেয়েছে এবং তিন বছর ধরে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে তবুও শ্বশুরের পয়সা নেয়নি, ওকালতি পাশ করে ফিরে এসেছে, সে ছেলেকে আর যাই হোক তার না মুনাসিব কোনও কাজ করতে বলা যায় না। বলা উচিত নয়। আল্লাহ্ যা করেন।

বিলকিস্ জামা কাপড় আর ঢাকাই সাবানের আধখানা গোলা ঘাটে রেখে বসতেই মোছফেকা মাজা বাসনের পাঁজা নিয়ে উঠে গেল। বিলকিসের মন তখনই বেশ ভারি। ফকিরের শোক ভুলতে পারছে না। গত তিন বছর ধরে তার মনে যে কি হয়েছে তার খবর ফকিরই রাখত। ওকে কিছু বলতে হত না। নিজেই বুঝে নিত।

বিবিটির দেল জখম হয়ে উঠছে বলে যেন মনে হচ্ছে? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফকির এই কথা বলেই ফোকলা দাঁতে হাসত। একেবারে দোহি জহুরা বিবির হাল। জহুরা বিবি কে? সে এক উজিরের মেয়ে। বাদশাজাদা বারামকে যে পেয়েও হারিয়েছিল। বিলকিসের ফুটে ওঠা মনের উপর ফকিরের মুখে শোনা জহুরা বিবির কেচ্ছা, বিরহ, বিশেষ করে তার বিলাপ—কান্দেন জহুরা বিবি, এলাহী আলামিন ভাবি—গভীর এক ছাপ ফেলেছিল। ছুটকি ফুটকি যেমন তার আপন, গোলাপ ফুল টগর যেমন তার আপন, জহুরা বিবিও হয়ে উঠেছিল তার অতটাই আপন। কিংবা সে-ই জহুরা বিবি। ফকিরের মুখে মুখে জহুরা বিবির বিলাপ শুনে শুনে তার যেন তাই আশ মিটত না। সেই ফকির আজ চলে গেল জন্মের মত।

কাপড় কাচতে কাচতে থমকে গেল বিলকিস। হাতের উপর-পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিল। উদাসভাবে কিছুক্ষণ পানাভর্তি পুকুরটার দিকে চেয়ে রইল। ওদের দুটো রাজহাঁস পানা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। যেখান দিয়ে যাচ্ছে জলের উপর পানা সরে সরে বেশ কেমন পরিষ্কার একজোড়া সমান্তরাল রাস্তা হয়ে যাচ্ছে। আবার একটু পরেই দুধারের পানা এসে রাস্তাটা কেমন মুছে দিচ্ছে! হঠাৎ ছবির মনে হল, যতদিন লোক বেঁচে থাকে ততদিন জীবনের পানাভর্তি পুকুরে সাঁতার দিয়ে দিয়ে ঐরকম একটা পলকা দাগ রাখে। একটু সরে গেলেই দাগটা মুছে যাবে। যাবে কী? না না, তার জীবন থেকে ফকির মুছে যাবে না।

ঘাটে ছায়া পড়ল। ফুটকি এসেছে। মুখ থমথম। চোখ জবাফুলের মত লাল। প্রথমে ছবির সঙ্গে কথা বলল না। সোজা চান করতে জলের দিকে নেমে গেল। তারপর কি মনে করে শেষ পইঠেটায় বসে পড়ল। তারপর আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ছবি ভাবল

ফকিরের শোকে বুঝি ফুটকি কাঁদছে। ওরও চোখে জল এসে পড়ল। ধীরে ধীরে উঠে ফুটকির গা ঘেঁষে বসল ছবি। তারপর ফুটকির পিঠে হাত রাখতেই ফুটকির পিঠটা কুঁচকে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে ফুটকি বলল, "পিঠি বিজায় ব্যথা। হাত দিসনে।"

"ক্যান্", বিলকিস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "পিঠি ব্যথা হ'লো ক্যান?"

ফুটকি কোনো কথা বলল না। পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিল শুধু। সারা পিঠে কালশিটে। ছবি হতবাক হয়ে গেল। শুধু বিস্ফারিত দুটো চোখ জিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে উঠল।

ফুটকি শুধু বলল, "রাত্তিরি খুব মা'রেছে।"

ভয়ে বিস্ময়ে ছবির গলা দিয়ে আওয়াজ বের হতে যেন চাইছিল না। কোনোমতে সে বলে উঠল "ক্যান, তুই করিছিলি কী?"

"সে আর তোর শুনে কাজ নেই।" বলেই ফুটকি আঁচল টেনে পিঠটা ঢেকে ফেলল।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে থাকল। ফুটকির চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

ফুটকি অনুত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, "এ তো আ'জ নতুন না। পিরায়ই তো মারে। তবে কা'ল আমি দুচার ঘা খাওয়ার পর পাখাটা হাতের থে কা'ড়ে নিইছিলাম। তাইতি আরউ রা'গে যা'য়ে একটা রুল দিয়ে পিটোয়েছে। লাথি মা'রেছে পেটে।"

বিলকিসও শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলল।

"ভাই তোরে এমনি ক'রে মারে? মানুষি মানুষির এমনভাবে মারতি পারে?"

ফুটকি বলল, "এখেনে মানুষ তুই পালি কনে? আমি কি মানুষ? আমি তো মুসলমানের ঘরের বিবি। মেয়ে মানুষ। আমারে পিটোনোর হক্ নাকি আমার খসমের আছে!"

"খালা!"

বিলকিস্ হঠাৎ বেজায় ভয় পেয়ে গেল।

"খালা, তা'লি কি আমারেউ আমিউ—"

ছবি এতই ভয় পেয়ে গেল যে, কথাটা শেষ করতে পারল না।

ফুটকি বলল, "সে তোর নসিবির লিখা আর তোর খসম মিঞার মর্জি। বিবিরি পিটোনোর হক্ সব মিঞারই নাকি আছে। তোর নসিব যদি বড়বুর মত হয় তো বাঁচে যাবি।"

আবার দুজনে চুপ। বিলকিস্ ভেবেছিল আজ বিকেলে গাঙের ঘাটে যাবে। তার গোলাপ-ফুলকে কাল রাতের কথা বলবে। যদিও তেমন কিছু বলার নেইও। ঐ এক শেষ রাত্তিরের সুখটুকু। যা কিনা এখনও ঠোঁটে লেগে আছে তার। তা সে কথা বলতে বিলকিসের হয়তো মুখ ফুটতো না। তবে গোলাপফুলের যা বুদ্ধি! ও হয়তো মুখ দেখেই ধরে ফেলত। কিন্তু এখন ফুটকির পিঠের এই কালশিটের দাগ দেখে ওর সব উৎসাহ উবে গেল। এই ফুটকিও কি ক'বছর কম সুহাগের কথা শুনিয়েছে তাকে? বিলকিসের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। আসলে এই জগতটার সঙ্গে তার কোনো পরিচয়ই ছিল না। জ্ঞান হওয়া ইস্তক ছবি কখনও ওর মাকে কাঁদতে দেখেনি। ওর আব্বাজানকেও কখনো একটা কড়া কথা ওর মাকে বলতে শোনেনি। যে-সব বই পড়েছে, বা কেচ্ছা শুনেছে তাতে অবিশ্যি মেয়েদের অনেক দুঃখ কষ্ট পাওয়ার কথা লেখা আছে. অনেক সময়ই বিলকিসের চোখে জল এসে গিয়েছে। যেমন ইউসুফ-জোলায়খার গল্পে জোলায়খা বিবিকে কি কম দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে ইউসুফের জন্য? জহুরা বিবি কি কম কষ্ট পেয়েছে বারামের জন্য? চন্দ্রাবতী কালুগাজির জন্য? চন্দ্রাবতী-কালু গাজি কি সোনাভান কি পদ্মাবতী, চম্পাবতী এদের কেচ্ছায় যে দুঃখ বা কষ্ট, সে অন্য রকম, সে-সবই তো এশ্‌কের জন্য, বিরহের যন্ত্রণা। নায়কের সঙ্গে নায়িকার, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার মিলন হবার আগে পর্যন্তই যা কিছু ব্যথা, বেদনা মেয়েদের ভোগ করতে হয়। তারপর হাতে হাত কি ঠোঁটে ঠোঁট মিলে গেলেই অথবা কন্যা মিঞার বুকে ভিরমি খেয়ে ঢলে পড়লেই, কাল রাতে যা ওর প্রায় হতে যাচ্ছিল, ছবির ধারণা ছিল, সেইখানেই সব দুঃখের শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ কী? বিলকিসের মনে পড়ল ওর যখন যে কেচ্ছা বা গল্পটা পড়ে বা শুনে ভাল লাগত সেটা ও তার গোলাপফুলকে বলত। একদিন ওর গোলাপফুল শুনে বলেছিল, তোগের সব গল্পেই দেখি হিঁদুর মেয়ে আর মুসলমানের ছাওয়ালের মিদ্যি ভাবভালোবাসা হয়. চটাপট বিয়েও হয়ে যায়, বলি ব্যাপারডা কী? সেদিন বিলকিস গোলাপফুলের এই আচমকা প্রশ্নে বেশ অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, ক্যান্, একথা জিজ্ঞেস কচ্ছিস ক্যান্? টগর বলেছিল, যে সব পণ্ডিতি এই সব গল্প বানায়েছেন তাঁরা খালি গাঁজা খান। হিঁদুর মেয়ে মুসলমানের ছাওয়ালের সঙ্গে নাচতি নাচতি বিয়ে কত্তি যাচ্ছে, এই তুই কখনো দেখিছিস্? মুখ বাঁধে ধরে নিয়ে জাত নষ্ট ক'রে দ্যায়, সিডা আলাদা কথা, কি নষ্ট মেয়ে হয়, তাহলি সিডা হয়তো হতিউ পারে। কিন্তু হিঁদুর মেয়ে মুসলমানের সঙ্গে নিজির ইচ্ছেয় কি বিয়ে পুষতি পারে রে বুকা? তার জা'ত যাবে না! মুসলমান তো দূরির কথা, তুই বামুনির সঙ্গে কায়েতের কি কায়েতের সঙ্গে শুদ্দুরির বিয়েই একবার দিয়ে দ্যাখ না, দ্যাখ না তাগের কেউ ঘরে ন্যায় কিনা? একেবারে একঘরে ক'রে ছা'ড়ে দেবে। হিঁদুর ঘরে সগলের উপরে হ'লো জা'ত। জাতির থে বড় আর কিছু নেই। সেদিন একটা ধাক্কা খেয়েছিল বিলকিস্। এটা যে একটা অসম্ভব ব্যাপার, তাদের জীবনে ঘটে না, কেচ্ছা পড়ে সে-কথা তার কখনোই মনে হয়নি।

যেমন আজ। আজও ঐ রকম একটা ধাক্কা খেল বিলকিস্। ফুটকির পিঠের কালো দাগগুলো তাকে অনভিজ্ঞ কল্পনার সুখস্বপ্ন থেকে ধপাস করে শান বাঁধানো ঘাটের কঠিন মাটিতে আছড়ে ফেলল। তার বরও কি তাকে এই রকম নিষ্ঠুরের মত পিটবে? বিলকিসের মনে নানা ভাবের ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। কাল রাতে ঘরে ঢুকে ফটিককে অঘোরে ঘুমোতে দেখে যত না ভয় যতটা অনিশ্চয়তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ছবি, ঘুম ভেঙে যখন চেয়ে দেখল ওর বর মুগ্ধ চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে যার মানে বুঝতে ওর একটুও অসুবিধে হয়নি। ওর বরের চোখ মুখের চেহারাই বলে দিচ্ছিল যে সে, অন্তত তার চোখ দুটো, ওকে খুবই পছন্দ করছে। তোর সুরত এমনই কো'রে বানায়ে দেবো যে মিঞা তোরে গিলে খাবে। ফুটকির কথা তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল। একেই গিলে খাওয়া বলে কিনা জানে না বিলকিস্। কেমন একটা পাষাণ ভার, সেই ঘুমের ঘোরে থাকা তার বুক থেকে নেমে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য এসে গেল ওর রক্তে। কী একটা বাসনা, একটা প্রত্যাশা জেগে উঠে ওর মন থেকে ভয়ডর সব মুছে ফেলতে লাগল। হঠাৎ ওর কর্তব্যের কথা মনে পড়ল, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কী, সে সম্পর্কে বুড়ো মৌলবীর উপদেশ, পায়ে ধরিয়া ছালাম করিবা। ও ধড়মড় করে উঠে বরের পায়ে হাত দিতে যেতেই লোকটা ওকে বুকে টেনে নিল। বিলকিস্ তখন বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য মরে গিয়েছিল। ওর হৃদ্স্পন্দন ছিল না, ওর শ্বাসপ্রশ্বাস ছিল না, ওর বোধ বুদ্ধি ছিল না, কোনো রকম চেতনাও হযতো না। নসিহতের একটা কথাও ওর মনে ছিল না। না, একটা বোধ ছিল, না হলে ওর ঠোঁটের উপর দুটো ঠোঁটের উষ্ণমধুর একটা চাপ যে পড়ছিল, পড়েছিল, সে স্পর্শ এখনও রয়েছে, এটা সে টের পেল কী করে?

ফকির যখন মরছে, বিলকিসের হৃদয় গভীর শোকে যখন আচ্ছন্ন, ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারা যখন গড়িয়ে পড়ছে, সেই তখনও বিলকিসের ঠোঁটের উপর লোকটার জোরালো ঠোঁট দুটোর চাপ এসে পড়ছিল। তাকে ব্যাকুল, উন্মনা করে তুলছিল। মুহূর্তের মধ্যেই ছবি আবার লজ্জিত হয়ে মাফ চাইছিল ফকিরের কাছে, আল্লাহর কাছে। সে আজ অন্যদিনের মত দাদীর পাশেই বিছানা পেতে ফজরের নামাজ পড়তে বসেছিল। প্রাণপণে নামাজে মন দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই দুটো ডাকাতে ঠোঁটের চাপ! তার উষ্ণতা, তার রোমাঞ্চকর অজানা স্বাদ কেবলই ওকে অস্থির করে তুলছিল। আজ একদম নামাজে মন দিতে পারেনি। এতে কি গুনাহ্ হবে? আল্লাহ্, তুমি মাফ করে দিও। ফটিকের কাছে যাবার জন্য, ওর আলিঙ্গনে ধরা পড়ার জন্য বিলকিসের সমস্ত দেহ, সমস্ত মন আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে কেমন একটা আবেশের ঢল নামছে শরীরে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা পিপাসা ভয়ানক তীব্র হয়ে উঠছিল। সব কাজ ভুলিয়ে দিচ্ছিল।

ফকির, ফকির, ফকির তুমি আমার কোনো অপরাধ নিও না। তুমারে ভোলব না, ভোলব না। তুমি যেখেনেই থাকো সেখেনের থেই দোয়া পাঠিও। খালি আ'জকের দিনডা আমারে মাফ ক'রে দিও। আজ আমার কি যে হচ্ছে আমি জানিনে। বুঝতি পারছিনে। আ'জ আমারে মাফ ক'রো ফকির। আল্লাহ্ তুমি মাফ ক'রো।

আজ সকাল থেকে বিলকিসের মন ফটিক আর ফকির, এই দোটানায় তোলপাড় করছিল। কিন্তু ফুটকির পিঠের দাগড়া দাগড়া কালশিটে বিলকিসকে এখন সব কিছুই ভুলিয়ে দিল। দাউদ ভাই যেমন নিষ্ঠুরভাবে ফুটকিকে মেরেছে, মারে, ওর বরও কি তাকে সেই রকম মারবে? পারবে মারতে ঐ লোকটা যে ওরকম অদ্ভুত চোখে চেয়ে চেয়ে ওকে দেখছিল? আল্লাহ্। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিলকিস্।

ফুটকি নিষ্প্রাণভাবে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলতে লাগল, "আমি কোনো দোষ করি, মারে, তবু না হয় সিডা সহ্য করা গেল। কিন্তু ইডা কী, রাগ হবে অন্য লোকির উপর আর ঝাল ঝাড়বা আমার উপর, ইডা কেমন বিচার! আল্লাহ্।"

বিলকিস্ বলল, "বউ-বিটি জানে?"

ফুটকি আঁতকে উঠল, "না না ছবি, খবরদার, বড় বু য্যানো একথা ঘুণাক্ষরেউ না টের পায়। তা'লি তুই আমার মরামুখ দেখবি। আমি তা'লি পুকুরি ডুবে মরবো। কারুরি কোবিনে ক।"

ফুটকির আর্তস্বর বিলকিসকে বেশ বিচলিত করে তুলল। চোখে জল এসে গেল।

বলল, "আচ্ছা, কব না।"

ফুটকি বলল, "বল, আল্লার কিরে।"

"আল্লার কিরে।"

এতক্ষণে ফুটকির চোখ দিয়ে ঝর ঝর জল ঝরতে লাগল।

বিলকিস্ বলল, "খালা, তোর মনে অ্যাতো ব্যথা, তুই তো কোনো দিন কোস নি।"

ফুটকি বলল, "আমি খসমের সুহাগ পাইনি, ইডা কি বড় মুখ ক'রে কাউরি কওয়ার কথা। তাছাড়া মুসলমানের মেয়েরে তার খসম পিটোবে, ইডা কি কোনো নতুন কথা। পেরথম পেরথম মন মিজাজ খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরতো। তখন পানের থে চুন খসলি দু এক ঘা চড়-চাপড় মা'রতো। পরে আবার ঢালে অ্যামন সুহাগ করতো যে মনের দাগ মুছে যা'তো। আমার ত্যামন

কষ্ট হতো না। তারপর তোর বাবা যেদিন ওরে কারবায়ের থে সরায়ে দেলেন, সেইদিনির থে মারির বিরাম নেই। রাগডা তোগের উপর, ঝালডা ঝাড়তিছে আমার পরে। আমি যে বড়বর বন। কত পাথা যে আমার পিঠি ভাঙেছে, তার আর হিসেব নেই। অ্যাখন তো পাখার বদলে খাটে পিটা শরু হলো। কুথায় গিয়ে যে ঠ্যাকবে, তাই ভাবতিছি।"

"তুই আমাগের বাড়ি আ'সে থাক।" ছবি একটা সমাধান বাতলে দিল।

ফটিক আঁচল দিয়ে চোখ মছে বিলকিসের মখের দিকে চাইল।

বলল, "তার পর?"

ছবি বলল, "তার পর আবার কী? দাউদ ভাই আব্বারে যমের মত ভয় খায়। এ বাড়ি আ'সে তোর গায়ে হাত তোলবে, অ্যাতো সাহস ভাই-এর হবে না।"

ফটিক অত দঃখেও ম্লান হাসল।

বলল, "তুই আর বড় হবি নে! আমি যেদিন তোগের বাড়ি চলে আসব, আমার খসম মিঞাও বেশ সবিধে পা'য়ে যাবে। খালি গটা কতক লোকের সামনে কোনো মতে আমার কানে

আয়েন তালাক, বায়েন তালাক
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরি দিলাম তালাক

এই কথা কডা শনোয়ে দিতি পারলিই হয়ে গ্যালো আমার তালাক। তখন?"

এই জীবনে যে এত জটিলতা আছে বিলকিসের ধারণাই ছিল না। সে একেবারে হতবাক হয়ে কিছক্ষণ বসে থাকল। তারপর ফটিকের জামা কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে সাবান ঘষতে শরু করল। ফটিকর অসহায়তার কথা চিন্তা করে ওর বক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ফটিকর প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারলো না। শধু এটা বঝতে পারল একটা অনিশ্চয়তা, একটা ভয় কাল বোশেখীর মেঘের মত দ্রুতগতিতে ওর মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

॥ ১৪ ॥

কবর খোলার জন্য বাইজদ্দি প্রথমেই ফটিককে ডাকল। কোদালটা তার হাতে দিয়ে বলল, "দলা মিঞা ফকিরির আওলাদ-ওয়ারেশ কেউ নেই। ছাওয়াল বলতিউ আপনি, ওয়ারেশ বলতিউ আপনি। তা আপনিই ছাওয়ালের কাজডা কো'রে দ্যান। এই যে এইখানডায় কবর খোলবো। আপনি আগে তিন কুদাল মাটি উঠোয়ে দ্যান। বাকিডা আমরা কো'রে দিবানে।"

ফকিরের দেহটা জানাজার জন্য রেখে দিয়ে খালেকের কথা মত বাইজদ্দি সবরালি আর ফটিককে ডেকে নিয়ে দ্রুতপদে গোরস্তানে চলে এসেছে। হাজী সাহেবই খালেকের কাছে বলেন যে ফকির বলে গিয়েছে, তার আওলাদ ওয়ারেশ কেউ নেই। ফটিক মিঞাই তার সব। তাই শনে খালেক ফটিককেই কবর খলতে পরামর্শ দিল। গোরস্তানটা গ্রামের একট বাইরে। তিনটে পাশাপাশি গ্রামের ঐ একটাই কবরখানা। বেশ বড়।

আগের রাত্তিরের ঝড় বৃষ্টিতে মাটি বেশ নরম হয়ে আছে। ফটিক বাইজদ্দির দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় বিসমিল্লাহ বলে এক কোপে বেশ খানিকটা মাটি তুলে ফেলল।

আমি খব খশি হইছি বাপ। ফকির হাসতে হাসতে বলল। এই মাত্তর তুমাগের মাদ্রাসার মৌলবী জালালদ্দিন আমারে ক'লো' তুমি জলপানি পাইছ। আল্লার বরকত তুমার উপর ঝ'রে পড়তিছে।

মৌলবী জালালদ্দিন ওদের শেখপর জনিয়ার মাদ্রাসার সেকেনড মৌলবী। ঘাসের পাতায় জল। তার উপর সকালের রোদ পড়েছে। ফকির হাসছে।

ফটিক আরেক কোপে আরও খানিকটা কবরের মাটি তুলল।

ফকিরের জানাজায় লোক নিতান্ত কম হয়নি। ফকিরের মৃত্যুর খবর মখে মখে ছড়িয়ে যেতেই আশপাশের গ্রাম থেকেও কিছ লোক এসে হাজির হয়েছে। গ্রামের ইমাম জানাজার নামাজ শরু করলেন।

নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তা'য়ালা আরবা'য়া তক্‌বীরাতে...

ইমামের সঙ্গে সকলেই এই নিয়েত পাঠ করতে লাগল।

আল্লার উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফের দিকে মখ করিয়া জানাজার নামাজের চারি তক্‌বির পালন করিতে মনস্থ করিলাম।

সকল প্রশংসাই আল্লার উপযক্ত এবং আমাদের নবীর উপর শান্তি ও এই মৃত ব্যক্তির উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

আল্লাহ আক্‌বার।

অতঃপর চার তক্‌বির বিধিমত পালন করার পর ইমাম জানাজার দোয়া পাঠ করতে লাগলেন:

হে আল্লাহ্ আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনপস্থিত, কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ,

পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমস্তকে ক্ষমা কর,

হে আল্লাহ! আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে জীবিত রাখ, তাহাদিগকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত রাখিও এবং যাহাদিগকে মৃত্যু দান কর, তাহাদিগকে ইমানের সহিত মৃত্যু দান করিও,

তোমারই অনুগ্রহ হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।

জানাজার দোয়া শেষ হবার সংগে সংগে দাউদ, বদর গাজী এবং আরও দুজন জওয়ান ছেলে ফকিরের খাটিয়াটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর দ্রুতবেগে গোরস্তানের দিকে রওনা হল।

সকলে মিলে শ্রদ্ধা বজায় রেখে চাপাস্বরে ধ্বনি দিলঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্।

কোদাল তুলে তৃতীয়বার গোরের মাটি খুঁড়ল ফটিক। তারপরই বাইজদ্দি ওর হাত থেকে কোদালটা নিয়ে নিল। তারপর সে আর সবুরালি দক্ষ হাতে অতি দ্রুত কবর খুলতে লাগল। ফটিক এতক্ষণে কবরখানাটা ভালো করে দেখে নিল। বেশ বড়ই জায়গাটা। কয়েকটা আম কাঁঠাল গাছও আছে আবার কোনো কোনো দিকে আগাছার জংগল। কতকগুলো কবরের চারপাশে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কতকগুলো মাটির কবরের ভিটি মাছের পিঠের মত ঈষৎ উঁচু হয়ে আছে। কিছু কিছু কবর আবার ইঁট দিয়ে বাঁধানোও আছে।

দুটো শিয়াল খ্যাক খ্যাক করে ছুটে পালাল।

দ্যাখো ফটিক, তুমার আর হাই মাদ্রাসায় পড়ে কাজ নেই। শেখপুর জুনিয়ার মাদ্রাসার সেকেনড মৌলবী জালালুদ্দিন অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলে উঠলেন। এই জমানায় আর আরবী-ফারসীর কদর কেউ করবে না। এই আমার মতোই হা-অন্ন জো-অন্ন করে ব্যাড়াতি হবে। ইশকুলির পন্ডিত আর মাদ্রাসার মৌলবী, এলেম যতই থাক, এই জামানায় তারা সকলের উপহাসের পাত্র। যদি বিয়ে-শাদী কর, বিবির পরণে ট্যানাউ জুটোতি পাববা না। না জোটে ইজ্জত না জোটে অন্ন। তাই বলি বাপ আর মাদ্রাসা ফাদ্রসা নয়, হেড মৌলবীর বচন ভুলে যাও, আখেরের কথা চিন্তা কর আঠারোখাদার এম-ই ইশকুলি যায়ে তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাও। আমি তারিণী মাস্টারের কাছে চিঠি লিখে দিবানে। তুমার প্রতিভা আছে। তুমার মতো ছেলেরে পালি উবা লুফে নেবে।

নফর এক ধামা নকলদানা ঘাড়ে করে হাঁফাতে হাঁফাতে উপস্থিত হল।

বলল, "উরা সব বেরোয়ে পড়িছে। গিরামডা ঘুরে আসতিছে। কী, তুমাগের কদ্দুর?"

বুক সমান গর্তে দাঁড়িয়ে বাইজদ্দি বলল, "হয়ে গেছে পিবায়। এদিক উদিক যা বাকি আছে তা আমি সজুত কত্তিছি। তুই আর সবুরভাই মিলে চটপট বাঁশগুলো চিরে একটা চাপা তৈরি করে ফ্যাল দিনি। বর্ষা বিষ্টির দিন। মাটি নরম থাকবে। তাই শিয়াল কুকুরি যাতে কবর খুঁড়ে মুর্দা নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া কত্তি না পারে তার জন্যি একেবারে সিন্দুক কবর বানায়ে দিচ্ছি।"

শিয়াল দুটো আবার খ্যাক খ্যাক করে ঝগড়ায় মেতে গেল। নফর একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল। শিয়াল দুটো পালিয়ে গেল।

আঠারোখাদার মিডিল ইংলিশ ইশকুলেই তাকে এক রকম জোর করে ভর্তি করে দিলেন মৌলবী জালালুদ্দিন। আঠারোখাদা এম-ই ইশকুলের হেড মাস্টার তারিণী শিকদের শেখপুর জুনিয়ার মাদ্রাসার সেকেনড মৌলবীর খুব বন্ধু লোক। ফটিক সেকেনড মৌলবীর চিঠি নিয়েই তারিণী শিকদেরের কাছে গিয়েছিল। চিঠিটা পড়ে আর তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়েই তারিণী শিকদের খ্যাক করে উঠেছিলেন।

জলপানি পাইছো, তবে আর কী, হাতির পাঁচ পা দেখিছ।

সেকেনড মৌলবী বলে দিয়েছিলেন তারিণীর চাল চলন ঐ রকম খেঁকুরে। কিন্তু ওর দেল খুব জিন্দা। মৌলবী হঠাৎ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কানের লতির ইংরাজি জানো? ফটিক বলেছিল, না। মৌলবী জালালুদ্দিন বলেছিলেন, লোব্। এল ও বি ই। লোব্। বানান আর মানে মনে রা'খে দিস। কাজে লাগে যাতি পারে।

তারিণী মাস্টার খেঁকিয়ে উঠলেন, জলপানি পায়েছেন! বয়েস কত হ'লো?

ফটিকের গলা শুকিয়ে উঠেছে।

বলল চোদ্দ।

তাহলি বাবা মুসলমানের ছাওয়াল, এই বয়েসে সংসার ধম্ম না করে শিং ভাঙে বাছুরির দলে আবার ভিড়তি আলে ক্যান? ভ্যাড়ার দলে বাছুর পরামাণিক হবার সাধ জাগিছে। অ্যাঁ। জলপানি পায়েছ, সেই জন্যি? বেশ, দেখি লেখাপড়া কদ্দুর শিখিছ।

ফটিকের বুক দুর দুর করতে লাগল।

নফর আর সবুরালি কবরের ভিতর মুর্দা চাপা দেবার একটা চালি বাঁশ কেটে বেশ চটপট বানিয়ে ফেলল। বাইজদ্দি কবরের তলদেশটা এমন সুন্দরভাবে বানালো যেন সেটা একটা বিছানা। উত্তর শিওরে মুর্দার মাথা যেখানে থাকবে সেইখানে মাটি খানিকটা উঁচু করে বাইজদ্দি একটা বালিশের মতও করে রাখল। তারপর উঠে এসে বাঁশের চাপাটা দেখে খুশি হল। তিনজনে গোল হয়ে বসে বিড়ি টানতে লাগল। নফর কয়েক বান্ডিল বিড়ি কিনে এনেছে।

বলো দিন, তারিণী মাস্টার হুংকার ছাড়লেন কানের লতির ইংরাজী কী?

ফটিক বলল, লোব্।

বানান!
ফটিক বলল, এল ও বি ই।
তারিণী মাস্টার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ফটিকের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, শিখোয়ে দিয়েছে কে, জালাল?
ফটিক সত্যি কথাই বলল, জে হা।
শয়তান! রামের ভাই-এর নাম জানো?
ফটিক বলল, লক্ষ্মণ?
তারিণী মাস্টার বললেন, বানান?
ল ক য-এ ক্ষ-ম ফলা আর ণ।
কাঠাকালির আর্যা বল?
ফটিক বলতে শুরু করল,

কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিহ্যে
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিহ্যে
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
বিশ কাঠায় হয় বিঘার প্রমাণ

সংগে সংগে তারিণী মাস্টারের ভাবভঙ্গী বদলে গেল।
নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওরে তোর বাড়ির অবস্থা কেমন? বই পত্তর কিনতি পারবি?
ফটিক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
বুঝিছি। আচ্ছা যা, তোরে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে নিলাম। বইপত্তর যা লাগে জোগাড় করে দেব। কথা দে জলপানি নিয়ে পাশ করবি?
ফটিক এবার কেঁদে ফেলল।
লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মোহম্মদুর রসুলুল্লাহ্।
আওয়াজ শোনা মাত্র ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফটিকের চোখ আবার ঝাপসা হয়ে এসেছে। সকলে তখন মুর্দাকে গোরে নামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জানাজা গোরের পশ্চিম পাড়ে এসে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িযে পড়ল। বাইজদ্দি আর খালেক মুছল্লি গোরের মধ্যে নেমে পড়ল। মুর্দাকে কেবলা-রোখ করে গোরের পশ্চিম কিনারায় আনা হল। ভিতর থেকে খালেক আর বাইজদ্দি মুর্দাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল।
মসজিদের ইমাম সুর করে বলে উঠলেন, "বিসমিল্লা-হে আ'লা মিল্লাতে রসুলিল্লাহ। আল্লার নামের সহিত হজরত রসুলে মকবুল (দঃ)-এর ধর্মের পর নির্ভর করিয়া এই মুর্দাকে গোরে রাখিয়া দিলাম।"
সবাই মিলে এই দোয়াটা তিনবার সুর করে পড়ল। তারপর মুর্দাকে বাইজদ্দি আর খালেকের হাতে তুলে দেওয়া হল। বাইজদ্দি মাথার দিকে ধরল, খালেক পায়ের দিকে। ওরা মুর্দাকে পশ্চিম মুখী করে কাত করে শোয়ালো। বাইজদ্দি উত্তর-শিওরি মাথাটাকে নরম মাটির বালিশে যত্ন করে শুইয়ে দিল। তারপর খালেক আব বাইজদ্দি ফকিরের কাফনে গিরে দেওয়া যত বন্ধন ছিল, সব খুলে দিল। নফর আর সবুরালি বাইজদ্দির ডাকে বাঁশের চাপাটা এনে ওঁর হাতে দিল। খালেক উপরে উঠে গেল। বাইজদ্দি বাঁশের চাপাটা এমন আলতো করে ফকিরের গায়ের উপর চাপিয়ে দিল যেন তার ঘুম না ভাঙে।
বাইজদ্দি উঠে আসার পর গোরে মাটি দেওয়া শুরু হল। এক এক জন এগিয়ে আসছেন কবরের কিনারে, একটা দোয়া পড়ছেন আর তিন মুঠো মাটি কবরে ফেলে সরে যাচ্ছেন।
ফটিকের পালা আসতেই ফটিক এক মুঠো মাটি কবরের পাশ থেকে তুলে নিল।
বাপ, তুমি এখেনে কি কত্তিছ?
ফটিক দোয়া পড়ল, "মিন্‌হা খালাক্‌নাকুম—তোমাকে এই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল"......
তুমারে নিয়ে যে বাপ আঠারোখাদার ইশকুলি হুলুস্থুলু কাণ্ড পড়ে গেছে। তারিণী মাস্টার একটা কাগজ হাতে নিয়ে পাগলের মত চেল্লাছে আমাগের ফটিক জলপানি পায়েছে, আমাগের ফটিক জলপানি পায়েছে। আমাগের ইশকুল জলপানি পায়েছে।
ফটিকের চোখে জল টল টল করছে। সে হাতের মাটি কবরে ফেলে দিল।
সে দ্বিতীয় মুঠো মাটি তুলে নিল।
ভারি গলায় বলল, "অফিহা নুয়ীদোকুম—এই মাটিতেই তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে।"
উরা কচ্ছে, তুমারে উরা আরউ বড় ইশকুলি ভর্তি করে দেবে। ফটিক বাপ আমার বড় হবে। যাও যাও বাপ, এখেনে কী কাঁদ্তিছ, ইশকুলি যাও, ইশকুলি যাও।
ফটিক দ্বিতীয় মুঠোর মাটি কবরে ফেলল। তার চোখ দিয়ে জল নামছে।
সে তৃতীয় মুঠো মাটি তুলে নিল। হাতে একটা ইঁটের টুকরো ঠেকল। সে তা বেছে ফেলে দিয়ে খানিকটা বেশ মোলায়েম মাটি নিয়ে মুঠো ভরে ফেলল।
ধরা-ধরা গলায় সে আবৃত্তি করল, "অমিনহা নুখ্‌রিজোকুম তাহারাতান ওখরা—এবং এই

মাটি থেকেই তোমাকে পুনরায় উত্থিত করা হবে।"

বাপ একটা কথা মনে রাখবা, যে শুধু নিজির তবক্কি নিয়েই মজে থাকে, তারে কেউ বড় বলে না। বড় গাছ সব্বাইরি ছায়া দ্যায়। সুরুজ চাঁদ বড়, তাই তারা সকলের জন্যিই আলো দ্যায়। এই হল বড়গের ব্যবহার। ইরাই হলো বড়। বাপ তুমি যখন বড় হবা এই কথাটা মনে রাখবা। যত বড় হবা তত এই কথাডা চিন্তা করবা। তুমি যা নেচ্ছ তা আবার ফিরোয়ে দেচ্ছো তো, তুমার দেলের কাছে সব সুমায় ইডা জিজ্ঞেস করবা।

ফটিক মাটি ঢাকা কবরটার দিকে চইল। ফকিরকে একটুও দেখতে পেল না। কি ভেবে আকাশের দিকে চাইল। সূর্যের আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ধাঁধালাগা চোখে সে তার হাতের শেষ মুঠো মাটি কবরে, ফকিরের আখেরি বিছানায়, ঢেলে দিয়ে সে দু হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বাহজদ্দি ওর হাতে এক কলসী জল এনে দিয়ে বলল, "ছড়ায়ে দ্যান, ছড়ায়ে দ্যান মিঞা। কবর ঠান্ডা হয়ে যাক। আপনারে খুবই ভালোবাসতেন। আপনার হাতের পানি পালিই কবরের তিষ্টা মিটে যাবেনে।"

ফটিকের চোখ সূর্যের তেজে এখনও ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তবুও সে ঝাপসা ঝাপসা চোখে সারা কবরটা কলসীর জল ঢেলে ঢেলে ভিজিয়ে দিতে লাগল। তার চোখ আরও আরও ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। সে কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না।

॥ ১৫ ॥

বিলকিস ফটিকের কথাটা ভাবতে ভাবতে যখন বাড়িতে ঢুকল তখন দেখল হাজী সাহেব সেই মাত্র গোরস্তান থেকে ফিরেছেন। ঘেমে তাঁর গা শপশপ করছে। মাথার টুপিটা খুলে ফেলছেন। আর ওর মা সব কাজ ফেলে রেখে হাতপাখা দিয়ে আব্বাকে বাতাস করতে লেগেছে। এই দৃশ্য সে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে। আব্বাজান বাইরের থেকে বাড়ি এলেই বউবিবি আর স্থির থাকতে পারে না হাতের কাজ ফেলে পাখা নিয়ে ছুটে যায়, যাবেই।

নয়মোন চাপা স্বরে বললেন "দুটো বড়ির পানি দেখি পিরেনে বাঁধে আনে ফেলিছেন। ন্যান পিরেনডা এখন খুলে ফ্যালেন তো। গায় হাওয়া লাগুক। এট্টু ঠান্ডা হন। তারপরে ঠান্ডা পানি দিয়ে শরবত বানায়ে দিবানে।"

হাজী সাহেব বললেন "আহ্হা তুই আবার পাখা নিয়ে ছুটে আলি ক্যান। সে শয়তানডা গ্যালো কনে? নফরা।"

নয়মোন একটু দুষ্টু হেসে বললেন "ক্যান আমার পাখার হাওয়ায় অন্ধকার বুঝি শরীলডে আর ঠান্ডা হচ্ছে না? নতুন হাতের বাতাস খাবার হাউস চাগিছে বুঝি?"

হাজী সাহেব দেখলেন আশ্চর্য, আসলে নয়মোনের গালে আজও টোল পড়ে। সেই নয়মোন!

হাজী সাহেব নয়মোনের পাখা সমেত হাতখানা খপ করে চেপে ধরে নয়মোনকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন "উপায় থাকলি কি আর হাত গুটোয়ে বসে থাকতাম ভাবিছিস। নিহাত নিজির বিবির নতুন করে আর নিকে করা যায় না তাই। কিন্তু তোর ব্যাপারডা কী? তুই কি আর পুরোনো হবি নে? পাকা হক্তেকী খায়ে রাখিছিস না কী?"

নয়মোন হাসতে হাসতে বলল "করেন কী? ছবি! ছবি! হাতডা ছাড়ে দ্যান। পিরেনডা খোলেন। হাত পা ধুয়ে ন্যান্। শরবতটা আনি নাস্তা দিই। খায়ে একটু জিরান। জামাই গ্যালেন কনে?"

হাজী সাহেব ঘাম-সপসপ জামাটা খুলতে খুলতে বললেন 'ঐ দ্যাখ আসল কথাডাই তোরে কতি ভুলে গিছি। ফটিক-বাপ এ ব্যালায় আর আসবে না। বাড়ি গ্যালো। সেই সন্ধ্যে নাগাদ ফেরবে। বাপের অসুখের কথা শুনে গোরস্তানের থেই সুজা বাড়ি চলে গ্যালো।"

নয়মোন বললেন, "সে কী? নাস্তাউ খায়ে গ্যালো না। কাল রাত্তিরেউ রাগের আমার তেমন ভালো করে খাওয়া হয়নি। তা ন্যান, আপনি হাতে মুখি পানি দিয়ে একটু জিরোয়ে ন্যান। আমি নাস্তাডা আনে দিই।"

ছবি উঠোনের আড়ায় ফটিকের কাচা কাপড়গুলো নেড়ে দিতে দিতে আড়চোখে ওর বাপ মাকে দেখছিল। আর ভাবছিল ফটিকের কথা। ফটিকের পিঠের কালশিটে দাগগুলো দুঃস্বপ্ন নয়, সে-কথা বুঝে গিয়েছে। কিন্তু তার বাপ মায়ের দাম্পত্য জীবনের যে ছবিটা এইমাত্র সে দেখল, যা দেখতে দেখতে সে এতটা বড় হয়েছে, সেটাও তো স্বপ্ন নয়। তবে? ছবি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ওর হিসেব মিলছিল না গোলমালের কারণটা কোথায়? কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। ছবি হাতের ভিজে শাড়িটার জল নিংড়ে নিয়ে আড়ার উপর মেলতে দেবে এমন সময় বাপের মুখে শুনল ফটিক আর বাড়ি ফিরবে না। অন্যমনস্কভাবে শাড়িটা আড়ার উপর ছুঁড়ে দিতেই তা আড়ার বাঁশটার একেবারে গিটের উপর গিয়ে পড়ল। তারপর ছবি শাড়িটার দুটো মুড়ো ধরে যেই টান মেরেছে অমনি ফ্যাস্ করে খানিকটা ফেঁসে গেল।

হায় আল্লা বলে ছবি আর্তনাদ করে উঠল।

নয়মোন পাশ দিয়ে রান্না ঘরে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন।

"ও শাউড়ি, কী হ'লো?"

কাঁদো-কাঁদো ছবি বলল, "বউবিবি, দ্যাখো তুমার আড়ার বাঁশ আমার শাড়িডেরে ক্যামন ফাসায়ে দিলো।"

নয়মোন বললেন, "তাতে কি হয়েছে, আমি বাঁশডারে ব'কে দিবানে। তুমি এখন ভিজে কাপড়ডা ছাড়ো গে দিনি।"

"যাও", ছবি মুখ ব্যাজার করে বলল, "তুমার সব তাতে ঠাট্টা।'

নয়মোন চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, "ও শাউড়ি, কা'ল জামাইর সংগে ভালো ক'রে কথাটথা হইছে তো? ভাব-সাব হইছে তো? জামাই তোরে পছন্দ করিছে তো মণি?"

বিলকিস কেমন একটা অস্ফুট স্বরে "যাও", বলেই মুখটা নামিয়ে ফেলল। নয়মোন মেয়ের থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে তুলে ধরলেন। ছবির চোখ দুটো বোজা। মেয়ের মুখে নির্ভুল শাদির রং ফুটে উঠতে দেখে নয়মোনের সমস্ত অন্তরে একটা সুখের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি হালকা মনে, একবার বললেন, আল্লাহ্‌। তারপর দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন।

॥ ১৬ ॥

হাজী সাহেব রহমান [illegible] কথা শুনতে শুনতে ভুরু কোঁচকালেন। তারপর গড়গড়া টানতে লাগলেন। কোনও জবাব দিলেন না। রহমানও চুপ করে গেল। রহমান হাজী সাহেবের চাচাতো ভাই। চুটকি ফুটকির শ্বশুর। হাজী সাহেব বয়েসে বড় বলেও বটে আর পরিবার ও সমাজের মুরুব্বি বলেও বটে, রহমান তাঁর বড় ভাই-এর কথার উপর কথা বলে না। নিতান্ত [illegible] আজ আবার দাউদের জন্য দরবার করতে এসেছে। বেকার দাউদকে নিয়ে সংসারে খুব অশান্তি হচ্ছে।

নফর দুজনেরই কলকে বদলে দিল। এবং দুজনেই চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন। এই সময়টা [illegible] খুবই অস্বস্তিকর ঠেকে। ওর অভিজ্ঞতায় ও দেখেছে, বড় বড় মানুষগুলো কথাবার্তার মাঝখানে যখন এই রকম দম ধরে থাকে, তখন, সেই সময়টায়, বাড়ির চাকরবাকরদের পক্ষে খুবই সতর্ক হয়ে থাকা দরকার। রাজায় রাজায় যুদ্ধু হলে উলুখাগড়ার যা হয়, একটু এদিক ওদিক হলেই চাকরদেরও সেই অবস্থা ঘটে। তাই নফরালি একেবারে তটস্থ হয়ে ছিল। [illegible] চাইছিল। কিন্তু পারছিল না। আজ আল্লা ওর একটা মনের খায়েশ মিটিয়ে দিয়েছেন। ও আজ তাই ক্ষণে ক্ষণে আসমানে উড়ছিল। ও নামতে চাইছিল না। ও চাইছিল, এখনই রাত্তির নেমে আসুক, হে আল্লাহ্‌, দহ্‌লিজ খালি হয়ে যাক, হাজী সাহেবের গা হাত পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে রেখে নফর আবার ফিরে আসুক দহ্‌লিজে, একেবারে একা, গড়গড়ার তামুক সাজুক নিজের মর্জি মত, তারপর হাজী সাহেবের তাকিয়া হেলান দিয়ে আয়েশ করে তামুক টানতে টানতে ডুবে যাক আজ সকালে ঘটা স্বপ্নের মধ্যে—আল্লাহ্‌, এই খোয়াবটাকে ভেঙে দিয়ো না, আমি না হয় নামাজী হব, শিখে নেবো নামাজ যদি তুমি তাতে সন্তুষ্ট হও, আল্লার কাছে কড়া আর্জি পেশ করল নফরালি—সে আসলে ঐ খোয়াবটার মধ্যেই আবার তাড়াতাড়ি ঢুকে যেতে চাইছিল, তার ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হয়ে ওঠা দেল বারবার একেবারে আসমানে উঠে যাচ্ছিল। এই সময় তার খুব তামাকের তেষ্টা পায়। কিন্তু এমনই বদ্‌নসিব তার, আজই দুই মিঞা তার সামনে শিঙে শিঙ ঠেকানো দুই ম্যাড়ার মত দম ধরে বসে থাকলেন। কতক্ষণ এই রকম থাকেন এখন দ্যাখ।

নফর প্রাণপণে হুজুরে হাজির থাকবার চেষ্টা করছিল। দুই মিঞার মুখের দিকে বারবার চাইছিল। কিন্তু শিঙ ছাড়বার কোনও লক্ষণ সে দেখতে পেল না। ওর চোখে বাইজদ্দির মেয়ে সাকিনার, তার লাইলীর নাকের নোলকটা হঠাৎ হঠাৎ দুলে দুলে উঠছিল। মুখের হাসিটা মুচকি মুচকি ভেসে উঠছিল আর নফর অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। চটকা ভাঙতেই নফর আবার তটস্থ হয়ে উঠছিল। এই টানাপোড়েনে অস্থির হয়ে উঠে সে অবশেষে হাল ছেড়ে সর্বশক্তিমান আল্লার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করে দিল।

আজ মাস নয়েক হল সাকিনা খাতুন, যাকে কিনা নফরের আসমানের হুরী বলেই মনে হয়, তার দেলে এসে আছর করেছে। এবং ওকে ঘায়েল করে দিয়েছে। নিতান্ত ও যদি হাজী সাহেবের পেয়ারের চাকর না হত এবং বাইজদ্দি হাজী সাহেবের নোকরি না করত, তাহলে নফর এ ধাক্কা সামলাতে পারত না। মাইরি, ও মজনুর মত পাগলা হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতো। হাজী সাহেবের হুকুম তামিল করতেই নফর একদিন বাইজদ্দির বাড়ি যায় এবং বাড়ির উঠোনে আচমকা হাজির হয়ে সাকিনা খাতুনকে গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় প'রে এবং

নাকে নোলক দুলিয়ে ভাই বোনেদের সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলতে দ্যাখে। দৃশ্যটা একটা পাগলা ষাঁড়ের মত ওর দেলকে ধাঁ করে গ‍ু‍ঁতিয়ে সেই যে জখম করে দিয়েছে আজও তা মেরামত হল না।

"জে?"

ওঃ কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে! হাজী সাহেবের ডাক শোনা মাত্তর যে সে জবাব দিতে পেরেছে, সেজন্য সে আল্লাকে কৃতজ্ঞতা জানালো। হয় আল্লার না হয় ফকিরের এই দুজনের কারো একটা নেক দোয়া ওর উপর আজ ঝরে পড়ছে বলেই যে বিপদটা অল্পের উপর দিয়ে কেটে গেল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হাজী সাহেব শুধু বললেন, "চিলিম।"

নফর বুঝল মেঘ কাটেনি। তার মানে এখনও ভোগান্তি। হায় আল্লা বলে সে নতুন কল্‌কেয় টিকে ধরাতে বসল।

সাকিনার সঙ্গে নফরের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ আলামখালির রথের আড়ং-এ। যে ব্যাপারীরা হাজী বাড়ির কাঁঠাল কিনেছিল, তাদের নৌকোয় তুলে দেবার জন্য গাড়ি বোঝাই কাঁঠাল নিয়ে নফর আড়ং-এ অর্থাৎ মেলায় এসেছিল। নফরের জোতা ঐরাবতের মত দুটো তেল-চকচকে মোষ দেখে আড়ং শুদ্ধ লোক মুগ্ধ। ছোটখাটো এক ভিড় জমে গেল চারদিকে। বাইজদ্দি এসেছিল অ্যালুমিনির বাসন কিনতে। সাকিনা খাতুন তার ভাই বোনেদের নিয়ে বাপের সঙ্গে এনামেলের বাসন পছন্দ করতে এবং ঐ সঙ্গে রথের আড়ং দেখতে আলামখালি এসেছিল। ওদের গ্রাম থেকে আলামখালি দূর নিতান্ত কম নয়। তা প্রায় ক্রোশখানেক ক্রোশ দেড়েক তো হবেই। নফর দেখল সাকিনা ভয়-ভয় চোখে যমদূতের মত মোষ দুটোকে দেখছে। হঠাৎ যেন নফরের বুকে জোয়ার এসে গেল। সে গাড়ির উপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর বাঁদিকের মোষটার পিঠের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে তার শিঙ দুটো দু হাতে চেপে ধরে দোল খাওয়ার ভঙ্গি করে শিঙের ভিতর দিয়ে গলে মোষটার নাকের সামনে নেমে পড়ল। মোষটা এমন জোরে ফোঁ-ও-স্ করে উঠল যে, সাকিনা এক লাফে বাপের কাছে সরে গেল। নফর আড়চোখে দেখে নিল সাকিনার বিস্ময়ভরা চোখ দুটো তাকে দেখছে। সে তখন আসমানে। সেই দুটো সুন্দর চোখের সঙ্গে নফরেব চোখা-চোখি হল। সাকিনা চোখ নামিয়ে নিল না। নফর মোষ দুটোর দড়ি খুলে গাড়িটা ওদের কাঁধ থেকে নামাল। তারপর অবলীলাক্রমে মোষ দুটোকে চাকার সঙ্গে বেঁধে ব্যাপারীদের খোঁজে পা বাড়াল।

বাইজদ্দি বলল, নফরা শোন্, এখেন থে বাড়ি যাবি তো?

নফর বলল, ক্যান্?

বাইজদ্দি ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বলল, তা'লি তোর গাড়িতি এগের তুলে দিয়ে আমি আঠারোখোদাটা ঘুরে যাতাম। বড় মিঞা এট্‌টা কাজের ভার চাপায়ে দেছেন। অ্যাদ্দুর আলামই যখন, তখন তা'লি কাজডা সা'রেই বাড়ি ফিরি।

নফরের হঠাৎ শিস দিতে ইচ্ছে করছিল।

সে বলল, তা বেশ। তুমি তুমার আড়ং-এর কাজ সারো। আমি ব্যাপারীগের হাতে কাঁঠালগুলো ততক্ষণে বুঝোয়ে দিই।

বাইজদ্দি জিজ্ঞেস করল, কত কাঁঠাল আনিছিস?

নফর বলল, তা হবে পণ তিনেক।

তারপর ফেরা। ওঃ কী সুন্দর একটা খোয়াব! দেড় ক্রোশ রাস্তা কোথা দিয়ে কেটে গেল! এতগুলো দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল!

বাইজদ্দির বাড়ির কাছে গিয়ে হঠাৎ নফরের মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলল। সে গাড়ি না খুলে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ল। তারপর সাকিনার ছোট ভাই বোনগুলোকে একে একে কোলে করে নামিয়ে দিতে লাগল আর তারা ছুটে ছুটে বাড়ি চলে গেল। তারপর কী দুঃসাহস নফরের, সাকিনাকে গাড়ির উপর থেকে তুলে ওর বুকে ধরে রাখল, একটুখানি রাখল, তারপর কী হত কে জানে, কিন্তু হুরীজান এক ধাক্কায় তাকে দূরে ঠেলে দিল, তারপর বাড়ির দিকে দৌড় দেবার আগে নফরকে শাসিয়ে গেল, বাজান বাড়ি আসুক আগে, তারপর তুমার কল্লামির মজাটা টের পাওয়ায়ে দিবানে।

নফর বোবা হয়ে গেল। বোকা হয়ে গেল। ভয় পেল। একটা নিদারুণ কষ্ট তার বুকের মধ্যে হাঁচোড়-পাচোড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা মোষ ফোঁ-ও-স্ করে ওর গালে নিশ্বাস ফেলল। ও চমকে উঠল। তারপর ধরাধরা গলায় বলল, মানুষির মানুষ কিছুতিই বুঝে উঠতি পারে না, বুঝলি? কোনও একটা মোষ আবার ফোঁওওস্ করে উঠল।

নফরের চোখে সেই দিনটা কেবলই ভাসে।

ঐ মেয়ে যে আজ ঘুরে গেল, সে কি অমনি অমনি? নিশ্চয়ই আজ নেক দোয়া পড়েছে। কার দোয়া আবার? ফকিরেরই দোয়া।

গোরস্থানে যাবার পথে আজ যে ঘটনা ঘটেছে নফরের কাছে তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই বিস্ময়কর। খোয়াব খোয়াব। গোটা ব্যাপারটাই যেন তার কাছে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নটায় এমনই একটা জাদু আছে যা লোককে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। যেমন নফরকে করে তুলেছে।

গোরস্থানে হাজির হয়ে কাজকর্মের মধ্যে নফর একটু ধাতস্থ হয়েছিল। কিন্তু হাজী-বাড়িতে ফিরে আসার পর আবার তার চোখে ঘোর লেগেছে। নফরের এখন দুটো সত্তা। একটা সত্তা মধুর এক খোয়াবের দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যেতে চাইছে, ডুবে থাকতে চাইছে। তার অন্য সত্তা সদা সতর্ক হয়ে আছে, কখন মনিবের ডাক তার কানে ঢুকবে তারই জন্য।

সাকিনা খাতুন! আজ সকালে, সে যখন শববাহকদের খাওযাবার জন্য এক ধামা নকলদানা মাথায় করে বাইজদ্দির বাঁশবাগানের ভিতর দিয়ে সোজাসুজি গোরস্থানে রওনা হয়েছিল, তখন সেখানেই সাকিনা বিবির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। নফর একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, অন্য দিনের মত সাকিনা বুঝি আজও পাশ কাটিয়ে যাবে। সেই যে সেই আড়ং-এর সময় সাকিনা বিবিকে সে গাড়ি থেকে কোলে করে নামিয়েছিল আর তার ভাল লাগছিল, খুব সুখ পাচ্ছিল, যে সুখের স্বাদ সে তার আঠারো বছরের জীবনে আর কখনোই পায়নি, কখনোই না, তাই সে সাকিনাকে একটুক্ষণের জন্য এক লহমা বুকে চেপে ধরেছিল, ইচ্ছে করে নয়, আপনিই কেমন ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল, আয় খোদায় মালুম কোনও বদমতলব তার ছিল না, কিন্তু কী তার বদনসিব, সাকিনা খাতুন তার উপর সেজায় নাবাজ হয়ে গেল। ওকে দেখলেই সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

একদিন সাহসে বুক বেঁধে নফর সাকিনার বেশ কাছে চলে গিয়েছিল। আর সাকিনার সে কী মূর্তি! বাপ্! চোখ পাকিয়ে বলেছিল, ছোঁচকা বিলাই! ফের যদি আমার ধারে ঘেঁষিছ, তা'লি বাজানরে সে দিনির কথা কযে দিবানে। বাজান তুমার ঠ্যাং ভাংগে দেবে। কল্লা! বলে মুখ ফিরিয়ে দপদপ করে চলে গেল। তাকে ছোঁচকা বিলাই বলাতে নফরের খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। সে বিড়াল! ছোঁচকা!

"জে?" বলে উত্তর দিয়েই নফর তটস্থ হয়ে বসল।

হাজী সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে ধমক দিলেন, "বলি ঘুম ছাড়া তুমার কি আর কাম নেই?"

"জে না।" নফর থতমত খেয়ে বলল, "আমি তো জাগন্তই আছি।"

"জাগন্তই আছি!" হাজী সাহেব গর্জন করে উঠলেন, "জাগন্তই যদি আছ, তা'লি হঠাৎ জে বলে চিক্কির পা'ড়লে ক্যান্?"

"জে, আপনি যে ডাকলেন?'

"আমি! কী!" হাজী সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন, "আমি তুমারে ডাকিছি। তুমি কোন্ কান দিয়ে শুনলে, তাই কও?"

ঠিক যে ভয়টা করছিল নফর। কিছু একটা গোলমাল ঘটে গিয়েছে। কোথায় ঠিক ধরতে পারছে না। ভয়ে অস্বস্তিতে অপমানে নফরের মনটা কুঁকড়ে গেল। এই শালী সাকিনাব জন্যি, বলেই তওবা তওবা ব'লে আল্লাব কাছে মাফ চেয়ে নিল, তারপর নিতান্ত করুণভাবে ভবিতব্যেব হাতে নিজেকে সঁপে দিযে নফর কবিসে উঠল, আমাব জান মান সবই যাবে।

না, আজ নফবেব নসিব ভাল। এবারও অল্পেব উপর দিয়ে গেল। হাজী সাহেব ফরাশির নলটা মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। নফবের ঘাম দিয়ে জ্বব ছাড়ল। হঠাৎ ও রহমানের উপর বেজায় রেগে গেল। বাড়ি যাও না মিঞা! দেখতিছ যে আজ ডা'ল গলবে না, তবু এখেনে ব'সে থা'কে লোকজনের বিপদ বাড়াও ক্যান্? না, সে আব অন্যমনস্ক হবে না। কিছুতেই না।

বেশ কিছুক্ষণ সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করল। দুই বুড়োর তখনও শিঙে শিং। গুমোট গরম। নফর পাখা দিয়ে হাজী সাহেবকে বাতাস করতে গেল। উনি বললেন, থাক। নফর জিজ্ঞেস করল, চিলিম বদলে দেবে কি না। হাজী সাহেব মাথা নাড়লেন, না। বুঝতে পারল ব্যাপারটা সঙ্গীন। এখন নিজেকে চেতনে না রাখলেই সে ঘোরতর মুসিবতে ফেঁসে যাবে। বেচারী কিছুক্ষণ ইতস্তত করে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে রইল। মুখের উপর মাছি বসছিল। ও প্রবলভাবে হাত নেড়ে তা তাড়াতে লাগল। বেশ চলছিল। মাঝে মধ্যে দুএক ঝলক হাওয়াও গায়ে লাগছিল। নফর ভাবল, জোহরের নামাজের ওখ্ত না এলে আর এই শিং খুলবে বলে মনে হয় না। অতএব ঐ সময়টুকু পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলেই আজকের ফাঁড়াটা কেটে যাবে। নফর দেখল বাড়ির কুঁকড়োটা ক্কক ককর কক ককব ক্কক করে এদিক ওদিক ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দূর থেকে কাতর স্বরে একটু ঘুঘু ডেকে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ ঝাড়ের পিছন থেকে নোলকপরা একটা ছোট্ট মুখ উঁকি মারল। সাকিনা খাতুন। নফর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘু উ উ ঘু উ উ। কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে। নফর অন্য দিনের মতই ভাবল, আজও সাকিনা তাকে একটা যাচ্ছেতাই অপমান করে বাদশাজাদীর মত গুমর দেখিয়ে চলে যাবে। সে শিঁটিয়ে রইল। কিন্তু আজ সাকিনা পালালো না। নফরের মাথার বড় ধামাটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

তারপর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, মাথায় কী?

নফরের বুক ঢিসঢিসানি শুরু হয়েছে। গলাও শুকিয়ে এসেছে।

কোনো রকমে উত্তর দিল, নকলদানা। ওর আওয়াজটা ফ্যাসফেসে লাগল।

নকলদানার কথা শুনে সাকিনার চোখ দুটো লোভে চিকচিক করে উঠল। বলল, তুমার মুখি কী?

মুখি! নফর অবাক হল। মুখি আবার কী, কিছু না।

হাঁ করো দিনি দেখি?

এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ? নফর অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। সে হাঁ করবে কেন? নফর ভাবল, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু দুটো লোভী চকচকে চোখ যেন ওর পা দুটোকে পুঁতে দিয়েছে। সে বাধ্য ছেলের মত হাঁ করল।

সাকিনা বলল, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি নকলদানা চুরি করে খাতি খাতি যাচ্ছ।

অন্য কেউ একথা বললে নফরালি তার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিতো। কিন্তু এই বিচ্ছু মেয়েটার কথায় সে কিছু মনে করল না। ওর উপর রাগতেই পারল না।

সাকিনা বলল, নকলদানা খাতি আমার খুবই ভাল লাগে। কিন্তু দেবে কিডা?

নফর কৃতার্থ হয়ে গেল। ধামাটা মাটিতে নামিয়ে হাঁটুগেড়ে সেই বাঁশবনে বসে পড়ল। তারপর সাকিনাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবা নকলদানা?

সঙ্গে সঙ্গে সাকিনার মুখের ভাব বদলে গেল। তার সারা মুখ দিয়ে লোভ আর অপরিসীম খুশির একটা আভা ফুটে বেরুতে লাগল। নফরের ইচ্ছে করছিল এক ধামা নকলদানাই ওকে খাইয়ে শেষ করে দেয়। কিন্তু এ মুর্দার নকলদানা। আবার যে সে মুর্দা নয়। ফকিরের মুর্দা।

নফর সাকিনাকে আস্তে কাছে টেনে নিল। সাকিনা একটুও বাধা দিল না। নফর সাকিনার দুখানা হাত আলতোভাবে ধরে জোড়া করে দিল। সাকিনার হাতের তালুতে মেহেদির নকশা দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল।

কাঁপা-কাঁপা গলায় নফর বলল, দুই হাত জুড়া ক'রে ধ'রে থাকো। আমি এখন হাত ভরে দিয়ে যাই। তারপর মুর্দা জানাজায় যারা গেছে তাগের দিয়ে থুয়ে যা বাঁচবে, আমি ফিরার সুমায় তুমারে তা দিয়ে যাবানে।

এক খাবলা নকলদানা মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে সাকিনা জিজ্ঞেস করল, ঠিক আসবা তো? দিবা তো? আমি কিন্তু এখেনেই থাকবানে। বুঝিছ না আলি কিন্তু বাজানরে সেদিনির কথা কয়ে দিবানে।

নফর নকলদানার ধামা মাথায় তুলতে তুলতে দেখল সাকিনা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম নকলদানা চিবিয়ে চলেছে। আর চোখ দুটো দিয়ে দুষ্টুমির হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হঠাৎ ওর মাথায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে গেল। সেদিনের ঘটনায় তাহলে সাকিনা কিছুই মনে করেনি। মিছিমিছিই সে ভয় পেয়েছিল? মিছিমিছি সাকিনা খাতুন তাকে ভয় দেখিয়ে চলেছে। ইয়া আল্লা, বলে সে একটা লাফ দেবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু ফকিরের কথা মনে পড়তেই সে সামলে নিল। এ সব তাঁরই দয়া। সে নিঃসন্দেহ। এ তাঁরই মেহেরবানী। তাঁরই নেক দোয়া।

সে তো জানে সাকিনা খাতুনের, তার লাইলীর দেলে তার প্রতি মহব্বৎ পয়দা করার চেষ্টা সে কম করেনি। খালেক মুন্সি নাকি কত রকম সব তাবিজ কবজ জানে, কত রকম মাছায়েল, আমলিয়াত জানে। খালেকের খেদমত সে কি কম করেছে? খুব ভালো করে খালেকের জন্য তামুক সেজে দিয়েছে। ফাই ফরমাশ, যখন খালেক যা কয়েছে অনুগত বান্দার মত তা তামিল করেছে নফর।

খালেক যে তার প্রতিদান দেয়নি, সেটা বলা ভুল হবে। কিন্তু খালেক তার লাইলীর মনে শক্ত মহব্বত পয়দা করার জন্য এমন এমন সব তরিকা বাতলাতো যার কোনোটা হাসিল করাই তার সাধ্যে কুলোতো না। যেমন খালেক মুন্সি তাকে একবার গভীর মহব্বত হাসিল করার জন্য 'ইয়া ওয়াজিদু' নামের খাছিয়াত বাতলে দিয়েছিল। বলেছিল এটা একটা অব্যর্থ আমল। এবং অতি আশ্চর্য ফল দেয়। শুনে নফরালি প্রথমে খুবই উৎসাহ বোধ করেছিল।

খালেক তাকে বলেছিল, লায়লী-মজনু জাতীয় সম্পর্কে অর্থাৎ কিনা প্রগাঢ় মহব্বৎ কায়েম করার জন্য উক্ত পাক ইসেমটি যদি একশ এগারো বার পাঠ করে পানিতে দম করে সেই পানি অভিপ্রেত ব্যক্তিকে অর্থাৎ কিনা লায়লী যদি মজনুর দেলে অথবা মজনু মিঞা যদি লায়লী বিবির দেলে মহব্বৎ কায়েম করতে চায় তবে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে লায়লী মজনুকে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মজনু মিঞা লায়লী বিবিকে পান করায় তবে উভয়ের মধ্যে প্রেমের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

ব্যাপারটার মধ্যে এত ফৈজৎ দেখে নফরের উৎসাহ একটু কমে এসেছিল। নফর দুটো অসুবিধেয় পড়েছিল। প্রথমত পাক ইসেম কাকে বলে, কীভাবেই বা তা আমল করতে হয়, পানিতে দম করাই বা কী জিনিস এসব সে কিছুই জানে না। তা বলে সে যে অপদার্থ, এটা মনে করা খুব ভুল হবে। সে যেমন কলকে সাজতে পারে, সত্যিই তেমন গুণী এদিকে খুব কমই আছে। মেন্দা সাহেব একবার হাজী-বাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন। ভোট না ফোট, ঐ যে কী বলে তা চাইতে। দুদণ্ড মাত্র বসেছিলেন। ওর মধ্যেই তামাক সেজে দিয়েছিল সে। নফরের সাজা তামাক খেয়ে মেন্দা মিঞা এমনই মুগ্ধ যে ওকে ভাগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। ও গোরু মোষের যত্ন জানে। গাড়ি খুবই ভালো চালায়। নফর গাড়োয়ানি না করলে হাজী সাহেব মেয়েদের কোথাও পাঠাতে ভরসা পান না। কিন্তু ও নামাজ জানে না। কোরান মজিদ, হাদিস, ইসলামী আদব তরবিয়ত কিছুই জানে না। অতএব সে খালেকের বাতলে দেওয়া 'ইয়া ওয়াজিদু' এই

পাক ইসেমটি একশ এগারো বার পাঠ করে পানিতে দম করার কায়দা যে জানবে না, এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই তো গেল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যাটাও তুচ্ছ করার নয়। ধরা যাক খালেক মুছল্লি যেমন যেমন বলে গিয়েছিল, সেই ভাবেই সব ক্রিয়াকর্ম ঠিকঠাক পালন করে ও পানিতে দম করল, তারপর? তারপর সেই পানি ঐ বিচ্ছু মেয়েটাকে খাওয়াতে পারত নফর? অ-সম্ভব! ও নিজেই মাথা নাড়ল।

কিন্তু ফকির কত সহজে এত বড় একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেল! পানিতে দম করে সেই পানি তার লায়লীকে খাওয়াতে লাগল না, বশীকরণের তাবিজ লিখে সাকিনার বুকে নিদ্রিত অবস্থায় রেখে আসতে হল না। খালেক এই রকম একটা অব্যর্থ আমলের সন্ধানও তাকে দিয়েছিল। বলেছিল, এইটা করতে পারলে অভিপ্রেত ব্যক্তি অর্থাৎ কিনা যার মহব্বত মনে মনে সে চাইছে, যতই অবাধ্য সে হোক বা তার দেল যতই কঠিন হোক খোদার মর্জি ঘুম ভেঙে উঠলেই সে আমলকারীর বাধ্য হয়ে যাবে। তাবিজের একটা নকশাও খালেক তাকে করে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও মুশকিল। নফর লেখাপড়া জানে না। আর তাবিজের উপরে তার নিজের নাম এবং নিচে তার অভিপ্রেত ব্যক্তির অর্থাৎ সাকিনার অর্থাৎ কিনা যাকে বশীভূত করতে চাইছে তার নামটা লিখতে হবে যে। অবিশ্যি অন্য কাউকে দিয়ে, হয় খালেক নয় দাউদ ভাই যে কোনো একজনকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই চলত। কিন্তু সাকিনার নাম সে মরে গেলেও কাউকে বলবে না। তাই বশীকরণের তাবিজের চেষ্টা তাকে ছাড়তে হয়েছিল। আর তা ছাড়া নিদ্রিত অবস্থায় তাবিজ পরানোর মানে খালেক যা বলেছিল, তাতেই নফরের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। বলে কি অভিপ্রেত ব্যক্তি মানে সাকিনা—অবিশ্যি সাকিনার নাম খালেককে বলেনি, কেননা খালেক বাইর্জাদ্দির বন্ধু,—যখন ঘুমুচ্ছে সেই তখন তার ঘরে ঢুকে চুপিসাড়ে তার বুকের কাপড় তুলে এই তাবিজটা এমন আলতোভাবে সেখানে রেখে আসতে হবে যে তাবিজটা গায় ঠেকলে সে যেন টের না পায়। কিন্তু খবরদার খবরদার, খালেক ওর মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য একটা কিতাব বার করে তার থেকে পড়ে শুনিয়েছিল, অভিপ্রেত ব্যক্তি যেন ইহার বিন্দু বিসর্গও টের না পায়, তাহা হইলে ফল একেবারে উল্টা হইয়া যাইবে। এবং অভিপ্রেত ব্যক্তি ও তাহার বাড়ির লোকের হস্তে আমলকারীর লাঞ্ছনার কিছু আর বাকি থাকিবে না, মুসিবত বাড়িয়া যাইবে, থানা পুলিশে টানাটানি এমন কি জান যাইবারও আশংকা থাকিবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে আমলকারীকে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতঃ কৌশলে কাজ হাসিল করিতে হইবে। কিতাবখানা যে কী, তাও খালেক অত্যন্ত হতাশপ্রাণ এক নবীন মাশুক নফরকে পড়ে শুনিয়েছিলঃ বর্ণিত কিতাবখানি মুজাররাব তাবিজ ও নেক আমলিয়াত সম্বলিত। ইহাতে বুজুর্গানে দীন কর্তৃক পরীক্ষিত বহু তদবীর ও অসংখ্য আমল রহিয়াছে, দোয়া-দরুদ, অফিজা-কালাম যাহা আমাদের পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছে, উহাও অত্র পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

অতঃপর এই কিতাব এবং খালেক সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বাড়লেও তার পক্ষে ঐ কিতাব বর্ণিত অব্যর্থ আমল কৌশলে হাসিল করা আর হয়ে ওঠেনি। কোনো চেষ্টাই সে করেনি। পাগল না কি! জিবন্ ছাড়া কি আর কারো পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব?

অথচ ফকিরকে দ্যাখো। হাজী বাড়ি এলো, মরলো, গোরস্থানে চলে গেল। তাই না নকলদানার ধামা মাথায় করে শববাহকদের মিষ্টিমুখ করাবার জন্য বাইর্জাদ্দির বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে তাকে কোনাকুনি ছুটতে হয়েছিল গোরস্থানে আর তাই না—

বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে তার একেবারে গা ঘেঁষে বসে একটা নোলকপরা লোভী মুখ অনবরত নকলদানা চিবিয়ে খাচ্ছিল। অভিপ্রেত ব্যক্তির মুখ বিরামহীন চলার সংগে সংগে বেশ একটা তৃপ্তির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যার আভা নফরের চোখে মুখেও উপচে এসে পড়েছিল। সে গভীরভাবে তলিয়ে গেল খোয়াবে। আত্মহারা, অতিশয় তৃপ্ত নফর হাজী সাহেবের দহলিজের খুঁটি হেলান দিয়ে ফাঁকা উঠোনের দিকে চেয়ে ভূতে পাওয়া মানুষের মত মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

হাজী সাহেব ডাকলেন, "নফর।"

নফর খুব আস্তে, যেন বহু দূর থেকে, মোলায়েম স্বরে জবাব দিল, "জ্বে"।

মিচকি হাসি তখনও তার সারা মুখে ছড়ানো। সে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে বসে খালি ধামাটার দিকে চেয়ে নোলক পরা মুখটাকে তখন বলছে, নকলদানা তুমার অ্যাতো ভালো লাগে তা আমারে কও না ক্যান?

তুমারি কলি কি আমার আর দুখান হাত বেরোবে? সাকিনা খিক্-খিক্-খিক-খিক করে হাসছে। নফরও হাসছে।

হাজী সাহেব ডাকলেন, "নফর, নফরা?"

নফর মুচকি মুচকি হাসছে।

সবই ফকিরির দয়া। এনারাই আসল বুজুর্গ। আল্লা তুমি ফকিরির কবরের আজাব দূর করে দ্যাও। নফর আল্লার কাছে জোর তদবির করল।

নফর শুনল হাজী সাহেব স্বপ্নে তাকে ডাকছেন, নফর! এই নফরা!

নফর ঘোর লাগা অবস্থায় মুচকি মুচকি হেসেই চলেছে। অস্ফুট কণ্ঠে নফর উত্তর

দিল, “জে?”

ধামাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নফর নোলকপরা মেয়েটাকে বলছে, না, তুমার আর দুখান হাত গজাবার দরকার হতো না।

সাকিনার মেহেদী-মাখা হাত দুখান টেনে নিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে নফর বলছে, এই সোন্দর হাত দুটোই আমি নকল দানা দিয়ে ভ'রে দিতি পাত্তাম।

“নফরা!”

সাকিনার চোখ চকচক করে উঠল। বলল, সত্যি?

নফর হাজী সাহেবের ডাকে জড়ানো গলায় উত্তর দিল, “জে?”

সে তখনও মিচকি মিচকি হাসছে। খুঁটি হেলান দিয়ে পরিতৃপ্ত একটা উঠতি যৌবন সুখ খাচ্ছে। কেবলই সুখ খেয়ে চলেছে।

প্রথম অবাক হলেন রহমান। দেখলেন, নফর এমনভাবে বসে আছে যে দেখলেই মনে হয়, সে এ জগতে নেই। খালি মিটি মিটি হাসছে ব্যাটা। বকছে বিড় বিড় করে।

সত্যি তুমি আমার হাত ভ'রে নকলদানা দেবা?

খোদা কসম, দেবো।

আমার গা ছুঁয়ে কও।

ফকির, ফকির! কী মেহেরবান তুমি। আল্লা তুমি ওর কববের সব আজাব দূর করে দ্যাও। যদি চাও, যদি তুমি খুশি হও, আমিউ না হয় তালি নামাজ শেখবো?

“নফ্‌রা আ।”

“জে।”

এই দ্যাখ তুমার গা ছুলাম। ইবার কচ্ছি তুমার মুঠো নকলদানায় ভ'রে দেব। দেব, দেব। ক্যামন ইবার তো বিশ্বেস হ'লো।

হাজী সাহেব নফরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নফর মিটি মিটি হাসছে। ওর চোখে ঘোর। নোলক পরা মেয়েটা তখনও ওর চোখের সামনে অনবরত নকলদানা চিবিয়ে চলেছে। ব্যাটা কি নেশা করছে না কী? এ রকম তো কখনও করে না। দেখি, তুমার হাত দেখি। সাকিনা দুহাতে নফরের পুরুষ্টু হাতের চেটো দুটো টেনে নিল। ওরে! বড্ড চালাক তো?

ফকির, ফকির! এবার নফরের বুকের মধ্যে প্রবল একটা অস্বস্তি ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল।

আমার হাতের মুঠো তো ছোট্ট, এই টুকুনি। ওতি অর কডা ধরবে? খালি ফাঁকি দিবার তাল। তুমার হাতের মুঠো বড়। তুমার হাতের মাপে দিতি হবে কিন্তু।

ফকিরের জন্য এতক্ষণ পরে নফরের কেমন কান্না পেতে লাগল। ওর চোখ ভিজে হয়ে এল। অনেক দিয়েছে ফকির তাকে। অনেক। আল্লা তুমি ওরে দে'খো।

নফরের কান ধরে হাজী সাহেব জোরে টান দিতেই নফর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। ভয়ে ভয়ে বলল, “জে!” ও আর কান্না চেপে রাখতে পারছিল না।

হাজী সাহেব গরম হয়ে বললেন, “জে! কানের ফুটো দুটো কি মোম গলায়ে বন্ধ ক'রে থুইছো। জে! মিঞা কনে ছেলেন অ্যাতক্ষণ। অ্যাঁ বলি কাত্তিছিলি কী? ডা'কে ডা'কে সাড়া পাইনে!”

নফর আর চাপতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেই দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। তারপর একটানা আর্তস্বরে ডুকরে যেতে লাগল, “ফকির, ফকির, ফকির।”

অপ্রস্তুত হাজী সাহেব ওর কানটা তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন, তারপর নফরের কেঁপে কেঁপে ওঠা চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলেন। নফরের ফকির, ফকির, ফকির, কান্নায় ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর তাঁকেও কেমন উন্মনা করে তুলল। আল্লাহ্‌ বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর উদাসভাবে খালি দাড়িতে হাত বুলিয়ে চললেন।

॥ ১৭ ॥

ঢেঁকিতে ঢেকুস্‌-ঢেকুস্‌ পাড় দিচ্ছিল চাঁদবিবি। আর নছিফা ঢেঁকির সামনে বসে বসে ঢেঁকির নাদনাটা ওঠানামা করার ফাঁকে ফাঁকেই বিদ্যুৎগতিতে তার হাতটা ঢেঁকির গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে ধানগুলো আলায়ে দিচ্ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই, মানে হাত ঢোকাবার আন্দাজে একটু হেরফের ঘটলেই জখম। নছিফার এক পাশে সেদ্ধ-শুকনো ধানভর্তি ধামা, আর একটা ধামা খালি, যার ধান এই একটু আগেই ঢালা হয়ে গিয়েছে ঢেঁকির নোটে, যার উপর ঢেকুস্‌-ঢেকুস্‌ লাথি খাওয়া ঢেঁকির নাদনাটা মুহুর্মুহু মাথাটা তুলেই আছড়ে এসে পড়ছে। নছিফার বাঁ-হাতের কাছে একটা কুলো। তাতে খানিকটা চাল আর কুঁড়ো মেশামেশি করে আছে। একটু আগেই আলটাচ্ছিল নছিফা। এখন আবার আলাতে বসেছে। ঢেকুস্‌-কুস্‌ ঢেকুস্‌-কুস্‌। এক আড়া-বাঁশের উপর হাতের ভর দিয়ে চাঁদবিবি ঠিক তাল বজায় রেখে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চলেছে।

ঘামে তার শরীর গলগল করে ঘামছে। আঁচল দিয়ে বারবার মুখ মুছে-মুছে আঁচলটিকে ভিজিয়ে ফেলেছে। পানির তিষ্টায় বুক খাঁ খাঁ করছে। তারপর যে-ভয়টা করছিল এতক্ষণ, যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপণে আল্লার কাছে মানত করছিল, সেই ভয়টাকে আর এড়াতে পারল না। ব্যাথাটা শুরু হল। বেশ কিছুকাল থেকেই চাঁদবিবি লক্ষ্য করছিল, কিছুক্ষণ একটানা ঢেঁকিপাড় দিতে শুরু করলেই ওর তলপেটের একটা শিরায় টান ধরে। যন্ত্রণা শুরু হয়। আগে অল্প হত, এখন ক্রমশই বাড়ছে।

ঢেকুস্-কুস্ ঢে-কুস্-কুস্ ঢেকু-স্-কুস্।

চাঁদবিবি আঁচল দিয়ে মুখ মুছল, পা-টা বদলে নিল। তারপর ঢেঁকির গায়ে তালে তালে পা ফেলতে লাগল। চাঁদবিবির দুটো হাত ভাঁজ করে আড়াবাঁশের উপর ভর দেওয়া। বাঁশের উপর কনুইএর ধাক্কা মেরে শরীরটাকে তুলছে চাঁদবিবি আর সেই জোরে পা ফেলছে ঢেঁকির গায়ে। পিঠটা আদুড় হয়ে গিয়েছে। থিক থিক করছে ঘামাছি। মাঝে মাঝে পুটুস পুটুস ঘামাচি গালতে গালতে চাঁদবিবির মনে হয় ওটা যেন ব্যাঙের গা।

ঢেকুস্-কুস্ ঢেকুস্-কুস্ ঢেকুস্-কুস্।

ঢেঁকির নাদনা এসে পড়ছে ঢেঁকির নোটে। গর্তে। নোটের ধান এদিক ওদিক ছিটকে যাচ্ছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর আশ্চর্য তৎপরতায় নছিফাবিবি হাত দিয়ে ঠেলে গুছিয়ে ফেলছে। নছিফা ঢেঁকির নষ্টামি জানে, তাই যথেষ্ট সতর্কতা এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ছিটকে-যাওয়া ধান-গুলোকে আবার নোটের মধ্যে এনে জড় করে দিচ্ছে। একটু হেরফের হলেই খুনে নাদনাটা গদাম করে এসে পড়বে হাতের উপরে, যাবে হাতের দফা গয়া হয়ে। নছিফাবিবি তা ভালোই জানে।

চাঁদবিবি পাড় বন্ধ করল। ঘাম মুছল।

বলল, "নছি এট্টু পানি দে। শরীলডেয় জুত লাগতিছে না।"

নছিফা ভয় পেয়ে গেল। আজ দশ আড়ি ধান অন্তত ভানতেই হবে। তেলিপাড়ার পেরমথো তেলির বউ কাল কি যেন বেরতো করবে, আজ সন্ধ্যের মধ্যে তার চাল চাই-ই চাই। এখনই যদি চান-ভাবি বলে যে শরীর ভালো না তবেই তো চিত্তির। নছিফা এমনি খুবই খাটতে পাবে, কিন্তু পারতপক্ষে ঢেঁকিতে উঠতে চায় না। তার একটা কারণ আছে। তার খসম। প্রতি রাত্রে তার খসম তার হক্ আদায় করতে চায়। হায়েজের দিনগুলোতে পর্যন্ত সে তার বিবিদের রেহাই দিতে চায় না। হায়েজের খুন প্রতিমাসে জারি হবার সময় হলে তারপর ক'দিন আর অশান্তির শেষ থাকে না। যদিও তার তিন বিবি, কিন্তু তাতেও তার ক্ষিধে মেটে না। বিবিদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি অসুখ বিসুখ হলেও পার পাওয়া যায় না। বলে, ওসব তোদের ছুঁতো, বদমাইসি। বলে, যে বিবি খসমের হক্ পুরো করতে আপত্তি জানায় সে জাহান্নামী হবে। অতএব তিন বিবির গর্ভ প্রায় সময়েই ভরাভর্তি থাকে। নছিফার সন্তান জন্মায় মরে। তার কিন্তু বিশ্রাম নেই।

নছিফা সেই কারণেই ঢেঁকি পাড় দিতে চায় না। কেননা ঢেঁকিতে পাড় দিতে থাকলে তার তলপেটের নিচে এত ব্যথা হয় আজকাল যে স্বামীসঙ্গ তখন তার কাছে বিভীষিকার মত ঠেকে। সে তার খসমের কবলে পড়ে কাতরায়, ক'কায়, কাঁদে। রেহাই দেবার জন্য কত মিনতি করে ; কিন্তু কে শোনে? আল্লার কাছে নালিশ জানানো, তাও সাহস হয় না, সেও নাকি গুনাহ্।

নছিফা মাটির কলসী থেকে কলাই-চটা একটা বাটিতে পানি ঢেলে চাঁদবিবিকে খেতে দিল। পানিটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিতেই নছিফা ওর মুখের দিকে চাইল। তেমন কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন এখনও চাঁদবিবির মুখে ফুটে ওঠেনি।

আশ্বস্ত হয়ে নছিফা বলল, "চান-ভাবি, এট্টু আলাতামুক খাবা?"

চাঁদবিবি খুশি হয়ে বলল, "আনিছিস নাকি, তা'লি দে।"

নছিফা খানিকটা তামাকের পাতা ছিঁড়ে একটু চুন লাগিয়ে চাঁদবিবির হাতে দিল। সে বেশ করে সেটা ডলে নিয়ে জিভের নিচে ধরে রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ জলে ভরে গেল। ঢেঁকশালের বাইরে গিয়ে চাঁদবিবি পিচিৎ করে পিক্ ফেলে এল। এতক্ষণে মাথাটা বেশ চিন্-চিন্ করতে লেগেছে। শরীরে ফের বেশ একটা টন্কো টন্কো ভাব। চাঁদবিবি ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করল। ঢেকুস্-কুস্ ঢেকুস্-কুস্।

দু'আড়ি ধান ভেনে চাঁদবিবি বলল, "নছি, তুই ওগুলো আল্টাতি থাক। আমি আসতিছি। একটু পাকের জুগাড় ক'রে আসি। ফটিকির বাপ তো বাড়ি আলিই খাতি চায়। কিন্তু খাওয়াব কী, তাই কদিনি। ঘরে নেই চাল। বাজারে ত্যাল আক্রা, ফটিকির বাপ ত্যাল আনা ছাড়ে দেছে। কতি গেলি ঝ্যান্ মাত্তি আসে। আমার হয়েছে জ্বালা। শরীল খারাপ শরীল খারাপ ক'রে বিয়েন ব্যালা বেরোয়ে গ্যালো। কলাম, শরীল খারাপ তা বেরোচ্ছেন ক্যান্। তা কলেন কি, কাল রাতি অ্যামন বিষ্টিডে হ'লো, দক্ষিণির মাঠটায় জো হয়েছে। যাই, একটা চাষ দিয়ে রা'খে আসি। দু'কানি জমি চষতি কতক্ষণ সুমায়ই বা লাগবে। ঘরে খুদ আছে, গুটা কতক কদুও ধরিছে। খুদগুলো বা'ছে রা'খে আসি। বাড়ি আলি খুদ আর কদু দিয়ে জাউ রাঁধে দিবানে। তুই কুটা চা'লগুলো আল্টায়ে রাখ।"

নছিফা ঢেঁকির গড়া থেকে তুষ সমেত চালগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখছিল। এর

পরে কুলোয় তুলে আলটাবে। তাতে তুষগুলো আলাদা হয়ে লাল-লাল আকাঁড়া চাল বেরিয়ে পড়বে। তারপর সে আকাঁড়া চালগুলো ধামা ভর্তি করে একপাশে রেখে দেবে। আর একপাশে ফেলে রাখবে তুষ। এরপর সব ধান ভানা হয়ে গেলে তারপর ওরা চাল কাঁড়াতে বসবে। কাঁড়ানো হয়ে গেলে, কুলোয় করে দুজনে ঝেড়ে ঝেড়ে কুঁড়ো বের করে একেবারে ঝকঝকে দানা দানা চাল আলাদা করে ফেলবে। তখন যে কী সুন্দর গন্ধ ওঠে চালের!

"চান্-ভাবি?"

নছিফার ডাক শুনে চাঁদবিবি দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দিয়েই যেন জিজ্ঞেস করল, কী?

"চান্-ভাবি?" একটু ইতস্তত করে নছিফা বলল, 'আমারে এটটা কদু দিবা? আমাগের বাড়িতিউ আজ কিছু রান্তি কিছু নেই। তুমার কাছ থে কদুর বিচি নিয়ে যায়ে গুয়ালের পাশে পুঁতে দিছিলাম। খুব সোমথ গাছ হইছিলো গো ভাবি। আর কত ডুগা! গুয়ালের চালখানারে য্যান একেবারে সুহাগ দিয়ে ঢাকে রাখছিলো। য্যাতো কথা বড়োবাবি ছোটবিবির কলাম, তুমরা বাড়িতি থাকতিছ আমি ভারা ভানে বেড়াই গছগাছ দ্যাখো নজর রাখো, ছ্যাগলে গোবুতি মুড়োয়ে না ফ্যালে। তা কার কথা কিডা শোনে? ওরা তো সব রাজরানী আর আমি তো ভারা ভানানী ওগের গতর ছুরতের দাম কত? কদিন আগে ভারা ভানে বাড়িতি গিয়ে দেখি সব সাফ। ছোটবিবির পিয়ারের খাসী তারে শেষ করে রাখিছে। সতীন নিয়ে ঘর করা, সে যে কী জ্বালাগো চান ভাবি তা বলে বুঝোনো যায় না। জানে আমার দেল আর জানে খোদা।"

নছিফার মুখ-চোখ মলিন হয়ে এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো। চাঁদবিবির এই সব সময় খুব মন টনটন করে। নছিফা ওর মেয়ের বয়সী। আহা! ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

ধরা ধরা গলায় বলে, 'দিবানে দিবানে। কদুর জন্যি তুই ভাবিস নে। যাওয়ার সুময় নিয়ে যাস।'

নছিফার এই সব সময় চাঁদবিবির বাঁদী হয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। না, তাহলেও হয়ত চান-ভাবির ঋণ সে শোধ দিতে পারবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে যে সব অপরাধবোধ সে প্রাণপণ চেষ্টায় মনের গহনে পাথর তলায় পুঁতে রেখেছে যত অবিচার করেছে চান-ভাবির প্রতি যত ঠকিয়েছে তাকে তার সেই সব অপরাধগুলো পাথর তলায় ভুড় ভুড় করতে থাকে ভেসে উঠতে চায় উপরে। আর সে মনের ভিতরে এইসব স্মৃতি পুঁতে ফেলতে শুরু করে, পুঁততে পুঁততে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

নছিফা কুলোটাকে জোরে চালিয়ে চাল আলটাতে থাকে। তার খিদে পায়। সে কুলোর উপর থেকে এক খাবলা আকাঁড়া চাল খপ করে তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দেয়। তারপর ফাঁকা ঢেঁকিশালে বসে এক মনে চিবুতে থাকে। ধীরে ধীরে এই শক্ত দানাগুলো তার সবল দাঁতের চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয় তারপর তার ভিতর থেকে এক রকম আঠা আঠা রস বেরুতে থাকে। কাঁচা চালের একটা অপূর্ব গন্ধ তার মুখের ভিতরে ভুরভুর করতে থাকে। আশ্চর্য একটা স্বাদ তার দাঁতে তার জিভে, তার টাকরায় লাফ লাফ করে বেড়াতে থাকে। কাঁচা চালের স্বাদ রসে তার লালায় তার মুখে চোখে একটা তৃপ্তির আমেজ সৃষ্টি করে তোলে। কুলোর থেকে আরেক খাবলা তৃপ্তির উপাদান সে তার মুখের ভিতর ছুঁড়ে দেয়। চান্-ভাবি নেই। এই তার খিদে মিটিয়ে নেবার পরম সুযোগ। সে উত্তরোত্তর তৃপ্ত হয়। খুশি হয়। আর তক্ষুনি তার হিসেবের কথা মনে পড়ে। পাঁচ সের চাল বাইচে ভানলে চার সের গেরস্তের এক সের ভানানীর। কিন্তু গেরস্তের বাড়ি গিয়ে ভারা ভানলে এগারো সের চালে দশ সের গেরস্তর, এক সের ওদের অর্থাৎ ভানানীদের। নছিফা তাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে বাইচের ভানার কাজই জোগাড় করে আনে। গেরস্তের বাড়ি গিয়ে ভারা ভানলে একটা সুবিধে এই যে ধান সেদ্ধ শুকনোর ঝামেলা সবই গেরস্তের ওরা শুধু গিয়ে ভেনে দিয়ে আসবে। কিন্তু বাইচের ভানতে দিলে গেরস্ত শুধু আড়ি মেপে ধান দেবে আবার আড়ি মেপে চাল বুঝে নেবে। এতে অবিশ্যি নছিফাদের খাটুনি খুবই বেশী। ধান ঝাড়ো পরিষ্কার করো, সেদ্ধ করো শুকনো করে ন্যাও তারপর ভানো। কিন্তু মজুরী ডবল আর খুদটা কুঁড়োটা, তুষটা ফাউ। কিন্তু বাইচের ধান ভানার আরও একটা নিগূঢ় কারণ আছে নছিফার। এবং সে-কথা মনে পড়লেই তার বিবেক তার বুকে কুট করে একটা কামড় মারে। সে চাল চুরি করে। কিন্তু গেরস্তকে ফাঁকি দেয় না, দেয় তার চান্ ভাবীকে। তাকেই সে ওজনে ঠকায়। যে চান্-ভাবি তাকে এতো দেয়, এতো উপকার করে যার বাঁদী হয়ে থাকতে তার মাঝে মাঝে সাধ জাগে, সে তাকেই ঠকায়। সে কষ্ট পায় ধিক্কার দেয় নিজেকে। পরমুহূর্তেই একপাল ক্ষুধার্ত মুখ তার চোখে ভেসে ওঠে। সে আর সামলাতে পারে না নিজেকে। মাঝে মাঝে তার কান্না পায়। চান্-ভাবির পেট সে মারতে চায় না। কিন্তু তার পেট যে তাহলে বাঁচে না। আল্লাকে সে সাক্ষী মানে, দেখায়, জিজ্ঞেস করে বলো আমার আর কী করার আছে? বলো বলো। তারপর সে বেশ কয়েক খাবলা চাল তার পেটকোমরে বেঁধে ফ্যালে।

গোয়ালের চাল থেকে কদু পাড়তে পাড়তে চাঁদবিবির ফটিকের কথা মনে হয়। এই রকম কচি কদুর সঙ্গে ইচে মাছের তরকারী খেতে সে ভালবাসে। তার গাছে যখনই কদু ফলতে থাকে তখনই চাঁদবিবির ফটিকের কথা মনে পড়ে। কচি কদুর মধ্যে সে ফটিকের কচি কচি মুখের আদল পায়। কিন্তু চাঁদবিবি খুব শক্ত মেয়ে। সে হা-হুতাশকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। সে জানে

তার ছাওয়াল অনেক পাশ দেওয়ার জন্য কলকাতায় গিয়েছে। সে পড়ছে, সে পাশ দিচ্ছে। ফটিকির বাপ বলে, ছাওয়াল নাকি উকীল হবে। দেওয়ান বাড়ির মাজে বাবু এই গিরামের পোসটো মাস্‌টার, গেল বছর বড় ঈদের ঠিক আগে তাগোর বাড়ি নিজে এসে হাজির। ফটিক নাকি জামা কাপড় কেনার জন্য পাঁচশটে টাকা পাঠিয়েছে তার বাপকে। তারপর সেই টাকা নিয়ে কদিন ধরে ফটিকির বাপের সংগে সমানে পরামর্শ হল। কী করা হবে, ঐ টাকায়। ফটিকির বউকে একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে, এই বিষয়ে দুজনে এক কথায় একমত হয়ে গেল। সমস্যা জটিল হয়ে উঠল অন্য ব্যাপারে। ফটিকির বাপের তখন দেল-দরিয়া অবস্থা। বলে কি, বিবি আমি তো সারা জন্মও তোরে ভালো কিছু দিতি পারিনি, এবার বিটার পয়সায়, বল্‌ কি চাস, হাউস মিটোয়ে দিই। চাঁদবিবি বলেছিল, তালি আপনি একটা বেশ ভালো দেখে পিরেন বানায়ে ন্যান। ছাওয়াল আলি তখন তার কাছে কত সব ভালো ভালো লোক আসবে, বিয়াই বাড়ি তখন যাতি-টাতি হবে, উকীল সাহেবের বাপ তো, পিরেন গায়ে না দিলি চলবে ক্যান্‌? ফটিকির বাপ এক কথায় সে প্রস্তাব উড়িয়ে দিল, আরে দূর, কী সুখ যে মানুষি পিরেন পরে, আমি তো সিডাই বুঝতি পারিনে। পিরেনে যা গা চুলকোয়, দূর। তার চাইতি তুই একটা ভালো কাপড় কিনে নে এই বেলা। শোনো কথা। চাঁদবিবি তাজ্জব হয়ে যায়। ফটিকির বাপ মাঝে মাঝে এমন অদ্ভুত সব কথা বলে যার কোনও দিশা পায় না সে। আমি বুড়ো মাগী। ভারা ভানতি যার দিন কাবার হয়, সে কিনবে ভালো শাড়ি! ফটিক সেই কবে জলপানি পেয়েছিল, তারিণী মাসটারের ইশকুলির থে যখন বড় ইশকুলি ভর্তি হলো, সেইবার, সেই টাকায় একটা পাটের শাড়ি মাকে কিনে দিয়েছিল। সেটাই তোলা আছে। বলি শাড়ি দিয়ে সে করবে কী, শুনি! তুই হলি বুড়ি, আর আমি তোর খসম, আমি সেই যোবতিই রয়ে গিইছি না কী? ফটিকির বাপ ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল। ফলে এই প্রস্তাবের কোনও মীমাংসা হল না। এবং পিরেন হল না ফটিকের বাপের, শাড়ি হল না ফটিকের মায়ের। ফটিকের বউ-এর জন্য ওরা শাড়ি জামা, আর একজোড়া রুপোর খাড়ু কিনল। তারপর একদিন তারা দুজনে বিয়াই বাড়ি গিয়ে বেটার বউকে জিনিসগুলো দিয়ে এলো। চাঁদবিবি ঐ সংগে পিঠে ক্ষীর বানিয়ে নিয়েছিল। আর ফটিকির বাবা নিয়েছিল দুটো মুরগি। বিয়াইসাহেব, বিয়ান বিবি, বউ, কত্তাবিবি কত যত্ন করেছিল ওদের। বউকে চাঁদবিবি যত দেখে তত তার ভাল লাগে। সাধ হয় বউকে এনে কাছে রাখে। ছমছম করে বউ ঘুরবে বাড়িতে। চাঁদবিবির এই ইচ্ছাটা খুবই হয়। কিন্তু ছাওয়ালের বারণ। পাশ দিয়ে সে না ফেরা পর্যন্ত বউ আনা চলবে না। বিয়ের আগেই এসব কড়ার হয়ে গিয়েছে। কাজেই ছাওয়ালের কথার উপর কথা চলে না।

চাঁদবিবি কাস্তেটা হাতে নিয়ে বেছে বেছে বেশ বত্‌নো দেখে তিনটে কদু কেটে ফেলল। দুটো নছিফাকে দেবে। ওদের সংসার বেশ বড়। তিন সতীনের ঘর। ছেলেপুলেয় ভর্তি। নছিফাকে ওর বেশ ভালো লাগে। গেরস্তরা এখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। এখন নিজেদের বাড়ি ডেকে নিয়েই ভারা ভানবার রেওয়াজ বাড়ছে। বাইচে-ভানা কমেই আসছে। তবুও নছিফা এপাড়া ওপাড়া ঘুরে ঘুরে কেমন করে যেন বাইচে-ভানার ধান জোগাড় করে আনে। সেদ্ধ শুকনো করার দায়িত্ব নছিফা নিজেই কাঁধে তুলে ন্যায়। আহা, চাঁদবিবি ভাবে তার গতরটা যদি আগের মত থাকত!

এখন আর আগের মত পারে না চাঁদবিবি। ঢেঁকিতে কিছুক্ষণ পাড় দিতে থাকলেই পায়ের চেটো গরম হয়ে আসে। তারপর সেই গরম ভাবটা ধীরে ধীরে যন্ত্রণায় পরিণত হতে থাকে। হঠাৎ মনে হতে পারে, বুঝি বা পায়ের চেটোয় ফোস্কা পড়েছে। ঢেঁকির পিঠে যত লাথি পড়তে থাকে পায়ের তলার বেদনা ততই বাড়তে থাকে। বাঁ-পায়ের বেদনা অসহ্য হয়ে উঠলে চাঁদবিবি ডানপায়ে পাড় দিতে শুরু করে, ডান পায়ে টাস ধরলে আবার পা বদলে বাঁ-পায়ের লাথিই ঢেঁকিকে সে দিতে শুরু করে। ধীরে ধীরে তার পায়ের দুটো চেটোই যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে। তারপরই হয় মুশকিল। সেই দোজখ-যন্ত্রণা ধীরে ধীরে পায়ের শিরার ভিতর দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। উপরে উপরে উপরে। যন্ত্রণা যেন আগুনের লকলকে শিখা হয়ে শিরার ভিতরে ছোবল দিতে থাকে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। বুক ধড়ফড় করে। দরদর করে ঘাম ঝরে। তালু সর্বদাই শুকিয়ে কাঠ। আর মাথাটা কেমন হাল্কা লাগে। আর ক্ষিধে পায়, খুব ক্ষিধে পায়। কিন্তু কাজ বন্ধ রাখতে পারে না নছিফারা, চাঁদবিবিরা। কাউকে একজন পাড় দিয়ে যেতেই হয়। যার আলায়ে দেবার কথা তাকে আলাতে হয়, আল্‌টাতেও হয়। কেননা, পনের সের ধান ভানলে দশ সের চাল হয়। এগারো সের চাল কুটলে গেরস্ত এক সের চাল ভানানীকে দেবে। দুজনে দু সের চাল পেতে গেলে তেত্রিশ সের ধান ভানতে হবে। আর কমপক্ষে সের চারেক চাল মজুরি হিসাবে দৈনিক ওদের চাই। বিশেষ করে নছিফার। ওর সংসারেই খাই বেশী।

তাই যাই ঘটুক গা-গতরে ঢেঁকির পাড় সেই যে সকালে শুরু হয়, আর ঢেকুস কুস্‌ ঢেকুস কুস্‌ এই একঘেয়ে আওয়াজ অবিশ্রান্ত চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্ধ্যে হচ্ছে, ধান ভর্তি ধামাগুলো খালি হচ্ছে, তুষ, কুঁড়ো স্তূপাকার হচ্ছে, থামে না, থামার উপায় নেই বলে। এরই মধ্যে ওরা বাহ্যি-পিসাব করে, রান্না-খাওয়া সারে।

যেমন চাঁদবিবি। কদু তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেল, ক্ষিপ্রহাতে কুটেও ফেলল, উনুন ধরাল, খুদ আর কদুর জাউ রেঁধে ঢাকা দিয়ে রেখে এল। তারপর ঢেঁকিতে এসে পাড় দিতে শুরু করল। দু-দুটো পুরুষ্টু আর কচি কদু পেয়ে নছিফা খুব খুশি। আল্লার রহম চান্‌-ভাবির উপর

হুরবখ্‌ত পড়ুক।
চাঁদবিবি ঢেঁকিতে উঠল।
ঢেকুস্‌ কুস্‌, ঢেকুস্‌ কুস্‌—
কুলোয় করে চাল অল্‌টাতে আল্‌টাতে নছিফার দুটো ডানা ভারি হয়ে এল। কাজ খুব একটা খারাপ এগুচ্ছে না।
হঠাৎ ফটিকের বাপ ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ঢুকল। কাঁধের লাঙলটা বেড়ার গায়ে কোনো রকমে হেলান দিয়ে রেখে, বলদ দুটোকে শুধু হেই বলে গোয়ালের দিকে তাড়িয়ে দিল। তারপর বারান্দায় উঠে কোনোমতে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।
চাঁদবিবি ঢেঁকিটা আস্তে করে নামিয়ে রেখেই ছুটলো বলদ দুটোর পিছনে।
সাজ্জাদ কোঁকাতে কোঁকাতে হাঁক পাড়ল, "এই কনে গেলি। ওহ্‌ ওহ্‌ ওহ হো হো হো। ওরে বাবা—আ, কী হি হি হি হি কাঁপুনী, ওরে বাপ্‌, ওরে ঐ, এই হারামজাদী এদিকি আয়, আমারে আমারে এঁহ্‌ এঁহ্‌ আমারে খ্যাতা চাপা দিয়ে যা শ্‌ শালী ওহ্‌ ওহ্‌ ওহ্‌ ওহ হো ও ও ও।"
চাঁদবিবি কোনোদিকে না তাকিয়ে এক ছুটে আগে বলদ দুটোর দড়ি ধরে ফেলল। তারপর এক একটা হ্যাঁচকা টানে দুটোকে কদুগাছের গোড়া থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। ওঃ, খুব বেঁচেছে গাছটা। এক পলক দেরি হলেই গাছটা মুড়িয়ে দিত ওরা। চাঁদবিবি বলদ দুটোকে গোয়ালে নিয়ে যাবার সময় বলল, "বলদ দুটোরে গুয়ালে বাঁধে এক্ষুনি আসতিছি।"
সাজ্জাদ ঠকঠক করে কাঁপছিল। চাঁদবিবির কথা শুনেই হুংকার ছাড়ল, "কী বললি! ইহ্‌ ইহ্‌ ইহ্‌ খসম মস্তিছে খসম মস্তিছে এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ ও বাপ্‌ ও বা-প্‌রে পানি, পানি এটটু পানি, এইশ্‌ শালী ইহ্‌ ইহ্‌ বাঁদীর বাচ্চা বাঁদী ইহ্‌ ইহ্‌ নচ্ছা আহ্‌ আহ্‌ আর্‌ তুমার খসম মস্তিছে এহ এহ আর আহ্‌ আহ্‌ তুমি বলদ নিয়ে গুয়ালে ঢুকিছ ওহ্‌ ও বাপ পানি ইহ্‌ ইহ্‌ ওহ্‌ ওহ্‌ ওরেশ শালী গুয়ালি কি পাল খাতি ঢুকলি আাঁ বাপ্‌রে খ্যাতা আন্‌ খ্যাতা আন্‌, চাপা দে চাপা দে এহ্‌ এহ্‌ আর বাঁচবো না আ-র বাঁচবো না আর বাঁ—চ—বো—না আহ্‌ আহ্‌ আহ্‌ পানিহ পানিহ ওরে এটটু পানি দে—রে।"
চাঁদবিবি বলদ দুটোকে গড়ায় বেঁধেই ছুটল সাজ্জাদের কাছে। চটপট কাঁথা এনে তাকে ঢেকে দিল। কিন্তু তার কাঁপুনী এবং বকুনী কিছুই থামল না।
"ও বিবি ও বউ ওহ্‌ ওহ্‌।" সাজ্জাদ গান ধরল, "ও পীরিতের শালী রে তুমি ক্যান্‌ বিবি হ'লে না, আহ্‌ আহ্‌ এই হারামজাদীর হারামজাদী পানিহ্‌ এট্‌টু পানিহ্‌—"
চাঁদবিবি পানি এনে সাজ্জাদকে খাওয়ালো। সাজ্জাদ ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, "খ্যাতা খ্যাতা, ওরে একটা খ্যাতা আন।"
চাঁদবিবি খুঁজে পেতে একটা ছেঁড়া কাঁথা পেল ঘরে তাই দিয়ে সাজ্জাদকে চাপা দিল। তার কপালে গালে চোখের পাতায় চাঁদবিবি ভিজে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।
সাজ্জাদ গান ধরল, "ও সুহাগের বিবিরে তুই ক্যান্‌ শালী হবি নে। এহ্‌ এহ্‌ এহ্‌ বাপরে বাপ আহ্‌ আহ্‌ মরি যাব কী শীত কী শীত খ্যাতা খ্যাতা ওরে খ্যাতা আনে চাপা দে।"
চাঁদবিবি খুঁজে পেতে এবার একটা দুমণি বস্তা এনে তাই দিয়ে সাজ্জাদকে চাপা দিল। সাজ্জাদ গান ধরল—

"ওরে বাপ দেশে আঁলো
মালোয়ারীর কী কাঁপুনী,
রাজা কাঁপে রানী কাঁপে
কাঁপে চাকর-চাকরানী॥"

ঢেঁকির পাশে বসে কুলোয় করে আছড়ে আছড়ে যতটা ধান ভানা হয়েছে নছিফা তার সবটাই আল্‌টায়ে ফেলল। একপাশে সেগুলো সরিয়ে রাখলো। পরে এগুলোকে কাঁড়াতে হবে। তারপর সে উঠে গিয়ে আর এক ধামা ধান এনে ঢেঁকির গড়ায় ঢেলে দিল। চান্‌-ভাবি এলেই আবার ভানার কাজ শুরু হবে। নছিফার পেটের ভিতর আবার খিদের কামড় শুরু হল। সে চাল খাবে না, কিছুতেই না। লাগুক খিদে, জ্বলুক পেট, তবু সে চান্‌-ভাবির ভাগে হাত দেবে না। সে উঠে গিয়ে কলসী থেকে এক বাটি পানি ঢেলে খিদে উপশমের চেষ্টা করল।
"বা প্‌ ফটিকরে-এ," সাজ্জাদ চীৎকার শুরু করেছে। তার মানে তার বিজার জ্বর আসছে।
"ফ—টিক বা—আ—প্‌! আহ্‌ আহ্‌ আহ্‌ পানি পানি পানি ইহ্‌ ইহ্‌।" সাজ্জাদ এখন বউকে গালি দেবে, যাত্রার গান গাইবে, মাঝে মাঝে চীৎকার দিয়ে উঠবে। কত রকম করবে। নছিফা সব জানে। এমনিতে সাজ্জাদ শান্তশিষ্ট খুব ভদ্র। কিন্তু বিমারে পড়লে সেই মানুষই কত বদলে যায়।

"তোর যাজান যে জ্বরে ভাসে যায়
ওরে ফহ্‌টিক নীলমণি ই ই ই

তোর বাজান যে কাঁপে কাঁপে কাঁপে কাঁপে এন্তেকাল ফরমায়
ওহ্‌হো বাপ্‌ বাহাপ্‌রে দেখবি যদি আয়।"

সাজ্জাদের গান শুনে নছিফা ফিক্‌ করে হেসে ফেলল।

"ওহ্‌হো বাহাপ্‌ দেশে আলো যে-এ কী কাঁপুনী
মালোয়ারির কাঁহ্‌পুনী
রাহ্‌জা কাঁপে রাহ্‌নী কাঁপে
কাঁহ্‌পে চাহ্‌কর চাকরানী ই ই ই।'

নছিফা ভাবল, এই পুরুষ মানুষগুলোর ধরন ধারণ কিছুই বুঝা যায় না। এই যে সাজ্জাদ ভাই, এখন বিমারির ঝোঁকে এই পাগলামিটা করছে যেই জ্বরটা ছাড়ে যাবে, সংগে সংগে একেবারে অন্য মানুষ, একেবারে মাটির মানুষ হয়ে যাবে। এগের কোন্‌ চিহারাডা যে আসল আর—

"এই হারামজাদী, হারামের হারাম জাদীর জাদী—"

এই দ্যাখ, নছিফা মনে মনে বলল, মিঞা আবার গা'ল পাড়তি শুরু করলো। ভালো থাকলি সাজ্জাদভাই কখনোই চানু-ভাবির এই ধরনের গা'ল দেতো না। নছিফার হঠাৎ ওর খসমের কথা মনে পড়ল। সারাদিন লোকটা এক রকম থাকে। একেবারে অন্য লোকই যেন, সেই লোকেরই রাত্তির হলি সে যে কী হয়, যেন রাক্ষস। দিনের বেলায় খসমের সংগে তার দেখা-সাক্ষাৎ বিশেষ একটা হয় না। নছিফা যত রাত্তিরেই শুয়ে পড়ুক, ফজর নামাজের আজান শুরু হবার আগে ওদের বাড়ির কুঁকড়োটা যে ডাকটা দেয়, সেই ডাকে তার ঘুম ভাঙে। তখনই উঠে বাড়ির কাজকর্ম খানিকটা সেরেই সে বেরিয়ে পড়ে। কার বাড়িতে কে ধান ভানাবে, সে খবর নছিফার চাইতে বেশী এ গ্রামের কেউ জানে না। বিশেষত হিন্দু পাড়ায়। তেলিরা, কুঁবরা, বিশ্বেসরা, সরকারবাড়ির ওরা, সবাই এখনো বাইচে প্রথায় ধান ভানায়। আর এ সব বাড়িতে নছিফার খুব পশার। ভোর ভোর গিয়ে হয় আগের দিনের ভানা চাল সে দিয়ে আসে, আর না হয় ভানার জন্য ধান নিয়ে আসে।

ওর ছোট সতীন তখনও হয়ত খসমের গলা ধরে শুয়ে শুয়ে সুখ খায়। বড়োবিবির যা ঠ্যাকার, নিজির ছাওয়াল-পাওয়ালগুলোর চ্যা ভ্যা না করা ইস্তক মটকা মেরে শুয়ে থাকে। আর বিয়োতেও পারে বাবা, বড়ো। গুটা ছয়েক হয়ে গিয়েছে এর মধ্যি। আবার নছিফা দেখে বড়োর পেটটা আবার ফুলে উঠেছে। বিয়োবার ব্যাপারে সেও যে খুব কম যেতো তা নয়। যখন ছোট আসেনি তখন তো বড়োর সংগে প্রায় পাল্লা দিয়েই সে বিইয়ে গেছে। কিন্তু সে তো বাঁদী, ভারা ভানে তাই সতীনের কাছে, খসমের কাছে ছেঁড়া ত্যানার বেশী ইজ্জৎ নেই, তেমনি হয়ত আল্লার কাছেও সে তাই। তা নইলে সকলের ছাওয়ালই যখন বেঁচে তখন ওর গুলোই বা শুধু ঝরে মরে যায় কেন? আল্লা একটাও তো বাঁচিয়ে রাখতে পারত। আগে আগে এ সব ব্যাপারে নছিফা খুব বিচলিত হত। ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে গেলে খুব কাঁদাকাটি করত। বিয়োবার সময় এলে দিনকতক খুব ডরে ভয়ে থাকত। খালাস হত। বাচ্চা মরত। খুব শোক করত। খসমকে তার রাতের হক্‌ উশুল করার ব্যাপারে বেকায়দা মত এক সময় বাধাও দিয়েছে। তার সাজাও পেয়েছে। শরীরের নানা জায়গায় তার চিহ্নও আছে। তারপর তার অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে তাকে শিখিয়ে দিল, নছিফা ছটফট কর কেন? দুঃখ শোক, ইচ্ছা অনিচ্ছা, সাধ আহ্লাদ তোমার জন্য এসব নয়, নাজায়েজ। তোমার জন্য আল্লার বরাদ্দ মাত্র দুটো জিনিস—হাড়ভাঙা খাটুনী আর পেট-জ্বলা ক্ষিধে। ক্ষিধের কথা মনে হতেই এইসব সাত পাঁচ চিন্তার মধ্যেও তার হাতখানা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত চলে গেল আকাঁড়া চালের স্তূপটার দিকে এবং ওর গালের ভিতর ঢুকে গেল সদ্য আলটানো এক খাবলা চাল। এবং নছিফা অন্যমনস্কভাবেই চাল চিবুতে লাগল। না, তারপর থেকে সে আর বাচ্চা নষ্ট হলে কাঁদে না। খসমকে তার হক্‌ আদায়ের কাজে বাধা দেয় না। রাতের বিভীষিকা এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। কাঠঠোক্‌রা যখন গাছে ঠোকর মারে তখন গাছ কি তাকে বাধা দেয়? গাধার পিঠে লোকে যখন মালের বোঝা চাপায় তখন সে কি বাধা দেয়?

নছিফা যখন হিন্দু পাড়া থেকে ধানের বস্তা কাঁখে করে বয়ে আনে, বোঝার ভারে তার কোমরটা যখন বেঁকে যায়, ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, প্রতি মুহূর্তে বোঝা নামিয়ে তার হাঁপাতে ইচ্ছে করে, তখনও সে রাগে না, দুঃখ বোধ করে না। শুধু তার দুঃখ লাগে, এখনও কষ্ট পায়, যখন সে তার চানু-ভাবির ন্যায্য পাওনা থেকে চুরি করে। এই দুর্বলতাটুকু সে ছাড়তে পারেনি। চুরিটুকুও না। আর, আশ্চর্য, তার সতীনদের কোনও কিছু ভালো হলে, দেলে একটা হিংসের ছোবল খায় আর তাদের বুরা কিছু হলে খুশি হয়। এটা যে কেন এখনও যায়নি সে জানে না।

নছিফার দাঁতের ঘায়ে কাঁচা চালগুলো পিষ্ট হয়ে মুখের ভিতর এতক্ষণে সুগন্ধি এবং স্বাদু একটা মণ্ড প্রস্তুত করেছে। শুধু এই সময়টুকুতেই নছিফার প্রাণে মরুভূমির মেঘের মতই আগন্তুক এক সুখ কয়েক লহমার জন্য এসে হাজির হয়। তার লালামিশ্রিত সেই চালের মণ্ডটা চিবুতে চিবুতে চুষতে চুষতে সে যতটা সুখ পাচ্ছিল, পায়, সত্যি বলতে কি এইটুকু সুখও সে তার জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে পায়নি। কখনো পায় না।

চাঁদবিবি ঢেঁক্‌শালে ঢুকতেই নছিফা একটু অপ্রস্তুত হল। তার মুখে চাল। চানু-ভাবি

এত শিগ্‌গির এসে পড়বে সে ভাবেনি। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়া! এঃ!

নছিফা বলল, "চান্‌-ভাবি তুমি ইবার বসে বসে আলাও। আমি পাড় দিই। সেই সকালের থে এক নাগাড়ে পাড় দিয়ে চলিছ। যাও তুমি নোটে গিয়ে ব'সো।"

চাঁদবিবি অবাক হল। এমন তো কখনো বলে না নছিফা। কিন্তু দেখল, নছিফা গিয়ে পাড় দেবার জায়গায় দাঁড়াল। চাঁদবিবি ভাবল, তাহলে এ বোধহয় ফটিকের বাপের জ্বর আসার জন্যেই।

নছিফা ঢেঁকিতে পাড় দিতে লাগল। ঢেকুস্‌ কুস্‌ ঢেকুস্‌ কুস্‌—

চাঁদবিবি বলল, "লোকটার বিজায় জ্বর আসেছে। গা অ্যাতো গরম য্যানো খই ফুটার খলা।"

নছিফা বলল, "ভাইর মুখি গাল আর গান শুনলিই সিডা বুঝা যায়।"

ঢেকুস্‌ কুস্‌ ঢেকুস কুস্‌—

নছিফার শরীরটা ঢেঁকির তালে তালে সমানে ওঠা-নামা করছে। ওর পায়ের চেটো গরম হয়ে উঠছে। স্নায়ুর ভিতর দিয়ে একটা ধারালো ছুরি তলপেটে এসে খোঁচা দিতে শুরু করেছে। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

"পানিহ্‌ পানিহ্‌ পানিহ্‌। ওহ্‌ বাপরে।" সাজ্জাদ চেঁচাচ্ছে কাতরাচ্ছে কাঁপছে।

চাঁদবিবি ঢেঁকির গড়া থেকে তুষ-মেশা চাল অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় কুলোর উপর তুলছে। আলটাচ্ছে. তুষগুলো তুষের স্তূপে চালগুলো চালের ধামায় ফেলছে। ঢেকুস্‌ কুস্‌ ঢেঁকি উঠছে পড়ছে। চাঁদবিবির হাত মুহূর্তের সুযোগে ঢেঁকির নোটে ঢুকে ধানগুলোকে আলায়ে অর্থাৎ নাড়িয়ে-চাড়িয়ে দিচ্ছে, আলটানোর মত হয়ে উঠলেই ধানভাঙা চাল তুষ সমেত কুলোয় তুলে নিয়েই আস্ত ধান নোটের ভিতর ঠেলে দিচ্ছে এবং সেই মুহূর্তেই ঢেঁকির নাদনা ঢকাস্‌ করে ধানের উপর এসে পড়ছে। ঢেকুস্‌ কুস্‌ ঢেঁকির শব্দ আর তার সঙ্গে সপস্‌ সপস্‌ সপস্‌ কুলোতে চাল ঝাড়াই-এর আওয়াজ, সব মিলে একটা অদ্ভুত ছন্দের সৃষ্টি করে চলেছে। চাঁদবিবির ডানায় টাস্‌ ধরে আসছে। তেষ্টা পাচ্ছে খুব।

"পানিহ্‌ পানিহ্‌ পানি দে এই শালী হারামজাদী। ইহ্‌ ইহ্‌ ইহ্‌ বাপ।"

"আম্মা! আম্মা জান?"

সঙ্গে সঙ্গে সব শব্দ যেন একসঙ্গে থেমে গেল। চাঁদবিবি অবাক। স্বপ্ন দেখছে না তো? নছিফা ঢেঁকিটা আস্তে নামিয়ে রাখল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘামটা মুছে নিল। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকল। চাঁদবিবি গড়া থেকে উঠে দাঁড়াল। সে কাঁপছে।

"ফটিক! বাপ!"

চাঁদবিবি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ছেলের দিকে পড়ি-মরি করে এগিয়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

চাঁদবিবি কাছে এসে দাঁড়াতেই ফটিক নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে মায়ের দু-পা ছুঁয়ে কদমবুসি করল। চাঁদবিবি দুহাত বাড়িয়ে ওকে তুলল। একটা বলদ গোয়াল থেকে ডেকে উঠল। ফটিক গলগল করে ঘামছে।

চাঁদবিবি বলল, "অ্যাতো রুগা হয়ে গেলি ক্যান বাপ্‌? শরীলডে যে আধখান হ'য়ে গেছে!"

ফটিক এই কথাটাই ওর মাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিল। তিন বছর আগে ফটিক যখন পড়তে গেল কলকাতায়, তখনও ওর মায়ের শ্রী স্বাস্থ্য বেশ ভালোই ছিল। এর মধ্যে সে-সব কোথায় উবে গেল! তুই এত রোগা হয়ে গেলি কেন? এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েও যে সে করল না, তার কারণ উত্তরটা তার অজানা নয়। তাই সে যেমন মায়ের দিকে চাইল তেমনি এক নজরে গোটা বাড়িটাকেও দেখে নিল। বাড়িটাও তার মায়ের মতই শ্রীছাঁদ-বিহীন হয়ে পড়েছে।

মায়ের হাত দুটো ধরে সে হাসল। বলল, "শহরে থাকলে চেহারা এই রকমই হয়। শরীর খারাপ-টারাপ কিছু হয়নি।"

চাঁদবিবি বিস্ময়ে খুশিতে ভর-ভর হযে ফটিককে দেখছিল। তার ফটিক, কিন্তু সেই ফটিক যেন নয়। ফটিকের ধরন-ধারণ কেমন যেন বদলে গিয়েছে। কথা বলছে কেমন ভাবে শোনো? এ যেন অন্য দেশের মানুষ। কেমন অবাক লাগছে চাঁদবিবির। যেমন সেবার অবাক হয়েছিল, যে-বার ওদের ধান হল না, ফটিকের বাপ হাট থেকে সেই প্রথম কিনে এনেছিল কলে-ছাঁটা রেঙ্গুন-চাল। কলে-ছাঁটা চাল দেখিছিস? ফটিকের বাপ 'এই দ্যাখ' বলে ধামাটা এগিয়ে দিয়েছিল। অদ্ভুত সব শাদা শাদা এক মাপে ছাঁটা সেই চাল দেখে সেদিন যেমন মনের ভাব হয়েছিল চাঁদবিবির, আজ ফটিককে দেখেও তার মনে সেই রকম একটা ভাব খেলে গেল। এই ফটিকের কোথায় যেন সেই রেঙ্গুন চালের কলে-ছাঁটা ভাব। হয়ত এই রকমই হয়। অনেক পাশ দিয়ে এসেছে তার ছেলে। তার ধরন-ধারণ তো বদলাবেই। মনকে বুঝ দিল চাঁদবিবি।

আহা, বাপ আমার ঘামতিছে দ্যাখ? চাঁদবিবির ইচ্ছে হল তার আঁচল দিয়ে ফটিকের মুখের

ঘাম মুছিয়ে দ্যায়। আঁচলটা নামিয়ে এনেও চাঁদবিবি থমকে গেল। আগের ফটিক হলে এক্ষুনি মুছিয়ে দিত। এই পাশ-দেওয়া ফটিককে দেখে কেবলই তার মনে হতে লাগল, তার আঁচলটা তার গায়ের ঘামে বড্ড ময়লা। এ আঁচল দিয়ে এই ফটিকের মুখ মুছে দিতে তার হাত ইতস্তত করতে লাগল।

চাঁদবিবি কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। সে আঁচলটা আবার পিঠের ওপর ফেলে দিল। তারপর এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বলে উঠল, "চল্ বাপ্ চল্। ছাওয়ায় বসবি চল্। এখানে বড্ড রোদ। উঃ ঘা'মে যে নায়ে উঠিলি। গামছা দিই। মুখডা মুছে ফ্যাল।"

বারান্দা থেকে ফটিকের বাপ জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে উচ্চৈস্বরে গেয়ে উঠল, "ও রসের বিবিজান এক খিলি পান খাওয়ায়ে যান আহন্ আহন্ আহন্—"

ফটিক ওর মায়ের মুখের দিকে চাইল। চাঁদবিবিও চাইল ছেলের মুখের দিকে। তারপর ফটিকের বাপের গান শুনে মায়ে-ব্যাটায় একসঙ্গে হেসে উঠল। নাঃ ফটিক সেই আগের মতই আছে।

"ও বা-আ-প্ ফটিকরেহ্," সাজ্জাদ চেঁচিয়ে উঠল। "তোহ্র বা-আপ যে মরে-এহ্, শেহ্য দেহ্খা দেখাবিহ্ বহুদি আয়।"

চাঁদবিবির পিছু পিছু ফটিক বারান্দায় উঠে এসে ওর বাপের পাশে বসল। কপালে হাত দিয়ে দেখল ধুম জ্বর।

আস্তে করে ডাকল, "বাজান!"

সাজ্জাদ চোখ মেলল। জ্বরের ঘোরে দুটো চোখই লাল। যেন দুটো লাল ভাঁটা টকটক করছে। তারপর বলল, "কিডা, আমার শিথেনে এ কিডা? বাপ্ ফটিক, না ফেরেশ্‌তা।"

ফটিক বলল, "আমি ফটিক।"

সাজ্জাদ জ্বরের দমকে হাঁপাচ্ছিল। ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে বলল, "পানি, পানি। এট্টু পানি দে বাপ খাই। ছিনা ছিনা। ছিনাডা শুকোয়ে গেছে বাপ। পানি দে, পানি দে।"

সাজ্জাদের মাথার কাছেই বাটিতে পানি ঢাকা ছিল। ফটিক একটু একটু করে বাপকে পানি খাইয়ে দিতে লাগল। তারপর পুরোনো অভ্যাসের বশে মাকে বলল, "তুই খানিকটে পানি তুলে আনতো আমি আব্বুর মাথাটা ধুইয়ে দিই।"

ফটিক বদলে গেছে। অনেকটাই বদলেছে। চাঁদবিবি এতক্ষণ ছেলেকেই দেখছিল। কিন্তু এই দ্যাখ ফটিকের মা, এ আবার সেই পুরোনো ফটিক। এ সেই আমাগেরই ফটিক। তার মনের অস্বস্তিটা অনেকটা কাটল।

চাঁদবিবি উঠতে যাচ্ছিল, ফটিক বলল, "আচ্ছা, তুই থাক। পানি আমিই আনছি। তুই বরং আমাকে কিছু খেতে দে। আমার খিধে পেয়েছে।"

ফটিক বাপ্ খাতি চা'লো! আনন্দে চাঁদবিবির চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই চাঁদবিবির মুখে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। বাপ্ তো খাতি চা'লো। কিন্তু কী খাতি দেবো তারে?

চাঁদবিবি বলল, "তুই বাপের কাছেই ব'সে থাক বাপ্। পানি আমি তুলে দিচ্ছি।"

একটা ঘড়া নিয়ে কুয়োর পাড়ে চলে গেল চাঁদবিবি। তারপর কুয়োয় বালতি নামাতে নামাতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বাপ্ অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি আ'লো, অ্যাদ্দিন পরে খাতি চা'লো, কিন্তু কী তারে খাতি দেবো? ঘরে তো কিছুই নেই। যা আছে, খুদ, একদিন ফটিক বাপ খুদের জাউ খেতে ভালবাসত। কিন্তু তা কি পাশ-করা ছেলেরে খাতি দেওয়া যায়? অ্যাখন তারে কী খাওয়াই? আল্লাহ্।

সাজ্জাদ কাতরাচ্ছে। ফটিক বাপের কপালে পানির হাত বুলিয়ে, মাথা টিপে, ওর সাধ্যমত শুশ্রূষা করে চলেছে। ওর আব্বাজানের গা দিয়ে কেমন একটা জ্বরো-গন্ধ উঠছে। বিছানা দিয়ে কাঁথা দিয়ে বদ্‌গন্ধ ছাড়ছে। ফটিকের স্নায়ুকে তা পীড়িত করছে। এছাড়া আরেকটা গন্ধও সাজ্জাদের গায়ে আছে, ফটিক টের পাচ্ছে, এক সময় গন্ধটা অহরহ তার নাকে লেগে থাকত অথচ টের পেত না, টের পেত না তার কারণ গন্ধটা তার গায়েও লেপটে থাকত। সে নিজেও যে ডুবে থাকত তার মধ্যে। সেটা মাটির গন্ধ। কলম ঠেললে যে গন্ধটা ধীরে ধীরে শরীর থেকে উবে যায়। যেমন তার গিয়েছে। তার বাপের যায়নি, কেন না তার বাপ এখনও লাঙল ঠেলে। ফটিক ল' কলেজের সহপাঠীদের চোরাগোপ্তা ঠাট্টার উত্তরে বলত যে, সে প্র্যাকটিসিং চাষার ছেলে। তার বাবু-ঘরের সহপাঠীরা এর কোনও মানে বুঝত কি-না কে জানে? কলকাতায় যতদিন ছিল ততদিন কলকাতাকে তার কেবল পরদেশ বলেই মনে হত। সে পাছে নিজেকে ভুলে যায় তাই সর্বদাই যেন ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলত। শুধু ভাবত সে গ্রামের ছেলে চাষার ছেলে, একথা সে যেন ভুলে না যায়। ম্যালেরিয়ায় কাতর তার বাপের শরীরের সান্নিধ্যে এসে সে বুঝতে পারল চাষার গা দিয়ে যে-গন্ধ বের হয়, তার শরীরে সে গন্ধ আর নেই। ছিল হয়ত একদিন, আজ তা নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। তাই কি আজ এই বাড়িটার মলিন শ্রীহীন চেহারাটা এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটিকের চোখে পড়ছে?

সাজ্জাদ চোখ মেলে চাইল। এতক্ষণে সে যেন চিনতে পারল ছেলেকে। সে তার জ্বরতপ্ত শীর্ণ হাতখানা দিয়ে ফটিকের হাতখানা চেপে ধরল।

তারপর বলল, "বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে।"

তারপর ফটিকের হাতখানা চেপে ধরে আবার চোখ বুজল। বাজানের হাতখানা ফটিকের হাতে, সে দেখল তার আব্বু কী কাঁপানটাই না কাঁপছে। ফটিক বাপকে চাপা দেবার জন্য ঘরের ভিতর ঢুকল। ফটিকদের বাড়িটা ছোট। একই পোতায় দুখানা ঘর। একটায় ওর বাপ-মা থাকে। আর ফটিক বড় হবার পর অন্য ঘরটার দখল পেয়েছিল। ফটিক ওর বাপের ঘরটাতেই আগে ঢুকল। সে ঘামছে। একপাশে একটা গামছা পেয়ে মুখটা মুছে ফেলল। কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ ওর নাকে এসে ঠেকল। ও সঙ্গে সঙ্গে গামছাটা সরিয়ে রাখতে গেল, তারপর কী ভেবে সেই ময়লা চিম্‌সে গন্ধওয়ালা গামছাটা দিয়েই মুখ মুছল। ফটিকের মনে পড়ল ওর শ্বশুরবাড়ির গামছা দিয়ে তো এমন কটু গন্ধ ছাড়ে না। ওর শ্বশুরের বাড়িটা দিয়েও তো এ রকম বদ্‌গন্ধ ছাড়ে না। ও বাড়িটা বেশ কেমন ছিমছাম। ফটিক ওর বাপ-মায়ের নড়বড়ে ভাঙা তক্তপোষটার এধার ওধার খুঁজে এমন একটা বাড়তি কিছু পেল না, যা ওর বাপের গায়ে চাপাতে পারে। উপরে নজর পড়ল। আড়াভর্তি কুন্টা ঝোলানো আছে। ঘরে জমা কুন্টার পরিমাণ দেখে ফটিক বিস্মিত হল। তার নিজের ঘরে উঁকি মেরে দ্যাখে, সে ঘরটাও কুন্টায় ভরতি।

"দেখতিছিস্ কী," চাঁদবিবি ওর পিছন থেকে বলে উঠল, "গত বছরউ তোর বাপ কুন্টা পিরায় বেচতিই পারেনি। তার আগের বারউ অনেক কুন্টা জমে গিছিল। শুধু আমাগের ঘরে না, এই গিরামের সব বাড়ীতিই ডাঁই হয়ে কুন্টা প'ড়ে আছে।"

ফটিক বলল, "বাজানকে তাহলে এই কুন্টা দিয়েই ঢেকে দিই। বেজায় কাঁপছেন।"

ছাওয়ালের কথাবার্তার ধরনটাই কেমন বদলে গিয়েছে। চাঁদবিবি লক্ষ্য করছিল। ফটিকির কথা শুনলি এখন মনে হয় বুঝি দেওয়ানবাড়ির নেজোকত্তার কথাই শুনতিছি। চাঁদবিবি আবার অসহায় বোধ করতে লাগল। বলল, "কর যা তোর মন চায়। কিন্তু কী খাবি এখন? কী খাতি দেবো তোরে?"

নিজের ঘর থেকে, দু-হাতে যত কুন্টা ধরে তাই নিয়ে, বের হতে যাচ্ছিল ফটিক, মায়ের "কী খাতি দেবো তোরে?", এই চাপা আর্ত প্রশ্নটা শুনতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিদ্যুৎ ঝিলিকে যেন ওর চোখের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। চাষার বউ চাঁদবিবি তার পাশদেওয়া ছেলেকে আর আগের মত ঘরে যা আছে তা খেতে দিতে ভরসা পাচ্ছে না। ফটিক আজ নিজের বাড়িতে মেহ্‌মান। তার আর তার বাপ মায়ের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য অথচ পাকাপোক্ত সীমা সরহদ্দ স্থির হয়ে গিয়েছে। "কী খাতি দেবো তোরে?" তার মায়ের এই অসহায় প্রশ্নটাই যেন ফটিকের মনে হল ইস্‌রাফিলের শিঙার আখেরি সেই অমোঘ ধ্বনি, হাশরের ময়দানে যা কার কোথায় স্থান তা নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন এই মাত্র তা বেঁধে দিল ফটিকের সীমানা। জানিয়ে দিল যে সে আর এ-বাড়ির সুখ-দুঃখে জড়িয়ে-থাকাদের কেউ একজন নয়, সে বড়জোর এ-বাড়ির স্থায়ী একজন বিশিষ্ট অতিথি। সে একজন আগন্তুক মাত্র। এবং আরও দুঃখের, কৌতুকের এবং আরও গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে এই বিভাজন একতরফা নয়। যখনই ফটিকের নাকে এই বাড়ির নানা গন্ধ অপ্রীতিকর ঠেকেছে তখনই তার মনের গভীরে একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। ফটিক যে নিজেই তার অজ্ঞাতসারে সীমা-সরহদ্দ ঠিক করতে লেগেছিল, ওর পরিবারগত অস্তিত্ব থেকে ফটিকের নবার্জিত ব্যক্তিসত্তা যে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল, ওকে আলাদা করে ফেলছিল সে নিজেও সেটা বুঝতে পারছিল না। আর পারছিল না বলেই তার যত অস্বস্তি। এখন তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ফটিক। সত্য এই যে, সে এখন একজন পাশ করা উকিল, আর তার আব্বু চাষা। তাকে প্র্যাক্‌টিসিং চাষা ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করে শহুরে বন্ধুদের কাছে ফটিক হীনমন্যতাকে ঢাকবার চেষ্টা করে করুক কিন্তু এ সত্য তো চাপা দেওয়া যায় না যে সে হাল বইতে জানে না। সে এমন কিছু উৎপাদন করতে পারে না যা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সে-উৎপাদন করে তার বাপ। কিন্তু তার যা বিদ্যে, যা শিখবার জন্য সে কষ্ট এবং মেহনত তার বাপের চাইতে কিছু কম করেনি, সেই বিদ্যে এখানে তাকে ভাত দেবে না। টেনে নিয়ে যাবে শহরে, পরের উৎপাদনের উপস্বত্বে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। সত্যিই তো এ-বাড়ির সঙ্গে তাহলে তার মিল কোনখানে? মেহমানদারি ছাড়া এ-বাড়ির সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই বা গড়ে উঠতে পারে? তাকে এখন খাতির করবে তার আম্মা। নিরক্ষর বাপ শিক্ষিত ছেলের জন্য গর্ব বোধ করবে, তাকে হয়ত সমীহও করবে, কিন্তু তার কাছে আর কিছুতেই সহজ হতে পারবে না বরং মকবুল আলি কি খুদিরাম মন্ডল, যাদের সঙ্গে তার বাপ মাঠ চষে, তাদেরকেই সে কাছের লোক বলে ভাববে।

"খ্যাতা খ্যাতা! ওহ্ বাপ্! কী শীহিহিহিহিহইত!"

বাপের কাতরানি কানে ঢুকতেই ফটিক আবার এ জগতে ফিরে এল। কী যা-তা ভাবতে লেগেছে সে। চেয়ে দেখল চাঁদবিবি তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করছে? সে চাঁদবিবিকে যেন আশ্বস্ত করছে, মনে মনে বলল, আমি তোমার ছেলে। তোমাদেরই একজন। তাই ছিলাম। তাই থাকব।

ফটিক চাঁদবিবিকে মনে বল দেবার জন্য বলল, "আম্মাজান, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তুই একটু জাউ খাওয়াবি?"

ফটিক তার মায়ের সঙ্গে তুই-তোকারি করছে। তার ভদ্রলোক সহপাঠীরা কেউই মাকে তুই বলে না। তুই বলাটা মধ্যবিত্ত ভদ্ররুচির বিচারে ছোটলোকের কাজ। তা হোক, ফটিক তার আম্মাকে তুই-ই বলবে। এ অভ্যাস সে ছাড়তে পারবে না। ছাড়বে না। বিবিকে কী বলবে? ঝাঁ করে বিলকিসের কথা মনে পড়ে গেল। সদ্য ঘুম-ভেঙে-ওঠা একখানা করুণ এবং সুন্দর মুখ তার মুখের দিকে সচকিত চেয়ে আছে। আজ শেষ রাতের সেই ছবিটা তার চোখে ভেসে উঠল। তার বিবিকে সে বুকে টেনে নিচ্ছে। চুমু খাচ্ছে। শিথিল খোঁপাটা ভেঙে গিয়ে একরাশ চুল তার হাতের উপর ভেঙে পড়ছে। তার হাতের মুঠোয় ধরা একরাশ মোলায়েম কুন্টা বিলকিসের চুলের স্পর্শটাকে সঞ্জীবিত করে তুলল। বিলকিসের শরীরটাকে হাতের মুঠোয় ধরার জন্য একটা প্রবল তৃষ্ণা তার মনে জেগে উঠল।

ফটিক বলল, "আম্মা, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তুই জাউটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে দে। আমি আব্বুকে দেখছি।"

চাঁদবিবি স্বস্তি পেয়ে বলল, "জাউ আমার রাঁধাই আছে বাপ। এক্ষুনি আনে দিচ্ছি।" চাঁদবিবি দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

ফটিকের মনে তার বিবির সঙ্গে তক্ষুনি-তক্ষুনি সহবাসের ইচ্ছা আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না। তার আর তর সইছিল না। বিলকিসকে তার চাই, এক্ষুনি এই পাট-ভর্তি ঘরের মধ্যেই চাই। অথবা তার শ্বশুরবাড়ির সেই প্রশস্ত, আরামপ্রদ, মজবুত মেহগনির উপোসী খাটে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবং তার মনে যে-কাম দুকুলপ্লাবী প্রচণ্ড জোয়ারে ত্বরিতগতিতে ফুলে ফেঁপে উঠে তার ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছিল তা আবার ভাটার টানে পরমুহূর্তেই প্রশমিত হয়ে গেল। ফটিক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নাঃ, সে তার বিবিকে বাপ বা শ্বশুরের মত তুই বলে সম্বোধন করতে পারবে না। তার রুচিতে বাধবে। বিলকিসকে সে তুই বলতে পারবে না, যেমন মিস পালিতকে সে কিছুতেই লতিকা বলতে পারেনি। সে কুন্টার বোঝা বাইরে এনে তার বাপের গায়ে চাপা দিতে লাগল।

"শীহিহিহিত! শীহুহুহুত। আমার গাড়ার উপর বোসে পড়ো রেহুহুহু বাপ্। চাপে ধরো, চাপে ধরো! ওহুহুহুহো! কী কাঁপুনী!"

সাজ্জাদের কাতরানি সেই একই রকম আছে। ফটিক তার বাপকে হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। দুহাতের টিপুনিতেই, ফটিক দেখল, তার বাপের ছটফটানি কেমন কম এল। ফটিক অনুভব করল তার বাপের শরীরে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ এক সময় দৈত্যের মত শক্তি রাখত তার বাপ। তার বাপের ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি থামাবার জন্য আগে কখনো কখনো ওকে এবং ওর আম্মাজানকে তার পিঠের উপর চেপে বসতে হত আর সাজ্জাদের এক এক ঝটকায় ফটিক এবং চাঁদবিবি দুজনেই ছিটকে পড়ত। দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে তার বাপের সেই পালোয়ানী চেহারা এখন কত জীর্ণ এবং কত দুর্বল হয়ে পড়েছে। কলকাতায় ওকালতি পড়তে তিনটে বছর ওর বোধ হয় বরবাদই হয়েছে। ফটিকের মনে আফসোস হতে লাগল। চাকরিতে ঢুকলে, এখন তার মনে হচ্ছে, সংসারে সে কিছু টাকা দিতে পারত।

চাঁদবিবি একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর গামছা বিছিয়ে তার উপর এক শানকি গরম জাউ রেখে ফটিককে বলল, "ও বাপ্, আয়! খায়ে নে। আবার জুড়োয়ে যাবে।"

ফটিক বাপকে ছেড়ে এসে বদনার পানিতে হাত পা ধুয়ে নিল। তারপর জাউ অর্থাৎ কদু আর খুদ সেদ্ধ, খেতে লাগল।

ফটিক চাঁদবিবিকে বলল, "আম্মা কাঁচালঙ্কা দিবি?"

চাঁদবিবি লঙ্কা ছিঁড়তে গাছের দিকে গেল।

ফটিক তখন নিজেকে বলল, মার সঙ্গে তুই-তোকারি করি, ওটা ছাড়ব না। বিবিকে কিন্তু তুমি বলব যে যাই মনে করুক। বিলকিসকে সে তুই বলতে পারবে না, রুচিতে বাধবে।

ফটিকের খাওয়া হলে চাঁদবিবি বলল, "তুই বাপ এখন এট্টু তোর বাপেরে দ্যাখ। আমি ততক্ষণে ধান-ভানাটা সারি ফেলি গে।"

চাঁদবিবি ছেলে আর তার বাপকে রেখে ঢেঁকশালে চলে গেল। ফটিক ওর বাপের মাথায় জল ঢালবার ব্যবস্থা করতে লাগল। এ কাজ তার জানা। আগেও করেছে। সে প্রথমেই একটা মানকচুর পাতা কেটে আনল। তারপর বারান্দায় সেটা পেতে তার আগার দিকে ওর বাপের মাথাটা তুলে দিল। সাজ্জাদ কাতরাতে থাকল। ঢেঁকির শব্দ ঢেঁকশাল থেকে ভেসে আসতে লাগল। ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্। আর তার সঙ্গে মাঝে মাঝে কুলো আছড়ানোর সপস্ সপস্ সপস্ আওয়াজ। ফটিক কলসির পানি বদনায় ঢেলে তাই দিয়ে ধীরে ধীরে সাজ্জাদের মাথা ধুইয়ে দিতে শুরু করল। তার মাথার পানি কচুপাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছানচেয় গিয়ে পড়তে লাগল। সাজ্জাদের কাতরানি ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফটিক তার বাপকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কচুর পাতাটা ফেলে দিয়ে এল। তারপর জামাটা খুলে ফেলল। গেঞ্জিটা ভিজে সপ্সপ্ করছিল। সেটাও খুলে ফেলল। এখন একেবারে আদুড়

গা। তেষ্টা পেয়েছিল। কলসি থেকে গড়িয়ে খানিকটা পানি খেয়ে নিল। ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ সপস্ সপস্ সপস্। তার মা ভারা ভানছে। ওর সামনেই বাপ কাঁথা, চট আর কুষ্টা গায়ে চাপা দিয়ে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সাজ্জাদ চাষার একমাত্র পুত্র ও ওয়ারেশ, সদ্য কলকাতা ফেরত জনাব শফিকুল বি.এ., বি.এল. নিজের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগল, এই আমি আর এই আমার সীমানা। গোয়াল থেকে বলদ হাঁক দিল ম্বা-আ-আ। হাঁক শুনেই ফটিকের ভিতরের রাখালটা বুঝল, বলদের তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু তার ভিতরের উকিল সাহেবটা সেজন্য বিশেষ ব্যস্ততা দেখাল না। ফটিকে রাখাল হলে তখনই গোয়ালে গিয়ে বলদের চাড়িতে পানি ভরে দিয়ে আসত। কিন্তু ভবিষ্যতের "ভকীল অ্যান্ড্ প্লীডার" ফটিক মিঞা অলসভাবে শুধু একবার তাকালেন। ম্বা-আ-আ। আবার একটা কাতর ডাক ভেসে উঠল। উকিল সাহেবের ওঠার কোনো তাড়া দেখা গেল না। হঠাৎ ঢেঁকিশালা থেকে চাঁদবিবি বেরিয়ে এল এবং এক কলসি পানি নিয়ে ঘামতে ঘামতে গোয়ালের দিকে ছুটল। এই দৃশ্যটা তার গালে যেন ঠাস করে এক চড় মারল। সে প্রাণপণে নিজেকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে গোয়ালে তার আম্মার পাশে পেঁছে দেবার চেষ্টা করল। সে দেখল যেন সে চাঁদবিবির হাত থেকে কলসিটা কেড়ে নিয়ে বলদের চাড়িতে পানি ঢেলে দেবার চেষ্টা করছে আর চাঁদবিবি বিব্রত হয়ে তাকে বলছে, ছায়ায় গিয়ে বো'স গে বাপ্, তুই এখেনে আলি ক্যান, তুই কত পাশ দিয়ে আলি, উকিল হয়ে আলি, তোর কি এখন এইসব কাজ মানায়? না, তুই পারিস্? তোর যদি আরউ পাশ দিবার ইচ্ছা থাকে তবে সে হাউস্ মিটোয়ে নে। আমাগের কথা তোরে ভাবতি হবে না। ভারা ভা'নে আমার আর হাল চ'ষে তোর বাপের দিন চ'লে যাবে। তুই যা—তুই যা বাপ্, তোর যা কাজ তাই করগে যা। ফটিক উঠল না। তবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকায় তার মনটা অপরাধবোধের ভারে ভারি হয়ে আসতে লাগল। ফটিক বুঝতে পারল তার সঙ্গে তার পরিবারের নাড়ির বাঁধনটা ছিঁড়ে গিয়েছে। কিন্তু এই আবিষ্কারে সে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। সে কেমন বিপন্ন হয়ে পড়ল। তার বাপ তার মা তার আত্মীয় কুটুম, তার সমাজ থেকে কোন্ একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সে যেন হুইল-ছিপে গলা-আটকে-যাওয়া একটা মাছ, সুতোর টানে ধীরে ধীরে সে সরে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে, যাদের সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক।

কোথায় তবে যাচ্ছে সে? ফটিক চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তটভূমির কোনো ছবিই তার চোখে ভাসল না। বিদ্যা জ্ঞান অর্জনের ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। অনেকদিন আগে শোনা মেজোকত্তার কথাটার একটা অর্থ এখন যেন সে বুঝতে পারছে।

ইশকুলের চাকরিতে ইশ্তফা দিয়ে ফটিক দেওয়ান বাড়ির মেজোকত্তার কাছে গিয়েছিল। কেন না, সে তাকে একজন মুরুব্বি বলে মানে। কথাটা মেজোকত্তাই বলেছিলেন, বিদ্যা বল জ্ঞান বল, এ সবই অর্জন করা ভালো। তবে কি জানো, এর ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। বিদ্যার্জনের মন্দ দিকও আছে, এই অদ্ভুত কথা সেই প্রথম শুনল ফটিক। তাও আবার কার কাছ থেকে, না যিনি তাকে এই ব্যাপারে পথ দেখিয়েছেন, এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন, যাঁকে সে গুরু বলে মান্য করেছে, সেই মেজোকত্তার কাছ থেকে।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে, মেজোকত্তা হুঁকো টানতে টানতে বলেছিলেন, আদম আর ইভের, তোমাদের শাস্ত্রে যাকে হাওয়াবিবি বলা হয়েছে, যে দশা যা দুর্দশা হয়েছিল, সব মানুষেরই সেই দশাই হয়। অর্থাৎ স্বর্গ থেকে পতন ঘটে। স্বর্গ হচ্ছে তাই, ইংরেজিতে যাকে ব্লিস্ বলে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ব্লিস্, ফটিক? একটু থেমে নিজেই জবাব দিয়েছিলেন, নাথিং বাট্ ইগ্নো-রেন্স্। এ জগতে তাই একমাত্র মূর্খেরাই স্বর্গবাসী। এবং জ্ঞান বিদ্যা মূর্খতাকে অজ্ঞানকে বিনাশ করে বলেই এবং একমাত্র মানুষই জ্ঞানবৃক্ষের ফল-ভক্ষণকে শ্রেয় জ্ঞান করে বলেই সে চির অভিশপ্ত, সে আশ্রয়চ্যুত, ত্রিশংকু। সে একা হয়ে পড়ে। সে বড় যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা ফটিক। এই কথাটা মনে রেখো।

সাজ্জাদ বিড় বিড় করে কি যেন বলল। ফটিকের চটকা ভাঙল। তার বাপ কি বলে তা শোনবার জন্য সে কান খাড়া করে থাকল। কিন্তু সাজ্জাদ আর কিছু বলল না। ঢেঁকিশাল থেকে অবিশ্রান্ত ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ স্প্স্ স্প্স্ স্প্স্ ঢেঁকির শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কুলোর আওয়াজ এসে ফটিকের কানে বাজতে লাগল। আসলে সে বড্ড আবোল তাবোল ভাবে। বড্ড বেশী ভাবে।

হঠাৎ গ্রামের মসজিদ থেকে জোহরের আজান-ধ্বনি শোনা গেল, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। ফটিক সচকিত হয়ে উঠল। এত বেলা হয়ে গিয়েছে! হঠাৎ ফটিক যেন পায়ের তলে মাটি পেল। অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। কী এত একা হয়ে যাবার আশঙ্কা সে করছিল! আশ্চর্য, সে কী করে একথা ভুলে গেল যে সে একা হতে পারে না, কেন না সে বিশ্বাসী, তার ঈমান আছে, তার ইসলাম আছে, তার ধর্মের রজ্জুই হচ্ছে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস প্রবল জোরে বেঁধে রেখেছে মুসলমান সমাজকে।

সে অসুস্থ বাপের পাশে নামাজের বিছানাটা বিছিয়ে নিয়ে তার উপর পশ্চিমরোখ খাড়া হয়ে নামাজের নিয়তটা পড়ে নিলঃ

"নিশ্চয়ই আমি তাঁহার দিকে মুখ করিলাম, যিনি আকাশ পাতাল সৃষ্টি করিয়াছে বাস্তবিকই আমি মোশরেকগণের দলভুক্ত নহি।"

এই নিয়তটা ফটিকের মনে অনেক জোর এনে দিল। না, আমি একা নই, কখনোই এক হব না। কারণ আমি জানি, এই মুহূর্তে এই গ্রামে, এই থানায়, এই সারকেলে, এই মহকুমায় এই জেলায়, এই বাংলায়, ভারতে, এশিয়ায়, প্রত্যেকটি মহাদেশে অর্থাৎ এই জাহানের প্রত্যেক কোণায় ইসলামে যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাঁরা এই মুহূর্তে এই একই প্রার্থনা বিভি ভাষার মধ্য দিয়ে উচ্চারণ করে চলেছেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন এই নিয়ত করছে "আমি আল্লার ওয়াস্তে কেবলা-রোখ দাঁড়িয়ে জোহরের ওয়াক্তের রসুলের সুন্নত চার রাকয়া নামাজ পড়ছি।"

তাহলে আমি একা কেন? ঐ যে আমার আব্বাজান নিরক্ষর চাষা, আর আমি শিক্ষি তাঁর ছেলে, বৃথাই তার সংগে সম্পর্কচ্ছেদের কাল্পনিক আশংকায় আমি বিচলিত বোধ করছিলাম আমি মূর্খ মূর্খ মূর্খ, তাই বুঝতে পারিনি যে আমাদের এ সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। এ তো শুধু নাড়ি বাঁধন নয় যে রুচিভেদে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার আব্বাজান আজ যদি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ত, তবে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে একই নিয়ত এইভাবেই করত। আল্লার ফরজ একই ভাবে পালন করত। এই তো একটা অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্র ইসলাম যা আমাকে দান করেছে এটা ছেদন করা যায় না। তাই আমি কখনোই একা হয়ে পড়ব না। বিচ্ছিন্ন হব না। না না না, আশ্রয়চ্যুত হবার অভিশাপ আমাকে বহন করতে হবে না।

ঢেকুস্ কুস্ সপস্ সপস্ ঢেকুস্ সপস্ কুস্ সপস্ সপস্ সপস্—

দুনিয়াভর ঈমানদারগণ জোহরের নামাজে যখন নিবিষ্টচিত্ত, এবং ফটিক যখন একাত্মবোধে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ তখন এই একটা ঢেঁকি আর একটা কুলোর অবিশ্রান্ত বেসুরো আওয়াজ ফটিকের বিশ্বাসের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছিল। নছিফার কথা জানে না ফটিক, কিন্তু তার আম্মাজানকে সে ভালোই জানে।

চাঁদবিবি নাচার না হলে নামাজ কাজা করে না। তার বাপ অসুস্থ, তার মা কর্মব্যস্ত। তিন বছর পর বাড়িতে এসে দুনিয়ার ঈমানদার মুসলমানের কাতারে দাঁড়িয়ে ফটিক প্রথম যে জোহরের নামাজটা পড়ল একাত্ম হয়ে, সেই কাতারে সে যাদের আত্মজ সেই তার আব্বা এবং আম্মা, বাড়িতে থেকেও অনুপস্থিত। সে তার বাড়ির নামাজের বিছানায় একা। কী আশ্চর্য!

॥ ১৯ ॥

দাউদ মিঞা বাজানের কাছে যখন শুনল যে তার বড়চাচা হাজী সাহেব দাউদের ব্যাপারে হাঁ-না কিছুই করেননি, তখন সে প্রথমটায় ভয় পেয়ে গেল। ভবিষ্যতটা অন্ধকার দেখল। যতই সে অপরাধ করুক, দাউদের ধারণা ছিল, তার সম্পর্কে তার চাচার একটা দুর্বলতা আছে। আগে যেমন তার অনেক দোষ-ঘাট তিনি মাফ করে দিয়েছেন, এবারও সেই রকম মার্জনা সে পাবে। দাউদের এবারের অপরাধটা হয়ত একটু গুরুতর। চাটমোহর মোকামের কিছু টাকা সে নষ্ট করেছে। তা এ ধরনের কাজ তার তো নতুন নয়। চাচা তো তা মাফ করে দিয়েছেন। তাকে কাছে ডেকে এনে কত বুঝিয়েছেন। রেগে গেলে মোকাম থেকে ডেকে এনে তাকে বাড়িতে কিছুদিন বসিয়ে রেখেছেন। সে তাস-পাশা খেলে বেড়িয়েছে। অমূল্য তাঁতির যাত্রার দলে কখনও মেঘনাদ, কখনও সহদেব কখনো কখনো বা যোধপুর-অধিপতির ভূমিকায় অভিনয় করে বেড়িয়েছে। অমূল্য যাত্রা সমাজের নায়ক, ওর দেলজানের দোস্ত, রাখহরি বাইতির সংগে মেয়েমানুষের বাড়িটাড়িও গিয়েছে। তারপর রাগ পড়লে চাচা অনেক উপদেশ দিয়ে তাকে মোকামে পাঠিয়ে দিয়েছেন আবার। নৌকোয় বসে সাত-পাঁচ ভাবছিল দাউদ। মালের মুখে অমূল্য তাঁতি পরম স্নেহভরে ওর পিঠে চাপড় মারত আর জড়িয়ে জড়িয়ে বলত, তুই একটা গাধা, তুই একটা উল্লুক, উ—ল—লু—ক বুঝলি? ঘোর-লাগা মনে দাউদ বলত, না। বোঝলাম না। অমূল্য তাঁতি বলত, তাও তো বটে, সিডা বুঝার ক্ষমতা যদি ভগবান তোরে দেবে, তা লি আর তোরে নাড়ের ঘরেই বা জম্মাতি পাঠাবে ক্যান? দাউদ আরও কয়েক পাত্তর টেনে নিয়ে নিজেকে আরেকটু উদার করে তুলত। আর অমূল্যদার কথার উত্তরে জিজ্ঞেস করত, তা আমার দোষডা হ'ল কনে, সিডা কবা তো? অমূল্য তাঁতি পরম আদরে ওকে বুকে টেনে নিত ওর গাল টিপে দিত, মালের মাত্রা যেদিন বেশি চড়ে যেত সেদিন চুমুও খেত আর বলত, শালা তোর অ্যাত সুন্দর চিহারা, অ্যাত সুন্দর গলা, অ্যাত সুন্দর তোর জেসচার পসচার, শা আল্লা কত সুন্দর ক'রে তুই মোশন দিস্ পা'ট করিস, শা আল্লা তুই যদি নাড়ের ঘরে না জম্মাতি তালি তোরে বুকি করে রাখতাম, তোরে পাটরানী করে পুষতাম, তোরে বিয়ে করতাম। এক্ এক্ এক্ এক্ এক্ অদ্ভুত এক শব্দ করে অমূল্য তাঁতি হাসত। শালা নাড়ে তোরে রামের পাট দিতি পারিনে, লক্ষ্মণের পাট দিতি পারিনে, কেষ্ট অর্জুন এমন কি কর্ণর পাটউ তোরে দিতি পারিনে। অথচ কী তোর চিহারা। কী তোর গলা! হায় [illegible] হায়!

এই সব পাটের জন্যিই তো তৈরি। দেখি আর আফসোস করি, হায় হায়, কী ছাই বিড়ালে খালো। দাউদ অমূল্যদার কথায় মজা পায়। বলে, ক্যান্ আমারে যদি অ্যাতই যুগ্যি ব'লে মনে ক'রে থাকো, তবে ঐ সব পাট দ্যাও না ক্যান?

অমূল্য তাঁতি মাদুরে এক চাপড় মেরে বলে, ওরে শালা সেই কথাই তো কতি চাচ্ছি। তুই হলি নাড়ের বংশ, আর রাম লক্ষ্মণ কেষ্ট অর্জুন এমন কী কর্ণ যে কর্ণ সে শালাউ ভগবানের অংশ। শালা তোরে কেষ্ট সাজায়ে তার জাতটা মারি আর চিরকাল সেই পাপে নরকে পচতি থাকি। কি কো'স রে রাখ?

রাখহরি বাইতি তখন একেবারে টং। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, ভগবান হ'ল জাত মারানির জাত মারানি। যত নষ্টের গুড়া। ও শালা সগলের জাত মারি বেড়ায়। ওর জাত যদি আগে মাত্তি পারো দাদা তবে তুমারে কব, হ্যাঁ পুরুষ মানুষ বটে। তা না, তুমার খালি ঐ সখিগুলোনের ওপর যতো ঝোঁক। যতো ছোঁক-ছোঁকানি সব ওগের নিয়ে। অমূল্য গর্জন করে উঠত, চোপ্‌রাও শুয়োর। রাখহরি বলে, ওস্তাদ আমারে দাবড় দিলি হবেডা কী? তুমার জ্বালায় দলে একটা ছুঁড়াউ টে'কবে না। অমূল্য তাঁতি আবার গর্জন করে ওঠে, স্তব্ধ কর রসনা তোমার, রে দুর্মতি! প্রাণে যদি চাহ বাঁচিবারে।

রাখহরি বলে, আমারে হাঁকাড় মারলি হবে কী? সেদিন উত্তরারে পা টিপোতি নিয়ে গেলে। ভোররাতে সেই যে পাছায় হাত দিয়ে সে দৌড় মারল, আর তার খোঁজ নেই। এখন সপ্তরথী নামাবো কী ক'রে, পবহাটির মজুনদর বাবুগের বাড়ি?

অমূল্য তাঁতি ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল, ওরে রাখ, তুইও ওব দিকটাই খালি দেখলি। আর উত্তরা শালা, হারামজাদা চোর, যে আমার বাবার গায়ের শালখানা আর আমার দুভরির আংটিডে নিয়ে শটকে পড়ল, তার ব্যালা কিছু না। হা হা হা।

দাউদের চোখ থেকে দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে বাঁধা নৌকোটায় বসে সে তাব চাচার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। চাচাকে ও বেজায় ভয় খায়। অথচ চাচা চাচী দুজনেই ওকে ভালবাসত। ছবির চাইতে সে বছর ছয়েকের বড়। ওদের বাড়িতে এ কথাটা খুব চালু আছে যে ছবিব জন্ম না হলে ওকেই ওর চাচা পুষ্যি নিতেন। পুষ্যি নিন বা না নিন, দাউদকে মানুষ করার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি বাখেননি হাজী সাহেব। ওকে ইশকুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ও বছরের পর বছর ফেল করে গিয়েছে, কী করবে, পড়তে ওর মোটেই মন লাগেনি, হাজী সাহেব হাল ছাড়েননি। কিন্তু ক্লাস এইট বছর তিনেক ঘষ পেড়ে ও নিজেই ইশ্‌কুল ছাড়ল।

নৌকোটাব উপর ছই নেই। জেলে ডিঙি। একটা শ্যাওড়া গাছের ছায়া এতক্ষণ পড়েছিল। ছায়াটা এবাব সবে গেল। প্রখর রোদ এবাব সবাসরি দাউদের মাথায় পিঠে এসে পড়তে লাগল। ফকিরকে গোব দিতে যে পোশাকে বেরিয়েছিল, সে পোশাকটা সে আর ছাড়েনি। কাছেই পোত্ত বাঁশেব খুঁটি পুঁতে বড়শিতে ব্যাঙ গেঁথে বড়শিগুলো সাব সার নদীতে ফেলে রাখা হয়েছে। গোরস্থান থেকে ফেরবাব পথেই বাজানকে সে অনুরোধ করেছিল, চাচার কাছে গিয়ে তার কথাটা পাড়তে। বহমান হাজী সাহেবকে বিলক্ষণ চেনে, চেনে এই বাউন্ডাবা ছোট ছেলেটাকেও। তাই সে ছেলের কথায়, তার কাকুতি মিনতি উপেক্ষা কবতে না পেরে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাই-এর কাছে ছেলেব জন্য দববারে গিয়েছিল। প্রায় এক পহব বেলা হাজী সাহেবের সামনে চুপ করে ব'সে থেকে, দুজনে পাশাপাশি কেবলারোখ দাঁড়িয়ে জোহরের নামাজ শেষ করে অত্যন্ত হতাশ এবং ছেলের উপর বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাজানেব মুখ থেকে সব বিত্তান্ত শুনবার পর দাউদ প্রথমে বেশ ভয় পেয়ে যায়। সে অনুভব করে তাব পায়েব তলা থেকে মাটি সবে যাচ্ছে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়েই ঘাটে বাঁধা ডিঙিটায় চড়ে বসে। এটা তাব অনেক দিনের অভ্যেস।

তার মন যখন অস্থির হয়ে ওঠে অশান্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে কোনো কিছু ঠিক মত বুঝতে পারে না, মানুষের সংস্পর্শ তার কাছে ভয় বা ঘৃণা বা বিভ্রান্তিব কাবণ হয়ে ওঠে দাউদ তখন তাদের এই ছোট ডিঙিতে এসে আশ্রয় নেয়। আগে, তার বালক বয়সে, যখন নবগংগা এতটা মজে যায়নি, কচুরিপানায় এমন আষ্টেপৃষ্টে ভরে যায়নি, যখন আবও অনেকখানি জায়গা জুড়ে টলটলে জল ছিল, তখন খুব নৌকা বাইত দাউদ। একা একা ডিঙি বেয়ে মনেব ভাব লাঘব করত। বাইচও খেলত দারুণ। নিকিরিপাড়ার বাইচের নৌকোব সঙ্গে ও অঞ্চলের কেউই এঁটে উঠতে পারত না। হরিশঙ্করপুরের ভবশঙ্কর মেমোরিয়াল শিল্‌ড ছিল ওদের বড় লোভনীয় বস্তু। পর পর আটবার নিকিরিপাড়ার দল বাইচে জিতে সেই শিল্‌ড জিতে এনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। দাউদ শেষের দিকে নিকিরিপাড়ায় নৌকোয় পর পর তিনবার বৈঠে বাইবার সুযোগ পেয়েছিল। আর একবার পেয়েছিল হাল ধরবার দুর্লভ সম্মান। অতএব সে ফালতু লোক নয়। জেলে ডিঙির হাত-বৈঠেটা সে তুলে নিল। একবার জলে ডোবাল, আবার তুলে নিল, মুখের কাছে এগিয়ে আনল, মুখ দেখছে না কি, তারপর ধড়াস করে সেটা ধড়াটের উপর ফেলে দিল। এক আঁজলা পানি নিয়ে তেষ্টা মেটালো। তারপর শূন্য চোখে গাঙ-ভর্তি কচুরিপানার দিকে চেয়ে থাকল। গাঙ আর গাঙ নেই, এখন চট করে দেখলে মনে হয় গরু-চরা মাঠ। এখন যা কিছু পানি, ঐ দহটা ঘিরে। দাউদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

চাচা এবার বড় রাগান রাগেছে সে ব্যাপারে সন্দ নেই। দাউদ ভাবল। চাচা তারে যে যে মোকামে

পাঠিয়েছে সেখানেই তাকে নিয়ে কিছু কিছু গোলমাল হয়েছে। কোথাও সে ইয়ার-বকশি জুটিয়ে ফুর্তি-ফার্তা মারতে গিয়ে কারবার ঢিলে করে দিয়েছে। কোনও মোকামে চাচা তাকে নতুন কারবার খুলতে পাঠিয়েছেন আর সে শুধু টাকা নষ্ট করেছে। অথচ ওর ধারণা ছিল, ব্যবসা জিনিসটার মত সোজা কাজ আর নেই। দাউদ ওর বাপকে জাল বাইতে দেখেছে, ওর বাপ এখনও জাল বায়, সে নিজেও ইশকুলের বিভীষিকা থেকে বাঁচবার জন্য যখন ইশ্কুল পালাত, তখন কিছুদিন গুড বয় হয়ে বাপের সংগে বিলে বাওড়ে জাল বাইতে যেত। সে বড় কঠিন কাজ। বড় পেরেশানি। দুদিন জলকাদা ঘেঁটেই তার উৎসাহ উবে যেত। সে হাঁপিয়ে পড়ত। যে-কাজে শুধুই পরিশ্রম এবং টাকার আমদানি এত কম, সে কাজে আর যেই থাক, দাউদ নেই। অনেক দিন তার বাপকে শুধু হাতে ফিরতে দেখেছে সে। কখনও কখনও না-বলে বেশির ভাগ সময়েই বলা ভাল, বড় চাচীর বাড়ি থেকে, কখনও বা ছোট আম্মার বাপ হালুয়া-নানার বাড়ি থেকে ধার-কর্জ করেই ওদের সংসার চলেছে। ওরা কখনোই সে ধার শোধ দিতে পারেনি। মাছ ধরে সংসার চলে না। তাই ফের ইশ্কুলে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু সেখেনেও সুবিধা করতে পারেনি। ক্যান আমি কিছু কবে উঠতি পারিনে? কচুরিপানার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অথচ বড়চাচাকে দ্যাখ। যেদিন থেকে মাছ-ধরার কাজ ছেড়ে মাছ-বেচার কাজ ধরেছে সেদিন থেকেই তার ছিরি ফিরেছে। এখন কেবল হয় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে বসে ফরশি টানে, না হয় দহ্‌লিজে বসে পাঁচজনের সংগে পাঁচ রকম কথা বলে, আর টাকাগুলো আপ্‌সে আপ্ নানা জায়গা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে তার সিন্দুকে এসে ওঠে। দাউদ আসলে তার বড়চাচাব মত হতে চায়। সে কোনও পরিশ্রম করবে না, তার বড়চাচা করে না, সে মোকামের গদিতে ইয়াব বক্‌শি নিয়ে গল্প গুজব করবে, দহ্‌লিজে। মজলিশ জমিয়ে তার বড়চাচা তাই করে। যখনই যে মোকামে তাকে পাঠানো হোক, সেখানে পেঁছেই সে দাউদ মিঞা বনে যায়। দিন কয়েকের মধ্যেই তার ইয়ার জুটে যায়, যারা তার ইউসুফের মত রূপের প্রশংসা করে, সেই গঞ্জের মধ্যে যে তাব চাইতে উঁচু নজরের কেউ নেই, কেউ বা আল্লা কেউ বা কালীর কিরে কেটে তাকে তা শোনায়। সে সব কথা শুনতে তার ভাল লাগে। এবং বিশ্বাস করে। ফলে তার হাতের মুঠো খুলে যায এবং হাজী সাহেবের তহবিল ফাঁক হয়ে যায়। বিলবাওড় জমা নেবার কথা ঠিক সময়ে মনে পড়ে না। জমা নেওয়া বিল-বাওড়ের ডাকের কিস্তি কাছারিতে পাঠাবার কথা দাউদের মনে পড়ে না। মাছ চাপা দেবার বরফ যথেষ্ট পরিমাণে মজুত না থাকায় অনেক সময় মোকামের মাছ পচে যায়। নিকারি এবং জেলেদের সংগে বন্দোবস্ত সময়ে না করায় মাছ ধরার লোকের অভাব ঘটে যায়। এবং এ সব ব্যাপারে দাউদকে আদৌ উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হতে দেখা যায় না। তার ধারণা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এই ধরনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে সময়ক্ষেপ করা বৃথা। কারণ কারবারের লাভ-লোকসানের সংগে এই সব বিষয়ের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। হাজী সাহেব আসলে যার জন্য আজ করে খাচ্ছেন তা হল তার নসিব। আর কিছু না। দাউদের নসিব এ পর্যন্ত খারাপ যাচ্ছে তাই তার আর মালদার হওয়া হয়ে উঠছে না। নসিব ঘুরলে সবই ঘুরবে। দাউদ সহজে যাতে মালদার হতে পারে, তার জন্য চেষ্টার কসুর করেনি। ইয়ার বন্ধুদের সংগে মেলায গিয়ে সারারাত জুয়া খেলেছে। জেতেনি। বদ্‌নসিব। তাব চাচার কারবারের তহবিলে টান পড়েছে' বেজায় মুশকিলে পড়েছে। তার মোসাহেবরা তার এই বিপদে অস্থির হয়ে পীরের দরগায় ছুটাছুটি করে মানত করে এসেছে। বালা মুছিবত দূর, সহজে মালদার হওয়া, দরিদ্রতা নিবারণ ও হাবানো ইজ্জৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নানা রকম অব্যর্থ তাবিজ কবচ, নানা বুজুর্গদের কাছ থেকে দোয়া ও দরূদ, আমল ও তাবিজের ব্যবহারবিধি, পীরের দোয়া ও ইজাজত এনে দিয়েছিল। কাজ হয়নি। দাউদের বদ্‌নসিব।

চাচা বেজায় রেগে গিয়ে তাকে সেই মোকাম থেকে সরিয়ে এনে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন। আবার রাগ পড়লে কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানা সদুপদেশ দিয়ে তাকে আরেকটা মোকামে পাঠিয়েছেন। এত লোকসান যাবার পরও হাজী সাহেব দাউদকে যে আবার মোকামে পাঠিয়েছেন তার কারণ নয়মোন বিবি। দাউদ যখনই বাড়িতে ফিরে আসত, বসে থাকত, তখনই ঢালাও আদরে সোহাগে ফুটকিকে দিন কতক একেবারে যেন সাত আসমানের উপরে তুলে রাখত। তারপর দাউদের মন খুব খারাপ হয়ে পড়ত। উদাসভাবে মন মরা হয়ে বাড়িতে ঢুকত, মুখ চুন করে ফুটকির সামনে ঘুরত, মাঝে মাঝে সোহাগে ঢিলা দিত। ভালবাসার ঢল কমে এলেই ফুটকি অস্থির হয়ে উঠত। সে তখন খসমের সোয়াদ পাওয়া যেন বাঘিনী। তার এই দুর্বলতার সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করত দাউদ। বলত তার মনঃকষ্টের কারণ। চাচা তার উপর বেজায় নারাজ হয়েছে। দোষটা অবিশ্যি তারই। চাচার ভাল হবে বলে যে কাজটা করতে গিয়েছিল, তার অভিজ্ঞতার অভাবে তাতে চোট খেয়ে গিয়েছে। ঐ রকম ভুল তার আর হবে না।

ফুটকির মন টলটল করে উঠত তার খসমের মুছিবতে। তার সেই ভিজে মনে এবং ক্ষুধার্ত দেহের উপর দাউদ, তার খসম, বার বার ঢেলে দিত সোহাগের সুতীব্র আরক। মাঝ রাত থেকে রাত ভোর পর্যন্ত শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন দাউদ, যেন দুরন্ত ঝড়, তাকে আছাড় দিত, উড়িয়ে নিত। বিপর্যস্ত বিবসন ফুটকির নিঃসাড় দেহটা তারপর পড়ে থাকত বিছানায়, আশ্বিনের প্রবল ঝড়ের পরে উথাল-পাতাল গাঙের মৃত মাছ ডাঙায় পড়ে আছে যেন। পরদিন সে আপনা থেকেই

যেত বড় বু-এর কাছে। নয়মোনের কাছে ছলছল চোখে জানাত তার খসমের মনঃকষ্টের কথা। বড়ভাই যাতে তার খসমের অনিচ্ছাকৃত দোষঘাটের কথা ভুলে যায়, সে আরজ বার বার পেশ করত বড় বু নয়মোন বিবির কাছে। দেখা যেত কয়েকদিনের মধ্যেই দাউদের মুশকিলের আসান হয়ে গিয়েছে। সে আবার নতুন মোকামে গিয়ে বসেছে।

নাঃ, কাল রাতে ফুটাকিকে অতটা মারা উচিত হয়নি দাউদের। ফুটাকি বিগড়ে যাওয়া মানেই, দাউদ শংকিত হল, নিজের মুছিবত ডেকে আনা। চাচার মন যদি কেউ নরম করতে পারে তো সে ফুটাকি। কাজেই ফুটাকিকে বিগড়ে দেওয়া মানে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি! আর সে কি না কাল তাই করেছে! নিজের মাথায় ডাং মেরেছে! হায় আল্লা। অথচ কাল সে ফুটাকিকে আদৌ মারতে চায়নি। সে বরং তাকে আদর করার জন্যই অস্থির হয়ে উঠেছিল। খোদা কসম। ওকে পিটবার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। নিজের দোষে কাল ফুটাকি মার খেয়েছে। কাল অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল ফুটাকি। দাউদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, এই কথাটা জানা যে, সে তার কথাটা তুলেছে কি না হাজী সাহেবের কানে? জিজ্ঞেস করেছে কিনা যে, দাউদকে আর কতদিন বসিয়ে রাখা হবে? প্রস্তাবটা তোলামাত্রই ফুটাকি, তার নিকে করা বিবি ফুটাকি, স্রেফ এক কথায় জানিয়ে দিল, সে হাজী সাহেব অথবা নয়মোন বিবিকে আর কখনোই দাউদের কথা বলতে পারবে না। দাউদ ওগের টাকা লোকসান করে দেবে আর সে ঐ ব্যাপারে মদত দেবে, উঁহু তা আর হবে না। ফুটাকি অনেক লোকসান ওগের করিয়ে দিয়েছে। আর না।

শুধু তাই নয়, ফুটাকি ফট্ করে বলে বসল, দাউদ চাটমোহরের মোকামে যা কাণ্ড করে এসেছে অন্য কেউ হলে এতদিনে জেল হয়ে যেত দাউদের। ভাইজান তো শুধু চাকরি ছাড়িয়ে এনে বসিয়ে রেখেছে। এতেই তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই কথা শুনেই, আল্লা-মালুম, কাল রাতে দাউদের মাথায় চড়াক করে রাগ উঠে গিয়েছিল। আসলে কাল তার ফুটাকিকে মারবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। বরং উল্টো। ফুটাকিকে আদর করবার বাসনাতেই সে বরং ছটফট করছিল। রাখহরির বাইতির বাড়ি থেকে বেশ রাত করেই এক বুক কামনার জ্বালা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল দাউদ। এসে দেখে ফুটাকি হাজী সাহেবের বাড়ি গিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিল তার কথাই বুঝি বলতে গিয়েছে। সে বরং খুশিই হয়েছিল। পরে শুনল, না, তার কোনো কাজ হাসিল করার জন্য যায়নি। ও বাড়ির জামাই ফটিক মিঞা এসেছে। ফুটাকি গিয়েছে ছবিকে সাজাতে। তখন তার ফুটাকিকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করছিল। তার শরীল তখন গরম। তার আর তর সইছিল না। কাজেই ফুটাকি আসতে যত দেরি করছিল, দাউদ তত অসহিষ্ণু, তত বিরক্ত হয়ে উঠছিল। তত তার রাগ ধোঁয়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার এমনও মনে হচ্ছিল যে যাই, রাখহরির বাড়িতিই আবার চলে যাই। তিষ্টার জ্বালডা সেখানেই মিটোয়ে আসি। আল্লাহ্ অ্যামন মেয়েমানুষও দুনিয়ায় আছে!

কালো! রাখহরি আশ্চর্য সুন্দর একটা নাম তাকে দিয়েছে। কালোজিরে! রাখহরি এই প্রথম তার সংগে দাউদের আলাপ করিয়ে দিল। গোড়ায় গোড়ায় দাউদের সংযমের রাশ বেশ টান টানই ছিল। কারণ কালোজিরেকে দাউদ ভেবেছিল রাখহরির বউ।

বউ! কালোজিরে যেন ছোবল মেরে উঠল। বোতল ফুরিয়ে যাওয়ায় দাউদের বারণ সত্ত্বেও রাখহরি তাকে তার বউ-এর কাছে বসিয়ে রেখে লুহাজাঙ্গার শুড়িবাড়ি টলতে টলতে ছুটল একটা বোতল আনতে। দাউদ আতান্তরে পড়ল। একা ঘরে সে আর কালোজিরে আর একটা লণ্ঠন। আর কেউ না। কালোজিরে! নামটা দাউদেরও বেশ পছন্দ। শুধু কি নাম? মেয়েমানুষটাই বা কী? শরীলির কী গড়ন? যেন একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে। ঘরে যখন খরখর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সব শরীল নাচাতে নাচাতে, দাউদের বুকে তখন খালি যেন ঢেঁকির পাড় পড়ছিল। রাখহরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই দাউদ গলগল করে ঘামতে শুরু করল। নাঃ! আর না। আর থাকা যায় না। এর পর কিছু একটা ঘটে গেলে কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি থাকবে না। চাটমোহরের মোকামে যে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, তারপর না, আর না। বিশেষ করে নিজের গ্রামে সে কোনো রকম কেলেঙ্কারীতে জড়াতে চায় না। এখানে হাজার হোক তাদের বাপ-দাদার একটা মান ইজ্জৎ আছে। তাই সে ওঠার জন্য উসখুস করছিল।

কালোজিরে দাউদের সুঠাম দেহ, সৌখিন চেহারা আর রূপের জেল্লা দেখেই মজে গেল। কিন্তু কী করছে দ্যাখ? নতুন এ'ড়েকে কেউ বুঝি পাল খাওয়াতে এনে বক্না গাইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কালোজিরে আড়চোখে দাউদের রকমসকম দেখে মজা পাচ্ছিল। উস্খুসুনিডা দেখতিছ একবার! ঐ যে কথায় বলে, পেটে খিদে মুখে লাজ, মেনিমুখো বরকন্দাজ। এ যে দেখি তাই। লোভ আছে ষোল আনা, এক ছিটে সাহস নেই।

কালোজিরে দুহাত মাথার উপরে তুলে টানটান বুক চিতিয়ে বেজায় শব্দ করে আড়মোড়া ভাঙল।

বলল, উঃ, বিজায় ঘুম পাতিছে।
দাউদ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।
বলল, ইবার আমি যাই।
কালোজিরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বঁড়শিতে টানা-দেওয়া একটা খুঁটি উপড়ে এল। বাপরে, বিক্রম দেখে বেশ বড় বুয়াল বলেই তো মনে হচ্ছে। দাউদ ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘপ্‌পোং ঘপাং। আরে আরে! এ খুঁটোটাও যে উপড়ে গেল। ব্যাপার কী? কত বড় মাছ! খুঁটি উপড়ে নেবার মত মাছ তাগের নদীতে তাগের জন্মে কেউ দেখিছে কি না সন্দেহ। বাপ-দাদারা হয়ত দেখিতি পারে।

দাউদ লুঙিগটা সামলানোর সময় পেল না, দেখল, মাছটা এক হ্যাঁচকায় এদিকের খুঁটিটাও উপড়ে দিয়েছে। আরেকটা হ্যাঁচকার ওয়াস্তা, তাহলেই মাছটা পালিয়ে যাবে তার নাগালের বাইরে। সে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে খুঁটোটা চেপে ধরল। ঘপাং। বিরাট একটা হ্যাঁচকা টানে আরেকটু হলেই জলে পড়ে যাচ্ছিল দাউদ। সামলে নিল। ঘপাং। ডিঙি নৌকোটা একটানে অনেকখানি চলে এল গভীর জলে। মাছটার জোর দেখে সে বিস্মিত হল। বঁড়শির খুঁটোটা দুহাতে শক্ত করে ধরে রইল দাউদ। রশিতে ঢিল পড়তে দিল না। বসে তেমন জোর পাচ্ছিল না দাউদ। ও লাথি মেরে কয়েকটা ধড়াট সরিয়ে দিয়ে ডিঙির খোলে পা দিয়ে দাঁড়াল।

শয়তান মাছটা মুহূর্তে এমন দিক পরিবর্তন করল যে, দাউদ সতর্ক হবারও সুযোগ পেল না। ডিঙিটা চরকির মত ঘুরে গেল। একদিকে হঠাৎ কাত হয়ে গেল। দাউদ টান সামলাতে না পেরে ঝপাং করে জলে পড়ে গেল। ঘপাং। মাছটা বিরাট লাফ দিল। দাউদ দড়িতে জড়িয়ে মাছের টানে তার ডিঙি থেকে আরও সরে গেল। তাকে কেবল ডুবতে আর ভাসতে দেখা যেতে লাগল।

॥ ২০ ॥

"ইন্নাহ লিল্লাহি ওয়া ইন্নাহ ইলায়হি রাজিউন" ফকিরের মৃত্যুর সংবাদ ছেলের মুখে পাওয়ামাত্র সাজ্জাদ দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে চোখ বুজল এবং অভ্যাস বশে বিড়বিড় করে "ইন্নাহি লিল্লাহি" আউড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেই ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু দেহে বা মনে কোথাও যেন একফোঁটা উৎসাহও আর অবশিষ্ট নেই। ঘামের পানির সঙ্গেই তা বুঝি বেরিয়ে গিয়েছে। তাই কোনো রকম শোক বা দুঃখ সে অনুভব করল না। সে এখন খুবই শ্রান্ত। একেবারে নিস্তেজ। খেতে ভালবাসত সাজ্জাদ, খেতে পারতও খুব। সারাদিন তো খায়নি কিছু, এখন তো বেলা প্রায় ডোবে-ডোবে, তবুও সাজ্জাদের খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। তামুক খেতে তো এত ভালোবাসে সাজ্জাদ, খেতে ইচ্ছেও হচ্ছে, কিন্তু তামুকটা যে সেজে নেবে, সে উৎসাহ নেই, তার বিবিকে বললেও হয়, মুখ দিয়ে ইচ্ছেটা শুধু জানিয়ে দেবার ওয়াস্তা, তাহলেই সে ঢেঁকির পাড় বন্ধ করে রেখে এসে তামুকটা সেজে দিয়ে যায়, কিন্তু একটুখানি চেঁচিয়ে যে তার বিবিকে ডাকবে, অতটুকু উৎসাহও আর বোধ করল না সাজ্জাদ।

কেন, তার ছেলে? সে তো বসে আছে সামনে। তাকে কেন তামুক সাজতে বলছে না সাজ্জাদ? কাকে বলবে? নিজেকেই সে পাল্টা প্রশ্ন করল। তার ছেলেকে? ফটিককে? শফিকুল মিঞাকে! এক লহমায় তার মনে একটা ছবি খেলে গেল। বিদ্যুৎগতিতে পাঁচন-বাড়ি হাতে তার নেংটি-পরা ছেলে, ফটিক বাপ্, দৌড়ে এসে পিরেনতহবন্ধ্ পরা শফিকুল মিঞার শরীরে ঢুকে গেল। ফটিককে সে অনায়াসে তামাক সাজার কথা বলতে পারত। কিন্তু শফিকুল মিঞাকে কি তা বলা যায়? চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্রই মাথাটা তার কেমন হাল্কা হয়ে গেল। সে উচিত-অনুচিত বুঝে উঠতে পারল না।

ঢেকুস্ কুস্ সপস সপস সপস—

ঢেঁকির আর কুলোর একঘেয়ে একটানা শব্দটা সাজ্জাদের ভিতরে একশ গুণ জোরদার হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

সাজ্জাদের মুখের ভিতরে একটা জ্বরো স্বাদ। জিভটা বের করে সে একবার শুকনো ঠোঁটটা চেটে নিল।

"বাজান!"

ছেলের মুখ থেকে মোলায়েম ডাকটা শুনে সাজ্জাদ শ্রান্ত চোখ দুটো মেলে তার দিকে চেয়ে রইল। ফটিক দেখল ওর আব্বু বোবা চোখে ওকে দেখছে। এই চাউনিটার পিছনে নিষ্ফল পরিশ্রম, বঞ্চনা এবং ক্ষুধা ও ব্যাধির কামড়ের যে সুদীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মুহূর্তে তার আবরণটা সরে গিয়ে ফটিকের চোখে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। তার কেমন মনে হতে লাগল, তার আব্বার, তার আম্মার, তার সংসারের এই দুর্দশার জন্য সে দায়ী।

সকাল দশটা নাগাত সে এবাড়িতে ঢুকেছিল। সেই ঢোকার মুখে তার কানে ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ ঢেঁকি-পাড়ের অবিশ্রান্ত এই শব্দটা ঢুকেছিল। এখন বিকেল। শব্দটা এখনও থামল না। এখনও তার কানের পর্দায় তা ঘা মেরে চলেছে। এখনও তার আম্মা ঢেঁকিতে পাড় দিয়েই চলেছে, দিয়েই চলেছে। সারাদিন সে কিছু খায় নি। তার কারণ, ফটিক জানে, আব্বাজানকে না খাইয়ে তার আম্মা কিছুতেই কিছু খাবে না। হয়ত ভালোবাসার জন্য, হয়ত ঘরে খাদ্যের

পরিমাণ এতই কম আছে যে আম্মাজান তা খেয়ে নিলে তার বাপের জন্য আর থাকবে না কিছুই। তাই এরা সোয়ামী যতক্ষণ না খায়, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু খায় না। ফটিক দু-একবার ওর আম্মাকে খেতে বলেছিল। চাঁদবিবির ওই এক কথাঃ খাবানে বাপ্ খাবানে। তোর বাপেরে আগে উঠতি দে। মুখি কিছু দিক আগে। তারপরই সে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করেছে। অনর্গল কথা বলছে শুধু ঢেঁকি, ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ আর নাছিফার কুলো সপস সপস সপস। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সে-ই শুধু বেমানান। সে কোথাও খাপ খাচ্ছে না।

ফটিক দেখল ওর বাপের শূন্য দৃষ্টি তখনও তার দিকে চেয়ে আছে। ক্ষুধার্ত, রিক্ত, ব্যর্থ ব্যাধির তাড়নায় বিপর্যস্ত কৃষকের চোখে মুখেই শুধু এই ধরনের শূন্য দৃষ্টি ভেসে উঠতে পারে। ওঠে। ফটিক জানে, এই শূন্যতা, বোবা অথচ অর্থবহ এই দৃষ্টি এমন কি তার মুখেও ফোটা সম্ভব নয়। কারণ যে অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ যে মাত্রাছাড়া শারীরিক পরিশ্রম এবং যে পরিমাণ মানসিক অনিশ্চয়তা থেকে এই ধরনের অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়, এবং এই ধরনের বোবা অথচ অর্থময় দৃষ্টির জন্ম দেয়, ফটিক জানে সে কোনোদিনই আর সেই অভিজ্ঞতার শরিক হতে পারবে না।

ফটিক বলল, "বাজান, পানি দেবো? খাবেন?"

সাজ্জাদ বলল, "পানি। গলাডা শুকোয়ে গেছে।"

ফটিক কুয়োর থেকে টাটকা পানি তুলে নিয়ে এল। বাপকে খেতে দিল। সাজ্জাদ চকচক করে পানি খেয়ে গলা ভেজাল। একবার ওয়াক তুলল। কিন্তু তারপর সামলে গেল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে ঝিম ধরে পড়ে থাকল।

ঢেকুস্ কুস্ ঢেকুস্ কুস্ সপস সপস সপস—

"চাচা আছো নাকি? চাচা?"

ডাক শুনে সাজ্জাদের ঝিমোনোর ভাবটা কেটে গেল। মেন্দাগের পাইক গয়া কৈবর্তের মতো গলা মনে হচ্ছে যেন?

"কিডা? গয়া নাকি?"

"হ্যাঁ গো চাচা আমি।"

"তা আ'সো, ভিতরে আ'সো।" সাজ্জাদ ডাক দিল।

গয়া ভিতরে ঢুকে সাজ্জাদকে আদাব জানাল। তারপর ফটিকের মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকার পর গয়া বলল, "ফটিক না? হ্যাঁ আমাগের ফটিকই তো? তাই কও, বলি মুখখানা চিনা চিনা লাগতিছে, অথচ চিনতি পাত্তিছি নে। মনে মনে কই, এ মিঞা কিডা হ'তি পারে? ও ফটিক, চিনতি পাত্তিছ না? আমি গয়া। তুমার ছাওয়াল সোহ্‌রাব গো। সেই যে তুমি রুস্তম সা'জে আমারে চিতপাত করি কাদার মদ্যি ফ্যালায়ে দিতে, তারপর ফকিরির নকল ক'রে সেই যে কত রকম সব ছড়া কাটতে, মনে পড়িছে?"

গয়াকে মনে পড়েছে। ওর পেটে পিলে ছিল বলে অন্যান্য রাখালেরা ওকে "পেট ডগুরে পুণ্ডা ম'ড়ে" বলে খেপাতো। ফটিকের মনে পড়ল। আর গয়া তারস্বরে গাল পাড়ত। কেবল ফটিকের সঙ্গেই তার ভাব ছিল। ফটিক রুস্তম সাজত আর গয়ারাম সাজত সোহ্‌রাব।

ফটিক চিনতে পারল, তবে তেমন কোনও আবেগ তার এই বাল্যকালের বন্ধু তার মনে সঞ্চারিত করতে পারল না।

সে একটু ঠাণ্ডা ভাবেই বলল, "আদাব আরজ।"

ফটিকের ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা গয়াকে অপ্রস্তুত করে দিল। সে বেকুবের মত কিছুক্ষণ ফটিকের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাজ্জাদকে বলল, "চাচা, তুমি ঠিকই ধরিছিলে। মেন্দা সাহেব কিছু খাস জমি বন্দোবস্ত দেবেন। মোট কুড়ি পঁচিশ কিতে হতি পারে। ইস্‌টেটের দেওয়ান হালিম সাহেব, লোকটা ত্যামন নিদয় নয় বুঝিছ। তবে হাড়ে হারামজাদা হইছে সদরের নায়েব ঐ শালা জীবুনে কায়েত আর আমাগের গিরামের ঐ রামতারণ গোমস্তা। মেন্দাগের ইস্‌টেট এই দু শালা কায়েত চুষে ছুবড়া করে ফ্যালতিছে। বুঝিছ। শালার গোমস্তারে অ্যাত করে কলাম, হুজুর আমি ইস্‌টেটের লোক, আপনার গুলাম। আমার বাড়ির পাশের গয়ালগের প'ড়ো ভিটেটা খাস হয়ে গেছে। হুজুর, উডা আমারে দিয়ে দ্যান। আমি গরিব পিয়াদা, পয়সা কড়ি কনে পাব। তবে হুজুরির দয়ার কথা চিরকাল মনে রাখব। তা এটটুও কি ভিজল? গ্যালাম দেওয়ানবাবুর কাছে। তিনি আরউ সরেস। আমারে সুজা গোমস্তাবাবুরি দ্যাখায়ে দেলেন। ঘ্যানো আমি ইস্‌টেটের পাইক নই। বুঝলে। শেষ পর্যন্ত দুই শালারে পান খাওয়ায়ে তবে সেই প'ড়ো ভিটের দখল পালাম। আমার চৌরি ঘরখানা যে ভিটের উপর তুলিছি, সেইডের কথাই কচ্ছি। এতেই বুঝতি পারবা, ঐ দুই শালা রক্তচুষা কায়েতরে পান না খাওয়ায়ে এ গিরামে একফালি জমিরউ দখল পাওয়ার উপায় কারুর নেই। কথাডা এই জন্যিই তুমারে ক'য়ে রাখলাম চাচা, যে তুমি আমার আপনার লোক। পরে আমারে ভুল না বোঝ। বুঝিছ?"

ফটিক চুপ ক'রে থাকল। সাজ্জাদও। গয়ারাম কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করে বলে উঠল, "কী

ব্যাপার গো চাচা। মুখখানা অ্যাতো শুকনো শুকনো দ্যাখাচ্ছে। জ্বরে ধরিছে নাকি?"

সাজ্জাদ বলল, "হয়, ধরিছে। তুমি কি আজ বুঝলে?"

গয়ারাম বলল, "এই দিগরে, ঘরে ঘরে জ্বর। সদর কাছারিতে যদি থাকতে তালি বুঝতি পারতে দেশের অবস্থাডা কী? গত বছর পেরথমে খরা। ধান পাটের চারাই করা গ্যালো না। আবার পরের দিকি অ্যামন ভাসাই ভাসলো যে কিছু হল না।"

সাজ্জাদ বলল, "তুমার ঐ জমিদারী চালির কথা রাখো দিন। এই জ্বরের থে উঠলাম। শরীলডেয় জুত পাতিছি নে। আগে এট্টু বেশ কড়া করে তামুক সাজো দিন দেখি। তারপর দেশের কথা কইও।"

গয়া বলল, "তা যা কইছো।"

গয়া উঠে গিয়ে তামুক সাজতে সাজতে বলল, "ইবার যে কি হবে চাচা, কী যে খাবো?"

সাজ্জাদ বলল, "তুমার আবার ভাবনা। তুমি হলে জমিদারের পাইক। পিরজার গলায় গামছার ফাঁস পরালিই টাকা।"

গয়ারাম কলকেয় একটান দিয়ে সাজ্জাদের হুঁকোয় কলকেটা পরিয়ে হুঁকোটা তাকে দিয়ে দিল। সাজ্জাদ কষে বেশ কয়েক টান তামাক খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে তুলল।

গয়া বলল, "চাচা আমারে ঠাট্টা করতিছ। গলায় গামছা! সেদিন আর আছে ভাবিছ? এখন পিরজার গলায় গামছা দিতি গেলি, সে গামছা যে কার কনে ঢোকবে তা জানো? কিন্তু একথা তুমি ঐ গোমস্তা হারামজাদা আর ঐ শালার পো শালা দেওয়ানডারে বুঝোতি পারবা?"

সাজ্জাদের আশু সমস্যা হল, হুঁকোটা তার ছেলেকে দেবে কিনা তাই। সাত পাঁচ ভেবে না দেওয়াই সাব্যস্ত করল। উকিল ছাওয়ালের মন-মতির হদিশ সাজ্জাদ জানে না। সেই কারণেই সে এত ইতস্তত করছিল। তাই সে একটা সুখটান দিয়ে কলকেটা আবার গয়ার হাতেই তুলে দিল।

কলকে চুষতে চুষতে গয়া বলতে লাগল, "বুঝিছ চাচা, শালার গোমস্তার মুখ দিয়ে কি কোনও কথা বের করা যায়! সবাই এখন কচ্ছে মেন্দা সাহেবগের জমিদারির রস অ্যাখন নাকি গুটোয়ে আসতিছে। মাগরো, শৈলকুপো, কুমোরখালির মহলগুলো সব ছাড়ে দেছেন। তাই সদর কাছারিউ গুটোয়ে আনতিছেন। এই নিয়ে ম্যানেজারে আর সদর নায়েবে বাধে গেছে চুলোচুলি। ছোট মেন্দা এর মধ্যি নেই। তিনি সেই যে পনের বছর আগে বাড়ির থে বেরোয়ে আসে হাটে পাটের আড়ত খুলে বসিছেন সেই অব্দি ইস্টেটের সঙ্গে তার সম্পর্ক পিরায় নেই। আমি সদর নায়েবেরে বুঝোয়ে দিছি যে আমাগের গিরামের গোমস্তা শালা তলে তলে ম্যানেজারের সঙ্গে জোড় বাঁধিছে। ম্যানেজার আমারে কয়েছে, গোমস্তার উপর নজর রাখতি। এই করেই তো জানে নিলাম আমাগের গিরামের এক কিতে খাস বিলেন জমি ইস্টেট ইবার জমা-বন্দোবস্ত দেবে। নিতি যদি পার চাচা তো নিয়ে রাখ। ছয় বিঘের একটা তোক্ আমাগের গিরামেই আছে। বিশ্বেসগের আম বাগানের লাগোয়া খাজনা হল গে ছয় টাকা।"

সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "আর সেলামী?"

"তা সেলামী আর কত হবে?" গয়া বলল, "ম্যানেজার তো কলো, বুঝলে চাচা, ইস্টেটের ডাক হবে কুড়ি টাকা। তা তুমি যদি রাজি থাক, ভাবে দ্যাখ, আমি ম্যানেজাররে কয়ে দেখতি পারি। গুটা দশেক পান খাতি দিলিই ও শালারা তুষ্ট হয়ে যাবেনে, বুঝিছ। এই তোক্টা তালি আর উরা ডাকে তোলবে নানে। তুমি ঐ বিশ টাকা সেলামীতেই উডা পায়ে যাবানে। তালি ধর গে তুমার সেলামী হল গে বিশ, পান খাওয়ার খং হল গে—"

এতক্ষণে ফটিক জিজ্ঞেস করল, "খংটা কী?"

গয়া বলল, "ই সব হল সেরেস্তার জমাখরচের অং বং খং। খং মানে খরচ।"

ফটিক বলল, "অ।"

গয়া বলল, "জমিদারীর হিসেব ধরতি পারা চাড্ডিখানি কথা নয়। যে সে ধরতি পারেউ না।"

ফটিক বলল, "শুধু ম্যানেজারকে দশ টাকার পান খাওয়ার খং দিয়ে দিলেই জমিদারীর খাঁই মিটে যাবে?"

গয়ারাম বলল, "আর লাগে আমলা ফি। তা সে তো শতকরা মাত্তর দশ টাকা। তা সে আর কতই বা লাগবে। সেলামী বিশ আর খাজনা ছয় একুনি ছাব্বিশ টাকা। তার হল গে শতকরা দশ টাকা। অর্থাৎ দু টাকা নয় আনা সোয়া সাত পাই। তালি একুনি হল গে আঠাশ টাকা নয় আনা সোয়া সাত পাই, তা আট পাই-ই ধরে নাও, আর পান খাওয়ার খং তুমার ধর গে দশ টাকা, তালি একুনি তুমার গে দাঁড়াল ছত্রিশ টাকা নয় আনা আট পাই। এক সিকি টাকা অর্থাৎ কিনা নয় টাকা দুই আনা পাঁচ পাই, চাচা তুমি সঙ্গে সঙ্গে আগাম জমা দিয়ে বায়না করলে আর পনের দিনির মধ্যি বাকী টাকাটা দিয়ে জমি একেবারে তুমার দখলে নিয়ে চলে আলে।"

সাজ্জাদ বলল, "জমি যে নেব, টাকা কনে? আর জমি নিয়েই বা করব কী? চষবে কিডা? এই বুড়ো হাড়ে যেটুকু জোত চষতাম, তিন বছর ধরে তাউ চষতি পারিনে। জ্বরে জ্বরে ভুগে শরীলির আর কী আছে? লাঙলের মুঠো ধরব জোর পাইনে, একটা পাক দিছি কি না দিছি বুক এমন ধড়ফড় করে যে বসি পড়তি হয়। বাকী খাজনার দায়ে এখন আমার জমিই জমিদারের ঘরে জমা করে দিতি হবে। যে জমি চষতি পারবই না, তার খাজনা তস্য সুদ আর টানে করব

কী? তাই চাইতি জমিদারের ঘরে জমা করে দিয়াই ভাল।"

গয়া বলল, "জমিদারের ঘরে জমা করে দিলি হবে লবডঙ্কা। তার চাইতি আর কারুর বেচে দ্যাও না।"

সাজ্জাদ বলল, "তিন বছর ধরে ধান হচ্ছে না, কিন্তু আমরা চাষারা যার যেটুকু হয়েছে সেটুকু হাটে নিয়ে গিয়ে শুনি ধানের মণ বার আনা চোদ্দ আনা, দিবা তো দ্যাও নাহলি পথ দ্যাখ। ব্যাপারীগের কথাবার্তার এই হ'ল ধরন।"

গয়া বলল, "কুষ্টার অবস্থাও তো তাই।"

সাজ্জাদ বলল, "কুষ্টা! ঐ দ্যাখ গত বছরের কুষ্টা এখনও গলায় ঝোলছে। কুষ্টার কথা আব কোয়ে না। গেল বছর চাষের খরচই পাড়ছিল দু টাকা। সেখানে মোকামের দর ছিল পাঁচ সেকে দেড় টাকা মণ। সব কুষ্টা বাড়ি আ'নে ছাওয়ালের ঘরে ভ'রে রাখিছি। হবার হয় ঐ কুষ্টা খাতি হবে আর না হয় পাকায়ে গলায় দিয়ে ঘরের আড়ায় ঝুলে পড়াতি হবে। তুমি গয়ারাম, এই পড়ন্ত বালায় চাষার কাছে জমির খবর নিয়ে আ'লে! হায় আল্লা! তুমার আরউ বছর পনেরো আগে আসা উচিত ছিল। তখন এক কিতে ক্যান্ এক কানি জমিব খববউ যদি কেউ আনে দেছে, তো তারে কাঁধে তুলে নাচিছি। কিন্তু অ্যাখন জমির মায়া কাটায়ে উঠিছি বাপ্। হযত মালেকের তাই-ই ইচ্ছে।"

গযাবাম চলে যাওয়ার একটু পরেই ঢে'কিব পাড়টা বন্ধ হল। চাঁদবিবি আর নছিফা তখন দুটো কুলোয় প্রাণপণে কাঁড়া চালগুলো ঝেড়ে চলেছে। সপস সপস সপস। নছিফা এবং চাঁদবিবি উভয়েই পরিশ্রমে এত কাতর যে কেউ কারো সঙ্গে একটা কথাও বলছে না। আজান শুনে চাঁদবিবি বুঝল মাগরেবেব নামাজটাও তাব কাজা হয়ে গেল। হায আল্লা। একবার ভাবল, এই নামাজটা সে পড়ে নেবে। কতদিন পবে তাব ছাওযাল, তার ফটিক বাড়ি আয়েছে, আজ, কি নামাজটা কাজা করা তাব উচিত হবে? কিন্তু উপায় কী? এখনই যদি হাত চালানো বন্ধ কবে ওবা, তবে কাজ পিছিযে যাবে। বরং আজ ছাওয়াল বাড়ি আয়েছে, আজ কিছু চালউ পাওযা যাবে, এ ব্যালা ভাত রাঁধে চাঁদবিবি তার ছাওয়ালবে খাওয়াতি পারবে।

এইটুকু প্রেরণাই চাঁদবিবিব শ্রান্ত এবং শিথিল শবীরটাকে চাঙ্গা করে তুলল। দুটো পা সেজায় ভারি হযে উঠেছে দুজনেব। দুজনের ডানাতেই টাস ধবে এসেছে। কিন্তু তবুও সপস সপস সপস কুলো ঝাড়ার বিবাম নেই কাবো। এখন আর কোনো কিছুর জনাই থামা যায় না।

নামাজের বিছানা ফটিকই পেতে দিল এবং বাপ ও ছেলে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জামাতে মাগরেবেব নামাজ শেষ করল। ফটিকের মনে হল, গতকাল ঠিক এই সময সে পাশেব গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ির পবিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত দহলিজে এই নামাজটা পড়েছিল। আজ এই একটু আগেই পড়ল তাব নিজের বাড়িতে, যেখানে তার জন্ম। অনেকদিন পরে সে নামাজ পড়ল তার বাপের পাশে দাঁড়িয়ে। তবু সে কেন এ বাড়িতে এত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে? সে পড়াশুনা করেছে বটে, সে তার বাপের পেশায় ফিরে যায়নি, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যই তো কুপমণ্ডুকতা থেকে নিজেকে মুক্ত কবা। সে তো তার বাপের ঘাড়ে বোঝা হয়ে, বাপের পযসা নষ্ট করে পড়াশুনা করেনি? তবে? তবে তার এই আত্মগ্লানি কেন? এর জন্যে কি সেই দায়ী? ধরা যাক, সে যদি পড়াশুনা না করত, যদি সে বাপের সঙ্গে লাঙ্গলই ঠেলত, এবং অনেক আগেই বিয়ে-শাদি কবত, ছেলেপুলে দারিদ্র্যে ও ব্যাধিতে তার দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্নকে কণ্টকিত করে তুলত, যদি সে বাংলা দেশের অগণিত অশিক্ষিত এবং দারিদ্র্য জর্জরিত কৃষকের সংখ্যায় আরেকটি বার্থ কৃষকের সংখ্যা যোগ করত, তাতেই বা কার কী লাভ হত? তার মায়ের এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সে লাঘব কবতে পারত? বড়জোর সে বিবি এনে তার মাকে একটা সঙ্গী দিতে পারত। কিন্তু তাব বেশী সে কী উপকাবটা করতে পারত? তার বাপের কোন্ পরিশ্রমটা সে লাঘব কবতে পারত? অবিশ্যি সে বাপের সঙ্গে সঙ্গে সে তার প্রাতিদিনের দুঃখদারিদ্র্য, দুশ্চিন্তা এবং ম্যালেরিয়াটা ভাগ কবে নিতে পাবত। কিন্তু কলকাতায় সেও তো খুব সুখে ছিল না। দিনেব পর দিন তাকেও কি সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়নি? থাকতে হয়নি একপেটা আধপেটা খেয়ে? কলকাতার মুসলমান, সে বড় অদ্ভুত জাত। একটা জায়গীর পাবার জন্য কোথায় না হন্যে হয়ে ঘুরেছে। পার্ক সার্কাস, তালতলা, ওয়েলেসলি, বেনেপুকুব, বৈঠকখানা, রাজাবাজার, চিৎপুর, কাশীপুব, একবালপুব, মোমেনপুর, খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, যেখানে যেখানে মুসলমান বসতি, কোথাও আর ঢু মাবতে বাকি রাখেনি ফটিক। সবাই ছেলে পড়াবার জন্য উরদুভাষী বিহারী বা আপ কানট্রির মুসলমান মাস্টার চায়। তাদের জায়গীর পেতে অসুবিধা হয় না। বাঙালীরাও তাদের বাড়িতে এনে রাখে, অবাঙালীরা তো বাঙালীদের পাত্তাই দিতে চায় না, তা সে বাঙালীরা যতই কেন উরদু বলুক, কি লখনউ-এর আদব তামিজের অনুকরণ করে "পহলে-আপ, পহলে-আপ" করুক। কলকাতার মুসলিম সমাজে কোথাও সে একটা টিউশানী জোগাড় করতে পারেনি। যদিও তার মাইনর এবং মিডিল ইংলিশ ইসকুলে শিক্ষকতা করার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। সে গুরু ট্রেনিং পাশ। মিডিল ইংলিশ ইসকুলে সে অ্যাসিসট্যান্ট হেড মাস্টার ছিল।

তার সহপাঠিনী মিস লতিকা পালিত বরং উদারতা দেখিয়েছিল, তার এক দিদির মেয়েকে

পড়াবার সুযোগ করে দিয়ে। ফটিকের প্রথম দিনের ঘটনা বেশ মনে আছে। তাকে দেখে তার ছাত্রী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও মাসী, তুমি যে বলেছিলে আমার জন্য একজন মাসটার মশাই আনবে। মাস্টার কোথায়, এ তো দেখছি মুসলমান। মিস পালিতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মিস পালিতের অবস্থা দেখে সেদিন সে নিজের মান-অপমানের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাছাড়া সে তখন ডুবছে এবং এইটেই তার শেষ আশ্রয়। সে তার ছাত্রীকে বলেছিল, ঠিক বলেছ খুকি, আমি মুসলমান। তবে আমি যেমন মুসলমান তেমনি আবার ভালো মাস্টারও বটি। জানো তো আমার কাছে পড়লে মোটেই বই খুলতে হয় না। মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলেছিল, তাই বুঝি। একদম বই খুলতে হবে না। কী মজা! আমি তবে তোমার কাছে পড়ব।

জায়গীর পায়নি, কিন্তু টিউশানী পেয়েছিল। সে প্রমাণ করতে পেরেছিল যে সে পড়ায় ভালোই। তার প্রথম ছাত্রী রেণু এবার আই এ-তে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ তাকে মুসলমান সমাজ দেয়নি, দিয়েছে হিন্দু সমাজ। মিস পালিতের করুণা সে কখনো ভুলবে না, যেমন ভুলবে না কলকাতায় তার অনাহারের জ্বালা।

তবে কি তার ম্যালেরিয়াটা হয়নি, তার বাপের হয়েছে, এইখানেই তফাৎ ঘটে গেল? এত তফাৎ! ফটিক তার বাপের দিকে চাইল। সাজ্জাদ গয়ারামকে যে কথাগুলো বলল, সে কি তাকেই শোনাবার জন্য? তাই কি ফটিক এতক্ষণ ধরে কৈফিয়ৎ দিল মনে মনে।

ফটিক ভেবে দেখল লেখাপড়া শিখে কিছু অন্যায় করেনি। অন্যায় করেছে রোজগার না করে। ওকালতি পড়তে যাবার আগে সে দারেপুরের মিডিল ইংলিশ ইসকুলে পড়াতো। অ্যাসিস-ট্যানট হেড মাস্টার হয়েছিল। হেড মাস্টার হরিপদ বাঁড়ুজ্জে বুড়ো হয়ে কাজ ছেড়ে দেবার পর বছর দুয়েক অস্থায়ী হেড মাসটার তাকে করা হয়েছিল। ফটিক উৎসাহের সঙ্গে খেটে ইসকুলের চেহারা বদলে দিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট, দশ আনির জমিনদার অ্যানড অনারারি ম্যাজিসট্রেট রায় পি সি ব্যানারজি বাহাদুর, সেক্রেটারি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বাড়রি, বি এ বি এল দশ আনির ম্যানেজারবাবু, এঁরা সবাই তাকে প্রশংসা করেছেন। পড়াশুনোয় খেলাধুলোয় বেশ নাম করেছিল তার ইসকুল। বাবুরা এমন কথাও তাকে বলেছিলেন যে তার ধারণা হয়েছিল সেই শেষ পর্যন্ত হেড মাসটার হবে।

এই দু বছরই তার জীবনের সব চাইতে ভালো বছর। কিছু টাকা সে মাস গেলে ঘরে আনছিল। তার বাপের দশাসই চেহারা তখনও টসকায়নি। ফটিকের দেওয়া টাকায় ওর বাপ একটু একটু করে বন্দকী জমিগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। ওকে মেন্দার মত লোকও বেশ খাতির করতে শুরু করেছিল। মেজোকত্তা ওকে দু-পাঁচ টাকা করে পোস্টাপিসের সেভিংস ব্যাংকে জমাতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কেননা, ফটিক যখন এতটাই এগিয়ে এসেছে, তখন আরেকটু এগিয়ে বি টি পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলুক। তারপর কোনো বড় ইসকুলে চাকরি পেলে প্রাইভেটে এম এ-টা দিতে পারবে। কথাটা ফটিকের মনে ধরেছিল এবং মেজোকত্তার কথামত টাকা জমাতে লেগেছিল। ভাগ্যিস তার টাকাগুলো জমেছিল। তাই তার ওকালতি পড়ার ইচ্ছেটা পুরণ হয়ে গেল। তবে দারেপুরের ইসকুলে তাকে অমনভাবে বেইজ্জৎ না হতে হলে তার উকিল হওয়া হত কিনা সন্দেহ।

ফটিক নাওয়া খাওয়া ছেড়ে ইসকুলটার যাতে উন্নতি হয়, তার চেষ্টা করতে শুরু করল। গরিব মেধাবী হিন্দু মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র এনে ভর্তি করতে শুরু করল। তার তখন বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে। ফটিকের ভ্রূক্ষেপ নেই। তার ধ্যানে তখন শুধু ইসকুল। এমন সময় যা অভাবিত তাও ঘটল। স্বয়ং মেন্দা তার এক মেয়ের সঙ্গে ফটিকের বিয়ে দেবার জন্য ওর বাপের কাছে পয়গাম পাঠালেন। আর সে পয়গাম পাঠাবার কায়দাও অদ্ভুত। পেয়াদা পাঠিয়ে তার বাপকে নিজের গদিতে ডাকিয়ে আনলেন। বিয়ে ভেস্তে গেল। ফটিক ইসকুল নিয়ে তখন মেতে আছে।

দুবছর পর ওকে কিছু না জানিয়েই ঐ ইসকুলের শিক্ষক, ওর চাইতে বয়সে বড়, স্রেফ এই অজুহাতে, মাণিক্য বকসীকে হেড মাস্টার করা হল। এই আঘাতটা বড় বেজেছিল ফটিকের। ওর মত যোগ্য এবং ভালো একজন শিক্ষক থাকতে, যার যোগ্যতার কথা ইসকুল কমিটিই স্বীকার করেছে, একজন কম দরের শিক্ষককে, যে এসটেটের ম্যানেজারের ছেলেকে মিনি মাগুনায় পড়ায় এবং ইসকুলে কেবল ঘোট পাকায়, কী করে সেই একই ইসকুল কমিটি যে তাকে হেড মাসটার নিযুক্ত করতে পারে তা আজও বুঝতে পারেনি ফটিক। তাহলে বিচার বলে কি দুনিয়ায় কিছু নেই? যোগ্যতার দাম আল্লার তৈরি এই জগতে কী ভাবে তাহলে স্থির করা হবে?

ফটিক ইসকুল থেকে পদত্যাগ করল। কানাঘুষো শোনা গেল ফটিক ইসকুলের টাকা মেরেছে তাই তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কদিন পরে আবার শোনা গেল, না টাকা পয়সার কোনও গোলমাল নয়, স্বদেশী। ফটিক খদ্দরের সুতো কাটে, খদ্দর পরে। এমনিতে মুসলমান হলে কি হয়, তলে তলে ও স্বদেশী। স্বদেশীদেরই চর। রাজভক্ত প্রজা তৈরি করাই যে ইসকুলের কাজ তার হাল স্বদেশীর চরের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। পরের খবর আরও মারাত্মক। সে মোছলা। মুসলমান ছোঁড়াদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিগড়ে দেবার মতলব নিয়েই ফটিক ঐ ইসকুলে ঢুকেছিল। এমনিতেই প্রজারা বশে থাকছে না। প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষক-প্রজা পারটির নেতারা রোজই এটা সেটা দাবি তুলছে। ময়মনসিং, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম,

কুমিল্লা, রাজসাহী, পাবনার জমিদাররা কৃষক-প্রজা পারটির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর কারা এর সঙ্গে জড়িত? ফটিকের মত যারা গরিব চাষার ঘর থেকে লেখাপড়া শিখে উঠে আসছে, তারা। এদিকে এখনও অবিশ্যি ওদিকের মত অবস্থা হয়নি। প্রজারা বশেই আছে। কিন্তু এখন না হয় নেই, হতে কতক্ষণ। কাজেই দশ আনির বাবুরা দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষতে আর রাজী হলেন না। সাবধানের বিনাশ নেই। তাই ফটিককে যেতে হল।

"বাজান, শরীরটা কি খারাপ লাগছে?" ফটিক বাপকে জিজ্ঞেস করল। "শোবেন একটু? আপনার খিদে পায়নি?"

"খিদে আজকাল আর তেমন করে পায় না বাপ। পেটজুড়া পিলে।"

কিন্তু সাজ্জাদের তার চাইতেও বড় আফসোস অ্যামন সুন্দব জো পায়েও সে আজ কৈবর্ত্ত পাড়ার মাঠের আউশির জমিডের চাষ দিতি পারলো না। ক্যাবল জমিডে ভাঙিছে, আর অমনি কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসে গেল। হাল বলদ আলাদা কত্তি পারে না, অ্যামনই কাঁপুনী। কী করে যে শেষ পর্যন্ত বাড়ি পৌঁছুল, তা আল্লাই জানে।

"বাজান, অ্যাতো ভোগা ঠিক না। ডাক্তার দেখান। আচ্ছা, আমি কাল এসে আপনাকে যতীন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবোখন।"

"কা'ল আসবা মানে?" সাজ্জাদ নিস্পৃহভাবে প্রশ্ন করল, "আ'জ থাকবা কনে?"

সাজ্জাদের মন পড়ে আছে মাঠে। ইস্, আর দু পহর সুমায় পালিই মাঠটা সে তৈরি কবে রেখে আসতে পারত। বদনসিব। বদনসিব বিটা মালোয়ারি আর ঘাড়ে চড়ার সুমায় পা'লো না। ইবার যদি আউশ নষ্ট হয়, পাট সে করবে না, তবে আর বাঁচান নেই। ফৌত হ'য়ে যাতি হবে। সাজ্জাদ একটা হিসেব কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। দেশী চালের দর যেখেনে দু টাকা মণও ওঠে না, ব্যাপারীরা কেনে না। সেখেনে রেঙ্গুনির ঐ মুটো গুমো গন্ধআলা চাল আড়াই টাকার নিচেই বা বিক্রি হয না ক্যান? গত বছর পাট বুনে সাজ্জাদ গুখ্খুরি করিছে। ইবার সে আউশ বোনবে।

"আ'জ আমি আপনার বিয়াই বাড়ি ফিরে যাব।"

চাঁদবিবি কুঁড়োভর্তি ধামাটা কাঁখে করে গোয়ালের দিকে যাচ্ছিল। ছাওয়ালের কথা শুনে ধামাটা উঠোনে রেখে, সেখানেই বসে পড়ল।

কাতরভাবে বলল, "ও বাপ্, আ'জ থাকবি নে। আমি আরউ ভাবলাম, ও ব্যালা শুধু জাউ খায়ে থাকলি, এ ব্যালা চাড্ডে চাল পালাম, তোরে ভাত রাঁধে খাওয়াব। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি আলি।"

ফটিক বলল, "তা বেশ তো, আজ যদি খাওয়াতে চাও, খাওয়াতে পার। কিম্বা কাল দুপুরেও খাওয়াতে পার। যা তোমার ইচ্ছা। ও বাড়ির থেকে সকালে বেরিয়েছি তো?"

চাঁদবিবি কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। তার শ্রান্ত মগজ কিছু গ্রহণ করতে পাবছিল না। বলল, "তা আলি কবে?"

ফটিক বলল, "কাল সন্ধ্যেবেলা।"

চাঁদবিবি এবার একটু উৎসাহ বোধ করল। বলল, "হ্যাঁ বাপ্, বউ বিটির পছন্দ হইছে তো? ভাবসাব হইছে তো? আর কদ্দিন অ্যামন ফাঁকা বাড়িতি প'ড়ে থাকব বাপ তাই ক? বউ বিটির ইবার আনে ফ্যাল। তোর বাপ, আমি বুড়ো হয়ে গ্যালাম। গা গতর আর চলে না। ইবার বউ আসুক। ঘুরুক ফিরুক। বউডারে ঘিরে আমরা আবার বাঁচে উঠি। অ্যাদ্দিন তুই যা কইছিস আমরা কথা রাখিছি। ইবার আমাগের কথাডা রাখ বাপ। শুকনো ছিনার তিষ্টা মিটুক।"

"আরে ঐ," বারান্দা থেকে সাজ্জাদ হাঁক দিল, "ও ফটিকির মা, বাপেরে ইবার ছাড়ে দে। অন্ধকারে অ্যাতটা পথ যাবে। আল্লার মনে যা আছে তাই হবে। তুই কাঁদে কী করবি?"

॥ ২১ ॥

আল্লাহ বলে ডাকবার ফুরসতও পেল না দাউদ। এক হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল। নাকের ভিতর দিয়ে খানিকটা জল সোঁ করে তাব টাকরায় গিয়ে খোঁচা মারল। দাউদের দম বন্ধ হয়ে এল। বাতাস! বাতাস চাই তার। প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে এক লহমার জন্য ভুস করে ভেসে উঠল। দ্রুত খানিকটা বাতাস কলজেয় ভরে নিল। চারদিকে কচুরিপানা ভাসছে। আকাশ, আকাশ! আলো! আঃ! দাউদ দু হাতে কিছু একটা চেপে ধরতে চাইছিল। একটা শক্ত কিছু। কিন্তু কচুরিপানা ছাড়া তার হাতের কাছে কিছুই আর পেল না। মাছটা একটা ঘাই মারার সঙ্গে সঙ্গে সে আবার তলিয়ে গেল জলে।

দাউদ এবার নিজের বিপদটা বুঝতে পারল। লুঙ্গিটা ভিজে পায়ে জড়িয়ে গিয়েছে, ফলে পা দিয়ে জল কাটতে পারছে না। তার উপর বঁড়শির খুঁটোটা পেঁচিয়ে গিয়েছে তার শরীরে বাঁ পায়ের গোছে। ফলে মাছের টানের সঙ্গে সে অগাধ জলে অসহায়ভাবে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যেই তার দম ফুরিয়ে এল। বাতাস! বাতাস! ইয়া আল্লা একটু বাতাস! প্রাণপণে সে শুধু ডানার জোরে জল ঠেলে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। বাতাস! বাতাস! দাউদের বুক বোধ হয় ফেটে যাবে। আর পারে না, সে বুঝি আর পারে না। তার চোখে কালো কালো ফুটকি ভেসে

উঠছে। বাতাস! একটু বাতাস! ভুস করে ভেসে উঠেই দাউদ এক মুখ হাওয়া গিলে ফেলল। ঐ সঙ্গে খানিকটা জল এবং কচুরিপানার শিকড়ও। থুঃ করে মুখ থেকে কচুরিপানার শিকড় সে ফেলে দিল। গলায় জল ঢোকার জন্য একটু কেশেও নিল। তারপর শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিল। যদি কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে। শূন্যতা তাকে কোনও আশ্রয় দিল না। মাছের প্রবল টানে সে আবার তলিয়ে গেল। এবং এবার মাছটাকে আবছা আবছা দেখতে পেল। যে তাকে টানছে। প্রচণ্ডভাবে ভয় পেয়ে গেল দাউদ। এই মাছটা তার মৃত্যুর দূত। বঁড়শির খুঁটোটা সে যদি তার শরীর থেকে খুলে ফেলতে পারে, তবেই তার বাঁচোয়া। না হলে আজ জলে ডুবে মৃত্যু তার অবধারিত।

বাতাস! বাতাস! দাউদের বুকে, আবার চাপ পড়ছে। আবার উপরে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল দাউদ। বাতাস! কিন্তু মাছটা এবার তাকে মেরে ফেলতে কৃতসংকল্প। তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে দহটার দিকে, যেখানে এখন অন্তত দু মানুষটাক জল। দাউদ মুহূর্তে মাছের মতলবটা বুঝতে পারল, এবং তার মতলব বানচাল করে দেবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। কিন্তু এবার মাছটা ওকে উঠতে দিচ্ছে না। টানছে, কেবলই টেনে নিয়ে চলেছে। উঃ বাতাস! একটু বাতাস চাই। না হলে দাউদ মরবে। তার ছাতি ফেটে যাবে। অনেক চেষ্টায় ভুস করে ভেসে উঠল দাউদ।

"বাঁচাও! বাঁচাও!" তার আর্তনাদ বেরুতে না বেরুতে মাছটাও একটা ঘাই দিল! ঘপাং। আর তার পরই আবার এক হ্যাঁচকা টানে দাউদ তলিয়ে গেল। এবার সে ভয় পেল। প্রচণ্ড ভয় তাকে নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় করে তুলল। তার আর এ যাত্রায় নিস্তার নেই। সে মরবে। সে মরছে। বাতাস! বাতাস! আল্লাহ। একটু বাতাস।

কলজেয় বাতাসের অভাব দাউদকে আবার মরীয়া করে তুলল। মাছটাও মরীয়া। তাকে গোঁয়ারের মত কেবলই টেনে নিয়ে চলেছে। বঁড়শিটা তার গলায় গাঁথা, দড়িটা দাউদের গায়ে জড়িয়ে আছে। মাছের টানে দড়িটা টান টান হয়ে আছে। দাউদ দড়িটা তার শরীর থেকে খোলার চেষ্টা করল। পারল না। বাতাস! লুঙ্গিটা হাঁটুর উপর তোলবার চেষ্টা করল। বাতাস চাই! বাতাস! লুঙ্গিটা যা হোক করে খানিকটা তুলল। আল্লাহ বাতাস! বাতাস! মাছটার প্রবল টানে দাউদ চিত হয়ে গেল। বাতাস! মাছটা হুড় হুড় করে টানছে তাকে। বাতাস, বাতাস, বাতাস! মাছের টানে আবার উল্টে গেল দাউদ। বাতাস! তার একটা হাত বঁড়শির দড়িতে পড়ল। আল্লাহ বাতাস চাই বাতাস। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। বাতাস! তার এখন বাতাস চাই। সে খপ করে দু হাতে বঁড়শির দড়িটা চেপে ধরল। উঃ উঃ বাতাস আল্লাহ! তার এখন এক চেষ্টা, উপরে উঠবে সে, আকাশ দেখবে আর বুক ভরে বাতাস টানবে। বাতাস!

উঃ বাতাস! আল্লাহ বাঁচাও বাঁচাও। দাউদ কিছু ভাবছে না। ভাববার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। তার হাত তার পা তার অজ্ঞাতসারে কাজ করে যাচ্ছে। বাতাস আল্লাহ বাতাস! দাউদের হাত দুটো বঁড়শির দড়িটা স্পর্শ করা মাত্র মারল জোরে টান। এক লহমার জন্য বুঝি মাছটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার গতি স্তব্ধ। দড়ির টান-টান ভাবটা বেশ শিথিল হয়ে গেল এবং দাউদ ভুস করে ভেসে উঠল। এবং দাউদ বুক ভরে বাতাস নিল।

কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই মাছটা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একটা ঘাই দিল। ঘপ পাং। দাউদের পায়ে পেঁচিয়ে-যাওয়া-দড়িতে পড়ল প্রচণ্ড টান। দাউদ উল্টে গেল। আবার চিত। এবং মাছটা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। কিন্তু ততক্ষণে দাউদ কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। দু হাতে চেপে ধরে আছে বঁড়শির দড়ি। মাছটার এই গোঁয়ার ঘাড়-ত্যাড়া জেদ ভাবটা হঠাৎ তাকে ফুটাকির কথা মনে পড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড একটা রাগ তার শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। অতি কষ্টে সে উপুড় হল। দাউদের মাথায় তখন খুন চেপেছে।

সুম্মুন্দির মাছ। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে দু-হাতে ধরা বঁড়শির দড়িতে মারল এক ঝিঁকে টান। এবং তাইতে যে-আলগা বঁড়শিটা এতক্ষণে মাছটার মুখের খুব কাছে দুলছিল, এতক্ষণের আলোড়নে মাছটার মুখের এদিকে সেদিকে আলতোভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরে যাচ্ছিল, কামড় দেবার সুযোগ পাচ্ছিল না, সেটা এখন আকস্মিকভাবে মাছের একটা চোখের ভিতর গেঁথে গেল। মাছটা আবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাউদ আবার একটা টান মারল। মাছটা খানিকটা এগিয়ে এল দাউদের দিকে। দড়ির টান খানিকটা ঢিলে হল। দাউদ ভুস করে ভেসে উঠে এক বুক নিঃশ্বাস নিল। আঃ! আল্লাহ! নদীর পানির শীতল এবং বৈরী ছাদের উপর মুখ ভাসিয়ে সে প্রাণভরে আকাশ দেখে নিল। দেখে নিল ভাস্বর সূর্যকে। খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। আর সে নদীর মধ্যে। মাছের টানে দহটার খুব কাছেই এসে পড়েছে। আর দু পাশের ডাঙাও বেশি দূরে নয়। তাদের পাড়ে যে খাসীটা চরছে সেটা এরসাদ ভাই-এর তাও চেনা যায়।

আবার হ্যাঁচকা টানে মাছটা তাকে ডুবিয়ে দিল। টেনে নিয়ে গেল। দাউদ আবার ডুবে গেল। মাছটা এবার বেজায় অস্থির। একবার দাউদকে এদিকে টানছে একবার ওদিকে। দাউদ চিত হচ্ছে উপুড় হচ্ছে। দাউদের মতলব যেন সুম্মুন্দির মাছটা টের পেয়ে গিয়েছে। তাই দাউদকে শক্তি সঞ্চয়ের, আক্রমণ রচনা করার কোনও সুযোগ সে যেন দেবে না। তাই সে লাফাচ্ছে

ঘাই মারছে। একবার অতর্কিতে দাউদের মুখে তার ল্যাজার বাড়ি সপাৎ করে এসে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল দাউদ। আল্লার দয়ায় তার চোখটা বড় জবর বেঁচে গিয়েছে। মাছটার ল্যাজার থাপ্পড় খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গেল দাউদ। বঁড়শির দড়ি থেকে একটা হাত ফসকে গেল তার। মাছের দিগ্‌বিদিক হারা প্রবল টানে সে এখন অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। খানিকটা নিস্তেজও হয়ে আসছে। হাঁফ এসে যাচ্ছে তার। সে প্রাণপণে হয় পায়ে নয় হাতে একটা শক্ত আশ্রয় পেতে চাইছে। তাই মাছটা তাকে ডুবিয়ে চুবিয়ে অস্থির করে তুললেও সে তার পা এবং তার হাতকে আশ্রয়ের অন্বেষণ থেকে বিরত রাখেনি। তার খালি হাতটা যা কিছু পাচ্ছে চেপে চেপে ধরছে। কচুরিপানা, ঝাঁঝি দাম, কলমির লতা, শাপলার নাল, পচা বাঁশের টুকরো কোনও কিছুই আর ধরতে বাকি রাখছে না। কিন্তু হায়, আশ্রয়ের পক্ষে কোনোটিই নির্ভরযোগ্য নয়। তার শরীরের নানা জায়গা কেটে যাচ্ছে। জ্বলুনি শুরু হয়েছে সারা শরীরে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় মাছটাকে বাগ মানাতে চাইছে, পারছে না। পালাতে চাইছে, পারছে না। তার বিবি, ফুটকি যখন ঘাড় ত্যাড়া করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ঠিক এমনই একটা ভাব দাউদের হয়। সে তাকে বাগ মানাতে চায়, পারে না। তখন ফুটকির কাছে দাউদের নিজেকে বড় ছোট মনে হয়, সে বেজায় ছোট হয়ে যায়। ফুটকি যেন মালেকা আর দাউদ যেন তার চাকর। গোলাম। ফুটকির নরম, সুন্দর, ঢলঢল মুখটা, যে-মুখ তার মুখে চেপে চেপে তার আশ মিটত না এক সময়, সেই মুখটাই আবার যখন উপেক্ষা, অবজ্ঞা, তাকে আদৌ গেরাহ্যি না-করার এক-গুঁয়েমিতে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন দাউদ কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়ে। কোথাও যেন আশ্রয় পায় না। সেই সময় ফুটকির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হত। তার সরে পড়তে ইচ্ছে হত। পারত না। হঠাৎ মনে পড়ত দাউদের তার তো বিবিকে ভয় করার কথা নয়। ফুটকিরই বরং তাকে ভয় করার কথা। মান্য করার কথা। কেননা সে তার খসম। আর সঙ্গে সঙ্গে, সে যে ফুটকির অটল ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেকে ছোট মনে করেছিল সে জন্য তার শরীরে প্রচণ্ড রাগ ছড়িয়ে পড়ত। আর তখনই, সে যে ফুটকির চেয়ে ছোট নয়, নিজেকে এটা বোঝাবার জন্য, ফুটকিকে নির্দয়ভাবে পিটত। কোন্ দিন হয়ত ফুটকিকে খুনই করে ফেলবে।

সুম্মুন্দির মাছ! তোর মার জাত মারি। রাগে শরীর কস কস করে উঠল দাউদের। এ সেই খুনে রাগ। বিচার বিবেচনাশূন্য, নির্দয়। ফুটকির একগুঁয়েমি যাকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়। যে-রাগ তার কাণ্ডাকাণ্ড বোধ বিলুপ্ত করে দেয়। মাছের টানে তাকে অসহায়ভাবে ভেসে বা ডুবে বেড়াতে হচ্ছে। এ তো আত্মসমর্পণ। এ তো ছোট হয়ে যাওয়া। নিকিরির রক্ত তার শরীরে যেন টগবগ করে ফুটে উঠল। সুম্মুন্দির মাছ। তখনও কিছুটা বাতাস তার কলজেয় ছিল। সে তারই জোরে জবরদস্তি উপরে উঠল। বুক ভরে বাতাস নিল। তারপর ডুব দিল, মাছের টানে নয়, এবার নিজে। এক হাতে বঁড়শির দড়ি ধরাই ছিল। নিজের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে আসায় সে অন্য হাতেও দড়িটা ধরে ফেলল। তারপর ডুব সাঁতার দিতে দিতে দু হাতে বঁড়শির দড়ি ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। একটা দুটো তিনটে। মাছটা এক লাফ দিল। কিন্তু দিয়েই নেতিয়ে পড়ল। একটু পরেই বঁড়শির দড়িতে একটা ল্যাজার ঘাই মারল। আবার নেতিয়ে পড়ল। খুব কাছ থেকে মাছটাকে এবার দেখল দাউদ। কাত হয়ে ভাসছে। চোখে গেঁথা বঁড়শির ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

শালার মাছ জোড়নে পড়িছে। ক্ষুধার্ত জন্তুর মত দাউদের উল্লাস যেন গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল। ঘাপান না খালি কোনো শালাই বশ মানে না, তা সে মাছই হোক আর মেয়েমানুষই হোক। দাউদ দম নেবার জন্য উপরে ভাসল। কিন্তু দম নিতে না নিতেই মাছের টানে ডুবে গেল দাউদ। আচমকা তার শ্বাসনালীর মধ্যে জল ঢুকে গেল। খুক খুক কাশল জলের মধ্যে। বুড়বুড়ি উঠল। আরও খানিকটা জল গেল পেটে। আরও অনেকগুলো বুড়বুড়ি উঠল। ভয় পেয়ে দাউদ জলের উপর ভেসে উঠতে চাইল। উঠলও। কিন্তু একটা খাবি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার তলিয়ে গেল। তার দু হাত থেকেই বঁড়শির দড়ি ছিটকে পড়ল। বঁড়শির একটা খুঁটো আর দড়ি আর তার পা এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে সে কিছুতেই তা খুলতে পারছে না। তবু বঁড়শির দড়িটা হাতে থাকা মানে একটা ভরসা। কেননা তাতে সে মাছটাকে আঘাত হানতে পারছিল। মাছের শক্তিটাকে সে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল। এখন ক্রমাগত পায়ের উপর টান পড়ায় দাউদের পায়ের দিকটা মাছের দিকে এবং তার মাথাটা বিপরীত দিকে ঘুরে গেল। অসহায়, সম্পূর্ণ অসহায় দাউদ মাছের টানে চরকির মত ঘুরপাক খেতে লাগল। এই সে চিত হয়ে ঘুরছে, এই সে কাত হচ্ছে, উপুড় হচ্ছে আবার চিত হচ্ছে। মাছটা তাকে ইচ্ছে মত চরকির পাক খাওয়াচ্ছে। বাতাস! দাউদের শ্বাসকষ্ট শুরু হল। বাতাস! আল্লাহ্ বাতাস! মাছটা খুব ঘোরাচ্ছে ওকে। বাতাস! খুব খেলাচ্ছে। আল্লাহ! উঃ! বাতাস, একটু বাতাস। দাউদের মাথাটা সীসার মত ভারি হয়ে উঠেছে। বাতাস! নদীর তলদেশের দিকে ক্রমশ নেমে যেতে চাইছে। বাতাস! বাতাস! হঠাৎ মাছের টানটা একটু কমল। মাছই এখন ভেসে উঠতে চাইছে। শ্রান্ত ক্লান্ত। দাউদ নিকিরিবৃত্তি করে না। কিন্তু ওদের আবহমান রক্তের অভিজ্ঞতা, ওদের আজন্ম সংস্কার দাউদকে জানিয়ে দিল যে তার দুশমনের দমও ফুরিয়ে এসেছে। এখন তাদের দুজনের মধ্যে যে আগে থামবে সেই মরবে। না, দাউদ মরবে না। সে মুসলমান। নিশ্চেষ্ট

আত্মসমর্পণ তার ধাতে লেখা নেই। সে ঐ মাছের জেদই ভাঙবে। এবং এই চেষ্টায় যদি সে মরেও সে শহীদের দরজা পাবে। আল্লাহ্! শেষ শক্তি সংগ্রহ করে সে দুটো ক্লান্ত ডানা দিয়ে জল সরিয়ে সরিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। বাতাস বাতাস! পানির কালো পুরু ঢাকনাটা তার ডানার প্রতিটি ধাক্কায় একটু একটু করে রঙ বদলাচ্ছে। বাতাস! কালো থেকে গাঢ় নীল। বাতাস, বাতাস! দাউদের ডানা বুঝি আর পারে না। বাতাস বাতাস বাতাস! নীল ঢাকনাটাও রঙ বদলাচ্ছে। দাউদের ডানার চাপ ক্রমশ কমজোরি হয়ে আসছে। বাতাস বাতাস বাতাস! দাউদের নাক থেকে একটা দুটো করে বুড়বুড়ি বেরিয়ে ওর চোখের উপর দিয়ে উপরে উঠছে। একবার মুখ থেকে ভক্ করে একসঙ্গে অনেকটা বাতাস বেরিয়ে একটা জলের গোলাকে উপরে তুলে দিল। বাতাস! নীল ঢাকনা ফিকে নীল হয়ে উঠল। দাউদ তার ডানা দুটো আর বুঝি নাড়াতে পারে না। সে দেখল তার মাথায় পানির ছাদ পাতলা হয়ে আসছে। উপরে ঝিলিমিলি খেলা শুরু হয়েছে। বাতাস বাতাস! দাউদ আল্লার দিকে তার চোখ দুটোকে মেলে ধরে আছে। এবং দেখছে আল্লা তার দিকে কচুরিপানার গুচ্ছমূল ঝুলিয়ে রেখে ইশারা দিচ্ছেন, আয় বান্দা নিজের হিম্মতে উঠে আয়। ঐ কচুরিপানার পাতার উপরেই খেলে বেড়াচ্ছে সেই প্রাণদা আশীর্বাদ, বাতাস, যা তুই চাইছিস আমার কাছে। ওঠ বান্দা ওঠ। নিজের হিম্মতে ওঠ। তার নিরাশ প্রাণে এই বার্তা প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করল। এবং পরক্ষণেই ক্লান্ত একখানা মুখ এক চাপড়া কচুরিপানাকে ঠেলে সরিয়ে নদীর ফিনফিনে একটা রুপোলী পাঁচিল ভেদ করে ভুউস করে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দাউদের উপোসী কলজে তাজা বাতাসে ভরে গেল। বার কয়েক টানা নিঃশ্বাস নিল। তার হাতে পায়ে জোর ফিরে এল। ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রহমান, ইয়া গোফুরোর রহিম। দাউদ চিত সাঁতার দিতে দিতে কেঁদে ফেলল। সে দেখল, ভাসতে ভাসতে সে ওপারে দহের মুখে, তুষ্টু জেলে যেখানে টার্টাকিন আর খয়রা মাছ ধরার জন্য ভাসাল জাল পেতে রেখেছে, না পেতে রাখেনি, জালটা তুলেই রেখে গিয়েছে, সেই জালের একেবারে গোড়ায় এসে পড়েছে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাড়নায় সে খপ করে একটা বাঁশ চেপে ধরল। এতক্ষণে সে একটা শক্ত আশ্রয় পেল। তারপর চোখ বুজে চিত হয়ে ভেসে কেবল হাঁফাতে লাগল। আর আশ্চর্য, গোঁজ হয়ে থাকা ফটিকের মুখখানা তার চোখে ভেসে উঠল। তেজ, তেজ! ওর তেজ ভাঙবার কত চেষ্টা করেছে দাউদ। কিন্তু কিছুমাত্র পারেনি।

হঠাৎ ওর পায়ের দড়িতে টান লাগল এবং ওর মনে পড়ল বঁড়শির দড়ি যেমন মাছটার গলায় গাঁথা তেমনি তার আরেকটা দিক ওর পায়েও জড়ানো। এবং দুজনের নসিবই এক সুতোয় গাঁথা। যে আগে হাল ছেড়ে দেবে তার মৃত্যুই এগিয়ে আসবে। দাউদ সতর্ক হল। তার দুশমন এখনও তেজ দেখাচ্ছে। অবিশ্যি ভাসাল জালের পোক্ত খুঁটি এখন তার হাতের মুঠোয়। এটা তার পক্ষে একটা বড় ভরসা। এবং দাউদ জানে মাছটার সাধ্য হবে না, তাকে এই আশ্রয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কেননা, কোনও মাছ যখন কাত হয়ে ভেসে ওঠে তখন বুঝতে হবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দাউদের বিপদ্ কেটেছে। মাছ যতক্ষণ জলে ততক্ষণ দাউদ নিরাপদ নয়। তবে ভাসাল জালের শক্তপোক্ত বাঁশের খুঁটি হাতের মুঠোয় আসার পর থেকে সে একটু ভাববার অবকাশ পাচ্ছে এই যা। এতক্ষণ প্রাণ রাখতেই তার প্রাণান্ত হবার জো হয়েছিল। আল্লার দয়ায় তার জানটা এখনও আছে।

এবার কী করা? দাউদ ভাবল। আশু ভয় এবং উত্তেজনা দূর হওয়ায় সে এখন মাথায় বেশ ভাবতে পারছে। তার প্রথম কাজ পা থেকে বঁড়শির দড়িটা ছাড়িয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয় কাজ মাছটাকে ডাঙায় তোলা। যদিও সে রহমান নিকিরির ছাওয়াল, তবু মাছ ধরাটা তার ধাতে তেমন সয় না। ছোট বয়সে ইশকুল পালিয়ে সে যখন বাড়িতে এসে বসে থাকত, তখন দু একদিন বাপের সঙ্গে জাল বাইতে গিয়েছে বটে, কিন্তু ঝঞ্ঝাট ঝামেলার বহর দেখে আর সে-মুখো হয়নি। নিজের হাতে এই তার প্রথম মাছ মারা। অবিশ্যি মাছ মারা বলাটা ঠিক নয়। সে তো এই মাছটা মারতে চায়নি। মাছটাই জড়িয়ে পড়ল তার সঙ্গে। দাউদকেই সে জড়িয়ে ফেলেছে, এটা বলাই ঠিক। তার জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল শালা। তাকে প্রায় জানে মেরে ফেলেছিল আর কী? এখনও তার বিপদ কাটেনি। কে জানে মাছটা ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে কিনা। তাকে অসতর্ক, অন্যমনস্ক করে তুলে সে তার শয়তানি হাসিল করবে কিনা, সেই মতলবেই চুপ করে পড়ে আছে কিনা তাই বা কে জানে? অতএব দাউদকেও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। আপাতত তার সমস্যা, পায়ের দড়িটা বের করে ফেলা।

দাউদ যতটা পারে দম নিয়ে খুঁটি ধরে ডুব দিল। এখানে জল বেশ পরিষ্কার। বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার মনে হল বঁড়শি-গাঁথা মাছটা দহের ঢলের কাছে পড়ে আছে। নড়ছে চড়ছে না। এটা ভাল। সে সন্তর্পণে তার বাঁ পায়ের দিকে এগিয়ে গেল। ডান পাটাকে টেনে এনে খুঁটিতে একটা প্যাঁচ দিল। তারপর মুখটাকে যতটা পারা যায় বাঁ পায়ের কাছে নিয়ে গেল। দড়িটা একটা ফাঁসের মত তার পাটাকে পেঁচিয়ে বঁড়শির উপড়ে-আসা একটা খুটোর সঙ্গে গিঁট বাধিয়ে দিয়েছে। বুঝল কাজটা সোজা নয়। যা হয়ে আছে তাতে হয় তোমাকে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে গিঁট খুলতে হবে, আর না হয় দড়িটা ঢিলে দিয়ে তার ফাঁসটা একটু একটু করে আলগা করে, বড় করে এনে তার ভিতর দিয়ে পাটাকে বের করে আনতে হবে। তার কাছে ছুরি নেই, অতএব

দড়ি কাটার প্রশ্নই ওঠে না। এখন একমাত্র পথ, দড়ির ফাঁস বড় করে এনে পা বের করে ফেলা।

ভ্‌স করে ভেসে উঠল দাউদ। একটু হাঁফটা জিরিয়ে নিল। আবার ডুব মারল খুঁটি ধরে। মাছটা নেই তো? সে দড়িতে একটা টান দিল। অমনি মাছটা একেবারে ওর পিঠের কাছে ঘপাং করে লাফিয়ে উঠল। ভাসাল জালের আড়া বাঁশে গদাম করে আছড়ে পড়ল মাছটা। বাঁশগুলো সব মড় মড় করে উঠল। ঐ এক লাফেই দাউদের বাঁ পা-খানা ছিঁড়ে যেন বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। ওর হাতও খুঁটি ছেড়ে বেরিয়ে যেত। নিতান্ত সতর্ক ছিল তাই বেঁচে গেল। দড়ির ঘসটানিতে পায়ের ছাল উঠেছে বোধ হয়। জ্বলছে। মাছটা আবার লাফ দিল। কিন্তু বিশেষ তেমন লাফাতে পারল না এবার। তার মানে ওর শক্তিও ফুরিয়ে এসেছে। দাউদ খুশি হল।

খুঁটি বেয়ে উপরে উঠে নিঃশ্বাস নিল দাউদ। তারপরেই দাঁতে দাঁত ঘষে গাল দিয়ে উঠল, "সুম্মুন্দির মাছ! সুম্মুন্দির মাছ। আজ তুমার একদিন কি আমার একদিন!"

কিন্তু এখন কী করা? পাড়ারে বের ক'রে আনি কী করে? চেঁচাব? লোক ডাকব? একজন কারো সাহায্য পেলেই সে বেরিয়ে আসতে পারে। সেই ভালো। চিৎকার দেবার কথা মনে হতেই ফুটকির জেদী মুখখানা চোখের উপর ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওর গলাটা টিপে চিৎকার করা থামিয়ে দিল। ফুটকির অবজ্ঞাভরা চোখের দৃষ্টি, যে দৃষ্টির সামনে দাউদ কেমন কুঁকড়ে যায়, ছোট হয়ে যায়, দাউদের চোখে এখন সেই দৃষ্টিটা ভেসে উঠল। বিবির গায়ে হাত তুলার ব্যাপারে মিঞা সাহেবের তো দেখি সাহসের আর সীমা থাকে না। আর একটা পুঁটি মাছের কামড় খাতি না খাতি মিঞার বাবাগো বাঁচাও গো ডাকে দেখি গিরাম ফাটে যায়। মন্দ বটে! ফুটকীর বোবা চাহনীটাই যেন কথাগুলো উগরে দিল।

দাউদ ক্ষিপ্ত হয়ে একটা শান্ত মুখশ্রীকে উদ্দেশ করে দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, শালী জা'তমারানী, এখেনে আয়, আ'সে দেখে যা, মাছটা কী? কিন্তু এটাও ঠিক, দাউদ ভেবে দেখল, এর পর সাহায্যের জন্য আর চেঁচান যায় না। সম্ভব নয়। অন্তত দাউদের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। তাহলে ঘাড়-ত্যাড়া বিবিটারই জিত হয়ে যাবে। একটা মাছ মারতে গিয়ে নিকিরির জোয়ান ছেলে বাপ্‌রে মারে বাঁচাও রে করে চেঁচিয়েছে, অন্যেরা সাহায্য করতে ছুটে এসে দেখবে বাঘ নয়, ভালুক নয়, একটা মাছের হাত থেকে তারা তাকে বাঁচাতে এসেছে। তারপর গল্প রটবে গ্রামে। কথাটা ফুটকির কানেও উঠবে। একটা কথাও ফুটকি বলবে না। বলে না। কেমন অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর তার নিজেকে ছোট মনে হতে থাকে। তার বিবির সামনে ক্রমশ কেমন ছোট হয়ে যায়। তার ধারণা তার বিবি তার সমস্ত রকম পাপ কাজের সব খবর রাখে। কিন্তু কিছু বলে না। দাউদ যেন তার খসম নয়, তার গুলাম। অতএব গুলাম যদি মোকামে গিয়ে মেয়েমানুষ রাখে, নেশা করে, তাতে তার যেন কিছু আসে যায় না। দাউদ আর ফুটকি অর্থাৎ নাজমা বেগম যেন এক স্তরের লোকই নয়! এই রকম সময় বেশ অসহায় বোধ করতে থাকে দাউদ। তার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যায় যেন। তার সত্যিই মনে হতে থাকে এই মহীয়সী বেগম সাহেবার খসম সে নয়, সে তার গোলাম, গোলাম, গোলাম। এই সময় তার রক্তে প্রচন্ড রাগের তুফান ওঠে। অ্যাত ঠ্যাকার তোম্র কিসির? পাখার বাঁট দিয়ে কয়েক ঘা কষিয়ে দাউদ রাগে গরগর করে। কেন এই সব সময়ে তার বিবি কথা বলে না? কাঁদাকাটা করে না? আরও পেটায়। ঝগড়া করে না? রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায় না? দাউদ তার বিবিকে আরও মারে, আরও মারে। আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না ফুটকি। কেন? শুধু ঘাড় ত্যাড়া করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর অদ্ভুতভাবে চুপ করে চেয়ে থাকে। সাড়াশব্দ একেবারে দেয় না। হারামজাদী!

যেমন দিচ্ছে না এই মাছটা। হারামজাদী! খপ্‌ করে ওর মাথায় রাগ উঠে গেল। চুপ করে আছে মাছটা। সুম্মুন্দির মাছ। তুমার আজ জান নেবো। এদিকে ওদিকে চাইতে লাগল দাউদ। হঠাৎ দেখে বঁড়শির অন্য খুঁটোটা একটু দূরেই ভাসছে। ভাসাল জালের তে-বাঁশা কাঠামোটার একেবারে গোড়ায়। শালার মাছ! দাউদ সন্তর্পণে তার আশ্রয়, খাড়া খুঁটিটা ছেড়ে, আড়াআড়ি লম্বা বাঁশটাকে বেশ ভালো করে দুহাতে চেপে ধরল। শয়তান মাছটা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। কিন্তু দাউদকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। এমন কিছু একটা ঘটবে এটা তার হিসেবেই ছিল। তাই আড়-করা বাঁশটাকে সে প্রাণপণে দুহাতে চেপে ধরে মাছের এই আক্রমণটা ব্যর্থ করে দিল। ওর পায়ের ক্ষতে দড়িটা আবার ঘষটে গেল। পায়ের ব্যথা ওর মগজে গিয়ে ঘা দিল। আহত জন্তুর মত যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে উঠল, "সুমুন্দির মাছ! তোর মার জা'ত মারি।"

মাছটা আর কোনও সাড়া দিল না। দাউদ এখন সম্পূর্ণ এক খুনী। তার আর কোনও রকম উত্তেজনা নেই। শরীরে কোনও রকম যন্ত্রণাও সে আর বোধ করছে না। তার মনে এখন শুধু একটা শীতল এবং সুদৃঢ় এবং একমুখী প্রতিজ্ঞাঃ শালার মাছ! তুমার আমি জান নেবো। দাউদের মনে দয়া মায়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান এখন আর কিছুই নেই। ওর যখন এই রকম অবস্থা আসে, কোণঠাসা হয়ে না পড়লে অবশ্য আসে না, দাউদ তখন সম্পূর্ণ একটা অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। একটা নির্দয় নিষ্ঠুর দুঃসাহসী খুনে যেন ওর ঘাড়ে এসে ভর করে। শালার মাছ!

দাউদ মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে আড়-বাঁশটাকে দুহাতে চেপে ধরে সরীসৃপের মত তার উপর বুক ঠেকিয়ে একটু এগুলো। তারপর কিছুক্ষণ বাঁশটার উপর চুপ করে শুয়ে থাকল। মাছটা

সাড়া দিল না। দাউদ আর একটু এগুলো। আবার থেমে পড়ল। বঁড়শির খুঁটোটা এখনও নিশ্চল। তার মানে মাছটা এখনও নিশ্চুপ। দাউদ আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। এখানে বাঁশের গায়ে হড়হড়ে শ্যাওলা। বড্ড পিছল। দাউদ জানে এখন যদি মাছটা ঘাই মারে তবে আর রক্ষে নেই। এই পিছল বাঁশটা ধরে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ছিটকে বেরিয়ে যাবে অগাধ জলে। মাছের অধীনে গিয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও একটুও তাড়াহুড়ো করছে না। কী করছে না করছে দাউদ জানে না। কারণ তার আত্মরক্ষার ব্যাপারটা এখন আর তার হাতে নেই। যে সহজাত সংস্কার স্নায়ু-মণ্ডলীকে আপনাআপনি নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণীদের রক্ষা করে, সেই সংস্কারই এখন দাউদকে চালনা করছে। দাউদ পিছল জায়গাটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। আর একটু। বুক ঘষটে এগিয়ে গেল। বাঁশের গিঁটে খোঁচা লেগে দাউদের বুক ছড়ে গেল। আর সামান্য একটু এগোলো দাউদ তারপরই বঁড়শির খুঁটোটা বিদ্যুৎবেগে জল থেকে তুলে নিয়ে বাঁশের গায়ে জড়িয়ে নিল এবং খুঁটোটা শক্ত হাতে ধরে রাখল। শালার মাছ! বিরাট জোরে লাফ মেরে জল থেকে শূন্যে উঠে মাছটা আবার ধপাস করে আছাড় খেয়ে জলে পড়ল। ওর ঝাঁপাঝাঁপির চোটে ভাসাল জালের কাঠামোটা মট মট করে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগল। লাফ লাফ লাফ। মাছটা অনবরত লাফ দিচ্ছে। এবং প্রতিটি লাফ দাউদের বাঁ পাটাকে জখম করে দিচ্ছে। কিন্তু দাউদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাটমোহরের মোকামে তার রসের ভাবী দুলিবিবির কথা মনে পড়ল। তার ইয়ার মোকছেদের বিবি। বড্ড ছিনালপনা করত। দাউদের তখন উঠতি যৌবন। মেয়েমানুষকে ভালো করে চেনেনি। কোন্‌টা য়ে ওদের মনের কথা আর কোন্‌টাই বা মুখের, তখনও ভালো করে বুঝতে শেখেনি। সেই দুলিবিবি, একবার ওর খসম যখন বাইরে, ওকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল, বলেছিল একা বাড়িতে মেয়েছেলে সে, তার থাকতে বড় ভয় করে। আরও কত সোহাগের কথা, রসের কথা বলেছিল দুলিভাবি। সে বাচ্চা ছেলে তার মুখে দুধের গন্ধ, বলে তার গাল টিপে দিয়েছিল। এ-সব ইয়ারকি তার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। দুলিবিবি তার বন্ধুর বিবি। এ ভাল না। আরও কত রকম দেল্লাগীই করছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল দাউদ। তার অস্বস্তি লাগছিল। খোদা মালুম, সে চলে আসতে চাইছিল। কেননা, সে জেনাকার হতে চায় না। খবরদার ভাই মুসলিম! তার চাচার বাড়িতে আলেম মৌলবীরা এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এক মৌলবীর সতর্ক বাণী তার মনে পড়ছিল, খবরদার ভাই মুসলিম! কখনও কাহারও বাড়িতে উপস্থিত হইয়া বউ বিটির ইজ্জতের হানি করিবে না। বেগানা স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি দিবে না ও জেনাকারীর পথ খুঁজিয়া লইবে না। একেবারে বালক বয়েস থেকেই সে এই সব অনুশাসনের কথা শুনে আসছে।

সে এও জানে যে, কেয়ামতের দিন জেনাকারের ন্যায় কঠিন আজাব আর কাহারও হইবে না। এবং সে আজাব বা শাস্তি যে কী ভীষণ তাও তার অজানা নয়। যে রমণী ও পুরুষ ইহকালে জেনাকার্য করিবে, কেয়ামতের অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে সেই পাপী পুরুষের জন্য এক অগ্নিময়ী স্ত্রী এবং সেই পাপিষ্ঠা রমণীর জন্য এক অগ্নিময় পুরুষ সৃষ্টি করিয়া খোদাতা'লা হুকুম করিবেন, যাও হে অগ্নিনির্মিত স্ত্রী ও পুরুষ! তোমাদের মাশুক ও মাশুকাকে খুঁজিয়ে বাহির করিয়া লও ও তাহাদের সহিত জোরপূর্বক ছোহবৎ কর ও করাইয়া লও। ইহা শুনিবামাত্র উভয়েই ছুটিয়া যাইবে ও খোদাতা'লার হুকুম অনুযায়ী অগ্নিময় পুরুষ জেনাকারী রমণীকে ও অগ্নিময়ী স্ত্রী জেনাকার পুরুষকে খুঁজিয়া লইবে এবং জোরপূর্বক জেনা করিতে ও করাইতে থাকিবে। তখন অগ্নিনির্মিত সেই স্ত্রী ও পুরুষের এতই তেজ হইবে যে, ছোহবতের সঙ্গে সঙ্গে গরমের চোটে সেই পাপীদিগের নাড়িভুঁড়ি এবং নিকটস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলিয়া খাক হইয়া যাইবে, তথাপি প্রাণ বাহির হইবে না, তাহারা কেবল চিল্লাইতে থাকিবে এবং অগ্নিনির্মিত সেই পুরুষ ও স্ত্রী বলিতে থাকিবে, এখন কেন চিৎকার করিতেছ? দুনিয়ায় যেমন বেগানা স্ত্রী পুরুষের গলায় গলায় বুকে বুকে মিলিয়া ও মিলাইয়া মজা চাকিয়াছিলে ও চাকাইতে-ছিলে, এখনও তদ্রূপ আমাদের গলায় গলায় বুকে বুকে মিলিয়া মজা চাক না কেন বা চাকাও না কেন?

সোবানাল্লাহ্‌! এখন সে যখন এক ডুব নদীর পানিতে, তার পায়ের সঙ্গে একটা ক্রুদ্ধ ও তেজি মাছের মুখে বেঁধা বঁড়শির দড়ি জড়ানো, আততায়ীর সঙ্গে আত্মরক্ষার অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্লান্ত, আশ্রয় শুধু একটা পিছল বাঁশ, নদীতীর জনশূন্য এবং মাথার উপরে উড্ডীন কয়েকটা ধৈর্যশীল ক্ষুধার্ত শকুন এবং সে আহত এবং নিস্তেজ, তখন, ঠিক সেই সময়েই বা তার মনে তার প্রথম পাপের স্মৃতি এমনভাবে ভেসে উঠল কেন? তার হৃদয় কেঁপে গেল। আল্লাহ্‌, তুমি জানো, তুমি তো সব জানো সে দিনের কথা। দাউদ সেদিন চলে আসতে চাইছিল। দুলি ভাবীর ঐরকম নির্লজ্জ আচরণ দেখে, কেয়ামতের সেই ভীষণ দিনের কথা ভেবেই সে পালাতে চাইছিল। কিন্তু দেখ, কী রকম নসিব তার! শেষ পর্যন্ত সে জড়িয়ে পড়ল, তাকে জড়িয়ে ফেলা হল। শালী! এই মাছটারই মতন। দুলিবিবির দিল্লাগী তখন এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে, সংযমের বেড়া ভেঙে দাউদের ভিতরের ক্ষুধার্ত বাঘটা দুলিবিবির উপর লাফিয়ে পড়ল। হঠাৎ আক্রমণে ভয় পেয়ে দুলিবিবি না না, না না বলে ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। ওর ভারি বুকের তলায় চাপা পড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য ওকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু দাউদকে ঠেকাতে পারেনি। নারীসঙ্গের সুতীব্র আস্বাদ পাওয়া বাঘ তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত

দুলিবিবিকে রেহাই দেয়নি। সেদিনও এই রকম একটা শীতল সিদ্ধান্ত দুলিবিবির বজ্জাতি ভাঙতে তাকে সাহায্য করেছিল। হারামজাদী! ছিনাল বজ্জাত! এই মাছটাকে তার হঠাৎ দুলি বিবি বলে মনে হল। বজ্জাত! আগে একবার মাছটা তাকে ফুর্টকির কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। ঘাড় ত্যাড়া! হঠাৎ মাছটাকে তার আবার কালোজিরে বলে মনে হয়। এই শালীও তাকে জড়িয়ে ফেলবে। প্যাঁচে ফেলবে, সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

মাছটা একটু দম নেবার জন্যই বোধ হয় চুপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার কয়েকটা ঘপাং ঘপাং ঘাই মারল। বাঁশগুলো মচ্‌মচ্‌ করতে লাগল। একটা গাঙ চিল ভাসাল জালের একেবারে উঁচু ডগায় বসে আর্ত স্বরে চিৎকার করছিল। বাঁশগুলো নড়ে উঠতেই উড়ে পালাল।

সুম্মুন্দির মাছ! পাডারে ছিঁড়ে ফেলার মতলব করিছে।

দাউদ বঁড়শির খুঁটোটা সেই পিছল বাঁশে বেশ করে জড়িয়ে নিল। শক্ত করে বাঁধল, তারপর দড়ি ধরে মারল হ্যাঁচকা টান। বঁড়শি-গাঁথা মাছের মাথাটা এবার খানিকটা এগিয়ে এল ভাসাল জালের আড়া বাঁশটার কাছে। মাছটা খুব আছাড়ি পিছাড়ি করছে। বঁড়শিটা গলা থেকে খুলে ফেলার জন্য পাগলের মত মাথা আর লেজ আছড়াচ্ছে। যেমন করেছিল দুলিবিবি ওর বুকের তলায় চাপা পড়ে। খালি তাকে বুকের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা। হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছিল। উল্টে যাবার চেষ্টা করছিল। নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে দিয়েছিল। দাউদ দুহাত দিয়ে দুলির সেই সরু সরু নরম নরম হিংস্র হাত দুটোকে যেন মেঝের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিল। হাত কামড়ে ধরেছিল দুলি। রক্ত বের করে দিয়েছিল। মাংস তুলে নেবারও চেষ্টা করছিল বোধ হয়। দুলির দাঁতের ফাঁকে আটকানো তার সেই হাতখানা দিয়েই দুলির মুখে এমন জোরে চাপ দিয়েছিল যে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল। ঠান্ডা গলায় দাউদ বলেছিল, চুপ করে থাক। অ্যাতক্ষণ ধবে তাতায়ে তাতায়ে অ্যাখন ন্যাক্‌রা হচ্ছে। ফের যদি নড়াচড়া করবি তো গলা টিপে মা'রে রাখে যাব। ডাকেই বা আ'নলে ক্যান্‌? শাগের খেতটা দ্যাখালেই বা ক্যান্‌? আবার অ্যাখনই বা তাবে ঠেলে দেচ্ছ ক্যান্‌? জানো না হাভাতেরে শাগের খেত দ্যাখাতি নেই। বাঁচতি যদি চাও, চুপ্‌ ক'রে থাকো। শালীবি সেদিন বশে আনতি দম বেরোয়ে গিছিল। দড়িটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে নিজের মনেই বলল দাউদ। মাছের আছড়ানি এমন জোরে শুরু হয়েছিল যে বঁড়শির দড়ির আরেকটা মুড়ো যে সে বাঁশের গায়ে বেঁধে ফেলতে পারবে, এমন আশা করতে পারছিল না। দুলিবিবি, দুলিবিবি। ঐ হারামজাদীর মতই এই মাছটার নষ্টামি। দুলি যেমন তাকে ওর বুকের উপর থেকে ফেলে দেবার জন্য অনবরত ঝটকান দিচ্ছিল, এই মাছটাও তাকে এই বাঁশের উপর থেকে ফেলবার জন্য কত চেষ্টাই না করছে। শেষ পর্যন্ত মাছটাকে বাঁশের সঙ্গে শেষ শক্তি দিয়ে বেঁধে ফেলল দাউদ।

দুলিরিউ বশে আনিছিলাম। ইবার তোরেউ আনলাম।

উল্লাস ভরে মনের ভিতরে চেঁচিয়ে বলে উঠল দাউদ। যেন এটা মাছ নয়, অবাধ্য একটা মেয়েমানুষ। লোভ দেখিয়ে তাকে নাচিয়ে নাচিয়ে শেষে সরে পড়ার তালে ছিল, দাউদ তাকে চিত করে পেড়ে ফেলে বুক হাত আর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে এবার তার তেজ ভাঙতে লেগেছে।

"তোর তেজ ভাঙব!" দাউদ বাঁশটার উপর বুক দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল। এবং কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আবার হাঁফাতে লাগল। মাছ আর তার দূরত্ব এখন আর খুব বেশি নয়। মাছটা আর সে একই রকম শ্রান্ত। তার কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়ার সময় নয়। মাছ এখনও জলে। মাছের দড়িটা থেকে তার পা-টাকে এখনও মুক্ত করতে পারেনি। দাউদ ভাসালের বাঁশে দেহের ভর ন্যস্ত করে হাঁফাতে লাগল। একটু পরে যখন খানিকটা বল ফিরে পেল, তখন নিজেকেই বলল, না আর দেরি নয়। পাডারে এখনই ছাড়াতি হবে। না'লি উডার আর কিছু থাকবে না।

দাউদ আবার ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে সরে গেল সেই খাড়া খুঁটিটার কাছে। তার কলজেয় যতটা পারে বাতাস ভরে নিল। তারপর খুঁটিটা ধরে সড়সড় করে নেমে গেল জলের নিচে। তার পর বঁড়শির দড়িটা ধরল। মাছটা একটা ঘাই মারবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁশের সঙ্গে সে তখন বাঁধা। মা'রে না, দুহাই তুমার আমারে জানে মা'রে না। দুলির ভয়ার্ত চোখ সেই জলের মধ্যে ভেসে উঠল। আমি চ্যাঁচাবো না, আমারে জানে মা'রে না। তুমি যা কও আমি শোনবো। দাউদ বুকের চাপ আলগা করে দিয়ে বলেছিল, নাও তালি খাটে ওঠো। দুধির ছাওয়াল রে কত দুধ খাওয়াতি পার দেখি। দাউদ দড়িটাকে একটু টেনে ঢিলে করে আনল। মাছটা কিছু বলল না। পায়ের গোড়ালির উপরে যে ফাঁসটা পড়েছিল, আস্তে আস্তে সেটা বড় করতে লাগল। মাছটা কিছু বলল না। দাউদ ধীরে ধীরে একটু একটু করে ফাঁসটা আলগা করল তারপর অনায়াসে তার পা-টাকে দড়ির ফাঁস থেকে বের করে ফেলল। মাছটা কিছু বলল না। দুলিবিবি ওর কথা শুনে যেমনভাবে সুড়সুড় করে খাটে গিয়ে শুলো, তা দেখে তার মনে হল, শালী যেন মানুষই নয়, একটা কুত্তার বাচ্চা। বঁড়শির দড়ির সেই খুঁটোটা হাতে করে দাউদ আবার ভেসে উঠল। সেদিকের দড়িটাও বাঁশের সঙ্গে পেঁচিয়ে নিল। তারপর খাড়া খুঁটিটাকে পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে হাত দুটো মুক্ত করে ফেলল। শালার মাছ! এইবার! আড়া বাঁশের গায়ে একটা প্যাঁচ দিয়ে সে এক হাত দিয়ে দড়ি ধরে আহত এবং মুমূর্ষু মাছটাকে টেনে আনতে লাগল আর একটা হাত দিয়ে দড়িটাকে বাঁশের গায়ে ক্রমশ পেঁচিয়ে ফেলতে

লাগল। মাছটা এবার বাধ্য। বশীভূত। লক্ষ্মী মেয়ের মত এগিয়ে আসছে। বাধা দিচ্ছে না। তেজ দেখাচ্ছে না। দাউদ খানিকটা ঠাণ্ডা হল।

মাছ আর মেয়েমানুষ, শালীরা সব সুমান। এতক্ষণে দাউদের মনটা হাল্কা হল। ওগের যা কিছু তেজ সন্ধ্যের মুখি। ঘাপাও বেশ করে, সব দ্যাখবা পুষা কুকুর। মাছটা এতক্ষণ টানে টানে বেশ এগুচ্ছিল। এবার লেজ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিকটা টানাটানি করে দাউদ বুঝল সুবিধে হবে না। উডা আবার নতুন নষ্টামি শুরু করিছে। বুয়াল আর চিতল খুবই পাজি মাছ। লেজ বেঁকিয়ে এমনভাবে জল আটকে দাঁড়ায়, তখন কারও সাধ্যি নেই তাদের টেনে আনে। এখন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তার ঠিক কী? যতটুকু মাছটাকে আনতে পেরেছে দাউদ, ঠিক সেখেনেই তাকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর আর একটু শক্তি ফিরে এলে দু হাতের ভর দিয়ে আড় বাঁশের উপর উঠে বসল। পাশের খাড়া বাঁশ ধরে ভারসাম্য বজায় রাখল। অনেকক্ষণ ধরে জলে পড়ে রয়েছে দাউদ। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। দেখল সমস্ত শরীরটা হেজে গিয়েছে। শীত করছে তার। চোখ দুটো জ্বালা করছে। বাঁ পাটা তুলতে কষ্ট হচ্ছিল। তুলল। এঃ! মনে হল কে যেন পায়ের গোছটা চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছে। দড়ির ঘস্‌টানিতে চামড়া উঠে গিয়েছে। জল থেকে পা-টা তুলতেই মনে হল যেন পায়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পা-টা তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়ে দিল কিন্তু জ্বলুনি কমল না। দাউদ এবার সত্যিই অস্থির হ'য়ে উঠল। খপ্‌ করে তার মাথায় রাগ চড়ে গেল। সুম্মুন্দির মাছ! দাঁতে দাঁত ঘষল দাউদ। তারপর এপার ওপারটা দেখে নিল। তাদের গিরামের পারটা একটু দূরে, ওপারটা একটু কাছে। কোন্‌ পারে গিয়ে উঠবে সেটাই চিন্তা করে নিল। তারপর ঘাড় ফেরাতেই দেখল তার নৌকোটা একটু দূরে কচুরিপানার জঙ্গলে আটকে আছে। হিসেব কষে দেখল, এপার ওপারের চাইতে, এখান থেকে নৌকোর দূরত্বটাই ওর কাছে কম। সে ঠিক করল নৌকোতে গিয়েই উঠবে। পারবে তো?

দাউদ সংশয়কে কচুরিপানার মত দুহাতে সরাতে সরাতে জলে নেমে পড়ল। যদিও তার ডানা দুটো শ্রান্ত এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত, পায়ের যন্ত্রণায় প্রায় পাগল তবু সে দৃঢ়ভাবে জল কেটে কেটে এগিয়ে চলল তার নৌকোটার দিকে। যেন প্রায় মৃত্যুর পরপার থেকে সে সারাজীবন ধরে সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে পাকাপোক্ত একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। যাতে হাত দেয় তাই ফসকে যায়। তবু সে হাল ছাড়েনি। সে তার নৌকোর টলমল আশ্রয়ে এসে উঠল। এবং নৌকোয় উঠেই খোলের মধ্যে অতিশ্রমে কাতর সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুটকি ওর সামনে এসে মুখ গোঁজ করে দাঁড়াল। তার দুই গালে দুটো হিংস্র বঁড়শি বেঁধা। মুখ তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু ঘাড় তার ত্যাড়া। নরম হবার কোনও লক্ষণ কোথাও নেই।

দাউদ চোখ বুজে শ্রান্তভাবে বিড় বিড় করতে লাগল, "তেজ তেজ তেজ! বিবি তুই অ্যাতো তেজ কনে পা'স?"

॥ ২২ ॥

বিলকিস অস্থির হয়ে উঠল। যে ঘরটা তার কাছে এতদিন ছিল সাধারণ মাপের একটা ঘর, খাট বিছানা আলনা কুরুশি তোরঙ্গে ঠাসা নিতান্তই অপরিসর, সেই ঘরে মাত্র একটা রাত তার খসম মিঞার সঙ্গে কাটাবার পর, তার বিপুল বিস্তার দেখে সে অবাক হয়ে গেল। ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। ঘর কোথায়? এ তো দিকহীন দিগন্তবিহীন এক ধু ধু নীরস প্রান্তর! ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। বিলকিস এখন অতীব কাতর। তার দেহ মন বড়ই আর্ত।

সকালে বাপের মুখে তাদের জামাই এ-বেলা আসবে না শুনে তার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে তখন পুকুর থেকে ফিরে বাঁশের আড়ায় কাপড় মেলছিল। খবরটা ধাঁ করে তার কলজের গিয়ে তীরের মত বিঁধল। সে ভারসাম্য হারিয়ে তার শাড়িটা ফাস্‌ করে ফাঁসিয়ে দিল। যে-কারণে কাঁদতে চাইছিল তার দেল, এবার সেটা ঢাকবার একটা ভালো অজুহাত পেয়ে চোখের পানিতে তা বাইরে ঢেলে দিল। তারপর অবিশ্যি ছোটখাট অনেক কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিল বিলকিস।

মোছফেকা বিলকিসের রকম দেখে আর হাসি সামলাতে পারল না। ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসতে লাগল। মোছফেকার হাসিটা যে সরল নয়, তা বুঝতে বিলকিসের একটুও অসুবিধে হল না। লজ্জা পেল সে। বাড়িতে পুরনো একটা পিতলের পিলসুজ ময়লা হয়ে পড়েছিল, কাজ না পেয়ে, আমরুলের পাতা এনে তাই দিয়ে সে সেইটাই সাফ করতে বসেছিল। তা এতে হাসবার কী আছে? বিলকিস আড়চোখে একবার মোছফেকাকে দেখে নিল। সে মসলা বাটছে। বিলকিস চোখ ঘুরিয়ে নিল। তার এবার একটু রাগও হল। এতে হাসার কী আছে? মুখ গোঁজ করে পিলসুজের গায়ে হাতে যত জোর ছিল তাই দিয়ে সে আমরুলের পাতা ডলতে লাগল। মোছফেকা মসলা বাটতে বাটতে মুখ ফিরিয়ে বিলকিসকে দেখেই ফিক করে হেসে ফেলল।

বিলকিস এবার সত্যিই রেগে গেল। "অ্যাতো হাসি আসতিছে যে আজ বড়?"

মোছফেকা বলল, "এমনি? আজ কাজে বড় বেশি আটা কিনা তাই।"

"এমনি!" বিলকিস গজগজ করতে লাগল। "ভাবতিছ আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, না?

কিছু বুঝি নে?"

মোছফেকা শুকনো লংকা বাটার তালটা শিলের একপাশে সরিয়ে রেখে নোড়াটা কেঁথে নিতে নিতে বলল, "কি বুঝিছ কও তা'লি?" বলেই মুখ টিপে এমন হাসল যে বিলকিসের পিত্তি জ্বলে গেল। সে বেশ একটা কড়া জবাব দিতে গিয়ে দেখে, মোছফেকার হাসির অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না বটে, তবে তার কোন জবাবও দেওয়া যায় না। বিলকিস আরও চটল।

বিলকিস মুখ গোঁজ করে গায়ের জোরে পিলসুজ মাজতে মাজতে আস্তে করে বলল, "বুঝিছি তুমার মাথা।"

মোছফেকা একটা অতীব নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল, "শুনলাম, রাত্তিরি জামাই না কি ঘুমোতি পারেনি এটটুও?"

বিলকিস ফোঁস করে উঠল, "কিডা ক'লো?"

"কবে আবার কিডা? চোখ মুখ দেখলিই বুঝা যায়।" মোছফেকা বলল। "সেই মোরগ-ডাকা বিহান ব্যালা দরজা খুলে সাত তাড়াতাড়ি দুজনে ্যামন করে বেরোয়ে আলে তা দেখে কিডা কবে যে জামাই মাত্তর কাল সন্ধ্যের সুমায় আসে পোঁছোইছে। হ্যাঁ একটা কথা কয়ে দিই, মনে করে রাখো, খসমের সঙ্গে নতুন নতুন ঘর করলি, বেরোবার আগে, মুখখান মুছে বের হবা। না হলি বুবা মুখ বড়ই চ্যাঁচায়, আর তাই চটপট সবই জানাজানি হয়ে যায়।"

বলেই মোছফেকা আবার তেমনি ঠোঁট বেঁকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকলো। ঝক করে সারা শরীরের রক্ত বিলকিসের মুখে জড় হল। ওর কান দুটো গরম হয়ে উঠল। নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। একবার ভাবল পিলসুজটা দিয়ে পোড়ারমুখী মোছফেকার মাথাটা ভেঙে দেবে। কিন্তু কাল শেষ রাত্তিরের ঘটনা মোছফেকার চোখে ফাঁস হয়ে গিয়েছে এটা জানার পর ছবি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ও মুখ নিচু করে ঘামতে লাগল। কী করে বুঝল?

জামাই তোরে পছন্দ করিছে তো মণি? বউবিবিটি সকালে তাকে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিল। কেন? প্রশ্নটা বিলকিসের মনে এখন বেত্রাঘাতের মত ছপাৎ করে এসে বাজল। তার মানে মোছফেকা যা জানে বউ বিবিটিও তা জেনে ফেলেছে? নিশ্চয়ই টের পেয়েছে। না হলে ওকথা জিজ্ঞেসই বা করবে কেন? শরমে বিলকিসের ইচ্ছে করছিল মরে যায়। সে পিলসুজটা ধোবার ছল করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে একেবারে তার ঘরে এসে ঢুকে পড়েছিল। তারপর দরজায় খিল এঁটে আয়না এনে নিজের মুখখানা ভাল করে দেখে নিল। সে তো তার মুখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পাচ্ছে না? তার মুখটাকে খুব খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এ তো তারই মুখ। তবে? কিন্তু সেই একই মুখ কী? অবিশ্যি একটু কেমন কেমন লাগছে। কিন্তু লজ্জা পাওয়ার মত কিছুই সে খুঁজে পেল না তার মুখে। মোছফেকার যত বাজে কথা। ওর পিঠে গিয়ে যদি একটা কিল না বসায় আজ ছবি তো কি বলেছে!

বিলকিস উঠল। আয়না রেখে দিল। তারপর বিছানার দিকে চাইতেই ওর শরীরে আলস্যের ঢল নামল। বিলকিস দরজার খিল খুলতে না গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানার উপর, যেখানে গত রাত্রে শুয়েছিল সেই লোকটা যে তার খসম। যে ফিরে এসেছে তার কাছে অনেক পাশ দিয়ে। যে তাকে শেষ রাত্রে মুহূর্তের সোহাগে কিনে নিয়েছে জন্মের মত। যার সঙ্গ পাবার জন্য এই মুহূর্তে বিলকিসের প্রতিটি অঙ্গ কাঙাল হয়ে উঠেছে। তার দেল আকুলি বিকুলি করছে।

বিলকিস অস্থির হয়ে ফটিকের শোওয়া বালিশটাতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ফটিকের শরীরের ঘ্রাণ একটা উন্মুখ যৌবনকে ক্রমশ উত্তেজিত করে তুলতে লাগল।

বিলকিসকে যেন জিন ভূতে ধরেছে।

ওলো সোয়ামীর রস পাস নি তাই মুখি অমন শাস্তরের খই ফুটতিছে। তার গোলাপফুল টগর প্রায়ই এই কথা বলে। সোয়ামী কী জিনিস একবার বুঝতি পারলি আর ভাগের কথা মুখি ফুটত না।

সত্যিই বিলকিস জানত না সোয়ামী কী জিনিস। তাই সতীনের ব্যাপারে টগর কেন অমন ফোঁস্ করে উঠত, ছবি তা বুঝতে পারত না। ও বুড়ো মৌলবীর কথাগুলো টগরের কাছে তাই তোতাপাখির মত আউড়ে যেত। যথা, "যে সকল স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া ছবর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লা শহীদের তুল্য ছওয়াব দান করিবেন।"

কাল বিকেলেই গুলাপ ফুলের সঙ্গে ছবির সতীন নিয়ে কথা হয়েছে। "তোর মন্দ যদি তোর ঘরে সতীন আনে হাজির করে তো তুই কি করিস্? সহ্য করবি?" গুলাপ ফুলের এই ঝাঁঝালো প্রশ্নের জবাবে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত বিলকিস "সোয়ামীর রস" পায়নি, তাই অমন অনায়াসে বুড়ো মৌলবীর "শহীদের তুল্য ছওয়াব" লাভের তত্ত্বটা উগরে দিতে পেরেছিল। কিন্তু আজ, এখন, এই মুহূর্তে ফটিক যদি এক বিবি এনে হাজির করে আর তাকে এই বিছানাটা তার সতীনকে ছেড়ে দিতে হুকুম করে, সে কী করবে? আখেরাতে শহীদের তুল্য ছওয়াব লাভের আশায় এ জন্মে খসমকে সতীনের হাতে তুলে দিয়ে ছবর করে থাকবে? পারবে? এই অলক্ষুণে কথাটা মনে হওয়া মাত্র ছবি চোখে অন্ধকার দেখল। ফটিকের বালিশে মুখ গুঁজে ফটিকের চুলের ঘ্রাণ নিতে নিতে আর্তস্বরে বিলকিস মনে মনে বলতে লাগল, না না না আল্লাহ্ না না না।

এইখানে কাল রাতে লোকটা শুয়ে ছিল। ঠিক এইখানে, এখন যেখানে বিলকিস শুয়ে আছে। ও যেন ফটিকের উপরেই শুয়ে আছে। কথাটা কল্পনা মাত্রই বিলকিসের শরীরটায় একটা রোমাঞ্চের সুখ দোলা দিয়ে গেল। অনাস্বাদিতপূর্ব এক সুখাবেশ তাকে যেন শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে। বিলকিস কেবলই ফটিকের বালিশে লেগে থাকা ফটিকের শরীরের ঘ্রাণটায় নাক ঘষতে লাগল। ছবি আর উঠতে পারছে না। ক্রমশ সে বোধ করছে, তার শরীরে উত্তেজনার একটা প্রবল জোয়ার আসছে। যার হানাদার ঢেউ, অগুনতি ঢেউ, তার দেলে এসে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ছে। শরীরে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিচ্ছে। কানে মুখে হলকা ছুটছে। বিলকিসের ভয় হতে লাগল এই বুঝি এই অস্বস্তিদায়ক সুখকর অনুভূতির প্রবল জোয়ারটা তাকে এই বিছানা থেকে, ফটিকের ঘ্রাণ থেকে দূরে কোথাও ভাসিয়ে নিয়ে যায়! সে তার মুখটা ফটিকের বালিশে আরও ডুবিয়ে দিল। এবং বালিশটা প্রাণপণে দু হাতে জড়িয়ে ধরল। যেন কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। লোকটা কি আরও বিবি ঘরে আনবে? কষ্ট দেবে তাকে? কই তার আব্বাজান তো দুবার বিয়ে করেনি। কিন্তু ফুটকির শ্বশুরের তো দুই বিয়ে। কই এমন বিশেষ গোলমাল তো ও বাড়িতে হয় না। কিন্তু তার মা'জে খালু? ওরে বাবা! তার আবার চার বিবির ঘর। দিনরাত চুলোচুলি, মারামারি। খালার বড় সতীন, উঃ কী দজ্জাল কী দজ্জাল! একবার ছো সতীনের কান কামড়ে নিয়েছিল। আরেকবার এক মৌলবী খালুর বাড়ির হাতনেয় বসে কাঁঠাল খে খেতে মশগুল হয়ে অবাধ্য স্ত্রীকে বশীভূত করার যে-সকল হক্ খোদাতা'লা খসমদের উপ জারি করে দিয়েছেন, সেই সব গুহ্য তত্ত্ব যখন পাক কোরান এবং হাদিছ শরীফের ব্যাখ্যা সহ বুঝি দিচ্ছিলেন এবং দাড়ি থেকে কাঁঠালের অঠা ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন খালুর ব সতীন ঝাঁটা হাতে সেই মৌলবী সাহেবকে এমন ভীম বিক্রমে আক্রমণ করেছিলেন যে, তি হাদিছ-এ তিরমিজির ব্যাখ্যা এবং কাঁঠাল ভক্ষণ অসমাপ্ত রেখেই কোনোক্রমে পালিয়ে জা বাঁচান। ঘটনার দিন বিলকিস সে-বাড়িতে উপস্থিত ছিল। তারপর সে কী তুমুল কাণ্ড বে গেল খালাদের বাড়িতে। মৌলবী সাহেবের আধখানা-খাওয়া কাঁঠালের দিকে চেয়ে স্বভাবত শান্ত খালু হঠাৎ খেপে গিয়ে রে রে করে চেঁচিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, বড় বিবিকে তক্ষুনি তি তালাক দেবেন। কথাটা শোনামাত্তর খালার বড় সতীন একটা বঁটি নিয়ে তড়াক করে হাতনে উপর লাফিয়ে উঠে খালুর দিকে তেড়ে গিয়ে বলল, দে দোহি তালাক, জিভ্ দে কথা বেরোয়ে কি এই বঁটির এক কোপে তোর কল্লা ফাঁক করে দেবো। বড় বিবির রণরঙ্গিনী মূর্তি আ তার হাতে বঁটি দেখেই খালু বাপ্ বলে এক লাফে পিছোতে গিয়ে মৌলবী সাহেবের আধ-খাও কাঁঠালের উপরে গিয়ে পড়ল এবং সেখান থেকে পত্রপাঠ পা পিছলে হাতনে থেকে একেবা দড়াম করে উঠোনে চিত হয়ে পড়ল। এবং প্রাণভয়ে চেঁচাতে লাগল, ওগো কিডা কনে আ জানে বাঁচাও জানে বাঁচাও। মা'রে ফেলল, আমারে কা'টে ফেলল রে বাপ। খালুর অন্য বিবি আপন আপন ছেলেমেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে তারস্বরে গালাগা চ্যাঁ ভ্যাঁ ছোটদের চেঁচামেচি, কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। বিবিদের উপযুক্ত সব ছেলেরা বাঁ কাঠ যে যা পেল হাতে নিয়ে ছুটে এল এবং নিজেদের পুরানো বিবাদের হিসেব সাফ্ ক ফেলার জন্য একে অপরকে ঠ্যাঙাতে লাগল। ক্রমেই ব্যাপারটা ঘোরতর হয়ে উঠল। ঐ বাড়ি তখন একমাত্র ঠান্ডা মাথার মানুষ ছিল তার খালা। সে ছবিকে আর তার ছেলেমেয়েদের স একটা ঘরে পুরে রেখে বেরিয়ে গেল এবং পরক্ষণেই খালা ল্যাংচানো খালুকে ধীরে ধীরে হা ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। বাইরে তখন কারবালার লড়াই চলছে। এবং খালা খালু কোমর ডলে দিচ্ছে।

দৃশ্যটা ছবি কিছুতেই ভুলতে পারে না।

ফটিকের বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে বিলকিস বালিশটাকেই বোঝাতে লাগল, বেশি বি আনলি বেশি সুখ হয়, ইডা কিন্তু ঠিক না। নিজের মায়ের উদাহরণ দেখালো বিলকিস। কে ফটিকের বাপ? তার শ্বশুর? তাঁরও তো একই বিবি। বিলকিস এতক্ষণ যেন হাতড়ে মরছি এবার এমন জুতসই একটা উদাহরণ পেশ করতে পেরে সে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল

হঠাৎ ওর মনে হল, ফটিক এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে। ওর বুকের রক্ত যেন ছলাৎ ক লাফিয়ে উঠল। বুক ঢিসঢিস করতে শুরু হল। বিলকিস ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ওর ফর নাকের ডগায় এবং চিবুকে কয়েক বিন্দু ঘাম নোলকের মত চিকচিক করতে লাগল। ছবি দেখ কেউ কোথাও নেই। দরজাটায় ভিতর থেকে খিল দেওয়া। ফাঁকা। ঘরখানা একেবারে ফাঁকা। ঠি তার দেলেরই মত। বিলকিসের বুকটা খাঁ খাঁ করতে লাগল। কেন এল না ফটিক? তার সঙ্গে একটা কথাও না বলে চলেই বা গেল কেন? কেন, কেন? সে উঠে পড়ল। মনটা কেমন খারা লাগতে লাগল। বিলকিস আলনা গোছাতে শুরু করল। ফটিকের লুঙ্গি কামিজ সব আব পেড়ে নিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে গুছিয়ে রেখে দিল। বাপের হাউসের কাঁচের ল্যাম্প বাতিটা আগাগো মুছে চকচকে করে তুলল। তারপর আয়নাটা তুলে নিয়ে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। আয়না মুখের কাছে এনে হাহ্ হাহ্ করে মুখের হাওয়া কাঁচে দিতেই তাতে বাষ্প জমে গেল। তখন দোলাতে দোলাতে বিলকিস আনমনে আঁচল দিয়ে আয়নার কাঁচটা মুছতে লাগল।

যাই বল বাপু, লোকটা ল্যাখাপড়া অনেক শিখিছেন সিডা ঠিকই, কিন্তু বোধভাস্যি

কম, সিডাউ কতি হবে। কা'ল আলেন। আ'সে দহ্‌লিজ ব'সে সারা সন্ধ্যেডা কাটায়ে দেলেন। তারপর যদিবা মেহেরবানি ক'রে ভিতরে আলেন তো দেলেন লম্বা ঘুম। তারপর সকালে বেরোয়ে সেই যে গোরস্থানে গ্যালেন তো সেখেনের থেই সটান চলে গ্যালেন বাড়ি। এই নাকি নতুন বিবির সংগে ল্যাখাপড়া জানা মানুষির ব্যাভার?

আপন মনে আয়না ঘষতে ঘষতে মুখ দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল বিলকিস।

এখেনে আ'সে দুটো মুখির-কথা খসায়ে গেলি কী এমন অপরাধ হ'তো শুনি? আমি কি পায় বেড়ি দিয়ে আটকায়ে রাখতাম?

অভিমানে বিলকিসের মুখ ভার হয়ে এল।

আমি কি যাতি দিতাম না? কই গুলাপ ফুলির বর তো পেরথম দিন শ্বশুরবাড়ি যায়ে নাক ডাকায়ে ঘুমোয়নি? অমন না বলে কয়ে বেরোয়েও তো যায়নি তার বর?

মুখের সামনে আয়নাটা এনে পা দোলাতে দোলাতে মুখটা দেখে নিল ছবি। আবার আঁচল দিয়ে আলতোভাবে কাঁচটা মুছতে লাগল।

সে তো ঘাপটি মা'রে শুয়ে ছিল। গুলাপ ফুল ভাবিছিল তার বর ঘুমোচ্ছে। তাই সে তামন সাবধান হওয়া দরকার মনে করেনি।

হুহু হাহু। আয়নার কাঁচে আরও খানিকটা বাষ্প জমিয়ে দিল বিলকিস।

আমি ভাবিছি মন্দ বুঝি ঘুমোচ্ছে। তাই চুপি চুপি দরজায় খিলটা আঁটে দিয়ে আলনার থে একটা কাপড় নিয়ে সিডা পরবো ব'লে পরনের শাড়িটার খুঁটটা ক্যাবল আলগা করে দিইছি, অমনি চক্ষিব নিমিষি উঠে আসে চিলির মত ছোঁ মা'রে আমারে, কোলে তুলে নিল। আচ্ছা কদিনি ভাই গুলাপফুল, হাড়পিত্তি জ্বলে যায় কি না রাগে? একটুও আক্কেল নেই লোকটার। আমার পরনে তখন শুধু অ্যাকটা সেমিজ। ঘরে হারিকেন বাতিডা জ্বলতিছে। সারা বাড়ি লোকে ভর্তি। আমি কত কলাম ছাড় ছাড়, পায় ধরতিছি, ব্যাগ্যাত্তা করতিছি। তা কি ছাড়ল? এইভাবেই জ্বালায় বুঝলি। রাগে আমার শরীর জ্বলে যায়। আচ্ছা, তুই কদিনি ভাই গুলাপ ফুল, তোর বর যদি তোর সংগে এই রকম ইয়ারকি করত, তোর রাগ হ'তো না?

বিলকিস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর নাকের নিঃশ্বাসে আয়নার কাঁচটা আবছা হয়ে এল। ওর চোখ দুটো টনটন করতে লাগল। ঘরখানা কত ফাঁকা! বিলকিসের দেলটা খাঁ খাঁ করতে লাগল। বিলকিস আঁচল বুলিয়ে বুলিয়ে আয়নাটা মুছে সেটাকে স্বচ্ছ করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল এটা যেন সেই জাদু আয়না যার ভিতর দিয়ে তার ভবিষ্যতের চেহারাটা সে দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই সে দেখতে পেল না, শুধু তার করুণ মুখটা ছাড়া।

বিলকিস আয়নাটা একটু উঁচু করে ধরে একমনে তার দিকে চেয়ে রইল। তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠেছে। তার মানে, ছবি তার প্রতিচ্ছবিটাকে বলল, তুমারে তার পছন্দ হয়নি। তুমি যতই বাহারি ক'রে খুপা বাঁধো, টিপ পরো, চোখি সুরমা টানো, যতই বাহার দিয়ে কাপড় পরো, আসল ব্যাপারডা জা'নে রাখো, তুমারে তার মনে ধরেনি।

ছবি দেখল আয়নার ছবির দু'গাল বেয়ে অবিরল ধারায় জল নেমে আসছে।

বিলকিস আয়নাটা তুলে রাখল। বিলকিস সম্পর্কে ফটিকের এই নিস্পৃহ ভাবটা ওকে পীড়া দিতে লাগল। অসহায় বোধ করতে লাগল ছবি। তবে কি, তবে কি ফটিক আবার বিয়ে করেছে? কাউকে ভালোবেসেছে? বিলকিস ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছে। অথচ এই সন্দেহগুলোকে সে মনে জায়গা দিতে চাইছে না। কিন্তু ফাঁকা ঘরে একা পেয়ে নানা ধরনের সন্দেহ তাকে চার দিক থেকে আক্রমণ করছে। ছবিকে কামড়ে অস্থির করে তুলছে। সে কী করবে ঠিক করতে পারছে না। হঠাৎ সে ভাবল, বিছানাটা আবার পরিপাটি করে পাতবে। বালিশ বিছানার চাদর সরাতে গিয়ে থমকে গেল সে। না না, ফটিকের স্পর্শটা সে রাখবে। এখনও রাখবে। পরে, অনেক পরে, ফটিক বাড়ি এলে বিছানা ঝাড়বে। বিছানায় ফের বসে পড়ল। ওর কেমন কষ্ট হল। চোখ বুজে ভাবতে লাগল এখন যদি তার খসম হঠাৎ এসে দেখে যে, সে এমনিভাবে বসে আছে। তাহলে সে কি খপ্ করে তাকে তুলে নেবে বুকে? যেমন নিয়েছিল ওর গোলাপফুলকে তার বর? আর সে কবুতরের মত ছটফট করবে? যেমন গোলাপফুল করেছিল তার বরের বুকে? সে কি বলবে, ছাড়েন ছাড়েন, এই দিন দুপুরে না। আপনি আমারে ছাড়ে দ্যান। চারদিকি লোকজন ঘুরাফিরা কত্তিছে। এই সুমায়ে কি কেউ দিল্লাগী করে? তার খসম কি তার এই ব্যাগাত্তায় কান দিয়ে ওকে ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দেবে! গুলাপফুলির বর কিন্তু তারে ছাড়েনি। না কি তার খসম এটাকে তার অবাধ্যতা বলে ভেবে নেবে। বিলকিস একবার পঞ্জিকায় খাস স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নির্দেশগুলো পড়ে ফেলেছিল। 'আপনাদের খসম যদি আপনাদিগকে কখনও কোনও কাজে ডাকেন তৎক্ষণাৎ চক্ষের ইশারায় আসিয়া হাজির হউন।' বিলকিসের মনে পড়ল। 'এবং যে মকসুদে ডাকিয়েছেন, তাহা বিনা আপত্তিতে পুরা করিতে চেষ্টা করুন, যদি শরীয়তের কোনও ওজর না থাকে যথাঃ হায়েজ, নেফাছ ও বিমার ইত্যাদি।' অতএব আপত্তি করলে খসম সেটাকে অবাধ্যতা বলে ধরে নেবেন এবং অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার যথোপযুক্ত দাওয়াই প্রয়োগ করবেন। যাউক ভাই ফটিককে যা করে। বিলকিস হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল।

কিন্তু এই লোকটাকে, যতটুকু দেখেছে ছবি তাতে এ তার বিবির গায়ে হাত তুলতে পারে বলে মনে হয়নি। বিলকিস সাহস দিচ্ছে নিজেকে। ফটিক যখন হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল রাত্তিরে, ওর মুখটাকে তখন অবিশ্যি মৌলবী সাহেবদের মতই গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল কিন্তু শেষ রাত্তিরে ওর মুখটাকে দুহাতে তুলে ধরে যে-মুখটা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, সেই মুখটাতে কোথাও অণুমাত্রও কাঠিন্য ছিল না বরং দাড়ির আবরণ সত্ত্বেও সে মুখের কোমলতা বিলকিসের চোখে ধরা পড়েছিল। সে ভরসা পেয়েছিল। তবে এখন বৃথা ভয় পাচ্ছে কেন? ভয় না, ভয় না, ফটিক কাছে নেই বলে সে কেমন অসহায় বোধ করছে। তার হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছে। ফটিক এতদিন বাদে এল। তার কাছে দু দণ্ড থাকবে নাই বা কেন? ওর কি ইচ্ছে করছে না বিলকিসের মত? একটু কাছে বসতে? দুটো কথা বলতে? সবাই ধরে নিয়েছে যে ওরা কাল রাতে খুব কথা বলেছে। খুব ভাবসাব হয়েছে দুজনের। বউ বিটিকে নিয়ে কোনও গোল নেই। তার একটা দুটো কথা। ব্যস। কিন্তু দাদীজানের হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে। যতক্ষণ না পেট থেকে কথা বার করে নিচ্ছে, ততক্ষণ থামাথামি নেই। তাই ও সকাল থেকে এড়িয়ে চলছে দাদীকে। যত পারে কাজ করছে। তারও বেশি কাজ দেখাচ্ছে। এখন হাঁফিয়ে পড়েছে ছবি। একা। এই ফাঁকা ঘরে।

এখন তার একটা সঙ্গ চাই। না মোছফেকা নয়। ওটা বড় পাজী। কিন্তু কি করে ধরল মোছফেকা! বিলকিস আয়নাটা তুলে নিল। মুখের খুব কাছে নিয়ে এল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, সে কোনও চিহ্ন দেখতে পায় কিনা? ফটিক কোনও চিহ্ন রেখে গিয়েছে কি না? না, পেল না। মুখে গত রাত্রের কোনো চিহ্নই এখন নেই। মুছে গেছে। মুছে গেছে? রাত্তিরের ক্ষণসুখস্পর্শের চিহ্ন মুখে না থাক, মনে তো গেঁথে রয়েছে। আর সেই স্মৃতি সারাক্ষণ তাকে উন্মনা, উতলা, অস্থির করে তুলছে। যখন তখন বিলকিসের সে কথা মনে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আর কারো নয় শুধু ফটিকের সঙ্গ পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে সে। তার পিপাসা ক্রমেই বাড়ছে।

বিলকিস আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সে আবার ফটিকের বিছানায় শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে। ফটিকের বালিশে মুখ গুঁজে। থর থর করে কাঁপতে লাগল। ও ব্যালায় আবার আসবে তো ফটিক? বিলকিসের মনে অন্ধকার নেমে এল। যদি না আসে? কী করে এই একা ঘরে রাত কাটাবে সে। ছবি বালিশে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, না পারব না, পারব না, আল্লাহ্, পারব না।

বিলকিস শ্রান্ত হয়ে পড়ল। সে এবার চিত হল। চালের বাতার দিকে চেয়ে ফটিকের কথাই ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার শরীরে কেমন একটা আলিস্যি এসে গেল। তার ঘুম পেতে লাগল। একটু পরেই ছবি ঘুমিয়ে পড়ল। আর সে ঘুম ভাঙল একেবারে মোছফেকার ডাকাডাকিতে। তাকে খেতে ডাকছে।

দরজা খুলতেই মোছফেকা ঠোঁট টিপে সেই রকম বিচ্ছিরি ভাবে হাসল। তারপর বলল, "ন্যান বিবি, হাউস মিটোয়ে ঘুমোয়ে ন্যান। নতুন খসম পালি বিবিগের দুনিয়াটা একেবারে উল্টোয়ে যায়। দিনই হয় তখন রাত্তির আর রাতই হয় দিন। অ্যাখন মেহেরবানি করে মুখি দুডো দেবেন চলেন। তারপর খাটে উঠে মিয়া সাহেবের খুয়াব দেখতি দেখতি আবার ঘুমোয়ে পড়েন গে।"

বিলকিসের ইচ্ছে হল ঠাস করে মোছফেকার গালে একটা চড় কষিয়ে দ্যায়। কিন্তু সে কিছু করল না। লজ্জায় রাঙা মুখখানা নামিয়ে সে খেতে চলে গেল।

কত্তাবিবি দেখলেন তাঁর নাতনীর চাল চলন এরই মধ্যে কেমন মন্থর হয়ে এসেছে। শাদীর পানি মেয়ের গায় পড়িছে। কাল পর্যন্তও ছবি ছিল নাদান এক বালিকা। কিছুই বুঝত না দুনিয়াদারীর। হাসত খেলত। এ-ঘর ও-ঘর লাফাতে লাফাতে ঘুরত। আর এখন? দ্যাখ আল্লার কী আশ্চর্য খোদকারি। খসমের ছোঁয়া একটুখানি যেই লেগেছে অমনি এক রাত্তিরের মধ্যেই সেই কাঁচ মেয়ে কেমন সোমথ হয়ে উঠেছে। বাইচ খেলা তরতরে নৌকোখান বিহেন না হতিই ধ্যানো এক মহাজনী কিস্তি হয়ে উঠল। আল্লাহ্ তুমি সব পার। তুমিই পানির থে মানুষির পয়দা করিছ, তারপর তুমিই রক্তের আর শাদীর সম্বন্ধ ঠিক করে দেছ। তুমিই আদমরে পয়দা করিছ, তুমিই আবার তার শরীরির থে হাড় খুলে নিয়ে তাই দিয়ে তার জুড়াউ পয়দা করে দেছ। সবই তুমার খ্যালা।

দেখিছ তামাসা! সকালের থে বিলকিস বিবি ক্যামন পালায়ে বেড়াতিছেন? চোখি চোখি হওয়া মাত্তর ক্যামন শরমাতিছেন! মুখখানা ক্যামন নিচু করে ফ্যালছেন! বলতে বলতে ক্যামন সব রক্ত মুখি আসে জড় হচ্ছে। ওর মা এই রকম ছিল। কত্তাবিবি মনে মনে খুব মজা অনুভব করতে লাগলেন। যে দাদী না হলি মেয়ের এক দণ্ড চলত না, অ্যাখন দ্যাখ, ক্যামন আড়ায়ে আড়ায়ে চলতিছেন। আজ অ্যাকবারউ এ মুখো হননি। আমি কি তোর ভাতারের ভাগ নিতি যাচ্ছি! হ্যাঁ রে ছুঁড়ি। কত্তাবিবি হাসলেন।

কত্তাবিবি দেখলেন, খাওয়ার সময়েও বিলকিস কথাবার্তা বিশেষ বলল না। দু-একবার যা চোখাচোখি হল, তাতেই তিনি বুঝে গেলেন যে বিলকিস এখন অথৈ জলে। সে ভাবনায়

পড়েছে।

কুল পাচ্ছে না। হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই একা থাকতে চাইছে। আহা, তাই থাকুক। মোছফেকা একবার একটা ঠাট্টা করল। বিলকিসের মুখ একেবারে থালার উপর নেমে পড়ল। বিলকিস খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে উল্টোপাল্টা কি একটা করে ফেলতেই মোছফেকা হেসে উঠল। বলল, "ডালির পাতে চিনি আর খিরির পাতে নুন মাখে বিবি সাহেবা কি নতুন সোয়াদ পাতি চাচ্ছেন?"

কত্তাবিবি বললেন, "ওর পিছুমে যে বড় লাগিছো, এ সুমায় অমন কান্ড কিডা না করে শুনি। ওর মা কী করতো? বউ বিটির অ্যাকবার জিজ্ঞেস করো দিনি? ছবির বাপের পানে ও কালোজিরে মিশোয়ে দ্যায়নি?"

নয়মোন খেতে খেতে ফিক করে হেসে উঠলেন। কত্তাবিবিও হাসতে লাগলেন। বললেন, "অ্যাখন তো সব ডাগর ডোগর হয়ে বিয়ে শাদী হতিছে। বউবিটির যখন আনিছিলাম তখন ওর বয়েস বোধ হয় নয় দশ। তা সে আন্দাজে বড়ই কতি হবে। তা ছবির বাপউ ছিল ঠান্ডা পিরকিতির। বউবিটিও তাই। আর ওগের মধ্যি সেই পেরথমেরথেই ভাব। ওগের নিয়ে বেশি হুজ্জোৎ তাই পুয়াতি হয়নি। আমার শাদী হইছিল পাঁচ বছর বয়েসে। আব্বাসের বাপের, (আল্লাহ তাঁর কবরের আজাব দূর করেন, তাঁরে বেহেস্তী করেন, তাঁরে শান্তি দ্যান) বয়েস তখন পিরায় ত্যারো চোদ্দ হবে। আমার নাক দিয়ে তখন দিন রাত পোঁটা ঝরতো। তাই ছবির রাজা আমারে পোঁটকা পোঁটকা বলে খ্যাপাতো। চড় চাপড়ই কি কম মারিছে ছোটো ব্যালায়। আমিউ শোধ কম নিইনি। অ্যাকবার দিনির ব্যালায় মার খায়ে রাত্তির ব্যালায় আব্বাসের বাপ (আল্লাহ তাঁর বেহেস্তের সব দরজা খুলে দ্যান) যখন ঘুমোতিছে বেহুঁস হয়ে তখন তাঁর কানে কামড় বসায়ে খুন বের করে বদলা নিছিলাম। আমাগের সুমায় অ্যামন ছিল। নতুন নতুন খসম পালি লোকে কত কী করে, তার ঠিক আছে?"

দাদীর কথায় সকলে হেসে উঠল। বিলকিসও। তার মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। তার দুশ্চিন্তাও কমে এল। খেয়েদেয়ে সে যখন আবার তার ঘরে এসে বসল, তখন সে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। পান চিবোতে চিবোতে ভাবল, এখন কী করি? সত্যিই তার খুব একা লাগছে।

বিলকিস উঠে পড়ল। এ ধারে ও ধারে ঘুরল। ফটিকের পুরনো স্যুটকেশটা পড়ে আছে। ও সেটার ধুলো ঝেড়ে দিল। ওর ভিতরে কী আছে? বিলকিস কৌতূহল দমন করল। জড়ানো বিছানাটা খুলে ফেলল। এবং ময়লা বিছানাটা রোদে মেলে দিয়ে এল। তারপর আবার বিছানায় বসে ভাবল, এখন কী করি? এখন সবে মাত্তর দুপুর গড়াল। হঠাৎ বিলকিস ঠিক করল, সে ফটিককে চিঠি লিখবে। সঙ্গে সঙ্গে সে কাগজ কলম দোয়াত তার বাক্স থেকে বের করে চিঠি লিখতে বসল।

কোলের উপর একটা শক্ত খাতা এবং খাতার উপর কাগজ রেখে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে বিলকিস কাগজের মাথায় এক নিঃশ্বাসে লিখে ফেলল, "এলাহি ভরষা।" আর তারপরই হোঁচট খেল। এবার? কী পাঠ লিখবে ফটিককে? ওর বিদ্যের ভাঁড়ার ও আতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল। কী লিখলে ভালো হয়? ভালো দ্যাখায়? পুঁথিতে যারা ভালোবাসার লোক তারা কেউ চিঠি লেখে না। গল্প উপন্যাস হিন্দু মুসলমানের লেখা যে কয়খান সে পড়েছে তার ফুফাতো ভাই ইয়াকুবের দৌলতে, তার মধ্যে মুসলমানের লেখা এমন একখানা বই-এর কথা সে মনে করতে পারল না যাতে খসমকে লেখা কোনও বিবির চিঠি আছে। মুসলমান মেয়েদের খসম বিদেশে যে যায় না তা তো নয়। তা'লি তারা চিঠি লেখে না ক্যান? হিন্দু লেখকরা সে বিষয়ে বরং ভাল। প্রাণেশ্বর, প্রাণকান্ত, প্রাণবল্লভ, হৃদয়েশ্বর, হৃদয়ের রাজা, হৃদযের ধন, জীবনের জীবন, প্রিয়তম আমার, নিদেন পক্ষে শ্রীচরণ কমলেষু, এই ধরনের রকম রকম সব পাঠ তাদের লেখায় পাওয়া যায়। সে তো বেশি বই পড়েনি। আরও কত আছে কে জানে? কত ভালো! কিন্তু বিলকিস বুঝতে পারছে না, এই সব পাঠ তার খসম বরদাস্ত করবে কি না? বিলকিস একবার পাক জনাবেষু কথাটা পেয়েছিল। অনেকটা শ্রীচরণ কমলেষুর মত। সেইটে লিখবে না কি? বিলকিস চটপট লিখে ফেলল, "পাক যোনাবেশু"। পড়ল। কিন্তু কেমন পর পর শোনাচ্ছে। দূর! খচ্ করে কেটে দিল। শের-তাজ (মাথার মুকুট) কথাটাও তার ভাল লেগেছিল। "শের-তাজ আমার!" লেখাটা কি খারাপ দেখাবে? সাহস হল না। খচ্। কেটে দিল। কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিল। সামনে ঝোঁকার দরুণ কয়েক গুচ্ছ চুল চোখের উপর এসে পড়েছিল। হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। আরেকটা কাগজ টেনে নিল। কলমের বাঁটটা চিবুতে চিবুতে ভেবে নিল কিছুক্ষণ। তারপর গোটা গোটা করে লিখতে শুরু করল—

এলাহি ভরষা

পতী ধন! জিবনের জিবন!

প্রাণান্ত মেহনত করে ছবি অবশেষে চিঠিখানা শেষ করল। পাঠ লিখল ইতি ছবি।

এই পর্যন্ত লিখে বিলকিস কি ভাবল। তারপর ছবি কথাটা কেটে দিল। তারপর লিখল, ইতি একান্ত আপনারই বিলকিস। পড়ল আবার। কাটল। লিখল, ইতি আপনার বিলকিস। তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করে উপরে বড় বড় করে লিখল যোনাব শফিকুল মোল্লা, পুজনীয় পতী উকিল সাহেব। তারপর চিঠিখানা ফটিকের বালিশের নিচের ঢুকিয়ে দিল।

ছবি এবার এক সমস্যায় পড়ল। চিঠিখানা তো বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল কিন্তু ফটিক জানবে কি করে যে, ওখানে চিঠি আছে? ছবি চিঠিখানা সঙ্গে সঙ্গে বার করে নিল। তাহলে? নিজে হাতে দেবে? ও বাব্বা! তাহলে? ঘরটায় বার কয়েক চক্কর দিল ছবি। ভাল একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে চিঠিখানা রেখে দিলে কিছুতেই ফটিকের দৃষ্টি এড়াবে না। কোথাও মনের মত একটা জায়গা পেল না। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে চুলের একটা বেলকুঁড়ি কাঁটা নিয়ে এল। তারপর ফটিকের বালিশের উপরে, ওয়াড়ের সঙ্গে চিঠিখানা সেই কাঁটা দিয়ে গেঁথে রেখে দিল। তারপর বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনা নিয়ে নিজের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

যখন ঘুম ভাঙল, বিলকিস ধড়মড় করে উঠে পড়ল। বেশ বিকেল হয়ে গিয়েছে। উঠোনভর ছায়া এসে পড়েছে। আয়না দিয়ে নিজের মুখটা একবার দেখে নিল। ঘুমের চোটে মুখটা ফোলা-ফোলা হয়ে উঠেছে। বড় গেলাসে পানি ভরে ঢকঢক করে তাই খেয়ে নিল। তারপর চেয়ে দেখল চিঠিটা বেশ গিঁথে আছে বালিশে। ছবি একটা বড় গামছা টেনে নিয়ে পুকুরঘাটে চলে গেল।

নয়মোন তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে ওকে বলল, "ও শাউড়ি, কনে যাচ্ছ?"

বিলকিস বলল, "পুকুরঘাটে। গাডা ধুয়ে আসি।"

নয়মোন বলল, "তা যাও। এই অবেলায় আজ চুলডা আর ভিজোয়ে না। এটটু তাড়াতাড়ি ফিরো।"

বিলকিস তাড়াতাড়িই ফিরে এল। নয়মোন মেয়ের মাথাটা টেনে নিয়ে ভাল করে চুলের জট ছাড়িয়ে একটা খোঁপা কেবলমাত্র বাঁধা শেষ করেছেন, ঠিক তক্ষুনি ফটিকদের বাড়ির দিক থেকে তুমুল উত্তেজিত আওয়াজ ভেসে এল। বিলকিস লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। কত্তাবিবি চেঁচাতে লাগলেন, "ও মোছফেকা, ও বউবিটি, কী হ'লো? ও বাড়িত এত গোল কিসির? ও নফরা, ও আব্বাস, বলি এই সন্ধ্যের মুখি ও বাড়িত অ্যাতো আওয়াজ হচ্ছে ক্যান্?"

হাজী সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর হাঁক পাড়লেন, "নফরা!"

॥ ২৩ ॥

ও বাড়িতে গোলমালের আওয়াজ শুনেই বিলকিসের প্রাণ উড়ে গেল। এ ফটিক! ফটিক নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দিয়েছে কি ধুতরোর বিচি খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। আজ সকালে দেখা ফটিকর দাগড়া দাগড়া পিঠের চেহারাটা ওর চোখে ভেসে উঠল। নির্ঘাৎ ও আত্মঘাতী হয়েছে।

"বউবিটি!" বলে মাকে জড়িয়ে ধরে বিলকিস হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

এমন সময় মোছফেকা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল আর উত্তেজনায় তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "ওগো আসো তুমরা, শিগ্গির আসো। ও ছবি, ও বউবিটি! যাও যাও ও বাড়িত যাও। দ্যাখ গে দাউদ মিঞা কী কান্ড করিছে?"

"কী হইছে, কী হইছে, ও মোছফেকা!" কত্তাবিবি তার ঘর থেকে, নয়মোন আর বিলকিস এ ঘর থেকে, এমন কী হাজী সাহেবও বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।

হাজী সাহেব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, হইছেডা কী? কী করিছে দাউদ?"

হাজী সাহেবকে ভিতর বাড়িতে দেখে মোছফেকা থতমত খেয়ে গেল। মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। এতটা তারস্বরে চীৎকার করে ফেলেছে বলে অপ্রস্তুতও হল।

ভয়ে ভয়ে উত্তেজনা দমন করে সে নিচু গলায় বলল, "জে, ও বাড়ির ছোটমিঞা, অ্যাটটা মাছ মা'রে আনিছে।"

"মাছ মারিছে। হুঃ।" হাজী সাহেব বিরক্ত হলেন। "নির্কিরির ছাওয়াল। মাছ মারিছে। আমি ভাবলাম বাড়িতি বুঝি আগুন লাগিছে কিংবা ডাকাত পড়িছে।"

হাজী সাহেব দহলিজে চলে গেলেন।

মোছফেকার উত্তেজনা আবার বৃদ্ধি পেল। ওরা কত্তাবিবির ঘরে জড় হয়ে বসলে পর মোছফেকা চাপা স্বরে কথা বলতে লাগল। কিন্তু ওর তখন এমনই উত্তেজনা যে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গলার স্বর উত্তরোত্তর চড়ে যাচ্ছিল।

মোছফেকা বলছিল, "মাছখান কী? অ্যাত বড় মাছ আমি বাপের জম্মেউ দেখিনি। চল অ্যাকবার দেখে আসবা। হা'তনের খুঁটিতি, চালির বাতায় মাছডারে ঝুলোয়ে রাখিছে। মাথাডা বাতার সঙ্গে বাঁধা আর ল্যাজডা পড়িছে ছানচেয়। তালি বুঝে দ্যাখো, মাছখান কী? গিরামসুদ্ধ লোক মাছ দেখতি ও বাড়িত ভাঙে পড়তিছে। সবাই অবাক অ্যাতো বড় শয়তানডারে দাউদ মিঞা অ্যাকা হাতে ধ'রলো কী করে। ওর খুবই ভানির দিন যে বাঁচে গেছে!"

মাছ! ফটিক নয়। ছবি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তক্ষুনি খিড়কি দিয়ে ফটিকদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সদরে অন্দরে লোক গিজগিজ করছে। বাড়িতে পা দেবার জায়গা নেই। ছবি রান্নাঘরে চলে গেল। ফটিক নেই। ছুটকি উনুনে কাঠ গুঁজে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। ধোঁয়ায় তার চোখ লাল। ওর বড় শাশুড়ি এন্তার কেঁদে চলেছে আর ছোট শাশুড়ি

পাড়ার মেয়ে-বউদের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। উনুনে বড় হাঁড়িতে পানি চড়ানো রয়েছে। ছবিকে দেখে ছুটকি বলল, "আয়।"

দাউদের ছোট আম্মা গর্বে ফাট-ফাট হয়ে এক নাগাড়ে বলে চলেছে, "দাউদ আমার বরাবর অ্যাক্ রুখা। বলি তোর ঘাড় ক্যান্ কা'ত, না আমি অ্যাক জা'ত। ও যখন ছোট্ট এই অ্যাট্টুবিনি সেই তখন থে ওরে দেখতিছি তো। য্যানো অ্যাট্টা মোষ। অ্যামন ধারা গোঁ। ঐ অ্যাক রুখা স্বভাবের মানুষ বলেই অত বড় মাছডারে ধরে আনতি পারেছে। আল্লা মালিক যে ওরে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরোয়ে দেছেন. এই ঢের। শুধু হাতে অত বড় মাছ আল্লার ইচ্ছে আর মেহেরবানি না হ'লি কেউ মারতি পারে?"

বিলকিস এক ফাঁকে উঁকি মেরে মাছটাকে দেখে এল। ও তো তাজ্জব। সত্যিই বিরাট মাছ। কিন্তু ফুটকি কোথায়? ফিস্‌ফিস্ করে ছুটকিকে জিজ্ঞেস করল, "ফুটকি গ্যাল কনে?"

ছুটকি বলল, "ওগের ঘরে। দাউদ ভাইর দফা পিরায় রফা হয়ে আইছিল। আল্লা মালিক জানে বাঁচায়ে দেছে। কিন্তু অ্যাখন তার কথা বলারউ অবস্থা নেই। অ্যামনই পেরেশান হয়ে পড়ছে। কী করে যে অত বড় মাছডারে ঘাড়ে করে বয়ে আনল, সিডাই অ্যাক তাজ্জব। বাড়িতি ঢুকে উঠোনে দড়াম ক'রে চিত হয়ে যখন প'ড়ল তখনই যা কিছুক্ষণের জন্যি ভিরমি খায়ে গিছিল। আমরা আওয়াজ শুনে বেরোয়ে আসে দেখি ঐ অত বড় অ্যাট্টা মাছ আর তার পাশে দাউদ ভাই প'ড়ে আছে অ্যাকেবারে বেহোঁশ। সন্ধ্যের মুখি। বাড়িতি অ্যাট্টা পুরুষ মানুষউ নেই আমি আর ফুটকি ধরাধরি ক'রে দাউদ ভাইর ঘরে নিয়ে তুললাম। সে কী চিহারা ভাইর? আমরা তো বিজায় ভয় পায়ে গিছিলাম। এখেনে সেখেনে খুন জমে আছে। মুখি কালশিটে, ফুলে ঢোল। বাঁ পা-খান দেখলি মনে হয় কিডা য্যানো চিবোয়ে শেষ করে দেছে। আমরা ভাবিছিলাম, মাছডাই বুঝি কামড় বসাইছে। যা না। দেখে আয়।"

ছবি ফুটকির ঘরে ঢুকে দ্যাখে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে দাউদ ভাইকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ফুটকি কাঁদছে আর দাউদের ব্যথার জায়গাগুলোয় গরম পানির সেঁক দিয়ে যাচ্ছে। দাউদের ক্ষত বিক্ষত চেহারা দেখে বিলকিস বেজায় ঘাবড়ে গেল।

ছবিকে দেখে ফুটকি প্রায় ডুকরে উঠল, "শেষ হয়েই গিছিল রে ছবি, আল্লা মেহেরবান, তিনিই ফিরোয়ে আনে দেছেন। ওর জানডা নিবার জন্যি শয়তান আজ মাছডারে পাঠায়ে দিছিল রে ছবি। আল্লা মালিক বাঁচায়ে দেছেন।"

এমন সময় বাইরে আস্‌সালা-মু আলায়কুম্ আস্‌সালামু আলায়কুম্, খড়মের শব্দ এবং হাজী সাহেবের মুখে ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম শুনে বিলকিস্ বলল, "আব্বজান আসে গেছেন।"

বিলকিসের মুখে কথাটা শুনে দাউদ চোখ মেলে চাইল। ওর মুখের একটা দিক ফুলে যাওয়ায় সেদিকের চোখটা প্রায় বুজেই আছে। অন্য চোখটা খোলা। নেয়ামত হাজী সাহেবকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। পিছনে রহমান। গম্ভীরভাবে দাউদের অবস্থাটা একবার দেখে নিলেন হাজী সাহেব। দাউদ অত্যন্ত করুণ এবং অপরাধীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর শ্রান্তভাবে আবার চোখ বুজল। নেয়ামত কি বলতে যাচ্ছিল। হাজী সাহেব গম্ভীর মুখে একেবারে দাউদের মাথার কাছে বসে পড়লেন।

তারপর দাউদের মাথায় হাত রেখে "আউজুবিল্লাহে" দোয়াটা পড়তে লাগলেন। তারপর বার কয়েক স্নেহভরে দাউদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

দাউদ চোখ মেলে আবার তাঁর দিকে চাইল। হাজী সাহেব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বললেন, "এই কামডা তো বাপ একেবারে নির্কিরির ছাওয়ালের মতই করিছ। আল্লা তুমারে দ্যাখায়ে দেলেন, তিনি তুমারে কতখানি হিম্মত দেছেন। তুমি যদি ঈমানের সঙ্গে এই হিম্মত ভালো কাজে লাগাও, তা'লি তুমার ভালো হবে। তুমি বড় হতি পারবা। ইবার তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো। আবার মোকামে যাতি হবে।"

দাউদ কথা বলল না। কথা বলার মত অবস্থা হয়ত ছিল না। সে চোখ বুজল। তার দু চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা নামল। ফুটকি চেয়ে থাকল হাজী সাহেবের দিকে। তার দু চোখে বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা এবং প্রাণভরা শ্রদ্ধা। তার চোখ দুটোও তরল হয়ে উঠল। হাজী সাহেব উঠলেন। দরজার কাছে গিয়ে নেয়ামতকে বললেন, "এখুনি যতীন ডাক্তারির ডাকতি লোক পাঠায়ে দ্যাও।"

নেয়ামত বলল, "জে, অ্যাখনই পাঠাতিছি।"

ওরা সব বেরিয়ে গেলে হঠাৎ বিলকিস বলে উঠল, "আব্বু অ্যাখনও রাঙা ভাইরি কত ভালোবাসে দেখলি তো?"

"কথাডা তোর ভাইরি ক। ভাইরি ক।" বলতে না বলতেই ফুটকি আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ছবিকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হাজী সাহেবের পিছনে পিছনে রহমানের বাড়ির ভিড়টা তাঁর দহলিজে এসে জমল।

হাজী সাহেব হাঁক দিলেন, "নফরা?"

"জে", বলে নফরালি শশব্যস্তে এগিয়ে এল।

হাজী সাহেব এবার খোশ মেজাজে বললেন, "তামুক সাজ বাটা।"

বাইজদ্দি বলল, "তামুক আমি সাজতিছি। তুই এটটু পানি খাওয়া দিন।" বাইজদ্দি আর তার সঙ্গে সবুরালি তামুক সাজতে বসে গেল। একা হাতের কাজ নয়। অনেক কল্কে এখন পুড়বে।

নাজেম নির্কিরি বলে উঠল, "দাউদ অবাক ক'রে দেছে। কোনোদিন বিটা জলে নামল না, জাল ধ'রলো না। অ্যা! বিটা অ্যাতবড় মাছডারে খ্যালায়ে তুলল কী করে!"

সবুর বলল, "আমার ধারণা ছিল, ছাওয়ালডা খালি গায় ফু দিয়েই ব্যাড়ায়। নাঃ, বাপ দাদার খুন শরীলি আছে বটে! বড় মিঞার বাপউ ঐ রকম ডাকাবুকো ছেলেন। কিন্তুক তা না হয় হ'লো, অত বড় মাছটাই বা এই গাঙে আ'লো কন থে?"

বাইজদ্দি বলল, "তুমার য্যামন কথা। মাছটা কি আর আকাশের থে পাড়িছে? ছিল এই পানির মধ্যিই কোনও জায়গায়।"

নাজেম বলল, "মাছডারে দেখে বুঝলে না কুথাকার মাছ? উডা পাকা মাছ। দয়ে ছাড়া আর থাকবে কনে? আমি ভাবতিছি শয়তানডা উপরে উঠল ক্যান? দয়ে কি খাওয়ার কিছু নেই? নাকি অন্য মাছের তাড়া খায়ে এ বিটা উপরে উঠে আ'লো? তা যদি হয় তা'লি তো দয়ে আরউ মাছ থাকতি পারে।"

বদর বলল, "নাজেম ভাই, তা'লি তো দহটারে ঘুলোয়ে দেখতি হয়। আরউ দু এক শালার দ্যাখা পাওয়া যায় কিনা?"

ততক্ষণে কলকেয় টান শুরু হয়ে গিয়েছে।

নাজেম বলল, "সিডাই তো ভাবতিছি। অ্যাখন পানি কম। ঘুলোবার ভালো সুমায়ই তো ইডা।"

"হ্যাঁ, তা ঘুলোতি পারো", হাজী সাহেব বললেন। "তবে মনে রাখবা দহটার উপর হক তুমাগের য্যামন, ওপারের জালেগেরউ ত্যামন। ওগেরউ খবর পাঠাও।"

"না, হিম্মত আছে।" কলকেয় টান দিতি দিতি সবুর বলল, "হিম্মত আছে দাউদির, ইকতা কতিই হবে।"

এতক্ষণে খালেক মুছল্লি বলল, "তুমি কবা তবে জানতি হবে, দাউদের হিম্মত আছে। দাউদের হিম্মত যে আছে তা পাক কোরানে আল্লা নিজেই কয়ে গেছেন।"

"হাঁ হাঁ ঠিক!" মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "বেশক্। সাচ্চা ঈমানদারের মত কথা কয়েছে খালেক ভাই। দেখি অ্যাখন তামাক দ্যাও তো খাই।"

মৌলবী সাহেবকে অনেকদিন বাদে আবার দেখা গেল। তাঁর মাথার পাগড়ি এবং জোব্বা এমনই জেল্লাদার যে এ অঞ্চলের সকলের মনেই তা সম্ভ্রম সৃষ্টি করে। সবাই আস্‌সালামু আলায়কুম আস্‌সালা-মু আলায়কুম বলে সালাম করতে লাগল এবং মৌলবী সাহেবও সবাইকে ওয়ালেকুমস্‌সালাম বলে সালাম ফিরৎ করতে করতে একেবারে হাজী সাহেবের কাছাকাছি গিয়ে বসলেন। এবং সকলের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "জী, আল্লার রহমতে আর সগলকার মেহেরবানিতে আমার তবিয়ত এখনও পর্যন্ত তন্দুরুস্‌ত্ আছে। বহোৎ শোকরিয়া। আল্লাহ সকলের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। সকলের রেজেক বৃদ্ধি করুন। সমস্ত রকম বিমারি, আফৎ আজাব থেকে সব্বাইকে রক্ষা করুন এবং সমস্ত রকম বালা মুছিবত দূর করুন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহতা'লারই জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব, যিনি পরম মেহেরবান এবং বিচার দিনের মালিক।"

মৌলবী সাহেবের কথায় খালেক খুব উৎসাহ পেয়ে গেল। এবং সে আসর জমানোর জন্য বলল, "পাক কোরানে কয়েছেঃ অ কাতালা দাউদো জালুতা ওয়াতা, অর্থাৎ কি না দাউদ জালুতকে বধ করিবেই। কি কন মৌলবী সাহেব? আর এও যখন দাউদ, তখন সে যে এটটা বুয়াল মাছ মারবে, সিডা কি খুব বড় কথা?"

মৌলবী সাহেব হুঁকোয় কষে একটা টান দিয়ে বললেন, "আমারে যদি কিছু কতিই হয় তাহলে প্রথম কথাই কব, জবান সাফ। খালেক ভাই আগে তুমার জবান সাফ কর। জবান সাফ কর। জবানডারে দুরুস্ত কর। তারপর তুমি কুর্‌আন আউড়িয়ো। ভাই মুসলমান, মনে রাখবা আরবি হচ্ছে সেই পাক জবান যার ভিতর দিয়ে আল্লাহ্ আমাগের প্রিয় নবীর কাছে কুরআন নাজিল করেছিলেন। তাই কুরআনকে কোনও মুসলমানের জবান দিয়ে কত্‌ল্ করা উচিত হয় না। তুমি যিডা ক'লে সাফ আরবি জবানে সিডা হবে এইঃ অ কাতালা, কাতালা না কাতালা, বুঝিছ। অ কাতালা দা-বুদো জালুতা অ আ তা। অর্থাৎ কিনা দাউদ জালুতকে কত্‌ল্ করিল।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "আল্লার ফজলে দাউদ ফিলিস্তিনী ফৌজির মশহুর পাহালবান জালুতকে কত্‌ল্ করিছিল, আর আমাগের বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলমান ভুল উচ্চারণে মহান আল্লার বাণী কুরআন শরীফকে হরবখ্‌ত কত্‌ল্ করিতেছে। কী আফসুস্!"

খালেক মিইয়ে গেল। আর সবাই চুপ। খালি সবুরালি 'মারহাবা মারহাবা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। সবুরালি বলল, "আপনি হুজুর কত বড় আলেম। দীনী এলেমে তালিম পাইছেন। তাই আমাগের মনের কথাডা কয়ে দেছেন। কিন্তু আমাগের দিকটাউ অ্যাকবার ভাবেন। সারাদিন প্যাট

পুরোবার ধান্ধায় ঘুরে ব্যাড়াই। সকালের থে সন্ধ্যে পর্যন্ত জাল বাঁতি বাঁতি হাত পার নড়া ছিঁড়ে যাবার জো হয়। কতদিন যে কত নামাজ কাজা হয়ে যায় তার হিসেব নেই। ঐ বাপ দাদার মুখির থে আমাগের যতটুকু শিখা। তারা ভুল বললি ভুল, ঠিক বললি ঠিক। অ্যাখন কথা হলো আমাগের শিখোই-ই বা কিডা আর খোঁজই বা ন্যায় কিডা। খালেক ভাইর তবু এইটুকু ভালো যে ওই-ই আমাগের মধ্যি ভ্যাঁড়ার দলে বাছুর পরামাণিক। নিজি যা জানে তা আরউ পাঁচ জনরে শিখোতি চায়।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "সিডা ভালো, খুবেই ভালো। মুসলমানরা তাগের তহজীব আর তমদ্দুন সম্পর্কে যত ওয়াকিবহাল থাকবে, আগের আখেরাতের আজাব তত দূরে হবে। ভাই মুসলমান, কেয়ামতের কথা সব সুমায় ইয়াদ রাখো। আর ইডাও খেয়াল রাখো কি খোদার নজরকে কেউ ফাঁকি দিতি পারে না।"

হাজী সাহেব বললেন, "আমাগের ছাওয়াল পাওয়াল মোটে ল্যাখাপড়া শিখতি চায় না, তা তাগের উন্নতি হবে ক্যামন করে? আখরাত তো পরে, তার আগে এই দুনিয়াতেই তো ঈমান নিয়ে চলতি হবে। দাউদরি আমি কি কম চেষ্টা করিছি। তা ওদিক তারে ভিড়োনোই গ্যালো না। ভাবিছিলাম আমাগের বংশের মদ্যি ও একটা পাশ দেওয়া ছাওয়াল হবে। তা দ্যাখা গ্যালো আল্লার ইচ্ছে সে রকম নয়। আল্লাহ।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "আল্লাহ যা করেন তা মঙ্গলের জনিই করেন। আরে পাশ দেনেওয়ালাগের কথা ছাড়েন তো দেখি। ওগের দেখে আমার ঘিন্না হয়ে গেছে। মুসলমানের ছাওয়াল দ্যাড় পাতা ইংরজী ল্যাখাপড়া শিখে বোধ হয় সিংঘির পাঁচ পা দেখিছে। তখন পিরেন তহবনধ পরতি তাগের লজ্জা হয়। দাঁড়ি গোঁফ চাঁছে ফ্যালায়ে মুখখানিরে করে তোলেন য্যানো যাত্রাদলের সখি। টুপিডে অবধি মাথায় দ্যায় না। তা জানেন? অথচ টুপি মুসলমানের সব সুমায় দরকারে লাগে। নামাজের সুমায়, খাওয়ার সুমায়, মুরুব্বিগের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সুমায়, কুরআন শরীফ পড়তি গেলি, ঘরের বাইরি বেরোতি হলি, অ্যামন কি পায়খানা পিসাব করতি গেলিউ টুপি পরা মুসলমানের সুন্নত। আর সেই টুপি কিনা আজকালকার পাশ দেনেওয়ালা মিঞাগের কাছে য্যানো জানি-দুশমন হয়ে উঠিছে। মিঞারা যত পাশ দেচ্ছেন ততই য্যানো মুসলমান বলে পরিচয় দিতি লজ্জা পাচ্ছেন। হিন্দু না মুসলমান কলেজ পাশ ছাওয়ালগেরে দেখে তা ঠাহর করি কতি হয়।"

হাজী সাহেবের ফটিকের কথা মনে পড়ল। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে বের করে নিয়ে বললেন, "সবাই কি তাই?"

মৌলবী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "সব সব, বড় মিঞা সব বিটা পাশ দিয়ে দিয়ে গোল্লায় যাতি বসিছে। অমুসলমানি পোশাক পত্তিছে। আচকান, পায়জামা, লুঙ্গি আর টুপি পরা ছাড়ে মিঞারা গোঁপদাড়ি চাঁছে মিহিন ধুতি আর বিলাতি সার্ট পত্তিছেন, দেখলি য্যানো তাগের রাম শ্যাম যদু বলে মনে হয়। শুধু কি এনারা? আর এনাগের কুল-মহিলারা? তাঁরাও আজ ইজের-তহবন কোর্তা-চাদর ফেলে অ্যাখন ফরাস ডাঙ্গার উলঙ্গ বাহার শাড়ি পত্তিছেন। তাঁরাও আজ ময়ূরির পালক পাখায় গুঁজে আশালতা প্রেমলতা অনুপমা ও নিরুপমা হয়ে উঠতিছেন।"

মৌলবী সাহেবের কথার ধরনে অনেকে হেসে উঠল।

কিঞ্চিৎ আবেগ ভরে ও ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে মৌলবী সাহেব বলে উঠেন, "খামোশ! ইডা হাসি মশকরার কথা নয়। বোঝবার চিন্টা কর। ইডা গুরুতর কথা।"

মৌলবীর রকম দেখে ওরা সবাই ঘাবড়ে গেল। এবং এ ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল।

মৌলবী সাহেব আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, "যে শিক্ষা মুসলমানের ছাওয়ালদের লা-মজহবী করে তোলে, মৌলবী মোল্লাদের উপহাস করতি শিখায়, সেই পাশ-দেওয়াটা আমাগের কোন কাজে লাগবে? ভাই মুসলমান আজ আমাগের বড় দুর্দিন। ইসলাম বিপন্ন। আমাগের ছাওয়ালগের আমরা বুকির রক্ত দিয়ে রোজগার করা টাকায় পাশ দিতি পাঠাচ্ছি আর তারা পাশ দিয়ে আসে হিন্দুয়ানীতি রুপ্ত হয়ে পড়তিছে। তারা আর "খোতবা" পড়তি পারে না। ইডা কি হাসির কথা? তাই জমায়েতে ইরা সব হাজির থাকলিউ যারা এগের তুলনায় ঢের কম ল্যাখাপড়া জানে সেই তাগেরই এমামতি করাবার জন্য ডাকতি হয়। হ্যাঁ কি না?"

সবাই "ঠিক কথা কয়েছেন", "লাখ কথার অ্যাক কথা কয়েছেন", বলে মৌলবী সাহেবকে সমর্থন ও অভিনন্দন জানাতে লাগল। হাজী সাহেব শুধু নির্বাক। গড়গড়া টানতে লাগলেন।

মৌলবী উৎসাহ পেয়ে হুঁকোয় বেশ করে কষে গোটাকতক টান দিয়ে নিলেন।

সবুরালি কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলেই ফেলল, "আমাগের খালেক, ঐ যে খালেক, ও কিন্তু খোতবা পড়াতি পারে। আমাগের এই গিরামের মধ্যি ওই সব মাছলা মাছায়েল জানে।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "আরে খালেকের কথা কিডা কচ্ছে। আমি কচ্ছি সেই সব কাফেরের বিদ্যা কুফরি কালাম আর ইংরাজি শিক্ষা এলমে বেদীন পড়ে যারা পাশ দিয়ে আসতিছেন, তাগের কথা। ইনারাই তহবনধ পরা টুপী পরা ছাড়িছেন। মুসলমান দেখলি নাক শিটকোন, হিঁদুগের মতই তাগেরে মোল্লাজী, কাট-মোল্লা এই সব বলে ঠাট্টা করেন। ইনারা অ্যাখন হিঁদুগের গায়

গা ঠ্যাকায়ে বাবু হবার জন্য কী কাঙালপনাই না দ্যাখাতিছেন। কিন্তু ইডা বোঝেন না যে, পাশই দ্যান আর যাই দ্যান, তাগের ছুঁয়া লাগলি হিঁদুগের হুকোর পানি নষ্ট হয়, নাড়ের গায়ে গা ঠ্যাকালি হিঁদুগের শরীর অপবিত্র হয়ে যায়। ভাই মুসলমান, তুমরা ভাবো, বুঝে দ্যাখ, ঐ সব পাশ দেওয়া মুসলমান বাবু আর তুমরা অ্যাক কি না? যারা ধর্ম মানে না, শরিয়ত মানে না, কুরআন পড়ে না, যারা বেনামাজী তারা আর তুমরা অ্যাক কি না? না যদি হও তাহলি ওগের সংগে মেয়ের বিয়ে শাদী দিবা না। সম্পর্ক রাখবা না।"

সবুরালি এবার বোকা বনে গেল। সে বলে উঠল, "বাঃ! তাহলি আমাগের ফটিক মিঞার কী হবে? সেও তো পাশ দিয়ে আয়েছে।"

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ফটিক মিঞা কিডা?"

বাইজদ্দি কল্কে পাল্টে দিতে দিতে বলল, "বড় মিঞার জামাই। উকালতি পাশ দিয়ে অ্যাখন বাড়িতি ফিরে আইছেন।"

হাজী সাহেব একবার জোরে কেশে নিলেন তারপর আবার গড়গড়া টানতে লাগলেন। কোনও কথা বললেন না। মৌলবী সাহেবের মনে হল, তাঁর ভাষণ বোধ হয় হাজী সাহেবের মনঃপূত হয়নি। বেশ কয়েক বছর পরে তিনি আবার এদিকে এলেন। মেন্দার বাড়িতেই এসে ওঠেন। কারণ সেখানেই ওঁর পশার জমে ভাল। মেন্দা ওর জানি দোস্তও বটেন। অনেক দিনের সম্পর্ক। এই ফটিকের সংগেই না মেন্দার বেটির শাদীর কথা হইছিল? হাজী সাহেবও এদিকের মাতব্বর। তাই এদিকটাও তাঁকে ঘুরে যেতে হয়।

হাজী সাহেবের দিকে চেয়ে মৌলবী সাহেব খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

বললেন, "বেটির শাদী দিয়ে ফেলিছেন? আল্লাহ ওগের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। ওগের ঈমানের রাস্তায় রাখুন। তা জামাই কি সেই ফটিক? সাজ্জাদ মোল্লার ছাওয়াল?"

খালেক জবাব দিল, "জে।"

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তা সে না ইশকুলির মাস্টারি করত? দারেপুর না কনে যানো?"

বাইজদ্দি বলল, "সে তো কবেই ছাড়ে দেছেন। তারপর তো কলকাতায় গ্যালেন। সেখেনের থে উকালতি পাশ করে এই ফিরিছেন।"

হাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনিউ তো কলকাতায় ছেলেন?"

মৌলবী সাহেব বললেন, "কলকাতায় না, হুগলীতে। মাদ্রাসায় চাকরি নিছিলাম। ভাল লাগলো না। তাই আবার মজহবের কাজে, কওমের খেদমতে, আল্লার হুকুমিই ফিরে আলাম। মোসলেম জাহানের অবস্থা খুব খারাপ হাজী সাহেব। মুসলমানের ছাওয়াল আর মক্তব মাদ্রাসায় পড়তি চায় না। তারা ইশকুল কলেজে ঢুকে এলমে বেদীন শিখতিছে। তাগের ঈমান নষ্ট হতিছে। ঈমান নষ্ট হলি মুসলমানের কি আর মুসলমানত্ব থাকে? সে তো কাফের হয়ে যায়। তাই সব অ্যাখন হতি যাচ্ছে। ভাই মুসলমান, সামনে অন্ধকার। হুঁশিয়ার হও।"

অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী বাঁ হাতে হুঁকো ধরে তামুক টানতে লাগলেন এবং ডান হাতে অভ্যাস বশত দাড়ি চুমরোতে লাগলেন। কারণ সম্প্রতি তিনি মুসলমানদের কয়েকটা পত্রপত্রিকায় মুসলমান লেখকদের, অবশ্যই কুফরি এলেম প্রাপ্ত, লেখা পড়ে তাজ্জব বনে গিয়েছেন। এবং ঐ সংগে ভীতও। এ সবই সন্দেহ নেই, কাফের স্বভাব প্রাপ্ত মুসলমান পাশ দেনেওয়ালাদের বজ্জাতি। এদের শায়েস্তা করতে না পারলে এদেশ থেকে ঈমান উঠে যাবে। ইসলাম যে আজ কী পরিমাণ বিপন্ন তা এই মুর্খদের কোনও ধারণা নেই। মুসলিম জাহান আজ যে জাহান্নমে যেতে বসেছে, সে সম্পর্কে কারও কোনও চেতনা আছে? সর্বনাশ কত দূর এগিয়েছে সে খেয়াল আছে কারও এখেনে? হাজী সাহেবের এই নিস্পৃহতা মৌলবী সাহেবকে আহত করল। মেন্দা হলে এখনই রই রই করে উঠত। ঐ জন্যই মেন্দার সংগে কথা বলে আরাম পান তিনি।

"যাঁহারা ধর্মোপদেশ দিয়া বেড়ান, তাঁহাদের অধিকাংশই স্বার্থের গোলাম। তাঁহারা আমাদের বংগীয় মোসলমান সমাজকে আলস্যের দিকে, ভিক্ষাবৃত্তির দিকে এবং মুর্খতার দিকে টানিয়া লইতেছেন।"

এ কথা কি কোনও হিঁদু বলেছে? মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন। না। নিজেই জবাব দিয়েছেন। এ কথা কি কোনও খেরেস্তান নাছারা বলেছে? না। যারা বলছে, তারা নিজেদের মুসলমান বলেই পরিচয় দিচ্ছে। আফসুস সেইখানে। শুধু কি এই?

"সমাজ বর্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীর সাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত; তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ সমাজের উন্নতিকে অনূন আরও কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছেন।"

কে একথা লিখছে? কোনও কাফের? না। কোনও নাছারা? না। এসব কথা প্রচার করছে ইশকুল কলেজে পড়া, পাশ দেওয়া মুসলমানের নব্য বংশতিলকেরা। কওমের ভবিষ্যত ভেবে মৌলবী মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন। এই সব পাশ দেনেওয়ালারা মৌলবী, মোল্লা, আলেম, যাঁদের

কাঁধের উপর ভর দিয়ে দীনী ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে, সেই তাঁদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

"বঙ্গদেশে বেহার ও হিন্দুস্থানের মৌলানা নামধারী একদল লোক আছেন—ধর্মভীরু বাঙ্গালী মোছলমান পালকী, বজরা, পাগড়ী ও আবা কবা দেখিলেই মুগ্ধ হয়। ঐ সকল নামধারী মৌলানাগণের মধ্যে শতকরা অর্ধেক লোক ষোল আনা মূর্খ, আরবীতে নামটা পর্যন্ত দস্তখত করিতে জানে না, শতকরা ৩০ জন সামান্য আরবীতে জ্ঞান রাখে। শতকরা ২।৪ জন লোক বিদ্যাবুদ্ধি রাখেন বটে, সমাজের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা ব্যতীত তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার আর কিছুই হয় না।"

লেখাটা পড়া মাত্র তাঁর পিত্ত জ্বলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল বুঝি তাঁকে লক্ষ্য করেই লেখা। কেননা পাগড়ি আবা কবা তিনি পরেন। কেন পরবেন না? যাতে কওমের খেদমতের বিশেষ সুবিধা হয় তাই তিনি করেন। একবার এই রকম এক অকাল কুষ্মাণ্ড আমারে দেওবন্দী আমামা অর্থাৎ পাগড়ি দেখে আমারে ঝাঁকামুটে বলে তামাশা করিছিল। কী আন্দাজ বদমাইশি! অ্যাঁ। বিটারা তুমরা কী কর? মোচ দাড়ি চাঁছে পুছে সাফ করে মুখখানারে একেবারে যে বাজারের বৌন্ডর মতো করে রাখতিছ, আওরাত না মরদ চট করে বুঝা যায় না, সিডা বুঝি ভালো দ্যাখায়, অ্যাঁ। ঝাঁকামুটে! শয়তান সব! হিন্দুয়ানি আর খেরেস্তানির গুলাম হয়ে পড়তিছ, সে খিয়াল নেই। ঝাঁকামুটে! আরে বিটা আমার মাথায় যে পাগড়ি তা যদি ঝাঁকাই হয় তো সেই ঝাঁকায় তো ইসলামরে বয়ে ব্যাড়াই। তুরা করিস কী? বেতমিজ! মোনাফেক! কী করে? আমাগের কুষ্টি কাটে। আবার কী?

"এ কথাটাও ভিত্তিহীন নয় যে, কতিপয় ছদরিয়া পাগড়ি এবং জুব্বাধারী তথাকথিত মৌলবী সাহেবান নিজেদের আসব জমাইবার উদ্দেশ্যে বা অতি বুজরগীর আশায় 'এক নামাজ কাজায় ৮০ হোকবা দোজখ-বাস', 'গানের সুর একবার কানে গেলে ৪০ দিনের এবাদৎ বরবাদ', একটি বাঁশীর রবে ঈমান ছুটে', 'হিন্দু দুরের কথা বে-নামাজীর হাতে এক গ্লাস জল পানে মায়ের সঙ্গে 'জেনা' ইত্যাদি অসংখ্য আজগবী গল্প বা রওয়ায়েৎ বর্ণনা করেই গোটা মুসলমান জাতটাকে ইসলামের বাইরে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করছেন।......পক্ষান্তরে, অতি সহজ উপায়ে বেহেশত দখল দিবার উদ্দেশ্যে একবার কলেমা তৈয়ব পাঠে বেহেশতে দাখিল দেওয়া, গঞ্জেল আরশ একবার পাঠে দশ হাজার হাজি, দশ হাজার গাজি প্রভৃতির নেকী হাসেল, অমুক দিন দুই রাকায়াত নমাজে বেহেশতের বালাখানা প্রাপ্তি, অমুক দরবেশ হাওয়ায় উড়িল, অমুক ফকির জলে হাঁটিল—এরূপ কত দেরায়াৎশূন্য রওয়ায়েৎ বর্ণনা করে সাধারণ মানবগুলিকে যা-তা বুঝিয়ে দিতেও তাঁরা কুণ্ঠা বোধ করেন না।"

ইডা যিনি লিখিছেন তিনি নাকি নিজি একজন মৌলবী! মৌলবী সাহেব এই সব পড়েন। রাগে গর গর করেন। মৌলবী না হাতি! ইরা সব হচ্ছে মোনাফেক, কপট, ভণ্ড। ইরা কাফেরগের থেও খারাপ। হিন্দুগের পা চাটা। শয়তানের চর। এবং আশ্চর্য, মৌলবী দীন মোহাম্মদ আজকালকার জমানায় বিভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। কেমন যেন ভয় পান। আউজুবিল্লা-হে-মিনাশাই-তোয়ানিররাজীম। মৌলবী সাহেব প্রার্থনা করলেন। বিতাড়িত শয়তানের দুষ্টামি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত আমি খোদাতা'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব কমে যাচ্ছে, মৌলবী সাহেব শুধু যে এই কারণেই ক্ষুব্ধ তা নয়। তাঁর ক্ষোভের আরেকটা কারণ আরও গুরুতর। এই পাশ দেনেওয়ালা মোসলেম নব্য সম্প্রদায় ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। এবং ধীরে ধীরে তাদের দল ভারি হতে শুরু করেছে। তিনি এই কারণেই এত উদ্বিগ্ন। ভয়ের কারণটাও এই। এই পাশ দেনেওয়ালারা পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনকে মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি বানাচ্ছে আর তার নাম দিচ্ছে ইসলাম। তারপর ধর্ম সংস্কারের নামে শরিয়ত হাদিস-এর উপর মারছে ইচ্ছে মত কলমের কোপ। এ'রা শিক্ষিত এই অভিমানবশত, এবং নব্য বিজ্ঞানের অবমাননা ভয়ে মৌলবী সাহেবদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ ঘৃণাজনক মনে করেন। অথচ নিজেরা ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ। অনেকেই নামাজ রোজার বালাই চুকিয়ে দিয়েছে। এই যে খালেক মুছল্লি, এ শিক্ষিত নয়, কোনোই পাশ দেয়নি। মক্তবে লেখাপড়া শিখেছে। বুজরগ আলেম মৌলবীদের সঙ্গে ফিরে ওয়াজ-নছিহত শিক্ষা করেছে। ইসলাম বিষয়ে ও যতটা জানে, পাশ দেনেওয়ালারা তার দশ ভাগের এক ভাগও জানে কিনা সন্দেহ। এখন আবার ফ্যাশন হয়েছে, আরবী ফারসীর বদলে বাংলা চালু কর। মক্তব মাদ্রাসা থেকে আরবী ফারসীকে নির্বাসন দাও। তা হলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। ইসলামের সর্বনাশ পুরা হয়। আর এই সব কথা যারা বলছে তারাও নাকি মৌলবী মৌলানা! আফসুস। এ দাবি হিন্দু কি খেরেস্তানে তোলেনি, তুলেছে পাশদেনেওয়ালা মুসলমান। আফসুস। মৌলবী সাহেবের বাঁ হাতে হুঁকো এবং ডান হাতে দাড়ি। দুটোর টানই একসঙ্গে চলতে লাগল।

যতীন ডাক্তার এসে দাউদকে বেশ ভাল করে দেখলেন। নেয়ামত, দাউদের বড় ভাই, ডাক্তারকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ফটিক আর ছবি অন্দরে ঢুকে গেল।

যতীন ডাক্তার ক্ষতস্থানগুলোর কোথাও আইডিন, কোথাও বেনজিন লাগিয়ে দিলেন। মুখে গরম জলের সেঁক দিতে বললেন। তারপর বাঁ পায়ের ক্ষতটা দেখে বললেন, "হুঁ, ইডা

সারতি একটু সময় নেবে। ক'দিন যেন আর বেরোয় না। আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে বাঁধে দিয়ে যাচ্ছি। সারে যাবে।"

কার্বলিক লোশন ক্ষতে ঢালতেই দাউদ "বাপ রে" বলে আর্তনাদ করে উঠল। যতীন ডাক্তার বললেন, "তবে যে শুনলাম অ্যাত বড় অ্যাকটা মাছের সংগে মুখ বুজে লড়াই করিছ? আর ওষুধের অ্যাকটা কামড় খাতি না খাতিই অ্যাত বড় একটা চ্যাঁচান চ্যাঁচায়ে ফেললে?"

ডাক্তার আবার একটু ওষুধ ঢাললেন। এবার আর দাউদ চ্যাঁচালো না, যদিও তার মনে হল তার পা-খানাকে কেউ জ্বলন্ত উনুনে ঠেসে দিয়েছে। শালার ডাক্তার আঁতে ঘা দিয়েছে, তাই সে টুঁ শব্দ করল না। তবে তার মনে হল, ফুটকির কোলে যদি সে তার হাতখানা রাখতে পারত, তবে তার শরীরে একটুও যন্ত্রণা সে টের পেত না। বাড়ি আসার পর থেকে এ পর্যন্ত কী শুশ্রূষাটাই না করেছে ফুটকি। সারা জীবনে সে তা ভুলতে পারবে না। সে ঠিক করল চাচা যখন মাফ করে দিয়েছে, তখন এবার সে ঠিক মত কাজ করবে। আর বদখেয়াল করবে না। পয়সা নষ্ট করবে না। ফুটকিকে সংগে নিয়েই এবার মোকামে যাবে। এবার সে ঘর বাঁধবে। অন্য মেয়েছেলে ছোঁবে না। ফুটকির সব আফসোস সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। দেল উজাড় করে ভালবাসবে ফুটকিকে। তার সব সাধ আহ্লাদ পুরোয়ে দেবে।

প্রত্যেকটা চিন্তা দাউদকে দারুণ সুখ দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ডাক্তারের খোঁচাখুঁচিতে খুব ব্যথা পাচ্ছিল দাউদ। কিন্তু ফুটকিকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন তাকে সে বেদনা তেমনভাবে টের পেতে দিচ্ছিল না। হঠাৎ তার মাছটার কথা মনে পড়ল। শালা! দাউদকে সব থেকে বেগ দিয়েছে নৌকোয় তোলবার সময়। নৌকোর খোলে তোলবার পরও কী আছড়ানি দিয়েছে দাউদকে। সে তখন রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে বৈঠে পেটা করে ওর মাথাটা থেঁতলে দ্যায়, তবে মাছটার তড়পানি ভাঙে। মাছটার তেজ ভাঙবার জন্য তার মাথা ভাঙতে হল। ফুটকিকে ভালবাসলেই দাউদ দেখেছে ফুটকির তেজ আর থাকে না। ফুটকিকে আসলে বুঝতে পারেনি দাউদ। বুঝবার ফুরসতই বা পেল কই। মোকামে ঘুরে ঘুরে অ্যামন অ্যাকটা বাইরের টান এসে গিয়েছিল তার যে, ঘরের সোনার উপর চোখই য্যানো পড়েনি। ভুল করেছে দাউদ। এ ভুল আর করবে না।

ডাক্তারবাবু উঠে যাবার সময় বললেন, "যে পাটা বাঁধে দিয়ে গ্যালাম কদিন পরে আসে উডা খোলব। এর মধ্যি য্যানো একটুও জল না লাগে।"

ডাক্তারবাবু উঠতে না উঠতেই মাগরেবের নামাজের আজান শোনা গেল।

নামাজও শেষ হয়েছে, হাজী সাহেবের দহলিজের জমায়েত ভাঙব ভাঙব করছে, এমন সময় ফটিক ঢুকল। কিছুটা শ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মৌলবী সাহেব তাকে দেখেই চিনলেন। মাথায় টুপী নেই। নামাজও সারেনি। এ সেই পাশ দেনেওয়ালাদের দলেরই একজন। সালাম টালাম করবার পর দুজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। দুজনেই কবুল করলেন যে একজন অন্য জনকে দেখেছেন আগে। এমনিতে আদব তমিজে কিছুই ঘাটতি পেলেন না মৌলবী সাহেব। তবুও ফটিকের চোখ দুটো দেখে তিনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ চোখ-অনুগত লোকের নয়। এ চোখ যাচাইকারীর। এই ধরনের লোকেরাই বিপদের হয়ে ওঠে। তাঁর মন তাঁকে সতর্ক করে দিল। ফটিকও মৌলবী সাহেবের ছদরিয়া পাগড়ি আর জোব্বার দিকে সতর্ক নজর দিল। দুটো যুগ যেন মোকাবিলার জন্য মুখোমুখি।

হাজী সাহেব এদিন আর ফটিককে দাঁড়াতেই দিলেন না। বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন।

নয়মোন ফুটকির বাড়ি যাচ্ছিলেন, জামাইকে দেখেই তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। নফরকে ডেকে যা যা দরকার ফটিককে দিতে বলেই ও বাড়ি চলে গেলেন। তারপর বিলকিসকে ডেকে মৃদু স্বরে বললেন, "ও শাউড়ি বাড়ি যাও। জামাই আসে গেছেন। কী লাগবে কী না লাগবে তুমি অ্যাকটু দ্যাখ গে দিনি। আমি একটু পরে আসতিছি।"

বিলকিসের প্রথমেই মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। সর্বনাশ! সে এক দৌড়ে ছুটল সেখানা সরিয়ে ফেলতে।

॥ ২৪ ॥

আব্বার রোগজর্জর চেহারা, হতাশ উক্তি এবং সব ছাপিয়ে সেই বোবা দৃষ্টি কিছুতেই ভুলতে পারছিল না ফটিক। ভুলতে পারছিল না দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে ঠায় বসে দেখা তার আম্মাজানের সারাদিনব্যাপী ফুরসৎহীন সেই অমানুষিক একটানা খাটুনি। তার আম্মা কি এই নতুন খাটছে? তা নয়। সে বরাবরই তার মাকে খাটতে দেখেছে। তবে? আজ নতুন কী এমন দেখল ফটিক, যাতে বিশেষ করে তার এই কথাগুলো মনে পড়ছে? তার মায়ের দিক থেকে নতুন কিছুই ঘটেনি। যে ভারা-ভানানী সে ছিল, সেই ভারা-ভানানীই সে আছে। পরিবর্তন হয়েছে ফটিকের। আগে সে তার সংসারের অন্য কাজগুলো করে দিয়ে আম্মাজানের পরিশ্রমের অনেক লাঘব করে দিত। তার আম্মার অনেক খাটুনির সে ছিল ভাগীদার। সে যখন রাখাল সেই

তখন থেকেই সে গোয়াল সাফ করেছে। তখন তাদের গোয়ালে এক জোড়া মোষ, এক জোড়া বলদ এবং দুধেল গাই গোটা তিনেক ছিল। তার কটা যে আজ আছে, সে জানে না। আম্মা আব্বার সঙ্গে সঙ্গে সেও হাত মিলিয়েছে, খড় কেটেছে, খড় ভুষি খইল মিশিয়ে জাবনা তৈরি করেছে, চাড়িতে তেষ্টার জল জুগিয়েছে, তাদের মাঠে নিয়ে গিয়েছে চরাতে। ধান উঠলে বাড়ির খামারে মলন মেলেছে। বাপের সঙ্গে কুষ্টা আছড়েছে। মক্তবে ইশকুলে পড়ার সময়েও তার এ-সব কাজ বন্ধ হয়নি। বড় ইশকুলে যখন পড়ত তখন সব কাজ করার সময় পায়নি হয়ত তবুও অবসর সময়ে বাড়ির কাজ সে একই ভাবে করে গিয়েছে। কেঁড়ে ভর্তি দুধ নিয়ে হাটে গিয়ে বেচে এসেছে।

সে যখন ম্যাট্রিক পাশ দেবার পর মাস্টারি করেছে, তখনও সে চাষা। মাঝে দু বছর চাকরি ছেড়ে নড়াইলের কলেজে ইনটারমিডিয়েট পড়ে এল। মেজো কত্তাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরে ফটিক যেন ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেল। আবার মাস্টারি ধরল। তখনও তার মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। তারপর আবার মেজো কত্তার উৎসাহে এবং সহায়তায় দৌলতপুরে সে বি এ পড়তে গেল। পাশ দিয়ে ফিরে এল। আবার মাস্টারি নিল। বাড়ি থেকেই রোজ যাতায়াত। তাই শরীর থেকে চাষার গন্ধ তখনও গেল না। সে যেন তখন তার আব্বা আম্মা এদের সকলের সঙ্গেই গ্রামীণতার একই সাগরে ডুব দিয়ে আছে। সমুদ্র থেকে উঠে না এলে গায়ে আলাদা করে নোনা গন্ধ টের পাওয়া যায় না। কলকাতায় এবার যখন সে ওকালতি পড়তে গেল তখনও তার গায়ে চাষার গন্ধ। যখন আবার সেই বাড়িতে ফিরে এল তিন বছর পর ফটিক দেখল তার শরীর থেকে কলকাতা তার উত্তরাধিকার শুষে বের করে নিয়েছে। সে আর পরিবারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নেই। সে এখন দর্শক মাত্র। সহানুভূতিশীল এবং সহৃদয় এক দর্শক। তাই তার চোখে আম্মার অমানুষিক খাটুনি, আব্বার অর্থবহ নির্বাক দৃষ্টি এত বিঁধছে। এবং এক নাম-না-জানা অপরাধ বোধের ভারে সে ক্রমশ নত হয়ে পড়ছে। অথচ সে বুঝতে পারছে না, তার দোষটা কোথায়? এ অবস্থাটা নিঃসন্দেহে অস্বাস্তিকর এবং পীড়াদায়ক।

ফটিক শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে হাটখোলাটা ঘুরে যাবে ঠিক করল। যতীন ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারি হয়ে ডাক্তারকে তার বাজানের খবরটা দিয়ে যাওয়াই ভাল। বাজানের চিকিৎসাটা ভালো করে করানো দরকার। এইখানে ফটিক একটা বড় সমস্যার মুখোমুখি হল। টাকা? বাড়ির যে অবস্থা এক নজরে দেখে এলো, ফটিক তেমন শোচনীয় অবস্থা তাদের পরিবারে আর কখনো দেখেনি। বাড়িটা যেন এখন মূর্তিমান নিঃস্বতা। তার কাছেও এমন কিছু টাকা নেই। বড় জোর শ খানেক টাকা হাতে আছে। এই তার ওকালতি পেশায় নামবার মূলধন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কত আজগুবি, তা যেন এখন, আজ এই মুহূর্তে বুঝতে পারল ফটিক। তার উকিল হওয়ার চেষ্টা যে বামন হয়ে চাঁদ ধরা, হ্যাঁ তা ছাড়া আর কী, হায় এটা কেন সে আগে বুঝতে পারেনি?

সত্যি বলতে কি খানিকটা রাগের বশে এবং খানিকটা ঝোঁকের মাথায় সে ওকালতি পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে যদি দা'রেপুরের মিডিল ইংলিশ ইশকুলের হেডমাস্টারের পদে স্থায়ী হতে পারত বা তার চাইতেও যোগ্য কোনো লোককে ঐ পদে নিযুক্ত করা হত, তাহলে ফটিক ঐ ইশকুলের শিক্ষকতা ছাড়ত না। পড়তে এবং পড়াতে তার ভালোই লাগে। কিন্তু তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এবং সে মুসলমান শুধুমাত্র এই কারণেই তাকে হেডমাস্টারের পদে স্থায়ী করা হল না, এবং এ ঘটনা ঘটতে পারল শুধু এই কারণেই যে ঐ ইশকুলটা এক হিন্দু জমিদারের অর্থানুকূল্যে চলে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। কাঁটাটা আরও খচখচ করে এইজন্য যে জমিদার নিজে লেখাপড়া জানেন এবং তার মর্ম বোঝেন। তা সত্ত্বেও তার উপর অবিচার হল এবং জমিদারবাবু মুখে যথেষ্ট আহাজারি করা সত্ত্বেও তার কোনো প্রতিকার করলেন না। সেই ক্ষোভে এবং সেই রাগে সে শিক্ষকতা ছেড়ে দিল এবং মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করল সে এবার এমন একটা পেশা নেবে যেখানে কারও গোলামী তাকে করতে হবে না, যেখানে সে নিজের হিম্মতে নিজের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারবে। তাই সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই আইন পড়তে ছুটেছিল। পাশটাও ভালোভাবেই করেছিল। মিস্ পালিত তাকে বলেছিল, ফটিক যদি রাজী থাকে তবে সে তার বাবাকে বলবে তাকে তাঁর জুনিয়ার করে নিতে। সে রাজী হতে পারেনি। তার হীনমন্যতা তাকে রাশ টেনে রেখেছিল। বার বার তার মিস্ পালিতের কথা মনে পড়ে। যেমন মনে পড়ে মেজো কত্তার কথা, আঠারোখাদা এম ই ইশকুলের হেড্‌মাস্টার তারিণী শিকদেরের কথা। সে মুসলমান বলে ওঁরা একদিনের জন্যও তো অবজ্ঞা করেন নি। বরং মেধাবী ছাত্র বলে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন তার, জলপানি পাওয়ানোর জন্য তারিণী স্যার নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে তালিম দিয়েছেন। ফটিকের প্রতিটি উন্নতিতে খুব খুশি হয়েছেন।

মাঝে মধ্যে ও বাড়িতে খেতেও হয়েছে তাকে। তারিণী মাস্টার ছাড়বার লোক নন। কিন্তু এই খাওয়া নিয়ে আবার অদ্ভুত কাণ্ডও হয়ে গিয়েছে। সে ঘটনা জীবনেও ভুলবে না ফটিক। ছুটির দিন সেটা। পড়াতে পড়াতে তারিণী স্যারের খেয়াল ছিল না। দুপুর প্রায় গড়িয়ে এসেছে। ওঁর বউ-এর তাগাদায় যখন মাস্টার মশাইয়ের খেয়াল হল, তখন ফটিকের উপর ওঁর চোখ পড়ল। বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তোরও তো খাওয়া হয়নি। মুখখান যে শুকোয়ে আমসি হয়ে গেছে। এই অ্যাতখানি পথ এই ঠা ঠা পড়া রোদ্দুরি আবার খালি পেটে ফিরে যাবি?" বলেই

চুপ করলেন। তারপর খানিকটা ভেবে নিলেন। কপালের রেখা কুঁচকে গেল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, "তাও কি হয়? আমার ছাওয়াল খালি পেটে এই রোদ্দুরে শুকনো মুখি ফিরে যাবে, আর আমি বসে বসে খাবো। তা কী করে হয়?" তারপর আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভুরু কপালে উঠল। তারপর একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে বললেন, "দ্যাখ বাবা, কিছু মনে করিস নে, এই বাড়ির মেয়েগের একটু ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক আছে। তা কী করা যাবে? যে য্যামন আছে অ্যাখন সে ত্যামনই থাক, তুই কিছু মনে করিস নে বাবা, তুই দুটো খায়ে যা। তুই না খায়ে গেলি আমারউ খাওয়া হবে না।" স্যার একথা বলতে না বলতেই তাঁর বউ বেরিয়ে এলেন। লালপেড়ে মোটা শাড়ি পরনে। মাথায় অল্প একটু ঘোমটা। কপালে লাল টকটক করছে সিঁদুর। দু হাতে শুধু লাল শাঁখা আর একা হাতে নোয়া। ডান হাতে একটা ঘটি। ফটিকের মনে হল, এই বোধহয় দেবী সরস্বতী। মানুষের এমন চেহারা সে দেখেনি। তিনি হেসে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, "ওঁর কথা তো অ্যাতক্ষণ ধরে খালে বাবা, ইবার ন্যাও আমার হাতের ভাত দুটো খায়ে ন্যাও। এই আমি জল ছিটোয় দিচ্ছি। ঐ দ্যাখ ঝাটা। তুমি একটু ঝাঁট দিয়ে ন্যাও। তারপর দুখান কলাপাতার আগোট আনে দিচ্ছি। অ্যাকখানার উপর আরেকখানা পাতে ন্যাও। তারপর তুমি খাতি বসো। আমি তুমারে ভাত তরকারি আনে দিচ্ছি। তুমার খাওয়া হয়ে গেলি হাত মুখ ধুয়ে আসে জায়গাটা তুমি জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েনে। আমি পরে গোবরছড়া দিয়ে শুদ্ধ করে দিবানে।" তারপর তারিণী মাস্টারকে বললেন, "আমাগের মা বিটায় কথা হচ্ছে, তুমি দাঁড়ায়ে আছো ক্যান্। যাও যাও চ্যান্ করে ন্যাও। ব্যালা কনে গেছে খিয়াল থাকে না। তুমাগের খাওয়া চুকলি তবে তো আমি মুখি দেবো।" তারিণী মাস্টার মশায় ইতস্তত করে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, "ঠিক আছে তো বাবা ফটিক? কোনও অসুবিধে হবে না তো?"

ফটিকের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। সে কথা বলতে পারল না। মাথা নেড়ে কোনোমতে জানাল, হ্যাঁ। তারিণী মাস্টারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেল। "ব্যস ব্যস" বলে হাল্কা মনে তিনি চান করতে গেলেন। শরিয়তি মোল্লারা যাই বলুন, তারিণী স্যারকে শফিকুল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। ঐ একজনকেই শুধু। বড় আনন্দ পায় সে। সে জানে এই গুনাহটুকুর জন্য আল্লা মিঞা তাকে মার্জনা করে দেবেন। কেন হরিপদ বাঁড়ুজ্জে? দারেপুর মিডিল ইশকুলের হেড মাস্টার? যিনি ছিলেন মনে প্রাণে স্বরাজিস্ট। দেশবন্ধু এবং দেশপ্রিয়র অনুগত ভক্ত। যাঁর অধীনে দু বছর কাজ করেছে। শিক্ষকতা কাকে বলে যাঁর কাছে শিখেছে শফিকুল। বেশীর ভাগ শিক্ষকরাই ফাঁকি দিত। কামাই করত। হরিপদ বাঁড়ুজ্জে সেই সব ক্লাস ওকে নিতে বলতেন। যে-সব বিষয় ওর ভাল অধিগত ছিল না, সেই সব ক্লাস নিতে ও প্রথম প্রথম ভয় পেত। হরিপদবাবু বলতেন, "ন্যাও, ক্লাস ন্যাও। নিতি নিতি ভয় ভাঙবে। তুমিউ তৈরী হয়ে উঠবা। নিজি ভাল ছাত্তর না হলি, ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না।" সে একবার দুঃসাহসের কাজও করে ফেলেছিল। রামানন্দ পণ্ডিতের অসুখ হলে তাঁর সংস্কৃত ও বাংলার ক্লাস সে-ই নিয়েছিল।

পণ্ডিতের জিভেয় ছিল খুরের ধার। ইশকুলে যোগ দিয়ে যখন শুনলেন ব্যাপারটা, তখন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ওকে অপমান করার জন্যই গঙ্গাজল চেয়ারে ছিটিয়ে তবে বসেছিলেন। ছাত্রদের গোবর দিয়ে জিভ সাফ করে আসতে বলেছিলেন। আসলে অধিকাংশ শিক্ষকই তখন তার উপর খেপে ছিলেন। তার কারণ হরিপদ স্যারের সুপারিশে ক'দিন আগেই তাকে সহকারী হেড মাস্টারের পদে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। রামানন্দ পণ্ডিতের ব্যবহারে প্রথম দিন থেকেই সে আহত হয়ে এসেছে। ও একা নয়, ভূগোল আর অঙ্কের টীচার ধনঞ্জয় মণ্ডলও। ফটিকের স্পষ্ট মনে আছে, হরিপদ স্যার যেদিন ওকে চাকরি দিলেন, টীচার্স রুমে ওকে এনে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "শফিকুল মোল্লা, আমাদের নতুন সহকর্মী—" হরিপদবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই রামানন্দ পণ্ডিত খেঁকিয়ে উঠলেন, "ব্যাপারটা কী, কন্ তো হরিপদ-বাবু? আপনার মতলবটা কী?"

হরিপদবাবু হাসলেন। শান্তভাবে বললেন, "উত্তেজনার কারণ আবার কী ঘটল?"

রামানন্দ পণ্ডিত বললেন, "এই তো গত বছর ঐ ধনা চাঁড়ালটারে ঢুকোলেন। আর ইবার কিনা জ্বলজ্যান্ত একটা কাটা মানে যবন ঘরে আনে তোললেন! ক্যান দেশে কি ভদ্দরলোকের দুর্ভিক্ষ লাগে গেছে যে এই ইস্কুলি তাগের মধ্যি থে মাস্টার পাওয়া যাচ্ছে না?"

হরিপদবাবু শান্তভাবে বললেন, "দেশে ভদ্দরলোক ঢের আছে পণ্ডিতমশাই, কিন্তু এই জিলায় আই-এতে ফার্স্ট ওই একটাই আছে, শফিকুল, পয়সা নেই বলে বেচারা পড়তি পারল না, তাই ওরে টানে আনলাম। আর বলেন তো, ধনঞ্জয়ের মত এত ভাল অঙ্কের টীচার এ মহকুমায় কটা আছে? ভালো ইশকুল গড়ে তুলতি হলি ভালো শিক্ষকও যে চাই।"

"তা না হয় হলো" পণ্ডিত মশাই বললেন, "কিন্তু আমাগের দিকটাউ তো অ্যাকবার দ্যাখবেন? চাকরি করতি আসে ব্রাহ্মণ সন্তান জাত ধম্ম তো আর জলাঞ্জলি দিতি পারি নে।"

পণ্ডিতমশাইকে তার আদৌ ভালো লাগত না। কিন্তু আশ্চর্য, হাটখোলার পথে চলতে চলতে ফটিক দেখল, এই অশিষ্ট বেয়াড়া চরিত্রের লোকটির কথা বেশ মনে আছে তার। লোকের মনে আঘাত দেবার একটা অনায়াস দক্ষতা তাঁর ছিল। অপমান করার কত নতুন নতুন রাস্তাই

না বের করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। টিফিনের সময় হলেই পণ্ডিত মশাই ধনঞ্জয় আর ফটিককে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলতেন, "বাপ ধনঞ্জয়, বাবা ফটিক, এবার অনুমতি কর বাবাগণ, গলায় একটু জল ঢালে তিষ্টাটা মিটোই।" তার মানে আমার জাত রক্ষে করার জন্যি তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। প্রথম দিন কথাটার মানে ধরতে পারেনি। তাই ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ উঠে বেরিয়ে গেলেও ফটিক তার চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি।

"বাবা ফটিক!" পণ্ডিত মশাই বললেন, "তা হলে অ্যাখন আসো বাবা, ঐ ধনার মত বাইরির থে এট্টু ঘুরে আসো, একটু গঙ্গোদক দিয়ে ঘরখানা শুদ্ধু করে নিই। জল তিষ্টা পায়েছে কিনা? ব্রাহ্মণ যে তৃষ্ণার্ত বাবা। পিত্তি রক্ষে করতি হবে। যাও।"

ফটিকের মনে খুবই ব্যথা বেজেছিল সেদিন। কিন্তু কিছু বলেনি। তবে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, "পণ্ডিত মশাই, আপনি পিত্তি রক্ষে করতে গেলে আমাদের দুজনকে বের করে দ্যান ক্যান?"

পণ্ডিত মশাই জবাব দিলেন, "ক্যান? বেরোয়ে যাতি বলি ক্যান? শুনবা। তুমি হচ্ছ যবন আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে, ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে? গায়ে বামুনের রক্ত আছে যে। ধম্মটা বজায় রাখতি হবে তো?"

এই পণ্ডিত মশাই-ই আবার, ফটিক যখন অস্থায়ী হেড মাস্টার হল, বিদায়ী হরিপদবাবুর সুপারিশে, একদিন জল খেলেন তাঁর সামনেই। ফটিক আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, "আজ কী হল পণ্ডিত মশাই? আমার সামনেই ঢকঢক করে পানি খেয়ে ফেললেন যে বড়।"

"কেন বাবা, অপরাধটা কী করলাম? ধনাটা চাঁড়াল, ওর কথা ছাড়ে দ্যাও", পণ্ডিত মশাই বললেন, "তুমার সামনে জল খাবো না ক্যান?"

"আপনার জাত যাবে না? ধর্ম? আমি তো মুসলমান।"

"মুসলমান!" পণ্ডিত মশাই চোখ কপালে তুলে বলে উঠলেন। "মুসলমান বলে তুমার সামনে জল খালি জাত যাবে! মুসলমান কথাটার মানে জানো? মুশল + ম্যান ইতি মুশলম্যান। ম্যান মানে মানুষ। অর্থাৎ কিনা যে-সকল মানুষের মুশল হইতে উৎপত্তি তারাই হল মুশলম্যান বা মুসলমান। বুঝিছ? এ হল গে স্বয়ং ব্যাসদেবের মহাভারতের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব মুশল প্রসব করিছিল। জান তো? সেই মুশলের থে জন্ম যাগের তারাই হল গে মুশলমান। তুমরা হলে গে আসলে ভগ্ন যাদব। অর্থাৎ কিনা যদু বংশের তিলক সব। তুমরা তো আমাগের পর নও বাবা। তুমার সামনে জল খালি জাত যাবে ক্যান?"

ফটিক মুসলমান শব্দের ব্যাখ্যা শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিল সেদিন।

পণ্ডিত মশাই বললেন, "তা বাবা আমার আর্জিটার কী হলো? মাইনেডা কাটা গেলি যে না খায়ে মরব বাবা। তুমার ব্রহ্ম হত্যার পাতক হবে। আমি তুমার পিতৃতুল্য।"

ফটিক বলল, "এবারও করে দিয়েছি। কিন্তু পণ্ডিত মশাই, এই শেষ। আর নিয়ম ভাঙবেন না। যজমান বাড়ি বিদায় নিতে যাবেন, ইশকুলের কানুনে সে কামাই মাফ করা যায় না। আপনি এটা বোঝেন না কেন? ওটা আপনার ছুটির থেকে কাটা গেল।"

হিন্দুগের ধর্মের উপর হাত দিচ্ছে ফটিক। এই ইশকুলি ফটিক থাকলি হিন্দুগের জাত ধর্ম রাখা যাবে না। পণ্ডিত মশাই এই কথা রটনা করে বিস্তর ঘোঁট পাকিয়েছিলেন। ইশকুল কমিটির মেমবার, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি সকলের কান ভারি করেছিলেন তিনি। তাকে যৎপরোনাস্তি জ্বালিয়েছেন। তবু আশ্চর্য ফটিক তাঁর কথা ভুলতে পারে না।

'মুসলমানরা আসলে ভগ্ন যাদব।' কথাটা মনে পড়তেই ফটিক মজা পেল। আরও সব কত মৌলিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন রামানন্দ পণ্ডিত মশাই।

বলেছিলেন, "আমাগের হিন্দুগের ধর্ম আর আমাগের হিন্দুগের শাস্তর, বুঝিছ বাবা, এ অ্যাত বড় আর অ্যাত গভীর যে কী বলব। সাত সমুদ্দুরির তল যদিবা পাওয়া যায়, তাহলিউ এর তল পাওয়া সম্ভব নয়। খেরেস্তান বলো মুসলমান বলো, সবাই তো এই হিন্দুগের ভাণ্ডারেই খাচ্ছে।"

ফটিক জিজ্ঞেস করেছিল, "কথাটা কি সত্যি?"

"আলবৎ সত্যি।" পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন, "এই যে খৃস্টি। আসলে উনি কিডা, তা কি বাবা জানো? উনিই হলেন কৃষ্ণ।"

"খৃস্টি হলেন কৃষ্ণ! বলেন কি পণ্ডিত মশাই?"

"প্রমাণ আছে বাবা, প্রমাণ আছে। প্রমাণ হচ্ছেন স্বয়ং যীশু। এই যে যীশু, কও দিন, এই কথাডা আলো ক্যামন করে? পারলা না তো। জানতাম। শোনো তালি। যশোমতীর ঈশু ইতি যীশু। কৃষ্ণই যে খৃস্টি, ইবার তার অকাট্য প্রমাণ পালে কিনা বাবা, বলো?"

ফটিক এই কারণেই রামানন্দ পণ্ডিতকে আজও মনে রেখেছে।

"শুধু যীশুই বা বলি ক্যানো? তুমরা মুসলমানরা, তুমরাও কি নিতি কিছু কম করিছ? এই যে তুমাগের হারুণল রসীদ, কও দিনি আসলে উনি কিডা? উনি আমাগের নল রাজা। পুণ্যশ্লোক নল রাজা। বুঝিছ?"

টীচার্স রুমে দারুণ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেদিন।

"হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ। যা বলছি শোনো। প্রমাণ আছে। এ আমার কথা নয়, ব্যাকরণ শাস্তরের কথা। তত্ত্ববোধ বিলাসিনীতি কয়েছে, হারুণল রসীদ ইতি। দময়ন্তী বিচ্ছেদজনিত বিষাদেন হা ইতি রোতি শব্দং করোরীতি হারুঃ। হারুশ্চাসৌ নলেশ্চেতি হারুণলঃ, হারুণলস্য রসো গুণোস্যাস্তীতি হারুণল রসী, ইদঃ শ্রীদঃ, ইতি হারুণল রসীদঃ। অ্যাঁ! ইবার পায়েছো তো প্রমাণ।"

যে ধনঞ্জয় মন্ডল পন্ডিতকে দুচক্ষে দেখতে পারত না, সে অব্দি সেদিন থ মেরে গিয়েছিল।

"কি গো, বাবা!" পন্ডিত ফটিককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "খুব তো ফাস্টো হয়ে আই এ পশ দিয়ে আইছ। বগদাদ কী জানো? তুমরা তো আবার বল বগদাদ তুমাগের।"

ফটিক বলল, "জানবো না কেন পন্ডিত মশাই, বোগদাদ আরব দেশের একটা শহর।"

"আরব দেশের একটা শহর! হুঃ! বলি কথাটা আলো কন্‌ থে। উডা আসলে ছিল ভীমির রাজধানী। ভীম ওখেনে গদা ঘুরোতো। শরীরটারে বলিষ্ঠ করার জন্যি। প্রমাণ চাও? শুনে রাখ। বগদাদ ইতি। বসা=বলবজ্জনস্য গদা, ইতি বগদা, বগদা দদাতীতি বগদাদঃ।"

এবার ধনঞ্জয় করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, "পন্ডিত মশাই, এই ভাষ্যটাও কি আঁপনার তত্ত্ববোধ বিলাসিনীর?"

পন্ডিত মশাই বলেছিলেন, "হ্যাঁ বাবা। এই আরব দেশটাও একদিন আমাগের ছিল। আর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে ছিল, আরব কথাটাই তার প্রমাণ। আরব অর্থাৎ আ-রব। রব অর্থাৎ কিনা আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পোঁছোয়েছিল সেই ভূখণ্ডই আরব। অর্থাৎ কিনা আর্য জাতির অশ্বমেধের বিজয়োল্লাসের আওয়াজ বা রব ঐ পর্যন্ত শোনা য্যাতো, তাই ঐ দেশটার নাম হয়েছে আরব। বুঝিছ?"

এই পন্ডিত মশাই অদ্ভুত লোক। ফাঁকিবাজ, দুর্মুখ, কোনও শৃঙ্খলা মানতে চান না, স্বার্থপর, অভদ্র এবং ঘোঁট পাকাতে ওস্তাদ। তাকে আড়ালে যবন ম্লেচ্ছ, কত কী না বলেছেন, আবার সুবিধা নেবার জন্য মুখের সামনে অজস্র তোষামোদ করেছেন, অবশ্য যতদিন সে হেড মাস্টারের পদে ছিল ততদিনই। তাকে ইশকুল থেকে সরাবার ব্যাপারে যে কয়জন প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, উনিও ছিলেন তার একজন। সেই হিসেবে পন্ডিত মশাই-এর উপর তো ফটিকের রাগই হবার কথা। যেমন অন্যদের অপরাধও সে ভুলতে পারেনি। এমন কি ধনঞ্জয়ের ভূমিকাও তার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। তাকে যারা দিন রাত চাঁড়াল, ছোট জাত, অস্পৃশ্য বলে দূরে রাখত, ঘৃণা করত, সেও সহকারী হেড মাস্টারের পদটা পাবার জন্য শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু সংহতি' বজায় রাখনেওয়ালাদের সংগে দিব্যি ভিড়ে পড়ল। ব্যাপারটা বেশ অবাক লাগে ফটিকের। কারণ ফটিক আর ওর মধ্যে, জাত মাননেওয়ালাদের কাছ থেকে নিরন্তর ঠোক্কর খেত বলে, এক ধরনের একটা সখ্যভাব গড়ে উঠেছিল। ঐ ইশকুলে ধনঞ্জয়ই ছিল আর একজন জাত শিক্ষক। কেন যে লোকে কী করে, বোঝা শক্ত।

কেন সে পন্ডিত মশাই-এর উপর রাগ করতে পারে না? সে কি তাঁর অদ্ভুত সব ব্যাখ্যার জন্য? না কি তাঁর অপরিসীম দারিদ্র্যের জন্য? পন্ডিত মশাই-এর দুই সংসার। দুই ব্রাহ্মণীর গর্ভই অতি উর্বরা। তবে কন্যার ফলনই বেশি। এটাও পন্ডিত মশাই-এর ভাষ্য। ইশকুলের বেতন অতি অল্প। আট জনের সংসার কিছুতেই চলে না। তাই যজমানি করতে হয়, আরও নানা রকম উঞ্ছবৃত্তি। ফটিক তাঁর সংসারের খবর জানে। নিজে সে অনাহারের জ্বালাও জানে। নেমন্তন্ন না থাকলে ব্রাহ্মণও যে অর্ধাহারে, অনেক সময় অনাহারে থাকেন, সে খবরও ফটিক রাখত। হয়ত সেই সব দিনেই তিনি দুটি সহজ শিকারের আঁতে অত্যধিক হিংস্রভাবে ঘা দিতে তৎপর হয়ে উঠতেন। তীক্ষ্ম জিহ্বার শরাসন একেবারে খালি করে দিতেন। অসহায় ব্রাহ্মণ, ধনঞ্জয় বলত, ঢোঁড়া সাপ, গায়ের ঝাল ঝেড়ে অস্তিত্বকে হয়ত সহনীয় করতেন। একথা বুঝত বলেই কি ফটিকের মনের গভীরে পন্ডিত মশাই-এর জন্য এক ধরনের সহানুভূতি জমা হয়ে থাকত? কে জানে?

আজ তার আব্বাজানের অসহায় মুখটার পাশে বারবার কেন পন্ডিত মশাই-এর মুখটা ভেসে উঠছে? এর কারণও ফটিক বুঝতে পারছে না। দুজনেই অসহায়, সেই কারণেই কি? অসহায় সেও কি কম? রোজগারের ব্যাপারে এখনই তার কিছু করা দরকার। বিবি নিয়ে বাড়ি ফেরা দরকার। অন্তত কিছু দিনের জন্য। সে কি ওকালতি করবে?

যতীন ডাক্তারের কম্পাউন্ডার সতীশ চাচা নিকেলের চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে প্রেসক্রিপশন পড়ছিলেন। "আদাব আরজ চাচা" শুনে চোখ থেকে চশমা খুলে একগাল হেসে বললেন, "আরে ফটিক যে। ভালো আছ তো বাপ। কবে আলে?"

ফটিক বলল, "কাল। বাড়ির খবর সব ভালো তো চাচা? ডাক্তারবাবু কই?"

সতীশ কম্পাউনডার বললেন, "তিনি তো হাজী বাড়িই গ্যালেন। নেয়ামত আসে জরুরি তলবে নিয়ে গ্যালো। দাউদরি মাছে কামড় দেছে না কিসি ব্যানো কামড়াইছে।"

সে কী করবে? ফটিক শ্বশুরবাড়িতে তার ঘরে ঢুকে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল। নফর ওর হাত মুখ ধোবার জন্য এক বালতি পানি, বদনা, পরিষ্কার গামছা বারান্দায় সাজিয়ে রাখল। দাউদের খবর দিল। এবং ছবি বু যে দাউদের বাড়িতে একটু আগেই গিয়েছে এবং এখনই ফিরে

আসবে, কিঞ্চিৎ কৈফিয়তের সুরে সে খবরও। অবিশ্যি দুলা মিঞা যদি চান তবে সে এখনই গিয়ে ছবি বুরি ডাকে আনতি পারে, এমন ইচ্ছেও প্রকাশ করল। ফটিক তখন ভাবনায় নিদারুণ আক্রান্ত এবং গরমে পীড়িত। সে নফরকে বারণ করল ছবিকে ডাকতে। জামা গেঞ্জি খুলে ফেলল। হাত মুখ ধুয়ে নিল এবং নফর তাকে পাখার বাতাস খাওয়াতে উদ্যত হলে ফটিক নফরকে বারণ করল এবং তামাক খেতে বা হাত পা টিপোতে দিতেও রাজী হল না। এই ধরনের লোককে নিয়ে কি করা যায়, নফর বুঝে উঠতে পারল না। এদিকি তো বড় মিঞা আর বউ বিবি ইনার খেদমত করতি কয়ে দেলেন। কিন্তু এ মিঞা চায় কী, তাই তো বুঝতে পারছে না। এমন সময় ফটিক পানি খেতে চাইল। নফরালি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে একটা ঢকচকে গেলাসে টিউকলের ঠান্ডা পানি এনে দিল।

ফটিক পানি খেয়ে গম্ভীর মুখে গেলাসটা নফরের হাতে ফেরত দিয়ে তাকে বলে দিল, "যাও, তোমার কাজ কর গে যাও। শুধু শুধু এখানে থাকার দরকার নেই।"

হায় বাপ! ভাবল, এ মিঞা যে দেহি বড় মিঞার চাইতিউ বাঘরেগে লোক। এর সামনে দাঁড়াতিউ যে দেহি বুক কাঁপে। এদিকে দাউদের বাড়ি যাবার জন্য ছটফট করছে নফর। সাকিনা তার ভাই বুনিগের নিয়ে কখন আসে যে মাছটারে দেখে যায় ঠিক কী?

যাবার সময় কত্তাবিবির ঘরে ঢুকে ফিসফিস করে নফর জানাল, "কত্তাবিবি, ব্যাপারডা বিশেষ সুবিধে ঠেকতিছে না। দুলা মিঞা তো মুখখানারে হাঁড়ির মতো করে রাখিছেন।"

কত্তাবিবির সদা ঘুরন্ত তসবিহ্ থেমে গেল। একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ব'লে উঠলেন, "ক্যান? ক্যান?"

"কী করে কব? আমি তো আর উনার পেটের মধ্যি ঢুকতি পারিনি।" বিরক্ত হয়ে নফর বলল, "তবে মনে হ'লো ঘরে আ'সে বিবিরি দেখতি না পায়ে বোধ হয় মিজাজটা একেবারে খাট্টা হয়ে গেছে। গোস্সাও হইছে বলে মনে হ'লো।"

কত্তাবিবি হাঁফ ছাড়লেন। বললেন, "নতুন নতুন অমন হয়েই থাকে। মিঞার রাগ ঢের দেখিছি।"

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি সমস্যা ফটিককে বেজায় অস্থির করে তুলছিল। আশু সমাধানের পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই সে খুব পীড়িত বোধ করছে। সে চঞ্চল হয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং সমস্যাগুলোর শ্রেণী বিন্যাস করতে শুরু করল।

সমস্যা ১। তাকে বাড়ি যেতে হবে। কিন্তু বিবিকে নিয়ে কী করবে? তাকেও বাড়ি নিয়ে যাবে?

সমস্যা ২। বিবিকে তার বাড়িতে নিয়ে তোলাই উচিত। কিন্তু বাড়ির যে শোচনীয় অবস্থা দেখে এল সে, সেখানে কোথায় নিয়ে তার বিবিকে তুলবে এখন? একে তো তার ঘরে কুন্টা একেবারে ঠাসা, তার উপর সেটার যা অবস্থা, মেরামত না করলে সেখানে বাস করা যাবে কি না সন্দেহ।

সমস্যা ৩। ঘর মেরামত করতে টাকা লাগবে। এখন কোথায় টাকা? অথচ ঘর মেরা—

যোনাব শফিকুল মোল্লা, পুজনীয় পতী ও উকিল সাহেব।

বালিসের সঙ্গে চুলের কাঁটা দিয়ে আঁটা একখানা খামের উপর গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে ওর নাম এবং অদ্ভুত সম্বোধন দেখে ফটিকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। কার কাজ বুঝতে অসুবিধে হল না। ওর কৌতূহল এবং কৌতুক উভয়ই জাগ্রত হল। খামটা হাতে নিয়ে দেখল। পরিষ্কার লেখা। খামখানা আঠা দিয়ে আটকানো ছিল না। খুলে ফেলল। ভিতরের চিঠিখানা বের করে পড়ে ফেলল। 'এলাহি ভরষা।' ভরষা! বানানে দেখি মা সরস্বতী! সম্বোধন দেখ? 'পতী ধন!' আবার 'জিবনের জিবন! জানি না এই সম্বোধন আপনার মনপুতঃ হইবে কিনা। তাহার সাথে ইহাও আশা করি যে আমার এই প্রেমপত্র পড়িয়া আপনি নারাজ হইবেন না।'

না আমি নারাজ হইলাম না। বিলকিসের প্রেমপত্রখানা পড়ে ফটিক তাকে আশ্বাস দিল। মেয়েটার জন্য তার মনে মমতার সঞ্চার হল। যাকে সে জানে না, ভালো করে চেনে না পর্যন্ত, সে শুধু স্বামী, মাত্র এই ভরসায় তার কাছে কেমন সরলভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। এই চিঠিখানা ফটিকের কাছে বিলকিসের মূল্য নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দিল। এবং সেই সঙ্গে তার দায়িত্ববোধও। এই সরল মেয়েটা তার হাতে পড়ে একটুও কষ্ট পাক, এটা তার মনঃপুত নয়। সে আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হল এবং সেই সঙ্গে চিঠিখানার উপরেও অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল।

সমস্যা ৪। ঘর মেরামত না করতে পারলে এ মেয়েকে তার বাড়িতে নিয়ে তোলা ঠিক হবে না। বেচারিকে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে কী হবে? ফটিক নিজেদের বাড়িতে থাকবে আর তার বিবি থাকবে তার বাপের বাড়িতে?

'আমার মৌলবি সাহেব আমাকে খাছ স্ত্রিলোকদিগের জন্য যে-সকল নছিহত শিখাইয়াছেন তাহাতে জানিয়াছি পতী অমূল্য ধন। সর্বদা তাহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে হইবে। কেননা যাহার আপন স্বামীর সহিত ভালবাসা আছে তাহার ন্যায় সুখি এ জগতে কেহই নাই।'

সমস্যা ৫। এতদিন পরে বাড়ি এল ফটিক। শাদীর পরে এই প্রথম। সে থাকবে নিজের বাড়িতে আর তার বিবিকে ফেলে রাখবে শ্বশুরবাড়িতে, এ আবার কেমন কথা? তার বাপ-মাই

বা কী মনে করবে? কিংবা তার বিবি? আবার এত কাছে নিজের বাড়ি থাকতে শ্বশুর বাড়িতেও পড়ে থাকা যায় না। বিশেষ করে সেই শ্বশুরের বাড়িতে যাঁর বেশ পয়সা আছে। না, এ হয় না।

'আবার দেখুন যাহার আপন স্বামীর সহিত ভালবাসা নাই তাহার ন্যায় দুঃখি এ জগতে কেহ নাই। যেমন আমি। আল্লাহ্ তায়ালা আমার পতী ধনকে জিবনের জিবনকে শের-তাজকে' (ফটিক এবার হেসে ফেলল। বেশ কথা জানে তো? শের-তাজ! অ্যাঁ!) 'আমার কাছে ধরিয়া আনিয়া দিলেন কিন্তু হায় আমি অভাগীনী নারী তাহাকে সন্তোষ করিতে পারিলাম না। ইহাতে আমার দেল ফাটিয়া যাইতেছে।'

সমস্যা ৬। এবং এইটেই মোক্ষম। কী করবে সে? ওকালতি? অবশ্যই। এতে এত সংশয় আসছে কেন তার? সে ওকালতি পাশ করবে। স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস্ করবে। গোলামী আর করবে না কোথাও, নিজের হিম্মতে বিকাশ ঘটাবে তার সুপ্ত প্রতিভার। এই না তার প্রতিজ্ঞা ছিল? এই জন্যেই না সে কলকাতায় গিয়েছিল? এবং এই জন্যেই না সে ওকালতি পাশ দিয়ে ফিরে এসেছে? তবে? তবে সে এত কেন ভাবছে? ভাবছে, তার কারণ, অনেক জিনিস আগে সে বুঝত না, এখন বুঝছে। ওকালতি পাশ দেওয়া আর উকিল হয়ে পসার জমানো যে এক কথা নয়, ফটিক তা আগে বুঝতে পারেনি। গরিবের ছেলে, বিত্তহীন গ্রামের ছেলের পক্ষে শহরে গিয়ে বসাই তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রতি কথায় টাকা। শহরে ঘর ভাড়া নিতে হবে? টাকা। কোট প্যান্টলুন কলার কিনতে হবে? টাকা। রোজ বেঁচে থাকার জন্য বাজার করতে হবে? টাকা। কোথায় তার টাকা?

বিলকিস্ ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে। বাড়ি ঢোকার মুখে নফর তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল, সাবধান। দুলা মিঞা বাড়িতি ঢুকে তুমারে না দেখতি পায়ে খুউব গুস্সা করিছে। রাগে টং হয়ে আছে। ঘরের মধ্যি খালি খাঁচায় পুরা বাঘের মত ঘুরপাক খায়ে ব্যাড়াচ্ছে। ভয়ে বিলকিসের প্রাণ উড়ে গেল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখল, লোকটা ঘুরছে না, খাটের বাজুতে বসে তার চিঠিখানাই পড়ছে। মুখখানা বড় গম্ভীর। সর্বনাশ করিছে তাহলি ঐ চিঠি! হায় আল্লা! ক্যান যে লিখতি গিছিলাম। বিলকিস্ ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

'আপনি আমার পতী, সত্য বলিতেছি আপনাকে পতীরূপে পাইয়া নিজিকে ভাগ্যবতি জ্ঞান করিতেছি, আপনি আমার ন্যায় মুর্খ এবং অভাগীনী নারীর প্রতি নারায হইবেন না।'

চিঠি থেকে মুখ তুলতেই ফটিক দেখল দরজার গোড়ায় বিলকিস। ভীত ত্রস্ত। থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে।

এই রকম সচ্ছল বাড়ির একটা মেয়েকে অগ্রপশ্চাৎ ভালো করে না ভেবে শাদী করা তার মত দরিদ্র লোকের পক্ষে কি বিবেচনার কাজ হয়েছে?

লোকটা অ্যাকবার দে'খলো আমারে। আবার চিঠিখান পড়তি লাগিছে। আমারে মারবে না আ'জ শুধু ব'কে ছা'ড়ে দেবে? ইয়া আল্লাহ্ আমারে বাঁচাও।

'আপনি আমাকে যে ইশারায় চলিতে বলিবেন আমি সেই ইশারায় চলিব। কদাচ অবাধ্য হইব না।'

সত্যিই কি এই মেয়েটা পারবে আমার সঙ্গে অপরিসীম দারিদ্র্য সহ্য করতে? একেবারে কাঁচ মেয়ে! এক মেয়ে এই বাড়ির। আদুরি নিশ্চয়। কিন্তু চেহারা দেখে সে রকমটা মনে হচ্ছে না।

আমারে দেখতিছে। অ্যাত করে কী দেখতিছে আমারে? কনে মারবে তাই? আল্লাহ্ যেন আমার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সদায়ু হন।

'আমার ক্ষুদ্র জিবনের বিনিময়ে আল্লাহ্ আপনার জিবন পরিপূর্ণ করিয়া তোলেন।' মেয়ে ছোট হলে কি হয় জ্ঞান বুদ্ধি আছে। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে তার শ্বশুর তাকে যে-সব চিঠি লিখতেন তা তাঁর মেয়েই সব লিখে দিত। নিশ্চয় তার চিঠিও এই মেয়েই তার বাজানকে পড়ে শুনিয়েছে।

লোকটা ভাবতিছে আর আমারে দেখতিছে। উঠে আ'সে আমারে পেটবে না হাতের কাছে ডা'কে নেবে, তাই বোধ হয় অ্যাখনও ঠিক করতি পাত্তিছে না। মারে তো মারুক, আমি টু শব্দও করব না। মরে গেলিউ না। নসিবি যদি খসমের হাতে মা'র লিখে থাকে তবে তা কিডা খণ্ডাবে? তবে আমি তাতে একটুও নাখোশ হবো না। আমার খসম যাতে আমার উপর নারাজ না হয় আমি তাই করব।

বাড়িটা আশ্চর্য নিস্তব্ধ। কেউ আছে বলেই মনে হচ্ছে না। নফর ফটিককে বলেছিল, সবাই দাউদকে দেখতে গিয়েছে। ঘরে শুধু ও আর বিলকিস্। বড্ড গরম। ফটিক পাখাটা হাতে তুলে নিল। বিলকিসের বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। বুঝল সময় হয়েছে। মনে মনে বলে উঠল, আল্লাহ!

"শোনো!" ফটিকের স্বরটা বিলকিসের কানে বেশ গম্ভীর শোনাল। ফটিকের গরমের মাত্রা হঠাৎ যেন বেড়েই চলেছে। "দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এদিকে এসো।"

বিলকিস্ দরজার খিলটা আটকে দিয়ে প্রাণপণে সেটা ধরে শরীরের কাঁপুনি বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। চোখের পানিকেও চেপে রাখতে চাইছিল। সে কাঁদবে না, কিছুতেই কাঁদবে না।

"তোমার মৌলবী সাহেব তোমাকে এত নছিহত শিখিয়েছেন আর এটা শেখাননি," ওর

পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে ফটিক চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বলল, "যে খসম ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে হাজির হতে হয়।"

বিলকিসের ছোট্ট পাখির মত দেহটা ফটিক সবলে বুকে তুলে নিল আর সে ফটিকের বুকের মধ্যে যেন মিলিয়েই গেল। ও না না না বলে আপত্তি জানাতে গেল কিন্তু তার বদলে প্রবল আবেগে ফটিকের গলা দুহাতে চেপে ধরে তার বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কেবল কাঁদতেই থাকল।

॥ ২৫ ॥

হঠাৎ ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। একটা বুড়োসুপারিগাছের মাথা কে যেন মড়াত করে মুচড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মোছফেকা আর নয়মোন বাড়িতে ঢোকা মাত্র ঝড়ের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন. রান্নাঘরের খুঁটি ধরে সামলে নিলেন। কী প্রচণ্ড গোঁ গোঁ শব্দ। কিছু শোনা যায় না।

নয়মোন বললেন, "শিগ্‌গির কত্তাবিবির ঘরে যা।"

মড়মড় করে কোথায় যেন ডাল ভেঙে পড়ল। তার শব্দে নয়মোন বিবির কথা চাপা পড়ে গেল। গোঁ গোঁ শোঁ শোঁ। পাগলা ঝড়টা যেন হাজীবাড়ির অন্দরের উঠোনে আচমকা ঢুকে পড়েছিল, এখন বেরিয়ে যাবার পথ পাচ্ছে না। গোঁ গোঁ শব্দে কেবলই এদিকে ওদিকে গুঁতো মারছে।

"কী?" মোছফেকা চিৎকার করে বলল, "কী ক'লে বউবিবি?"

পাগলা মোষটা যেন বেরিয়ে যাবার জন্য বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। মড়াত। ডাল ভাঙল। দড়াম করে কত্তাবিবির ঘরের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। দড়াম করে হাজী সাহেবের ঘরের খোলা জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

নয়মোন খুঁটি ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না, হাওয়ার জোর এমনই।

বেশ চেঁচিয়েই বললেন, "কত্তাবিবির দরজা বন্ধ করে আয়।"

মোছফেকা খুঁটি ছেড়ে এগুতে যাবে, প্রচণ্ড দমকায় আঁচল খুলে গিয়ে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। কাপড় সামলাতে যেই খুঁটিটা ছেড়েছে অমনি মোছফেকা ঝড়ের ধাক্কায় উঠোনে গিয়ে পড়ল। তার ভয়ার্ত চিৎকার বাতাসে ফালা ফালা হয়ে গেল। নয়মোন গাছকোমর এঁটে উঠোনে নেমে মোছফেকাকে ধরে তুললেন। তারপর দুজনে কোনোক্রমে কত্তাবিবির ঘরে গিয়ে উঠলেন।

নয়মোন বললেন, "তুই এই ঘরডা দ্যাখ, আমি আমাগের ঘরডা বন্ধ করিগে।" কত্তাবিবি উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "ছবি? ছবি আইছে তো? ও বউবিবি! ও মোছফেকা।"

মোছফেকা বলল, "আইছেন। অনেকক্ষণ আইছেন। মিঞা-বিবি ঘরেই আছেন। ভয় নেই।"

নয়মোন হাসলেন। তারপর নিজেদের ঘরে ছুটলেন। এ ঘর থেকে ও ঘর। কিন্তু এইটুকু যেতেই নয়মোন বিবি নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন। এক দমকায় ওদের ঢেঁকিশালের চালা উড়ে গেল। জামরুল গাছের একটা ভাঙা ডাল ওর কানের পাশ দিয়ে উড়ে এসে উঠোনে ধড়াস করে পড়ল। নয়মোনও বাতাসের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে বারান্দায় পড়লেন। ওঁর হাঁটুতে চোট লাগল। চোখে কালো কালো ফুটকি ভাসতে লাগল। হাত দিয়ে পতনের ভার খানিকটা ঠ্যাকালেন। তারপর ঘরে ঢুকে গেলেন। প্রথমে তীব্র তীক্ষ্ম বিদ্যুতের ছোবল। তারপর কড়কড় করে বাজের আওয়াজ। কত্তাবিবি বাজ পড়ার দোয়া পড়তে লাগলেন. বিদ্যুৎ আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসায় তসবীহ্‌ পড়ে এবং ফেরেশতারা সব আল্লাহর ভয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন করে।

হাজী সাহেবের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না, তবু তিনি দহলিজ থেকে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন।

"নফরা, এই নফরা! গোরুগুলোন ঠিক আছে কিনা দ্যাখ। নফরা, এই নফরা! সাড়া দিসনে ক্যান? বলি অন্দরে সব ঠিকঠাক আছে তো?"

সারা বাড়িতে যখন এত হুলুস্থূলু, তখন বিলকিসের ঘরটাই সব থেকে নিঃসাড়। কী হয়েছে, কী ঘটেছে, কোনও বোধ নেই তার। যেন চেতনাও তেমন নেই। সে নিদ্রিত না মূর্ছিত না সম্মোহিত বোঝার উপায় নেই। বিপর্যস্ত দেহটা শিথিল, এলিয়ে পড়ে আছে বিছানায়। উপুড় হয়ে। চুল এলোমেলো। একটা দুরন্ত ঘূর্ণী ঝড় যেন তার দেহ তার মন তার শাড়ি জামার উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। তার শরীরের সব জোড় খুলে দিয়ে গিয়েছে। সে আর কখনোই উঠে আসতে পারবে না, উঠে দাঁড়াতে পারবে না রমণীয় অবসাদের এই অতলস্পর্শ কুণ্ড থেকে। সে এখনও ভেসে চলেছে প্রচণ্ড প্লাবনে ভেসে যাওয়া অসহায় একখানা ঘরের মত। প্লাবন না ঘূর্ণি ঝড়? কিসের মুখে পড়েছিল বিলকিস?

ফটিক চিত হয়ে শুয়ে চালের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝড় উঠেছে বাইরে। তার ক্রুদ্ধ আওয়াজ টিনের চালে আছড়ে পড়েছে। শব্দটা কানে যাচ্ছে। কিন্তু তার শরীরে তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি একটা অচেনা সুখস্বাদ তাকে তার পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেন শোক তাপ জরা দিয়ে ঘেরা ভূমণ্ডলের বাইরে কামনা বাসনাহীন নিরুদ্বেগ কোন লোকে

ঠাঁই করে দিয়েছে। তার আর ফেরার ইচ্ছে নেই। ঝড়ের ঝাপটায় ঘরটা দুলছে। ঘর নয়, তার অতীত। ফটিকের বোধও কেমন যেন তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। ঝড়ের শব্দ ক্রমশ তাকে অবসন্ন করে আনছে। তার শরীর ঝিমিয়ে আসছে। নেশাগ্রস্তের মত কেমন বুঁদ হয়ে আছে সে।

সে যেন ঢেউ-এর দোলায় দোল খাচ্ছে। বিলকিস যেন ঘুমের দোলায় শুয়ে একবার উপরে উঠছে, একবার অতলে নামছে। অতি ধীরে বেশ ঢিমে তালে শ্বাস বইছে তার। কী যেন একটা ঘটেছে তার। বার বার সে উঠতে চেষ্টা করছে। পারছে না। কোথায় যেন বেশ ঝড় হচ্ছে। খুব দূরে। তার আওয়াজ পাচ্ছে বিলকিস। এখন রাত না দিন? চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। সে এইভাবে থাকতে চাইছে। জাগবে না। উঠবে না।

কী একটা কাজ করতে হবে ফটিকের। কী একটা জরুরি কাজ তার বাকি ছিল? কাজটা কী? কিছুতেই মনে করতে পারছে না। তার চিন্তা যেন শরতের মেঘের মত ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কোনও কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় করে জমাট হয়ে উঠতে পারছে না। সে যদিও জাগ্রত তবু যেন মনে হয় তার ইন্দ্রিয়সকল আপাতত বিশ্রামে রত। বুকের উপর থেকে তার শিথিল হাত দুখানা দুপাশে গড়িয়ে পড়ল। একটা হাত রেশমের স্তূপে! বিদ্যুৎ খেলে গেল ফটিকের শরীরে। মুহূর্তে তার ঝিমুনির ভাব কেটে গেল। সে ঈষৎ পাশ ফিরে দেখল আলুথালু বিলকিস। একেবারে তার হাতের নাগালে। এবার ফটিকের মনে পড়ল, শুধু বাইরেই নয়, কিছুক্ষণ আগে এই ঘরের ভিতরেও প্রবলতর একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। সমূল উপড়ে পড়া দুটি অস্তিত্ব এই যে ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে এই খাটে। বিলকিস! তার বিবি। না স্বপ্নে দেখা নয় একেবারে রক্তে মাংসে গড়া। কী মোলায়েম! দেখলে মনে হয় কত ঠুনকো। হাত দিলেই বুঝি জখম হবে। হয়ত বা ভেঙেও যেতে পারে। ফটিক দেখতে লাগল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার বিবি। একরাশ চুল তার পিঠে মুখে বালিশে ছড়ানো। বেশবাস অসম্বৃত। আঁচলটা বুক থেকে সরে গিয়েছে। শাড়িটা হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। চুলের ফাঁকে সুন্দর দুটো ঠোঁট পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। যেন যুঁই ফুলের পাপড়ি। আর সে কিনা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি! ক্ষুধার্ত দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মায়া মমতা কিছুই জাগেনি তার মনে। শুধু এক হিংস্র পিপাসা। তাই শুধু লুণ্ঠনই করে গিয়েছে নির্বিচারে। তার তিরিশ বছরের সংযমের বাঁধ এইটুকু একটা মেয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল!

এও তো বড় আশ্চর্য! সে বিস্মিতভাবে আল্লাহর এই আজব সৃষ্টিকে দেখতে লাগল।

ফটিকের মনে মমতা বিস্ময় এবং সম্ভ্রম এই তিনই জেগে উঠল। সে খুব আলতোভাবে তার হাতখানা বিলকিসের পিঠে রাখল। বিলকিস শিউরে উঠল। ওর ঠোঁটে আলতো চুমু এঁকে দেবার একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠল।

ফটিকের হাতখানা গায়ে ঠেকতেই বিলকিসের শরীরটা মুহূর্তে শক্ত হয়ে উঠে আবার এলিয়ে পড়ল। আবার তার শরীরের রক্তে তোলপাড় শুরু হল। না, সে এবার সাবধান হবে। বিলকিসের ঘুম ঘুম ভাব একেবারে ছুটে গেল। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে যাবে তা আদৌ বুঝতে পারেনি সে। তাই সে সতর্ক হবার সময় পায়নি। তার চাইতেও লজ্জার কথা, এখন তার মনে হচ্ছে, তার গোলাপফুলের কথামত যেখানে যেখানে তার আপত্তি করা উচিত, না না বলা উচিত, সেসব জায়গায় সে কিছুই করেনি। প্রবল জোয়ারে সে অসহায় তৃণের মত ভেসে গিয়েছে। খুবই বেশরম বেহায়ার কাজ হয়েছে। এমন কি মোজামেয়াতের তরতীবও পালন করা হয়নি। বিলকিস মরমে মরে গেল। এবং বদদোয়ার ভয় পেল। সে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। কিন্তু লোকটার ছনবনে হাতে কী জাদু আছে? কেন আমাকে এত অস্থির করে ছাড়ছে? বিলকিস দাঁতে দাঁত চিপে পড়ে রইল। কিন্তু ওর বুকের স্পন্দন ক্রমশ দ্রুত হয়ে উঠল যে ওর সমগ্র শরীরটা তার তালে তালে ওঠা নামা করতে লাগল। লোকটার হাত এখন আর কোনো কিছুই বাধা মানছে না। যেখানে সেখানে হানা মারছে। ওর উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে। আমারে ছ্যা'ড়ে দ্যান, ছ্যা'ড়ে দ্যান। দোহাই আপনার। কিন্তু তার মনের প্রার্থনা কিছুতেই সে মুখে ফোটাতে পারল না।

ঝড় কমে ততক্ষণে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। টিনের চালে প্রথমে ঠপ ঠপ তারপর ক্রমাগত চড়বড় শব্দ হতে থাকায় বিলকিস বুঝল শিল পড়ছে। তবে ঠিক যে কোথায়, টিনের চালে না তার বুকের ভিতরে, সে ঠাহর করতে পারল না।

হঠাৎ বিলকিসের মনে হল এখন সন্ধ্যে রাত্তির আর ওরা কিনা দরজা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। মোছফেকার মুখখানা, তার বাঁকা হাসি বিলকিসের চোখে ভেসে উঠল। তার বেজায় লজ্জা এসে গেল। শুধু কি তাই?

"তখন মিঞা বিবি অজু করিয়া কোনও পুশিদা স্থানে থাকিয়া একখানা চাদর দ্বারা ঢাকনি লইয়া মোজামেয়াতের দোয়া পাঠ করতঃ হাস্য বদনে কার্য সমাধা করিবে। কারণ শরীর না ঢাকিলে উক্ত সময় ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বেশরম বলিয়া বদদোয়া করেন।" মুখস্থ করে রেখেছে বিলকিস। কিন্তু কোনোই কাজে এল না। এখন তার ফেরেশতার ভয় ঢুকল। সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ফটিক হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে নিল।

এবার বিলকিস কাঁদো কাঁদো হয়ে মিনতি করল, "আর না, আর না। দোহাই আপনার, অ্যাখন সন্ধ্যে, অ্যাখন সন্ধ্যে, অ্যাখন আমারে ছাড়ে দ্যান।"

ফটিকের সঙ্গে বিলকিসের এই প্রথম কথা। তার আর্ত কণ্ঠ ফটিকের গালে যেন জোর করে একটা চড় মারল। লজ্জা পেয়ে ফটিক আলগা দিতেই বিলকিস দ্রুতগতিতে তার নাগালের বাইরে চলে গেল। তারপর দরজার খিল সন্তর্পণে খুলে বাইরে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে।

ছবি ভিজতে ভিজতে হাঁফাতে হাঁফাতে একেবারে দাদীর ঘরে চলে গেল। তারপর দাদীর কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল। কত্তাবিবি তস্‌বিহ্‌ সরিয়ে রেখে ছবির মাথায় হাত দিয়েই একটা দোয়া পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন, "ও মণি, মিঞারে চা'খে দ্যাখা ব্যান্‌ হয়ে গেছে মনে লাগতিছে।"

ছবি মুখখানা দাদীর কোলে আরও জোরে গুঁজে দিল।

দাদী আদর করে ছবির সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দোয়া পড়তে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমারই গুণগান করিতেছি। তোমার নাম মঙ্গলপ্রদ তোমারই গৌরব সবচেয়ে মহান। তুমি ছাড়া উপাস্য নাই।

দাদী এবার ছবির কাছে মুখ নামিয়ে এনে বললেন, "মণি রে, অ্যাকটা কথা কই। খসম মিঞাগের খিয়ালের আর শেষ পাওয়া যায় না। এক মাত্তর যদি মনে মনে মিল হয়ে যায় তখনই তেজী ঘুড়া বশে আসে। বুঝলে? হ্যাঁ, ইবার অ্যাকটা কাম করো। ভিজেই যখন গেছো তখন যাও আর ভিজে কাপড়ে বুড়ীর ঘরে বসে বসে সুমায় নষ্ট করো না। চুলডারে আবার বাঁধো। ছাফ ছুতরো হয়ে ন্যাও। তারপর যাও মিঞার কাছে বসে বসে দুটো খুশখুশালির কথা কও গে।"

এতক্ষণ পরে বিলকিসের কেমন যেন ভালো লাগতে আরম্ভ করল। অদ্ভুত এক আনন্দের জোয়ারে অন্তর ছাপিয়ে যেতে লাগল। মোছফেকা ফুটকিদের বাড়ি থেকে বোয়াল মাছের বিরাট একটা টুকরো এনে কত্তাবিবিকে দেখাল।

বলল, "ইবার আনজাদ করলেন তো কত বড় ছিল মাছটা।" তারপর বিলকিস্‌কে সেই ঘরে দেখে বলল, "দরজা যে অ্যাত তাড়াতাড়ি খুলল?"

বিলকিস সে কথা এবার আদৌ গায়ে মাখল না। বলল, "বিষ্টি কমে গেল তাই।"

মোছফেকা বলল, "কিন্তু দরজাখান ব্যান্‌ বিষ্টির আগেই বন্ধ হইছিল।"

বিলকিস বলল, "তখন যে ঝড় হতিছিল।"

মোছফেকা বলল, "আমার তো মনে হ'লো ঝড়ের আগেই দরজায় খিল পড়িছে। তখন ছিল কী?"

বিলকিস বলল, "তখন ছিল তুমার মাথা।"

বলেই হেসে ফেলল। তারপর নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

মোছফেকা বলল, "ছবি এক ব্যালার মধ্যিই মানুষ হয়ে গেল।"

কত্তাবিবি বললেন, "আল্লাহ্‌ ওগেরে ভালো করুন। শান্তিতি রাখুন।"

বিলকিস্‌কে আদর করার জন্য ফটিকের বাসনা যখন তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল, বিলকিস ততক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। একটা অতৃপ্তি ফটিকের মনে কটু স্বাদ এনে দিল। বিলকিসকে সে আবার কাছে পেতে চাইছিল। কাছে তো পেয়েছিল। কেন তবে ছেড়ে দিল? আসলে এটা বোঝা গেল বিলকিস তাকে ভয় পাচ্ছে। সে সন্ধ্যের মুখে যে ব্যবহারটা করেছে তার বিবির সঙ্গে, তাতে নিজের উপর লজ্জিত হ'ল ফটিক। নানা চিন্তায় ভাবনায় মন তার উদ্‌ভ্রান্ত ছিল। সেই কারণেই সে নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। কাম রিপু তাকে সম্পূর্ণত গ্রাস করে ফেলেছিল। সে বোধ হয় মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিংবা পাগল। কেন না, কী সে করেছে, এখন কিছুই বিশেষ মনে নেই। শুধু যা মনে আছে তা এই, শুধুমাত্র তার বিবি বলে, একটি বালিকাকে, তার সম্মতি অসম্মতির তোয়াক্কা না করে, জবরদস্তি ভোগ করেছে। ছিঃ! এ কী কোনও শিক্ষিত লোকের কাজ! তাহলে তার সঙ্গে আর কলকাতার আনটুনি বাগান মেসের ইদ্রিস মিঞার, সেই খাজা লোকটার তফাত কোথায়?

বিবিদের সে কীভাবে বশ করেছে ইদ্রিস মাঝে মাঝে সবিস্তারে তাদের শোনাতো। আরে মাতারিগো কথা ছাড়ান দ্যান মিঞা। আল্লা মিঞায় অগো পয়দাই করচেন আমাগোর ছিনার থিক্যা ত্যাড়া হাড় খুইলা নিয়া। বুঝছেন নি। অগোর তাই ত্যাড়া বুঝ। আপনে সোজা বুঝ দিয়া অগো নাগাল পাইবেন ক্যামনে। এই আমার মাইঝলা বিবি, আমি আবার তারে একটুক বেশী ইচ্ছা করি, তা হেই মাতারি পরথম পরথম আমারে কি কম হয়রান করছে। নিকা পইড়া ঘরে আনছি, চুরি কইরা আনি নাই, লুঠ কইরা আনি নাই। হালায় আমারে পাশে ঘেষতে দিবো না। হালায় তখন আমি সোমখ যোবতী, আর আমার মাইঝলা বিবি, তার কথা মিঞা ওফ্‌ আপনেরে আর কী কমু? কী দ্যাখতে, কী শরীল, কী তার গমক ঠমক, কাছ দিয়া হাইটা গ্যালে মনে হয় ব্যান নারানগঞ্জের মেলের ইসটিমার হালায় আমার বুকের ভিত্‌রের খুনে তুফান তুইলা বারাইয়া গ্যালো গিয়া। আর আমি ব্যান তার ধাক্কায় পানির মাঝে গিইয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগছি। কত ভালো কথা কইছি, কত মিঠা কথা কইছি, হিন্দি পিক্‌চার দেইখা অশোককুমার দেবিকারানীকে লীলা চিট্‌নিসরে যা যা মহাব্বতের কথা কইছে হেই গুলান বেবাক কইয়া দিছি বিবিরে কিছু আর বাকি রাখি নাই বুঝছেন। হালায় আমার মাইঝলা বিবি পিকচারের মাতারি হইলে কবেই কাইত হইয়া পড়ত। অশোককুমারের পিকচার দ্যাখছেন নি? ম্যায় বনকা পন্‌ছি বনমে বন বন বলু রে,

হায় হায়! আ্যাকবার হুনলেই দেলে গাইথা যায়। কী কইলেন? দ্যাখেন নাই! অশোককুমাররে দ্যাখেন নাই! দেবিকারানীরে দ্যা—খেন নাই! লীলা চীটনিসেরে দ্যা-খে-নই না-ই! ইদ্রিস মিঞা এমন বিস্ময়ভরা চোখে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ফটিকের দিকে চেয়েছিল যেন ফটিক মানুষই নয়, একটা ছয়-পেয়ে গোরু বা কোনও জলজ্যান্ত জলজন্তু হঠাৎ উঠে এসে ইদ্রিসের সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলতে লেগেছে। তারপর অত্যন্ত হতাশ কণ্ঠে বলে উঠেছিল, দূর মিঞা আপনের লগে রসের কথা কইয়া একটুও সুখ নাই। খালি সময় নষ্ট। আরে ওই বরকাইতা বইস্যা আছস্‌ ক্যান্? সিগরেট আনবার লাগব না। বিয়ান ব্যালাতেই এই নাদান মিঞা মুখটারে আ্যাক্কেরে খাট্টা কইরা দিছে। তারপর সিগারেটে গোটা কতক লম্বা টান দিয়ে অত্যন্ত করুণাভরে ইদ্রিস ফটিককে বলতে লাগল, শাদী যখন করচেনই মিঞা আ্যাকদিন না আ্যাকদিন বিবিরে তো ফেইস্ করতে লাগব। হের লাইগাই কইতাছি, মাতারি ক্যামুন চিজ্ আগে থাইকা জাইনা লন। নইলে ঐ নরম শরম মুখ ঢোলা ঢোলা চউখ ফোলা ফোলা বুক মুচকি মোহন হাসি আর ঢং চং দেইখ্যা যদি কাইত হইয়া পড়েন তো আপনের জিন্দগী বরবাদ। কান্দাইয়া ছাড়ব। কচুর ফুল দ্যাখছেন নি? কী খুবসুরত। কী তার বাসের ত্যাজ। ঐ রূপ দেইখ্যা, ঐ গন্ধ হুইঙা যে পোকডা কচুর ফুলে ঝাঁপ দিয়া পড়ছে মিঞা, তার জিন্দগী খতম। ব্যাবাক মাতারি ঐ কচুর ফুল। বুঝচেন। উপ্‌রে উপ্‌রে কত য্যান বালো ভিতরে ভিতরে আ্যাক্কেরে বিচ্ছু। আপনে আবার যে রকম নাদান উল্টা সিলাই না সুজা সিলাই হেইডাই বোঝবার পারেন নি, হেইতেই তো আমার সন্দ যায় না। সত্যি বলতে কি, সবাই যখন ইদ্রিসের এই মন্তব্য শুনে হো হো করে হেসে উঠল, ফটিক এর কোনও মানে বুঝতে পারল না। বলল, আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। ইদ্রিস বলল, খ্যাতা খান গায়ে না দিলে ক্যামনে বোঝবেন? হালায় খ্যাতা আগে গায়ে উঠুক তখন স্যান্ উল্টা সিধা বোঝবেন? কি কইস্ বরকইতা? এ রসের খ্যাতা মিঞা, রসিক ছাড়া হের উল্টা সিধা বোঝা মুশকিল। এ খ্যাতা ত্যামুন ত্যামুন লোগ পাইলে আপনে আপনেই হামাগুড়ি দিয়া গায়ে ওঠে। বুঝছেন নি। খোদা আমাগো পাঁজরার থিক্যা আ্যাকটা ত্যাড়া হাড় বার কইরা এই সব খ্যাতা পয়দা করছেন। তাই অগো উল্টা সিধা চট্ কইরা বুঝা যায় না। কোন্‌টা অগো হাঁ আর কোন্‌টা অগো না, কিছুই আন্দাজ হয় না। আমার মাইঝুলা বিবি, এই মনে লয়, এই বুঝি ধরা দিতে রাজী কিন্তু হাত বাড়াইতে যাও অমনি ফোঁস কইরা উঠে। এই রকম টালিবালি আ্যাকদিন দ্যাখলাম, দুইদিন দ্যাখলাম, ব্যস্ মনে মনে কই আর না। এবার কড়া দাওয়াই দিবার লাগব। এ ঘি সোজা আঙুলে উঠব না। সেইদিন রাইতে বিবি আইসা যেই ঘরে ঢুকছে আর আমি গিয়া তারে কাছে নিয়া বসাইছি। আস্তে আস্তে এক ডোজ দুই ডোজ সোহাগের ফোঁটা ঢালতা আছি আর চ্যাততে আছি আর ভাবতে আছি পাখি বোধ হয় কাঠির আঠায় আটকাইছে। আস্তে ধীরে আউগাইয়া আউগাইয়া যেই না বদর বদর বইলা মোকাম বরাবর রওয়ানা দিছি অমনি বিচ্ছুটা উলটাইয়া পালটাইয়া কেম্নি মাইরা আমারে নাস্তানাবুদ কইরা দিল। হাঁ মিঞা! খোদা কসম। একটুকও মিছা কথা কইতাছি না। আমারি গো কোনটা একরার আর কোনটাই বা এন্‌কার কিছুই বোঝন যায় না। আমি হালায় পরথমে তো আ্যাক্কেরে বেকুব বইনা গ্যালাম। তত্‌খনে দেখি বিবি বিছনার থনে নাইমা পইড়তাছে। তখন আর আমি আমাতে নাই। চউক্ষের নিমিষে আ্যাকটা গইড় দিয়া বিছানার বাজুতে আইসা হাতের ব্যাড় দিয়া হালার বিচ্ছুটার কোমর সাপটাইয়া ধরছি। এইবার ভাগ দেখি, কেমুন ভাগনেওয়ালা মাতারি তুমি আইজ দেইখ্যা নিমু। কিন্তুক তারে তো আর বিছানায় উঠাইবার পারি না। খালি না না না, খালি না না না, আবার পায়ে ধরতে চায়, আবার ফোঁত ফোঁত কান্দেও, আবার কয় মইরা যামু, মইরা যামু, কত রকম বাহানা। অনেক সহ্য করছি আর না। আ'জ তল দেইখ্যা তবে ছাড়ুম। এই ভ্যাইব্যা শ্যাষে আমিও নাইমা গ্যালাম গিয়া। তারপর কেঁইচি মাইরা বিবিরে বিছানার উপ্‌রে দড়াম কইরা ফালাইয়া বুকের চাপ দিয়া ঠাইসা ধরলাম। তারপর সমানে বিবির প্যাটে আর বুকে দুই চার বার আ্যাইসা ঠাপ দিলাম সে বিবির কইলজার থনে সব হাওয়া বাইর হইয়া গেল। মাতারির ফাইজলামি ঐখানেই শ্যাষ। তারপর যখন মোকামে গিয়া ভিড়লাম তখন দেখি আর বিবির কান্দন কাটন কিচ্ছু নাই। জিগাইলাম, কী, তবে নাকি মইরা যাইবা? কই, গ্যালা না? তখন ভূতে পাওয়া মাইয়ার মত আমারে জাপটাইয়া ধরল। তারপর থিকা বিবি আমার অন্য মানুষ। তাই কই মিঞা, বিবিগর ছোট বড় নাই। ব্যাবাকই বিচ্ছু। কেউ কম কেউ বেশী। সোজা আঙুলে কাম না হইলে বোতলে ত্যাড়া আঙুল ঢুকাইতে লাগব। বুঝছেন তো।

চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে ফটিকের ইদ্রিস মিঞার উপদেশ মনে পড়ল। সত্যি বলতে কি ইদ্রিস মিঞার চালচলন বাচনভঙ্গী এত মোটা দাগের যে ফটিক সেদিন তার কোনও কথা উপভোগ করতে পারেনি। গোটা ব্যাপারটাই তার স্থূল বলে মনে হয়েছিল। তার সদ্য অর্জিত ভদ্র রুচিতে আঘাত লেগেছিল। সে দেখেছে তাদের সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়। পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ্ তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই হেতু যে পুরুষ তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য নিজের ধন ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুম মত চলিবে এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ যাহা হেফাজত করিতে বলিয়াছেন তাহা রক্ষা করিবে। এই

বাণী ফটিক জন্মাবধি শুনে আসছে। এবং বিশ্বাস করেও এসেছে। যেমন ইদ্রিস মিঞা বিশ্বাস করে এবং সেই মত আচরণ করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রী পুরুষের হুকুম মত চলিবে। ইদ্রিস তার অনিচ্ছুক মাঝলা বিবিকে কেঁইচি মেরে বিছানায় গেঁথে ফেলে তার অভিলাষ চরিতার্থ করে যাবে। ইদ্রিসের পক্ষে এটা তার ধর্ম পালনেরই অঙ্গ। একই সঙ্গে রথ দেখা এবং কলা বেচা, এই দুই কাজই সফল হচ্ছে তার। কথাটা মনে পড়তেই তার মনটা কেমন খচ্ খচ্ করতে থাকে। বিশেষ করে তার গ্রামীণ সমাজের গন্ডি কেটে সে যখন কলকাতার বৃহত্তর গন্ডিতে এসে পড়ল তখন তার নবার্জিত অনেক অভিজ্ঞতাই পুরাতন বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে ক্রমাগত ঘা দিতে লাগল। যেমন আল্লাহ্ যেখানে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পুরুষের হুকুম মত চলিবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন, সে-ব্যাপারটা, যতদিন সে গ্রামে ছিল এবং যে ধরনের নারীদের সে চারপাশে দেখেছে, তার কাছে অবিচার বলে মনেই হয়নি।

কিন্তু কলকাতায় দুজন মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ 'মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট' এই বিষয়ে তার মনে প্রথম প্রশ্ন তোলে। এক মহিলা হচ্ছেন তার সহপাঠিনী মিস্ লতিকা পালিত। আরেকজন মহিলা হচ্ছেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। মিস্ পালিতই তাকে একবার একটা ঘরোয়া বৈঠকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সরোজিনী, রাজনৈতিক বক্তৃতা। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণ এবং অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠস্বর তাকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেলেছিল। আর তারপরই হল সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, যখন তিনি সকলের অনুরোধে স্বরচিত কয়েকটা কবিতা পড়লেন। 'বীণার ধ্বনি' বলে একটা কথা বইতে পড়েছে ফটিক। শ্রীমতী নাইডুর আবৃত্তি শুনে মনে তার আর দ্বিতীয় কোনও উপমা এল না। তার মন এক কথায় রায় দিয়ে দিল, এই হল সেই বীণাধ্বনি। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সবই জানেন। তবে তিনি কী করে ভুলে গেলেন তাঁর নিজের এই অপূর্ব সৃষ্টি সরোজিনী নাইডুর কথা? আল্লাহ্ তো সব বিচারের মালিক এবং সুবিচারক। তিনি কি তাঁর বিচারের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করতে পারেন, যে কোনও পুরুষের পাশে সরোজিনীকে দাঁড় করিয়ে, এবং তারপর এই রায় দিয়ে যে পুরুষে নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ্ নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। এই প্রশ্ন বহুদিন ধরে নাড়া দিয়েছে তাকে। এবং এখনও দেয়। কিংবা এই চরম রসিকতা হয়ত আল্লাহ্ই, একমাত্র তিনিই করতে পারেন, যিনি পরম রহস্যময়। সে যখন তার বিশ্বাস এবং তার অভিজ্ঞতার এই রকম টানাপোড়েনে বিব্রত এবং বিভ্রান্ত এমন সময় আরেকজন মুসলিম রমণী তার পুরাতন বিশ্বাসের মূলে দিলেন প্রচন্ড আঘাত। এই মহীয়সী মহিলা, মিসেস রোকেয়া এস রহমান, যাঁকে সে কখনো চোখে দেখেনি, তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। "যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকায় কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জলবায়ু তো সকল দেশেই আছে, কেবল দূতগণ সর্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন?" 'নবনূর' নামে একটা মাসিকপত্রের পুরানো সংখ্যায় এই লেখাটা পড়েছিল ফটিক। এবং পড়েই মনে হয়েছিল কী আশ্চর্য এ তো তারই মনের কথা। অথচ এতদিন এই মহিলার নামই কখনো শোনেনি। মুসলমান শিক্ষিত সমাজ এঁর নাম নেয় না আর হিন্দু সমাজ এই বিপ্লবিনী নারীর নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত মাহিলাটি আদৌ মুসলমান কিনা সে সম্পর্কে তার সন্দেহই জেগেছিল। কোনও শিক্ষিত মুসলমান পুরুষের লেখাতে সে এর সিকির সিকি আগুনও দেখতে পায়নি। আর এই মহিলা কিনা সেখানে অম্লান বদনে লিখে গিয়েছেন, "যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নতমস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহা উচিত নহে। আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। যেখানে ধর্মবন্ধন, শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত আছেন। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বুঝিতে হইবে।" ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ বাংলা পাঠ্য সংকলনে কই, কত মহিলার আলুনি সব ছেলেভুলানো লেখা স্থান পেয়েছে, কিন্তু রোকেয়ার, যাঁর তেজ এবং বিদ্যোৎসাহিতা একমাত্র নিবেদিতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়, তো ঠাঁই মেলেনি সেখানে? কেন? যেদিন থেকে ফটিক বুঝতে পেরেছে তাদের সমাজে নারীজাতিকে কোনও সম্মান দেওয়া হয় না, এবং এটা ঠিক সামাজিক ন্যায় বিচারের মধ্যে পড়ে না, সেদিন থেকেই সে ঠিক করেছে তার বিবিকে সে শুধু তার বিবি বলে নয়, মানুষ বলেই গ্রহণ করবে। সে আর বিবি হবে সমান। সে কখনোই তাকে তার হুকুমের বাঁদীতে পরিণত করবে না। কিন্তু তুমি কি তা করেছো? হঠাৎ যেন ফটিক তার মনের মধ্যে গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেল। তুমি যে তোমার বিবির উপর স্বামীর অধিকার খাটালে, তাতে তোমার বিবির সম্মতি ছিল কি না জেনে নিয়েছিলে? কী, চুপ করে আছো কেন, জবাব দাও। ফটিক মরমে মরে গেল। তুমি তোমার বিবিকে যেভাবে ব্যবহার করেছো, তার সঙ্গে ইদ্রিস মিঞার কেঁইচি মারা পদ্ধতির কোনও তফাত আছে? এবার ফটিক অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে মনে মনে আকুল হয়ে বলে উঠল, না না। আমি ওরই মত পশু। এবং আমি অনুতপ্ত।

হঠাৎ দৃশ্যটা তার চোখে ভেসে উঠল। দরজায় খিল দিয়ে বিলকিস্ তার দিকে পিঠ

ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ফটিকের এই মেয়েটার সংগে একটু মজা করারই ইচ্ছে হয়েছিল।

বিলকিস সুন্দর চকচকে একটা বড় কাচের বাতি এনে মাথার দিকে একটা বাতিদানের উপর রেখে দিল। ঘরটা আলোয় ভরে গেল। পাছে বিলকিসের সংগে চোখাচোখি হয়ে যায় তাই ফটিক চট করে পাশ ফিরে শুল। সে কি তার অসংযত ব্যবহারের জন্য বিবির কাছে ক্ষমা চাইবে?

বিলকিস এরই মধ্যে যথাসাধ্য একটু সাজগোজ করে এসেছে। সে ভেবেছিল ফটিককে জানাবে যে তখন উঠে যেতে তার ভাল লাগছিল না। ফটিকের কাছে থাকতেই তার ভাল লাগছিল। কিন্তু বাড়ি ভর্তি লোক, সন্ধ্যেবেলা দরজা দিয়ে পড়ে থাকলে পাছে এ নিয়ে কোনও কথা ওঠে, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে চলে যেতে হয়েছিল। আপনি নারাজ হবেন না। নারাজ হবেন না। আমার অবস্থাডা একটু ভাবে দ্যাখেন। অত অবুঝ হয়ে পাশ ফিরি শুয়ে থাকলি কি চলে? আমাগের মেয়েগের যে কত অসুবিধে তা এটটু ভাবেন। শুধু শুধু রাগ করবেন না।

আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানো? ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত অতদূর গড়াবে বা ঐ ধরনের বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে যাবে মানে তোমার সম্মতি না নিয়েই যে আমি অতটা মানে অতটা আত্মহারা হয়ে পড়ব এবং যাক গে যাক আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। দেখে নিও ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

ফটিক বিলকিসের দিকে পিঠ ফিরে শুয়ে এবং বিলকিস খাটের শিথেনের নকশায় হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে এবং বাতির আলোয় ঘরখানা উদ্ভাসিত এবং কারো মুখে টু শব্দ নেই।

পাছে আপনি রাগ করেন তাই আমি আলোডা নিয়েই চ'লে আলাম। বউ বিটি, মেজফেকা, দাদীজান সকলেই জানে আমি অ্যাখন এই ঘরে আইছি। তা অ্যাখন আর কেউ কিছু মনে করবেনা নে। আপনি আমার উপরে নারাজ হবেন না। আজ সারাদিন আপনি ছেলেন না, আমার খুব কষ্ট হইছে মনে। আপনারে ছা'ড়ে থাকতি আমার খুব কষ্ট হয়। তাই আপনারে ঐ চিঠিখানা লিখিছিলাম। আপনি কি তার জন্যি রাগ করিছেন আমার উপর?

তোমার ঐ চিঠি। চিঠিখানা বেশ ভালো লেখা হয়েছে। আর ঐ যে ঐ খানটায়, ঐ যে যেখানে গোলাপফুলের কথা লিখেছ, ঐ যে 'যদিও মাঝে মাঝে গোলাপফুল তাহার পতীর দিল্লাগীর কারণে বিরক্ত হইয়াছে বলে কিন্তু সংগে সংগে হাসিয়া ফেলে। ইহাতে কী গুলাপফুল বিরক্ত বুঝাই?' হ্যাঁ, ঐ জায়গাটা, যদিও কথাটা 'বুঝাই' হবে না হবে 'বুঝায়' তা হোগ্‌গে, ঐখানটা পড়ে আমার মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল জানো, সারাটা দিন কত যে দুশ্চিন্তা গিয়েছে তাই মন ভালো ছিল না, কিন্তু ঐখানটা অদ্ভুত লিখেছ, মানে খুব সুন্দর লেখা, পড়ে মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল আর তাই ভাবলাম তোমার সংগেও একটু দিল্লাগী করে দেখি, যেমন তোমার গুলাপফুলের সংগে তার বর করে, তোমাকে চমকে দিতে পারি কিনা? বিশ্বাস কর, আমার না, আর কোনও খারাপ মতলব ছিল না। কিন্তু কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল না? দেখে নিও আর হবে না। এবারে সংযম। হ্যাঁ বিবি, তোমার কিছু ভয় নেই। সংযমের রশি একটুও ঢিলে হবে না।

বিলকিস ফটিকের রাগ ভাঙছে না দেখে সাত পাঁচ ভেবে খাটের দিকে একটু এগিয়ে গেল। ফটিক সেই সময় চোখ মেলল। বিলকিসের মুখে বাতির আলোটা পড়েছে। ফটিক আর চোখ বুজতে পারল না। সাজগোজের ঐ সামান্য একটু হেরফেরেই বিলকিস্‌কে একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে। এবং আরও লোভনীয়। এবং এ যেন আর অপাপবিদ্ধ আগেকার সেই বালিকাটি নয়। এর চোখ এর মুখ এর সমস্ত অবয়বই ঘোষণা করছে যে, পরিণত এক তরুণীই এখন খোলস-ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবং ক্রমাগত তার চোখ, তার ঠোঁট, তার শরীর উত্তেজক সব ইংগিত পাঠিয়ে তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করছে। ফটিক তার অনুশোচনা এরই মধ্যে ভুলতে শুরু করেছে। কিন্তু বিলকিসকে এত পরিণত বলেই বা ওর মনে হচ্ছে কেন? আ, এতক্ষণে নজর পড়ল ফটিকের, বিলকিসের নাকে নোলকটা নেই। চুলেও পাতা কেটে এসেছে। তার মানে তার তখনকার অসভ্যতায় বিলকিস কিছু মনে করেনি।

ফটিকের ঠোঁটে অদ্ভুত একটা মায়াবী হাসি ফুটে উঠল। বিলকিস যেন সম্মোহিত হয়ে গেল। সেও হাসল। তার ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হতেই দাঁতের পাতি কিঞ্চিৎ অনাবৃত হয়ে গেল। ফটিকের দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। তার চোখ দুটো ঈষৎ স্ফীত এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফটিক হাসল।

বিলকিসের চোখ দুটো এখন স্ফটিক। তার নাসারন্ধ্র ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে নাকের ডগায় ঘাম ফুটে উঠেছে। স্তনাগ্র ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। বিলকিস হাসল।

ফটিকের রক্তে আদিম চঞ্চলতা। তার শরীর অবসাদমুক্ত হয়ে প্রাণের জোয়ারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠছে। সে একটু সরে শুলো।

বিলকিসের এখনই একটা শক্ত কিছু আশ্রয় দরকার। না হলে সে পড়ে যাবে। ভেসে যাবে। সেই প্লাবনটা তার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করতে করতে আসছে। সে এগিয়ে গেল। তারপর কী মনে হতেই থমকে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে একটা ঢাকা দেবার চাদর নিয়ে এল। তারপর খাটের কিনারে গিয়ে বসল। তারপর সে ভেসে যাওয়া রোধ করতে ফটিকের এগিয়ে দেওয়া হাতখানা ধরল। তারপর উত্তেজনার প্রবল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওর সমগ্র শরীরটার সমস্ত

জোড়গুলো খুলে খান খান। চারদিকে যেন ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে যথা বিদীর্ণ এক বাড়ি। অথবা ডুবো পাহাড়ে গুঁতো খাওয়া এক জাহাজ। হাড়গোড়বিহীন একটি অস্তিত্ব ফটিকের দেহের উপর আছড়ে পড়ল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে চাদর দিয়ে দুজনেরই আপাদ-মস্তক ঢেকে দিতে লাগল সে। এবং ফটিকের দুটো বাহু সাঁড়াশির মত যখন তাকে চেপে ধরছিল তখন শুধু দুটো মিনতি নিমজ্জমান বিলকিসের কণ্ঠ দিয়ে বুদ্‌বুদের মত অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, "দরজাটা, দরজাটা! বাতি বাতি!"

॥ ২৬ ॥

বিলকিসের সুখ উপছে পড়ছিল। কাজ করতে এত ভালো লাগে, তার আস্বাদ সে আগে কখনো আর এমন পায়নি। হাজী সাহেব আর ফটিক খেতে বসেছে হাজী সাহেবের ঘরে। মোছফেকা রান্নাঘর থেকে সব গুছিয়ে দিচ্ছে আর মনের আনন্দে পরিবেশন করছে বিলকিস। নয়মোন শুধু তদারক করছেন।

হাজী সাহেব পাতে মুরগি-গোসের ছালুন ঢালতে ঢালতে বললেন, "তা ইডা ভাল কথা। তুমার বাপেরে যতীন ডাক্তাররি দিয়ে বরং দ্যাখায়েই ন্যাও। বিয়াই বড্ড ভুগতিছে। ক'দিন আগেই দ্যাখা হইছিল গোহাটায়। চিহারা অ্যাকেবারে অধেক হয়ে গেছে। তা যতীন ডাক্তাররে কি কইছ?"

ফটিক বলল, "জে না। আজ এখানে আসবার আগে গিয়েছিলাম। তিনি তখন দাউদকে দেখতে এসেছেন।"

হাজী সাহেব বললেন, "এঃ, আগে জানলি আমিই কয়ে দিতাম তখন। কাল সকালেই আমি লোক পাঠায়ে দিবানে।"

ফটিক বলল, "সতীশ চাচাকে আমি বলে এসেছি। কা'ল বরং বাড়ি যাবার পথে আমিই দেখা করে যাব।"

হাজী সাহেব বললেন, "কাল বাড়ি যাবা? কখন যাবা?"

ফটিক বলল, "জে নাস্তা করেই বেরিয়ে পড়ব।"

হাজী সাহেব বললেন, "দুপুরে আ'সে খাবা তো?"

বিলকিস তখন বাজানের বাটিতে আবার মুরগির গোস্ত ঢালছে।

ফটিক বলল, "জে না। আমি ভাবছি কাল চলে যাব। বাড়িটাকে মেরামত করা দরকার। দিন কতক লাগবে। তারপর সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে, আপনার মেয়েকে এসে নিয়ে যাব।"

ফটিক কাল তাহলে আর ফিরবে না? বাড়ি মেরামত করবে? তারপর একদিন এসে ওকে নিয়ে যাবে? ও বাপ্! ততদিন ও বাঁচবে? বিলকিসের সুখের বাতি সেই মুহূর্তে নিবে গেল। ওর মুখ শুকিয়ে গেল।

হাজী সাহেব খেতে খেতে বললেন, "সিডাউ তো অ্যাকটা কথা। তুমি যদি তাই ভালো মনে করো—"

হঠাৎ তাঁর মাথায় পরিষ্কার হয়ে উঠল, ফটিক যা বলল তার তাৎপর্য কী? মানে কী? ফটিক ঘরবাড়ি মেরামত করে এসে ছবিকে নিয়ে যাবে? ছবি চলে যাবে এই বাড়ি ছেড়ে? এই দিকটা তো কখনও তেমনভাবে ভেবে দেখেন নি তিনি। এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

হাজী সাহেব বললেন, "তবে অ্যাত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? অ্যাঁ। অ্যাত বচ্ছর পরে আ'লে। অ্যাঁ। কডা দিন থাকোই না এখেনে। তুমারে বাপ তো কিছু খাওয়ানোই হল না। ছবির মা আবার এট্টু লোকেরে খাওয়াতি দাওয়াতি ভালোবাসেন কিনা।"

ছবি চলে যাবে! অ্যাত্তটুকুন ছবি। চলে যাবে! ছবি কিছুই কষ্ট দেয়নি ওর মাকে। হাজী সাহেবের মনে পড়ল। নয়মোনের ব্যথা উঠলেই অন্ন দাইকে খবর পাঠানো হল। অন্ন আসতে না আসতেই ভূমিষ্ঠ হল ছবি। ছবি নামটাও অন্ন দাই-এর দেওয়া। নাড়ি কেটে সাফ সুতরো করে অন্ন দাই যখন কুতকুতে একটা বাচ্চাকে, মাথা ভর্তি চুল, কোলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে কর্তাবিবি আর হাজী সাহেবকে দেখাতে গেল, তখন তারা কী খুশীই না হয়েছিলেন। অন্ন বলেছিল, মেয়ে কনে, এতো ছবি গো ছবি। সেই থেকে ছবি। হাজী সাহেবের খেতে ভালো লাগছিল না। নয়মোন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে লক্ষ্য করছিলেন।

"কী কও গো ছবির মা।" হাজী সাহেব একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, "তা'লি তো কাল সকালেই নফরারে তুমার সেই মধুপুরির বাবুরচির কাছে পাঠাতি হয়। বিটারে আবার পাওয়া গেলি হয়। কী গো কথা কচ্ছ না যে। তুমি ক্যামন শাউড়ি, অ্যাঁ। জামাইরি ভালো মন্দ খাওয়াতিই পারলে না। অ্যাঁ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।" নিজের রসিকতায় হাজী সাহেব অস্বাভাবিক-ভাবে হেসে উঠলেন।

নয়মোন হাজী সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে কোমলতার ছায়া নেমে এল।

বিলকিস নয়মোনের ইঙ্গিতে বোয়াল মাছের ঝাল আরও খানিকটা ফটিকের পাতে দিতে

যেতেই ফটিক না না করে উঠল। বিলকিস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা কাল সকালেই চলে যাবে! অ্যাতক্ষণ তো অ্যাকবারও ক'লো না। ক্যান্ সে কি মানুষ না!

নয়মোন শান্তভাবে বললেন, "ও ছবি! দে দে। উডা বাপ্, দাউদির মারা মাছ। খাও, এট্টু খাও। যা ছবি, বাপের জন্যি এট্টু গোস্ নিয়ে আয়। তারপর আন্ডা আনবি।"

ফটিক কাতর হয়ে বলল, "আর না, আর পারব না। এত খাওয়া অভ্যেস নেই আমার।"

হাজী সাহেব ব্যস্ত হয়ে বললেন, "গোস্ না খাও। আন্ডা খাও। অ্যাতদিন পরে বাড়ি আইছ। আন্ডা অ্যাখন হরবখ্‌ত খাবা। শরীরি অ্যাখন যতটা ক্ষয় হবে আন্ডায় ততটাই পুরো—"

নয়মোনের মুখের দিকে এক নজর দিয়েই বাকী কথাটা গিলে ফেললেন হাজী সাহেব। বিলকিসের ঝট্ করে কান গরম হয়ে গেল। সে ফটিকের বাটিতে খানিকটা বোয়াল মাছের ঝাল ঢেলে দিয়ে দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। ও আর বেরুলো না। মোছফেকা গোস্ত আর আন্ডার বাটি নয়মোনের কাছে রেখে এল। নয়মোন মনে মনে হাসলেন। তারপর ধীরভাবে আন্ডার বাটি ফটিকের দিকে এগিয়ে দিলেন। নতুন জামাই-এর আন্ডা খাওয়ার অর্থ কী সেটা হৃদয়ঙ্গম করে ফটিকও বেশ লজ্জা পেল।

হাজী সাহেব কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। বাড়িময় সর্বত্র ছবি ছড়িয়ে আছে। আছে কিন্তু জানা যায় না। অ্যাকেবারে ওর মার মত। হাজী সাহেবের কত হাঁকডাকে যে কাজ হতে এক যুগ লাগে, নয়মোনের একটা ভ্রূভঙ্গীতে সে কাজ নিমেষে সমাধা হয়। কী করে যে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটে হাজী সে রহস্য আজও বুঝতে পারেন নি। ছবি যদি ওর মায়ের মত সংসারের হাল ধরার এই কৌশলটাও আয়ত্ত করতে পারে তবে সে সুখী হবে। খোদা ওগের সহায় হোন। ছবি সুখী হবে বলেই তাকে তাড়াহুড়ো করে বাচ্চা বয়সে বিয়ে দেননি। নয়মোনের সেই রকমই পরামর্শ ছিল। ঘরজামাই আনেননি। নয়মোনের পরামর্শ। ফটিকের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও নয়মোন করেছিল। হাজী সাহেবের একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল দাউদের সঙ্গে ছবির বিয়ে দেন। ওঁর মতলব ছিল তাহলে নয়মোনের শর্তও পূর্ণ হ'ল, ঘরজামাই করা হ'ল না অথচ ছবি সর্বক্ষণ চোখের উপর থাকল। তারপর দাউদকে গড়ে পিটে মানুষ করে কারবারটা তার হাতে তুলে দিয়ে সংসার থেকে ছুটি নেবেন। কিন্তু নয়মোন এ বিয়ে হতে দ্যায়নি। সত্যি বলতে কি, তখন হাজী সাহেব কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। পরে দাউদের কীর্তিকলাপ দেখে, তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেন যে তিনি নয়মোনের কথা শুনেছিলেন। তাই যখন নয়মোনের মুখ দিয়ে ফটিকের সঙ্গে ছবির বিয়ের কথা উঠল, তিনি সেটাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বলেই মেনে নিলেন।

"তা'লি কী হ'লো ও ছবির মা?" হাজী সাহেব ক্ষীরের বাটি থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন। "মধুপুরি কি ভোরে লোক পাঠাব?"

নয়মোন শান্ত হেসে বললেন, "তা জামাই বাপরি জিজ্ঞেস করে দ্যাখেন? ওর তো অ্যাকটা সুবিধে অসুবিধে আছে। জামাই বাপের য্যামন সুবিধে সেই রকমই হবে। তার জন্যি ব্যস্ত হবার কি আছে?"

ফটিক এই প্রথম শাশুড়িকে ভালো করে দেখল। তাঁর এই আশ্চর্য বিবেচনাবোধ ফটিককে অবাক করে দিল। "এই যে আজ যা কিছু দেখতিছ, সব ঐ অ্যাকটা লোক, ঐ ছবির মার জন্যি," মনে পড়ল ওর শ্বশুর বলেছিলেন। কথাটা হয়ত অত্যুক্তি নয়।

"তা বেশ তা বেশ।" হাজী সাহেব নয়মোনের কথা উৎসাহ সহকারে সমর্থন করলেন। "তা তুমিই কও বাপ, শ্বশুরবাড়ির জেয়াফৎ খাতি কবে তুমার সুমায় হবে? কা'ল বাবুরচি আনতি লোক পাঠাবো?"

ফটিক বলল, "জে, কালকের দিনটা বাদ দিন। আব্বার একটা ব্যবস্থা আগে করে নিই। তারপর সুবিধে মত একটা দিন দেখে সে ব্যবস্থা করলেই হবে। এর মধ্যে বরং আমি বাড়িটাকে মেরামত করে তুলি। তারপর একটা দিন ঠিক করে আপনাদের মেয়েকে নিয়ে যাব। তখন বরং আপনি সেই ব্যবস্থা করবেন।"

হাজী সাহেব করুণভাবে বললেন, "তা বেশ, তা বেশ। য্যামন তুমার সুবিধে।" একটা চাপা শ্বাস সন্তর্পণে ছাড়লেন। একটুক্ষণ চুপ করলেন। তারপর হঠাৎ উৎসাহ ভরে বলে উঠলেন, "তা মন্দ না। বুঝিছ বাপ। আমাগের জমানায় শ্বশুর জেয়াফৎ দেতেন, জামাই গিয়ে সেই সুমায় হাজির হ'তো। আর অ্যাখন জামাই বাপে সুমায় করে দেবে আর শ্বশুরির জেয়াফৎ সেই সুমায় গিয়ে হাজির হবে। হাঃ হাঃ হাঃ।"

তার ছবি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে!

"হাঃ হাঃ হাঃ! জমানা কত বদলায়ে যাচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ!"

নয়মোন তাঁর এতদিনের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ঐ বুকটায় দুঃখের তুফান উঠছে, বুঝতে পারলেন।

ছবি ছাড়া এ বাড়িতে থাকা যাবে তো! আব্ বা আব্ বা। ছবির মুখে প্রথম বুলি ফুটেছিল। বাপ সুহাগি মেয়ে। আব্ বা আব্ বা। বাপের কোলে না ওঠা পর্যন্ত শান্তি নেই। কোল থেকে নামতেই চাইতো না। একটা হাত বাড়িয়ে শব্দ করত স্ স্ ব্যাঃ। মানে বেড়াতে নিয়ে যাও।

বাইরে ঘুরিয়ে আনো। একটা দুটো দাঁত উঠেছে। ও মণি দাঁত দ্যাখ্যাও। অমনি হি করে মুখখানা খুলে ধরত। এ বাড়ির সব দিকেই ছবি। আর ছবির এমনি সব ছবি।

"আমাগের জমানায় জামাইরা অ্যাকবার যদি শ্বশুরবাড়ি গ্যালো ত্যো আর যাওয়ার নাম নেই। বিছানা য্যানো জিউলির আঠা। হাঃ হাঃ হাঃ।" হাজী সাহেব কেবলই হাসছেন। "আর অ্যাখন? জামাই আসতি না আসতি কয় যাই যাই। বিছানায় য্যান ছারপুকার বাথান হাঃ হাঃ হাঃ।"

কথাটা ছবির খুব পছন্দ হল। রান্নাঘরে তার গোমড়া মুখটা বাপের এই কথায় কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফটিক শুধু অবাক হয়ে ভাবছিল, তার শ্বশুর এত হাসির উপাদান কেনই বা টেনে আনছেন আর কেনই বা এত শব্দ করে হাসছেন? স্বভাবগম্ভীর লোকটা এত কৌতুকপ্রিয় হয়ে উঠবেন, তা ভাবেনি ফটিক। নয়মোন শুধু জানেন মেয়ে-অন্ত-প্রাণ ঐ মানুষটার দেলে কী তোলপাড়টাই না হচ্ছে! লোকটা আদৌ হাসছে না। সে প্রকাশ্যে কাঁদছে। কাঁদুক লোকটা। প্রথম চোটটা সামলাক এই ভাবে। যা অবশ্যম্ভাবী তা হবে। সহ্য করতে শিখুক। কাঁদুক। তাই হাজী সাহেবকে হাসতে একটু বাধা দিলেন না নয়মোন। সমস্ত প্রশংসাই ঐ আল্লার জন্য, যিনি আমাকে আহার জুগিয়েছেন, তিষ্টা মিটাবার জন্য পানি জুগাড় করি রাখিছেন এবং আমাবে মুসলমান দলভুক্ত রাখিছেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে এই দোয়াটা বরাবর হাজী সাহেব আন্তরিকতার সঙ্গে করে থাকেন। কিন্তু আজ তাঁর চিত্ত বিক্ষিপ্ত তাই কোনমতে দোয়াটা সেরেই উঠে পড়লেন।

নয়মোন খেয়ে উঠে, হেঁসেলের কাজ সেরে, যখন ঘরে গেলেন শুতে, দেখলেন হাজী সাহেব তখনও পায়চারি করছেন ঘরে। নয়মোন এটা সেটা সারতে সারতে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী, শোবেন না?"

বিলকিস বাটা ভরা পান নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল ফটিক চিত হয়ে শুয়ে একটা হাত কপালে থুয়ে গম্ভীরভাবে শুয়ে আছে। দেখলিই মনে হয় বুঝি বাগে রয়েছে। কিন্তু বিলকিস এখন আর তেমন ভয় পেল না। রাগ না, আসলে লোকটা অ্যাখন কিছু ভাবতিছে। লোকটাকে যতই দেখছে ছবি, ততই অবাক হচ্ছে। একটু একটু বুঝতে যেমন পারছে, ভয় কাটছে, আবার ভরসাও তেমন পুরো আসছে না। কা'ল নাকি আবার চ'লে যাবে। আচ্ছা কও দিন, এব কোনও মানে হয়? আ'সে ইস্তক তো মুখি ক্যাবল যাই আর যাই। তালি আব আসা ক্যান্ বাপু? লোকটা য্যান কী? ব্যান, তার কাছে কদিন থাকলি কী হয়? গায় ফুস্কা পড়ে? ছবি কি ওরে চিমটি কাটতিছে। খুবই রেগে গেল ছবি। সে য্যান আর মানুষ না! ঠকাস করে পানের বাটা একটা জলচৌকির উপর রেখে দিল।

"কী শোবেন না?" নয়মোন মৃদুস্বরে বললেন, "সারা রা'ত ধরে হা'টে ব্যাড়ালিই কি মনের কষ্ট দূর হবে?"

"মনের কষ্ট?" হাজী সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন, "সোবানাল্লা। তুই মনের কষ্টটা দেখলি কনে?"

নয়মোন ডাবর আর বাটা টেনে নিয়ে পান সাজতে বসলেন, "দ্যাখলাম আপনার দেলে। আবার দ্যাখব কনে?"

"নয়ান বিবি! তুই যে দেখি দৈবজ্ঞ ঠাউর হয়ে উঠলি। মনের কষ্ট, হুঃ!"

নয়ান বিবি! এবার সত্যিই অবাক হলেন নয়মোন। এ যে অনেকদিন আগেকার সেই সুহাগের ডাক! নয়মোন সবে পুরন্ত হয়ে উঠছে, স্বামী-সঙ্গে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছেন, সেই তখনকার ডাক! কত ক—ত দি—ন হয়ে গেল। এ সব তো সেই পুরনো জমানার, আগের জন্মের ডাক। সুহাগে সুহাগে অস্থির হয়ে উঠত যে নয়মোন, সে এখন শুধু খিড়কি পুকুরির নিঢেউ পানি।

"নয়না! নয়নসুখ!"

হাজী সাহেব যেন অতীতের বেলোয়ারি সওদার সব মোট খুলে দিচ্ছেন। নয়মোনের দেলে ক্যামন য্যানো মোচড় দিয়ে উঠল।

নয়মোন পা ছড়িয়ে মুখ নিচু করে বাটা এলিয়ে পান সাজছিলেন। মুখ না তুলে বললেন, "অ্যাকটা পান খাবেন! মিঠা ক'রে সাজে দেব?"

এসব সেই জমানার কথা, হাজী সাহেবের মনে পড়ল, যখন এই দুনিয়ায় ছবি আসেনি, তাঁর এত পয়সাও হয়নি। তাঁর সব দৌলতের এক দৌলত নয়মোন, নয়না, নৈনি, নয়ান বিবি, তাঁর নয়নসুখ। পয়সা ছিল না। জওয়ানি ছিল। মাথায় বাবরি ছিল। কেউ বিশ্বাস করবে, আজকের মাথা ভর্তি টাক, অতি শান্ত এই হাজী মিঞা এককালে আব্বাস লেঠেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল? মহরমের লাঠি খেলায় দশ আনির বাবুগের গর্ব পশ্চিমা লেঠেল ইয়াসিন ওস্তাদের ডান কাঁধে অবিশ্বাস্য তৎপরতায় দিয়েছিল মোক্ষম চোট। জীবনে আর লাঠি ধরতে হয়নি মদগর্বী, জমিদার-বাবুগের সব অপকর্মের সহায়ক সেই পশ্চিমা লেঠেল ইয়াসিন ওস্তাদকে। দশ আনির বাবুরা স্তম্ভিত। ওঁকে তাঁরা সোনার মেডেলও দিয়েছিলেন। ওঁদের বরকন্দাজদের সর্দার করবার জন্য তাঁকে নিয়ে কি কম ঝুলোঝুলি হয়েছে। নিষ্কর চাকরাণ জমি, ইনাম, কত প্রলোভন। মেন্দা

মিঞাদেরও তখন দারুণ রবরবা। মেম্দারা অবিশ্যি এস্টেটে বরাবরই হিন্দু আমলা হিন্দু পেয়াদা পুষে থাকেন। তবু আব্বাস লেঠেলের কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়ার পর ওঁরাও তাকে টানবার চেষ্টার কসুর করেননি। বড় মেম্দা তাঁর বাড়িতেই এসেছিলেন। বলেছিলেন, ধন দৌলত বড় কথা নয় আব্বাস মিঞা,—মেম্দাগের বড় মিঞার মত একজন দাম্ভিক আশরাফ, কুলীন, তার মত আত-রাফের, ছোট জাতের বাড়ির উঠোনে পা দিয়েছেন এবং তাকে মিঞা বলে সম্বোধন করছেন এতে গোটা নিকিরি পাড়াটাই ধন্য মনে করেছিল—ঈমান ধন দৌলতের চাইতেও বড়। কেন না আখেরাতে ধন দৌলত কাজে দেয় না, ঈমানই তরায়ে দ্যায়। হিন্দুগের লোভানীতে প'ড়ে মুসলমানের দল ছা'ড়ে যদি লা-মজহবি হও তবে ঈমান নষ্ট হবে। বেশ ভা'বে চিন্তে কাজ করবা মিঞা।

মিঞাকে ভাবনা চিন্তা কিছুই করতে হয়নি। তাকে লেঠেল হতে দ্যায়নি, গোলাম হতে দ্যায়নি ঐ যে তার সামনে বসে যে ঘাড় নিচু করে পা ছড়ায়ে পান সাজতিছে, ঐ নয়মোন। তখন তো কতটুকুন। ওর যৈবনে ক্যাবল রঙ ধরিছে, কিন্তু তখনই কী বুদ্ধি, আর কী জেদ। কিছুতেই লেঠেলের চাকরি নিতে দ্যায়নি। পিয়াদা! ছিঃ! বাবুরা পাল্কি চড়ে যাবে আর তুমি তার পাছ পাছ লাঠি ঘাড়ে কুকুরির মত ছুটবা। আর গরিব মানুষির বুকি বাঁশ ডলবা। না ওতে খোদা নাখোশ হবেন। তুমি নিকিরি। নিকিরির কাজ ক'রো। আল্লাহ্‌র ইশারায় চলো, আল্লাহই আমাগের দ্যাখবেন। নয়মোন একেবারে সার বোঝা বোঝে। অবাক লাগে হাজী সাহেবের।

নয়মোন দুখিলি পান সেজে বাটা গুছিয়ে খাটের নিচে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "এই ন্যান," বলে একটা পান এগিয়ে দিতেই হাজী সাহেব পান সমেত হাতখানা চেপে ধরে নয়মোনকে টেনে নিয়ে খাটে বসলেন।

বললেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব, জবাব দিবি? সাচ্চা কথা কবি?"

নয়মোন নরম সুরে বললেন, "কী কথা?"

হাজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি করে ক দিন্ তোর মনে কষ্ট হচ্ছে না?"

নয়মোন ধীর শান্ত এবং বিষন্ন চোখে হাজী সাহেবের করুণ মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর হাজী সাহেবের মুখে মিঠে পানের খিলিটা পুরে দিয়ে বললেন, "খান।" নিজেও একটা খিলি গালে পুরে চিবুতে লাগলেন।

শব্দ শুনে ফটিক পানের বাটার দিকে চাইল। তারপর বিলকিসের দিকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন মেজাজটা ভালো নেই।

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "ওটায় কী? পান?"

বিলকিস দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, "জে।"

ফটিক বলল, "তুমি কি পান খাও?"

বিলকিস বিপদে পড়ল। ফটিক ওর বিবির পান খাওয়া পছন্দ করে কি না, বিলকিস জানে না। "কখনও স্বামীকে এরকমের কথা বলিবেন না, যাহাতে তাঁহার দেল আপনার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যায়।" নছিহতের কথা। বিলকিস বাধ্য মেয়ের মত মাথা নাড়ল। খায়।

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "তবে যে পান না খেয়ে বাটাটা ঠকাস করে রেখে দিলে?"

বিলকিসের রাগটা কি ফটিকের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে? ওর ব্যাপারটা কি? গোপনে বা মনে মনে ও যা কিছুই করুক না কেন তা লোকের কাছে ধরা পড়ে যাবেই। মোছফেকাই হোক, কি বউবিবিটিই হোক কি দাদীই হোক আর কি ফটিকই হোক, সক্কলেই জেনে যায়। কেন? বিলকিস ঘামতে লাগল।

তারপর অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বলল, "আপনি একটা পান খাবেন?"

ফটিক বলল, "আমি পান খেলে তুমি খুশি হও?"

বিলকিস এবার বলে উঠল, "জে, খুশি হই।" বলেই তাড়াতাড়ি বলল, "যদি আপনি খুশি হন।"

ফটিক গম্ভীর মুখ করে বলল, "আর আমি যদি খুশি না হই?"

বিলকিসের মুখ কালো হয়ে উঠল। ফটিক লক্ষ্য করল। গম্ভীরভাবে বলল, "বাটাটা আমার কাছে আনো।" বিলকিস হুকুম তামিল করল। ফটিক বলল, "হাঁ করো তো দেখি পানের ছোপে দাঁত কতটা কালো হয়েছে?" বিলকিস একটু ইতস্তত করে ঠোঁট খুলে দাঁত দেখাল। ফটিক সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঠোঁট ছবির মুখে চেপে ধরে ঈষৎ ফাঁকটা বুজিয়ে দিল। ছবির চোখ দুটোও বুজে এল। হঠাৎ সে টের পেল ফটিক ওর মুখে একটা পানের খিলি ভরে দিয়েছে। চোখ খুলেই দেখল. ফটিক নিজেও একটা পান চিবুচ্ছে। ছবির শরীরের ঘ্রাণে এমন আশ্চর্য চৌম্বক শক্তি, যার কাছে ফটিক দেখল তার সংযমের বাঁধ বার বার ভেঙে যাচ্ছে। সে এবার যথেষ্ট রাশ টেনে অগ্রসর হতে লাগল।

বিলকিসের বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। নারীর সহজাত সংস্কার ও বাস্তব বুদ্ধি তাকে জানিয়ে দিল, এই যে মৌলবী সাহেবের মত মুখ গোমড়া করে তার কাছ ঘেঁষে বসে আছে যে মিঞা, পান চিবুচ্ছে, তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, ওর কাছ থেকে তার ভয় করার

কিছু নেই। লোকটা তার মায়ায় পড়ে গিয়েছে। যে মুহূর্তে এই কথা মনে পড়ল বিলকিসের, অমনি তার মনে কোত্থেকে সাহস এসে গেল প্রচণ্ড। দাড়ি গোঁফে ঢাকা দারুণ গম্ভীর মুখখানা যেন ফুস্‌মন্তরে উড়ে গেল বিলকিসের চোখের সামনে থেকে। সে দেখল এখন তার সামনে রয়েছে, অসহায়, কাতর, আর্ত একখানা মুখ যে কি না এখন বিলকিসেরই কৃপাপ্রার্থী। বিলকিসের চোখ মুখ সমস্ত শরীর দিয়ে প্রবৃত্তির আদিম বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে থাকল। সে বুঝল সে আকর্ষণ করছে লোকটাকে কিন্তু বিলকিস নিজে আর ভেসে যাচ্ছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত মাটিতে, লোকটাই বরং ব'ড়শি-গাঁথা মাছ। ভাসছে।

বিলকিস মিচকি হাসি হাসল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল ফটিক। সে বিলকিসের দুটো করতল জোড়া করে তার মধ্যে নিজের মুখটা গ'ুজে দিল। কী অপূর্ব গন্ধ এই মেয়েটার গায়ে!

বিলকিসের গলা কে'পে গেল। বলল, "তখন তো দাঁত দ্যাখলেন, ইবার কি হাত দ্যাখছেন?"

ফটিক মুখ তুলতেই বিলকিসের চোখ আর মুখ কৌতুকের তীক্ষ্ন ছুরি ছ'ুড়ে মারল তার দিকে। সে ছবির হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরল।

ছবি বলল, "আঃ লাগে, লাগে! ছা'ড়ে দ্যান।"

ফটিক অপ্রস্তুত হয়ে তৎক্ষণাৎ ছবির হাত দুটো ছেড়ে দিল। এবং ছবি সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে গেল এবং ফটিকের নাগালের বাইরে-দাঁড়িয়ে তার বেকুব-বেকুব মুখখানা দেখে মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল।

ফটিক উঠে দাঁড়াতেই বিলকিস হাসতে হাসতে আরও পিছিয়ে গেল। ফটিক কী যেন ভাবল তারপর আবার খাটের উপর বসে পড়ল। ওর মুখেও বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল।

"ছবি বিল্লী বলতে পারত না," হাজী সাহেব বললেন, "তোর মনে আছে?"

কাঁকই দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে নয়মোন স্বামীর দিকে ফিরে চাইলেন।

মৃদুস্বরে বললেন, "আছে। অ্যাখন শোন্ তো?"

হাজী সাহেব একটু বিরক্ত হলেন, "তুই আচ্ছা মা তো?"

নয়মোন বললেন, "ক্যান আমি আবার কোন্ গুনাহ্ করলাম।"

হাজী সাহেব বললেন, "তা মেয়ের জন্যি তোর কোনও চিন্তা হচ্ছে না?"

নয়মোন চুলের গোছ সামনে এনে মাথাটা ঈষৎ বাঁকিয়ে চুলের ডগার দিকে কাঁকই চালাচ্ছিলেন। তাঁর মাথাটা ঝে'কে ঝে'কে উঠছে।

বললেন, "ক্যান, মেয়ের হইছে ডা কী? জলে পড়িছে? আপনি এ নিয়ে অ্যাত ভাবতিছেন ক্যান? মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না?"

নয়মোন আসল জায়গায় ঘা দেওয়ায় হাজী সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। এই ব্যাপারটা প্রকাশ করতে তিনি চাইছিলেন না।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আরে ধুর্। তুই ভাবতিছিস আমি বুঝি ছবির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা চিন্তা করতিছি। তোর যত আজুড়ে কথা! আমি ভাবতিছি—"

হাজী সাহেব এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পর হঠাৎ থমকে গেলেন। নয়মোন ওঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

তারপর সোৎসাহে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ মনে পড়িছে। হাঃ হাঃ হাঃ! বিন্নি। বিন্নি।"

নয়মোন বিস্মিত হলেন। "বিন্নি?"

"হ্যাঁ বিন্নি। তুই ভুলে গেলি!" হাজী সাহেব অনুযোগ করলেন, "ভুলে গেলি তুই! নাঃ তোরে নিয়ে আর পারা যাবে না। ছবি বিল্লীর বিন্নি ক'তো না?"

নয়মোন চুল আঁচড়ে শান্তভাবে বললেন, "ছবি এই জামাইর হাতে সুখি থাকবে। আপনি নিশ্চিন্ত হতি পারেন। আল্লাহ্ এই জোড় মিলোয়ে দেছেন, আপনি শুধু শুধু ভাবে মত্তিছেন ক্যান। রাত হলো। আপনি শুয়ে পড়েন। আমি গা হাত পা টিপে দিই। ঘুম আ'সে যাবেনে।"

হাজী সাহেব নয়মোনের হাত ধরে পাশে এনে বসালেন। বললেন, "তুই আমার পাশে বো'স দিন এট্টু। তোরে এট্টু দেখি। সংসারের কাজ, যত সব উটকো ঝামেলা তোরে আমারে অ্যাত আড়াল করে রাখে, তোরে দেখতিই পাইনে। আগে আমাগের পয়সা ছিল না। কিন্তু তুই আমার কাছে ছিলি, আমি তোর কাছে ছিলাম। অ্যাকেবারে কাছে। কোনও দুঃখু কষ্টই গায়ে মাখিনি। আর অ্যাখন অ্যাতগুলো ঘর, অ্যাত পয়সা। কিন্তু তোর আর আমার মধ্যি কনে থ্যানো অ্যাক্‌টা আড়াল প'ড়ে গেছে। এই আড়াল যে কিডা তুলল, তাও বুঝিনে।"

নয়মোন হাজী সাহেবের আকর্ষণে ওর কাঁধের উপর মাথা রেখে চোখ বুজে অতীত স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যেতে চাইলেন। ওর মুখ কেমন ম্লান হয়ে এল। ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিলেন, "বয়েস। বয়েসই এই আড়ালডা তুলে দেছে। ছবির অ্যাখন বয়েস কম। ও দুঃখির সংসারে পড়িছে। অ্যাখন উরা সংসার গড়ে তোলবে। কখনও খাতি পাবে, কখনও পাবে না। কিন্তু দুজন দুজনার কাছে পাবে।"

"য্যামন আমরা আমাগের পাইছিলাম?"

"আল্লাহ্ য্যান তাই করেন। ফটিকরি য্যান্ আপনার মত দেল দ্যান।"

নয়মোনের চোখ পানিতে ভরে এল।

"আর ছবিরি য্যান তোর মত আক্কেল আর সেই মত বুঝ দ্যান।"

নয়মোনের ভিতরটা আবেগে এতই মথিত হচ্ছিল যে হাজী সাহেবকে জড়িয়ে ধরে তিনি ফোঁপাতে লাগলেন। হাজী সাহেব অ্যাখন আশ্চর্য শান্ত। আল্লাহ্, অ্যাতক্ষণে তুমি মার চোখ দিয়ে পানি ঝরায়ে ছাড়লে। হাজী সাহেব পুরনো দিনের মত নয়মোনকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

হঠাৎ ফটিকের একটা কথা মনে পড়ে গেল। এটা আগেই করা উচিত ছিল। সে লজ্জিত হল। ফটিক ঘরের কোণায় গিয়ে ওর স্যুটকেশটা খুলল। আড় চোখে দেখল, বিলকিস তার দিকে আগ্রহভরে চেয়ে আছে। ও একটা হিমানী আর অগুরুর শিশি দু হাতের মুঠোয় নিয়ে আবার খাটে এসে বসল। তারপর পা দোলাতে লাগল।

মিঞা ইবার গুলাপফুলির বরের কায়দা ধরিছেন। আমারে ছোট খুকি পায়েছেন, না! আমি ওসব খুব জানি। গুলাপফুল আমারে শুনোয়ে রাখিছে। লোভানি দ্যাখায়ে কাছে ডাকে ন্যাও তারপর দেল্লাগী শুরু কর। সব পুরুষিরই সেই অ্যাকই কায়দা। বিলকিস দূরে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ফটিক অস্থির হয়ে উঠল।

বিলকিস জিজ্ঞেস করল, "হাতের মধ্যি কি লুকোয়ে রাখিছেন?"

"তোমার জন্যে কলকাতা থেকে কিনে এনেছিলাম। দিতে একদম ভুলে গিয়েছি।"

"আমি জানি কী।"

"জানো? বলত তাহলে কী আছে?"

"কলি পরে কী হবে?"

"কী আর হবে? তোমাকে দিয়ে দেব।"

এবার বিলকিস বলল, "ডান হাতে আছে সাবান আর বাঁ হাতে আছে বাস তেল।"

ফটিক একটু অপ্রস্তুত হল। বলল, "সাবান আর গন্ধ তেল বুঝি তোমার খুব পছন্দ?"

বিলকিস বলল, "গুলাপফুলির বর যে ওরে তাই আনে দ্যায়।"

"তাই বুঝি।" ফটিক যেন ক্রমশ ছেলেমানুষ হয়ে উঠছে। "তা তোমার কী পছন্দ?"

"তা আমি কী জানি? আমারে কেউ কী কিছু আনে দেছে যে কব?"

"তাই তো। তোমার লোকটা তো গোলাপফুলের লোকটার মত সুবিধের নয়।"

"যান্, তা আমি আবার কখন কলাম। আপনি কী আনিছেন দেখি?"

ফটিক বলল, "গন্ধ তেলও নয়, সাবানও নয়। তোমার বোধ হয় পছন্দ হবে না।"

"তালি কী?" এবার বিলকিসের কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। সে মুহূর্তে তার সব সতর্কতা উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। আবার সে একটা নিতান্ত সরলা বালিকায় পরিণত হয়ে গেল। সে ফটিকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "দ্যাখান ইবার?"

"হাত পাতো।"

বিলকিস ডান হাত পাতলো।

"এর নাম অগুরু। এটা জামা কাপড়ে দু এক ফোঁটা ছিটিয়ে দিলে বেশ সুন্দর গন্ধ হয়। ঐ হাত পাতো।"

বিলকিস বাঁ হাত এগিয়ে দিল। গোলাপফুলের মুখে অগুরুর কথা সে শোনেনি।

"এর নাম হিমানী স্নো। নাম শুনেছো?"

বিলকিস খুশিতে উপছে পড়ল। গোলাপফুলের মুখে হিমানী ছোনোর কথাও শোনে নি। বলল, "না।"

ফটিক বলল, "শোবার আগে এই স্নো একটুখানি আঙুলে লাগিয়ে বিবিরা যদি বেশ করে গালে ঘষে তাহলে বিবিদের গাল মাখনের মত নরম থাকে।"

বিলকিস মুগ্ধ বিস্ময়ে জিনিসগুলো দেখছে। ওর হাত থেকে অগুরুর শিশিটা ফটিক নিয়ে নিল। তারপর শিশির মুখ থেকে টুপিটা খুলে ফেলে ছিপি খুলল এবং ছবির বুকের কাপড়ে দু ফোঁটা ছিটিয়ে দিল। সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে ছবির সারা শরীরটা ভরে গেল। ওর যেন কেমন একটা রিমঝিম নেশা লেগে গেছে। ফটিকের দুটো বাহু সাঁড়াশীর মত ওকে চেপে ধরল। বিলকিস বাধা দিল না। দিতে চাইলও না। ফটিক হিমানীর শিশিটা ওর হাত থেকে নিয়ে রেখে দিল। ও বাধা দিল না। ফটিক ওকে কোলে তুলে নিয়ে অনিবার্য লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল। ছবি একটুও বাধা দিল না।

নয়মোন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। মনে মনে বললেন, বয়েস হয়েছে। অ্যাখন আর পারা যায় না। কিন্তু হাজী সাহেবের ইচ্ছের কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করলেন না। অন্তত আজ

সে ইচ্ছে তাঁর হল না। এক যুগ পরে আজ ডাক দিলেন হাজী সাহেব। নয়মোন প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাজী সাহেব আর নয়মোন সেই প্রথম যৌবনের নিশিযাপনের মতই গল্প করছিলেন। নয়মোনের মাথা হাজী সাহেবের বুকে। কথা হচ্ছিল ছবি আর ফটিককে নিয়েই। কথা বলতে বলতে ওরা দুজনেই চলে গিয়েছিলেন নিজেদের প্রথম যৌবনে। হঠাৎ হাজী সাহেব নয়মোনের ঠোঁটে চুমু খেলেন। ঠাণ্ডা ঠোঁট। যেন পরিত্যক্ত বাড়ি। উষ্ণতা নেই। অভ্যর্থনা জানাবার জন্যও কেউ হাজির ছিল না। নয়মোনও যে ঠোঁটের ছোঁয়া পেলে চঞ্চল হয়ে উঠতেন সেই সঞ্জীবনী স্পর্শ কোথাও এখন পেলেন না। এ যেন মাত্রই এক দেহের মাংসের ছোট দুটো টুকরোর সঙ্গে অন্য দুটো টুকরোর সম্মেলন। হাজী সাহেব এ রকম হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। না। ওঁর মনে হল, বয়েস বয়েস, আর চেষ্টা না করাই ভালো। হঠাৎ ওঁর কাছে নয়মোনের শরীরটা উষ্ণতর বোধ হল। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর রক্তের ভিতরে যৌবনের কল্লোলের শব্দ দূর থেকে শুনতে পেলেন। ওঁর উচিত কলপ মাখা। কলপে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।

নয়মোনও ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠছেন। হাজী সাহেব নয়মোনের মুখে আবার চুম্বন এঁকে দিলেন। এবার ততটা স্বাদহীন মনে হল না। তা ছাড়া, 'ইরশাদুত্তালিবিন' কেতাবে আছে, ছোহবতের সময় বিবির মুখে চুমা দেওয়া অতি উত্তম কার্য। আল্লাহ্ তা'লা উভয়ের আমলনামায় ৭০টি করিয়া নেকী লিখিয়া দেন ও ৭০টি করিয়া বদী তাহাদের আমলনামা হইতে কমাইয়া দেন। হাজী সাহেব প্রস্তুত হবার জন্য প্রয়োজনীয় দোয়াও পড়ে নিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের শয়তানের কুহক হইতে রক্ষা কর ও আমাদের যাহা দান করিতে চাও তাহাকেও শয়তানের কুহক হইতে রক্ষা কর।"

বয়সের ভারে পীড়িত দুইজনেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন। নয়মোনই আগে কৈফিয়তের সুরে বললেন, "হাঁফ ধরে, আজকাল বড় হাঁফ ধরে। বয়েস হইছে। বয়েস! ক্ষ্যামা দ্যান। দোহাই আপনার নারাজ হবেন না।"

হাজী সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নয়মোনের ঠিক সময়ে ঠিক কাম করার এমন অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁকে বারবার অবাক করে দেয়। নয়মোনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা নতুন করে প্লাবিত হয়ে উঠল। নয়মোনকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর ঘুম আসছিল। নয়মোনের দিকে মুখ করে শুয়ে অস্পষ্ট স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "আমাগের কলপ মাখা উচিত। বুঝলি। তোরউ আমারউ। তা'লি যৈবনরে ধরে রাখা যায়।" বলেই ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর নাক গভীর গর্জনে ডাকতে লাগল। নয়মোনের নাক তার আগে থেকেই মৃদু স্বরে ডাকতে শুরু হয়ে গিয়েছে।

॥ ২৭ ॥

বিলকিস তার সঙ্গে যাবার জন্য যে শেষ পর্যন্ত এমন গোঁ ধরে বসবে, ফটিক তা বুঝতে পারেনি। সে রীতিমত বিপন্ন হয়ে উঠল। সে কি কম বোঝাবার চেষ্টা করেছে! কিন্তু বিলকিসের মুখে এক কথা। আমারেও সঙ্গে নিয়ে যান। আপনারে ছাড়ে আমি থাকতি পারব না। প্রথম দিকে বিলকিসের মুখে এই ধরনের কথা ফটিকের কানে মধু বর্ষণ করছিল। সে ছবিকে কাছে টেনে নিচ্ছিল। আর সোহাগে সোহাগে তাকে অস্থির করে তুলছিল। রাত কত হবে এখন!

ফটিক এবং ছবির মনের দরজা এখন হাট হয়ে খোলা। ফটিক অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। তার দারিদ্র্যের কথা, তার আশঙ্কার কথা, তার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা, সবই সে বলেছে বিলকিসকে। এমন শ্রোতা আর পায়নি ফটিক। কাউকে এমন করে বলতেও ইচ্ছে হয়নি।

"ভাবছি ওকালতির আশা ছেড়েই দেব," ফটিক হতাশ হয়ে বলল।

"ক্যান্ উকালতির আশা ছাড়ে দেবেন, এ কথা কতিছেন ক্যান?"

"টাকা লাগে জানো? ওকালতি তো গ্রামে থেকে করা যায় না। শহরে যেতে হয়। সেখানে বাসা নিতে হয়। খরচ আছে না! তারপর ধর, পসার জমানো। সে কি আর এক আধদিনের কাজ? কাজেই বুঝতে পারছ, আমার মত যারা গরিব, তাদের দিয়ে ওকালতি হয় না।"

ছবি বলল, "খুব হয়।"

ফটিক হাসল। ছেলেমানুষ! ছবির মুখটাকে সে অন্ধকারে ঠাহর করে নিল। তারপর ওর ভুরু দুটোর উপর অত্যন্ত যত্নে আঙুল বুলিয়ে দিল। কী মোলায়েম রোমের গুচ্ছে দিয়ে ছবির ভুরু দুটো তৈরি! ফটিক উপস্থিত এক নিপুণ কুম্ভকার অথবা চিত্রকর। যার আঙুলের তৎপর দক্ষতায় প্রতিমার মুখের ছিরিছাঁদ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। ফটিক তার বুড়ো আঙুল দিয়ে নিভুর্লভাবে সেই অন্ধকারেও আবার ছবির ভুরু দুটো টেনে দিল। সে-ই যেন আঁকল।

"খুব হয়।" ফটিক হাসল। "তুমি কি করে জানলে?"

বিলকিস দৃঢ়স্বরে বলল, "আপনি উকিল হবেন।"

"আমি উকিল হব!" ছবির গলার স্বরে একটা পরিণত আত্মবিশ্বাস ফটিককে বিস্মিত করল। এবং তাকে যেন জাগিয়ে দিল। "আমি উকিল হব?"

"জে।" ছবি যেন অবুঝ আবদার করছে। "আপনি উকিল হবেন।" কোনও সংশয় নেই ছবির সেই অন্ধকারে উচ্চারিত স্পষ্ট প্রতিবেদনে। ফটিক জানে বাস্তবের চেহারা কী। ছবি জানে না। ফটিক জানে তার নৈরাশ্যের কারণ কী। তবুও এখন ছবির এই আশাবাদ, যদিও তার ভিত কাঁচা, খুবই কাঁচা, ফটিকের ভাল লাগল। একেবারে ছেলেমানুষ। ছবিকে তার খুব ভালো লাগতে লাগল।

"বাইরের দুনিয়াকে তুমি জান না," ফটিক বলল, এবং "তুমি ছেলেমানুষ" এই কথাটা বলতে গিয়ে, পাছে তাকে ব্যথা দিয়ে ফেলে তাই বলল না। "আমাকে এখন একটা চাকরির জোগাড় করতেই হবে। না হলে চলবে না।"

"না, আমি বাইরির দুনিয়ারে জানিনে।" বিলকিসের সাহস ক্রমেই বাড়ছে। "কিন্তু আল্লারে জানি আর আপনারে জানি। আপনার অন্য কোনো কিছু কত্তি হবে না। আপনি উকালতি করবেন।"

"আমি ওকালতি করব?"

"জে।" বিলকিসের উত্তর স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত।

"অন্য কোনও কাজ করব না!"

"জে, না।"

"তাহলে খাব কী?"

"তার জন্য আপনারে ভাবতি হবে না।"

"তবে কে ভাববে?"

"আল্লাহ্। আমরা যদি আল্লার রাস্তা না ছাড়ি, তালি আল্লাউ আমাগের ছাড়বেন না।"

ফটিক বিলকিসের কাছ থেকে এমন একটা উত্তর আশা করেনি। সে ভেবেছিল ও ওর বাপের কথা বলবে। ছবির মুখে এমন পরিণত উক্তি সত্যিই সে আশা করেনি। সে বিস্মিত হল। এ তো ঠিক ছেলেমানুষের কথা নয়। ছবিকে যতটা বালিকা বলে ভেবেছিল সে, এখন দেখল ছবি তার চেয়ে অনেক পরিণত। সে চুপ করে ভাবতে লাগল। ছবি যা বলছে সেটা বিশ্বাসের কথা। যুক্তির কথা নয়। তবুও মনের বিশেষ অবস্থায় যুক্তিবাদ যেখানে পথ দেখাতে পারে না, যেখানে তাকে দুর্বল করে তোলে, শুধুই নৈরাশ্য সৃষ্টি করে মানুষকে যেখানে নিষ্ক্রিয় করে দেয়, যেমন বর্তমানে সে, সেখানে ছবির কথা, তার ভিত্তি যদি শুধু বিশ্বাসই হয়, সে দেখল তার প্রাণে আশার সঞ্চার করছে, লড়ে যাবার প্রেরণা দিচ্ছে।

ফটিক চুপ করে রয়েছে। ফটিক কি ভাবছে, না তার উপর রাগ করেছে? বিলকিস আস্তে করে ফটিকের দিকে এগিয়ে এল।

কাতর হয়ে বলল, "আমার উপর নারাজ হবেন না। আমি ল্যাখাপড়া শিখিনি। আমার যা মনে হইছে আমি তাই কয়ে ফেলিছি। আমি যদি গোস্তাকি করে থাকি আমারে মাফ করবেন।"

"তোমার উপর আমি নারাজ হব কেন?" ফটিক ওকে আরেকটু কাছে টেনে নিল। "আমি বরং অবাক হয়ে ভাবছি, তোমার মনে এত জোর কোত্থেকে আসছে। জান ছবি, আজ সকালে বাড়ি গিয়ে বাজান আর আম্মাজানের অবস্থা আমাদের বাড়ির হাল দেখে বড্ড মুষড়ে পড়েছিলাম। আমরা যে কত গরিব তুমি ধারণা করতে পারবে না। আমি এতদিন পরে বাড়ি ফিরেছি, আম্মা একবারও আমার কাছে এসে বসতে পারেনি। আজ সারাদিন শুধু ধান ভেনেছে। জানো? আব্বাজান সারাদিন জ্বরে ধুঁকেছেন, তাঁর কাছে এসেও বসতে পারেনি। অবিশ্রান্ত শুধু ঢেঁকি পাড় দিয়েছে আর ঢেঁকশাল থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখেছে।"

ফটিকের গলা ভারি হয়ে এল। প্রায় তিন প্রহরের জমাট অন্ধকার ফটিকের হতশ্বাসে যেন আরও ঘন হয়ে উঠল। তীব্র একটা বেদনাবোধে বিলকিসের প্রাণটা হা হা করে উঠল। তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছিল। সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। কেমন করে না জানি সে হু হু করে বড় হয়ে উঠল। তার নিজের থেকে বড় ফটিকের চাইতেও বড়। ফটিক সম্পর্কে তার আর কোনও ভয়ডর নেই, দ্বিধা সংকোচ নেই। সে ফটিকের মাথাটা টেনে এনে নিজের বুকে চেপে ধরল। তারপর তার চুলের ভিতরে আঙুল চালিয়ে বিলি কেটে দিতে লাগল।

"আমি না আজ সারাদিন পথ হারিয়ে যেন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি।" অশান্ত ফটিক যেন তার মায়ের বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে। তার মনে প্রশান্তির শীতল ছায়াটা যেন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। সে শান্তভাবে বলল, "তোমার কথা শুনে, বিশ্বাস করো ছবি, আমি যেন এই প্রথম একটা পথ দেখতে পাচ্ছি।"

বিলকিসের চোখ ঝপ্ করে জলে ভরে এল। কেমন একটা আনন্দ, কেমন একটা সমব্যথার তীব্র এক মিশ্র অনুভূতিতে তার মনটা টনটন করে উঠল।

"বিশ্বাস করো, আমার যেন আবার উৎসাহ ফিরে আসছে। আমি আজ সারাদিন কী ভেবেছি জানো, ওকালতি পড়তে যাওয়াটা আমার হয়ত ঠিক কাজ হয়নি। হয়ত গোঁয়ারতুমিই হয়ে গিয়েছে। হয়ত কোনও একটা চাকরি নিয়ে সংসারে কিছু টাকা দিয়ে গেলেই ঠিক হত। তোমার কী মনে হয় ছবি, তাই ভালো হত না?"

ছবির চোখের ধারা আর বাঁধ মানল না। তার পরামর্শ জিজ্ঞেস করছে ফটিক। সে পরম

মমতায় ফটিকের চুলে আরও মোলায়েম হাতে বিলি কাটতে লাগল আর নিজেকে সামলাতে লাগল।
"তোমার কী মনে হয় ছবি?"
ছবি অনেক কষ্টে শান্ত ও সহজ করে আনা গলায় বলল, "আমি কী বা বুঝি আর কীই বা জানি। আল্লার মর্জি যদি তাই হ'তো, তালি তিনি আপনারে চাকরি না করায়ে উকালতি পাশ দিতি পাঠালেন ক্যান?"
ফটিক এবার হাসল। তার এমন কী উত্তর জানা আছে, যা দিয়ে ছবির এই সহজ অথচ সরল প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়? সে হাতের কাছে তেমন কিছু খুঁজে পেল না। তাই চুপ করে রইল। এবং দেখল তার মনটা ধীরে ধীরে শান্ত এবং সতেজ হয়ে উঠছে।
ফটিক আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার একটু হাসল। তারপর বিলকিসের বুক থেকে নিজের মাথাটা সরিয়ে নিল। এবার সে-ই বিলকিসের মাথাটা নিজের বুকে তুলে নিল। তারপর খুব হাল্কাভাবে বলল, "জানো, আজ সারা দুপুর না, কত সব আজে বাজে কথা ভেবেছি। এমন কি একবার এও ভেবেছিলাম তোমাকে শাদী করে আমি হয়ত ঠিক কাজ করিনি। আমার হাতে পড়ে, তোমার কষ্টের আর সীমা থাকবে না।"
বিলকিস একেবারে আর্তনাদ করে উঠল, "না না, দুহাই আপনার, ও কথা কবেন না, কবেন না। আপনারে পাইছি, এ আল্লার মেহেরবানি। আমার কোনও কষ্ট হবে না।"
বিলকিস ফটিকের বুকে মুখ ঘষতে লাগল।
ফটিক বিলকিসকে বলল, "ছবি, আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিনে। যা সত্যি তাই বলছি। না-খাওয়ার কষ্ট কাকে বলে তা তুমি তো জানো না। আমার মা জানে। তাই ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমার প্রতি অবিচার করেছি।"
ছবি বলল, "আপনি কষ্ট কারে কন তা জানিনে, তবে আপনারে কই, কষ্ট কারে কয় তা এতদিন জানতাম না, আজ জানিছি। সারাটা দিন আজ দোজখের আগুনি য্যানো জ্বলিছি। এর চাইতি কষ্ট মানুষ আর পায় না। আপনি বিয়ান ব্যালা চলে গ্যালেন। বাজান ফিরে আসে কলেন আপনি বাড়ি গেছেন, দুপুরে ফেরবেন না, ফেরবেন সেই সন্ধ্যেয়। তারপর সারাদিন তো আর কাটে না। দেল জ্বলে খাক হয়ে যাতি থাকে। সে যে কী কষ্ট আপনি পুরুষ মানুষ আপনি বোঝবেন না। দুহাই আপনার, আপনার পায় পড়ি, আমারে আর অ্যাকা ফেলি চলে যাবেন না।"
ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরল বিলকিস। তারপর বুকে মাথা রেখে ঝরঝর কেঁদে ফেলল। এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমারে ফেলে যাবেন না, আমারে ফেলে যাবেন না। আপনারে ছাড়ে থাকতি পারব না। আমি তালি মরে যাবো, মরে যাবো।"
ফটিক দেখল একটু আগেকার সেই পরিণত বড়সড় মেয়েটা আবার এখন কেমন এক ছোট্ট খুকি হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত মায়া হল মেয়েটার প্রতি। সে হাতের তালু দিয়ে আলতোভাবে ওর চোখের পানি মুছিয়ে দিতে লাগল।
ফটিক বলল, "তুমি কাঁদছ কেন? আমি তোমাকে ফেলে যাব কেন? তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব বলেই তো ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। কাল সকালে যাব। গোছগাছ করতে বড় জোর দু চারদিন লাগবে। তারপর এসে দুজনকে নিয়ে যাব।"
বিলকিস ফটিককে জোরে জড়িয়ে ধরল যেন সে এই মুহূর্তেই পালিয়ে যাবে। আর তারপর পাগলের মত বলতে লাগল, "না না না। আমারে ফেলে যাবেন না। কাল আপনার সঙ্গে আমারেও নিয়ে চলেন।"
ফটিক বেশ বিব্রত হয়ে উঠল।
"তুমি এমন করছ কেন ছবি? তুমি কাঁদছ কেন? আমি তো তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি। তুমি তো জানো না, আমাদের বাড়ির অবস্থাটা কী হয়ে আছে এখন। তোমাদের এই বাড়ির ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত দেখে আমাদের বাড়ির আন্দাজ করতে পারবে না। আমাদের বাড়িতে দুটো মাত্র ঘর। তার একটা আমার। আমি গিয়ে দেখি আমার ঘরময় ভর্তি কুন্টা। সে-সব সরাতে হবে। সাফ করতে হবে। তবে তো গিয়ে তুমি ঢুকবে? নাহলে ধর, এই মানে রাত্তিরে শোবে কোথায়?"
ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বিলকিস রায় দিল, "আপনার পাশে।"
"আমার পাশে।" ফটিক হেসে উঠল। "আরে আমি কোথায় শোবো তাই তো জানিনে।"
বিলকিস বলল, "কিন্তু রাত্তির শোবেন তো কুথাউ না কুথাউ? জাগে তো আর থাকবেন না?"
ফটিক বলল, "সে ব্যবস্থা কোনোরকমে না হয় একটা হয়ে যাবে।"
বিলকিস বলল, "তাহলি আমার ব্যবস্থাউ হয়ে যাবে। আমারে নিয়ে চলেন। দ্যাখবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হবে না। আপনারে অ্যাকটুকুনিউ অসুবিদেয় ফ্যালব না। আমার একথা বিশ্বাস করেন।"
ফটিক এখন এই অবুঝ মেয়েটাকে বোঝায় কী করে? প্রচণ্ড জোরে তাকে আঁকড়ে শুয়ে আছে বিলকিস। যেন সে ধরেই নিয়েছে এ লোকটা তাকে ফেলে রেখে পালাবে। পাগল! একেবারে

পাগল! এত নরম, এত বাধ্য, এত ভীতু সেই মেয়েটা কোথায় গেল! একটু আগেই না এই মেয়েটাই তাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহ দিয়েছে। নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলতে তাকে সাহায্য করেছে। এখন আবার সেই মেয়েটাকেই দ্যাখ। কী প্রচণ্ড জেদ। ফটিক এ'টে উঠতে পারছে না যেন।

হাল ছেড়ে দিয়ে সে বলল, "বেশ ছবি! তুমি আমাকে একটা দিন সময় দাও। আমি কথা দিচ্ছি, আমি পরশু এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কেমন? শুধু একটা দিন সবুর কর। আমাকে একটু সময় দাও।"

বিলকিস এবার মাথাটা তুলল। ধীরে শান্ত স্বরে সে বলল, "একটা কথা কব, নারাজ হবেন না? আমার অনেক ভাগ্যি, তাই আল্লাহ আপনারে আমারে মিলোয়ে দেছেন। আপনি আমার মালিক, আপনার হাত ধরে আমি আমার মালিকির বাড়ি গিয়ে ওঠবো। সে ষ্যামন বাড়িই হোক। আপনি কিন্তু-কিন্তু কত্তিছেন ক্যান? সে কি আমি হাজী বাড়ির মেয়ে বলে? তা যদি হয়, আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস রাখতি পারেন যে আপনার সংগে মাঠে জঙ্গলে থাকলিউ আমি সুখি থাকব। আমার কোনও কষ্ট হবে না। আর আপনি না যদি নিয়ে যান আমারে তালি আমি বুঝে নেবো, আল্লাহ আমার উপর নাখোশ হইছেন, তিনি যাঁর হাতে আমাকে তুলে দেছেন, সেই আমার মালিক আমারে বিশ্বাস করেন না।"

বিলকিস ঝর ঝর করে কে'দে ফেলল। তারপর বলল, "আমি আপনার দুঃখির ভাগ নিতি চাই। আমার এই আরজ আপনি মনজুর করবেন না?"

বিলকিস কে'দেই চলল। ফটিক মনে মনে বিচার করে দেখল, ছবি খুব পাকা উকিলের মত সওয়াল করেছে। এর পর তার কোনও আপত্তিই টে'কা উচিত নয়। মেয়েটাকে তার আশ্চর্য রকম ভালো লেগে গেল। এমন কি তার এও মনে হল, বিয়েটা সে ঝোঁকের মাথায়, মেন্দাগের উপর এক হাত নেবে বলেই হয়ত, হঠাৎ-ই করে ফেলেছিল, কিন্তু কাজটা সে ভালোই করেছে কেননা ছবির মত এমন বিবি খুব বেশি লোকের কপালে জোটে না।

সে ছবিকে কাছে টেনে নিল। তার নোনতা ঠোঁটে একটা দীর্ঘ চুমু খেল। তারপর তার চোখ থেকে মুখ থেকে গাল থেকে নোনতা পানি মুছতে মুছতে বলল, "বিবিজান, তোমার আর্জি মনজুর। খালি একটা কথা, দেখো তোমাদের বাড়ির কেউ যেন এ ব্যাপারে আঘাত না পান। তুমি চলে গেলে এ বাড়ি ওদের কাছে ফাঁকা হয়ে যাবে।"

ছবি এদিকটার কথা ভাবেইনি এতক্ষণ। ফটিকের কথায় তার বাপ মা দাদীজানের মুখগুলো সব চোখের উপর ভাসতে লাগল। তার মুখ আবার মলিন হয়ে এল। ধীরে ধীরে সে তার মাথাটা ফটিকের বুকের উপর রাখল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার চোখের কোণ দিয়ে আবার নতুন একটা পানির ধারা গড়িয়ে পড়ল। সে এবার পরম নির্ভরতায় ফটিকের বুকে নিজেকে এগিয়ে দিল। আর সংগে সংগে ওদের বাড়ির কু'কড়োটার তীক্ষ্ণ জোরালো ডাকে রাতের অন্ধকার যেন ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা যে ঠিক কী হয়ে গেল, ফাঁকা বাড়িটার দিকে চেয়ে হাজী সাহেব বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ছবিরা চলে গেল। বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। ছবি চলে গেল! মনে হচ্ছে কেউ নেই। পড়ো বাড়ি। এক পহর বেলা হয়েছে।

অন্যদিন নাস্তা টাস্তা সেরে দহলিজে গিয়ে তিনি এই সময় কিছুক্ষণ বিষয়কর্ম সব সেরে নেন। আজ আর ওমুখো হবার সময় পাননি। নিজের শোবার ঘরে বসে বসেই, ছবি চলে গেল, এই একটা অদ্ভুত আজগুবি অংক মিলোতে চেষ্টা করছিলেন। যা হই হুড়ুমধুমটা গেল। তাঁর তামাক খেতে ইচ্ছে হল।

অভ্যাস বশে ডাক ছাড়লেন, "নফরা।"

ছবি চলে গেল! ফজর নামাজের পর নয়মোনের মুখে কথাটা শুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। নয়মোন যখন আস্তে করে বললেন, "শোনেন, আপনার মেয়ে তো কোট ধরিছে। আজই সে শ্বশুরবাড়ি যাবে।" হাজী সাহেব কথাটার মানেটা, সত্যি বলতে কি, তখনও ঠিক ধরতে পারেননি। হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। ঘুম থেকে উঠে ইস্তক গত রাত্তিরের ঘটনার রেশ তার মনের খুশি-খুশি ভাবটাকে উ'চু পর্দায় বে'ধে রেখেছিল। "হাঃ হাঃ হাঃ। জামাই তাহলি বিটিরি এর মধ্যিই একেবারে বশ করে ফেলিছেন। ওগের আর তর সচ্ছে না। কী কোস্?" নয়মোন হাসছে না ক্যান? তখনই হাজী সাহেবের আন্দাজ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজের মনের উপচে পড়া আনন্দেই মশগুল হয়ে ছিলেন। এবং এই রহমত তাঁর উপর বর্ষণ করার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। সুবহানাল্লাহি বেহামদিহী অসুবহানাল্লাহিল আজীম—যিনি মহান, ও যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্ববিধ প্রশংসা ও মাহাত্ম্য তাঁরই জন্য। হাজী সাহেবের অন্তরে আনন্দের গোপন উৎস-মুখটা যেন খুলে গিয়েছে। আল্লাহর বরকতযুক্ত এ রকম সকাল হাজী সাহেবের জীবনে অনেক দিন পরে এল। আকাশে মেঘ নেই। মিঠে বাতাস বইছে। হাঁসগুলো হৃষ্টপুষ্ট, প্যাঁক প্যাঁক করে উঠোনে ঘুরছে আর হঠাৎ হঠাৎ তাদের গলাগুলো গত সন্ধ্যের বৃষ্টিতে আনাচে কানাচে জমে যাওয়া জলের মধ্যে বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুতবেগে কী সব যেন খেয়ে

চলেছে। ঠ্যাকারে কুঁকড়োটা ডিঙি মেরে মেরে উঠোনময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হাজী সাহেব যেন তন্ময় হয়ে অল্লাহর মহান তুলিতে আঁকা এই জীবন্ত চিত্রপট দেখে চলেছেন।

নয়মোন বললেন, "তা এখন এমন করে বসে থাকলিই কি চলবে? মেয়ের একটা ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত তো কত্তি হবে, না কী? জামাই তো নাস্তা করেই চলে যাবেন।"

"হবে হবে", সুখে ডগমগ হাজী সাহেব বললেন, "বৌট কী কয়? ওর জন্যিই তো ভাবনা। অ্যাতদিন অ্যাক রকম অবস্থায় মানুষ হইছে। অ্যাখন অ্যাকেবারে অন্য রকম অবস্থার মধ্যি গিয়ে পড়বে তো? তুরা বরং এই কয়দিন ওরে বেশ করে বুজোয়ে সুজোয়ে ওর মনডারে তৈরি করে দে। কোনোদিন তো আমাগের ছাড়ে থাকেনি। পেরথম পেরথম মন খারাপ হবে। তা কী করা যাবে? শাদী যখন হইছে, তখন মেয়েরে তো শ্বশুরবাড়ি যাতিই হবে। কী কোস? মনেরে বুঝ দিতি, ছবিরি খুব ভা—লো করে কোয়ে দিবি। বুঝলি। কোবি? কোবি? হ্যাঁ কোবি, দ্যাখো মণি তুমি অ্যাখন ডাগর হইছ, অ্যাখন খসমের ঘরই তুমার ঘর। বুঝিছ। বিবি আয়েশা য্যামন নবীর ঘর আলো করে ছেলেন, তুমিও তুমার খসমের ঘর তেমনি আলো করে থাকবা। বুঝলি, এই সব কথা কোয়ে কোয়ে ছবির মনডারে বেশ ভালো করে তৈরি করে রাখ যাতে জামাই যেদিন ওরে নিতি আসবে সেদিন য্যান আমাগের ছাড়ে যাতি বেশি কষ্ট না পায়।"

হাজী সাহেব এতখানি উপদেশ দিয়ে একটুক্ষণ থামলেন। নয়মোন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন একটা প্রশান্তির নূর এই বিয়েন ব্যালায় হাজী সাহেবের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাজী সাহেব নয়মোনের মুখে বিস্ময়ের ভাব লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন, "দ্যাখ, আমি হলি ছবিরি কী কতাম জানিস? কতাম, মা তুমি বিবি আয়েশার মত হও কিম্বা তুমার মার মত হও। হাঃ হাঃ হাঃ।"

নয়মোন করুণ চোখে হাজী সাহেবের মুখের দিকে চাইলেন তারপর ভারি গলায় বললেন, "ছবি তো ওদিকি ওর দাদীর ঘরে যায়ে কোট ধরে পড়িছে। অ্যাতক্ষণ চোখি-মুখি পানি পস্যন্ত দ্যায়নি।"

হাজী সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। "ক্যান? কী হইছে? জামাইর সঙ্গে ঝগড়া হইছে?"

নয়মোন বললেন, "ঝগড়া হবে ক্যান? ছবি কোট ধরিছে, সেউ জামাইর সঙ্গে আজই চলে যাবে।"

"কী! ক্যান? কী রকম হলো?" ব্যাপারটা হাজী সাহেবের মাথায় ঢুকছিল না ঠিক মত। "কী কোলি? কী করবে ছবি?"

নয়মোন নরম গলায় বললেন "ছবি আজ চলে যাতি চাচ্ছে।"

হাজী সাহেব এবার কথাটার মানে বুঝলেন। গলাটাকে উচ্চগ্রামে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যান? কেউ তারে কিছু কইছে?"

"না। কিডা তারে কী কবে?" নয়মোন বললেন, "ছবি জেদ ধরিছে ও জামাইর সঙ্গে চলে যাবে।"

"এ নিশ্চয়ই ঐ জামাই বিটার ফুসলানি।" হাজী সাহেব হঠাৎ খাপ্পা হয়ে গেলেন। "আমাগের ছবি তো অ্যামন ছিল না।"

"তওবা, তওবা।" নয়মোন ব্যথিত হয়ে বলল, "আপনি জামাই বিচারার উপর খামাখা নারাজ হতিছেন ক্যান। সে বিচারির দোষ কী? সে তো আপাতক ছবিরি রাখেই যাতি চায়। কাণ্ড তো আমাগের মেয়েই বাধাইছে।"

"কী হইছেডা কী, একটু ভালো করে ক দিনি? ব্যাপারডা বুঝে নিই।"

নয়মোন বললেন, "ফজর নামাজের পর পরই ছবি তার দাদীর কোলে গিয়ে ঠাস খায়ে পড়িছে। তার দাদীরি সে কইছে, জামাইরি ছাড়ে সে এক ব্যালাউ এ বাড়িতি থাকতি পারবে না। তার জান তালি নাকি চলে যাবে। এই কথা কচ্ছে আর হাপুস নয়নে কাঁদতিছে। জামাই তারে সারা রাত ধরে বুঝোইছে। তার দাদী তারে বুঝোতি কসুর করেননি, আমি বুঝোইছি। অ্যাখন বাকি আছেন আপনি। আপনি আম্মাজানের ঘরে যান।"

নয়মোন বেরিয়ে গেলেন। রান্নার কাজ পড়ে আছে। যদিও কেমন ক্লান্ত লাগছে তার।

হাজী সাহেবের সব হিসেব গণ্ডগোল হয়ে গেল। নাঃ এবার একটু তামুক চাই। তাঁর মনে পড়ল, তামুক খাবার জন্য কিছুক্ষণ আগেই না নফরাকে ডেকেছিলেন। বেয়াদব ব্যাটা অ্যাকটা সাড়া পর্যন্ত দিল না! আস্পর্দা তো কম নয়। হঠাৎ তাঁর রাগ চড়ে গেল। আজ ব্যাটাকে জুতো পেটা করব।

"নফরা-আ!"

হাজী সাহেবের গর্জন শুনে নয়মোন নিজেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন, "কিছু চাই।"

হাজী সাহেব ঘরময় পায়চারি করছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"সে নবাবজাদা গালেন কনে?"

নয়মোন ম্লান হেসে বললেন, "জে, সে তো ছবিগের নিয়ে গ্যালো। তারে যে গাড়ি জুততে ছবির পেঁৗছোয়ে দিয়ে আসতি কলেন? কিছু চাই?"

হাজী সাহেবের রাগ অমনি পড়ে গেল। তাই তো ছবি তো আজ চলে গেল। কর্তাবিবির ঘরে ঢুকে আদর করে হাজী সাহেব মেয়েকে যেই ডেকেছেন, "ছবি!" অমনি ছবি দৌড়ে এসে তাঁকে দু হাতে জড়িয়ে ধরল তারপর তাঁর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে আর্ত কণ্ঠে আবেদন করল, "আব্বাজান! আমার উপর নারাজ হবেন না। আমারে যাতি দ্যান, যাতি দ্যান!"

এর উপর আর কথা চলে না। সব হিসেব ওলোট পালোট হয়ে যায়। হাজী সাহেব বোবা হয়ে গেলেন। ছবির শাড়ির খুঁট দিয়েই তার চোখ মুছিয়ে দিলেন।

নয়মোনের কথা শুনে তিনি তো অপ্রস্তুত। গলার পর্দা একেবারে নেমে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "না না, কিছু চাইনে। আমি ভাবতিছি নফরার আক্কেলডা কী? ব্যাটা তাড়াতাড়ি আসে অ্যাকটা খবর তো দিবি? গেছেন তো এখেনের থে এখেনে। কলকাতায় তো আর যাননি। তা মিঞার ফিরে আসতি অ্যাত দেরিই বা হচ্ছে ক্যান?"

"এই তো গ্যালো। অ্যাখনও আমাগের গিরামডাই পার হয়নি।"

"না না", হাজী সাহেব জোর দিয়ে বলতে গেলেন কিন্তু ততটা জোর ফুটল না, "কী যে তুই বলিস। হুঃ!"

তিনি হন হন করে দহলিজে চলে গেলেন। নিজেই তামাক সাজলেন। আব্বা আব্বা। চমকে পিছন ফিরলেন তিনি। ছবি হামা দিতে দিতে এগিয়ে এসে টিকে ধরাবার আংরার মালসায় হাত দ্যায় আর কি! সর্বনাশ! এক ঝটকায় ছবিকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে তরিবৎ করে সাজা কলকেটা উলটে দিলেন। তাঁর বুক ধুকপুক করছিল। আব্বা আব্বা। চমকে পিছন ফিরে দেখেন সেখানে শুধু খাঁ খাঁ শূন্যতা।

কলকেটা গড়গড়ার উপর বসিয়ে ফাঁকা বালাখানায় বসে চেয়ারে হেলান দিয়ে সটকা টানতে লাগলেন। অনেক দিন পরে নিজে আজ তামাক সাজলেন। ব্যবসাটার একটা বিলি ব্যবস্থা করতে পারলেই তিনি এখন নিশ্চিন্ত হন। আরেকবার হজে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর। এবার তিনি নয়মোনকেও নিয়ে যাবেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল বিয়াই বাড়িতে পুকুর নেই। ওরা নিশ্চয়ই সব কুয়োর পানিতে গোসল করে। ছবির তো আবার হয় পুকুর নয় গাঙ-এর খোলা পাতলা পানিতে গোসল করা অব্যেস। এখন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কুয়োর ঠান্ডা আর ভারি পানিতে গোসল করে সর্দি জ্বর বাধিয়ে না বসে। তবেই তো চিত্তির। এমনিতে অবিশ্যি ছবি যে খুব একটা অসুখে ভোগে তা নয়। কিন্তু যদি সে অসুখে একবার পড়ে তা হলে সাংঘাতিক ভোগে। কুয়ার পানিতে গোসল করার ব্যাপারটা সম্পর্কে ছবিকে কিংবা ফটিককে তিনি যদি একবার অন্তত সতর্ক করে দিতেন তা হলে আর কোনও ঝঞ্ঝাট হত না। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। তাঁর উদ্বেগ বাড়তে লাগল। হাতের সটকা হাতেই রইল, তিনি তাতে টান দেবার কথাও ভুলে গেলেন। কথাটা বলব কখন? বাড়ি শুদ্ধু লোকের অ্যামন লাফালাফি শুরু হয়ে গেল যে আমি য্যানো ছবির তালাচাবি দিয়ে আটকায়ে রাখিছি। অ্যাত অল্প সুমায়ির মধ্যে একটা মেয়ের নতুন শ্বশুরবাড়ি যাবার ব্যবস্থা করা কি সুজা কথা? কিন্তু কুয়োর পানিতে মেয়ে যদি গোসল করে, তা হলি ঐ টুকুনি মেয়ে ও মেয়ের সর্বনাশ হবে। এই ব্যাপারডাই তার মনে পড়েনি। আশ্চর্য!

হঠাৎ হাজী সাহেব উঠে পড়লেন এবং দ্রুত বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে ডাকলেন, "ছবির মা, অ্যাকবার আয় দিনি।"

নয়মোন রান্না ফেলে ছুটে এলেন। হাজী সাহেব বললেন, "আমার পিরেনডা দে শিগগির।"

নয়মোন পিরেনডা এনে দিয়ে বললেন, "এই রোদ্দুরি অ্যাখন যাবেন কনে?"

হাজী সাহেব একরাশ উদ্বেগ গলায় ঢেলে বললেন, "অ্যাত বড় অ্যাকটা ভুল আমাগের সগলের হয়ে গেল। অ্যাঁ। অথচ কারুর নজরেই সিডা পড়ল না। আশ্চায্যির কথা। অ্যাখন ভালোমন্দ কিছু অ্যাকটা না হলিই বাঁচি।"

নয়মোন উদ্বিগ্ন হলেন। "ভালোমন্দ হবে? কার?"

পিরেনডা গায়ে গলাতে গলাতে বললেন, "ছবির, আবার কার?"

"কী হইছে ছবির?"

"অ্যাখনও কিছু হয়নি, কিন্তু হতি কতক্ষণ। হাত পা গুটোয়ে বসে থাকলিই হবে? যাতে কিছু না হয় তার ব্যবস্থা কত্তি হবে না?" হাজী সাহেব চিকনের কাজ করা টুপি মাথায় দিলেন। তারপর কাঁকই নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়িটা আচড়াতে লাগলেন।

নয়মোন জিজ্ঞেস করলেন, "ভুলির কথা কী য্যানো কতিছিলেন?"

"এই ছবিটা, অ্যাখন জ্বর না বাধায়ে বসে", হাজী সাহেব বললেন, "অ্যাখন সেইডেই হল গে চিন্তার কথা।"

"ছবি জ্বর বাধায়ে বসবে?" নয়মোন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "ক্যান?"

"নাঃ, তোর আজকাল কিছু মনে থাকে না", হাজী সাহেব অনুযোগ করলেন। "ছবির জোন্মে ইস্তক পাতলা পানিতি গোসল করা অব্যেস। সে হয় পুকুরি গোসল করিছে আর না হয় গাঙে। সিডা ভুলে গেলি?"

নয়মোন বললেন, "তা এর মধ্যি ভুলডা হলো কনে?"

"আহা", হাজী সাহেব কৈফিয়ৎ দিলেন, "জামাই বাপারি, সে কথাডা কয়ে দেওয়া উচিত ছিল না কি, যে দ্যাখ বাপ, ছবির আবার কুয়োর ভারি পানি সহ্য হয় না সিডা য্যানো খিয়াল রাখো? ওরে খবরদার কুয়োর পানিতি গোসল কত্তি দিবানা। অ্যাঁ এই কথাডা কয়ে দিলিই চুকে যাতো। উরাউ সাবধান হতি পারতো। তা এ খিয়ালডা আমাগের কারু হলো না। হুঃ। বাপ মায়ের কর্তব্য বড়ই কঠিন। বুঝলি?"

হাজী সাহেব বেরোবার জন্য পা বাড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে নয়মোন তাঁর হাত ধরে মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "বড্ড রোদ। একটু বসেন। একটু শরবৎ করে দিই। খান দিনি। অ্যাকটা কথা আছে।"

হাজী সাহেবকে হাত ধরে টেনে এনে খাটে বসিয়ে রেখে নয়মোন শরবৎ আনতে দৌড দিলেন। এবং একটু পরেই এক গেলাস মিছরির পানার মধ্যে গন্ধরাজ লেবুর পাতা ফেলে হাজী সাহেবের হাতে দিলেন। বললেন, "আজ তো নাস্তাউ খালেন না।"

হাজী সাহেব ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে বেশ আয়েশ করে শরবৎ শেষ কবলেন। তারপর মুখ মুছে জিজ্ঞেস করলেন, "কি জ্যানো কথা আছে কোলি?"

নয়মোন হাসলেন। "বিয়াই বাড়ি তো পুকুর নেই?"

"না। সেই কথাই তো কোচ্ছি।"

"গাঙউ তো অনেক দূর?"

"বেশ দূর, বে—শ দূর।"

"বাড়িতি খালি কুয়ো?"

"হ্যাঁ, খালি কুয়ো। ছবি তো কুয়োর পানি গায়ে কোনোদিন ঢালিছে বলে মনে পড়ে না। অ্যাখন ঐ পানি গায়ে ঢালবে আর অসুখ বাধাবে। কুয়োর পানি ঢাললি অসুখ বিসুখ করবে না? তুই-ই-ক?"

"তালি আপনি অ্যাক কাম করেন", নয়মোন গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিলেন, "শুধু হাতে বিয়াই বাড়ি না যায়ে, হয় খিড়কির পুকুরডারে আর না হয় গাঙডারে হাতে করে নিয়ে যান।"

হাজী সাহেব গরম হয়ে বললেন, "তুই কি আমার সঙ্গে অ্যাখন মস্করা কত্তি বসলি?"

নয়মোন বললেন, "আমার সঙ্গে না হয় অন্য সম্পক্কো। কিন্তু বিয়ানির সঙ্গে তো আপনার সেই ঠাট্টার সম্পক্কো। তিনি যদি এই কথাডা জিজ্ঞেস করেন তো তখন কী জবাব দেবেন?"

এতক্ষণে হাজী সাহেবের মাথায় ঢুকল যে অযথা উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি কত বড় অ্যাকটা আজগুবি কাজ করতে যাচ্ছিলেন। সত্যিই তো, তাগের বাড়ি যে পানি আছে তাগের বউরি গোসল কত্তি তো সেই পানিই দেবে। নাঃ, আমি অ্যাকডা আস্ত উজবুগ। হাজী সাহেব কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "তালি পিরেনডা খুলেই ফেলি, কী কোস?"

"তাই করেন।" নয়মোন বলল, "আর দ্যাখেন, ছবির জন্যি উতলা হবেন না। ও য্যামন আমাগের মেয়ে তেমনি ওগেরউ তো বউ। উরা য্যামন পারে তেমন করেই ওরে রাখবে। তা ছাড়া ছবি এখেনকার বাইরির সুখ যেভাবে ঠেলে ফেলে ওর খসমের কষ্টের সংসারে চলে গ্যালো, খুব কম মেয়েই এ সাহস দ্যাখাতি পারে। এই আক্কেল ওরে আল্লাহই দেছেন। তিনিই ওগের হেফাজত করবেন। আমি আপনি ভাবে মরি ক্যান?"

"সিডা যা কইছিস।" হাজী সাহেব পিরেন খুলতে খুলতে বললেন, "তোর য্যামন কড়া জান, তোর মেয়েউ সেই রকম হইছে। যা ভালো বোঝবে, তাই ধরে থাকবে। আলহামদো লিল্লাহ।"

"বসেন। বড্ড ঘামতিছেন, এট্টু বাতাস করি।" নয়মোন পাখা নাড়তে লাগলেন।

"তুই য্যামন হাসিনা", হাজী সাহেব বললেন, "তোর মেয়েউ তেমনি হবে।"

"আল্লাহ য্যানো তাই করেন।" অ্যাতক্ষণে নয়মোনের চোখে পানি দেখা দিল।

॥ ২৮ ॥

হেঁটে গেলে ফটিকদের গ্রাম বিলকিসদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু গাড়ির রাস্তায় বেশ খানিকটা ঘুর পড়ে। ফটিক পারতপক্ষে মোষের বা গোরুর গাড়ির সওয়ার হতে চায় না। হাঁটতেই সে পছন্দ করে। দা'রেপুরে চাকরি নেবার পর একখানা সাইকেল কিনেছিল। সুশীল দরজির সেকেনড হ্যানড হামবারখানা। সে ঠিক করেছিল গাড়িতে জিনিস যাবে আর ছবি। সে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেই যাবে। কিন্তু ছবি যখন ছই-এর মধ্যে ঢুকে পলকের জন্য একবার ওর দিকে চাইল, ফটিক তখন আর ছবির নীরব আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারল না। ছবি ছই-এর মধ্যে উঠে যেতেই নফরা কাল বিলম্ব না করেই "উর্রির গুটি" বলে একটা ডাক ছেড়ে মোষের

কাঁধে গাড়ি জুতে দিল। হাজী সাহেব হাঁ হাঁ করে নফরার দিকে ছুটে এলেন।

"বিটা কি আক্কেলের মাথা গুলে খাইছিস? না কী? অ্যাঁ!" হাজী সাহেব ধমক দিলেন।

নফরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠল, "জে?"

"জে কীরে ব্যাটা, জে কী?" হাজী সাহেব খুব চোটপাট শুরু করে দিলেন, "আক্কেলডারে রাখিছিস কনে? জামাই বাপ গাড়িতি উঠলো না আর তুই গাড়ি জুতে দিলি?"

এই সময় বিলকিসের ডাগর দুটি চোখে ফুটে উঠল প্রবল আকর্ষণ।

হাজী সাহেব ধমক দিলেন, "গাড়ি নামা। বাপেরে উঠাতি দে।"

ফটিক বলল, "জে গাড়ি আর খুলতে হবে না। আমি উঠছি।"

সে অনায়াসে গাড়িতে উঠে ছই-এর মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এবং একটু ফাঁক রেখেই দুজনে বসে ছিল।

দাউদের বাড়ি ছাড়াতে না ছাড়াতেই গাড়ির ঝাঁকুনিতে দুজনের মধ্যে আর কোনও ব্যবধান রইল না। ফটিক ছবির দিকে চাইল। ছবি মালপত্রে ঠাসা ছই-এর ফাঁক দিয়ে তখন এক দৃষ্টিতে ওদের বাড়ির দিকে চেয়ে আছে।

ফুটকি ওর চুল বেঁধে দিতে দিতে বলল, "আমি যে ভুল করিছি ছবি, তুই যে তা করিসনি, খুউব ভালো করিছিস। খসমই মেয়েগের আসল জিনিস। কক্ষনো তার কাছছাড়া হতি নেই।"

নয়মোন এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ও শাউড়ি, কী প'রে যাতি চাও, মণি?"

ফুটকি বলল, "বুবু, ওর তো একখান রেশমী শাড়ি আছে, সেইখেন বের করে আমারে দ্যাও, ওরে অ্যাকবার সাজায়ে দ্যাখায়ে দিই।"

নয়মোন বললেন, "তালি তাই বের করে আ'নে দিই?"

"না", ছবি দৃঢ়স্বরে আপত্তি করল, "রেশমী শাড়ি না। উডা বাড়িতিই থাক। আমি পরে যাবো না।"

"শাড়ি পরবি নে?" ফুটকি বলল, "তালি কী পরবি? কুর্তা আর ইজের?"

নয়মোন জিজ্ঞাসু চোখে ছবির দিকে চাইলেন।

বিলকিস বলল, "বউবিটি শোনো।" নয়মোন কাছে আসতেই সে ফিসফিস করে বলল, "আমি ভাবতিছি, শাউড়ি যে শাড়িডা সিবাব দিয়ে গিছিলেন, সেই শাড়িডেই পরব। তুমি কি কও?"

নয়মোন নিজেই এবার বিস্মিত হলেন। বললেন, "খুবই বুঝমানের মত কথাডা কইছ বিটি। আল্লাহ তুমার এই আক্কেল চিরকাল য্যানো রাখেন।"

বিশ্বেস পাড়ার ভিতরে ঢুকেই গাড়ি রাস্তার গর্তে এমনই টাল খেয়ে গেল যে বিলকিস একেবারে ফটিকের গায়ের উপর এসে পড়ল। সামলে বসতে না বসতেই আরেকটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে এবার ফটিকই ছবির গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। ছবির মুখের বিষন্নভাব এতক্ষণে কাটতে লাগল। সে ফটিকের মুখের দিকে চাইল। সেখানে একটা প্রসন্নতা বিরাজ করছে দেখে ছবি খুশি হল।

ফিসফিস করে টগরদের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "ঐটে আমার সেই গুলাপফুলির বাড়ি।" দুটো খেঁকি কুকুর ওদের গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করতে করতে কিছুটা এগিয়ে চলল।

ফটিক বলল, "তাই বল। তোমার গোলাপফুল বোধ হয় কুকুর দুটোকে সেইজন্যেই রাস্তায় বসিয়ে রেখেছিল। তুমি যে চলে যাচ্ছ ওরা বোধ হয় সেই কথাটা জানিয়ে দিচ্ছে।"

বিলকিস ম্লান হাসল। হাজী বাড়িটা বেশ পিছিয়ে পড়েছে। আর দেখা যায় না।

দাদী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমাগের কথা ভাবে মন খারাপ করবা না। অ্যাখন খালি ভাববা তুমার খসম মিঞা কিসি খুশি হবে। মণি, মনে রাখবা তুমি মুসলমানের বিটি, তুমার সব কামের বড় কাম সোয়ামীর খেদমত করা আর তারে খুশি রাখা। আমাগের রসুল কয়েছেন যে খোদা ছাড়া আর কারুরি যদি সেজদা করা দুরুস্ত থা'কতো তালি আমি নিশ্চয়ই মেয়েগের কতাম, যাও আপন আপন সোয়ামিরি সেজদা (গড় হয়ে প্রণাম) কর। তা'লিই বুঝে দ্যাখ, সোয়ামি কত বড়। আল্লাহ তুমাগের এই জুড়ার উপর তাঁর সব বরকত য্যানো ঢালে দ্যান।"

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা, নিজির থে য্যানো, কখনো এ বাড়িতি আসার জন্যি কোঁট ধ'রে না। নাতিন জামাই নিজির থে আসতি কলি তখন আসবা। বুঝিছ?" বুড়ি ছবির চোখ মুছিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "মেয়েগের দেল মণি, শাঁখের করাত, আসতিউ কাটে, যাতিউ কাটে। এ অ্যাক আজব নদী, এপার ওপার দুই পারের জন্যিই চোখির পানি ঝরে। আল্লাহ।"

বাড়ি গিয়েই প্রথম কাজ, ফটিক ঠিক করল, নিজের ঘরটা সাফ করা। কিন্তু সমস্যা হল অত কুণ্টা সরাবে কোথায়? আজ না হয় বারান্দাতেই রেখে দেবে। কিন্তু ঘরটা যে কি অবস্থায় আছে, তাই তো সে জানে না। নাঃ ঝোঁকের মাথায় মেয়েটার কথায় রাজী হয়ে গিয়ে খুব বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি ফটিক। ছবিকে তার আরও বোঝানো উচিত ছিল।

ফটিকের মুখখানা মনে পড়ল ছবির। খুবই ভালো করিছিস ছবি, জানিস। খসমরে ছাড়ে থাকার মতো বুকামি আর নেই। আমি বুকা, খুবই বুকা। বুঝলি ছবি। তোর রাঙা ভাইর সংগে সংগে আমারউ থাকা উচিত ছিল। তুমি যেখেনে আমিউ সেখেনে। তুমি যা খাবা আমিউ তাই খাবো। আমারে য্যামনভাবে রাখবা ত্যামনভাবেই থাকবো। আমি যদি পেরথমের থেই এই বুঝি চলতাম তা'লি আর আমার অ্যামন হাল হতো না। ইবার আর আমি পাছ ছাড়তিছি নে। তুমি যেখেনে যাবা, আমিউ সেখেনে যাবো। তোর খুব বুদ্ধি ছবি। আল্লাহ তোরে কোনও কষ্ট দেবে না, দেখিস।

এইটুকু মেয়ের অ্যাতো মনের জোর কোত্থেকে আসে? ফটিক অবাক হয়ে বিলকিসের ছোট্টখাট্ট চেহারাটা মাঝে মাঝে দেখছিল। ছই-এর ঐ নিবিড় পরিবেশে এইযে যে শরীরটা গাড়ির ঝাকুনিতে অনবরত দুলছে, যে দেহটা থেকে অগুরুর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, যাকে গত রাত্রে একটা পরিণত নারী বলে মনে হয়েছিল, আজকে এখন দিনের আলোতে তাকে কেমন যেন ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ এক অসহায় বালিকা বলেই বোধ হচ্ছে। বাড়ির কথা ভাবছে। কিন্তু আশ্চর্য! ঐ মেয়েই আজ সকালে কী খেলটাই না দেখাল। সকলের মত আদায় করে ছাড়ল।

"কী, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?" ছবিকে ফটিকের খুব ভালো লাগছে।

ফটিকের দিকে দুটো করুণ চোখ তুলে বিলকিস চাইল। "আব্বাজান" ছবি বলল, "কখনোই আমারে ছাড়ে থাকেননি।"

ছবির মা! হাঁক ডাকে বাড়ি সরগরম করে তুলছিলেন হাজী সাহেব। ছবির সব গোছগাছ করে দিছিস তো? ঐ বড় পোটম্যানটো, উডা যে পড়ে থা'কলো। কী মুশকিল! তুরা করিস কী? নফরা আ!

জে! বলে নফরালি সংগে সংগে হাজির।

ছবির জন্যি সখ করে বোমবাইর থে পোটম্যানটো কিনে আনলাম। তা নবাবজাদার সিডা আর গাড়িতি তুল্যার হুঁশ হলো না।

জে, আমি উডা—

জে ফে না, আমি ওসব জে ফে বুঝিনে। তোল, উডা গাড়িতি তোল!

নয়মোন বিবি গোলমাল শুনে সেদিকে এগিয়ে এলেন এবং হাজী সাহেবকে এই বলে নিবৃত্ত করলেন যে ফটিক ওটা এখন নিতে চাইল না। ওর ঘরে ধরবে না।

আর খাট? সিডা দিছিস তো? না কি সিডাউ নেবে না?

নয়মোন বললেন, অ্যাখন ওসব না নেওয়াই জামাইর ইচ্ছে। সেইজন্যই ছবির সংগে বেশী জিনিস দেওয়া গেল না।

তালি নেবেডা কী? বিটি শুধু হাতে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠবে? তোগের হিসেবডা কী ক তো শুনি?

নয়মোন বললেন, সবই তো ওগের। উরা য্যামন সুবিধে বোঝবে, আ'সে নিয়ে যাবে।

ছবি দেখল তার বাবা ও, বলে মুখখানা কালো করে দহলিজে গিয়ে বসলেন।

ফটিকের দিকে চেয়ে বলল, "আব্বারই কষ্ট হবে।" ওর চোখ ছলছল করে উঠল।

"তোমার বাবা আমাকে জিয়াফৎ খাওয়াতে চাইলেন। তা মেয়ে কী হুঁশিয়ার! বাপের পয়সা বাঁচাবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে পড়িমরি দিল দৌড়।"

গাড়ি বুনো পাড়ার উপর দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। এবং বড় রাস্তায় উঠবার জন্য নফরা মোষ দুটোকে নানাবিধ শব্দের দ্বারা তাড়না করতে লাগল। ছবি কী যেন একটা বলতে গেল এবং সেই সময় ভ'ক ভ'ক করে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ঝিনেদার বাসখানা বেরিয়ে গেল এবং আচমকা ভয় পেয়ে নফরার মোষ দুটো গাড়ি সমেত হুড়মুড় করে মাঠে নেমে গেল। গাড়ির জিনিসপত্র ছত্রাখান হয়ে গেল। ছবি ও ফটিক জড়াজড়ি করে এ ওর ঘাড়ের উপর পড়ল। দাদীজান বিলকিসকে বিদেশ সফরে যাওয়ার দোয়াটা তার যাত্রা করার আগে পড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে পথে কোনো বিপদ আপদ না হয়। "আমার সমস্ত কাজ, জান, মাল আল্লাহ তায়ালার প্রতি সোপর্দ করিলাম। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার বান্দাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।" আয়াতুল্ কুরসিও ছবিকে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর "আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছি। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে না। সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই"—এই দোয়াটাও পাঠ করে দাদীজানের নির্দেশে তাকে ডান পাটা আগে বাড়িয়ে যাত্রা করতে হয়েছিল। গাড়ির মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে সেটা তার মনে পড়ল। তাই হয়ত ফটিকের মাথার সংগে বিলকিসের মাথাটা ঠক করে ঠুকেই ফাঁড়াটা কেটে গেল। ফটিকের ব্যাজার মুখে মাথায় হাত বুলোতে দেখে বিলকিস নিজের ব্যথা ভুলে গেল এবং খিলখিল করে হেসে উঠল। দেখাদেখি ফটিকও।

নফরা মোষ দুটোকে প্রাণান্ত পরিশ্রমে বাগে এনে যখন গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় উঠাতে যাবে তখন শুনল ছই-এর ভিতরে মিঞা-বিবি হাসতে শুরু করেছেন।

নফরা কৈফিয়ৎ দিল। "মোষির দোষ নেই, ঐ শালা মটোরের আচমকা ভ'ক ভ'ক হরন্ শুনে ঘাবড়ায়ে গেছে। এরকম এলেমদার মোষ আপনি এদিগরে পাবেন না।"

নফরার কথা শুনে মিঞা-বিবি আবার হাসে ওঠলেন। তার মানে আমার কথা বিশ্বাস হ'লো না। নফরা মনে মনে গরম হয়ে গেল। সে হঠাৎ তারস্বরে "রা গুট, হুর্‌র্‌র্ হা হা" বলে দুটো মোষের পেটে পা দিয়ে ঠোক্কর মেরে তাদের লেজে দিল মোচড়। সঙ্গে সঙ্গে মোষ দুটো প্রচন্ড তেজে দিল দৌড় এবং অতি দ্রুত খাড়া ঢাল বেয়ে মাঠ থেকে রাস্তায় গাড়ি তুলে ফেলল। ফলে গাড়ি হঠাৎ ওল্‌লা হয়ে যাওয়ায় ফটিক আর ছবি সামলাতে না পেরে আবার এ ওর ঘাড়ে পড়ে পিছনে গড়িয়ে গেল।

কোনও রকমে সামলে নিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, "নফর মিঞার মোষ এরকম এলেম আরও দেখাবে নাকি?"

নফর নিতান্ত ভালোমানুষের মত বলল, "জে না। বড় রাস্তা তো অ্যাকেবারে ঘরের মা'ঝের মত পেলেন, উ'চু নীচু আর নেই তো। গ'ড় খাওয়ার ভয় আর নেই।"

দাদীজান বিলকিসের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মণিরে, আ'জ কটা কথা কই, খিয়াল রা'খো। অ্যাকদিন এজিদ আনছারিয়ার বিটি আছমা মেয়েগের তরফের থে হজরত রছুলুল্লোর খেদমতে আ'সে আরজ ক'রল, ইয়া রসুলুল্লাহ! পুরুষরা কত কী করে ছওয়াব পায়। তাগের জন্যি জুম্মা, জামায়াত, ঈদ, বিমারপোরছি, জানাজা, হজ, ওমরা আরও কত রকম নেকি কাজ আছে এবং এই সব কাজ হাসিল করে তারা আমাগের চাইতি কত বেশী ছওয়াব আদায় করে আর আমাগের ব্যালায এই সব ছওয়াব পাওয়ার জো নেই ক্যান? কী আমরা করলি আমরা তা পাবো? হজরত সে-কথার জবাবে কলেন, "হে আছমা। তুমি চলে যাও আর মেয়েগের ডাকে ডাকে এই কথা শুনোয়ে দ্যাও যে তারা যদি তাগের সোয়ামীগেরে খুশী করবার আর সোয়ামীর মর্জি অনুযায়ী তার পায়রবী করে তা হলিই তারা ঐ রকম সব কাজের মতই ছওয়াব পাবে।"

দাদীজানের বলিরেখা অঙ্কিত প্রশান্ত মুখখানা সেই গাড়ির ছই-এর মধ্যেই ছবির চোখে ভেসে উঠল। এবং তার স্নেহজড়িত কন্ঠস্বর।

মণি রে! তবে শোনঃ "হাদিছ শরীফ আছে, কোনও এক সাহাবার প্রশ্নের উত্তরে হজরত রসুল ফরমাইয়াছেন," দাদীজান মাঝে মধ্যে একেবারে কেতাবের কথা আউড়ে যান, "হাসি মুখের বা চক্ষের ভ্রূকুটির দ্বারা অথবা কোনও কঠোর আদেশ পালন হেতু কিংবা স্বামীর জান ও মালের হেফাজাত করিয়া যে স্ত্রী তাহার স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছে তাহাকেই হাছিনা ও নেক্‌কার আওরত বলা হইয়া থাকে।"

আব্বার মলিন মুখটা ভেসে উঠল। মন খারাপ কখনও কববা না। বুঝিছ। এই তো এই গিরাম আর ঐ গিরাম। ধাত্ত গোল এ-পাড়া আর ও-পাড়া। অ্যাঁ মনে করবা য্যানো এ বাড়ি আর ও বাড়ি। আব্বাজানের মুখটা ক্রমশ ওর কানের কাছে এগিয়ে এল তার গলার আওয়াজটাও ফিসফিস করতে শুরু করল, বিটি তুমার বাক্‌সে অ্যাকটা জিনিস পাবা। উডা তুমার। তুমার যা মর্জি হবে উডা দিয়ে তাই করবা। তারপর একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে আওয়াজটা চড়িয়ে বললেন, আর হ্যাঁ, তুমার শ্বশুরির শাউড়ির যত্ন করবা। আর হ্যাঁ মোটেউ মন খারাপ করবা না। উডাউ তুমার বাড়ি ইডাউ তুমার বাড়ি। বুঝিছ।

বিলকিসের চোখ ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। মুখগুলো আর তেমন সাফ দেখাচ্ছে না। আমিউ ইবার তোর রাঙা ভাইর সঙ্গে মোকামে চলে যাবো। বুঝলি ছবি। কাল রাত্তিরি আমার বুকি মুখ রাখে খুব কাঁদিছে। কোয়েছে আমার উপর অ্যাতদিন ধরে যা অবিচার করিছে তার জন্যিই আল্লাহ নাকি তোর রাঙা ভাইরি কাল হুশিয়ার করে দেছেন। কাল রাত্তির ক্যাবল কাঁদিছে আর আদর করিছে। কোয়েছে, অ্যাকা থাকলিই নাকি ওর ঘাড়ে শয়তান আসে ভর করে। আর তখন যত খারাপ কাজ করে ফ্যালে। আমি আর ওরে অ্যাকা ছাড়তিছি নে। এ ভুল আর না। ইবার আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব ছবি। আর ওকে ছাড়ে থাকব না।

মোছফেকাডা ভারি শয়তান। ওর মুখি কিছু আর আটকায় না। বাইরি আব্বা ঘুরাঘুরি কত্তিছেন, দাদীজানের ঘর ভর্তি। ছুটকি ফুটকি, ওগের দুই শাউড়ি। লোকে অ্যাকেবারে গিজগিজ কত্তিছে। তার মধ্যি মোছফেকা চোখ মুছতিছে আর ধরা গলায় কোয়ে উঠল, বিবি! বাড়িখান তো খালি করে চলে যাতিছ। যাতিছ যাও। কিন্তু কোলে অ্যাকডারে নিয়ে ফিরে আসা চাই। আর অমনি সবাই মিলে ঠিক কোয়েছে, ঠিক কোয়েছে মোছফেকা এই বলে অ্যাকেবারে কলকলিয়ে উঠল। ঝপ করে বিলকিসের মুখে যেন সব রক্ত এসে জমা হল। ওর মাথাটা প্রায় মাটিতে ঝুকে পড়ল। অসভ্য। অ্যাকা পালি আজ ওরে দ্যাখায়ে দিতাম মজা।

কত্তাবিবি বললেন, মোছফেকার দেখি আর তর সয় না। ও ব্যানো ঘুড়ায় জিন আঁটেই রাখিছে। সবাই হেসে উঠল।

বিলকিস, কথাটা মনে পড়তেই, এখনও লজ্জা পেল। কথাটা যদি ফটিকির কানে যা'তো?

কী ভাবতো। ছি ছি। ওর মুখে গরমের হল্‌কা লাগল। আড়চোখে দেখল ফটিকও তলিয়ে গিয়েছে কোনও গভীর ভাবনার তলায়।

ফটিক ভাবছিল বিলকিস তার দুঃখের ভাগ নিতে চায়। তাই সে জোর করে তার সঙ্গে চলে এল। কী জোর মেয়েটার মনে। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারল না। কিন্তু এটাও ঠিক যে বিলকিস তার সমস্যা এবং কাজ দুই-ই বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনই তার রোজগার করা দরকার। এবং এই রোজগারের উপায় যদি ওকালতি হয় তবে তার মত মুরুব্বিহীন লোকের পসার জমাতে এবং সেই পয়সায় সংসার চালাতে কবে যে ফটিক সমর্থ হবে তা সে জানে না। ততদিন চলবে কি করে? কোনও কূল কিনারা দেখতে পেল না ফটিক। বিলকিসের দিকে আড়চোখে চাইল। বিলকিস ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছে। মুখটা থমথম করছে। চোখটা ছলছল। আহা, ও বাড়ির কথা ভাবছে। ফটিকের খুব মায়া হল। এই মেয়েটার সঙ্গে কী আশ্চর্যভাবেই না তার জীবনটা জড়িয়ে গেল। বিলকিসকে হঠাৎ তার খুব আদর করার ইচ্ছে হল। কিন্তু একে মোষের গাড়ি, তায় দিনের বেলা। ফটিক আত্মসম্বরণ করল। তবে হ্যাঁ, ফটিক ঠিক করল, বিলকিসকে সে পড়াবে। প্রথমে ম্যাট্রিক, তারপর আই এ, এ দুটো সে তার বিবিকে পাশ দেওয়াবেই। তারপর দেখা যাবে। ছবির যে-রকম প্রখর বোধ ও বুদ্ধি এবং ওর হস্তাক্ষর যে-রকম পরিচ্ছন্ন তাতে মনে হয় ওর সব কাজে যত্ন আছে। ছবি পারবে। প্রাইভেট পাশ দেওয়া এমন কিছুই শক্ত নয়।

ছবির সঙ্গে ফটিকের হঠাৎ খুব কথা বলতে ইচ্ছে হল। "বলল, জানো ছবি, আমি তোমাকে পড়াবো।"

কথাটা বিলকিসের কানে ঢুকল না। সে তখন ভাবনার তলায় ডুব-সাঁতার কেটে বউবিবিকে খুঁজছে।

"জানো ছবি, আমাদের সমাজে মেয়েদের এই যে দাবিয়ে রাখা হয়, ভাব দেখে মনে হয় তারা যেন সব কেনা বাঁদী, তাদের যেন আর ব্যক্তিত্ব থাকতে নেই, তাদের যেন আর আলাদা ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে নেই, মেয়েরা যেন মানুষ নয়। আমার এটা আদৌ পছন্দ নয়, জানো। আমি তোমাকে পুরো সুযোগ দেব, তুমি নিজে আপন গুণে দাঁড়াবে এবং অন্য মেয়েদের জাগাবার চেষ্টা করবে। নিজে শিখবে, পরে অন্যদের শেখাবে। ইশকুলে টীচারও হতে পারো। আমাদের মধ্যে অজ্ঞতা এত বেশি, তাই আমরা এত পিছিয়ে।"

বউবিবিকে কোথাও পাচ্ছে না বিলকিস। সকাল থেকে সবাই তাকে ঘিরে আছে। কেউ তাকে প্রশংসা করলে, কেউ বা ঠাট্টা। উপদেশ দিচ্ছেন কেউ। কেউ বা ওকে বুকে টেনে নিয়ে দোয়া জানিয়েছেন আল্লাহর কাছে। কেউ চোখের পানি ফেলেছেন, কেউ হেসে হেসে তাকে সাহস দিয়েছেন। কিন্তু বউবিবির দেখা আর পাওয়াই যাচ্ছে না। তাকে সে একটুও পাচ্ছে না। ছবি একবার দেখল তার তোরঙ্গটা যত্ন করে গোছানো শেষ। যা ছবির পছন্দ, যাতে সে খুশি হয় তার সব কটা জিনিস তোরঙ্গে ভরা। এ বউবিবির কাজ। কিন্তু কোথায় বউবিবি? আব্বুর সঙ্গেও বাব কতক দেখা হয়ে গেল। একবার গিয়ে দেখল, নাস্তার সরঞ্জাম সব গোছানো রয়েছে। এবং ছবি যা খেতে ভালোবাসে, তারই প্রস্তুতির আয়োজন চলেছে। কার কাজ বুঝতে দেরি হল না। কিন্তু বউবিবি সেখানেও নেই। চরকির মত সারা বাড়ি ঘুরছে বউবিবি।

"জানো ছবি, পুরুষের আক্কেল যতটা, মেয়েদের নাকি তার অর্ধেক আক্কেল দিয়ে গড়া হয়েছে। এই ধরনের সব কথা আমার কাছে আজগুবি বলেই মনে হয়। হ্যাঁ গায়ের জোরের তারতম্য আমি স্বীকার করি। অধিকাংশ মেয়ের চাইতে পুরুষের গায়ের জোর বেশি সেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আক্কেলের বেলায় আল্লাহ মেয়ে পুরুষের মধ্যে কোন তফাৎ রাখতেই পারেন না, এটা অবিশ্যি আমার বিশ্বাস।"

নাস্তা তৈরি হয়ে যাবার পর বউবিবির দেখা পেল বিলকিস। ফটিক শুধু একটু তাগাদা দিচ্ছিল। আচমকা বিবি নিয়ে বাড়ি উঠবে, তাই একটু আগে ভাগেই বাড়ি পৌঁছুতে চাইছিল সে। বউবিবি ঠিক সময়ে নাস্তা হাজির করে দিলেন। ওরই মধ্যে কত রকম তৈরি করে দিয়েছেন। বিলকিস খেতে বসে অবাক। তার ক্ষিদে ছিল না। সে খাব না খাব না করছিল। নয়মোন মেয়ের পাশে বসে, *খাও শাউড়ি খাও। এই তো কটা মোটে জিনিস। তুমরা যে সুমায়ই দিলে না। তাই* তো পাক-সাক কিছুই করা গেল না। বিলকিস খাচ্ছে না দেখে তখন নিজেই হাত লাগালেন। বাড়ির থে এই পেরথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছ। বাসী মুখি কি কেউ যায় মণি? আমি অল্প অল্প করে মুখি তুলে দিই তুমি আস্তে আস্তে করে খায়ে ন্যাও। ও কী! না না না। চোখের পানি আক ফুটাউ ফ্যালবা না। যাতিছ খসমের বাড়ি। আজ তুমার কত খোশনসিব। মুখি হাসি ফুটোয়ে রাখবা।

"জানো ছবি, স্ত্রীলোকদের আক্কেল আর ঈমান নাকি পুরুষদের আক্কেল ও ঈমানের অর্ধেক। বেশ, এটা যদি মানতে হয়, তাহলে হজরত আয়েশা বিবির অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? তিনি রসুলের তৃতীয় বিবি, তাঁর খুবই পিয়ারের বিবি ছিলেন তো। এবং তিনি যে স্ত্রীলোক একথা কেউ তো অস্বীকার করেননি। তবে? তাঁর আক্কেল উপরের হিসেব অনুযায়ী পুরুষের অর্ধেক হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু ইমাম জাহরী রমণীকুলরত্ন এই আয়েশা বিবি সম্পর্কে কী লিখেছেন জানো? তিনি বলেছেন, যদি সমস্ত পুরুষ এবং হজরতের স্ত্রীগণের জ্ঞান একত্র করা

যায়, তাহা হইলেও আয়েশার জ্ঞানের পরিমাণই অধিক হইবে। জানো, প্রখর স্মরণশক্তি বলে ২২১০টি হাদিছ আয়েশা বিবি বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ১৭৫টি হাদিছ সম্পর্কে মুসলিম জগতের দুইজন প্রধান পণ্ডিত ইমাম মুসলিম আর ইমাম বোখারী একমত। আর আলাদা করে ইমাম বোখারী ৫৪টি হাদিছ এবং ইমাম মুসলিম ৬৮টি হাদিছ সমর্থন করেছেন। কারও কারও মতে ইসলাম বিধির এক চতুর্থাংশই বিবি আয়েশার বর্ণনা প্রসূত। জানো তিরমিজি গ্রন্থে, বিবি আয়েশার জ্ঞান সম্পর্কে আবু মুসা আশায়িরী এই কথা বলেছেন, যে কোনো জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমি তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর কাছ থেকে সঠিক উত্তর আমি পেয়েছি। আর ইবনে জুবায়ের ঐ সময়ের আরেকজন পণ্ডিত, কী বলছেন শোনো? তিনি বলছেন, কোরান, ফরায়েজ, হালাল, হারাম, ফেকাহ, কবিত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, আরবের ইতিহাস, বংশতালিকা প্রভৃতির জ্ঞানে আয়েশা বিবির চাইতে অধিক জ্ঞানী আর দেখিনি।”

বিলকিস যখন বিদায় নেবার জন্য সালাম করতে গেল তখন তার দাদীজান আয়াতুল কুরসি পাঠ করে শোনালেন। তার কর্তব্যাকর্তব্য বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। আব্বাজানকে যখন সালাম করল তখন তিনি অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সামলে নিয়ে ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বলে উঠলেন, মন খারাপ করবা না। মন অ্যাকেবারেই খারাপ করবা না। এই তো এখেন থেকে এখেনে। দহলিজি দাঁড়ায়ে যদি ছবি বলে ডাক দিই তালিই তুমি শুনতি পাবা। বুঝিছ মণি, মন অ্যাকেবারেই খারাপ করবা না। দেখি গে নফরা আবার সব ঠিকঠাক করে নেচ্ছে কিনা। বলে তাড়াতাড়ি করে ওর সামনের থেকে চলে গেলেন। একমাত্র বউবিবিটিই তাকে কোনও উপদেশ দেয়নি। ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলেন। তারপর বললেন, বিয়াই-এর লুঙ্গি আর টুপি, বিয়ানির শাড়িখান মনে করে বের করে দিবা। আর বরইর শুকনো আচার আর আমসত্ব দিলাম। মনে করে খাবা। আর মনে রাখবা আজকের থে বিয়ানই হলেন গে তুমার আম্মা।

“যাদের সমাজে বিবি আয়েশার মত এমন পণ্ডিত মেয়ে জন্মায় সেই সমাজের শাস্ত্রই আবার বলে স্ত্রীলোকদের আক্কেল আর ঈমান পুরুষদের আক্কেল আর ঈমানের অর্ধেক। কী করে বলে বুঝিনে। জানো ছবি, তোমার আম্মাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।”

ফটিকের মুখে বউবিবিটির উল্লেখ শুনে বিলকিসের চটকা ভেঙে গেল। ও জিজ্ঞাসু চোখে তার মুখের দিকে চাইল।

ফটিক বলল, “তোমার মা অসাধারণ মহিলা। ওঁর যেমন বুদ্ধি, তেমন স্নেহ, তেমনি আবার বিবেচনা বোধ। আমার তো মনে হয় তুমিও তোমার মার মতই হবে। কেন না, তোমার আক্কেল যে অন্তত আমার আক্কেলের ডবল, সেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে।”

ছবি মুখ রাঙা করে বলল, “যাঃ!”

নফর “ঠা ঠা” আওয়াজ করে গাড়ি একেবারে ফটিকদের সদরে রুখে দিল। তারপর নেমে গাড়িটা মোষের কাঁধ থেকে যত্ন করে নামাল। ফটিক হাত ধরে ছবিকে ছই-এর ভিতর থেকে বের করছে, এমন সময় চাঁদবিবি দরজায় এসে উঁকি দিল। প্রথমে অবাক। যেন স্বপ্ন দেখছে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। আর তারপরই উল্লাসের এক চিৎকার, “ইয়া আল্লা, ও ফটিকির বাপ, শিগগির আসেন, দ্যাখেন আসে আমাগের বাড়িতি কারা আইছে। আমাগের ফটিক বাপ, কারে আনিছে।”

বলেই দৌড়ে গিয়ে ছবিকে জড়িয়ে ধরলেন। সাজ্জাদও বেরিয়ে এল। আর জ্বর নেই। তবে দুর্বল। অত্যন্ত খুশি হয়ে বললে, “আসো আসো বিটি আসো।” ছবি শ্বশুর শাশুড়িকে সালাম করল।

নফর ইতস্তত করে ফটিকের বাপকে একটা সালাম করল। তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল, “জে এই জিনিসপত্তর, এগুলো সব অ্যাখন রাখি কনে?”

সাজ্জাদ কি বলতে যাচ্ছিল, ফটিক বলল, “বাজান আপনি ভিতরে যান, আমি সব ব্যবস্থা করছি।”

ফটিক নফরকে বলল, “মেহেরবানি করে একটু হাত লাগাও তো নফর মিঞা। জিনিসগুলো আমরা ভিতরে নিয়ে রাখি।”

ওরা দুজনে মিলে জিনিসপত্র সবই আপাতত ফটিকের ঘরের বারান্দায় নিয়ে রাখল। চাঁদবিবি ছবিকে নিয়ে তার ঘরে তুলল। তার মুখে যত হাসি, চোখে তত পানি।

“আসো বউ, আসো। বাঁচে থাকো। খোদার বরকত তুমাগের জুড়ার উপর হামেশাই বজায় থাক। কর্তাবিবির খবর ভালো তো? বিয়ানির খবর ভালো তো? বিয়াইর খবর ভালো তো? তুমি যে বিটি অ্যাত তাড়াতাড়ি আসে পড়বা, এ আমি ভাবতিউ পারিনি। আমার ঘরে যে আসমানের চাঁদ সত্যিই আসে উদয় হবে, এ আমি ভাবতিউ পারিনি।” চাঁদবিবি কেবল চোখ মুছতে লাগল। “আল্লা তুমাগের শান্তি আর সুখি রাখুন।”

চাঁদবিবি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে মেঝের একখানা পাটি পাড়ল। বলল, “বসো বউ, বসো।” একটা পাখা নিয়ে ছবিকে বাতাস করতে লাগল। ছবি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে প্রবল আপত্তি করল। বলল, “আম্মাজান, আমারে দ্যান, পাখাডা আমারে দ্যান।”

চাঁদবিবি কাঁদতে শুরু করলেন, "আমার ফটিক, মানুষ হবে, আমার ফটিক বড় হবে, আমার ফটিক পাশ দেবে, উকিল হবে, আমার ফটিকির শাদী হবে অ্যামন চাঁদপারা বিটি আসবে আমার, এ আমি ভাবতিউ পারিনি। আমার নসিবি অ্যাত সুখ ন্যাকা আছে, এ আমি ভাবতিউ পারিনি।" চাঁদবিবি কাঁদতে লাগল। "আল্লা তুমাগের খুশ হালে রাখুন। তুমাগের জোড় আল্লাহই বানাইছেন। তুমাগের উপর তাঁর রহমত পড়ুক।" চাঁদবিবি কাঁদছে।

সাজ্জাদ ডাক দিল, "ঐ ফটিকির মা, এট্টু বাইরি আয় দিন।"

চাঁদবিবি চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এল। সাজ্জাদ বলল, "এট্টু তামাক সাজ।"

চাঁদবিবি তামাক সেজে হুকোটা সাজ্জাদকে দিল। সাজ্জাদ ফস ফস করে বেশ কষে গোটা কতক টান দিয়ে চাঁদবিবির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, "ইদিকি আয়। এখেনে বোস। বিটারে তো কোলি বিটার বউরি আনতি। তোর ছাওয়াল তো পত্তরপাঠ তার আম্মার হুকুম তামিল করলো। ইবার?"

চাঁদবিবি বলল, "বড় সোন্দর বউখান হইছে গো ফটিকির বাপ। আমরা য্যাখন দেখতি গিছিলাম অ্যাখন তার চাইতি আরউ সোন্দর হইছে। বিটির মুখি অ্যামনই মায়া যে অ্যাকবার তাকালি আর চোখ ফিরোনো যায় না। আমি তো ভাবিছিলাম, আমার ফটিকির য্যামন ভাবগতিক দিন রাত মুখি বই গুঁজে আছে ওর বোধ হয় আর শাদী হবেই না। দেলের আগুন দেলেই পুষে রাখি। আপনারে মাঝে মধ্যে কই তা আপনি ক্যাবল কন ছবুর কর ছবুর কর। আমি ভাবিছিলাম আমার ফটিকির শাদী আর হবেই না। আমার ফটিক বাপের জেন্দগী ঐ বই মুখি দিয়েই কাটবে। আল্লারে ডাকে কই, আল্লাহ অমরা তো অ্যাত দুঃখি কষ্টেও তুমার রাস্তা ছাড়িনি, অ্যাক দুখিনী মায়ের অ্যাকটা খায়েশ মিটোয়ে দ্যাও। বুড়ো হয়ে গালাম। ইবার বাড়িতি অ্যাকটা বউ আনে দ্যাও। ছম ছম করে বাড়িময় ঘুরুক ফিরুক আমরা বুড়োবুড়ি দেখি আর তুমার মেহেরবানির কথা মনে করি।" চাঁদবিবি কাঁদতে লাগল।

"তা আল্লা তো তোর মনের খায়েশ মিটোয়ে দেছেন। তালি আর কাঁদতি বসলি ক্যান?" সাজ্জাদ হুঁকোতে আরও গোটা কতক টান দিল।

চাঁদবিবি চোখ মুছল। "কাঁদতিছি কনে। দেলে যে কী হতিছে, ক্যামন করে আপনারে কব?"

সাজ্জাদ বলল, "প্যানপ্যানানি থামা। ইবার কি হবে তাই ক? তোর ছাওয়াল তো বলা নেই কওয়া নেই বিয়াইর বিটিরি হুট করে আনে হাজির করল? য্যামন তোর আক্কেল ত্যামন তোর ছাওয়ালের।"

চাঁদবিবি বলল, "ইডা আবার ক্যামন কথা কলেন আপনি? বউ কি চিরকাল বিয়াইবাড়ি পড়ে থাকবে?"

সাজ্জাদ বলল, "ধুত্তো! কথা বোঝবে না, সোজবে না খালি চ্যাঁচাবে।"

সাজ্জাদ নিজের ঘরের দিকে চেয়ে ইশারা করে বোঝাল যে ঘরে বউ আমার কাছে সরে আয়।

চাঁদবিবি সাজ্জাদের গা ঘেঁষে বসলে, সাজ্জাদ ফিসফিস করে বলল, "বউরি অ্যাখন থাকতি দিবি কনে। ওগের তো অ্যাকটা ঘর চাই। ফটিক বাপের ঘরটায় তো কুষ্টা বুঝাই।"

চাঁদবিবি অ্যাতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল। বুঝেই আকাশ থেকে পড়ল।

"ও ফটিকির বাপ। তালি অ্যাখন কী হবে?"

"দ্যাখ ভাবতিছি কুষ্টাগুলো বেচে দিই। দাম কিছুই পাবো না।" সাজ্জাদ হুঁকো টানতে টানতে বলল। "ঐ আগরওয়ালা বিটার খপ্পরেই শেষ পর্যন্ত পড়তি হলো। কিন্তু উপায় কী? ওগের ঘরটা তো খালি হোক আগে। পরির কথা পরি ভাবা যাবে। এটটু পানি খাওয়া।"

"বিয়াইর বিটি ঘরে আলো, তারে অ্যাখন খাতি দিই কী?" চাঁদবিবি জিজ্ঞেস করল।

"উডা তোর ভাবনা তুই ভাব।" সাজ্জাদ ব্যস্ত হয়ে বলল। "দে দে পানি দে। আমি আমার কামডা সারে আসি।"

ফটিক মালপত্তর বারান্দায় ডাঁই করে রেখে নফরকে খেয়ে যেতে বলল। সে কিছুতেই রাজি হল না। ছবির সঙ্গে দেখা করে এবং সবাইকে সালাম জানিয়ে দ্রুত গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই সে দেখল তার বাজান গাড়ি ভিতরে এনেছে আর তার মা মাথায় করে তার ঘরের থেকে কুষ্টা এনে গাড়িতে রাখছে। ফটিক মুহূর্তমাত্র দেরি না করে কুষ্টা বইতে লাগল। ওর মা একবার আপত্তি করতে গেল, সাজ্জাদ ইশারায় বারণ করল। অনেকদিনের অনভ্যাস। তবু ফটিক কুষ্টার মোট বইতে বইতে হঠাৎ বোধ করতে থাকল, সে আবার যেন তার সংসারে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পাচ্ছে। সে এই বাড়িরই ছেলে।

ফটিক ঘামতে ঘামতে বলল, "আব্বাজান, এই কাজটা আমি করি। তুই বরং তোর বউ-এর কাছে যা।" একটু পরে সাজ্জাদ গাড়ি বোঝাই পাট নিয়ে হাটের আড়তে চলে গেল।

হঠাৎ চাঁদবিবির মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। সে ফটিক আর ছবিকে বলল, "তুরা ততক্ষণ একটু জিরো। আমি এই আলাম বলে। যাবো আর আসবো।"

চাঁদবিবি অনেকদিন আগে একবার দেওয়ান-বাড়ি ধান ভানতে গিয়ে হালুয়া খেয়েছিল।

কর্তাবুড়ি বলেছিলেন, অমন সুন্দর জিনিস নাকি সুজি দিয়ে তৈরি। কী সুন্দর তার সোয়াদ। আজও তার জিভে তা লেগে রয়েছে। আজ তার বাড়িতে প্রথম বউ এসেছে। বউ-এর মুখে সেই হালুয়া সে তুলে দেবে। হাজীর মেয়ে কত ভালমন্দ খায়। গরিব শ্বশুরবাড়ি প্রথম দিন তার বউ এসে যা তা মুখে দেবে, চাঁদবিবি তা হতে দেবে না। রান্নাঘরে ঢুকে সে সাত রাজার ধন মাণিক একটা টিনের কৌটো বের করল। বছর চারেক আগে সে সুজি জোগাড় করে রেখেছিল ছেলেকে হালুয়া খাওয়াবে বলে। খুলে দেখে সে সুজি দলা পাকিয়ে গিয়েছে। কৌটোটা আর একটা কলাই করা বাটি পেট কোঁচড়ে বেঁধে নিল। তারপর ভালো দেখে দুটো কদু নিল। তারপর চৈত্রের সেই গনগনে রোদে মাঠের পথ দিয়ে ছুটল দেওয়ানবাড়ির কর্তাবুড়ির কাছে।

॥ ২৯ ॥

পাটের মহাজন আগরওয়ালার আড়তে এই অসময়ে, বলা নেই কওয়া নেই, সাজ্জাদ মোল্লা গাড়ি বোঝাই পাট নিয়ে হাজির হওয়াতে আগরওয়ালা একটু অবাক হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করল না। বরং বেশ খাতিরই করল। "বড় মিঞা" বলে কথা বলল, মুসলমানের হুঁকোয় তামাক খাওয়াল। এবং তার চাইতেও আশ্চর্য, এক কথায় পাট কিনতে রাজী হয়ে গেল আগরওয়ালা। ওরা বলে, মাড়োবাবু। তার যত পাট আছে সব কিনতে চাইল। সাজ্জাদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, ফটিকের ঘরটা সে আজই খালি করে দিতে পারবে। ছাওয়ালের কাণ্ডই অদ্ভুত। কোনও তাল পায় না সাজ্জাদ। কেমন হুট করে বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকল। ঘরের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে কালকের মত যদি আবার দমকা মারে তবেই তো চিত্তির। হয়তো হুড়মুড় করে পড়েই যাবে। বউ আনবে এ কথা ফটিক বলে গেলে সে ব্যবস্থা করে রাখতো। সাজ্জাদ জানে দায় তার, তাই দরদাম সম্পর্কে উচ্চবাচ্য কিছু করল না।

শুধু বলল, "দামটা আজ দিতি পারবেন তো মারোয়াড়ী বাবু?"

"না কেনো পারবো, বোড়ো মিঞা?" আগরওয়ালা বলল, "শও মণ দেড়শ মণ হবে তো আপনার মেহেরবানি, আখুনই দিতে পারবো। বেশী হোবে তো থোড়া মুশকিল হোবে। তা সে বেওস্থাও আমি কোরে দিব। আপনি বাড়ি যান। অউর পাট নিয়ে আসুন।"

সাজ্জাদ গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে ঢুকে দ্যাখে ফটিক খালি গায়ে ঘর থেকে সব কুষ্টা বাইরের বারান্দায় এনে ডাঁই করে রেখেছে।

ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ কণ্ঠে সাজ্জাদ বলল, "দে বাপ কুষ্টাগুলো গাড়িতি তুলে দে। নসিব ভালোই কতি হবে। সব কুষ্টা নিয়ে নেবে কোয়েছে।"

সাজ্জাদ বারান্দায় গিয়ে বসে হাঁফাতে লাগল। তারপর হাঁক দিল, "ও ফটিকির মা। এট্টু পানি দে যা।"

ছবি তাড়াতাড়ি একটা গেলাস মেজে কুয়োর থেকে পানি তুলে সাজ্জাদকে খেতে দিল। গুড়ও খানিকটা ওরই সংগে এনে দিল।

"আ—রে বিটি! কী কাণ্ড করিছে দ্যাখ।" সাজ্জাদ হইহই করে উঠল। "বিয়ানির বিটি পানি চালি সংগে গুড়উ দ্যায়। ও ফটিকির মা। দ্যাখ, দ্যাখ আ'সে।" সাজ্জাদের খুশি আর ধরে না।

বিলকিস লজ্জায় ছুটে পালাল। সাজ্জাদ হাসতে লাগল। ঘামে ভিজে হাঁফাতে হাঁফাতে চাঁদবিবি বাড়িতে ঢুকল। হাতে কলাপাতায় মোড়া বাটি।

"আপনি আ'সে পড়িছেন। আমার এট্টু দেরি হয়ে গেল।"

"কনে গিছিলি তুই?" সাজ্জাদ ওকে দেখে অবাক হ'ল। "আমি আরউ তোরে ডাকে মত্তিছি।"

চাঁদবিবি বারান্দায় উঠে সাজ্জাদের পাশে গিয়ে বসল। তারপর উত্তেজিত হয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এই দ্যাখেন।"

বাটিটা খুলে সাজ্জাদকে বলল, "কী সোন্দর হালুয়া, কী সোন্দর বাস দেখেন। ঠাকরেন বুড়ি গাওয়া ঘি দিয়ে বানায়ে দেছেন। বউ এ বাড়ি এই পেরথম আ'লো। যা-তা তো আর তার মুখি তুলে দেয়া যায় না। কী দিই কী দিই ভাবতি ভাবতি হালুয়ার কথা মনে আ'লো। তাই দ্যাওয়ান বাড়ি ছুটিছিলাম।"

সাজ্জাদও গলা চেপে বলল, "বউটা তো খুব ভালোই পাইছিস ফটিকির মা। আল্লা তোর আর্জি পুরো করে দেছে। তোর খায়েশ মিটোয়ে দেছে। এই দ্যাখ তোর বউর কাজ। পানি চালাম। দ্যাখ্ দিনি ঐটুকুনি মেয়ে, কিন্তুক কী সোন্দর তার আক্কেল। পানি দেলে আর তার সংগে গুড় আনে দেলে রে ফটিকির মা। যা যা বিটিরি খাতি দে। আর হ্যাঁ, এই গিলাসটা কার ক দিনি?"

চাঁদবিবি দেখেই বলল, "উডা নিশ্চয় বিয়ানির বিটির। আমি যাই, ওগের এট্টু খাতি দিই গে। আপনিউ এট্টু হালুয়া খা'য়ে যান।"

"থাম দিনি, আমায় বলে অ্যাখনই আবার মাড়োবাবুর আড়তে ছুটোতি হবে। হুঃ।"

বিলকিস এর মধ্যেই রান্নাঘরটার ভোল এমনই পালটে ফেলেছে যে চাঁদবিবি যেন চিনতেই পারে না। চাঁদবিবির রান্নাঘরে নতুন জিনিসও কম আমদানি হয়নি। আর আশ্চর্য, প্রত্যেকটা জিনিসই এমন কাজের যে দেখলে মনে হয় এখান থেকে কেউ বুঝি সেগুলোর জন্য ফরমায়েশ পাঠিয়েছিল।

"হ্যাঁ গো বিটি", চাঁদবিবি সরল মনে জিজ্ঞেস করল, "ফটিক যায়ে বুঝি এসব ফরমায়েশ করিছে?"

বিলকিস সলজ্জভাবে বলল, "তা ক্যান? আপনার বিয়ানই ওসব পাঠায়ে দেছে। কোয়েছে, খবরটবর না দিয়েই যাতিছ, এইগুলো সব নিয়ে যাও, না হলি বিয়ান মুশকিলি পড়ে যাবেন।"

"আহা", বিলকিসকে বুকে চেপে ধরে চাঁদবিবি চোখের জল ফেলতে লাগলেন, "ঘ্যামন আমার বিয়ান, তেমনি আমার বউ। বিটির মুখখানা শুকোয়ে গেছে। বিটির আমার ক্ষিধে পায়েছে গো। নিচ্চয় ক্ষিধে লাগিছে। আসো বিটি, এট্টু হালুয়া খাও।"

বিলকিস বলল, "আম্মা, আমরা নাস্তা করেই আইছি। বরং আপনি আর আব্বাজান, আপনাগের দুজনের কিছুই খাওয়া হয়নি। আপনারাই খান।"

"পাগল বিটি কয় কী?" চাঁদবিবি বললেন, "বাড়ীতি নতুন বউ আলো, সে থাকলো পড়ে আর আমরা বুড়োবুড়ি তারে ফেলে দাড়ি জুবড়োয়ে খাতি বসি, না?"

বিলকিস অত্যন্ত কাতর হয়ে বলে উঠল, "আমার অ্যাখন এট্টুও ক্ষিধে নেই। অ্যাখন আর খাব না।"

চাঁদবিবির সব উৎসাহ নিবে গেল। অ্যাত ছুটোছুটি, অ্যাত হয়রানি সব বৃথা হল! চাঁদবিবির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

করুণভাবে আবেদন করল, "খাবা না! ও বউ, সত্যিই খাবা না!"

বিলকিস্ শাশুড়ীর চোখমুখের বিচলিত অবস্থা দেখে বুঝতে পারল, ওভাবে বলা তার উচিত হয়নি। সে চাঁদবিবিকে জড়িয়ে ধরল।

আবদারের সুরে বলল, "আম্মাজান, আসেন তালি, আমরা সবাই মিলে খাই।"

পাট সব বের হয়ে গেলে ফটিক এবড়োথেবড়ো মেঝেটার দিকে চেয়ে বুঝলো কাজ এখনও ঢের বাকি। পাটের ফেঁসোয় ঘর ভরতি। মেঝেয় বড় বড় গর্ত। ইঁদুরের না সাপের কে জানে? ওর খাটটা আছে বটে, তবে কুন্টার চাপে পায়াগুলো নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। পাট বইবার পরিশ্রমে ওর ঘুম এসে যাচ্ছিল। ছবির একটা পাগলামোকে ও পাত্তা দেয়নি। ছবি ওর সঙ্গে পাট বইতে চাইছিল। ও দেয়নি। ধমকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। তারপর থেকে ছবির রাগ হয়েছিল। কিছুক্ষণ সে এদিক ওদিক ঘুরল। তারপর রান্নাঘরে চলে গেল।

ফটিক পাটের ফেঁসোগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে দলা পাকাল, তারপর সেই দলাগুলো গর্ত-গুলোর মধ্যে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দিল। তারপর খানিকটা কেরোসিন জোগাড় করে এনে তাই একটু একটু করে গর্তে ঢেলে ঢেলে পাটের দলাগুলোকে ভিজিয়ে নিয়ে গর্তগুলোয় আগুন ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর মাটির ঢেলা জাগাড় করে ঘরের মেঝেতে এনে ডাঁই করে রাখল। বিলকিস ঘরের ভিতর আগুন দেখে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

ফটিক ছবিকে বলল, "বিবিজান, অ্যাখন কিছু সময় আর ওদিকে যাবেন না। সাপ ব্যাঙ, ঐসব গর্তে কী আছে আর কী নেই, তা তো জানিনে। কিন্তু যাই থাক, আগুনের তাতে, আশা করি, পালিয়ে যাবে। তারপর আমি গর্তগুলো ভালো করে বুজিয়ে দিই, তারপর আপনি ঘরে গিয়ে ঢুকবেন, কেমন?"

"তালি আপনি ঢোকছেন ক্যান?" বিলকিস উদ্বিগ্ন হয়ে ওর দিকে চাইল। "বিপদ তো আপনারউ হতি পারে। আপনিউ ঢোকবেন না।"

ফটিক হাসল। "আমি আর ঢুকছি কোথায়? আগুন নিবলে, তখন সাবধানে ঢুকব।"

শেষ গাড়ি পাট মারোয়াড়ী মহাজনের আড়তে ঢেলে দিয়ে টাকার তোড়া কোমরে বেঁধে নিয়ে সাজ্জাদ যখন গাড়িতে উঠল, তখন জোহরের সময় হয়ে গিয়েছে। সে গাড়িটা ঘুরিয়ে নদীর ধারে নিয়ে গেল। একটা বটগাছের ছায়ায় গাড়িটা খুলে রেখে ঘাটে নেমে ওজু করল। তারপর ছায়ায় গাড়ির কাছে এসে কাঁধের গামছা মাটিতে বিছিয়ে তার উপরেই জোহরের নামাজটা সেরে নিল। তারপর দুটো হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে মোনাজাত করতে লাগল, "হে খোদাতা'লা! তুমি আমাকে ইহকালে নেয়ামত এবং পরকালে বেহেশ্‌ত প্রদান কর।" গুয়ে-মাছি গায়ে-পিঠে এবং নাকে-মুখে উড়ে উড়ে বসে বড় উৎপাত করছিল। "আর দোজখের অগ্নি হইতে বাঁচাও। আর তোমার রহমতের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ মখলুখ হজরত মোহাম্মদ এবং তাঁহার পরিজন ও সমস্ত আসহাবগণকে অনুগ্রহ কর। হে করুণাময় ও পরম দয়ালু।"

মাছিগুলো বড্ড বিরক্ত করছিল। তাকে মনঃসংযোগ করতে দিচ্ছিল না, এই মাছির কামড়। কিন্তু শুধুই কি মাছি? বশির সরদারের মুখখানাও কি কম বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

“হে খোদাতালা! তুমি আমাকে ও আমার পিতা, মাতা, ওস্তাদ, পীর, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন এবং সমস্ত মোমেন, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন ও মরিয়া গিয়াছেন, সমস্তকে তোমার অনুগ্রহের দ্বারা মার্জনা করিয়া দাও। নিশ্চয়ই তুমিই প্রার্থনা গ্রহণকারী।”

নাঃ! বশিরের বাড়িটা ঘুরেই যাই। মোনাজাত শেষ করেই উঠে পড়ল সাজ্জাদ। টাকা পেয়ে সে ভেবেছিল বেটার বউ-এর জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু বশিরের মুখটা মনে পড়াতে সাজ্জাদের সব আহ্লাদ আলুনী হয়ে গেল। ফটিক বউটাকে হুট করে এনে ফেলায় সে প্রথমে অপ্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু বিয়াই-এর বিটির ব্যবহারে সে আজ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঠিক মালোয়ারির জ্বরটা আসার মুখে যেমন একটা সুন্দর রিমঝিম ভাব শরীরে জাগে, যেটা ঠিক বোঝানো যায় না, হাজীর বিটি ঘরে আসবার পর থেকে তার মনে তেমনই একটা আহ্লাদের ঢেউ বারবার জেগে উঠছিল। বেশ ভালো লাগছিল তার। মা'ড়োবাবুর আড়তে সে গাড়ির পর গাড়ি পাট গস্ত করে দিল। কত দাম পাবে সে তা হিসেব করেনি। জানতেও চায়নি। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ছাওয়ালের শোবার ঘরটা খালি করে দেওয়া। সাজ্জাদ জানতো, অ্যাখন করা যায় না। হাঁস শালা ঝাঁকি মা'রে মা'রে মেহনত করবে আর ডিম খাবে দারোগাবাবু! এ ব্যাপারে কথাই কইবে না। মেন্দা বিদ্রূপ করবে। এই হাটে সেইজন্যই মা'ড়োবাবুর উপরই সে এত ভরসা করেছিল। দাম ভাল দিক না-দিক একমাত্র মা'ড়োবাবুই সব সময় পাট কেনে। তাই সে এখেনেই এসেছিল। আর মা'ড়োবাবু যখন দাম ধরল, তখনই সে অবাক হ'ল। এবার পাটের বাজার বেশ মন্দা ছিল। গত বছরের চাইতেও খারাপ। আর আড়তদারেরাও সব যেন ষড় করেছিল। তিন টাকা মণ, তাও দিতে চায়নি। তার উপর ঢলতার পরিমাণ মণে পাঁচ সের, ফড়েদের দস্তুরি টাকায় আট পাই, আড়তদারদের, বিশেষত হিন্দু আড়তদারদের টাকায় চার পাই করে ঈশ্বরবৃত্তি আদায় সাজ্জাদদের খেপিয়ে তুলেছিল। বশির আর সাজ্জাদ চাষীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, বেচো না পাট। বাড়ি নিয়ে চল। সবাই সাজ্জাদকে জিজ্ঞেস করেছিল, খাবো কী? খাজনা দেবো কেমন করে? মহাজনের দেনা শুধবার উপায় কী হবে? একটা কথার জবাবও দিতে পারেনি সাজ্জাদ। বশিরও না। ওদের চোখের সামনে দিয়ে ফড়েরা অনিচ্ছুক, মনে মনে ক্রুদ্ধ এবং অসহায় চাষীদের যখন একজনের পর একজনকে ধরে ধরে বিভিন্ন আড়তে নিয়ে ঢুকোতে লাগল, তখন সাজ্জাদের মনে হতে লাগল খে'কশিয়াল বুঝি হাঁসগুলোর টু'টি টিপে ধরে নিয়ে চলেছে।

সবাই গেল। শেষ পর্যন্ত গেল না শুধু সাজ্জাদ আর তার দেখাদেখি বশির।

তুই যে গেলি না বড়?

আমি না মুসলমান! আল্লার নামে কসম খাইছি, এই দামে পাট ব্যাচবো না।

খাবি কি? খাজনা দিবি ক্যামন ক'রে? মহাজনের দেনা তোরে শুধতি হবে না?

অতশত বুঝি নে। তুমি যা করবা, আমিউ তাই করব।

দ্যাখ বশির, আমার ছাওয়াল-পাওয়াল-এর ঝঞ্ঝাট নেই, তোর আছে। তুই ভা'বে দ্যাখ।

বশির বলল, আমরা যদ্দিন চাচা এইরকম আলাদা আলাদা থাকব, তদ্দিন এই আড়তগুলো আমাগের ঘাড় মটকাবে। আমরা মেহনত করব আর ঐ শালারা তার রস চুষে খাবে, এ আর সহ্য করা যায় না। হাঁস শালা ঝাঁকি মা'রে মা'রে মেহনত করবে আর ডিম খাবে দারোগাবাবু! এ অশৈলে আর সয় না।

দ্যাখ বশির, বুঝি তো সব। আমাগের দিয়ে কি জোট বাঁধা কখনও হবে! এ যায় এদিক তো ও যায় ওদিক।

চিন্তা তো কত্তি হবে চাচা। চল বাড়ি যাই। পাট আর চষব না।

না, পাট আর চষব না। চল, যাই।

বশির আর সাজ্জাদ গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি এসেছিল। হাটময় কথাটা রটে গিয়েছিল। ওরা পাট বেচেনি। সাজ্জাদকে আজও বেচতেও হত না, যদি না ফটিক এমন দুম করে বউ নিয়ে এসে পড়ত।

মা'ড়োবাবু তাকে সব থেকে বেশী দাম দিয়েছে। গত মরসুমে সব থেকে ভালো পাটের দাম ছিল তিন টাকা তের আনা। সাজ্জাদের সব পাট ঐ দরেই কিনে নিয়েছে আগরওয়ালা। ঈশ্বরবৃত্তি কেটে নেয়নি, ফড়ের দস্তুরি লাগেনি।

আড়তের গোমস্তা ট্যারা ভট্‌চায্‌ বিস্ময় দমন করতে না পেরে বলেই ফেলল, “এই পাটের কি এই দাম হয় চৌতিবাবু?”

চৈত্‌রাম আগরওয়ালা হাসতে হাসতে বললেন, “কেনো না হোবে? বোড়ো মিঞা নেয্যো দাম পাবার জোন্যে সোব চাষীকে একাঠ্‌টা কোরবার চিন্টা কোরেছিলেন। সিবার কেউ উনার কোথা মানতে পারেনি। কিন্তু বোড়ো মিঞা নিজের থিকে পাট বেচতে এসেছেন আথুন, আমার কাছে নেয্যো পাবেন তো খুশি হোয়ে চলে যাবেন, আর সকলকে এই কোথা ভি বোলে দেবেন কি মা'ড়োবাবু নেয্যো দামেই পাট কিনে। সত্যো কোথা কিনা বোড়ো মিঞা বোলেন?”

সাজ্জাদকে সে-কথা স্বীকার করতেই হ'ল। এবং এও বুঝে গেল, তার এই পাট বিক্রির কথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হবে না। ঘাড় নিচু করে ভাবতে ভাবতে চলেছিল সাজ্জাদ। তার গাড়িও

চলেছিল অতি ঢিমে তালে। কী আশ্চর্য কথা? সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে সাজ্জাদ লাঙল ঠেলছে, আজ তার প্রায় গোরে যাবার সময় হল, এই দীর্ঘদিনের মধ্যে তার দিন আনা দিন খাই, এই ভাবটা আর গেল না। বরং যত দিন যাচ্ছে তত তার ঋণ বাড়ছে। গত দু বছর খাজনা দেবার টাকাও হাতে ছিল না। পাট চাষ করলে আজ ক' বছর ধরে খরচ উঠছে না। দাম না পেয়ে ওরা বোকার মত আরও বেশী কুষ্টা বুনছে আর তত বেশী কষ্ট বাড়ছে ওদের। ঋণে জড়িয়ে যাচ্ছে। জমিদারের ঋণ, মহাজনের ঋণ সবই বেড়ে চলেছে। তারা ডুবছে আর আড়তদারের পয়সা রাখার জায়গা হচ্ছে না। পঁতে কুণ্ডু এখন কুণ্ডুবাবু। হাটে এর মধ্যেই পাকা দালান গেঁথে ফেলেছে। এই পাট বেচে। আগে ছিল ফড়ে। এখন এই ক' বছরের মধ্যে, বড় আড়তদার। সুন্দর এক কাপড়ের দোকান করেছে। দরজিও বসিয়েছে। কেরাসিন তেলেরও আড়তদারি নিয়েছে। ঘরবাড়ি তৈরির যাবতীয় জিনিসের পেল্লায় এক দোকান করেছে। কী করে করল? সাহারা ফেঁপে উঠছে। বিশ্বেসবাবুদের দোতলা উঠছে। আগরওয়ালার যে কত কারবার তার ঠিক নেই। ওরা যে এত সব করছে তার মূলে পাটের টাকাই তো প্রধান। তবে? যে কুষ্টার পয়সায় হিন্দুরা সব ফেঁপে উঠছে, সেই কুষ্টাই তাহলে ওদের কেন ঋণে জড়িয়ে ফেলছে? কী আশ্চর্য! আমরাই কুষ্টার চাষ করি, কুষ্টা কাটি, কুষ্টা পচাতি যায়ে আমাগেরই হাত পা পচে, কুষ্টা ধুতি যায়ে আমাগেরই হাতে পায়ে হাজা হয়, আর আমাগের প্যাটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। ভালো রে ভালো। এ তো রগড় কম নয়। আমি তো আমার খাটুনিতি ফাঁকি দিই নে, খোদা জানে, তা'লি আমার জমি-জিরেত ঋণের দায়ে বেহাত হয়ে যাচ্ছে ক্যান্? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর পায় না সাজ্জাদ। তাই, এই বৃদ্ধ বয়সেও তার মাঝে মাঝে বেজায় রাগ চড়ে যায়। আসলে রাগটা হয় তার নিজের উপর। এবং সেই অন্ধ রাগ তখন সব কিছু ভেঙে ফেলতে চায়।

আজ এখন সাজ্জাদের শরীরে ঐ রকম একটা রাগ ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল। মাড়োবাবু কেন তাকে মৌখিক অত খাতির দেখাল এবং তার পাটগুলোর জন্য 'নেয্যো' দাম না চাইতেই দিল, সাজ্জাদ ধীরভাবে চিন্তা করে ক্রমশ বুঝতে পারল। ও আর বশির যে চাষীদের কুষ্টার চাষ কমিয়ে দেবার জন্য তাতাচ্ছে, পাটের একটা ন্যায্য দামের সীমা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে এবং তাই নিয়ে বৈঠক করছে চাষীদের সঙ্গে, এ খবরটা বোধ হয় মাড়োবাবুর কানে পোঁছোয়ে গেছে। তাই অ্যাত খাতির। মতলবটা বুঝতে পারছে না সাজ্জাদ। তার একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

ফটিক ঘরের মেঝের গাড়া-গর্ত সব বুজিয়ে চান করতে গেল। বিলকিসকে চাঁদবিবি কিছুতেই ঘরের মেঝে লেপতে দেবে না, বিলকিসও ছাড়বে না।

চাঁদবিবি যত বলে, "বিটি, তোর অমন সোন্দর হাত নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বুড়ো মাগী বাঁচে আছি, আর তুই কাঁচ মেয়ে তোরে মা'ঝে মুছাতি হবে, ক্যান্, আমার গতরখানা কি পড়ে গিয়েছে?"

বিলকিস বলল, "আম্মাজান, আচ্ছা আমি শুধু ভিতরটা লেপি, আপনি ডুয়াডারে লেপে দেন। আমার মোমের হাত না যে এইটুকু কাজ কত্তি যায়ে তা গ'লি যাবে।"

অবশেষে তাই সাব্যস্ত হল। ফটিক এসে দেখে মায়ে-বউয়ে ঘর লেপতে লেগে গিয়েছে। ছবি ঘর লেপছে উবু হয়ে বসে। ওর শরীরটা নড়ছে চড়ছে, এদিক ওদিক দুলছে। ফটিক সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। এক ফাঁকে ওর দিকে বিলকিসের নজর পড়ল। প্রথমে সে লজ্জা পেল। তারপর ফটিকের দিকে চেয়ে হাসল। বিলকিসের ছোট্ট মুখখানা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। মুখে ঈষৎ ক্লান্তির ছাপ। তার মধ্যে এক টুকরো তাজা হাসি ফুটে উঠে ফটিকের শরীরে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলল। বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। চাঁদবিবি ডুয়া লেপে উপরে উঠে গেল এবং বউ-এর কাজ দেখে খুবই খুশি হল।

বলল, "বেশ হইছে। ভালো হইছে খুউব। যাও বিটি ইবার এট্টু জিরোয়ে ন্যাও। তারপর তুমি গোসল কোরে আ'সে ঘরখানা গুছোতি থাকো, আমিউ গোসল সা'রে রান্নার জুগাড় দেখি।"

বিলকিস চাঁদবিবির সঙ্গে কুয়োতলার দিকে চলে গেল। পরিশ্রান্ত ফটিক দাওয়ায় একটা মাদুর আর বালিশ নিয়ে শুয়ে পাখা নেড়ে বাতাস খাচ্ছিল। ওর মনে বেশ একটা ফুর্তি-ফুর্তি ভাব। ছবি কাজের ভয় করে না। সেটা ফটিকের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। বেশ গরম লাগছে। বেশ ঘাম হচ্ছে। প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে তার তবুও গায়ে লাগেনি। অনেক দিন পরে ফটিক নিজেকে অবসাদমুক্ত মনে করল। ছবির জন্য। ছবিই তাকে নতুন করে শক্তি যোগাচ্ছে। তাকে কেমন তাজা করে তুলছে। অথচ ছবি যখন আসতে চেয়েছিল, কাল রাতে, সে চমকে গিয়েছিল, বিব্রত হয়ে উঠেছিল।

এই ছবিকে সে আনতেই চায়নি। আহাম্মক! এই ছবিকে শাদি করে সে চলে গিয়েছিল। তিন বছর খোঁজ নেয়নি। আহাম্মক! কী করে সম্ভব হল যে, ছবিকে তার মনে পড়েনি! আহাম্মক! কুয়োতলা থেকে শাশুড়ী বউ-এর গুনগুনানি ভেসে আসছে। গতকাল সে এই বাড়িতে এসে যতটা অস্বস্তি বোধ করেছিল; আজ তা একেবারেই নেই। এ তার বাড়ি। তার বাপ তার মা তার বিবি। ভাবতেই বেশ ভালো লাগছে তার। কোথায় আর যাবে সে? এইখানেই পড়ে থাক।

কোথায় আর যাবে সে? শহরে? কেন? ওকালতি করবে? কেন? আবার ঝুঁকি নেবে? আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে অনিশ্চয়তার মধ্যে? কী দরকার?

দরকার নেই? বাঃ! ওকালতি যদি না কর, তোমার চলবে কি করে?

চলবে কি করে মানে? শ্বশুরের ব্যবসা দেখব। লোকটার বয়েস হয়েছে। তাঁর এখন লোক দরকার। তাঁর মনে মনে খুব ইচ্ছে, জামাই এসে তাঁর সঙ্গে লাগুক। ব্যবসাটা বড় হোক তাঁর। মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু আমি জানি তাঁর মনের ইচ্ছে কী?

তুমি ব্যবসা করবে!

আশ্চর্য হবার কী আছে? আজ আমাদের মুসলমানদের এত দুরবস্থা কেন? কারণ জমি চষা ছাড়া আর কোনও কাজ তারা করে না। তারা চাকরিতে ঢুকতে পারে না, চাকরির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্র তো সীমাহীন সমুদ্র। ইসলামের জয়যাত্রা সওদাগররাই তো সহজ করেছে। কোরানে আল্লাহতা'লা পাক কি এরশাদ করেন নি যে, "কেনা-বেচা তোমাদিগের জন্য হালাল করা হইল এবং সুদকে হারাম করা হইল।" তবে?

চাঁদবিবি আর ছবি এসে দেখল ফটিক অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সাজ্জাদের মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। হায় আল্লা! সে যেন মা'ড়োবাবুর মতলব এতক্ষণে ধরতে পারল। পাটের দাম কমতে কমতে এখন যেখেনে নেমেছে চাষীরা যদি এই দামই মুখ বুজে মানে নেয় তো তারা ফোঁৎ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা নানা গ্রামে শুরু হয়েছে। কথাটা নিজেগের মধ্যিই চলছিল অ্যাদ্দিন। কিন্তু সে আর বশির, অন্য কাউকেই সিবার ফিরোতি পারেনি। কিন্তু নিজেরাই যে পাট না বেচে গাড়ি ফিরিয়ে এনেছিল, এইটেই রটতে রটতে নানা দিকে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। মধুপুরি রটেছে যে মুসলমান চাষীদের কাছ থেকে হিন্দু আড়তদাররা জবরদস্তি করে যে ঈশ্বরবৃত্তি কেটে নেয় গুপালপুরির হাটে তারই প্রতিবাদে মুসলমান চাষীরা পাট বেচেনি। আঠারোখাদায় আরেকরকম রটেছে। দা'য়েপুরে নাকি রটেছে যে মাল যখন মহাজনেই কেনছে তখন ফড়ের দস্তুরি চাষীরি দিতি হবে ক্যান, সে দস্তুরি মহাজন দিক। এই নিয়েই নাকি চাষীরা কুষ্টা ফেরত নিয়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা গুপালপুরির হাটের চাষীরা কুষ্টা বেচোতি আ'সেও কুষ্টা ফেরত নিয়ে বাড়ি গিয়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদে, এই অবিশ্বাস্য কাহিনী চতুর্দিকে রটে যায়। এবং তারপর দু-একটা মোকাম থেকে আড়তদারদের কাছে ছোটখাট হাঙ্গামার খবরও এসেছে।

বশিরের কাছে প্রজা পার্টির এক মাতব্বর নাকি এসেছিল। সে কোয়ে গেছে পাট চাষের আগের থেই যদি বুঝোনো যায়, কুষ্টা বুনা কমায়ে দ্যাও তা'লি ভাল দাম পাবা। বশির ইবার সেই কাজেই লা'গে গেছে। পাছে সাজ্জাদও ঐ দলে ভিড়ে যায়, তার পথ বন্ধ করার জনিই মা'ড়োবাবু এই কাজ করিছে। সাজ্জাদরে তার হাতে রাখার চিন্তা।

সাজ্জাদ বশিরদের পাড়ার দিকে গাড়ির মুখ ফেরাল।

ঘরটা শুকিয়ে যেতেই বিলকিস ওর ঘরটায় ঢুকল। খুবই ছোট্ট ঘর। সারা ঘরে কুষ্টার গন্ধ ছড়ানো। ও ফটিকের নড়বড়ে খাটের উপর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মাথার উপর তখ্‌খক্‌ তখ্‌খক্‌ ডাক শুনে বেজায় চমকে উপরে দিকে চাইতেই ছবি দেখল দুটো চোখ আড়ার উপর থেকে ওর দিকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে। বিলকিস পরিত্রাহি চীৎকার দিয়ে ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল। চাঁদবিবি ছুটে এল "ভয় কী, ও বিটি ভয় কী" বলতে বলতে। ফটিকও আচমকা ঘুম ভেঙে "কী হল, কী হল" বলে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ওরা দুজনেই দেখল, ছবি খুঁটি ধরে কাঁপছে। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। বিলকিস চাঁদবিবিকে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল। চাঁদবিবি টের পেল ওর ছোট্ট বুকটা ভয়ে ধুকপুক করছে।

চাঁদবিবি এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল "কী হইছে, ও বিটি কী হইছে?"

এমন সময় ফটিকের ঘরের ভিতর থেকে তখ্‌খক্‌ তখ্‌খক ডাক শোনা গেল।

বিলকিস চাঁদবিবিকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে বলল, "ঐ ঐ!"

চাঁদবিবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ওরে বিটি, ও তো তক্ষক। ওতে ভয় কী? ও কাটে না।"

ফটিক হাসল। বলল, "তুই যা। তোর বউর ভয় আমি সারিয়ে দিচ্ছি। ব্বাপ্‌, আমি আরও ভাবলাম কী না কী হয়েছে।"

চাঁদবিবি চলে যেতেই ফটিক বলল, "ও তো তক্ষক। ও ক্ষতি করে না। চলো দেখবে চলো।"

বিলকিস "না" বলেই শাশুড়ীর কাছে পালিয়ে যাচ্ছিল। ফটিক ধরে ফেলল।

বলল, "ভয় কী? চলো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বিলকিস বলল, “না। দ্যাখব না।”

ফটিক বলল, “না, কেন? দেখবে চলো ভয় কেটে যাবে।”

বিলকিস বলল, “বিচ্ছিরি চিহারা!”

ফটিক বলল, “সে তো আমারও। তা হলে আমাকেও, বলো, দেখবে না?”

বিলকিস বলল, “আমি তা কইছি বুঝি।”

ফটিক বলল, “বলতে আর কতক্ষণ। তক্ষক বিচ্ছিরি, তাকে দেখব না। তুমি বিচ্ছিরি, তোমাকেও দেখব না। বলে দিলেই হ'ল।”

“আপনি আর তক্ষক, অ্যাক হলেন?”

“কতটা তফাত সেইটেই তো দেখাতে চাইছি। না দেখলে কী করে বুঝা যাবে। চল।”

ফটিক বিলকিসের হাত শক্ত করে চেপে ধরে একটা টান দিল। বিলকিস হাসল। বলল, “না।”

ফটিক বলল, “আমি তো সঙ্গে আছি। তবু ভয়?”

বিলকিস ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকেই চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল।

“চোখ খোল।” বিলকিস মাথা নাড়ল। ফটিক এদিক ওদিক কেউ নেই দেখে ওর সুন্দর ফুলকুঁড়ির মত বোজা চোখেব উপর আলতোভাবে ঠোঁট রাখল। বিলকিস শিউরে উঠল। তক্ষকটা ডাকল তথ্‌থক্‌ তথ্‌থক। আর বিলকিস ফটিককে জড়িয়ে ধরল প্রাণপণে। ফটিক হাসল।

“তাকাও।”

“না।” বিলকিস ফটিকের বুকে মুখটা ঠেসে ধরল।

“চেয়ে দেখ না!”

“নুনা।”

“চেয়ে দেখ,” ফটিক বলল, “সত্যি ওরা টিকটিকির মত। ক্ষতি করে না।”

“না। দ্যাখব না।” বিলকিস বলল, “আমার ভয় করে। কেমন বিচ্ছিরিভাবে তাকায়ে থাকে।”

“শুধু শুধু ভয় করলে তোমারই মুশকিল হবে। এ ঘরে আর থাকতেই পারবে না।” ফটিক বলল, “এই ভয় পুষে রাখা ঠিক নয়। আমি তোমার পাশে আছি, এখনও যদি তোমার ভয় হয়, তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে, আমার উপর তোমার ভরসা নেই।”

“আমি যেন তাই কইছি?” বিলকিস করুণভাবে ফটিকের দিকে চাইল। ছবির মুখখানা যেন হাল্কা মেঘের ওড়না ঢাকা রমজানের চাঁদ। ফটিক কষ্টে আত্মসংবরণ করল।

বলল, “তুমি খুব সুন্দর ছবি। এমনই সুন্দর যে তক্ষকও ও মুখ না দেখে পারে না। বেচারার দোষ কী?”

বিলকিস এবার হেসে ফেলল। “আপনার সব তাইতে ঠাট্টা।”

“ঠাট্টা!” ফটিক ওর চিবুক ধরে মুখখানা চালের বাতার দিকে তুলে ধরল। “বেচারা সেই যে চেয়ে আছে আর যাবার নাম নেই। নিজেই দ্যাখ।”

বিলকিসের ভয় অনেকটা কাটল। বলল, “আপনি এখেনে বসবেন এটটু? আমি ঘরখানারে গুছোয়ে ফেলি। আবার যদি কিছু বেরোয়?”

ফটিক রাজী হল। সে তার নড়বড়ে পুরনো চৌকিটাকে বোবা করবার জন্য অনেক চেষ্টা করল। তারপর হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। এপাশ ফিরলে মচ্‌ ওপাশ ফিরলে মচ্‌। ছবি ততক্ষণে তার তোরঙ্গ বিছানা সব খুলে ফেলেছে। কাপড়চোপড় কোথায় রাখবে? এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

ফটিক লক্ষ্য করছিল তাকে। বলল, “দাঁড়াও, তোমাকে দড়ি টাঙিয়ে দিই একটা।” ফটিক দড়ি আনতে বাইরে গেল। ছবি তোরঙ্গের ভিতর থেকে জিনিসপত্র বের করতে লাগল। হঠাৎ সে দেখল, একটা পোটলা। খুলে দেখল টাকা। অনেক টাকা। এ তার আব্‌বার কাজ। তার চোখ হঠাৎ জলে ভরে গেল। তথ্‌থক্‌। তথ্‌থক। আর ভয় পেল না ছবি। তার ঘরে যেন তখন আব্‌বু এসে দাঁড়িয়েছেন।

মা'ড়োবাবু যে ওরে ঘুষই দিয়েছেন, সে বিষয়ে সাজ্জাদের মনে আর কোনও সংশয় রইল না। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল, সে বশিরের সঙ্গে বেইমানি করেছে। হায় খোদা! তার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হল। বশিরের সংসারে অনেক মুখ। কত অভাব! তা সত্ত্বেও সে কুষ্টা বেচেনি। কোট ধরে পড়ে আছে। আর সে কিনা ঝোঁকের মাথায় এই কাজ করে বসল। আড়তদারগের ফাঁদে পা দিল। তারে ওবিশ্যি দাম বেশী দেছে কিছু। কিন্তু তেমনি তার মাথাডাও তো কিনে নেছে। অ্যাখন কোয়ে ব্যাড়াবে, সাজ্জাদ মোল্লা লুকোয়ে লুকোয়ে পাট বেচে গেছে। বশিররি জানানো দরকার কীভাবে ব্যাপারটা ঘটলো। ও য্যানো তারে ভুল না বোঝে।

বশিরির বাড়ির রাস্তায় গাড়ি নামিয়ে রেখে সাজ্জাদ চ্যাগারের ব্যাড়ার সামনে এসে ডাক দিল, “বশির!”

বশির বেরিয়ে এল। তার মুখে-চোখে ক্লান্তি এবং কাতরতা। একবার শূন্য চোখে সাজ্জাদের দিকে চাইল। তারপর আর্ত স্বরে বলল, "জাতউ গ্যালো চাচা, প্যাটউ ভরলো না।"

সাজ্জাদের গালে বশির যেন ঠাস করে এক চড় মারল। আঘাতটা সামলে নিতে একটু সময় নিল সাজ্জাদ। তারপর বলল, "শোন বাপ্।"

বশির সাজ্জাদকে আর এক মুহূর্ত সময় দিল না। "বাড়িতি যখন আ'সেই পড়িছ, তা'লি দেখে যাও।" বশির সাজ্জাদের হাত ধরে পাগলের মত টানতে টানতে নিয়ে গেল তার শোবার ঘরে। ওর বউ, ওর ছেলেমেয়ে সার সার সব পড়ে আছে জ্বরে। সাজ্জাদের মনে হল বশির বুঝি এক টানে একটা কবরের ঢাকনাই খুলে ধরেছে।

বলল, "দেখ চাচা, দেখে যাও। বাপ হ'য়ে খসম হ'য়ে আর কো'ট ধরি থাকতি পারলাম না চাচা। ফড়ের হাতে কুষ্টাগুলো জলের দরে তুলে দেলাম। জাতউ গ্যালো চাচা, প্যাটউ ভ'রলো না। খোদার কসম খায়ে বড় মুখ ক'রে কইছিলাম, ন্যায্য দর না উঠা পর্যন্ত কুষ্টা ব্যাচবো না।' কথা রাখতি পারলাম না চাচা। কথার খেলাপ করলাম।"

হাউহাউ করে বশির কাঁদতে লাগল। আর বুক চাপড়াতে লাগল।

সাজ্জাদ যেন কেমন হয়ে গেল।

সে কেমন অসংলগ্নভাবে বলে উঠল, "গরিবির আবার কথা, গরিবির আবার কথার খেলাপ। তুই কাঁদিস নে। এই নে, টাকা নে। যা করবার কর। আমি বাড়ি যাই। আমার বোধ হয় জ্বর আসতিছে।"

ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে এক মুঠো বশিরকে দিয়ে দিল সাজ্জাদ। কত দিল গুনেও দেখল না।

"অ্যাতগুলোন টাকা এই অসময়ে পা'লে কনে চাচা?"

সাজ্জাদ গাড়িতে উঠে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "মা'ড়োবাবুর আড়তে আমারে বেচে আলাম বাপ্। বিটা মা'ড়ো, কিনতি জানে।"

বাড়ির পথে চলতে চলতে হঠাৎ ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস, যেন শুকনো হাহাকার, বেরিয়ে এল।

॥ ৩০ ॥

দাউদ আগামী কাল মোকামে চলে যাবে। না, এবারে আর কোনও ভুল নয়। ফুটকিকে সে নিয়ে যাবে। ফুটকি কী, সেটা বোঝাবার জন্যই যে আল্লাহ্ তাকে অমন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই দাউদের। শয়তান তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। খোদা তাকে আবার তাঁর রাস্তায় ফিরিয়ে এনেছেন।

চাচার বাড়ি থেকে পথ-খরচ এবং সংসার পাতবার টাকা নিয়ে বেশ খুশি মনেই বের হল দাউদ। ওর টাটিয়ে ওঠা পা-টা যতীন ডাক্তারের ওষুধ আর ফুটকির অক্লান্ত তদবির-তদারকে সেরে গিয়েছে। কিন্তু দিন দশ বাবো কী ভোগান্তিটাই না হল! দাউদ তো জ্বরের ঘোরে কেবলই খোয়াব দেখত যে ওর পা-টা পচে গলে খসে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে সে আঁতকে উঠত। তারপর ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখত ফুটকি তাকে সেবা করছে। সাহস দিচ্ছে।

দাউদ হাজী সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল। চাচা টাকা নিতান্ত কম দেননি। ফুটকির জন্য একটা ভাল শাড়ি কিনবে সে। দাউদ হনহন করে হাটখোলায় চলল। সাগর বিশ্বেসদের দোকান থেকে একটা সুন্দর শাড়ি সে কিনবে।

দ্যাখ বাপ, তুমারে একটা কথা কই। কারবারডা মন দিয়ে করবা। আমি আর ক'দিন। আল্লার ইচ্ছেয়, এসব যদি বাঁচায়ে রাখতে পার আখেরে তুমারই সব থাকবে। আল্লার রাস্তায় যদি টাকা রোজগার কর তবে সিডা যে পরহেজগারির চাইতি কিছু কম নয় সিডা মনে রাখবা।

দাউদ পথে যেতে যেতে মনে মনে বলল, জে, মনে রাখব। আর ভুল হবে না।

অ্যাখন বাপ, তুমার বয়েস অল্প। যা করবা করো, কিন্তু কারবারডারে মা'রে কিছু করবা না। এই কথাডা সব সুমায় খিয়াল রাখো, তা'লি দ্যাখবা বাঁচে গেলে।

না, দাউদ বলল, ইবারই যথেষ্ট অক্কেল হইছে। আর না। কারবার দ্যাখব, ফুটকিরি দ্যাখব। ফুটকি যে আমার কী, ইবার সিডাউ বুঝিছি।

কাল রাতের কথা মনে পড়ল। সদ্য যেন ওদের শাদী হয়েছে। সারা রাতই কেউ ঘুমোয়নি। কোথাও যাওয়ার নাম শুনলে দাউদ এখনও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এবার সে সিরাজগঞ্জের মোকামে বসবে। জায়গাটা ওর অচেনা নয়। আগেও দু একবার গিয়েছে। সইফুল সিরাজী, সে মোকামের কারপরদাজ, তার সঙ্গেও দাউদের জানাশোনা আছে।

সইফ মিঞার ওখেনে গিয়েই ওঠবো। তারপর একটা বাসা ভাড়া কত্তি আর কতক্ষণ। ফুটকির গায়ে গা ঠেকিয়ে দাউদ উৎসাহভরে বলে উঠল।

ফুটকি মটকার জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আকাশপাতাল কী সব ভাবছিল।

দাউদ বলল, বাড়িডা বেশী বড় নেবো না। বুঝলি। আব্রুউ থাকে, আবার বেশ ছোট্টউ হয়, অ্যামন বাড়িই আমার পছন্দ।

দাউদ ফুটকির সাড়া পাচ্ছিল না। তার গায়ে সে ধাক্কা দিল।

কী রে, ঘুমোয়ে পড়লি?

না।

তা'লি? ভাবতিছিস কী? কথাবাত্তারা নেই মুখি?

আমার ক্যামন ভয় কত্তিছে।

ভয় কত্তিছে? কিসির ভয়?

আচ্ছা মটোর গাড়ীতি যায়ে যে চড়ব, য্যামন উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে দেখি, গড়ায়ে পড়ে-টড়ে যাব না তো? বাপ গড়ায়ে যদি পড়ে যাই?

গড়ায়ে যদি প'ড়ে যাই? দাউদ ওকে ভেংচে ঠাট্টা করল। তোর যত অশৈলে কথা। আর কেউ পড়বে না, তুই গড়ায়ে পড়ে যাবি।

আমি মটোরে চড়িছি কখনো? অ্যাকবার রাস্তা দিয়ে ফুফুগের পাড়ায় যাতিছিলাম, তখন আমি খুব ছোটো। পাশ দিয়ে ভ'কভ'কায়ে অ্যাকখান মটোর, উরি বাপ, কী জোরেই না বেরোয়ে গ্যালো। বাতাস লা'গে উল্টোয়ে পড়ে যাই আর কী? সেই ইস্তক মটোরের নাম শুনলি জানে বড় ভয় হয়।

তুই অ্যাকটা গাঁয়ো ভূত! মটোরেই যদি তোর অ্যাত ভয় তো রেলগাড়িতি কী করবি? সে তো আরউ জোরে যায়।

ক্যান্ নৈকোয় চ'ড়ে যাওয়া যায় না?

কন্‌কার পাগল? সিরাজগঞ্জ কি এখেনে যে নৈকোয় যাবি? নৈকোয় গেলি জম্ম কাবার হয়ে যাবে না? এখেনের থে ঝিনেদা মটোর, ঝিনেদার থে চুংগোডাংগা মটোর। চুংগোডাংগায় গেলি তবে রেলগাড়ি। বুঝলি? রেলে চড়ি পুড়াদা জং হয়ে সাড়ার পুল পার হয়ে যাতি হবে ঈশ্বরদি জং। সেখেনে না'মে আবার রেল। সিরাজগঞ্জ। সে কি এখেনে? নৈকোয় ক'রে গেলিই হ'ল? '

ফুটকির শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলেছিল, ভয় করে, বড্ড ভয় করে।

বলি তোর ভয়ডা কিসির? দাউদ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তোর কি গিরাম ছাড়ে যাতি মন সরতিছে না?

না না না। ফুটকি বলল, আপনার সংগে যাব, মন সরবে না ক্যান?

তা'লি তোর ভয়ডা কনে? দাউদ বলল। সিডা কবি তো?

ফুটকি বলল, কী জানি, ক্যান ভয় ক'ত্তিছে। আপনি গাড়িতি উঠি গ্যালেন, আমি উঠতি পারলাম না। তা'লি কি হবে?

দাউদ ফুটকিকে আদর করে কাছে টেনে এনেছিল। যত্তো তোর আজুড়ে কথা। আমি কি তোরে পথে ফ্যালায়ে যাবো?

ফুটকি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বলল, রেলের গাড়ি আমি তো দেখিনি।

ফুটকি অ্যাকেবারে গাঁয়ো ভূত। মটোর চড়েনি। রেল দ্যাখেনি। বিদেশে যায়নি। এই দুনিয়ার কিছুই দ্যাখেনি।

তুই জাহাজ দেখিছিস? দাউদ জিজ্ঞেস করেছিল।

জাহাজ? ফুটকি বলল, ন্‌না। দেখিনি।

তোরে ইবার চড়াবো। দাউদ বলল, সিরাজগঞ্জে দেখবি, নদী কারে কয়! জাহাজ আসে সেখেনে। তোরে চড়াবো।

ফুটকি দাউদের কোল ঘে'ষে এগিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, যদি জলে পড়ে যাই।

দাউদ হাসল। আসলে তার বিবি অ্যাকটা বিলাই-এর মত। একটু আদর পালিই ঘড়র ঘড়র করে। গিরামের বাইরি যে আল্লার দুনিয়া সেখেনে অ্যাকবার ভুলুকও দ্যায়নি কখনও। দাউদ ওরে যতটা পারে তা দ্যাখাবে। অ্যাখন যাবে বিশ্বেসগের দুকানে। অ্যাকখান বাহারী শাড়ি কেনবে ফুটকির জন্যি। সেখেনে যদি ভালো না পায়, কুণ্ডু বস্ত্র ভাণ্ডারে যাবে। সেখেনে যদি না পায়, তা হলি কি ঝিনেদায় যাবে? না, হাটখোলায় যা পাওয়া যায়, তাই অ্যাকখান কেনবে। বছর পাঁচেক বিয়ে হয়েছে তার। ফুটকিকে কিছুই কিনে দ্যায়নি। অথচ কত টাকাই না নষ্ট করেছে। দাউদ ঠিক করল, অ্যাকখান নয়, দুখান শাড়ি কেনবে। অবাক করে দেবে ফুটকিকে। খুউব খুশি করে দেবে।

ফুটকির সংগে তার ক্যানো যে বিরোধ হত অ্যাত, অ্যাখন তার কোনোই কারণ খুজে পাচ্ছে না দাউদ। ক্যানোই বা তাকে অ্যাত দিন কাছে নিয়ে গিয়ে রাখেনি সে? আশ্চর্য! দাউদ আসলে এরও কোনো কারণ খুজে পাচ্ছে না আজ। গোটা ব্যাপারটাই ক'দিন ধরে ভাবছে। কেবলই ভাবছে। ফুটকিকে অ্যাত দিন তার মনে হত বেয়াড়া অ্যাকটা তেজী ঘুড়া। বন্য এবং দুরন্ত এবং দুর্দান্ত। ফুটকির চালচলনে মনে হত সে য্যানো অ্যাক বেগম সাহেবা। ফুটকিকে তার বিবি বলে য্যানো মনেই হত না। গত কয়েকদিনের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতায় দাউদ বুঝতে পেরেছে ভুল, তার ধারণা কত ভুল। ফুটকি তেজী অবাধ্য ঘোড়া নয়, ফুটকি বেগম আর সে তার বান্দা নয়, অ্যামন

কি ফুটকি ত্যামন ঘাড় ত্যাড়া বিবিও নয়।

ফুটকির জন্য সে দুখান শাড়িই কিনবে। আর বাস-তেল অ্যাক শিশি। আর সাবান। হ্যাঁ, আর অ্যাক কোটো হেজলীন। আয়নাও কেনবে অ্যাকটা। আর তিনমুখো যশোরের চিরুনি। দাউদ তার ফর্দ ক্রমশ লম্বা হতে দেখে নিজের মনেই খুশি হয়ে উঠতে লাগল। ফুটকি য্যানো তার নতুন বিবি। ইবার নতুন করে ঘর পাতবে দাউদ। ওর ইচ্ছে নদীর পাড়ে ঘর ভাড়া নেয়। কি জানি কেন, নদী বেজায় ভালো লাগে দাউদের। বিশেষ করে দুর্যোগে। যখনই কোনো মোকামে থেকেছে দাউদ, চেষ্টাচরিত্র করে নদীর ধারে বাড়ি নিয়েছে। দুর্যোগের উথালপাথাল নদীর কখনও আলুথালু, কখনও হিংস্র চেহারা, দাউদকে খুব টানে। তাগের গিরামের নদী মরা। স্রোত নেই। ফুঁসে ওঠে না বর্ষায়। কুল ভাঙে না। এ নদী ভালো লাগে না দাউদের। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কী সব নদী! তার চাচা যখনই তার কাজকামে নারাজ হয়ে ডেকে এনেছেন, বসিয়ে রেখেছেন গ্রামে, তখনই নির্বাসিত লোকের মত ছটফট করেছে দাউদ। দুরন্ত নদীর জন্য সে আঁকুপাঁকু করেছে।

এখন হাটখোলার পথে যেতে যেতে দাউদ যেন মুক্তির স্বাদ পেল। এই ছোট্ট গ্রাম। বাঁধা দাগে সকলের জীবন চলে। এখানে দাউদ জীবনের কোনও বিশেষ স্বাদ পায় না। গঞ্জের জীবনে ঢেউ খেলে। ঝিনেদা আর রানাঘাট, এ ছাড়া শহর দেখেনি দাউদ। তা ওসব শহরের চাইতে গঞ্জের জীবনে স্বাদ বেশী। বিশেষত সে গঞ্জ যদি হয়, বড় নদীর উপর। নদীর কুল নাই কিনার নাই রে। গোয়ালন্দে থাকার সময় পাশের বাড়িতে কলের গানে এই গানটা খুব শুনত দাউদ। ও অ্যাকটা কলের গান কিনবে এবার। ফুটকি নিশ্চয়ই খুশি হবে। দাউদ জানে না, সে জিজ্ঞেস করেনি ফুটকিকে, কিন্তু তবু দাউদের ধারণা, ফুটকি কলের গান শোনেনি। বড় নদীও দেখেনি ফুটকি। কালবৈশাখীর মেঘনা, বর্ষার রাগে ফোঁস-ফোঁস ছোবল দেওয়া পদ্মা যে না দেখেছে, সে কী করে আব্বাস মিঞার দরাজ গলায় গাওয়া নদীর কুল নাই কিনার নাই রে!—এই গানটার মর্ম বুঝবে?

দাউদের মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু মতলব খেলে গেল। সে মিচকি মিচকি হাসতে লাগল আপন মনে। নদী কারে কয়, এই বর্ষাতেই সিডা ফুটকিরি দ্যাখায়ে ছাড়ব। নৌকোয় ফুটকিরি উঠোয়ে ভরা ভাদ্দরে অ্যাকবার পদ্মা পাড়ি দিলিই ফুটকি মজাডা টের পাবে নে।

ফুটকির ভীত ত্রস্ত মুখটা চোখের সামনে দেখতে পেল দাউদ। আর আপন মনেই হাসতে লাগল।

নয়মোন ফুটকিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কয় দাউদ?" বাবুরচির কাজকামের তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে ফুটকির সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলে নিচ্ছিলেন। আজ জামাই মেয়ে আসবে। কাল ফুটকিরা চলে যাবে মোকামে। তাই হাজী সাহেব আজ কিছু লোককে নেমন্তন্ন করেছেন। নয়মোন যথারীতি লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। পায়ে পায়ে ফুটকি।

ফুটকি লাজুক-লাজুক হাসল। ওকে খুশিতে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছিল।

"ভালোই হবে।" নয়মোন বলল, "আল্লা ইবার তোর দুঃখু ঘুচোয়ে দেবেন। কতদিন আল্লার কাছে মোনাজাত করিছি ছুঁড়িডার কষ্ট ইবার দূর করি দ্যাও। তা ইবার তিনি চোখ তুলি চায়েছেন।"

ফুটকি বলল, "ছবি না থাকলি মনি হয়, বাড়িডায় লোকই নেই। কখন ওগের আনতি পাঠায়েছ, বুবু? উরা আসবে কখন?"

"গেছে তো আগেই। উরা দুপুরির আগেই আ'সে পড়বে নে বোধ হয়। গিরস্তর বাড়ি। সবাই আসবে। সব, সারেসুরে আসবে তো।" নয়মোন ফুটকিকে ডাকলেন, "মণি, শোন। এদিক আয়।" ওকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাক্স থেকে তিনখানা শাড়ি বের করে বললেন, "তুই বাইরি যাবি, দুখোন তোর। আর ইখানা ছুটকির দিবি। আর আমার মেয়ের কান্ড দ্যাখ।"

ফুটকি দেখল বিলকিস ওর সব ভাল জামা কাপড় বাড়িতে রেখে গিয়েছে। কিছু নিয়ে যায়নি।

"গয়নাও নেয়নি।" ফুটকি বলল, "আমি তাই ভাবি বুবু। ঐটুকুন মেয়ে ছবি, কিন্তু কত ভা'বে কাজ করে। আমি অ্যাত ক'রে যাওয়ার দিন ওরে সাজায়ে দিতি চালাম তা ক'লো, খালা অ্যামন কিছু ক'রে দিবা না, যাতে আমারে দেখলি কেউ কতি পারে যে আমার বাপের বাড়ির খুব পয়সা আছে। আমি চাষী গিরস্ত বাড়ির বউ, সেই বাড়িতি আমারে য্যামন মানায় তেমনি সাজায়ে দ্যাও। ওর এই বুদ্ধি দেখে বুবু, আমার চোখ খুলে গিয়েছে।"

"আল্লা য্যানো ওর এই বুঝ বজায় রাখেন।" নয়মোনের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। "ছবি গেল। ইবার তুই যাবি। তোগের দুটোরে নিয়েই অ্যাদ্দিন সুমায় কাটিছে। ইবার তুই থাকবি নে, ছবিউ থাকবে না। বাড়িটা ঝিমোয়ে পড়বে।"

"তা'লি কই বুবু, যাবার সুমায় যতই আগোয়ে আসতিছে," ফুটকি বলল, "ততই আমার য্যানো ক্যামন ভয় কত্তিছে।"

"খসমের সঙ্গে যাচ্ছ, খসমের সঙ্গে থাকবা" নয়মোন সাহস দিলেন, "মণি রে, এর চাইতি ভাল আর কী চাও? ভয় করবে ক্যান?"

"কী জানি ক্যান? হয়তো তুমাগের ছাড়ে যাতি হচ্ছে, তাই।"

তাজ বিড়ি কোমপানির বজলু শেখ দাউদকে দেখেই "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে অভ্যর্থনা জানাল। "এই যে বড় মিঞা, বলি ডুমুরির ফুল হয়ে উঠলে নাকি? অ্যাকেবারে চিহারাখানই দ্যাখা যায় না। ব্যাপার কী? ব'সো, ব'সো।"

"ওয়ালাইকুম সালাম।" দাউদ বজলুর বিড়ির কারখানার সামনে অ্যাকটা ভাঙা নড়বড়ে বেনচিতে গিয়ে বসল। কাঠের তৈরি দোতলা চৌকো অ্যাকটা বাক্স। চারটে কাঠের খুঁটির উপর বসানো। টিনের চালা। সেইটেই বজলুর তাজ বিড়ির কারখানা। দেওয়ালে নতুন পুরনো ক্যালেন-ডারের সব ছবি সাজানো। অধিকাংশ ছবিতেই মেম সাহেব। কেউ বগল দ্যাখাচ্ছেন। কেউ বা নগ্ন পা। একটা ছবিতে বোররাখ ঘোড়া, যার মুখটা একটা সুন্দরী মেয়ের, বেশ তেজে উড়ে চলেছে।

"তুমার কারখানার অ্যামন সুন্দর ছবি আমি আর কুথাও দেখিনি।"

কারখানায় ব'সে ঐটুকু জায়গার মধ্যে চারটে কারিগর বিড়ি বে'ধে চলেছে এক মনে। বজলু নিচের তলায় উবু হয়ে বসে বিড়ির বাণ্ডিল বাঁধছে। তার সামনে একটা তোলা উনুন। উনুনের উপর একটা টিনের জাল পাতা। জালের উপর বিড়ির বানডিলগুলো সাজানো।

বজলু, খুশি হয়ে দাউদের দিকে চাইল। এবং অত্যন্ত উদারভাবে বলল, "তাজ কোমপানির মিঠে-কড়া লাল সুতোর বিড়ি অ্যাকটা খাবা নাকি?"

"দ্যাও খাই।"

একটা বিড়ি ধরিয়ে দাউদ সত্যিই মোহিত হয়ে গেল।

সুখটান দিয়ে দাউদ বলল, "অ্যাত জায়গায় ঘুরিছি, কিন্তু অ্যামন সুন্দর বিড়ি সত্যিই এর আগে খাইনি। আল্লার কসম।"

বজলু বলল, "এই মিঞা যে নিজির হাতে স্যাঁকে। দেখতিছ না, বসে বসে সে'কতিছি। কিন্তু হলি হবে কী? গিরামের যোগী ভিক্ষে পায় না। এই হাটে এই বিড়ির কদর নেই। মোহিনী বিড়ি না হলি এখেনকার বাবুগের মুখি রোচে না। তাজ কোমপানির মুখপোড়া, লাল তাজ মিঠেকড়া মধুপুর কও, আঠারোখাদা কও, ঝিনেদা কও, পড়তি তর সয় না।"

"তা'লি তো তুমি কাজ গুছোয়েই আনিছ।" দাউদ তাকে উৎসাহ দিল। "একদিন দ্যাখব হাটে হাটে মোহিনী বিড়ির মত তাজ কোমপানির মুখপোড়া, লাল তাজ মিঠেকড়া তাড়া তাড়া বিক্কির হচ্ছে। আর তুমার ধনদৌলত উপচোয়ে পড়তিছে।"

"আল্লার মর্জি হলি তাই হত।" বজলু বলল। "কিন্তু হবার উপায় নেই। অ্যাকে মুসলমান, তাই গরিব। লাভের গুড় সব পি'পড়েয় খায়ে নেচ্ছে। বিড়ির চাহিদা বাড়তিছে জানো। মালউ কাটতিছে। আমদানিউ হতিছে। কিন্তু আমার শুধু খাটে মরাই সার। মা'ড়োবাবুর থে টাকা কর্জ নিছিলাম কারবারডারে বড় করবো বলে। সেই বড় কল্লামউ। আগে দেখিছ তো নিজিই বিড়ি বাঁধতাম। তারপর এই শালাগেরে ভিড়োলাম। শালারা, হাঁ করে পাঁচালি শুনতিছ যে বড়, হাত চালা না। কু'ড়ের বাদশা সব। সবই হল, বুঝলে দাউদ, কিন্তু ঠেকে গ্যালাম। টাকা? মুরুব্বিরা, যার কাছেই যাই, কয় টাকা! কোরানের বয়েত আউড়োয়ে শুনোয়ে দ্যায়, কর্জ দেওয়া মুসলমানের হারাম। সুদ খাওয়া হারাম। তা মুসলমানের টাকা কর্জ দেওয়া যখন হারাম, তখন বাধ্য হয়েই মা'ড়োর ঘরে যাতি হ'ল। অ্যাখন সব মধু সেই খাতিছে।"

"বিশ্বেসবাবু কুণ্ডুবাবু ওগের কাছে তো যাতি পাত্তে।" দাউদ বলল। "মা'ড়ো তো তুমারে শু'ষে খায়ে ফ্যালবে।"

বজলু বলল, "তুমি কি ভাবতিছ যাইনি?" তিক্ত হাসি হাসল বজলু। "উরা আবার আরেক পদ। টেলারিং-ইর সুশীলদা, এই অ্যাকটা লোক এই হাটে, যে কেউ কিছু ক'তি চালি খুশি হয়, মদতও দ্যায়। সুশীলদা আমারে নিয়ে কি ওগের দরজায় কম ঘুরিছে। শেষে আমারে অ্যাকদিন আ'সে কয়, বজলু ওগের পিছনে ঘুরে আর লাভ নেই। আমারে টাকা দ্যায়নি, আমি ওগের চিনা লোক, আমারে কর্জ দিলি নাকি লোকের কাছে মুখ দ্যাখাতি পারবে না। আর তোরে দেবে না, তুই ওগের অচিনা লোক, মোছলা। এই হাটে ওরা মোছলাগের কারবার ফাঁদে করে খাতি দেবে না। তন্ন চাইতি তুই মা'ড়োর কাছেই যা। মা'ড়োবাবুর কাছে একটা সুবিধা এই যে মা'ড়ো হিন্দুউ বোঝে না, মুসলমানও বোঝে না, খালি সুদ বোঝে। আমি ওর খাতক, আমি ওর ক্ষুরি মাথা মুড়োইছি, তুইউ মুড়ো। এই তো হল বিত্তান্ত!"

একটু থেমে বজলু বলল, "তা তুমি কচ্ছড়া কী?"

দাউদ বলল. "আমি কাল মোকামে যাব। সিরাজগঞ্জ। দ্যাও এক তাড়া লাল তাজ। নিয়েই যাই। বিড়ি সত্যিই খায়ে সুখ আছে।"

বিড়ি নিয়ে উঠে পড়ল দাউদ।

"উররর হা! হা হা হা। এই গুটি!" নফরা পেল্লায় মোষ দুটোকে, এতক্ষণ ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি টেনে আনছিল যারা, হাজী বাড়ির সদরে থামিয়ে দিল। তারপর যত্ন করে গাড়ি মোষ দুটোর কাঁধ থেকে খুলে নামাল। আগে নামল ছবি। পরে তার শাশুড়ী। চাঁদবিবি। বহু পুরনো একটা

রঙচটা কালা বোরকায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা।

হাজী সাহেব দহলিজ থেকে "ওরে বিয়ান আ'সে গেছে ছবি আ'সে গেছে" বলতে বলতে নিচে নেমে আসতে না আসতেই চাঁদবিবি সুড়ুৎ করে অন্দরে ঢুকে গেল। ছবি বাপকে কদমবোসি করে বলল, "আব্বাজান!" হাজী সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরলেন। বিড়বিড় করে দোয়া পড়লেন।

বললেন, "সর্দি টর্দি হয়নি তো?"

"জে না।"

"এট্টু ব্যান্ রুগ্না হয়ে গিছিস?"

"কই না তো?"

"বেশ, বেশ, ভাল থাকলিই হল। তা আমার বিয়াই সাহেবের খবর কী? কখন আসবেনে? বাপের খবর ভালো?"

"জে।" ছবি ভিতরে দৌড় দিল।

"আস্সালামু আলাইকুম।"

বিয়াইকে দেখে হাজী সাহেব "ওয়া আলাই কুমুস্সালাম" বলেই এগিয়ে গেলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। ফটিক এসেও শ্বশুরকে সালাম করল। হাজী সাহেব ওদের সমাদর করে দহলিজে নিয়ে গেলেন। নফরা শরবৎ আনল সকলের জন্য। পাখা দিয়ে বাতাস করতে চাইল।

সাজ্জাদ বলল, "হাওয়া বিয়াইরি কর বাপ। এই নাংলা চাষাডারে হাওয়া করলি মেহনতডাই মাটি হবে। হাওয়া তো পিরেনে খায়। হাজীর পিরেনে হাওয়া কর। ঐ হাওয়া গায় ঠেকলি হজের হাওয়া পাওয়া যাবে।"

সাজ্জাদের কথায় হাজী সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন।

"কথাডা কইছ বড় ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ। হাজীর পিরেনের হাওয়া গায় লাগলি হজের হাওয়া গায় লাগবে। তুমার মুখি এসব কথা জুগায় কিডা কও দিনি।"

"আজ সকালের থে বাড়ীতি সে কি কান্ড। তুমার বিয়ান, সে আমারে পিরেন পরাবেই। আমিউ পরব না। কয় কি, বিয়াইবাড়ি যাবা। ইজ্জতের কথা এর মধ্যি আছে। প্যানপ্যান ঘ্যানঘ্যান। শেষে কলাম আন তোর পিরেন। তুমার বিয়ান বিটির সংগে শলা করে এই দ্যাখ এ্যাকটা জুটোয়ে দেলে। কাঁধে করে বয়ে আ'নে পিরেনের ইজ্জত বাঁচাইছি। ইবার এই ন্যাও, তুমার জিম্মায় দিয়ে রাখলাম। যাওয়ার সুমায় ফেরত দিও। সোব্হানাল্লাহ।"

কত্তাবিবির ঘরে সবাই গিয়ে বসল। বিরিয়ানির খোশবু তখন বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ছে। চাঁদবিবি তার বউ-এর প্রশংসা করছে আর আনন্দে চোখের পানি ফেলছে।

"বিটি আমার খুব ভালো। খুউব ভালো।" চাঁদবিবি চোখ মুছল। "আমার ফটিকির যে আবার শাদি হবে, আমাগের ঘরে যে আবার বউ আসবে, তাউ আবার আমার এই বিটির মতন অ্যামন সোন্দর বউ, এ আমি ভাবতিউ পারিনি। আমি আল্লারে কত ডাকিছি, কইছি আল্লাহ্ আমরা তো তুমার পথেই আছি। তুমি আমার ফটিকির শাদিতি রাজী করাও। তুমি ওরে জুড়া মিলোয়ে দ্যাও। তুমারে ছাড়া আর কার কাছেই বা কব।" চাঁদবিবি চোখ মুছল। "ফটিকির বাপেরে কই, তা মন্দ কয়, ছবুর কর। খালি কয় ছবুর কর। আমি মেয়েমানুষ, তা আমি আর কী কত্তি পারি? ফটিক বাপেরে কতি সাহস হয় না। দিন রাত বই মুখি করে থাকে। কী খায়, কী না খায় তারউ ঠিকঠিকানা নেই। ছাওয়াল ল্যাকাপড়া শিখিছে। আমি আর সে ছাওয়ালের নাগাল পাইনে। তা আমি মুখ্যু মা, আমি আর কী করব? ঐ আল্লার কাছেই কান্নাকাটি করি। কই তুমি আমার ফটিকির অ্যাকটা শাদি করায়ে দ্যাও। তা আল্লাই হাজীর বিটিরে আমার বাড়ীতি পাঠাইছেন। খুব ভালো বউ পাইছি। আল্লার মেহেরবানি।" চাঁদবিবি চোখ মুছল।

নয়মোন বিয়ানের পাশে পানের বাটা মেলে বসেছিলেন। জাঁতি দিয়ে একমনে সুপারি কেটে চলেছেন।

কত্তাবিবি বললেন, "হ্যাঁ এসব তো আল্লারই রহমত। সিডা ছাড়া আর কী?"

নয়মোন জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মাজান, আপনারে অ্যাকটা পান ছেঁচে দিই?"

কত্তাবিবি বললেন, "দ্যাও। সুপোরি আর খয়ের এট্টু কম দিও।"

নয়মোন ছোট্ট একটা হামানদিস্তের কত্তাবিবির পান সাজতে লাগলো। ঠন ঠন ঠনক ঠন।

কত্তাবিবি বললেন, "আল্লাহ জুড়ার অ্যাকটা এ বাড়ি আরেকটা তুমাগের বাড়ি বানায়েই রাখিছিলেন।" ঠন ঠন ঠনক ঠনক ঠন। "তুমি বউ খালি তুমার বউইর কথাই ক'লে।" ঠনক ঠন ঠন। "কিন্তু নিজির ছাওয়ালের কথা ক'লে না। তুমার ছাওয়ালের সংগে হাজীর মেয়ের শাদি হইছে, ক্যাবল আল্লাহ ইচ্ছে করিছেন তাই। আল্লাহ আমাগের যে নেকনজরে রাখিছেন, এ ক্যাবল হাজীর বাপদাদার ইমানদারীর জন্যি।" ঠনক ঠন ঠনক ঠন ঠনক ঠন ঠন। "ফটিকির মত ছাওয়ালরে জামাই হিসেবে পায়ে আমরা বর্তায়ে গিছি। বিটি, তুমারে আমি সাফ কথা কয়ে দিলাম।"

নয়মোন হামানদিস্তেটা কত্তাবিবির দিকে ঠেলে দিলে। চাঁদবিবিকে একটা খিলি এগিয়ে দিয়ে বললে, "ন্যান বু ধরেন।"

চাঁদবিবি হাত বাড়িয়ে পানের খিলিটা নিল। "আলাতামাক আছে বিয়ান? থাকলি দ্যাও।"

ছবির ঘরে ফুটকি আর ছবি ফিসফিস করে কথা বলছে। আর মাঝে মধ্যে হেসে হেসে উঠছে।

এক সময় ছবি বলল, "তোর কথা শুনলি মনে হয়, তুই বুঝি তিন বছরে খুকী। মটোরে, রেলে এর আগে চড়িসনি তো হইছেডা কী?"

ফুটকি হাসতে হাসতে বলল, "সিডা কি আর বুঝি নে, খুব বুঝি। কিন্তুক ধর তোর রাঙা ভাই উঠে গেল আর আমি উঠতি যাবার আগে গাড়ি ছাড়ে দিল। তালি হবেডা কী?"

"তুই চ্যাঁচাবি, ওগো থামো থামো, আমার খসম উঠে গেছে গো। আমি প'ড়ে আছি।"

"হাসি ঠাট্টার কথা নয় ছবি।" ফুটকি গম্ভীরভাবে বলল। "আমি অ্যাত ভয় পাইছি ক্যান, তা'লি শোন। আমি পর পর কদিন বিয়ানে এই অ্যাকটা খোয়াবই খালি দেখিছি। মস্ত বড় জায়গা। মস্ত বড় অ্যাকখান গাড়ি দাঁড়ায়ে আছে। তোর রাঙা ভাই গাড়িতি উঠে হাত বাড়ায়ে দেছে। আমি পর্দা সামলায়ে তোর রাঙা ভাইর হাত ধরতি যাব আর অমনি পিলপিল ক'রে লোক আ'সে আমারে ঠ্যালা দিয়ে পিছনে সরায়ে দিল। তোর রাঙা ভাই কনে হারায়ে গেল। আমি দৌড়োয়ে গাড়ির দি'ক যাতি গ্যালাম। লোকের ধাক্কায় ছিটকোয়ে অ্যাক গর্তে পড়ে গ্যালাম। খালি এই খোয়াবডাই বা ঘুরে ফিরে দেখতিছি ক্যান?"

ফুটকির স্বপ্নের কথা শুনে বিলকিস ঘাবড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "তুই দাদীরি এই কথা কইছিস?"

ফুটকি বলল, "অ্যামন বিতেন করে অ্যাক তোরেই কলাম। তবে বুবুরি আমার ভয়ের কথাডা জানাইছি।"

"তুই দাদীরি ক। দাদী অনেকরকম দোয়া জানে। তাবিজ জানে।" বিলকিস বলল। "তুই দাদীর কাছে সব ভাঙে ক। দাদী সব ঠিক করে দেবেনে।"

ফুটকি রাজী হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, মোছফেকা এসে উঁকি মেরে বলল, "দুলা মিঞা এদিকিই আসতিছেন।"

ফুটকি ঘোমটা টেনে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। ফটিক ঘরে ঢুকে, কি মনে হল খাটের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বালিশ দুটো উল্টেপাল্টে দেখে হতাশ হয়ে পড়ল।

বিলকিস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী খুঁজতিছেন?"

হতাশভাবে ফটিক বলল, "দেখছিলাম, পতিধনকে লেখা কোনও চিঠি পাই কিনা?"

বিলকিসের মুখ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। "যাঃ!" বোকার মত হাসতে লাগল বিলকিস।

দহলিজে ততক্ষণে বেশ তামাক পুড়তে শুরু করেছে। রহমানের হাতে হুঁকোটা দিয়ে খালেক বলল, "নিকিরিগের আর মাছ মা'রে খাতি গেলি জানে বাঁচতি হবে না। বিল-বাওড়ের জমা ইজারা সব হাতছাড়া হয়ে যাতিছে। বোয়ালের বাওড়ডা অ্যাদ্দিন নিকিরিগের হাতে ছিল। ইবার শুনতিছি সিডাউ হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল, "কিডা কলো?" "কও কী?" "এ তো যাঁড়ে সব্বোনাশ!"

খালেক বলল, "বাকড়ির শুক্কুর মিঞার সঙ্গে ঝিনেদার হাটে দ্যাখা। আমাগের কুটুম হয়। তাওই। তা কলাম, কী তাওই, আপনাগের ওদিকির থে আজউ ডাকডোক আলো না। বলি কথাডা কী? আমরা সব হাত কোলে করে বসে আছি। কী হল? বোয়ালের বাওড় কি শুকোয়ে গেল? তাই শুনে শুক্কুর তাওই কপালে হাত ঠুকে কলো সে বাওড় কি আর আমাগের হাতে আছে তাওই যে আপনাগের ডাকে পাঠাবো? শামুকখুলার গুপী তেলী সেরেস্তাদাররে টাকা খাওয়ায়ে জমা নিয়ে নিয়েছে। আগে যামন গিরামে গিরামে ঢোল পিটোয়ে ডাকের সুমায় জানায়ে দিত, ইবার সে-সব কিছুই করেনি। আমরা আপত্তি দিছিলাম সেরেস্তাদারের কাছে যায়ে। সেরেস্তাদার এক কথায় হাঁকায়ে দেছে। কোয়েছে, আইনমতো ইউনিয়নে ইউনিয়নে নোটিস বিজ্ঞপ্তি মারফত আমি জানায়ে দিছি। ব্যস। পছন্দ না হয় মামলা করো। শোনেন কথা।"

সবুরালি খপ্ করে জ্বলে উঠল, "শালার কল্লাডা ফাঁক করে দিলা না ক্যান?"

খালেক বলল, "তুমার মত সুজা রাস্তায় তো সগলে চলতি রাজী হয় না সবুর ভাই।"

নাজেম বলল, "তালি দাঁড়ালো কী? সিবার ভুবনপুরির বাওড়ডা গেল। ইবার বোয়ালের বাওড়ডাও গেল। নশিপুরির বাবুরা কোয়েছে তারা বিল জমা দেবে না। লোক রেখে মাছ ধরাবে। তালি আমরা খাবো কী করে?"

সবুর বলল, "ইবার তালি লাঙল বাতি শেখো।"

খালেক বলল, "তা না হয় শিখলে। জমি পাবা কনে?"

সাজ্জাদ হুঁকোটা নিয়ে বলল, "জমি পালিই কি অ্যাকখান হাত বেশী বেরোবে? জমি চষলি ফোঁত হয়ে যাবা। চাষ করার কি মজা, আমি জানি। কুষ্টা চষো দাম পাবা না। ধান চষো খাই খরচ ওঠে না। অবাক কাণ্ড।"

"শুনলাম, আপনি নাকি, পাট চষতি বারণ কত্তিছেন।" বাইজদ্দি জিজ্ঞেস করল।

"শোনবে কিডা? অ্যাকে চাষা তায় মুসলমান। আমাগের মধ্যি মানুষ কেউ আছে?"

সাজ্জাদ উত্তেজিত হয়ে উঠল। "অ্যাখন আড়তদারগের কুষ্টা কিনার গরজ নেই। ক্যান? দেখতিছে আমরা হাতে পায়ে ধরে সাধে কুষ্টা ওগের আড়তে তুলে দিয়ে আসতিছি। উরা যে দাম দিতি চাতিছে, তাই সই। খালি কর্জ কত্তিছি। আর মহাজনের ঘরে সুদ বাড়তিছে। মুসলমান অ্যাক অদ্ভুত জাত। অল্প সুদি অভাবি জাতভাইরি কর্জ দিলি গুনাহ হয়। মোল্লারা "শরা" গেল "শরা" গেল বলে ফাল পাড়তি থাকে। কিন্তু অভাবির চোটে দিকবিদিক না দেখে যখন সেই মুসলমান হিন্দু সুদখোরের কাছে চিরকালের মত গলা বাড়ায়ে দ্যায়, তখন আর আমাগের 'শরা'তে চোট লাগে না।"

নাজেম হুকো টানতে টানতে বলল, "মুসলমান আর বাঁচবে না।"

সাজ্জাদ বলল, "মুসলমান বাঁচবে না, কিডা কলো? খাজা রাজা নবাব জমিদার ওগের গায় হাত দেবে কিডা? মরতি মরণ বাঁশোর মরণ। মরতি মরব আমি চাষা, তুমি নিকিরি, এই আমাগের মত সব গরিব।"

খালেক বলল, "তালি বাঁচার উপায় কী, কন?"

সাজ্জাদ বলল, "আমরা চাষী, ফসল তো আমরাই তুলি। আমরা যদি অ্যাক জোট হতি পারি, যদি কতি পারি, কুষ্টার দাম অ্যাত দিবা তো চষব। নাহলি কুষ্টা চষব না। সবাই যদি এই কথায় কোট ধরে থাকি। অ্যাক বছর দু বছর না-হয় নাই চষলাম কুষ্টা। এমনিউ তো মরেই আছি। আর ক্ষেতি কী হবে? অ্যাক জোট হলি তবে যদি বাঁচতি পারি। না হলি আর উপায় নেই।"

সাজ্জাদের কথার এত জোর যে গোটা মজলিস চুপ হয়ে গেল। মুখ নিচু করে সকলেই যেন তার কথার মানে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

মুখ নিচু করে দাউদ ফুটকির কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল। শাড়ি পেয়ে কতটা অবাক হবে ফুটকি, তার মুখের চেহারা কেমন হয়ে উঠবে, তাই যেন সে মাপবার চেষ্টা করছিল মনে মনে।

হঠাৎ সে মিহিন সুরে "সওদাগর" ডাক শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই কালোজিরে। কুরিদের ঘাট থেকে চান করে ফিরছে। কাঁখে জলভরা কলসী। এক হাত দিয়ে ঘোমটা একটু ফাঁক করে ধরেছে। ঘোমটার ফাঁকে দুটো চোখ আর ঠোঁটের দুরন্ত হানাদার হাসি থরথর করে কাঁপিয়ে দিল দাউদকে। পাতলা ভিজে কাপড় কালোজিরের শরীরের আকর্ষণটা দুর্বার করে তুলেছে। দাউদ পালাতে চাইল। ভয় পেয়েছে সে।

কালোজিরে চাপা স্বরে বলল, "রাস্তার মধ্যি দাঁড়ায়ে আমারে কি চোখ দিয়েই গিলে খাবা?"

কালোজিরে আবার হাসির ছুরি চালালো। বলল, "বাড়িতি চলো। কথা আছে।"

শরীরে ঢেউ তুলতে তুলতে কালোজিরে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ভিজে শাড়ির চোঁয়ানো জলে পথ ভিজিয়ে নিশানা রেখে রেখে সে এগোতে থাকল।

॥ ৩১ ॥

ঘরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। মটকাটা ঠাহর পাচ্ছিল না ফুটকি। তবু বিছানায় একা, একদৃষ্টে সেই অদৃশ্য মটকার দিকে চেয়েই শুয়েছিল। এমনভাবে চেয়েছিল, তার চোখ এখন শুকনো, যেন ঐ মটকার অন্ধকারেই কোথাও লুকিয়ে আছে দাউদ, না ফুটকির নসিব। যেন অন্ধকারটা ফিকে হয়ে এলেই সে দেখে নিতে পারত, বুঝতে পারত কী আছে সেখানে? কিন্তু সে শুধু অন্ধকারই দেখছে। কাল এমন সময় এই অন্ধকারে, এই খাটেই, তার পাশে দাউদ ছিল। সোহাগ করছিল, আদর করছিল, তার গাড়ি চড়ার ভয় ভাঙাবার জন্য কত ধমক দিচ্ছিল। আজ সেই রাত্রি, সেই অন্ধকার, সেই খাট, কিন্তু কোথায় দাউদ? নাস্তা খেয়ে বলে গেল, চাচার বাড়ি যাই, চাচা আজ টাকা পয়সা দেবেন। সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না।

হাজী বাড়ি গিয়েছিল দাউদ। টাকা পয়সা সবই নিয়েছে। তারপর হাটখোলাতেও গিয়েছিল দাউদ। বিবির জন্য শাড়ি কিনেছে সকালে। তারপর দুপুরে কুণ্ডুবাবুদের দোকান থেকে একটা সুটকেস এবং বিবির জন্য একটা বোরখা কিনেছে। তারপর তাকে দুটোর বাসে, ঝিনেদায় যে বাসটা যায়, চড়তে দেখা গিয়েছে। হাতে নতুন সুটকেস। আর বোরখা-পরা এক বিবিকে হাতে ধরে সেই বাসের লেডিজ কেবিনে চড়িয়ে দিচ্ছে দাউদ, এটাও নাকি দেখা গিয়েছে। একটার পর একটা খবর ফুটকি শুনেছে আর একটু একটু করে পাথর হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে এমন বেইমানি করল কেন দাউদ? সে কি ওর সঙ্গে মোকামে যেতে চেয়েছে বলে? কিন্তু এ প্রস্তাব দাউদই তো তাকে দিয়েছিল। তবে? আরেকটা শাদি করবে বলে? তাই যদি দাউদের ইচ্ছে ছিল তবে সেকথা বলল না কেন তাকে? সে কি বাধা দিত? না বাধা দিতে পারত? মুসলমানের মেয়ে হয়ে তার খসমের আরেকটা শাদিতে বাধা দেবে, এমন বুকের পাটা তার আছে? সে ক্ষমতাই তো কোনও মেয়ের নেই। তবে তার সঙ্গে এমন প্রবঞ্চনা কেন করল দাউদ? এত সোহাগ, এত এত আদর,

তাকে অনাদরের জন্য দিনের পর দিন এত অনুশোচনা, এ সবই ফাঁকি? ঠকানো? তাহলে ওগুলোকে সত্য বলে মনে হয়েছিল কেন? কিছুই বুঝতে পারে না ফুটাক।

বোনেদের মধ্যে ওকেই সব থেকে ভালো দেখতে। কাজে-কর্মেও ভালো। একটা জিনিস তো ভালোই জানে। মেয়েদের ভালো সাজাতে পারে। ওদের পাড়ায় এই জন্য ওর পসার। বাড়িতে বর এলে মেয়েরা ওকে ডাকে, নয়তো ওর কাছেই সব সাজতে আসে। খসমরা নাকি খুব পছন্দ করে। বিবিকে আদর সুহাগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ওর হাতের নাকি এমনই গুণ। কিন্তু হায়রে, সেই হাতের মালিকা! তার খসমকে সেই হাতের গুণ আর বশ করতে পারল না।

দাউদ চতুর্থবার শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়ল। কালোজিরে তখনও বেশ সতেজ। আঁচল দিয়ে দাউদের মুখের ঘাম মুছিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে দাউদের মুখে ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাতাস করতে লাগল। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট চুমু খেতে লাগল। দাউদের দেহ থেকে শ্রান্তির ভার কুহকরীর তৎপরতায় এই জাদুকরী যেন চেটে চেটে মুছে ফেলে দিল। দাউদ কালোজিরের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

একটা ইনজিনের তীক্ষ্ণ হুইসিল রাতের বুক চিরে বেজে উঠল। তারপর হুউস হুসউসউস হুউস হুসউসউস করে ইনজিনটা গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে থাকল। একটু পরেই মোটা গম্ভীর গলায় জেটি থেকে একটা স্টিমার বার কয়েক ভোঁ বাজিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর সব চুপচাপ। দাউদের গলা জড়িয়ে তার মুখটাকে নিজের উষ্ণ বুকে টেনে এনে কালোজিরে উত্তেজক চাপা স্বরে বলল, "সওদাগর, তুমার মত পুরুষ দেখিনি। তুমি আমারে বাঁদী করে রাখো। পায়ে ঠেলো না।"

দাউদের বুকটা ফুলে উঠল। সে কালোজিরেকে এক হ্যাঁচকা টানে বুকে তুলে নিল।

একটু ঠাট্টার স্বরে বলল, "ক্যান, বাইতি?"

কালোজিরে বলল, "তুমি আর বাইতি রাম আর রামছাগল। দিনরাত মদ গিললি মানুষ আর মানুষ থাকে? বেশির ভাগ দিনই তো হুঁশ থাকে না। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। পেরথম পেরথম দিন কতক তবু আগোয়ে আসিছিল। মদ ছাড়িছিল। সেই কডাদিনই যা শরীলডা জুড়োইছে। নচ্ছারডা তারপর আবার মদে ডুব দিল। বাইতি মদ টানে আসে ভোঁস ভোঁস করে পাশে শুয়ে ঘুমোয়। আর আমার শরীলডা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। সে যন্তননার কথা তুমারে আর কী কব? সওদাগর, তুমি আমারে জুড়োয়ে দিলে।"

দাউদ হাসল। তার মনে হচ্ছে, সে যেন বাদশা। আর কালোজিরের শরীরটা যেন তার বাদশাহী। এমন মনের ভাব তার কখনও হয়নি। সে আবার কালোজিরেকে আদর করতে শুরু করল।

"তুমি আমারে যেখেনে হয় নিয়ে যাও, আমি যাব। য্যামন ইচ্ছে হয়, দাসী কো'রে হোক, বাঁদী কোরে হোক রাখো, আমি থাকবো। দুহাই তুমার আমারে ফ্যালায়ে যায়ো না। তালি আমি আত্মঘাতী হবো।"

দাউদ গভীর আবেগে কালোজিরেকে বুকে চেপে ধরল। আদরে আদরে তাকে অস্থির করে দিল।

দাউদ বলল, "তুমারে আমি নিকে করব। তুমারে বিবি করে রাখব। তুমারে ফ্যালায়ে যাব ক্যান?"

হাজীবাড়িতে ভোজ ছিল। জামাই-মেয়ে এসেছে বলেই নয়, দাউদ ফুটাক চলে যাবে বলেও হাজী সাহেব তাঁর আপন ও অনুগত জনদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ফুটাক তাই নিয়েই মেতে গিয়েছিল। কখনও ছবির পিছনে লাগছিল, কখনও নয়মোনের ফাইফরমাস খাটছিল। তার মনের আনন্দ এইভাবেই তার প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে উপচে পড়ছিল। সে তো টের পায়নি, তার নসিব তাকে নিয়ে এমন বদ রসিকতা করবে। কোথাও কোনও ইশারা সে পায়নি।

ফুটাক সেই নিরেট রাত্রির কবরে শুয়ে বিনিদ্র চোখ দুটো মটকাতেই আবদ্ধ রেখে ভাবল, তার কপাল পুড়েছে, এ ইশারা যদি পেতই, কী করত সে? সে দাউদকে ঠেকাতে পারত? না, তা পারত না। তাহলে? কেন, একটা কাজ তো সে পারত, সে তো নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারত সকলের আড়ালে। এতগুলো লোকের দৃষ্টির সামনে তাহলে আর বেইজ্জত হতে হত না। এইটেই তার বড় দুঃখ। কিন্তু সে একা কেন, কেই বা দাউদের মতলব টের পেয়েছিল? হাজী সাহেব পেয়েছিলেন? নিশ্চয়ই না। তাহলে দাউদের হাতে তার ব্যবসার টাকা, তাদের দুজনের রাহা খরচের টাকা, তাদের ঘর বাঁধার টাকা—এত টাকা কি তুলে দিতেন? নিশ্চয়ই না। তবে? দাউদের ধোঁকাবাজি হাজী সাহেবের মত বিচক্ষণ লোকই যদি ধরতে না পারেন, তাহলে ফুটাক মেয়েলোক হয়ে কী করে আশা করবে যে সে দাউদের মতলব ধরে ফেলবে? হাজী সাহেবকেও ধোঁকা দিল দাউদ!

অথচ হাজী সাহেব সম্পর্কে কাল রাতেও না কত শ্রদ্ধা জানিয়েছিল? এবং হাজী সাহেবের কত টাকা সে নষ্ট করেছে তার মোকামের ইয়ারদের পাল্লায় পড়ে তা বিতেন বিতেন করে বলেছে তার কাছে। একদিন নয়, দিনের পর দিন। অসুখের মধ্যে বলেছে দাউদ, ভালো হয়ে

উঠলে বলেছে। এই যদি মতলব ছিল, তবে কেন বলতে গেল তার গোপন কথা? সে তো দাউদকে বলতে বলেনি, তাকে বাধ্য করেনি। তবে? আর দাউদকে বাধ্য করার মত কী ক্ষমতা আছে তার মত সাধারণ একটা মেয়ের? রূপ? তার বোনেদের মধ্যে, সব্বাই বলে যে, সে নাকি সব্বার চাইতে খুবসুরৎ। কিন্তু কী হল তাতে? তার রূপে কোনোদিন ভোলেনি দাউদ। মোকামে মোকামে সে অনেক মেয়ের পিছনে টাকা নষ্ট করেছে একথা নিজেই বলেছে আর তওবা করেছে, ভবিষ্যতে এমন বুরা কাম আর করবে না। এই যদি মনে ছিল, তাহলে নিজের ইচ্ছেয়, এই অনুতাপের কথা দাউদ কেন বলতে গেল তার কাছে? ফুটকি এই কথাটাই বুঝতে পারছে না। এ কোন্ ধরনের ধোঁকাবাজি?

সকাল হয়ে আসছে না কি? ফুটকির বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। না না না। সকাল হয়ে আর কাজ নেই। দিনের কথা মনে হলেই তার বুক শুকিয়ে আসে। সে আর কারও চোখের সামনে পড়তে চায় না। কারও সহানুভূতি চায় না। সে অন্ধকারেই তার লজ্জাকে ঢেকে রাখতে চায়।

কালোজিরে এক কথায় তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। দাউদকে সে নিকে করবে। দাউদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার মন হাল্কা হয়ে উঠল। আজ দুপুর থেকে তার মনে যে গ্লানিবোধ জমা হয়ে উঠেছিল, এখন তা যেন এক ফুঁয়ে উবে গেল। সে কালোজিরের মুখে লম্বা করে একটা চুমু খেল। এখন আর জেনা হচ্ছে না। গুনাহও নয়। সে তার নিজের বিবির মুখেই চুমু খাচ্ছে। ফুটকির মুখে চুমু খাচ্ছে? হঠাৎ ফুটকির নাম মনে পড়ে যাওয়াতে দাউদ বিব্রত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে কালোজিরে দাউদের মুখে চুমু দিল। এ তো চুমু নয়, কেউটেসাপের ছোবল। এক ছোবলে দাউদের শরীর জর্জরিত হয়ে গেল। এ জিনিস ফুটকি কোথায় পাবে? ফুটকি কত ঠান্ডা।

"জিরে বিবি?" দাউদ কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকল।

"সওদাগর!" একটা অদ্ভুত চাপা অথচ উত্তেজক স্বরে কালোজিরে উত্তর দিল।

"তুমি আমার জিরে বিবি। রাজি?" দাউদের হাত অবাধ্য হয়ে উঠেছে।

"রাজি।" কালোজিরের হাত হানাদারকে প্রতিরোধ করছে।

"বাস, তালি তো হয়েই গ্যালো। মিঞা বিবি রাজি তো ক্যায়া করেগা কাজী।" দাউদ এতক্ষণে হাসল।

"আমি অ্যাখন কিসির সওদাগর, জানো?" বাধা পেয়ে হানাদার অধৈর্য হয়ে উঠছে।

"কিসির?" কালোজিরের হাত শুধু বাধাই দিচ্ছে না, মাঝে মাঝে পাল্টা ছোবলও মারছে।

"আমি কালোজিরের সওদাগর।" হানাদার ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছে।

কেমন একটা অস্পষ্ট মিহিন হাসির আওয়াজ সেই অন্ধকারে কালোজিরের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দাউদ আরেকটা ছোবল খেল। ওর শরীরটা থরথর করে উঠল।

"হোটেলের খাতায় যখন তুমার নাম জিরেবিবি লিখোই তখনো ভাবিনি, তুমি আমার বিবি হতি রাজি হবা।" দাউদ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ওর হাত লক্ষ্যহীনভাবে চরতে লাগল।

"আমি কিন্তু তুমারে পেরথম দেখেই বুঝতি পারিছিলাম," কালোজিরের হাত একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বেছে নিয়ে অতি সন্তর্পণে শিকারের দিকে এগোতে থাকল, "যে তুমিই আমার নিয়তি। ইবার তুমার সঙ্গেই ভাসব।"

"আহ্ হা রে!"

"কী হলো?"

"ইডা যদি আগে জানতাম!"

"তাহলি কী হতো?"

"তাহলি কী হতো! জেনা কত্তিছি ভাবে আমি সারাদিন আর দোজখের আগুনি ভাজা ভাজা হতাম না।"

কালোজিরের হাত শিকারকে স্পর্শ করা মাত্র দাউদ চনমনিয়ে ব্যাধের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুরুষদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। হাজী সাহেব তদারক করছিলেন। হঠাৎ হাজী সাহেবের খেয়াল হল, তাইতো, দাউদ তো খেতে আসেনি। নেয়ামতকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে দাউদ কনে? খাতি আলো না যে বড়? ব্যালা যে গড়ায়ে গ্যালো।"

ঐ ফুটকি প্রথম শুনল যে দাউদ আসেনি। তার ধারণা ছিল সে বুঝি দহলিজেই আছে। দ্যাখো দিন লোকটার কাণ্ড। নেয়ামত বলল, "ওরে তো হাটখোলায় দ্যাখলাম। শাড়ি কিনতিছে।"

ফুটকি আর শুনল না। সরে গেল। শাড়ি কিনতিছে! একটা পুলকের ভাব ওর রক্তে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল। একটা লজ্জা, একটা দারুণ আহ্লাদ ফুটকিকে যেন আছাড় দিতে লাগল। শাড়ি যে কার জন্যে কিনছে দাউদ, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই জাগল না তার মনে, সে কত বোকা! ফুটকি ধরে নিল তার জন্যই শাড়ি কিনেছে দাউদ। মরমোন যেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছেন দাওয়াতিয়াদের বিবি আর বাচ্চাকাচ্চাদের জন্য, সে সেখানে গিয়ে তদারক করতে লাগল।

বাড়ির মেয়েদেরও খেতে বসিয়ে দেওয়া হল। ছুটকি, ছবি সবাই তাকে ওদের সঙ্গে খেতে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। সত্যি বলতে কি, খিদেয় ওরও পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘরের লোকটা যখন না খেয়ে আছে, আর তারই জন্য জিনিস কিনছে হাটখোলায় তখন সে তার বিবি হয়ে কী করে আগে খেতে বসে? ছবি ওর গোঁয়ারতুমিতে খুব রাগ করতে লাগল। ছবির রাগ দেখে খুবই মনে কষ্ট পাচ্ছিল ফুটকি। ওর পিছনে হাঁটুগেড়ে বসে ওর কানে ফিসফিস করে বলল, "তোর রাঙা ভাই হাটখোলায় কীসব জিনিসপত্তর কিনতিছে। অ্যাখনও বাড়ি আসেনি। তুই খাতি শুরু কর। ও আলি আমি খাবানে।"

বিলকিস বলল, "ব্যালা কত হলো খিয়াল আছে? একটু আগে না ঝিনেদার দুটোর মটোর প্যাঁক প্যাঁক করে বেরোয়ে গ্যালো। অ্যাখন কি কোনও দুকান খুলা থাকে? যা দিন, বাড়ি গিয়ে দ্যাখ গে, রাঙাভাই আসে গেছে। যা ডাকে নিয়ে আয় গে।"

তাই তো! এটা তো খেয়াল হয়নি। বড় আশা করে ফুটকি ছুটেছিল বাড়িতে। কী শাড়ি কিনেছে দাউদ? দারুণ কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখল ঘর খালি, তখন হঠাৎ তার কেমন অবসাদ এসে গেল। সত্যিই তো, কোথায় গেল লোকটা? কোথায় যেতে পারে, এ সময়ে? আজ ও-বাড়িতে দাওয়াতের ব্যাপার আছে, তা জানে। তা সত্ত্বেও কোথায় গিয়ে আটকা পড়ল? এই আসে এই আসে করে কতক্ষণ বসে রইল ফুটকি। একটু শব্দ হলেই ও উঠে গিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। ক্রমে বেলা পড়ে এল। ওর শাশুড়িরা পান চিবুতে চিবুতে ফিরে এলেন। কীগো, বিটা আসেনি? না, বলে ফুটকি আবার ঘরে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যে হয়ে এল, দাউদ ফিরল না। এবার ফুটকির ভয় হতে শুরু করল। নিশ্চয়ই দাউদের কিছু একটা হয়েছে। খিদেয় ওর শরীর ঝিমঝিম করছে। শুয়ে পড়ল সে। হঠাৎ ও-বাড়িতে কিসের গোলমাল শোনা গেল। ফুটকির বুক ছ্যাৎ করে উঠল। ধড়মড় করে উঠে পড়িমড়ি ছুটল সে।

কালোজিরের ডাক শুনে কুরিদের ঘাটের কাছে পথের উপর দাউদ যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। খোদা কসম, সে এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার সারা মন জুড়ে তখন ফুটকি। কাপড় পেলে ফুটকির মুখচোখের ভাব কেমন হয়, সে তারই একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছিল মনে মনে। সেই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে পথ চলছিল দাউদ। তাই সে সাবধান বা সতর্ক হবার কোনও অবকাশই পেল না। একেবারে কালোজিরের মুখে পড়ে গেল। তারপর কালোজিরে যখন ভিজে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চাইল এবং মিচকি মিচকি হাসল, তখনই সে লবেজান। সে মনে মনে ত্রাহি ডাক ডাকতে লাগল। মুখ শুকিয়ে উঠল, বুকের মধ্যে ধুকপুকানি বেড়ে গেল। ঠিক প্রথম দিন কালোজিরের মুখোমুখি হয়ে তার অবিকল এই অবস্থা হয়েছিল। সেদিন তবু সে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু আজ? কালোজিরে আবার ঘোমটার ফাঁকে হাসল। দাউদ অবশ। সওদাগর! কেমন আস্তে ডাকে কালোজিরে! একটু ফিসফিসে আওয়াজ কিন্তু কী তার জোর! কলজেটা উপড়ে আসতে চায়। সে থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে পথে আর তাকে 'বাড়ি আসো' বলে এক ডাক দিয়ে কালোজিরের মাতাল করা দুলকি দেহ, ভিজে কাপড় শরীরের সঙ্গে একেবারে লেপ্টে আছে, ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে পথে জল ফেলে ফেলে, এই ছবিটা, এখন যখন কালোজিরে তার বুকে পড়ে আছে নিশ্চল, নিস্পন্দ এবং তৃপ্ত, খুলনার দি নিউ মোসলেম হোটেলের, যেখানে পর্দানশীন মহিলাদিগের থাকিবারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এই অন্ধকার ঘরে, ঠিক তখনই তার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠল। দাউদ পালাতে চাইছিল, পারল না। ফুটকির জন্য কেনা শাড়ি দুটো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে সে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছিল, পারল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করল, পারল না। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, সে কালোজিরের ভিজে শরীরের এঁকে যাওয়া চিহ্ন ধরে চলতে শুরু করেছে, প্রথমে ধীরে, পরে ক্রমশ জোরে।

কাল তো চলেই যাবো। তালি আর ভয়ডা কী? বরং দেখাটা দিয়ে যাওয়াই ভালো। বাইতিদারেউ কওয়া হয়ে যাবেনে, আমরা কাল মোকামে চলে যাতিছি। যায়েই খবর দেবো। যদি কোনও দিন ওদিকি যাও বাইতিদা তালি খোঁজ করবা। তুমার তো আর ছোঁওয়া ছুঁয়ি, খাওয়া থাওয়ির বাছবিচের নেই। তুমি আমাগের ওখেনেই উঠবা। তুমার বউমার হাতের রান্না খালি কি তুমার জাত যাবে? মনে তো হয় না। তুমার জাত মারবে কিডা? এই গিরামে তুমিই অ্যাকটা মানুষ বাইতিদা যার কাছে আমি মন খুলে সুখ-দুঃখির কথা জানাতি পারি। তাই তুমার কাছ থে বিদেয় নিতি আলাম।

বাইতিদার ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাউদ ঘামছিল। তার বুকের ধক ধক শব্দ সে কানে শুনতে পাচ্ছিল। 'বাইতিদা' বলে ডাকতে যাবে, দরজা খুলে গেল। ভিজে কাপড় ছাড়ছিল কালোজিরে। সেমিজের উপর শাড়িটা তখন সদ্য পাক দিয়েছে। আঁচল গায়ে তোলেনি।

"ভয় নেই। বাইতি বিকেলে ফেরবে। ভিতরে আসো!" সেই কলজে-ছেঁড়া চাপা স্বরে ডাকল কালোজিরে।

দাউদ ভিতরে ঢুকল। তার হাত থেকে শাড়ি খসে পড়ল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল দাউদ।

রাখহরি প্রচুর মদ খেয়ে এসেছে। তার হাতে বিরাট এক খাঁড়া। সে লাফাচ্ছে, হুংকার ছাড়ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, কাঁদছে। উঠোনময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাইতি।

"কোথায় শ্শালা দাউদ? শ্শালা শুয়োরের বাচ্চা। তোরে না আমি ছোট ভাইর মত দ্যাখতাম। তোরে না আমি মার পেটের ভাইর মত বুকি করে রাখিছিলাম। শেষে তুই আমার বুকি ছোবল দিলি রে দাউদ? বেরিয়ে আয় শ্শালা। তোরে আমি কা'টে দুখোন করে সেই রক্ত দিয়ে চ্যান করব। হাজী চাচা আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি আমার পিতিতুল্য, আপনি আমার বাপ, আপনি বিচের করেন। আমি দাউদরি কাটতি পারি কিনা? বিচের আপনি করবেন। তারপর ওরে বের করে দ্যান। আমি আপনাগের সগলির সামনে ওরে কা'টে টুকরো করে রা'খে যাই।"

হাজী সাহেবের মজলিস ভাঙব ভাঙব করছিল। নফরা গাড়ি জুততে গেছে। বিয়াই বিয়ানকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামাই মেয়ে আজ রাত্তিরে থাকবে, ফটিক আর দাউদকে কাল রওনা করে দিয়ে যাবে। হাজী সাহেব মাথা খাটিয়ে মেয়েকে রাখবার এমন একটা সুন্দর অজুহাত যে বের করতে পেরেছেন, তাইতেই বেশ আমেজে ছিলেন। কেবল রহমানকেই সন্ধ্যে অবধি ছাওয়ালের পাত্তা নেই দেখে, একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। এই সময়ে খাঁড়া হাতে রাখহরি বাইতির প্রবেশে মজলিশ সচকিত হয়ে উঠল।

হাজী সাহেব একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হইছে বাপ, এটটু ঠাণ্ডা মাথায় খোলসা করে কও দিন? দাউদ কী করিছে? কনে দাউদ? আমরাউ তো তার পিত্যেশে বসে আছি।"

"দাউদ বাড়িতি আসেনি!" রাখহরি আর্তনাদ করে উঠল, "চাচা তা'লি আমার সববোনাশ হয়ে গেছে। ওরে দাউদ, ওরে কালোজিরে। তোগের মনে এই ছিল! হায় হায় হায়!"

এবার হাজী সাহেব একরাশ উদ্বেগ নিয়ে বলে উঠলেন, "রাখ বাপ! পরে কাঁদো। শিগগির কও দিন, কী হইছে?"

"চাচা!" বুকফাটা আর্তনাদ করে রাখ বাইতি বলে উঠল, "দাউদ আমার কালোজিরেরে নিয়ে ভাগে পড়িছে। চাচা, যদি জানেন, দাউদ কুথায় গেছে, কয়ে দ্যান আমারে। এর শোধ আমি নেবো।"

"কী মুশকিল, কালোজিরেডা কী, সিডা কবা তো?"

"কালোজিরে," বাইতি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "আমার বউ।"

মজলিশে "কও কী?" বলে সমবেত একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি উঠল। ফটিক বেশ স্পষ্ট-ভাবেই এটা শুনতে পেয়েছিল। তারপরই সে মাথা ঘুরে ছবির পায়ের কাছে পড়ে গেল। তার চেতনা লুপ্ত হল।

কত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে মেয়েরা! দাউদ অবাক হয়ে যায়। খুলনার হোটেলে এসে দাউদ নিজের ঠিক নামটাই লেখাল। শেখ দাউদ। পিতার নাম? ঠিক বলল। শেখ রহমান। বিবির নাম? জিরে বিবি। কোত্থেকে আসা হচ্ছে? দাউদ ঝিনেদার একটা ঠিকানা দিল। চাচার আড়তের। যাওয়া হবে কোথায়? ঢাকা। কোন্ কাজে? দাউদ জবাব দিল, মাছের কারবার খোলবো। ব্যস। প্রশ্ন শেষ। দাউদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাকর একটা চাবি নিয়ে সঙ্গে এল। দাউদ ঘাত ঘোত সব বোঝে। চাকরের হাতে এক সিকি বকশিশ গুজে দিয়ে বলল, "নতুন বিছানা দাও। আর শোনো, বিবিগের হাত মুখ ধুয়ার জায়গাডা কনে? সাফসোফ করে পানিটানি ঠিক করে রাখে আসে আমাগের ডাকবা।"

"জে। আগে বিছানাডা আনে দিই।" লম্বা সালাম দিয়ে চাকরটা চলে গেল।

কালোজিরে বলল, "ইবার ইডা, এই বস্তন্‌নাডা খুলি?" বোরখার ভিতরে সে সেদ্ধ হচ্ছিল।

দাউদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না। আর একটু সবুর কর। বিছানাডা পাতে দিয়ে যাক।"

বলতে না বলতেই চাকরটা বিছানার বাণ্ডিল ঘাড়ে করে ঘরে ঢুকল। তারপর বলল, "জে, এটটু মেহেরবানি করে আপনারা চিয়ারি বসেন। আমি বিছানাডা পাতে দিই।"

চাকরটা দুটো তক্তপোশ জোড়া দিয়ে যখন বিছানা পাতছিল, আর পাশে বোরখা ঢাকা কালোজিরে, আশ্চর্য, তখন এক লহমার জন্য দাউদের মনে হয়েছিল, তার পাশে কালোজিরে নয়, ফটিকই বুঝি বসে আছে। কী হতে কী হয়ে গেল? এখন যখন কালোজিরে তার বুকে সুখে এলিয়ে আছে, ঘুমে অচেতন এবং দাউদের মন হালকা এবং রাত্রি গভীর তখন দাউদের মনে হল, ফটিক ওর পথ চেয়ে জেগে বসে আছে। দাউদের ফটিকের জন্য বেশ কষ্ট হতে লাগল। ফটিকের সঙ্গে সে বেইমানি করেছে। কিন্তু বিশ্বাস কর, দাউদ সেই অন্ধকারে ফটিককে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল, ব্যাপারটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল যে আমার কোনও হাত ছিল না।

কালোজিরে দাউদের শিথিল শরীরটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে খাটের উপর উঠে বসল। বেশবাস ঠিক করে নিয়েই দাউদকে বলল, ওঠো, আর দেরী করো না। দুকানে গিয়ে শিগগির অ্যাকটা সুটকেস আর অ্যাকটা বোরখা কিনে আনো। দুটোর বাসের আর দেরী নেই। ঐ বাসেই বেরোয়ে পড়ব। দাউদ ইতস্তত করছে দেখে কালোজিরে তার চোখের উপর চোখ রেখে বলল, টাকার চিন্তা? এই ন্যাও টাকা। বলেই তোশকের তলা থেকে একমুঠো টাকা এনে ঝনাৎ করে ফেলে দিল। বিশ্বাস করো, ছাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাউদ প্রাণপণে ফটিককে বোঝাতে চাইল, আমি ইডা চাইনি, চাইনি। ফটিক শোনো, আমি এরে নিকে করব। তারপর ঢাকায় ঘর ঠিক করে তুমারেউ নিয়ে আসব। ফটিক, তুমি বিশ্বেস করো।

রহমান নির্কিরি, স্বভাবত শান্ত মানুষ। সাত চড়ে কথা বলে না। হঠাৎ সে খপ করে জ্বলে উঠল, হাঁকড় মেরে বলল, "মিথ্যে কথা! আমার ছাওয়ালের নামে ফের যদি অ্যাকটা কথা কইছ তো তুমার জিভ আমি টানে ছিঁড়ে ফ্যালব।"

জ্ঞান ফিরে আসতেই ফটিক, ছুটকির কোলে তার মাথা, ছবি চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, তার শ্বশুরের কথা শুনতে পেল। হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। সেও মনে মনে বলে উঠল। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দ্যাও ঐ মিথ্যুকটার জিভটা ছিঁড়ে দ্যাও।

রহমানের প্রচন্ড রাগ দেখে রাখহরি থতমত খেয়ে গেল।

হতভম্ব হয়ে রাখহরি বলল, "মিথ্যে কথা! তুমার ছাওয়াল আমার বউরি নিয়ে পালায়ে গেছে, সিডা মিথ্যে কথা? এখেনে বসে বসে ন্যাজ না নাড়ে তালি হাটখুলায় চলো। শুনবা চলো, তুমার গুণধর ছাওয়ালের কীর্তি নিজির কানে শুনবা চলো। তুমি আমার জিভ ছিঁড়ে নিবা, অ্যাঁ? আমার জিভ ছিঁড়ে নিবা? হাজী চাচা, আপনি থাকতি এই হলো বিচের? বলি যার শিল যার নুড়া, তারি ভাঙ্গি দাঁতের গুড়া! এই হলো বিচের! অ্যাঁ? তুমার ছাওয়াল আমার বউ চুরি করিছে, টাকা চুরি করিছে, গয়না নিয়ে ভাগিছে। আমার সব্বসসো নিয়ে গেছে। এই কলাম। ন্যাও, ছেঁড়ো আমার জিভ।"

রাখ একটু থেমেই বুকফাটা চিৎকার করে উঠল—"আসো! ছেঁড়ো—ও।"

হাজী সাহেব এবার নিচে নেমে এলেন। রাখহরিকে জড়িয়ে ধরলেন। ওর হাত থেকে খাঁড়াটা নিয়ে নিলেন, "বাপ রাখো, মাথা গরম করে না। বিপদ আপদ ঘটলি মাথা ঠান্ডা রাখলি, বুদ্ধি বেশী গজায়। চলো উপরে চলো। বসবা চলো। এটটু ঠান্ডা হও। তারপর সব কথা আমারে কও, যাতে ব্যাপারটা বুঝি। তারপর দ্যাখা যাবে, তুমি কী পিরতিকের চাও। তবে অ্যাকটা কথা কই বাপ, বিশ্বেস কর, দাউদ এখেনে নেই। সকালে নাস্তা খায়ে বেরোয়ে গেছে, অ্যাখনও ফেরেনি। আমরা সবাই ওর জন্যি ভাবতিছি। আর তাছাড়া দাউদ যদি অ্যামন কম্ম কোরেই থাকে, কোন্ মুখি এ মুখো হবে? আমরা তারে জায়গাই বা দেবো ক্যান?"

লোকটাকে পিটিয়ে ভাগিয়ে দেচ্ছে না ক্যান উরা? ফটিক বুঝতে পারছে না। ওর সংগে নলপত করে অত কথা কওয়ার দরকারই বা কী? ও মিথ্যুক, ও মিথ্যুক, ও মিথ্যুক।

রহমান বলল, "তুমি যে আমার ছাওয়ালের নামে অ্যাত অ্যাত নালিশ কত্তিছ, তার সাবুদ কিছু আছে? সাক্ষী আছে?"

ঠিক। সাক্ষী কনে? খালি গলাবাজি করেই জিতে যাবা, না? ফটিক বলতে চাইল।

"সাক্ষী?" এবার আর বাইতি চ্যাঁচালো না। শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "আছে। আছে। আছে।"

না। না। না। ফটিক তারস্বরে প্রতিবাদ করবে ভাবল। কিন্তু উৎসাহ পেল না।

লোকটা যেভাবে বলল প্রমাণ আছে সেই কথাতেই ফটিকের বুক কেঁপে গিয়েছিল। লোকটা চলে গেলে হাজী সাহেব খালেককে বাইকে করে হাটখোলা ঘুরে এসে খবর জানাতে বললেন। নেয়ামত যেতে চাইল। হাজী সাহেব তাকে যেতে দিলেন না। খালেক গেল। খালেক আসা পর্যন্ত ফটিক ও-বাড়িতেই বসে থাকল। ফটিক আবার যেন নিজের দুর্গে ফিরে এসেছে। আর অস্থিরতা নেই। ফাঁসির হুকুম শোনার জন্য সে এখন প্রস্তুত। খালেক এসে জানাল, খবরটা সত্যি এবং সাক্ষী-সাবুদ যথেষ্ট আছে। শুধু তাই নয়, হাটখোলার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। হিন্দু নারী অপহরণের জন্য হাটসুদ্ধ হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ক্ষেপে উঠেছে। গ্রামে গ্রামে ওরা খবর পাঠাচ্ছে।

ফটিক সেই যে ও বাড়ি থেকে উঠে চলে এসেছে ঘরে, আর বের হয়নি। রাত্তিরেও খেল না ফটিক। মটকার অন্ধকারে চেয়ে আছে সেই থেকে।

এমন কি আছে সেই মেয়েটার যা তার নেই। যে জন্যে ফটিককে ফেলে সেই মেয়েটাকে নিয়ে ভেগে পড়ল দাউদ? ফটিকের সেই মেয়েটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হল। ফটিক এত হারে কেন? খালি হারছে সে।

হঠাৎ ও বাড়ির কুঁকড়োটা প্রথমে, তারপর প্রায় সংগে সংগেই তাদের বাড়ির কুঁকড়োটা জোরে ডেকে উঠল। একটু পরেই ফজরের নামাজের আজান শুরু হবে। অ্যাঁ, ফজর নামাজের

আজান ? তার মানে তো বিয়ান হয়ে এল ? এর পর আলো ফুটবে। দিন হবে। দলে দলে পড়শীরা এসে জড়ো হবে। কত রকম কথা বলবে লোকে। কত রকম চোখে চাইবে তার দিকে। তার ব্যর্থতা নিয়ে সহানুভূতি সমবেদনা ঠাট্টা বিদ্রূপ কিছু আর বাকী রাখবে না কেউ!

ফুটকি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিঃশব্দে দরজা খুলল। নিরুত্তেজকভাবে ঘরের কোণে রাখা ভরনের ভারি ঘড়াটাকে কাঁখে তুলে নিল। তারপর রোজ যেমন যায় তেমনি খিড়কি পুকুরে চলে গেল। তবে আজ আর হাজীদের বাঁধা ঘাটে না। ওদের ঘাটে গিয়ে দাঁত মাজতে বসল। ধীরে সুস্থে মুখ ধুলো। পরনের শাড়িটা আঁট করে পরল। আঁচলটা যত দূর পারে লম্বা করে নিল। মাঝখানটা দিয়ে নিজের গলায় একটা ফাঁস এমনভাবে বাঁধল যাতে নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট না হয়। আঁচলের মুখটা দিয়ে ঘড়ার গলাটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিল। টেনে টেনে দেখল, খুলবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার!" ফুটকি চমকে উঠল। মোয়াজ্জিন যেন ওর কানের কাছে মুখ এনে আজান দিয়েছে।

ফুটকি নিঃশব্দে জলে নেমে গেল। আঃ ভোরের ঠাণ্ডা জলে তার শরীরের সব তাপ, সব সন্তাপ, সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। খুব আরাম বোধ করল ফুটকি। আঃ কী শান্তি! সে ঘড়া বুকে করে নিঃসাড়ে সাঁতার কেটে একেবারে মাঝ পুকুরে চলে গেল।

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার!" আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান। মোয়াজ্জিনের আহ্বান দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ফুটকি একবার শুকতারাটা দেখে নিল। তারপর ঘড়াটা উল্টে ভরতে লাগল। একটুক্ষণ বগবগ করল তারপর ঘড়াটাই ওকে টেনে নিল অতলে।

নিশুতি রাতের সেই নিস্তব্ধ হোটেলে দাউদ চিত হয়ে শুয়ে আছে। ওর শরীরের উপর উপুড় হয়ে পরম নিশ্চিন্তমনে সেই তখন থেকে ঘুমুচ্ছে কালোজিরে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবার সময় কখনও বা কালোজিরের পেটটা ঠেকছে ওর পেটে আবার কখনও বা বুক ঠেকছে ওর বুকে। শুধু দাউদের চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে ফুটকি। সে অন্ধকার ছাতের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছে। ঐ অন্ধকারের মতই জমাট এবং দৃঢ় এবং অব্যক্ত ফুটকির অভিমান।

আমি কোনও অন্যায় করিনি ফুটকি। আমি কালোজিরের সঙ্গে আসতি চাইনি। আমি তুমার কাছেই যাতিছিলাম। এই যে অ্যাখন যে শাড়িখান কালোজিরে পরে আছে উখান আমি তুমার জন্যিই কিনিছিলাম। কত শাড়িই যে দেখিছি তা আর কি কব? বিশ্বেসগের দুকানে শাড়ির ডাঁই হয়ে গিছিল। কিছুতিই আর পছন্দ হতি চায় না। শেষে দুখোন শাড়ি আমার মনের মত হইছিল। দুখোনই তুমার জন্যি কিনিছিলাম। তুমার কাছেই নিয়ে যাতিছিলাম। তার পরে এই তো কাণ্ড।

আমি হয়ত তুমার সঙ্গে বেইমানি করিছি। কিন্তু আর কোনও অন্যায় করিনি। কালোজিরে বাইতিদার বউ নয় ফুটকি। ওরে শাদী করে ঘরে আনেনি বাইতিদা। খোদা কসম। যাত্রারা গাতি ওগের গিরামে যায়ে ওর সঙ্গে ভাব হয়। ওরে নিয়ে চলে আয়েছে। তাছাড়া আমি কালোজিরেরে ভাগায়ে আনিনি ফুটকি। ও নিজির থেই চলে আয়েছে। নিজির ইচ্ছেয় আমার বিবি হতি চায়েছে। আমি ওরে নিকে করব। তারপর চাচার টাকা আমি যা আনিছি আর বাইতির টাকা কালোজিরে যা আনিছে, তাই দিয়ে নিজিই অ্যাকটা মাছের ব্যবসা করব। কালোজিরে কোয়েছে, ও আমারে দাঁড় করায়ে দেবে। ও মেয়ে কিন্তুক খারাপ নয়। ও যদি, ইশাহ, আমারে দাঁড় করায়ে দ্যায় ফুটকি, তখন তুমারেও নিয়ে আসব। তখন আমরা তিনজনে থাকব। আমার মনে হয় এতে তুমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। মুসলমানের ঘরে দুই বিবি পুষা, কিছুই অন্যায় নয়।

টাকা? চাচার টাকা আমি দাঁড়ায়ে গেলি পেরথমেই শোধ করে দেবো। তারপরে শোধ দেবো বাইতিদার ধার। তাহলিই গোল চুকে গ্যালো। বাইতিদা যদি সুদ চায়, সুদ তো ওগের হারাম নয়, দেবো। কারুর মনেই দুঃখু রাখবো না। আমি জানি ফুটকি, পরের মনে দুঃখু দিলি নিজির মনে দুঃখু পাতি হয়। কালোজিরে বড়ই দুঃখি মেয়ে। বাইতিদার ওখেনে মোটে সুখি ছিল না। ওরেউ আমি সুখি করব। তুমারেউ আমি সুখি করব। আমার কথা তুমার বিশ্বেস হচ্ছে না। খোদা কসম, যা কতিছি, সব আমার দেলের কথা। দেল যা বলে, তা মিথ্যে হয় না। তুমি খালি কটাদিন সবুর কর, ফুটকি, কটাদিন একটু কষ্টেসৃষ্টে চালায়ে ন্যাও।

"আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার!"

চমকে উঠল দাউদ। মোয়াজ্জিন যেন তার কানে মুখ ঠেকিয়ে আজান দিচ্ছে।

"কী হলো?" কালোজিরে ঘুম জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

"ফজর নামাজের আজান শুরু হলো।" দাউদ বলল। "রাত কাবার হয়ে গ্যালো বিবি ওঠেন!"

মধ্যিখানে চর

॥ ১ ॥

কোরট থেকে ফিরে শফিকুল দেখল, বিলকিস জ্বরে বেহুঁশ। ভুল বকছে। ঝিটাকেও বাসায় দেখতে পেল না। ও সোজা গিয়ে বিলকিসের কপালে হাত দিল। গা পুড়ে যাচ্ছে। শফিকুল আদালতের পোশাক না ছেড়েই বিবির পাশে বসে পড়ল। পাশেই হাই ইশকুলের হেড মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেবের বাড়ি। তাঁর মেয়ে সইফুন বিলকিসকে ভাবী ভাবী বলে ডাকে। এক ওদের বাড়ির সঙ্গেই শফিকুলদের যা ঘনিষ্ঠতা। সইফুনকে ডাকবে কিনা সে একবার ভাবল। তারপর কী ভেবে আর তাকে ডাকল না।

শফিকুল বিলকিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে ডাকল, "ছবি! ছবি!"

ওর একবার মনে হল বিলকিস যেন একটু চোখ ফাঁক করেই আবার তা বুজে ফেলল। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চেটেও নিল।

শফিকুল জিজ্ঞেস করল, "পানি খাবে?"

বিলকিস মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

শফিকুল ঘড়া থেকে পানি ভরে ধীরে ধীরে ওকে খাইয়ে দিল।

বিলকিস অস্ফুট স্বরে বলল, "শীত, বড্ড শীত।"

শফিকুল একখানা কাঁথা এনে ওকে ঢেকে দিল। বিলকিস চোখ বুজে ধুঁকতে লাগল।

"তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো," সে বলল, "আমি কোরটের পোশাকটা ছেড়ে আসি।"

বিলকিস কথা বলল না। ওর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল। শফিকুল উঠি উঠি করেও আর উঠতে পারল না। বিলকিসের দুর্বল মুঠির অনুরোধ সে অমান্য করল না। শুধু বাঁ হাত দিয়ে ওর জামার শক্ত কলারটা খুলে দিল। তারপর বিলকিসের কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তারপর? শফিকুল যে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চায়, সেইটাই হঠাৎ অসুস্থ স্ত্রীর শিয়রে বসে তার মনে জেগে উঠল। আর কদিন চালাতে পারবে, এভাবে? নিরুপায় হয়ে বিলকিসের মুখের দিকে চাইল শফিকুল। আজ প্রায় এক বছর হতে চলল জেলা শহরের আদালতে সে যাতায়াত করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে কিছুই করে উঠতে পারেনি। কয়েকজন মুসলমান উকিলও আছেন। বেশ সিনিয়ার। কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান কারও কাছ থেকেই সে পাত্তা পায়নি। শফিকুল সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব, না গ্রহণ না বর্জন। সে আসে যায়। ভাগ্যক্রমে বার লাইব্রেরিতে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার মিলেছে, না হলে বটতলা আশ্রয় করতে হত। সে ঐ চেয়ারে বসে মাছি তাড়ায়। আজ একটা জামিনের দরখাস্ত নিয়ে এত হাঁটাহাঁটি করল থার্ড ম্যাজিস্ট্রেটের কোরটে। কিন্তু তিনি সেটা খারিজ করে দিলেন। এতে খুব ব্যথা পেয়েছে শফিকুল। কারোর কাছ থেকেই সহানুভূতি পাবার উপায় নেই। তাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। তাহলে কী করে সে দাঁড়াবে? এইখানেই পসার করবে। কিন্তু কী করে? সমব্যবসায়ী যারা, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করবে না। বিচারকরাও তার প্রতি কঠোর। আদালতের কেরানী পেশকার, তারাও কেন তার প্রতি এত বিরুদ্ধভাব পোষণ করছে? বাস্তব এত কঠোর এত নিষ্ঠুর যে সে নিরাশ হয়ে পড়ছে। তার উপর ছবি আবার জ্বরে পড়ল।

এই একটা বছর তাকে চালিয়ে এসেছে বিলকিস। কী করে সে-ই জানে! উৎসাহ দিয়েছে তাকে, দিয়েও চলেছে। সে ছবির রুগ্‌ণ মুখটা দেখল। বিলকিস কিছু বলেনি বটে কিন্তু তার সন্দেহ, তার বিবির সম্বলও ফুরিয়ে এসেছে। অতঃ কিম্? এখানকার হাই ইশকুলে একটা সহকারী শিক্ষকের পদ খালি হয়েছিল। জয়নুদ্দিন সাহেব তাকে চাকরিটা নিতে অনুরোধ করেছিলেন। শফিকুল খুবই রাজি ছিল। বিলকিস কিছুতেই তাকে সেটা নিতে দিল না। সে কিছুতেই তাকে অন্য কাজ নিতে দেবে না। জয়নুদ্দিন এখনও আফসোস করেন।

ভুল করলেন। খুব ভুল করলেন। জয়নুদ্দিন প্রায়ই তাকে বলেন। আমাদের মতন গরিব গুরবোর পক্ষে উকালতির পসার জমানো কি চাড্ডিখানি কথা? আপনারে কলাম মিঞা, তা বিবির কথায় নাকচ করে দেলেন।

না, ঠিক্ বিবির কথায় নয়। আসলে আমারই—

আহা দোষ কী, দোষ কী? বুদ্ধমান বিবি হলি, তার কথায় চলালি দোষডা কী? আমার মেয়ে সবই কইছে। কথা তো তা নয়। কথা হচ্ছে চলবে কী কোরে? তা চালায়ে যদি নিতি পারেন, বলার কিছু নেই।

ইশকুলির চাকরিউ যে অ্যামন আহা মরি কিছু ছিল, তা নয়। মাইনের টাকায় সংসার চলতো না। টিউশনি কত্তি হতো। মাসটারি পালি টিউশনি পাওয়া শক্ত হয় না। তবে অ্যাতো আফসোস কত্তিছি ক্যান? কখনও তো মুসলমান ভাইরি জন্যি কিছু করে উঠতি পারিনে।

সে ক্ষমতাই নেই। তাই হঠাৎ কখনও সখনও সুযোগ আলি, সিডা যখন ফস্কায়ে যায়, তখনই আফসোস হয়।

বিলকিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে। মৌলবী জয়নুদ্দিনের কথাগুলো তার কানে ভাসছে। এই লোকটার কথাবার্তা বেশ সাফসোফ। মনে কোনও জড়তা নেই।

ও তার মানে আমি মুসলমান বলেই আপনি আমার উপকার করতে চান? শফিকুল হাসল।

আলবাৎ। আপনি হিন্দু কি নাছারা হলি, আমি আপনার সাহায্য কত্তি যাতাম ভাবতিছেন? মোটেউ না। জয়নুদ্দিনার ত্যামন বান্দা পাননি। আমি ইসলামের খেদমত করি। যা করি মুসলমানগের ভালোর জন্যি করি। আর তাতে দোষ কী? হিন্দুরা কি মুসলমানগের জন্যি কিছু করে? এই তো যান না, নাছারাগের মিশনে। যায়ে অ্যাকবার ভুলুক দিয়ে আসেন গে দেখি। নাছারাগের গিরজে ওদের ছেলে-মেয়েগের ল্যাখাপড়া শিখোবার ব্যবস্থা, হাতের কাজ শিখে করে খাওয়ার ব্যবস্থা, অসুখ হলি চিকিচ্ছের ব্যবস্থা, কত সুন্দর করে সব করে রাখিছে। অ্যাকটা হিন্দু যদি কুথাউ অ্যাকবার ঢুকতি পারলো তো দ্যাখবেন পর পর সব হিন্দুরি উরা ঢুকোয়ে ছাড়বে। ফাঁক পড়তি পড়তিছি আমরা, এই খালি মুসলমানেরা। ক্যান্? না, আমাগের মধ্যি অ্যাকতা নেই। কেউ কারুর ভালো দেখতি পারিনে। ক্যান্, ফজল আলি মিঞা, খোনকার বজলুর রহমান, মৌলবী দিলদার আহমেদ, সমশের আলি চৌধুরী, অ্যাত অ্যাত সব বড় বড় উকিল তো আছে, আমাগের সমাজের মাথা তো উরাই, আপনারে মদত দিতি পারে না? মুসলমানরা যদি বাঁচতি চায় তবে সবাইরি অ্যাক হতি হবে।

শফিকুল বিলকিসের মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে এই ঘরের অন্ধকারের দিকে চেয়েই যেন এই হিতৈষী লোকটিকে কিছু বলতে গেল।

আরে আপনি করবেন কী, আপনি তো নতুন, এই সেদিন আলেন, এখানে আমার অনেক দিন কাটে গ্যালো, বোঝলেন, সব মিঞারেই দেখে নিছি। খোন্‌কার বজলুর রহমান ডিস্‌ট্রিকট বোরডের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন। ছাওয়াল আসে ক'লো বাজান বোরডে অ্যাকটা সারভেয়ার নেবে। আমার বড় ছাওয়াল। কানুনগো ট্রেনিং নিয়ে বসেই ছিল। গ্যালাম উনার কাছে। কলাম ছাওয়ালডা বসে আছে। কানুনগো পাশ করিছে। আপনে আমাগের মুরুব্বি। দ্যান না ছাওয়ালডারে ঢুকোয়ে। তা কলেন কি, অ্যাখন তো খালি কিছু নেই। এর পর তো আর কথা চলে না। ফিরে আলাম। পরে শোনলাম চেয়ারম্যান বো'দে সরকার অ্যাকটা হিন্দু ছাওয়ালরে ঐ পোসটে ঢুকোয়ে দেছে। ছাওয়ালডা আমার মনের দুঃখি রেঙ্গুন চোলে গ্যালো। মুসলমান মুরুব্বি মাতব্বরগের ব্যবহার যদি এই রকমের হয়, তা'লি মুসলমান বাঁচবে! সোবানাল্লাহ্।

বিলকিসের জ্বর বাড়ছে। গা পুড়ে যাচ্ছে। ছটফট করছে। ম্যালেরিয়া। এ জ্বরকে শফিকুল চেনে। এ রকম তারও হয়েছে। তার বাজানেরও হয়। তাই জ্বরের ব্যাপারটা সে বেশি আমল দিল না। তার খারাপ লাগল ছবি জ্বরে পড়ল দেখে। ছবি ছাড়া সংসার অচল। এই এক বছরের মধ্যে বিলকিসের কোনও অসুখ দেখেনি সে। ওর মনে হল বিলকিস বুঝি কিছু বলছে। ওর মুখের কাছে কান নিয়ে গেল শফিকুল। ভুল বকছে। সে আর কালবিলম্ব না করে আদালতের ধরাচুড়া ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নিল। একটা লণ্ঠন জ্বালল। তারপর কুয়ো থেকে ঠাণ্ডাপানি তুলে এনে বিলকিসের মাথা ধুইয়ে দিতে লাগল। পানি ঢালতে ঢালতে ঢালতে শফিকুল এক সময় দেখল, বিলকিস শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শফিকুলও খুব ক্লান্ত বোধ করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, খুব খিদে পেয়েছে। এখেনে সেখেনে হাতড়ে কোথাও কিছু সে পেল না। তার শরীরটা এলিয়ে পড়ছে যেন। তাই বেরিয়ে গিয়ে কিছু আর কিনতে ইচ্ছে করল না। ঝিটাকে দেখল না। কাজ ছেড়ে দিল নাকি? ঢকঢক করে এক গেলাস পানি খেয়ে শফিকুল বিলকিসের পাশেই শুয়ে পড়ল। বিলকিস অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওর শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে। শফিকুল ভাবল, মরীচিকার পিছনে আর কত দৌড়ব। পিছনে দাঁড়াবার কেউ না থাকলে ওকালতিতে কী সুবিধে করতে পারবে সে? তার না আছে পয়সা, না সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ফজল আলি মিঞা, মৌলবী দিলদার আহমেদ, সমশের আলি চৌধুরী ওঁদের সকলের কাছেই গিয়েছিল শফিকুল। জুনিয়ার হতে পারে কিনা, তার ধান্ধায়। আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, ওঁরা প্রথমেই জানতে চেয়েছেন, কোথায় তার বাড়ি, কোন্ বংশের ছেলে সে? এখানে কে আছে মুরুব্বি? যেই শুনেছেন ওঁরা, এখানে তার কোনও খুঁটি নেই, সে মফস্বলের চাষার ঘরের ছেলে, ব্যস্, অমনি ওঁদের আগ্রহ ফুরিয়ে গিয়েছে। বজলুর রহমান একে খোন্‌কার তায় আবার খান বাহাদুর, ওঁর আড়ালে বারের সবাই ওঁকে খয়ের খাঁ বলে, তাই ওঁর কাছে ঘেঁষেনি। তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে। ঈদে ওঁর বাড়িতে প্রতি বছর উনি শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দেন। জজ, ম্যাজিসট্রেট, মুনসেফ, এস পি, ডি এস পি, এস ডি ও, সিভিল সারজেন, বোরড ও বারের মেমবার, ইশকুলের হেড মাস্টার, প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী কাউকে দাওয়াত করতে কসুর করেন না। গত ঈদে তার নামে দাওয়াতের কারড আসেনি। হয়ত আসলে এটা সত্যিকারের ভুল। সে নতুন এসেছে। দাওয়াতিয়াদের তালিকায় হয়ত তার নামটা তুলতে ভুলই হয়ে গিয়েছে। এইভাবেই সে তার আঘাতটাকে হালকা করে তুলতে চাইছিল। ভুলতেই চাইছিল সে। কিন্তু পারেনি। এমনও তো হতে পারে যে সে চাষার

ঘরের ছেলে, খোন্‌কারের দাওয়াতে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তাই আমন্ত্রণ আসেনি। এটা ভুল না হয়ে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার ফলও হতে পারে। বরং এইটেই স্বাভাবিক বলে শফিকুলের মনে হল। এবং সেই থেকে অপমানের আগুন ধিকি ধিকি করে তার মনে জ্বলতে শুরু করেছে। এটা তুচ্ছ ব্যাপার। এই ভেবে ব্যথা ভুলতে চেয়েছে। পারেনি। গরিব বলেই হয়ত অপমানের ক্ষত শুকোতে চায় না।

এই ঘটনার পর থেকে যে এজলাসে খোন্‌কার সাহেবের মামলা থাকে, শফিকুল সেই এজলাসে গিয়েই হাজির হয়। এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে, খোন্‌কারের মামলা লড়ার কৌশল কী? ফৌজদারি মামলায় খোন্‌কারকে জেলার মাত্র আর দুজনই এ'টে উঠতে পারেন, এক দিগীন মিত্তির, আর দুই রায়বাহাদুর ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্জে। এই দুজনকেই উনি মানুষ বলে গণ্য করেন। আর হ্যাঁ, বৈদ্যনাথ ওরফে বো'দে সরকার হচ্ছেন খোন্‌কারের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। জেলা বোরডের প্রাঙ্গণেই এ লড়াই এতদিন সীমাবদ্ধ ছিল। এবার নাকি কাউন্সিলের ইলেকশনেও দুজনে লড়বেন।

এই খবরটাও মৌলবী জয়নুদ্দিনই তাকে জানিয়েছেন। একদিন সকালে সে বাজারটা ভিতরে রেখে সদ্য বাইরে এসে বসেছে, মৌলবী সাহেব এসে বললেন, খবর শুনিছেন? শফিকুল মুখ তুলল। খোন্‌কার ইবার ইলেকশনে দাঁড়াতিছেন। সে তখন ইলেকশনের কথা ভাবছিল না। ভাবছিল টিউশনি শুরু করবে কি না? না হলে সংসার অচল হয়ে যাবে। বলি ও উকিল সাহেব এত ভাবতিছেন কী? যা কই তা মন দিয়ে শোনেন। এই ফাঁকে খোন্‌কারের দলে ভিড়ে যান। খোন্‌কাররে মুরুব্বি পালি পসার আপনার জমতি দেরী হবে না। মৌলবীর প্রস্তাব শুনে শফিকুল হাসবে না রেগে উঠবে ঠিক করতে পারল না। শুধু বলল, খোন্‌কারের ইলেকশনের জন্য আমার আপনার দরকার লাগবে না। ওঁর নিজের লোক ঢের আছে। আসুন, আমরা এখন নিজেদের ভাবনা ভাবি। বাজান খবর পাঠিয়েছেন দেনার দায়ে কিছু জমি বেচে দিতে বাধ্য হয়েছেন। যে জমিটুকু থাকল তাতে যদি ঠিক মত ফসল হয় তবে টায়েটোয়ে সম্বচ্ছর চলে যেতে পারে। বাজান আমার জমি অন্ত প্রাণ। জমি বেচা নয়তো, ওঁর কাছে সেটা পাঁজরার হাড় কেটে বের করে দেওয়া। একে ওঁর শরীর খারাপ তার উপর জমি বেচার এই আঘাত! শফিকুল আর ভাবতে পারল না। মুসলমান আর বাঁচবে না, এই আমি কোয়ে দিলাম উকিল সাহেব। মোসলেম জাহান চারদিকির থেই মার খাচ্ছে। জমি চষছে ফসলের দাম পাচ্ছে না। ল্যাখাপড়া শেখছে চাকরি জোটছে না। যে দিক দিয়েই যান মুসলমানের টিকি হিন্দুর কাছে বাঁধা। খোন্‌কারের জমিদারিতে মুসলমানের অবস্থা বুঝি ভালো? শফিকুলের প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, ঘণ্টা। জমিদার সব অ্যাক। সবাই অ্যাক রকম। তবে কি জানেন, মুসলমান জমিদার আর কটা? তবে হ্যাঁ, ঐ যে কলাম, প্রজা ঠ্যাঙাতি কেউ কম যান না। কিন্তু চাষী তো হলাম গে আমরাই বেশি, তাই জমিদারের লাঠির ঘা-টা, তা হিন্দুই মারুক আর মুসলমানেই মারুক, পড়ছে আসি বেশির ভাগ আমাগেরই পিঠি। করি কী? কন তো?

বিলকিসের আবছা চেহারার দিকে চেয়ে শফিকুল নিজের মনে মনেই বলল, কী আর করার আছে? খোন্‌কার ভোটে দাঁড়িয়ে জিগির তুলবে, মোসলেম সংহতি চাই। মোসলেম জাহানের তরক্কির জন্য, বিপন্ন ইসলামকে বাঁচাবার জন্য আমি মুসলমান আমাকে ভোট দাও! গরিব বড়লোক, প্রজা জমিদার এসব সওয়াল তুলো না। আমাকে ভোট দাও। আর আমরাও মোসলেম জাহানের তরক্কির জন্য খোন্‌কারের তরক্কি করে আসব। ওকে ভোট দেব।

বিলকিস একবার চোখ মেলল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, "বউবিটি"! সাড়া পেল না। শফিকুল ঘুমোচ্ছে। বিলকিস কাতর স্বরে এবার ডাকল, "দাদী! দাদী জান!" সাড়া পেল না। অন্ধকারের দিকে চেয়ে হতাশভাবে বলল, "বড্ড তিস্টা। এটটু পানি।" একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ফুটকি এক ঘড়া পানি এনে ওর মুখের সামনে ধরল, বলল, নে, খা! বিলকিস ধমক দিল, যা ফাজিল। তোর ও পানি কিডা খাবে? ফুটকি বলল, আচ্ছা তালি খুব ঠাণ্ডা পানি আ'নে দিই। ফুটকি হাসতে হাসতে ঘড়ার পানি সব ফেলে দিল। বাপ কত পানি! এ দেখি ফুরোয়ই না। হঠাৎ বিলকিস দেখল, ফুটকি ডুবে যাচ্ছে। ছবি! ছবি! এই নে, পানি নে। ঘড়াটা ধরে ফুটকি প্রাব ডুব জল থেকে হাসতে হাসতে জলভরা অত ভারি ঘড়াটা বিলকিসের দিকে ছুড়ে দিতে চাইল। বিলকিস বলল, না ছুড়িস নে। হাতে হাতে দিয়ে যা। ফুটকি বলল, তালি আগোয়ে আয়। নিয়ে যা ঘড়াডা। বিলকিস বলল, আমার যে ধুম জ্বর আইছে। পানিতি নামব না। ফুটকি হাসতে হাসতে বলল, ধুর বুকা মাধাই, অ্যামন পানি নিলি নে! যাই তোর রাঙা ভাইরি দিয়ে আসি। ঘড়া নিয়ে তলিয়ে গেল ফুটকি। ফুটকি! ফুটকি! কোথায় গেল? আশ্চর্য! বউ বিটি, বউ বিটি! মোচ্ছফেকা ও মোচ্ছফেকা! মোচ্ছফেকা হাসতে হাসতে বলল, কোনো কথা নয়, কোলে অ্যাকটা আনবা তবে ঢুকতি দেবো। বিলকিস বলল, দুহাই মোচ্ছফেকা, অ্যাখন দিল্লাগীর সময় না। এটটু পানি দে। ছিনা ফাটে যাচ্ছে। মোচ্ছফেকা বলল, না কোনো কথা নয়। আগে দ্যাখাও। বিলকিস দেখল আব্বাজান যাচ্ছে। হাতে অ্যাকটা পুকুর। আংটা ধরে হাজী সাহেব

পুকুরটারে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ফুটকি ঘড়া বুকে সাঁতার কাটছে সেই পুকুরের পানিতে। আয় না, এই ছবি! বড় ঠান্ডা পানি। বিলকিস বলল, আমার খুব জ্বর রে ফুটকি। অ্যাখন পানিতি নামতি নেই। আয় না, আয় না, এই ছবি! হঠাৎ বিলকিসের মনে পড়ল, তবে না ফুটকি মরে গিয়েছিল! এই ফুটকি, তুই না ম'রে গিছিস। ফুটকি হাসতে হাসতে বলল, কিডা কইছে? বিলকিস বলল, গিরামের মানুষ সবাই কতিছে। ফুটকি খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, আর তোর রাঙা ভাই? সে কী কয়? বিলকিস বলল, রাঙা ভাইরি পাবো কনে। সে যে সেই গেছে আর তো ফেরেনি! ফুটকি হাসতে হাসতে বলল, তালি তারে খুঁজে আনি। ফুটকি ডুবে যেতে লাগল। বাজান! বাজান! বিলকিস চেঁচিয়ে উঠল, ধরেন, ফুটকিরি ধরেন। বাজান, ও যে ডুবে গ্যালো! আশ্চর্য, বাজান ওর ডাক শুনতেই পাচ্ছে না। বিলকিস ওর বাপের পিছনে দৌড়চ্ছে, প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। বিলকিসের বাঁ হাতে ছোট্ট সুন্দর একটা বেতের টুকরি। টুকরিটা কাত হয়ে যাওয়ায় ভেতরের মুড়কিগুলো সব ঝুর ঝুর করে পথে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। একটা কুকুর সেগুলো খেয়ে নিচ্ছে আর লেজ নাড়তে নাড়তে বিলকিসের পিছু পিছু ছুটছে। বিলকিস কাঁদছে, বাজান আমারে নিয়ে যান। আমারে নিয়ে যান। কাঁদছে আর ছুটছে বিলকিস। বাপের ভ্রুক্ষেপ নেই। বিলকিস ছুটতে ছুটতে বাপকে প্রায় ধরে ধরে এমন সময় ওর ফ্রকটা আটকে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বিলকিস। বাজান! বাজান! হঠাৎ বাজান ফিরে চাইলেন। ও আমার সুনা, ও আমার মণি, তুমি অ্যাদ্দুর আসে পড়িছ আমার পিছনে পিছনে। অ্যাঁ, করিছ কী? আসো আসো, কোলে আসো। বাপ বিলকিসকে কোলে নিতে যাবেন এমন সময় বাপের হাতে পুকুর দেখে বিলকিস বায়না ধরল, বাজান, পানি খাব। বাজান বলে উঠলেন, উরি সববোনাশ এ পানি কী খাতি আছে বিটি? এ তো আমি ফেলে দিতি যাচ্ছি। বিলকিস জিজ্ঞেস করল, ক্যান, এ পানির হইছেডা কী? বাজান বললেন, এ পানি নাপাক। এ পানিতি মুর্দা আছে। ফুটকি এই পানিতি ডুবে মরিছে। ইন্না লিল্লাহে অ ইন্না ইলাইহে রাজিউন। কও বিটি, তুমিউ কও। বাজান, বাজান, ঐ ঐ তো ফুটকি। পানির মধ্যি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে হাসতিছে। ফুটকি হাসছে। বাজানের হাত থেকে পুকুরের আংটা খসে গেল। পানি চলকে পড়ল পথে আর একটা বিরাট ঢেউ-এর ধাক্কায় বিলকিস কোথায় চলে গেল। একা। ডুবছে বিলকিস। অন্ধকার। ভাসছে বিলকিস। অন্ধকার। বিলকিস অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আশ্রয় খুঁজছে। হঠাৎ ফটিকের গায়ে তার হাতটা পড়ল।

চোখ মেলল বিলকিস। অন্ধকার। হাঁফাচ্ছে বিলকিস। সে কোথায়? তার সারা শরীর ভিজে শপ্ শপ করছে। এত পানি কোথা থেকে এল? আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নেবে ভাবল। কিন্তু এত দুর্বল যে হাত তুলতে কষ্ট হল। ফটিক ঘুমুচ্ছে পাশে। বিলকিসের খুব তেষ্টা পেয়েছে। সে ফটিকের গায়ে হাত দিল। ফটিকের ঘুম ভাঙল না। বিলকিসের খুব খারাপ লাগছে। খুব একা লাগছে। ভয় করছে। জিভটা শুকনো। মুখটা বিস্বাদ। লোকটা ঘুমোচ্ছে কেন? উঠুক। তার সঙ্গে কথা বলুক। তাকে ডাকুক। তার ভয়টা ভাঙিয়ে দিক আদর করে। সারা শরীরটা আর তার জোড়গুলো সব শিথিল। বিলকিসের গলা শুকিয়ে কাঠ। তার ভাল লাগছে না। একটুও ভাল লাগছে না। লোকটা সাড়া দিচ্ছে না কেন? পানি, এটটু পানি খাওয়াবেন? লোকটা কোনও সাড়া দিল না। সে নিজে উঠতে গেল। পারল না। লোকটার গায়ে ধাক্কা দিতে গেল, হাতটা গড়িয়ে আলতোভাবে ফটিকের গায়ে পড়ল। তার শরীরটা কেমন আনচান করছে। সে খুব ঘামছে। তালি কি আমি পানি না খায়ে মরব? আমার কি কেউ নেই? বিলকিসের খুব অভিমান হল। ঝরঝর করে অকারণে কাঁদতে লাগল। বাজানের কথা তার খুব মনে পড়তে লাগল। বাজান থাকলে এমন হতে পারত না। তাকে একা ভয়ে মরতে হত না। একটু সর্দি লেগেছে ছবির অমনি বাজান অস্থির হয়ে উঠতেন। হুপিং কাশি হয়েছে ছবির, ডাক্তার বদ্যি বাড়ির লোক সবাইকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়তেন। অসুখে পড়ে ছবির ঘুম নেই রাত্রে। বাজান রাতের পর রাত ছবিকে বুকে করে ঘরে পায়চারি করেছেন। পানি খাব বলা মাত্র ঝিনুকে করে বাজান পানি খাইয়ে দিয়েছেন। বাজান থাকলি কখন তার গলায় পানি পড়ে যা'তো! ছবি বাজানকেই ডাকতে লাগল মনে মনে। বাজান আপনি আসেন। আমারে এটটু পানি দ্যান। আমার গায়ে এটটু হাত বুলোয়ে দ্যান। আমার মাথাটা এটটু টিপে দ্যান। আমারে এটটু বাতাস করেন। বিলকিসের কান্না ক্রমশই বাড়ছে। প্রথম নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছিল। তারপরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তারপর হাপুস নয়নে। বাপের কথা যত মনে হচ্ছে ততই কান্না বেড়ে যাচ্ছে বিলকিসের। নিজেকে আর থামাতে পারছে না। ওর কেমন মনে হচ্ছে ওর বাজান মরে গিয়েছে। যেই না একথা মনে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে বিলকিস 'বাজান বাজান' বলে কেঁদে উঠল। সেই শব্দে ফটিকের ঘুম ভেঙে গেল।

"কী হয়েছে ছবি, কী হয়েছে?" ফটিক ব্যস্ত হয়ে বিলকিসকে জড়িয়ে ধরল, "ভয় পেয়েছ? খারাপ স্বপ্ন দেখেছ? শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে? কী হয়েছে, আমাকে বল? কাঁদছ কেন?"

ফটিকের এত উদ্বেগ দেখে, ঠিক বাজানের মত, বিলকিস নিজেকে ক্রমশ সংযত করে আনতে লাগল। প্রচুর ফোঁপাচ্ছে।

"পানি খাবে ছবি?" ফটিক কিছু বুঝতে পারছে না। কী করবে সে এখন? ডাক্তার ডাকবে? সইফুনের বাজানকে ডাকবে? না কী করবে? "পানি দেবো, ছবি? খাবে?"

অতি কষ্টে কান্না থামিয়ে বিলকিস বলল, "পানি দ্যান।"

ফটিক উঠে লণ্ঠনের আলোটাকে উস্‌কে দিল। তারপর এক হাত দিয়ে ওর মাথাটাকে একটুখানি উঁচু করে ধরে ফটিক একটু একটু করে ওর মুখে পানি দিতে লাগল। ধীরে ধীরে বিলকিসের তেষ্টা মিটে আসতে লাগল। একবার ওর খালি পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। একবার ওর বুকের ভিতরটা কেমন খালি খালি ঠেকল। যেন সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। তারপর ক্রমে সুস্থ হল। বালিসে মাথাটা কাত করে চোখ বুজে ঝিম মেরে পড়ে থাকল। চোখ আর মেলতে পারছে না, এতই শ্রান্ত। ফটিক ওর ঘাম মুছিয়ে দিল। চুলে বিলি কেটে দিতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ পাখা চালিয়ে বাতাসও করল। বিলকিসের খুব আরাম বোধ হতে লাগল। আবার লজ্জাও। কোথায় সে ফটিকের সেবা করবে, না ফটিকের সেবাই তাকে নিতে হচ্ছে। বিলকিস হাত বাড়িয়ে পাখাটা নিতে গেল। পাখায় ওর হাত ঠেকতেই ঠকাস করে একটা আওয়াজ হল।

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "কী, লাগল ?"

বিলকিস ক্লান্ত স্বরে বলল, "না। থাক আর বাতাস দিতি লাগবে না।"

"এখন কেমন লাগছে তোমার ?" ফটিক জিজ্ঞেস করল।

বিলকিস বলল, "এখন আগের চাইতি ভালো ঠেকতিছে।"

ফটিক বিলকিসের গালে নিজের গালটা ঠেকিয়ে ওর গায়ের তাপটা অনুমান করার চেষ্টা করল। নাঃ অনেক কমেছে। সে স্বস্তি পেল।

"বাব্বাঃ! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! কোরট থেকে ফিরে দেখি তোমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। একেবারে বেহুঁশ। ভুল বকছ। শীতে কাঁপছিলে, কাঁথা চাপা দিলাম। কতবার পানি খেতে চাইলে, খাওয়ালাম। তারপর দেখি জ্বর বাড়ছে। বাড়ছে তো বাড়ছেই। ভুল বকতে শুরু করলে। প্রথমে কপালে জলপট্টি দিলাম। কিছু হল না। বাড়িতে একটা লোক নেই। জালালের মাও কি ভেগে পড়ল নাকি ?"

বিলকিস মন দিয়ে শুনছিল। বেচারি খুব নাজেহাল হয়েছে আজ। ফটিক তাকে এত যত্ন করেছে! শুনতে তার যেমন ভাল লাগছিল আবার তেমনি লজ্জাও।

বলল, "না, ভাগেনি। এ ব্যালাটা ছুট নেছে। জরুরী দরকার আছে কলো। আমি কি জানি, আমার অ্যামন জ্বর আসবে ? তালি কি আর ওরে ছাড়ি ?"

"হ্যাঁ, একজন হাতের কাছে থাকলে সুবিধে হয়।" ফটিক বলল, "ডাক্তার ডাকার দরকার হলেই ঝঞ্ঝাটে পড়তাম। তোমার কাছে বসা মাত্র তুমি হাত চেপে ধরলে। তখন তোমার হুঁশ নেই। এদিকে পানি খাব পানি খাব বলে অস্থির করে তুলছ, আবার ওদিকে হাতও ছাড়ছ না। এদিকে শরীরে যা জ্বর, তাতে মাথায় পানি ঢালা দরকার। কিন্তু তুমি উঠতেই দিচ্ছ না। ভাবলাম, শেষ ভরসা সইফুন। ও তো যখন তখন হুটহাট করে চলে আসে। তাহলে ওকে তোমার কাছে বসিয়ে রেখে একবার উঠে যাব। তা এমনই বদনসিব সইফুনও এল না।"

"সইফুনরা যে মামার বাড়ি গেছে।" বিলকিস বলল।

"কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, যখন কেউ এল না," ফটিক বলল, "তখন তোমার হাত ছাড়িয়ে উঠে পড়লাম। কোরটের পোশাক ছেড়ে পানি তুলে আনলাম কুয়ো থেকে, তারপর বেশ করে ঢালতে ঢালতে দেখি তোমার ঘুম এল। তারপর তোমার পাশে আমিও শুয়ে পড়লাম।"

বিলকিসের ভাল লাগছিল। খুব ভাল লাগছিল এসব কথা শুনতে। সে ফটিকের কাছ ঘেঁষে শুলো। তারপর ফটিকের হাত ধরল।

বলল, "জ্বরটা আসে আপনারে খুব মুশকিলি ফ্যালায়ে দেছে। না ?"

ফটিক বলল, "জ্বর হয়েছে তোমার। আমার আর মুশকিল কী ?"

"খাওয়া হইছে ?"

"না।"

"দ্যাখেন তো।" বিলকিস ভারি গলায় বলল। "আমি বুঝিতিই পারিনি যে, আমার এমন ধুম জ্বর আসবে। তালি আর জালালের মারে ছাড়তাম না। ও-ও চলে গ্যালো আর তার একটু পরের থে আমার জ্বর আসতি লাগল। সে কী কাঁপুনী! জানেন, আমার খুব ভয় হইছিল। আমার মনে হতিছিল, আমি যদি মরে যাই তালি কী হবে ?"

বিলকিস আরও সরে এল ফটিকের কাছে। ওর বুকে নিজের মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে থাকল।

ফটিক একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বিলকিস কোনও জবাব পেল না।

বিলকিস আবার বলল, "আপনার তো খাওয়াও হয়নি ?"

ফটিক হঠাৎ বলল, "না। এবার ঘুমোও। রাত অনেক হয়েছে।"

তারপর চুপ করে গেল। বিলকিসও চুপ করে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে বিলকিস ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ঘুমোয়ে পড়িছেন ?"

ফটিক উত্তর দিল, "না।"

বিলকিস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। "আপনি কি নারাজ হইছেন ?"

"না। ঘুমোও।"

আসলে বিলকিসের ঘুমোতে ভাল লাগছিল না। ওর ভয় করছিল। আবার যদি ওই রকম বদ স্বপ্ন দেখে ? ফটিককে যদি দেখে আবার ? কিন্তু ফটিকের মনে আবার সেই নৈরাশ্যের ভাবটা

মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। তার কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না। সে চুপ করে শুয়ে থাকতে চাইছিল। বিলকিস ফটিকের এই ভাবান্তরের কোনও কারণ খুঁজে পেল না। সে ভাবল, কোনও অপরাধ সে হয়ত করে ফেলেছে। ফটিকের কাছে মাফ চাইবার ইচ্ছা হচ্ছিল তার। ফটিক কথা বন্ধ করে দিল কেন হঠাৎ। কোন্ অপরাধ সে এর মধ্যে আবার হঠাৎ করে বসল? ভাবতে লাগল বিলকিস। বুঝতে পারল না। আজকাল প্রায়ই এরকম করে লোকটা। বেশ কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। কেন? ভাবতে ভাবতে তার দুর্বল মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। সে কি ওকে বিরক্ত করে? সে কি কোনও অপরাধ করে? কিছুই বুঝতে পারে না। নিজেকে তার কেমন অপরাধী লাগে। একটু সাহায্য করুক না লোকটা? বিলকিস তো মাফ চাইবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। একটু বলুক না মুখ ফুটে, কী তার অপরাধ? সে তক্ষুনি মাফ চেয়ে নেবে। একবার বলুক ফটিক? সে উসখুস করতে লাগল।

ফটিক নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। আজকাল প্রায়ই তার এমন হচ্ছে। কেবলই নিরাশার মধ্যে ডুবছে সে। কীই বা করতে পারল জীবনে? সে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল। সে সমাজের এত নিচুতলার লোক যে কুয়ো বেয়ে মুখে উঠতেই তার দম ফুরিয়ে যায়। তার আর পুঁজি কোথায় যে আরও উপরে উঠবে? খোনকার জাতীয় লোকেরা ওর তুলনায় বলতে গেলে তো সুযোগ সুবিধের একেবারে চুড়োয় বসে আছে। ঐ সব ঘরের ছেলেরাই তো উন্নতি করবে। গড়গড় করে উপরে উঠে যাবে। নিজের সম্পর্কে সে একটা বেশ উঁচু ধারণা তৈরি করে রেখেছিল। বাস্তব অবস্থা বিচার না করেই এমন একটা উঁচু ধারণা করে রাখাটা উচিত কাজ হয়নি। স্কুল কলেজে লেখাপড়া করা এক জিনিস আর পেশার জগতে ঢুকে করে খাওয়া অন্য জিনিস।

মিস পালিত তাঁর বাবার চেম্বারে আরটিকেলড হওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন বলে ওকে জানিয়েছিলেন। মিস পালিতের প্রস্তাব শফিকুল বিনীতভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিল। কেন না, তখনও নিজের সম্পর্কে তার একটা ভাল ধারণা ছিল। এখন কি সেজন্য অনুশোচনা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ কি না বলতে ফটিক দেখল অসুবিধা হচ্ছে। সে কি মিস পালিতের পরামর্শ না মেনে ভুল করেছে?

"আমি কী দোষ করিছি?" বিলকিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেই ফেলল।

শফিকুল বাধা পেয়ে বিরক্ত হল। বিরক্তি দমন করে বলল, "তোমার অসুখ হয়েছে। এটা তো কারও দোষ হতে পারে না। দোষ করবে কেন?"

"তাহলি আমার সংগে কথা কচ্ছেন না ক্যান?" বিলকিস কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমার সংগে আপনার কথা কতি কি ভালো লাগে না?"

"না না, একথা বলছ কেন ছবি? তোমার অসুখ, রাত এখন অনেক। তোমার তো ঘুমনো উচিত। এসো তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। তুমি ঘুমোও।"

"ঘুমোতি আমার ভয় কত্তিছে।"

"ঘুমোতে ভয় করছে। সে আবার কী?"

"যদি ফুটকিরি আবার দেখি? আমি ঘুমোলেই ফুটকি আসতিছে। আর ডুব জলে দাঁড়ায়ে কেবল আমারে ডাকতিছে। যদি আমি চলে যাই? যদি আমি মরে যাই।"

ফটিক বিলকিসের কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। ভয়ও পেল সে।

"কী যা তা বকছ। ও তোমার মনের ভুল ছবি। তুমি মরার কথা ভাবছ কেন?"

"একটু আগেই আইছিল ফুটকি। আয় না ছবি, আয় না কো'য়ে আমারে কেবলই ডাকতিছিল।"

বিলকিস তারপর হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ফটিককে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। "আমি অ্যাখন মরব না। যাব না, আমি যাব না, যাব না। আপনি আমারে ধরে রাখেন। কিছুতিই যাতি দেবেন না।"

ফটিক দেখল বিলকিসের আবার জ্বর বাড়ছে। তার খুব অনুশোচনা হলো।

ছিঃ, এমন অবস্থায় ছবির উপর নজর না দিয়ে আত্মচিন্তায় মগ্ন হওয়া উচিত হয়নি। ছবির উপরই সব নজরটা দেওয়া উচিত ছিল।

ফটিক ছবিকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। তার শরীরটা কী গরম। ফটিক চমকে উঠল।

॥ ২ ॥

শফিকুলের নাওয়াখাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বিলকিসের অসুখটা হঠাৎ কেমন বাঁকা পথ ধরল। বিলকিসকে ফেলে ওর কোরটে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যদিও সইফুন, সইফুনের আম্মা এ'রা কেউ না কেউ সারাক্ষণ থেকেছেন, সত্যি ওঁদের ঋণ শোধ দেবার সাধ্য শফিকুলের নেই, তথাপি বিলকিস ওকে নড়ে বসতে দেয়নি। জেগে থাকলে সর্বদাই চোখের সামনে থাকতে হয়েছে। চোখ বুজে থাকলে ওর হাতখানা ধরে পাশে বসে থাকতে হয়েছে। সিভিল সারজনকে ডেকেছিল শফিকুল। তিনি এসে আদ্যোপান্ত ইতিহাস শুনে বললেন, ফুটকির অস্বাভাবিক মৃত্যুটা বিলকিসের মনের অবচেতনে ঘা দিয়েছিল। তারপর পরিবার-পরিজনহীন এই বাড়িতে যখন ও একা কাটার

তখন তাই নিয়ে অজ্ঞাতসারে ওর মনের মধ্যে তো// ।ড় করে। এতদিন শরীর সুস্থ ছিল, তাই কিছু বোঝা যায়নি। একটা বড় রকম জ্বর হতেই শরীর ও মন দুই জায়গাতেই একসঙ্গে আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। শরীরটা আমি সারিয়ে দিচ্ছি। মনটাকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। ইউ ক্যান ডু মোর দ্যান এনি ডক্টর ক্যান ডু। ওর বাবা-মাকে আসতে বলুন।

শফিকুল কালবিলম্ব না করে মৌলবী জয়নুদ্দিনকে পাঠিয়ে হাজী সাহেব আর নয়মোনকে আনিয়ে নিল। সে নিজেও কিন্তু কিন্তু হয়ে আছে সেই রাত্রির ঘটনার জন্য। বিলকিস যে ভয় পাচ্ছে এবং ভয়টা কাটাবার জন্যই তার সঙ্গে কথা বলতে অত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, এটা সে সত্যিই বুঝতে পারেনি। আর একটু যত্ন যদি সে সেদিন নিত, তাহলে আর ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না।

ভাগ্যিস শ্বশুর আর শাশুড়ী এসে গিয়েছিলেন। না হলে খুব আতান্তরে পড়ে যেত। কারণ এই ডামাডোলের মধ্যেই ওর পারট টাইম মুহুরি হরিবল্লভ নাথ এক মামলা এনে হাজির করল। শ্বশুর শাশুড়ী সবে এসে পৌঁচেছেন।

হরি মুহুরি বলল, "উকিল সাহেব, অ্যাকটা বড় কেস হাতে নেবেন? পয়সা নেই কিন্তু। এই যে বদরুদ্দি, আর এ হল সদরুদ্দি।"

ওরা দুজন সালাম করে দাঁড়াল। দুজনেই বৃদ্ধ। চাষা। ঠিক যেন ওর বাপ।

হরি মুহুরি বলল, "ইরা দুই ভাই। বদরুদ্দির দুই আর সদরুদ্দির এক, এই তিন জুয়ান ছাওয়ালরি একেবারে ৩৭৬ ধারায় চালান করে দেছে।"

শফিকুল বলল, "বলেন কি? সে তো রেপ কেস।"

বদরুদ্দি আর সদরুদ্দি দুজনেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "হুজুর, উরা নির্দুষী। মিথ্যে মামলায় ওগেরে ফাঁসায়ে দেছে আমাগের গিরামের গোমস্তা কুঞ্জ কায়েত। যে মেয়েছেলেডার নামে মামলা দায়ের করিছে, সেই চিন্তামণি, ঐ কুঞ্জরই ভাগ চাষী পরাণ বোরেগীর বউ। আসলে কুঞ্জরই রক্ষিতা। এমনিতিউ ওর স্বভাব ভালো না। গিরামের জুয়ান ছেলেগের বড্ড খারাপ করে। একথা সবাই জানে। হুজুর আমাগের ছাওয়াল তিনডেরে বাঁচায়ে দ্যান। দুহাই আপনার।"

শফিকুল একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু মুহুরি মশাই আমার বিবির যে বড় বাড়াবাড়ি অসুখ।"

"তবে যাও," হরি মুহুরি বলল, "হাপু গাও গে। ছাওয়ালগের দ্বীপান্তর যদি নাও হয় তাহলিউ অন্তত দশ বচ্ছর ঘানি টানায়ে ছাড়বে। টাকা নেই, পয়সা নেই, ও-পক্ষে আবার খান বাহাদুরি দাঁড় করায়েছে, কোন উকিল আর এ-কেস ছোঁবে? আবার আই উইটনেস জুগাড় করিছে। এ অ্যাকেবারে রাজযক্ষ্মা।"

"সব সাজানো হুজুর। সব সাজানো সাক্ষী। সবাই ঐ কুঞ্জ কায়েতের নিজির লোক।"

"ও-দিকে বুঝি খোনকার দাঁড়িয়েছেন?" শফিকুলের স্বরে একটু আগ্রহের ভাব দেখা গেল, "সে তো অনেক পয়সার ব্যাপার।"

হরি মুহুরি বলল, "ওঁর তো অ্যাখন হাজির হলিই অ্যাক মোহর।"

"ও বাবা, আবার মোহর?"

"খান বাহাদুর চালু করিছেন," হরি বলল, "দ্যাখাদেখি রায় বাহাদুরউ ফলো কত্তিছেন। এলাইনি গরজ বড় বালাই। বোঝলেন না? গরজে পড়লি ভূতে ঢ্যালা বয়, তা উকিলের হাতে মোহর আনে দেবে, এ আর বড় কথা কী?"

"আমাগের অ্যাকদম পয়সা নেই হুজুর।" সদরুদ্দি বলল, "মুসলমানের ছাওয়াল, ইমান জামিন রাখে কচ্ছি হুজুর, সামান্য কানি কয়েক জমি আছে। তাতি বছর চলে না।"

হরি ধমকাল, "আরে বিটা, জমি বড় না ছাওয়াল বড়? অ্যাঁ! অ্যাখনউ জমি জমি কত্তিছে। ইরা কি মানুষ না ভূত? অ্যাঁ!"

"হুজুর আপনি দয়া না কল্লি ভাসে যাব।" বদরুদ্দি কাতর স্বরে হাত জোড় করে বলল, "আল্লা ছাড়া আমাগের আর কেউ নেই। হুজুর, আল্লা আপনারে দৌলত ইজ্জত সব দেবেন। হুজুর।"

শফিকুল একটু ভাবল। তারপর বলল, "মুহুরি মশাই, ওদের দিয়ে ওকালতনামায় দস্তখত করিয়ে নিন গে। কোরটে দেখা হবে।"

ওরা চলে যেতেই শফিকুল দেখল, হাজী সাহেব বাইরের ঘরের তক্তপোশে বসে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

শফিকুল কিছু বলবার আগেই হাজী সাহেব বলে উঠলেন, "ছবির জন্যি একটুও ভাববা না। সব চাইতি বড় উকিলির সঙ্গে লড়তি যাচ্ছ, তুমি তুমার ভাবনাডাই ভাবো বাপ। এদিক আমরা দেখতিছি। আল্লা তুমার সহায় হোন।"

শফিকুল মামলা নিয়ে মেতে উঠল। ৩৭৬ ধারার মামলা। বলাৎকারের অভিযোগ। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর বনাম মোহাম্মদ বশিরুদ্দি ওরফে সানা মিঞা এবং অন্যান্য। সরকার পক্ষের প্রধান এবং পয়লা নম্বর সাক্ষী অর্থাৎ ফরিয়াদী শ্রীমতী চিন্তামণি দাসী, দ্বিতীয় সাক্ষী তার স্বামী শ্রীপরাণচন্দ্র বৈরাগী, তৃতীয় সাক্ষী শ্রীকুঞ্জবিহারী সরকার, চতুর্থ সাক্ষী চৌকিদার শ্রীঘনরাম পাইক ইত্যাদি। প্রথম আসামী মোহাম্মদ বশিরুদ্দি, পিতা মোহাম্মদ বদরুদ্দি, সাকিন বেচাইতলা,

থানা কোতোয়ালী, দ্বিতীয় আসামী মোহাম্মদ মইনুদ্দি, ওরফে মজনু মিঞা, পিতা ও সাং ঐ, তৃতীয় আসামী মোহাম্মদ মনিরুদ্দি ওরফে গজু মিঞা, পিতা মোহাম্মদ সদরুদ্দি, সাং ঐ।

অভিযোগ ঃ সরকার পক্ষের ১নং সাক্ষী, পার্শ্ববর্তী পার চাকলা গ্রামের শ্রীমতী চিন্তামণি দাসীকে দিনদুপুরে তার শোবার ঘরে ঢুকে উক্ত তিনজন আসামী কর্তৃক উপর্যুপরি বলাৎকার এবং তজ্জনিত অত্যাচারের ফলে গর্ভপাত ঘটানো, ২নং সরকারী সাক্ষী তার স্বামী শ্রীপরাণচন্দ্র বৈরাগীকে বলপূর্বক আটক রাখা এবং ৪নং সরকারী সাক্ষী, গ্রামের চৌকিদার শ্রীঘনরাম পাইককে মারধোর। ঘটনার তারিখ ১০ এপ্রিল ১৯৩৬। থানায় এজাহারের তারিখ ১১ এপ্রিল ১৯৩৬। চৌকিদারকে মারাপিটের অভিযোগ সম্পর্কে এজাহারের তারিখ ১৩ এপ্রিল ১৯৩৬।

সরকার পক্ষের উকিল খানবাহাদুর খোনকার বজলুর রহমান এবং আসামী পক্ষের উকিল শফিকুল মোল্লা। শফিকুল মোল্লা? সেসন জজ রায় পীতাম্বর চক্রবর্তী বাহাদুর বিস্মিতভাবে আদালতের দিকে চাইলেন। "কাউনসেল শফিকুল মোল্লা কে?"

খোনকার জজ সাহেবের মনোভাব আন্দাজ করে সংগে সংগে টিপ্পনী কাটলেন, "এ গ্রীন হরন ইওর অনার।"

জজ সাহেব পালটা দিলেন, "নেভার ইগনোর এনিথিং গ্রিন স্যার, এ গ্রিন ব্যামবু অফ টু ডে মে টারন টু বি এ ইয়েলো ওয়ান অফ টুমরো।"

জজ সাহেব ওর নামটা বলা মাত্র শফিকুল উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল। ও ভেবেছিল একটা ছিমছাম জবাব দিয়ে জজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যেমনভাবে কলেজের মুট কোরটে সহপাঠীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু সেসন জজের এজলাসে এতগুলো লোকের চোখের সামনে শফিকুল এমনই ঘাবড়ে গেল যে একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বের হল না। ওর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, গলা শুকিয়ে গিয়েছে, বুক ঢিপ ঢিপ করছে। কী করে যে পা দুটোর থরথরানিকে বেশী প্রশ্রয় দেয়নি সে নিজেও জানে না।

জজ সাহেব ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, "ওয়েল ইয়ং ফ্রেন্ড, জাসটিস ইজ ব্লাইনড, ডু ইউ নো হোয়াট ডাজ ইট মিন?"

শফিকুল হঠাৎ জড়তা কাটিয়ে উঠল। বলল, "ইওর অনার এখানে ব্লাইনড মানে অন্ধ হবে না, হবে ইমপারশিয়াল। নিরপেক্ষ।"

"হোয়াই?" জজ সাহেব বললেন, "মে আই নো।"

শফিকুল ক্রমশই উৎসাহিত হয়ে উঠছে। বলল, "ইওর অনার, জাসটিসের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে প্রসেস। এটা সত্যে পৌঁছুবার পন্থা। এখানে আমরা কিছুতেই অন্ধভাবে পথ চলতে পারি নে। ইওর অনার, ব্লাইনডনেস মানে অন্ধত্ব, এখানে জাসটিসের পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করে। এখানে চোখ কান এবং বুদ্ধি বিচার খোলা রাখাই অভিপ্রেত। জাসটিসের দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে জাজমেনট অর্থাৎ রায়। এখানে, ইওর অনার নিরপেক্ষতার মেটাফর হিসাবে ব্লাইনড কথাটা ব্যবহার করা যায়।"

"থ্যাংক ইউ, ইউ হ্যাভ মেড এ পয়েনট।" জজ সাহেব বললেন। "ওয়েল টেক ইওর সিট প্লিজ। রিমেমবার ইটস এ লং জারনি অ্যানড ইটস এন আপ হিল জারনি, অ্যান্ড হি হু শ্যাল বি দি মোসট সিনসিয়ার, দি মোসট পেইনসটেকিং, ওনলি হি শ্যাল মেক ইট। গুড লাক। গড ব্লেস ইউ।"

বিরতির সময়েই শফিকুল তার মক্কেলদের সংগে দেখা করে নিয়েছিল। এবং তাদের বলে দিয়েছিল তারা নির্দোষ, এছাড়া যেন একটা কথাও না বলে। মামলাটা যত গড়াচ্ছে, ততই শফিকুল দেখল সেটা জটিল হয়ে উঠছে। রেপ কেস-এ আসামী পক্ষের হয়ে মামলা লড়ার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে এটা এমনি একটা অপরাধ যার কথা শোনামাত্র সকলের সহানুভূতি ফরিয়াদীর উপর পড়ে। বিশেষত ফরিয়াদী যদি যুবতী হয় এবং তার মুখখানা যদি এমন ঢলঢলে হয় যে দেখলেই তার উপর মায়া পড়ে, তাহলে আসামীকে সমর্থন করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে চিন্তামণি দাসী যুবতী এবং দেখতে ভাল হওয়ায় তার কাজটা শক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর এমনিতে বেশীর ভাগ রেপ কেসেই প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকে না। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান ইত্যাদি প্রধান সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কেস-এ প্রত্যক্ষদর্শী, একজন নয়, দু-দুজন। একজন সাক্ষী তো চিন্তামণির স্বামী নিজেই। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী কুঞ্জবিহারী। সে-ই দৌড়ে গ্রামের চৌকিদারকে ডেকে আনে। এবং চৌকিদারকে তারই চোখের সামনে আসামীরা মারধোর করে। সাক্ষী হিসাবে কুঞ্জবিহারী যে একজন ঝানু, সে-কথা অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শফিকুলের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। কুঞ্জবিহারী ঘুঘু মামলাবাজ। ওকে জেরা করে কাবু করা যাবে না। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী পরাণ। পরাণকে কাবু করতে পারবে কিনা, তা সে চেষ্টা করে দেখবে।

থানায় যে এজাহার দেওয়া হয়েছিল ফরিয়াদীর পক্ষ থেকে তার নকল আনাল শফিকুল। খতিয়ে দেখতে গিয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার তার নজরে পড়ল। চিন্তামণি দাসীর উপর অত্যাচার সম্পর্কে এজাহার দেওয়াতে ১১ এপ্রিল চৌকিদার ঘনরাম পাইকই চিন্তামণি, পরাণ এবং কুঞ্জবিহারীকে কোতোয়ালীতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেদিন তাকে যে মারধোর করা হয়েছে, এই মর্মে কোনও এজাহার সে দেয়নি। সে ১৩ এপ্রিল কোতোয়ালীতে গিয়ে আলাদাভাবে আর একটা এজাহার এই মর্মে লিখিয়ে আসে। একই ঘটনার জন্য দুটো আলাদা এজাহার, এ বড় আশ্চর্য

ঠেকল তার কাছে। এর কী রহস্য? চট করে কোন ব্যাখ্যা পেল না শফিকুল।

তাছাড়া এজাহারগুলো বিশ্লেষণ করে শফিকুল দেখল: ১। চিন্তামণির উপর বলাৎকার, ৩৭৬ ধারা; ২। পরাণকে বে-আইনিভাবে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা আটকে রাখা, ৩৪২ ধারা এবং সরকারী প্রতিনিধি চৌকিদারকে মারধোর করে কর্তব্যকর্মে বাধাদান, ৩৫৩ ধারা—পরিষ্কার এই তিনটি ধারাতেই যদিও আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা আনা যেত, কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকিল অন্য দুটো ধারাকে আমল না দিয়ে শুধুমাত্র ৩৭৬ ধারাতেই আসামীদের অভিযুক্ত করতে চাইছেন। কেন? ৩৭৬ ধারার কেস অন্য দুটো ধারার কেস থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে? এটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না শফিকুল। খোনকার মামলাটার গতিকে ধীরে ধীরে একমুখী করে তুললেন। রেপ। প্রকাশ্য দিবালোকে অসহায় স্বামী এবং প্রতিবেশীদের চোখের সামনে কুলবধূর উপর অনুষ্ঠিত সমাজের জঘন্যতম অপরাধ। এইদিকেই মামলাটাকে নিয়ে চলেছেন শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফৌজদারি উকিল খানবাহাদুর খোনকার সাহেব। শফিকুলকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনেই করেন না। তাঁর চোখে শফিকুল শুধু গ্রিন হরন।

বাড়িতে বসে মামলার নথি এবং তার নোটস মিলিয়ে দেখছিল শফিকুল আর ভাবছিল, খোনকারের মতলব কী? মেডিকেল রিপোরট ৩৭৬-এর একটা বড় হাতিয়ার। খোনকার তাকেও আমল দিতে চাইছেন না। লেডি ডাক্তার মিস ডরোথী নলিনী দাস এবং সিভিল সারজেন ডি পি মোকারজি এফ আর সি এস, সরকার পক্ষের সাক্ষী নং ৭ এবং ৯, পারতপক্ষে এঁদের জেরাই করলেন না। আজ এক কান্ডই করলেন বটে খোনকার। আদালত শেষ হবার মুখে ৭নং এবং ৯নং এই রকম গুরুত্বপূর্ণ দুজন সাক্ষীকে তুললেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়। নোট মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ অবাকই হচ্ছিল শফিকুল। সে ভেবে পাচ্ছিল না, এ কী রকম জেরার ধরন।

খোনকার: আপনার নাম?

৭নং সাক্ষী: ডরোথি নলিনী দাস।

খোনকার: আপনার পিতার নাম?

৭নং সাক্ষী: স্যামুয়েল অম্বুজাক্ষ দাস।

খোনকার: আপনি কিসের ডাক্তার?

৭নং সাক্ষী: আমি মানুষের চিকিৎসা করি।

খোনকার: সরি, ডাঃ দাস, আপনি কোন ব্রাঞ্চের স্পেশালিস্ট, আই মিন আপনি সারজেন না মেডিসিন না এই ইয়ে—

৭নং সাক্ষী: আমি প্রসূতিবিদ্যা এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। গাইনোকোলজিস্ট।

খোনকার: কোনও নারী ধর্ষিতা হলে তার কি গর্ভপাত ঘটা সম্ভব?

৭নং সাক্ষী: ধর্ষণ গর্ভপাতের একটা কারণ বইকি। তবে—

খোনকার: থ্যাংক ইউ ডকটর।

শফিকুল আদালতের কাছে প্রার্থনা জানাল, একসপারট দুজনকে এক সঙ্গেই সে ক্রশ করতে চায়। আদালত অনুমতি দিলেন। খোনকারের অনুরোধে এর পর সিভিল সারজেন সাক্ষ্য দিতে ওঠেন।

খোনকার: ডাঃ ডি পি মোকারজি এ শহরের আবাল-বৃদ্ধবনিতার কাছে আপনি পরিচিত। তাই সময় সংক্ষেপের জন্য ভণিতা বাদ দিচ্ছি। আই নো ডকটর হাউ ভ্যালুয়েবল ইজ ইওর টাইম।

৯নং সাক্ষী: থ্যাংক ইউ স্যার।

খোনকার: ডঃ এই রিপোরট আপনি তৈরি করেছেন?

৯নং সাক্ষী: ইয়েস স্যার।

খোনকার: আচ্ছা ডঃ মোকারজি আমি যদি বলি, কোনও গর্ভবতী নারীকে যদি তিন জন দুর্বৃত্ত উপর্যুপরি পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করে তবে তার গর্ভপাত হতে পারে আপনি কি একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেডিক্যাল একসপারট হিসেবে এই বিবৃতির প্রতিবাদ করবেন?

৯নং সাক্ষী: ইউ সি কাউনসেলার—

খোনকার: প্লিজ ডকটর প্লিজ, সে ইয়েস অর নো। আই নো দি ভ্যালু অফ ইওর টাইম।

৯নং সাক্ষী: ওয়েল, নো।

খোনকার: থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অল।

নোটস দেখতে দেখতে শফিকুল উত্তেজিত হয়ে উঠল। এ তো স্পষ্ট মুখ বন্ধ করা। খোনকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারকামসটানসিয়াল এভিডেনস, বিশেষজ্ঞের মতামত, এসব জিনিসকে একেবারে ছেঁটে দিতে চাইছেন খোনকার। তাই নমো নমো করে এগুলোকে সেরে ফেললেন তিনি। হঠাৎ একটা ব্যাপার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বুঝে গেল, খোনকার যে বিষয়গুলো খেলো করে দেখাচ্ছেন, গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, সেইগুলোই ওঁর দুর্বল স্থান। শফিকুলকে যদি সফল হতে হয় তবে তাঁর এই সব জায়গাতেই জোরে ঘা মারতে হবে। প্রথম দিকে শফিকুল ভেবেছিল, এত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছে খোনকারের হাতে যে, খোনকার বোধ হয় ওয়াক ওভার পেয়ে যাবেন। ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাবেন মহরমের বাজনা বাজিয়ে। কিন্তু এখন তো সে দেখছে অনেকগুলো ব্যাপারের মুখোমুখি হতে চাইছেন না তিনি। শফিকুল তাঁর নোট বই খুলে

প্রতিপক্ষের দুর্বলতর জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগল।

১। একই অভিযোগের জন্য দুদিন দুটো এজাহার দেওয়া হল। কেন? চৌকিদারকে মারা হল, তার কর্তব্য কর্মে বাধা দেওয়া হল। এজাহার হল। মামলায় তার উল্লেখ নেই। কেন?

২। ফরিয়াদীর স্বামীকে জবরদস্তি আটকে রাখার অভিযোগে থানায় এজাহার দেওয়া হল, কিন্তু মামলায় তাকে আদৌ প্রাধান্য দেওয়া হল না। কেন?

৩। গর্ভপাতের ব্যাপারটায় বিশেষজ্ঞদের অভিমত জানতেই দেওয়া হল না বরং তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ঝোঁকই দেখা গেল। কেন?

রেপ কেসের দুটো প্রধান স্তম্ভ: কোনও রমণীর সঙ্গে (১) তার আপত্তি সত্ত্বেও এবং (২) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সহবাস করলে তবে তাকে ভারতীয় পেনাল কোড মোতাবেক ধর্ষণ বলা যাবে। নচেৎ তা রেপ হবে না। শফিকুলের কানে কেবল 'উইদাউট হার কনসেনট' অর্থাৎ আপত্তি সত্ত্বেও এবং 'এগেনসট হার উইল' অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ইংরেজী বাংলা এই কয়টা শব্দসমষ্টি অনবরত ধ্বনিত হতে লাগল। খোনকারের পদক্ষেপ দেখে শফিকুলের মনে একটা অসম্ভব ইচ্ছা অঙ্কুরিত হতে থাকল। সে যদি সতর্কভাবে অগ্রসর হয় তবে হয়ত খোনকারেব সফলতা না-ও আসতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা শফিকুলের কাছে এখনও দূরের স্বপ্ন।

মামলার তৃতীয় দিন শফিকুল ক্রস একজামিন করতে উঠে সরকার পক্ষের ৭নং সাক্ষী ডঃ ডরোথী নলিনী দাসকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কাল বলেছেন ডাক্তার, যে ধর্ষণ গর্ভপাতের একটা কারণ, তাব মানে কি এই বুঝব যে গর্ভপাতের আরও কারণ আছে?"

৭নং সাক্ষী: নিশ্চয়ই আছে। আমি সেই কথাই কাল বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু—

শফিকুল সবিনয়ে বলল, আমার অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ সহযোগীর কাছে সময়ের দাম গিনি সোনা। আমি গ্রিন হরন, আমি শিক্ষার্থী, ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝে নিতে চাই।

খোনকার: অবজেকশন, ইওর অনার, এটা আদালত, মেডিকেল ইশকুল নয়। অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আদালতের সময় নষ্ট হোক, এটা আমরা চাই না।

শফিকুল: ইওর অনার, বেপ এবং গর্ভপাত উভয়ই আমার অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ সহযোগীর কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক। অন্তত আমার ধারণা তাই। আমার ধারণা, ব্যাপারটা আদালতও জানতে চাইবেন।

জজ সাহেব: বলুন।

শফিকুল: ডঃ মিস দাস, আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি যে ধর্ষণজনিত গর্ভপাতের কি কোনও বৈশিষ্ট্য আছে?

৭নং সাক্ষী: আছে। ধর্ষণকালে নারী দেহে এবং মনে প্রচণ্ড আঘাত পায় তার ফলে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তার গর্ভপাত ঘটে যায়।

শফিকুল: ডঃ মিস দাস, ধরুন, কোনও গর্ভবতী রমণীকে তিন জন দুর্বৃত্ত পৈশাচিকভাবে ধর্ষণ করল, এ ক্ষেত্রেও কি ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভপাত ঘটবে?

খোনকার: ইওর অনার, অবজেকশন।

জজ সাহেব: প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপত্তি খারিজ। ডঃ জবাব দিন।

৭নং সাক্ষী: অবশ্যই ঘটবে।

শফিকুল: এমন কি হতে পারে না যে, এই ধরনের পৈশাচিক ধর্ষণের তিন-চার দিন, ঘণ্টা নয় ডাক্তার, দিন বলছি, তিন-চার দিন পরে কি উক্ত রমণীর ঐ কারণে গর্ভপাত হতে পারে?

৭নং সাক্ষী: গর্ভপাত হতে পারে। তবে যে গর্ভপাত তিন-চার দিন পরে ঘটে তার কারণ তিন-চার দিন আগেকার ধর্ষণ নয়, অন্য কোনও কারণেই তা ঘটবে।

শফিকুল: আপনি তো এই মামলার ফরিয়াদী শ্রীমতী চিন্তামণিকে পরীক্ষা করেছেন?

৭নং সাক্ষী: আজ্ঞে হ্যাঁ করেছি।

শফিকুল: কত তারিখ ছিল সেটা মনে আছে?

৭নং সাক্ষী: ১৫ এপ্রিল ১৯৩৬।

শফিকুল: আপনি চিন্তামণির শরীরে গর্ভপাতের কোনও লক্ষণ দেখেছিলেন?

৭নং সাক্ষী: না। ওর শরীরে গর্ভপাতের কোন লক্ষণ ছিল না।

শফিকুল: ধন্যবাদ ডাক্তার মিস দাস। আপনি যেতে পারেন।

পরের সাক্ষী সিভিল সারজেন সাহেব।

শফিকুল: আপনার কাছ থেকে জাসট একটা মেডিকেল ওপিনিয়ন নিতে চাই ডঃ মোকারজি। আপনার আগে ডঃ মিস দাস বলে গেলেন, গর্ভবতী নারী ধর্ষিতা হলে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তার গর্ভপাত হবে, তা না হয়ে যদি ধর্ষণের তিন-চার দিন পর হয়, তবে তাকে আর ধর্ষণজনিত গর্ভপাত বলা যাবে না। ডঃ মোকারজি, একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি আদালতকে জানাবেন কি যে এটা ডঃ মিস দাসের ব্যক্তিগত মত না মেডিকেল সায়েনসের মত?

খোনকার: ইওর অনার, দিস ইজ নট প্রপার ক্রস একজামিনেশন। আই স্ট্রংলি অবজেক্ট।

শফিকুল: ইওর অনার, একটা ভাইট্যাল ব্যাপারে আমার বিজ্ঞ সহযোগী কি আদালতকে

বিশেষজ্ঞের মত শোনাতে আপত্তি করছেন?

খোনকার: কোনও প্রপার প্রসিডিওরেই আমার আপত্তি নেই। বাট দিস ইজ নট প্রপার প্রসিডিওর।

জজ সাহেব: আপনি সাক্ষীকে এই প্রশ্ন করছেন কেন? আর ইউ সিওর ইউ আরনট রিপিটিং ইউরসেলফ?

শফিকুল: আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি সিওর ইওর অনার। আদালতের জানা উচিত এত বড় একটা ভাইট্যাল ম্যাটারে আগের সাক্ষী যা বলে গেলেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত না মেডিক্যাল সায়েনসের স্বীকৃত মত, সেটা জানা এই মামলার পক্ষে অত্যান্ত জরুরি। ইওর অনার, দি প্রপার প্রসিডিওর ইজ, হোয়াট আই আনডারস্ট্যানড, টু হেলপ দি কোরট টু আনডারস্ট্যানড দি কেস প্রপারলি অ্যানড নট টু কনফিউজ ইট। আই অ্যাম সিওর ইওর অনার দ্যাট আই অ্যাম হেলপিং দি কোরট।

জজ সাহেব: আনসার দ্য কোয়েশচেন।

৯নং সাক্ষী: ওটা মেডিকেল সায়েনসেরই মত। ধর্ষণের ভায়োলেনস এবং শক এমন প্রচন্ডভাবেই শরীরে এবং মনের উপর ধাক্কা মারে যে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত অবশ্যাম্ভাবী হয়ে ওঠে।

শফিকুল: এবং ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই তা হয়ে যায়?

৯নং সাক্ষী: নরম্যাল এবং হেলদি নারীর ক্ষেত্রে তা হয়।

শফিকুল: চার-পাঁচ দিন পরে হতে পারে না?

৯নং সাক্ষী: না। তাহলে বুঝতে হবে এক্ষেত্রে অন্য কারণ আছে।

শফিকুল: আপনি ফরিয়াদী চিন্তামণিকে পরীক্ষা করেছেন?

৯নং সাক্ষী: হ্যাঁ।

শফিকুল: ১৫ এপরিল ১৯৩৬?

৯নং সাক্ষী: হ্যাঁ।

শফিকুল: আপনি অ্যাবরশনের কোনও চিহ্ন ওর শরীরে দেখেছেন?

৯নং সাক্ষী: না।

শফিকুল: এমন কোনও লক্ষণ আপনি কি ফরিয়াদী চিন্তামণির শরীরে দেখেছেন, যার দ্বারা আপনি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, ১০ এপরিল থেকে ১৫ এপরিলের মধ্যে চিন্তামণির গর্ভপাত ঘটেছে?

৯নং সাক্ষী: বলতে পারি যে ঐ সময়ের মধ্যে ওর গর্ভপাত ঘটেনি।

শফিকুল: চিন্তামণি যে গর্ভবতী ছিল, আপনি যখন ওকে পরীক্ষা করেন, অন্তত তখন পর্যন্ত, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?

৯নং সাক্ষী: আমার রিপোরটেই উল্লেখ আছে গর্ভবতী ছিল।

শফিকুল: আপনার কি মনে হয়, সে নরম্যাল?

৯নং সাক্ষী: হ্যাঁ।

শফিকুল: হেলদি?

৯নং সাক্ষী: হ্যাঁ।

শফিকুল: তাহলে ডঃ মোকারজি, চিন্তামণি সুস্থ ও স্বাভাবিক নারী। সে গর্ভবতী। তাকে তিন তিন জন দুর্বৃত্ত পর পর ধর্ষণ করল। আমার পরম বিজ্ঞ প্রসিকিউশন কাউনসেলের ভাষায় 'পৈশাচিকভাবে'। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচন্ড ভায়োলেনস ও শক হল। এ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই, আপনাদেরই মেডিকেল শাস্ত্রের তত্ত্ব অনুযায়ী, গর্ভবতী চিন্তামণি দেহে ও মনে যে পরিমাণ শক পেয়েছে, তাতে তার তো অ্যাবরশন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। নয় কি?

৯নং সাক্ষী: নিশ্চয়ই।

শফিকুল: কিন্তু আপনারা দুজনেই রিপোরট দিলেন যে পনের এপরিলের মধ্যে তার অ্যাবরশন হয়নি। আপনি এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?

খোনকার: অবজেকশন, অবজেকশন। ইওর অনার, হি ইজ গোয়িং টু ফার। ইটস নো ক্রশ একজামিনেশন। দিস ইজ, দিস ইজ সিমপলি পুটিং ওয়ানস আইডিয়া ইন টু আদারস মাউথ। ইওর অনার, উই নিড ইওর প্রোটেকশন।

জজ সাহেব: হোয়াট! এ লিডিং ল-ইয়ার অফ দি বার নিডস প্রোটেকশন! প্রোটেকশন ফ্রম হুম?

শফিকুল: ফ্রম এ গ্রিন হরন, আই প্রিজিউম।

জজ সাহেব: অল রাইট। আপত্তি গ্রাহ্য হল। প্রসিড।

শফিকুল: থ্যাংক ইউ ডকটর। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

একটা বড় জায়গায় জয় হয়েছে। খোনকারকে সে বিচলিত করে তুলতে পেরেছে। নোট খুলে দেখছিল শফিকুল। রাত অনেক হয়েছে। একটা বড় কাগজে পয়েনট লিখছিল শফিকুল।

১। চিন্তামণির অ্যাবরশন হল না কেন?

২। চিন্তামণি কি সত্যিই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল, যেমন বলেছে?

৩। চিন্তামণির বা দুর্বৃত্তদের কারোর শরীরেই কোনও আঁচড় কামড়ের দাগ নেই কেন? (দ্রষ্টব্য মেডিকেল রিপোরট)

৪। দুর্বৃত্তরা যদিও সংখ্যায় তিনজন, এবং জোয়ান, তবুও কারও হাতেই কোনও অস্ত্র ছিল না। ফরিয়াদী পক্ষের ১নং, ২নং, ৩নং, এবং ৪নং সাক্ষী সে কথা স্বীকার করেছে। এবং চিন্তামণি এও বলেছে যে, আসামীরা একজন করে তার ঘরে ঢুকেছে, একসঙ্গে দু'জন কখনোই ঘরে ঢোকেনি বা ছিল না। দু'জন করে পরাণকে চেপে ধরে বসেছিল এবং অন্যজন চিন্তামণির উপর অত্যাচার করছিল। বেশ। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী এই সাক্ষ্য দিয়েছে। এবং দুঃখের বিষয় শফিকুল একটা সাক্ষীকেও মচকাতে পারেনি। এখানেই তার ব্যর্থতা। আরে বাঃ! হ্যাঁ, তাই তো? চিন্তামণি ঘরে খিল তুলে দেয়নি কেন? প্রথমবার না হয় আচমকা অত্যাচারটা হয়ে গেল। কিছু করার ছিল না। কিন্তু প্রথম আসামী বেরিয়ে আসার পর? এবং দ্বিতীয় আসামী ঘরে ঢোকার আগে? তখন খিল দেয়নি কেন ঘরে? কেন? কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে তো একাই ছিল তার ঘরে? তাহলে? এবার কী দাঁড়াল?

চিন্তামণির ঘরে নিরস্ত্র আসামীরা একবারে একজন করে ঢুকল। তার আপত্তি সত্ত্বেও এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তিনজন একে একে তার উপর অত্যাচার করে বেরিয়ে এল। এবং প্রত্যেকবারই সে প্রচণ্ড বাধা দিয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছেঃ

ক। চিন্তামণি বা আসামী, কারও শরীরেই আঁচড় কামড়ের দাগ নেই।

খ। চিন্তামণি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দরজায় খিল এঁটে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেনি।

গ। প্রচণ্ড "ভায়োলেন্স" তার উপর হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রচণ্ড "শক" পাওয়া সত্ত্বেও গর্ভবতী চিন্তামণির গর্ভপাত ঘটেনি।

এই তিনটি ঘটনাই যে-কোনও যুক্তিশীল লোকের সিদ্ধান্তকে একটি লক্ষ্যেই অভ্রান্তভাবে পৌঁছে দেবে। এবং তা হ'ল আসামীরা চিন্তামণির সঙ্গে যাই করে থাক, "উইদাউট হার্ কনসেনট" এবং "এগেনসট হার্ উইল" কিছু করেনি। অর্থাৎ চিন্তামণি বাধা দেয়নি। যা ঘটেছে তা তার সম্মতি এবং ইচ্ছা অনুসারেই ঘটেছে। অতএব আসামীদের কিছুতেই ধর্ষণের দায়ে ৩৭৬ ধারায় অভিযুক্ত করা যায় না।

শফিকুল বলল, "এই হচ্ছে আমার সওয়াল।"

তারপর খোন্‌কারকে উদ্দেশ করে বলল, "পার তো উড়িয়ে দাও।"

তারপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলল, "ইওর অনার। আসামীদের ৩৭৬ ধারায় অভিযুক্ত করা চলে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য রীতিমত বিভ্রান্তিকর। আপাতদৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্য যে ধারণারই সৃষ্টি করুক না কেন, এখানে সারকামসটেনশিয়াল এভিডেনস্ অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ। এবং নিশ্ছিদ্র। আসামীরা নিরপরাধ। ওদের খালাস দেওয়া হোক, এই আমার নিবেদন।"

হৃষ্ট শফিকুল এই রাত দুপুরে অজু করে এসে এশার নামাজ পড়তে শুরু করল।

॥ ৩ ॥

গয়ারামকে উপস্থিত হতে দেখে কুঁকড়োহাটির খাদু শেখ একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। খাদু বলল, "শালা গোমস্তার গাড়ু, তুমি এখনে আ'সে উদয় হলে ক্যান্? আমাগের মজহবের মজলিশি, তুমার কামডা কী?"

অতগুলো লোকের মধ্যে হঠাৎ বেইজ্জত হয়ে গয়া প্রথমটায় বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর উঠল ক্ষেপে। "সুমুন্দির ভাই, আমি কি তোর বাড়ি আইছি, না তোর ঘাড়ে চা'পে বসিছি। তুই অ্যাত বড় কথাডা আমারে ক'লি। আমি আমার চাচার বাড়ি আইছি।"

"চাচার বাড়ি আইছি!" খাদু গরগর করতে লাগল। "মুখির সামনে চাচা চাচা কর, আর গোমস্তার কাছে যায়ে চাচার পুঙায় বাঁশ ঢুকোও। শালা হি'দুর জাতই হ'লো দুমুখো সাপের জা'ত।"

গয়া সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে খাদুর ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছিল, জমিরুদ্দি, বকাউল্লা ওকে ধরে "হা হা কর কী, কর কী" বলে রুখে দিল। গয়া ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, "শালা তুই জা'ত তুললি, তোর অ্যাত বড় আস্পদ্দা। তোর জিভ ছিঁড়ে নেবো।"

খাদু শেখও রই রই করে উঠল। বশির তাকে দুই ধমক মারল।

বশির বলল, "ব'সে থাক্। অমন ক্ষেপতো হয়ে উঠিছিস ক্যান? গয়া তোর কোন্ পাকা ধানে মই দেছে শুনি?"

সাজ্জাদ বলল, "আমি ওরে আসতি কইছিলাম। ক্যান্ না, আজগের জমায়েতে আমাগের কথাবার্তা যা হবে, গয়া সেগুলো গোমস্তারে জানায়ে দিতি পারবে।"

খাদু বলল, "আমি হিদুগের বিশ্বেস করিনে। শালা পুনুদু স্যাকরা আমার সব্বোনাশ ক'রে ছাড়িছে। বিটির বিয়ে দিতি টাকা কর্জ নিছিলাম। সুদির সুদ তস্য সুদ দিয়েউ ওর গড়ভো

ভরাতি পারিনি। সুদ দিতি দিতি জেরবার হয়ে গ্যালাম। সে বিটি আমার কবে মরে গেছে। কিন্তু পুনুনু শালার দিনা আর শোধই হ'লো না। শেষে দেড় বিঘে জমি লিখি দিতি হ'লো। অ্যাখন সেই জমি ভাগ চষতিছি।"

একটু থেমে খাদু বলল, "পুনুনুর সে কী কথা! ক'লো, তুই কোস্ কী খাদু, তুই আমার গিরামের লোক। আমার ভাই। তোর মেয়ের বিয়ে, তোরে টাকা দেবো না? অ্যাকটা সাদা কাগজ বের ক'রে ক'লো, নে এখেনে একটা টিপ দে। উডা নিয়ম রক্ষে। সুদির টাকাটা ঠিক মত দিয়ে যা'স। টাকা নেলাম না তো, কসাই-এর ছুরিতি গিয়ে গলা ঠ্যাকালাম। নিছিলাম দুশ টাকা। পাঁচ বছর ধ'রে যতটা পারিছি, সুদ দিছি, কাজে অকাজে ওর ব্যাগার খাটিছি, তারপরউ শালা মালাউন, হারামের হারাম কয় কী আমার নাকি চারশ টাকা দিনা রয়ে গেছে। টাকা আর ফ্যালায়ে রাখতি পারবে না। টাকা শোধ না দিলি বাড়ি ঘর ক্রোক করে নেবে। পুনুনু শালার সে কী মূর্তি!"

খাদু অসহায়ভাবে মজলিশের দিকে চাইল। তারপর গয়ারামের দিকে চেয়ে বলল, "এই যে, শালা গয়া। ও শালা কি কম শয়তান! পুনুনু স্যাকরা ওরে অ্যাকটা কাগজ আ'নে দ্যাখা'লো আর ও শালা গড়গড় করে তা পড়ে ক'লে, তুই তিনশ টাকা কর্জ নিছিস্।"

গয়া বলল, "শালা হা'লো চাষার কত বুদ্ধি হবে! পুনুনু শালা আমারে যিটা দ্যাখালো সিটা তুমার হ্যাননোট। বুঝিছ। ঐ হ্যাননোটে তুমার টিপ সই আছে। দুলা শেখ আর রিদয় ঠাউরির দস্তখত আছে। উরা সাক্ষী। আর হ্যাননোটে লিখা আছে তুমি তিনশ টাকা কর্জ নেছো। আমি যা লিখা আছে তাই পড়িছি। আমার দোষডা হ'লো ক'নে?"

খাদু লাফিয়ে উঠল, "দুলা শেখ কিডা? কই, টাকা নেওয়ার সুমায় তো কারুরি দেখিনি? আর টাকা নিলাম দুশ, সিডা হয়ে গ্যালো তিনশ! কী করে হয় কও?"

গয়া বলল, "কী মুশকিল। সিডা আমি কব কী করে? তাই লিখা আছে ঐ হ্যাননোটে।"

খাদু বলল, "ঐ হ্যাননোটের গুষ্টির জা'ত মারি। আল্লার কিরে, দুশ টাকা কর্জ নিছিলাম।"

গয়া বলল, "সে কথা আদালত শোনবে না। তুমার ঐ হ্যাননোট আর সাক্ষী। দুজনীর আদালতে তুললি ইটাই প্রমাণ হবে যে তুমি তিনশ টাকাই কর্জ নেছো। তুমি যে মাত্তর দুশ টাকা কর্জ নেছো, তিনশ টাকা ন্যাওনি, এর কোনও সাক্ষীসাবুদ আছে?"

খাদু বলল, "আছমানে আল্লাই আমার সাক্ষী।"

গয়া বলল, "রিদয় ঠাউর আর দুলা শেখ আদালতে উঠে যখন কবে, হুজুর ধর্মসাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি যে খাতক খাদেম সেখ ওরফে খাদু শেখ পিতা মৃত কাছেমালি শেখ, সাং ও মৌজা কুকড়োহাটি, ইউনিয়ন ভ্যাবলা, থানা সদর, অমুক তারিখে ঋণদাতা পূর্ণচন্দ্র দত্ত পিতা মৃত হবলাল দত্ত সাং লোহাজাঙ্গা, ইউনিয়ন আঠারোখাদা, থানা সদর, আমাদিগকে সাক্ষ্য রাখিয়া ঋণদাতার নিকট ইহতে টাকা প্রতি মাসিক বার পাই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিতে স্বীকৃত হইয়া নগদ তিনশত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এবং কাহারও দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া হ্যাননোটে লিখিত বক্তব্য পূর্ণরূপে অবগত হইয়া উহাতে টিপসহি দিয়াছে—ওগের একজনের হাতে থাকবে তামা তুলসী গঙ্গাজল আরেকজনের হাতে থাকবে তুমাগের পবিত্র কোরান, তখন কি তুমি উটা যে মিথ্যে কথা তা বলবার জন্যি তুমার সাক্ষীরি কাঠগড়ায় হাজির করাতি পারবা?"

খাদু শেখ কথা বলল না। কেবল টালুমালু চাইতে লাগল।

"কী, তুমার সাক্ষীরি হাজির করাতি পারবা?" গয়া আবার জিজ্ঞেস করল।

তখন খাদু তার রাগ ভুলে গিয়ে খপ্ করে গয়ার হাত ধরে আর্তস্বরে বলে উঠল, "আল্লার কসম, আমি দুশ টাকা ধার নিছি। সাদা কাগজে টিপ দিছি। আর সেখেনে কেউ ছিল না। দুনিয়ায় কি ইনসাফ নেই? রিদয় ঠাউররি না হয় বুঝলাম কিন্তু দুলা শেখ কিডা?"

মজলিশের সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'চিনি নে।'

"চেনো আর না চেনো, দুলা শেখ হল গে পুনুনু স্যাকরার এক নং ইসাদী।" গয়া বলল। "যারা সুদির কারবার করে তাদের এরকম ধরনের অনেক ইসাদী কই মাগুরির মত হামেশাই জিয়োনো থাকে।"

দশকুশির মোতালেব বলল, "মুসলমান হয়ে কোরান ছুঁয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেবে?"

গয়া বলল, "মোছলমান হলিই বুঝি সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে যায়। আরে ঐ খাদু, আমার বাপের তো ছেরাদ্দ করে ছাড়লি। হিন্দু ফিন্দু কত কী বললি। শালা আমি ছোট জাত্, তুই মোছলমান। হিন্দু সমাজ তো বাবুগের সমাজ। ওগের কাছে তুইও যা আমিউ তাই। বরং বাবুগের সমাজ তোগের যদিউ পাত্তা দ্যায়, আমাগের তাউ দেবে না। হিন্দু! হিন্দু তো খালি বাবুরা। ঐ বামুন কায়েত বদ্যি আর বদ্যি কায়েত বামুন। এর নিচে যে শালারা তারা হাতে পয়সা হলিই বামুন খাওয়ায় আর পৈতে নিয়ে বাবু হয়ে যায়। বলরামপুরির ষষ্ঠীবাবু। চাচা তো চেনো? যার মেয়ের বিয়েতে বামুনগেরে অ্যাকটা করে ঘড়া দিছিল। আমাগেরই কৈবত্ত। ষষ্ঠীবাবুর বাপ ছিরিপদ ব্যবসা করে পয়সা করে গেলো। ষষ্ঠীবাবু জমিদারি কেনেন্সেন। এখন তিনি দাস বিশ্বেস। গরিব যন্মৌলিক আর বংশজ কায়েতগের ঘরেই অ্যাখন ক্রিয়াকর্ম করেন। জাতে উঠে যাবার পর শালা আর কৈবত্তের হাতে জল খায় না। ঐ উরাই হলো হিন্দু। আমাগের কপালে অন্তরম্ভা। পয়সা হলি দাস বিশ্বেস আর গরিব হলি হয় হা'লে আর না হয় জা'লে। আমাগের হয়েছে ভালো!

আল্লা আল্লা করে চে'চাইনে, তাই তুমরা কও হি'দু। আবার হিন্দু সমাজের যারা মাথা, আমাগের ছুলি তাগের জাত যায়। ঘরে কুকুর পুষলি জাত যায় না। আমরা ঘরে উঠলি জাত যায়। আমাগের মেয়ে বিয়ে করলি বাবুগের জাত যায়। কিন্তু মেয়েমানুষ করে রাখলি ওগের হিন্দুত্ব যায় না। হিন্দু! যাগ্‌গে যাক যা আছি তা আছি, কিন্তু এই খাদু! তুই শালা দেনা মিটোতি দেড় বিঘে জমি যে পুননুরি কোবলা করে দিলি, তা তোর হ্যানেনোটডারে ফেরত আনিছিস তো? না কি পুনুনু শালা সিডাও রাখে দেছে?"

খাদু কথাটা শুনে একবার খালি "অ্যাঁহ" করে উঠল। তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে গয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর খাদু যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে, "অ্যাঁ। ক্যান? পুনুনু তো আমারে ক'লো, যা খাদু তোর দিনা শোধ হয়ে গেল। আর তোর জমি তো তোরেই চষতি হবে। পিরাকিতিপকখে তোর জমি তোর কাছেই তো রয়ে গেল। ফসলের সুমায় ভাববি তুই যেন সুদটাই দিয়ে যাচ্ছিস। ব্যস, এই তো ক'লো।"

বশির জিজ্ঞেস করল, "ক্যান তোর টিপসই যাতে আছে, সেই কাগজডা ফেরত নিসনি?"

খাদু যেন তলিয়ে যাচ্ছে। বলল, "না তো?"

খাদু যেন ঝিমুচ্ছিল। ওর মাথায় পরিষ্কার কিছু ঢুকছিল না। কেমন একটা পানায় ঢাকা পুকুরের মত ভাব। হঠাৎ একটা ঢেউয়ে পানা যেন পরিষ্কার হয়ে উঠল। গোটা ব্যাপারটা খাদুর মগজে ঢুকল এখন। পুননু তাকে বেজায় ঠকিয়েছে। বেইমানি করেছে তার সঙ্গে। জমি লিখিয়ে নিয়েছে অথচ তার খতটাও ফেরত দেয়নি! সর্বনাশ! ক্রমশই সব জিনিসটা তার কাছে দিনের মত সাফ হয়ে উঠছে। খত যতক্ষণ পুননুর হাতে ততক্ষণ তার তো রেহাই নেই। যখন খুশি পুননু স্যাকরা তার কাছে ঐ খত দেখিয়ে টাকার দাবী করতে পারে! গোটা ব্যাপারটা সে যখন বুঝে গেল তখন সে চোখে অন্ধকার দেখল। খাদু শেখের মনে হল পুননু স্যাকরা যেন একটা সাপ। ওকে পেঁচিয়ে ধরেছে। খাদুর আর নিস্তার নেই। ওকে শেষ না করা অবধি পুননু ক্ষান্ত হবে না। ওর বাদবাকি জমিজিরেত সবই পুননুর গভ্ভে যাবে। খাদু তাহলে খাবে কী? ওর এগার বছুরে মেয়ে জরিনার বিয়ে দেবে কেমন করে? ওর আট বছুরে মেয়ে চিররুগ্‌ণ নুরুন্নেছার চিকিৎসা করাবে কেমন করে? কেমন করেই বা আরও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বকু, নালু, বদু, ছইফ আর হেনাকে মানুষ করে তুলবে? ভাবতে ভাবতে ক্রমাগত ভয় পেতে লাগল খাদু। যত টাকা কর্জ করেছিল খাদু, সুদ সমেত তার অনেক বেশি টাকা সে দিয়েছে। শেষ পর্যন্তও পুননুর খাঁই মেটাতে দেড় বিঘে জমিও তাকে কোবলা করে দিয়েছে খাদু। তবুও পুনুনু কেন তাকে ঠকাল? কেন তার খত ফেরত দিল না? এটা আল্লার দুনিয়া। কোনও ইনসাফই এখানে পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে।

বশির বলল, "জমিদার মহাজন আমাগের এইভাবেই পাকে পাকে বাঁধে রাখিছে। এই বাঁধন কাটানো অ্যাকার কাজ না। জোট বাঁধো জোট বাঁধো। হিন্দু মুসলমান সব চাষী যদি একসাথে জোট বাঁধতি পারো, তবেই গিয়ে সুমুন্দিরা জব্দ হবে।"

গয়া বলল, "জমিদার মহাজন তুমাগের জোট বাঁধতি দেবে ভাবিছ? মামারবাড়ির আবদার! গিরামের সব খবর রাখো, না কী?"

"ক্যান, কী হইছেডা কী?" বশির জিজ্ঞেস করে।

গয়া বলে, "ঐ যে বাইতির মেয়েমানুষডা দাউদির সঙ্গে পালায়ে যাবার পর হাটে যে হাঙ্গামাডা হয়ে গেল তাতে তো কারুরি জড়ানো গ্যালো না। সেই রাগে বিশ্বেস বাবুরা ফুঁসতিছে।"

"কার মেয়েমানুষ কিডা নিয়ে পাঁয়ষট্টি দিল, আর দুকান পুড়ল গুটা কতক বেকসুর লোকির।" জমিরুদ্দি আফসোস করল। "আমাগের গিরামের বজলুডা করে খাচ্ছিল। দেলে তার দুকান পুড়োয়ে।"

"ক্যান, সুশীল দরজি?" বশির বলল, "অমন ভালো লোক হাটখুলোয় আর দুটো আছে? কত উপকারী! দেলে তার দুকানডাও পুড়োয়ে।"

"তার জের কি মিটিছে ভাবিছ?" গয়া বলল। "সেই তখনের থেই থানা পুলিসের সঙ্গে উঠাবসা বিজায় বাড়ে গেছে। বড় দারোগার তো পুয়া বারো। অ্যাকবার আ'সে গুপালবাবুগের ওখেনে ওঠছে তো পরের বার ওঠছে মেন্দার ওখেনে। মুছিমুলামে খাওয়া-দাওয়া সারে মাড়োবাবুর গদির থে পকেট ভরে তবে গিয়ে ঘুড়ার জিনির উপর চড়ে বসতিছেন। মতলব সুবিধের নয়।"

সাজ্জাদ এবার নড়ে চড়ে বসল। "কও দিনি বাপ, কী মনে হয় তুমার?"

"দ্যাখ চাচা। তুমাগের কয়ে দিই, তুমরা একটু সাবধানে থাকবা।" গয়া বেশ উদ্বেগ নিয়েই বলল। "গোমস্তা সুমুন্দি যখন নামে পড়িছে তখন ধরে নিতি পারো ব্যাপার বড়ই গুরুচরণ।"

বশির বলল, "সেই দাঙ্গার সঙ্গে আমাগের সম্পর্ক কী? সে তো নিকিরিগের উপর বিশ্বেসরা মাল ঝাড়তি গিছিল।"

গয়া বলল, "মেন্দাও বিশ্বেসগের উসকোয়ে দিছিল।"

বকাউল্লা বলল, "গয়ার যত আজগুড়ে কথা। মেন্দা আমাদের এই দিগরে মুসলমান সমাজের মাতব্বর। তিনি মুরুব্বি হয়ে মুসলমানগের পিছনে হি'দু ল্যালায়ে দেবেন? মেন্দা বাতকম্ম না করলিও গয়া দেখতিছি তার গন্ধ পায়। তুমি কি মেন্দার পিছনে সব সুমায় নাক ঠ্যাকায়ে বসে

থাকো না কী?"

গয়া কি বলতে যাচ্ছিল, সাজ্জাদ তার আগেই বলে ফেলল, "যা জান না, তা নিয়ে কথা কতি যাও ক্যান? সিবারের ব্যাপারটায় মেন্দা পুরোটাই উসকোনি দিয়ে গেছে আমার বিয়াইরি জব্দ করার জন্যি। তুমরা কী যে সব হিন্দু হিন্দু মুছলমান মুছলমান কর, আমি কিছু বুঝিনে। লাভের কড়ি ট্যাঁকে গুঁজার বেলায় মেন্দা কি বিশ্বেস, কুন্ডু কি মাড়োবাবুর চাইতি কম কিছু করে? না মেন্দা চশমখোর কারুর চাইতি কম? মেন্দা কি কুষ্টার দাম অন্য কারুর থে আমরা মুছলমান চাষী বলে আমাগের বেশি করে দ্যায়? তবে? হিন্দু বলো মুছলমান বলো নিজির কোলে ঝোল টানার ব্যাপারে কিডা যে কার চাইতি কম, তাই তো বুঝি নে?"

গয়া বলল, "চাচা, কদিন ধরে দেখতিছি, গোমস্তা, কুন্ডুবাবু, গুপালবাবু, ভুঁয়ে মশাই, ইরা সব খুব সলা-পরামর্শ কত্তিছে। মাড়োবাবুও আছে এর মধ্যি। তবে খুব বাস্তুঘুঘু তো। বিনি ধরাছুঁয়ার মধ্যি নেই। তারপর কাল ভক্ত দফাদার আমারে ক'লো বড় দারোগা নাকি তারে বি এল কেসের আসামীর নাম থানায় পেশ কত্তি কয়েছে। ভক্তবুড়ো কলো যে দারোগা নাকি ওরে গোমস্তার পরামর্শ নিতি কয়েছে। তার জন্যিই তো আমার চিন্তা হয়েছে যে শালা কায়েত আবার তুমাগের নাম না ঢুকোয়ে দ্যায়।"

সাজ্জাদ অবাক হল। "আমাগের নাম! কার কার নাম?"

গয়া বলল, "তুমার নাম দিতি পারে, বশির ভাইর নাম দিতি পারে, বকাউল্লার নাম দিতি পারে, জমিরুদ্দিভাইর নাম দিতি পারে। খাদু শেখের নাম দিতি পারে—"

খাদু শেখ অস্বাভাবিক চোখে সবার দিকে চাইল। বলল, "আল্লা এই দুনিয়ায় জমিনকে আমাগের জন্যি বিছানা আর আছমানকে ছাদ করে দেছেন। আছমানের থে পানি ঢালে আমাগের খাওয়ার জন্যি কত রকমের ফল পয়দা করিছেন। ঠিক কিনা, ভাই মুছলমান, কও?"

জমায়েতের কারো চোখে খাদু শেখের ভাবান্তর বিশেষ নজরে পড়ল না। অনেকেই সায় দিল, কথাটা ঠিক।

খাদু শেখের চোখদুটো কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "তালি? যে আল্লাহ্ এত চীজ পয়দা করিছেন, তিনি নিশ্চয়ই ইনসাফও পয়দা করিছেন? হ্যাঁ কি না?"

জমায়েতের সবাই "আলবাৎ" বলে ওকে বেশ জোরেসোরে সমর্থন করল।

খাদু শেখের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "এই আদালতে যদি ইনসাফ না পাই, আল্লার আদালতে নিশ্চয়ই ইনসাফ পাওয়া যাবে, কী কও?"

সকলেই ওর কথায় সায় দিল।

"তালি সুমুন্দির পো ঐ পুনন্দ স্যাকরারে আল্লার আদালতে হাজির করব। শালার বেইমানি ঘুচোয়ে দেব!"

সাজ্জাদ বলল, "আমাগের বি এল কেসে ঠ্যালবে ক্যান, ও গয়া?"

গয়া বলল, "তুমরা চাচা যে চাষীগেরে অ্যাক কত্তি যাচ্ছ।"

বশির বলল, "বুঝা গেল।"

গয়া বলল, "তুমরা কচ্ছ কুষ্টা করবা না। বরগার ভাগ বাড়াতি চাচ্ছ। চক্রবৃদ্ধি সুদ দিবানা কচ্ছ। এইতিই জমিদার মহাজন আড়তদার খেপে টং হয়ে গেছে।"

জমিরুদ্দি একটু ভয় পেয়ে গেল। ওর পুলিসে খুব ভয়। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে। একা রোজগেরে। দুই বিবির সাত-আটটা ছেলেমেয়ে। মেয়েগুলো একটু বড়। বড় ছাওয়াল মন্নু সাত বছরে পড়া মাত্র তাকে রাখালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সত্যিই যদি পুলিস হামলা করে তাহলে তো এরা সব ভেসে যাবে?

"কই গো বশির," জমিরুদ্দি ভয়ে ভয়ে বলল, "কিডা যে আসবে ক'লে? কই, মানুষ তো দেখিনে। ব'সে ব'সে মাজা ব্যথা হয়ে গেল। ভাবতিছি বাড়ি চলে যাই।"

বশির বলল, "আসবে, আসবে। এসব কাজ কি ঘুড়ায় জিন দিয়ে আলে চলে? একটু ছবুর কর। তামুক খাও। চাচা, বাড়িতি তামুক আছে, না আনায়ে নেবো।"

"তামুক আছে, তামুক আছে।" সাজ্জাদ বলল, "এই জমির, যা না। সাজে আনে দে।"

সাজ্জাদ বেশ ভাবিত হয়ে পড়ল। কেন না, এবার ও দেখছে যে বারবার মার খাওয়ার পর চাষীদের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। এ গিরাম সে গিরামের মাতব্বর একজন দুজন করে ওর আর বশিরের কাছে আসছে। আলাপ আলোচনা একআধটু শুরু হয়েছে। এখন ফ্যাসাদ তাহলে এই দিক থেকে শুরু হবে। সাজ্জাদের কপাল কুঁচকে উঠল।

গয়া বলল, "এ শালা সব ঐ কায়েতের বুদ্ধি। না হয় তো গয়ার নামে কুকুর পুষো। আমাগের গোমস্তার মত শয়তান এদিক দুটো নেই। শালার বুদ্ধি না তো, যানো শাঁখের করাত, আসতি কাটে, যাতি কাটে।"

বকাউল্লা বলল, "দেব নাকি শালার কল্লা ফাঁক করে?"

বশির বলল, "ওসব চিন্তা অ্যাকেবারে ছাড়ো।"

বলতে না বলতে চ্যাগারের বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা ক্রিং ক্রিং করে উঠল। বশির লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। "আস্সালা-মু আলায়কুম।"

"ওয়া আলাই কুমুস্‌সালাম।"

বশির সোৎসাহে বলল, "আসেন, আসেন আবু তালেব সাহেব। আপনার আসতি কোনও কষ্ট হয়নি তো?"

"না না, আসিছি তো বাইকেই। কষ্ট আবার কী?"

বশির আবু তালেব চৌধুরীকে নিয়ে হাজিরানা মজলিসে পরিচয় করিয়ে দিল। "ইনি নগরবাথানের কৃষক প্রজা নেতা জনাব আবু তালেব চৌধুরী।"

"আস্‌সালা-মু আলায়কুম।"

"ওয়া আলাই কুমুস্‌সালাম।"

পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর, ধানাই পানাই না করেই আবু তালেব আজকের মজলিসে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। প্রথমেই তিনি সুন্দরভাবে চাষীদের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন। বললেন, "চাষী-খাতক ভাইরা শোনেন। অ্যাখন নিজিরা উঠে না দাঁড়ালি ষাঁড়ে-সব্বনাশ!"

বাংলার চাষী যদি আগু-পিছু না ভেবে শুধু পাটের চাষ বাড়িয়েই যায়, তাহলে তার দুর্দশা তো ঘুচবেই না, সে একদিন মারাও পড়বে। এক সময় পাটের বাজার তেজি ছিল। তখন সাহেবদের যুদ্ধ চলছিল। তাই চটের বস্তার দরকার লাগত প্রচুর। তখন পাট চষলে লাভ ছিল। তখন যারা পাটের চাষ করেছে, তারা ঘরের চালে টিন দিয়েছে বিবির গায়ে গয়নাও পরিয়েছে।

"সেদিনির কথা ভাই, আপনারা ভুলে যান। আজ কুষ্টার আর ত্যামন কদর নেই। তাই তার দামউ নেই। আমাগের চাষী ভাইরা এই কথাডাই বুঝতি পারতিছে না। আপনারা ভাবতিছেন, অ্যাক বিঘে কুষ্টা বুনে পেট ভরল না, তো ইবার দু বিঘে বুনি। ঐটেই হল গে মরণের ফাঁদ। যে-মালের চাহিদে নেই, সেই মাল বাজারে যত আমদানি হবে, তার দাম তত কমে যাবে। তত আপনাগের মহাজনের কাছে হাত পাততি হবে। এইভাবে চাষী চারদিক থে মার খাচ্ছে।"

জমিরুদ্দি বলল, "কথাগুলোন কলেন তো বড় ভালো। কুষ্টা না হয় নাই বুনলাম, কিন্তু করবোডা কী সেইডে কন।"

"আপনারা ধান বোনবেন।"

"ধানে তো আরউ দর নেই।" বকাউল্লা বলল। "জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ। আমরা যাবো কনে?"

আবু তালেব হেসে বললেন, "তালি আমরা ড্যাঙ্গাতেই থাকব। অর্থাৎ কি না ধানই বেশি বোনবো। কুষ্টার বদলে যদি ধান লাগাই, বাজারে দর না পালি, খাতি তো পারব। কুষ্টা বিক্রি না হলি তা দিয়ে গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া আর কোন্ কাম করা যাবে?"

একথাটা মজলিসের মনঃপুত হল। সবাই মাথা নেড়ে বলল, "সিডা অবিশ্যি ঠিক।"

সাজ্জাদ চিন্তিত মুখে বলল, "দ্যাখেন এ ব্যাপারে বুঝাবুঝির বিশেষ কিছু নেই। কারণ কথাডা সত্যি। আমি বশির জমির আমরা এ কথাডা নিয়ে পিরায় রোজই নাড়াচাড়া করি। অ্যাখন দেখতিছি, আশেপাশের গিরামেও কথাডা নিয়ে আলাপ-সালাপ শুরু হইছে। কিন্তু মুশকিলডা এই যে, এ নিয়ে আমরা আগোতি পারতিছি নে। আমাগের চাষীগের কথা আর কবেন না। আমাগের অবস্থা অ্যাখন মুষ্টি ভিক্ষে তনু রক্ষে। তাই আমাগের মনে আর জোর নেই। তাই কারুর উপর বিশ্বেসও নেই। আল্লার উপরই ভরসা হারায়ে ফেলতিছি। আমি ভাবতিছি, আমি কুষ্টা না হয় বুনতিছি নে। কিন্তু বশির যদি বোনে। বশিরউ ঠিক এই কথাটা ভাবতিছে। ফলে যতই বুঝোন আর যাই করেন আখেরে দ্যাখা যাতিছে যে আমিউ কুষ্টা বুনতিছি আবার বশিরউ কুষ্টা বুনতিছে। ইডা ঠ্যাকাবার কোনও রাস্তা আছে কি না, তাই কন।"

আবু তালেব বললেন, "আপনারা অ্যাকটা বড় জমায়েত ডাকেন। জনকতক বড় নেতারে আনেন। তাহলি দ্যাখবেন, চাষীগের মনের বল ফিরে আসবে। আসলে অ্যাকা অ্যাকা আমরা ভয় পাই। দলে পড়লি সাহস বাড়ে। আমাগের ওদিকিও তো এই একই সমস্যা। আসল কথা আজ চাষী-খাতকের ঠিক ক'রে নিতি হবে তারা বাঁচবে না জাহান্নামে যাবে। যদি বাঁচতি হয় তালি নিজির পায় দাঁড়াতি হবে। এ ছাড়া আর রাস্তা কী?"

উঠোনে যখন মজলিস চলছে, তখন চাঁদবিবি রান্নাঘরে। হাঁড়িতে ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। আর চাঁদবিবি নিঃশব্দে কাঁদছে। বউটার জন্য ওর সব সময় মন খারাপ করে। আর তক্ষুনি কাঁদতে ইচ্ছে করে। আগে যখন তখনই কাঁদত। কিন্তু ফটিকের বাপ কদিন খুব বকাবকি করায় ওর সামনে আর কাঁদে না। অ্যাখন, মাঝে মধ্যে নাছিফা যখন ধান ভানতে আসে, তখন চাঁদবিবির সুবিধে হয়। ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে সে নিজের মনেই কাঁদতে থাকে। নাছিফা বোঝে তাই কিছু বলে না। ফটিকের বাপ কী বোঝবে, বউটার জন্যি ওর দেলটা যে কীভাবে জ্বলে ওঠে, তা ফটিকের বাপ পুরুষমানুষ, সে কী বোঝবে?

আল্লাহ্, তুমারেউ বুঝতি পারিনে। একটা কাঁচা কাঠ উনুনে ঠেলে দিয়ে চাঁদবিবি ঠেসে ফুঁ দিতে লাগল। আজ বারে বারে উনুন নিবে যাচ্ছে। আর হরদম ফুঁ দিতে হচ্ছে চাঁদবিবিকে। কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ করমচার মত লাল হয়ে উঠেছে তার। এখন কাঁদলে আর ধরা পড়ার

ভয় নেই। তাছাড়া ফটিকির বাপের অ্যাখন মজলিস চলতিছে। আল্লাহ্, তুমার মর্জিউ আমি বুঝতি পারিনে। আমরা তুমার পথেই বরাবর চলতিছি। তুমার কাছে আর্জি পেশ করিছিলাম, ছাওয়ালডারে পাশ করায়ে দ্যাও। দেছ। অ্যাটটা ভাল বউ চাইছিলাম। দেছ। কিন্তু বুড়োবুড়িতি মিলে ছেলে বউ নিয়ে থাকব, গরিবির এই হাউসটা তুমি মিটোয়ে দেলে না ক্যান? বউ কাঁদনির জন্য আসে মন কাড়ে নিয়ে চলে গ্যালো। অ্যাখন এ-বাড়িতি থাকি কী করে? বিটির শরীল খারাপ। বিয়াই বিয়ান চলে গেছেন। আমার নসিব খারাপ, আমি আর যাতি পারলাম না। ফটিকির বাপরে ছাড়ে যাই কী করে? আর মানুষটার তো সুমায়ই হচ্ছে না। এই মজলিস আর এই মজলিস! অ্যাত মজলিস কিসির, তাও তো বুঝিনে। মানুষটার কী য্যানো অ্যাকটা হইছে। দিন রাত ভাবতিছে, খালি ভাবতিছে।

আল্লাহ্, আমার বিটির তুমি ভালো করে দ্যাও। আমরা তো তুমার পথ ছাড়িনি। তালি ক্যান আমাগের নসিব অ্যামন হয়। চাঁদবিবির দেলটা উনুনের মতই হু হু করে জ্বলতে থাকল। চোখের জলে বউটার ছবি ভেসে ওঠে আর চাঁদবিবি আল্লাহ্ বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

॥ ৪ ॥

খাদু যথার্থই ভয় পেয়ে গেল। কাল পুননু স্যাকরার বাড়িতে গিয়েছিল। পুননু মিষ্টি গরম নানা রকম কথা বলল, কিন্তু খাদুর খত সে কিছুতেই আর ফেরৎ দিল না। একবার পুননু বলল, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অ্যাত ভাবতিছ ক্যান খাদু? আমি কি তুমার পর? তারপর আর একবার বলল, আর যে ব্যাপার মিটে গেছে, তা নিয়ে আমি আর সুমায় নষ্ট কত্তি চাইনে। আমার অ্যাকটা মাথা আর দশখানা গিরামের খাতকের ভালমন্দর কথা আমারে দিন রাত্তির ভাবতি হয়, তাই ভাবব না তুমার খত কনে আছে বসে বসে তাই খোঁজব। অ্যাঁ। বলে খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজা, তুমার হল গে তাই। তারপর পুননু তো বেশ রাগই দেখাল। বলল, আমারে অবিশ্বেস কত্তিছ! তুমাগের গায় কি মানুষির চামড়া আছে? না কি গণ্ডারের চামড়া? অ্যাঁ। চোখির পাতা কি খায়ে ফেলিছ? যে লোক তুমার বিপদের সুমায় অ্যাত উপগার করলো, তার উপর অবিশ্বাস কত্তি লজ্জা হয় না! পিঁয়াজ রসুন অখাদ্য কুখাদ্য খাবা, বিটারা তুমাগের ধম্ম জ্ঞান আর কতটুকুই বা হবে? যাও যাও, কাজের সুমায় বিরক্ত করে না। খাদুকে শেষমেষ একেবারে হাঁকিয়েই দিল পুননু। খাদু এবার ভয় পেল। সে কী করবে এখন?

সকালে উঠেই খাদু বশিরের বাড়ি গিয়েছিল। সব কথা বলল। বশির হুঁকোটা খাদুর হাতে চালান করে দিয়ে এক মনে খ্যাঁশ খ্যাঁশ করে খড় কাটতে লাগল। খাদু হুঁকো টানতে লাগল।

খাদু ক্লান্ত স্বরে একবার বলল, "সুমুন্দির স্যাকরার পো, আমারে তাড়ায়ে দেলে। আমার খত ফেরত দেলে না। গয়া কয়, আদালতে গেলি নাকি পুননুরই জিত হবে। পুননুর পয়সা আছে। ভালো ভালো উকিল লাগাবে। তারা হয়রে নয় করে ছাড়বে। গয়া কয়, পুননুর ঘরে হিঁদু মোছলমান সব রকমের সাক্ষী জিয়ানো আছে। কেউ তামা তুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে সাক্ষী দেবে আবার কেউ কোরান ছুঁয়ে কবে যে পুননু যা বলতিছে তাই ঠিক। ক্যান না পুননুর পয়সা আছে। আমি যা বলতিছি সব মিছে কথা, ক্যান না আমার পয়সা নেই। তালি ইনছাফটা পাব কী করে?"

বশির খড় কাটতে কাটতে খাদুর কথা শুনছিল। এ তো একা খাদুর কাহিনী নয়। তাদের গিরামে অ্যামন অ্যাকটা লোক নেই যার কোনও না কোনও মহাজনের কাছে টিকি বাঁধা। তাদের অঞ্চলে অ্যামন অ্যাকটা গিরাম নেই যেখানে খাতক নেই। দিনে দিনে ওদের অভাব বাড়ছে। দিনে দিনে ওদের আয় কমছে। দিনে দিনে ওরা মহাজনের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ছে। আবু তালেব লেখাপড়া শিখেছে, সে অনেক খবর রাখে। একদিন সে বলেছিল, মহাজনদের ঘরে বাংলার খাতকদের দেনার পাহাড় জমে গেছে। আবু তালেব বলেছিল সুদে-আসলে এই দেনার পরিমাণ অ্যাখন দুই শত দশ কোটি টাকা। দুই শত দশ কোটি টাকা যে কত টাকা সে সম্পর্কে বশিরের কোনও ধারণাই নেই। তবে দুই শত দশ কোটি টাকা, এই কথাটা এই জন্যে তার মনে আছে যে আবু তালেব দু'শ-কে বলেছিল দুই শত। দুই শত দশ কোটি টাকা দেনা। আবু তালেব তারপর যে কথাটা বলেছিল তাতেই বশিরের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, বশিরই যে শুধু খাতক তা নয়, কৃষিঋণের পাহাড়ের তলায় বাংলার সব চাষীই আজ পুরুষানুক্রমে চাপা পড়েছে। শুধু কিষাণ নিজেই নয়, তার বিবি বাচ্চা, সকলের ঘাড়েই গড়ে প্রায় একশ টাকার দেনা চেপে আছে। এবং সেই দেনা রোজ সুদে বাড়ছে। শুধু বিবি নয়, এমন কি যে বাচ্চা বিবির পেটে, অ্যাখনউ জমিনে গেরেনি, তার ঘাড়েও একশ টাকা মহাজনের দেনা চেপে আছে। সেই বাচ্চা যেই জন্মাবে এই দেনা তার ঘাড়ে চাপবে। যখন বড় হবে তার সঙ্গে সঙ্গে এই দেনাও সুদে-আসলে বাড়বে। চক্রবৃদ্ধি সুদে বাড়বে। তার মানে আজ যিডা সুদ কাল তা আসলের সঙ্গে মিশে সিডাই আসল হয়ে ওঠবে আর এই সমস্ত টাকার উপর বাড়তি সুদির চাপ। বাঃ রে, শালার কারখানা। হে ঈমানদারগণ! বশির খড় কাটতে কাটতে

আল্লার হুকুম আওড়াতে লাগল। তোমরা কর্জ দিয়া ক্রমবর্ধমান হারে সুদ খাইও না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হইবে। এ হুকুম তো তাদের জন্য যাদের হাতে টাকা আছে এবং যারা কর্জ দিতে পারে। কিন্তু যাদের টাকা নেই, যারা কর্জ দিতে পারে না, বরং কর্জ নিতে বাধ্য হয়, যেমন আমি বশির, যেমন খাদু, যেমন বাংলার লক্ষ লক্ষ চাষী, লক্ষ লক্ষ মুসলমান, যারা আল্লার রাস্তায় আছে, তাদের জন্য খোদা, তোমার কী হুকুম? বশির খড় কাটতে কাটতে আরজি পেশ করে। আমরা তো দেনায় তলায়ে যাচ্ছি। তুমি তো সবই দেখতিছ। কও, আমরা বাঁচব কী করে?

"কও বশির," খাদু নিস্তেজ কণ্ঠে বলল, "আমি তালি করব কী?"

বশির এমনই একটা ভয় করছিল। এর সোজা জবাব কী দেওয়া যেতে পারে? আবু তালেব থাকলে বড় ভাল হত। ও হয়ত একটা জবাব দিতে পারত। আবুভাই য্যামন করে বলে ত্যামন করে বোঝানো ওর সাধ্য নয়। আর কাকে বোঝাবে? কে বুঝবে, কে ধৈর্য ধরে শুনবে কথা? আর্থিক অবস্থায় মুসলমান সমাজ অত্যন্ত হীন, এটা এতই পরিষ্কার যে এটা কি বলে বোঝাতে হয়? অপরিমিত অপব্যয় মুসলমান সমাজকে ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত করছে, তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, একথা বোঝাতে চাইলে কে বোঝে? বা বুঝতে চায়? যদি বলি, ভাই মুসলমান, কর্জ করে টাকা এনে আমদারী করো না, খয়রাত করো না, বিয়ে-শাদীতে পণ নিও না বা খয়োস্তলী, সিগ্গানী, দেয়াগিরী, মাতুল-সলামী বা বেশী গয়নার চারজ করে বরপক্ষকে জুলুম করো না, তবে আমার সে কথা কেউ শুনবে? সুদখোর মহাজনরা একবার গরিব চাষীকে কায়দায় পেলে সব রস শুষে না নিয়ে তাকে ছিবড়ে না করা ইস্তক আর ছাড়বে না। আবু তালেব বলে, চাষ ছাড়া বাংলার মুসলমান আর কোনও কাজে হাত দেবে না। হিন্দুরা ব্যবসা বাণিজ্য করে ধন-দৌলত কত বাড়িয়ে ফেলছে। কোরান বলছে, "কিন্তু আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।" কিন্তু আল্লার এই এরশাদও মুসলমানেরা মান্য করে না।

"বাজান!" বশিরের মেয়ে এসে ডাকল। বাচ্চা মেয়ে। ন্যাংটো। নাক দিয়ে মোটা ধারায় পোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। পেটজোড়া পিলে। পিলের উপর দিয়ে একটা লাল ঘুনসী বাঁধা।

বশিরের কানে সে ডাক ঢুকল না। তার চোখে বাংলার মুসলমান চাষীদের প্রেতগুলো তখন নৃত্য করতে শুরু করেছে। কোনও হাটে মুসলমানের একটা দোকান নেই। তাদের এখেনে এক মেন্দার আড়ৎ। আব তাজ বিড়ির কারখানা। ব্যস। কাপড়ের দোকান হিন্দুর, মুদীখানা হিন্দুর, মনোহারী হিন্দুর, লোহা, টিন, কেরোসিন, তেলের দোকান হিন্দুর। মুসলমান চাষী জমি কিনবে, দলিল লিখবে হিন্দু। জমি বেচবে, বেশির ভাগ খদ্দের হিন্দু, বন্ধকী কারবার হিন্দুর। সব ব্যাপারেই মুসলমানের ঘর থেকে পয়সা বানের স্রোতের মত বেরিয়ে যায়। আর হিন্দুদের সিন্দুকে গিয়ে ঢোকে। এই একমুখী প্রবল স্রোতটা বশিরের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এমনভাবে তার চোখ ফোটাবার জন্য সে আবু তালেবের কাছে ঋণী। খড় কাটতে কাটতে সে যেন স্বপ্ন দেখছে। স্রোতে ভাসছে তারা। এই স্রোত দুর্বার গতিতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে, খাদুকে, সাজ্জাদ চাচাকে, তাদের গ্রামের এবং আরও সব গ্রামের অসংখ্য চাষীকে। তারা আর তাদের পরিবারের সবাই খড় কুটোর মত ভেসে চলেছে। ভাসছে, ডুবছে, খাবি খাচ্ছে। কী অসহায় তারা!

"বাজান। বাজান!" মেয়েটা বার কয়েক ডাকল।

জানো বশির! আবু তালেব একদিন বলেছিল, আল এসলাম কাগজের পুরোনো এক সংখ্যাতে এছলামাবাদী ছাহেবের একটা লেখা পড়িছিলাম।

"বা—জা—ন!"

অন্যমনস্কভাবে বশির এবার উত্তর দিল, "কী বাপ?"

এছলামাবাদী ছাহেব একটা আশ্চর্য সত্য আমার চোখের সামনে ফুটোয়ে তুলিছেন। বশিরভাই, তুমিও শুনে রাখো।

"বাজান। খিদে লাগিছে।"

"খিদে লাগিছে?" খড় কাটতে কাটতে অন্যমনস্কভাবে বশির বলল, "তা খাওগে বাপ।"

জানো বশির, বাংলাদেশে রোজ গড়ে তিন শতাধিক মুসলমান দায়ীকের সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর তা কিনে নেবার ক্ষমতা কোনও মুসলমানের হচ্ছে না। মুসলমানগের সম্পত্তি সব চলে যাচ্ছে অমুসলমানগের হাতে। রোজ তিন শতর উপর মুসলমানের সম্পত্তি এই বাংলায় নীলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! ভাবতি পারো? এ হিসেব আজকের নয়, বশির। অন্তত পনের ষোল বছর আগেকার কথা। আজ জমি বিক্রির সংখ্যা তো আরউ বাড়িছে। আর ক বছর পরে আমাগের থাকবে কী? কতি পারো?

"বাজান!"

ভালো লোকেরে জিজ্ঞেস করিছেন আবুভাই! যে কথার জবাব আপনি দেবেন, তার জবাব আপনি জিজ্ঞেস কত্তিছেন, আমার মত এক নাংলা চাষার কাছ থে? কী তাজ্জব!

না, না, তামাশা নয়, আমি সত্যিই জিজ্ঞেস কত্তিছি। আমাগের অবস্থা যে কী রকম হয়ে উঠতিছে তা যাতে তুমি ভালোভাবে বুঝতি পারো তার জন্যিই একথা তুমারে জিজ্ঞেস করা।

তুমার বাড়ি ডাকাত পড়ল, কি হাটখলোয় তাজ বিড়ির কারখানাডা উরা পুড়োয়ে দিল, এ সব ক্ষতি আমরা চোখি দেখতি পাই বলেই আমরা ধরে নিই যে আমাগের কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল। এই ধরনের সর্বনাশ আমরা টের পাই। কিন্তু যে সর্বনাশ—

"বাজান। আমার খিদে লাগিছে। আমি কী খাব?"

"একটু ছবুর কর না বাপ। হাতের কাজটা শেষ হতি দে।" বশির খড় কেটে চলল।

খাদু বলল, "চুপ করে থাকলি চলবে না বশির। তুমি আমাগের মাতব্বর। তুমারে এর একটা বিহিত কত্তি হবে। পুনুনু হারামখোর খত ফেরত দেবে না। গয়া শালা ধরিছে ঠিক। শালা নিজি হিন্দু তাই হিন্দুর কল্লামিডা ঠিক ধরিছে। আমি ইনছাফ পাবো কি পাবো না, তুমারে তা কতি হবে।"

বশির বিপন্ন বোধ করতে লাগল। মহাজনরা এ রকম অন্যায় নতুন করছে না। এক যদি ওদের স্বারস্থ হতে না হত তবে হয়ত উপায় করা যেত। আরেকটা উপায়ও ছিল। আবু তালেব যা করবার চেষ্টা করছে। গ্রামের চাষীদের ঋণ দেবার জন্য প্রতি গ্রামে একটা করে বয়তুলমাল অর্থাৎ কি না নিজেদের মধ্যে টাকা তুলে একটা তহবিল আর তিন চারটে গ্রাম নিয়ে একটা ধর্মগোলা যদি গড়ে তোলা যায় তা হলে চাষীদের আর ঋণ নেবার জন্য মহাজনের কাছে হাত পাততে হয় না। কিন্তু মুসলমান চাষীরা এতই বোকা এবং অবিশ্বাসী এবং পরনির্ভর এবং নিরুপায় যে আবু তালেবের এই সব ভালো মতলবে এরা কানই দিতে চায় না। একে অন্যকে বিশ্বাসই করতে চায় না। মহাজনদের কাছে জুজু হয়ে থাকে, পাছে মহাজন নারাজ হয়। সাজ্জাদ চাচা পর্যন্ত বলে, সুমায় লাগবে বাপ, আমাগের ওই পয্যন্ত যাতি অনেক সুমায় লাগবে। সত্যিকারের মোমেন মুসলমান কটা আছে দেশে কও দিনি যার দেলে দীনী ইসলাম ঈমানের চেরাগ জ্বালে রাখিছে? মসজিদির সম্পত্তি, ওয়াকফ সম্পত্তি গাপ করে দিতি যাগের বাধে না, তাগের আমরা যে শুধু মুসলমান কই তা নয়, মুসলমান সমাজের মাতব্বরও তাগেরই বানায়ে রাখিছি। উরা যদি আর ওগেরই মত হিন্দু মতলববাজ মাতব্বররা যদি হিন্দু মুসলমান ঠুকাঠুকি জিয়োয়ে না রাখতো তো ওগের মাতব্বরি কবেই খসে যাতো। যে লোকের আল্লার সম্পত্তি বেচে খাতি ভয় হয় না, সে লোকের হাতে বয়তুলমালের টাকা কি ধর্মগুলার চাবি পড়লি পরদিনই সব মাল নস্যি হয়ে যে উড়ে যাবে না, তা বুকি হাত দিয়ে কেউ কতি পারে? তুমি পারো?

"বাজান!" অ্যাঁ অ্যাঁ করে মেয়েটা কান্না শুরু করল। "আমার খিদে লাগিছে।"

"অ্যাঁ! খিদে লাগিছে?" খড় কাটতে কাটতে বশির যেন ঘুম থেকে উঠল। "তা যাও না বাপ, মার কাছে যাও। পান্তা ভাত খাও গে যাও।"

"নেই-ই ই ই।" মেয়েটা কাঁদতে লাগল।

"কী মিঞা, অ্যাকেবারে বুবা হয়ে গেলে যে।"

"ভাই বেশ করে এটটু তামুক সাজো দিন। কাজডা চটপট চুকোয়ে দিই।"

"নেই। বাজান, ভাত নেই!"

বশির বিরক্ত হয়ে উঠল। "ভাত নেই তো মুড়ি খাওগে বাপ? যাও অ্যাখন বিরক্ত করে না।"

"নুন্ নেই। নুন নেই।"

"কী নেই?"

"মুনি মুনি নেই। বাজান আমার খিদে লাগিছে। মুনি নেই।" মেয়েটা কাঁদতে লাগল।

বশির থপ্ করে রেগে গেল। কাটা খড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার বলদ দুটোর পেট অর্ধেকও ভরবে না।

খিদে খিদে করে বশিরের আরও একটা বাচ্চা বেরিয়ে এল। আরও একটা। তারপর তিন জন সমস্বরে কাঁদতে লাগল। খাদু হুঁকোটা বশিরের হাতে তুলে দিল। বশির হুঁকোয় টান দিতে দিতে ভাবতে লাগল। ওর ছেলেমেয়েদের কান্নায় তেমন বিচলিত বোধ করল না। বশির জানে ঘরে খাবার না থাকলে প্রথম প্রথম ওরা কাঁদে তারপর এ বাড়ি ও বাড়ি চলে যায়। কেউ কিছু দিলে তো খায়, না হলে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। কাঁদে। কেঁদে কেঁদে এক সময় নেতিয়ে পড়ে। গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোয় না। তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের মা ধান ভেনে ফিরে আসে, যা পায় আনে, রাঁধে বাড়ে, তারপর ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। দু একটা বাচ্চা টিকতে পারেনি। মরে গিয়েছে। দুঃখ বিশেষ পায় না বশির। তবে ওর বিবির শোকোচ্ছ্বাস-বিহীন শূন্য দৃষ্টির সামনে দু তিন দিন কেমন কাঁচুমাচু হয়ে থাকে। মনে হয় বাচ্চা-কাচ্চা মরার জন্য বশিরই যেন দায়ী। এই রকম সময় বশির ওর বিবির উপর বেজায় রেগেও যায়। মনে মনে গাল দেয়, হারামজাদী তোর অ্যাত বিয়োবার শখ ক্যান? কিন্তু বশিরই ওকে আবার বিছানায় টানে। ওর বিবি হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। যেন সে মানুষ নয়, পাথর কিংবা মাটিরই তাল একটা। কিন্তু বশিরের যেটা আশ্চর্য লাগে তা এই যে, তার বিবির বিয়োনো বন্ধ হয় না। ও সব নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামায় না বশির। তবে হ্যাঁ, মাথা ঘামায় না, এটাও ঠিক নয়। কিন্তু ভেবে করবে কী? এই যে বাচ্চাগুলো চেঁচাচ্ছে। খিদে পেয়েছে। খেতে চাইছে। ঘরে খাবার থাকলে ওদের পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা যেত। ওদের কান্না থামত।

এ তো পাগলেও বোঝে। এখন খাবার নেই ওরা কাঁদছে এবং খাবার যোগাড় করার কোনও সম্ভাবনাও নেই। তাই ওরা কাঁদবে। বশিরের কিছুই করার নেই।

রোজ তিন শত মুসলমানের সম্পত্তি নীলেমে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বশিরের সম্পত্তি, সাজ্জাদ চাচার, খাদুর, সব্বার সম্পত্তিই নীলেমে চড়বে। আবু তালেব তাই বলে। এক জমায়েতে আবু তালেব বলেছিল, ভাই মুসলমান ভাই চাষী! আপনারা সব অ্যাক হন। যদি আপনাগের বাঁচাতি হয়, আপনাগের ছাওয়াল-পাওয়ালগুলোরে বাঁচাতি চান যদি তালি আপনারা অ্যাক হন। ভাই আপনারা সেই কঞ্চির কেচ্ছাডা ভাবে দ্যাখেন। অ্যাকটা কঞ্চি, তার আর কতটুকু বল। চার বছরের ছোঁড়াডাউ তারে মটাস করে ভাঙে ফেলাতি পারে। কিন্তু সেই অবলা কঞ্চির অ্যাকডা অ্যাকডা আলাদা করে না রাখে অনেক কঞ্চির অ্যাক সঙ্গে করে অ্যাকটা আঁটি বাঁধে ফ্যালেন দিনি। তারপর সেই আঁটিডারে যদি দেশের সব চাইতি মশহুর পালোয়ানের হাতেও তুলে দ্যান, অ্যামন কি সিডা যদি পালোয়ান রুস্তম মিয়ার হাতেও তুলে দ্যান তবে রুস্তম পালোয়ানেরও সাধ্যি হবে না যে সেই আঁটিডারে ভাঙে। ভাই মুসলমান, তালি ভাবে দ্যাখেন কঞ্চির আঁটির কত জোর, অ্যাকটা কঞ্চি হল অ্যাকা তাই তার কোনও জোর নেই। এই য্যামন আজকের দিনির মুসলমান চাষী। অ্যাকা অ্যাকা। তাই ফৌত হবার দাখিল হইছে। আর সেই কঞ্চির আঁটির আবার জোর কত তা দ্যাখেন। এই জোরডা কিসির জোর? আবু তালেব প্রশ্ন তোলে। কেউ জবাব দ্যায় না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে আবু তালেবের মুখের দিকে সবাই তাকায়। ঐ জোরই, আবু তালেব বলে অ্যাকতার জোর। তখন একজন দুইজন হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসে। অন্তত বশিরের তাই মনে হয়। তারপর সেই ঘুম ভাঙা মানুষরা হঠাৎ মারহাবা মারহাবা বলে ওঠে।

"বাজান, খিদে লাগিছে।"

"বা জা ন অ্যা অ্যা খি'নে খিনে।"

বশিরের শরীরে রাগ চড়তে থাকে। প্রাণপণে সে হুঁকো চুষতে থাকে। যেন সে ভালোভাবে হুঁকো চুষতে পারলেই ওর বাচ্চাকাচ্চাদের পেট ভরে যাবে।

"বশির ভাই", খাদু সেখ বলে, "কী করি অ্যাখন, পুনুনু শালার হাতের থে আমার খতখান ফেরত পাই ক্যামন করে, তাই কও।"

"বাজান খি'নে, বাজান খি'নে।"

বশির আর সামলাতে পারলো না। "শালা হারামের গুষ্ঠি", হুংকার দিয়ে বশির এক লাফে বারান্দায় গিয়ে উঠল। "খালি খিদে, খালি খিদে!" পাগলের মত নাগালের মধ্যে যে দুটো বাচ্চাকে পেল তাদের গলা টিপে ধরল। "আজ তোগের জন্মের মতো খিদে মিটোয়ে দেবো।"

"করো কী করো কী বশির ভাই, উরা যে ক্যালায়ে গ্যালো!" খাদু এক লাফে বশিরের কাছে গিয়ে, "ছাড়ো ছাড়ো", বলে এক ধাক্কায় বশিরকে সরিয়ে দিল। ছোট বাচ্চাটার চোখ ততক্ষণে উলটে গিয়েছে, তার বড়টা খাবি খেতে খেতে হঠাৎ তারস্বরে কেঁদে উঠল। খাদু ছোট বাচ্চাদের মুখ ফাঁক করে ফুঁ দিতে লাগল। মাঝে মাঝে বলতে লাগল, "পানি, পানি আনো বশির ভাই!" একটু পরে বাচ্চাটা ক্যাঁ করে উঠল। ওর হাড় জিরজিরে বুকের খাঁচাটা হাপরের মত উঠতে নামতে শুরু করল।

"পানি, পানি আনো ও বশির ভাই! কত্তিছ কী?"

খাদু পিছন ফিরে দেখল বশির একটা বাঁশের খুঁটি ধরে থরথর করে কাঁপছে। আর বিড়বিড় করে বকছে।

খাদু তাকে ডাকছে বশির বুঝতে পারছে। কিন্তু কী যে বলছে, সে একটুও শুনতে পাচ্ছে না। দুটো বাচ্চা উঠোনে পড়ে আছে বশির দেখতে পাচ্ছে, এও দেখছে খাদু একটা বাচ্চার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কী সব করছে। কিন্তু আদৌ বুঝতে পারছে না, ব্যাপারটা কী? আরও মুশকিল এই যে, সে খুঁটি ছাড়তে পারছে না। কেমন চরকির মত ঘুরপাক খাচ্ছে সে। সে আউজুবিল্লাহ বলে উঠল।

বশির দেখল খাদু তাকে কী যেন বলছে আর বাচ্চাটার মুখে ফুঁক দিচ্ছে। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছে খাদুর কাছে যায়। গিয়ে ধুলো থেকে বাচ্চাটাকে ওর বুকে তুলে নেয়। ওকে খুব ভালোবাসে বশির। কিন্তু একদম খুঁটি ছেড়ে নড়তে পারছে না। হাত, পা, বুক সব থর থর করে কাঁপছে।

বশির দেখল খাদু বাচ্চা দুটোকে ফেলে রেখে ভিতরের দিকে দৌড় দিল। বশিরের ইচ্ছে হল বাচ্চাটাকে এবার কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটা উঠোনেই শুয়ে আছে কেন? নড়ছে চড়ছে না কেন? তারই বা শরীরটা এত কাঁপছে কেন?

বশিরের বুক ঠেলে একটা যন্ত্রণার ঢেলা বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। অসহ্য একটা কষ্ট পাচ্ছিল বশির।

সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "আমার গুনাহ্ মাফ করো। আমারে মাফ করো।"

সঙ্গে সঙ্গে ঢেলাটা তার বুকের মধ্যে ভেঙে যেন গলে গেল এবং অনুতাপের অশ্রু হয়ে দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

তার মেয়ে "বাজান" বলে ডেকে উঠতেই বশির চমকে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দপ করে

সব কিছু তার মনে পড়ে গেল। বশির বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল, "হায়আল্লা! তালি কি আমি নিজির বাচ্চারে খুন কল্লাম। খাদু! এ আমি কী কল্লাম!"

খাদু বলল, "ভয় নেই। সব বাঁচে আছে। বড় জোর বাঁচে গেছে।"

বশির খাদুকে দুই হাতে জাপটে ধরল। তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "খাদু তুই আমার বাপ, তুই আমার বাপ, তুই আমার বাপ!"

॥ ৫ ॥

অনিশ্চয়তার ভাবটা কিছুতেই কাটাতে পারছে না শফিকুল। এখন প্রকৃতপক্ষে শ্বশুরের পয়সাতেই ওর সংসার চলছে। বিলকিসের শরীরটা কেমন যেন ভেঙে পড়ছে। তাই নয়মোন মেয়ের কাছেই রয়ে গিয়েছেন। হাজী সাহেব কখনও এখানে থাকেন, কখনও বাড়িতে। চাঁদবিবির কান্নাকাটিতে সাজ্জাদ একবার ওকে নিয়ে ছাওয়ালের বাসাবাড়িতে এসেছিল। দিন কতক ছিল। হাজী সাহেব তখনও এখানে। তারপর চাঁদবিবিকে নিয়ে সাজ্জাদ সেই যে চলে গিয়েছে আর আসেনি। অন্য কোনও কারণে নয়, সদরে যাতায়াত করতে যে কয়টা পয়সা খরচ, সেটা যোগাড় করতেই সাজ্জাদের কষ্ট হয়। ছাওয়াল অবশ্য পয়সা দিতে চেয়েছিল সাজ্জাদ নেয়নি। বিলকিস কিন্তু ছাড়েনি। শ্বশুরকে লুকিয়ে ওর শাশুড়ির আঁচলে টাকা বেঁধে দিয়েছিল।

শফিকুলের প্রথম মামলাটা নিয়ে শহরের উকিল মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কেউই বুঝতে পারেননি শফিকুল মামলাটা এত সুন্দরভাবে লড়বে। শফিকুল জেরা শেষ হবার পর, সওয়ালটাও খুব সুন্দরভাবে করেছিল। বলেছিল, এটা, ইওর অনার, স্পষ্টতই সাজানো মামলা। তাই ফরিয়াদী পক্ষের সব ব্যাপারটাই এমন সামঞ্জস্যবিহীন। তিনটে নিরস্ত্র লোক, একটা মেয়েছেলেকে তার স্বামীর সামনে পর পর ধর্ষণ করে গেল। মেয়েছেলেটি যখন একজনের দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে, তখন তার স্বামীকে অন্য দুজন আসামী হাত ধরে আটকে রেখেছিল। এবং স্বামীটি বাধ্য ছেলের মত আসামীদের কাছে বসে থাকল। কোনও রকম বাধা দেবার চেষ্টা করল না। চিৎকার চেঁচামেচিও না। এবং অন্য সাক্ষীরা যখন এল, তখনও তাদের কাছে কিছু বলল না, শুধু মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল। মেয়েছেলেটি, লক্ষ্য করবেন ইওর অনার, বলেছেন যে তিনি 'প্রাণপণে' তিনটি জোয়ানের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। আমি এখানে প্রাণপণে কথাটার উপর আবার জোর দিচ্ছি। কিন্তু সরকারী ডাক্তার, ফরিয়াদী বা আসামী কারোর শরীরেই "সেই প্রাণপণ লড়াই"-এর কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না। নট ইভন এ সিংগল স্ক্র্যাচ। সামান্য একটা আঁচড়ের দাগও নয়। যে দারোগা প্রথম এজাহার নিয়েছিলেন, তিনিও এই ব্যাপারটার কোনও উল্লেখ তাঁর এফ আই আর-এ অর্থাৎ প্রাথমিক এজাহারে লিপিবদ্ধ করেননি। আসামীরা ফরিয়াদীর হাত-পা বেঁধে তার উপর অত্যাচার করেছে, একথা ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী বা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা কেউ বলেননি। তথাপি একটা আসামী অত্যাচার করে বেরিয়ে এল এবং অন্য আসামী অত্যাচার করতে গেল, এই দুটো ঘটনার মাঝখানে যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও, সময়ের ব্যবধান পাঁচ-ছ মিনিট যে ছিলই, একথা, ইওর অনার, ফরিয়াদী পক্ষের ঝানু সাক্ষীরাও স্বীকার করেছেন এবং ইওর অনার এটা মামলার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, এই সময়টুকু পাওয়া সত্ত্বেও ফরিয়াদী সেটাকে তাঁর আত্মরক্ষার কাজে লাগাননি, তিনি ঐ সময়টুকুর মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু দিলেন না। কেন? তিনি ববং আরও দুজন আসামীকে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর উপর "অত্যাচার" করার সুযোগ করে দিলেন। কেন দরজা বন্ধ করলেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে ফরিয়াদী একবার বললেন, তিনি দরজায় খিল তুলে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। কেন? না, ভয়ে নড়তে পারেন নি। ইওর অনার, এটা কি একটা কারণ হল? এই কি প্রাণপণে আত্মরক্ষা করার নমুনা? এই দেখুন ফরিয়াদীর সাক্ষী, আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, "আসামীরা একের পর এক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায়", তিনি দরজা বন্ধ করার সময় পাননি। অথচ দেখুন তাঁর স্বামীর সাক্ষ্যে বলা হয়েছে, একজন আসামী তাঁর স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে এসে তাঁর হাত চেপে ধরে তাঁকে আটকে রাখার পর আরেকজন আসামী তাঁর স্ত্রীর ঘরে ঢুকেছে। তাঁর সাক্ষ্যতে তিনি আরও বলেছেন, একজনের আসা, তাঁর হাত ধরে অন্য আসামীকে মুক্ত করে দেওয়ার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান ছিল, এতে করে অনায়াসে দরজা বন্ধ করে দেওয়া যেত, অবশ্য কেউ যদি চাইত। কিংবা ওঁরা যেমন বলছেন, ঘটনাটা সত্যিই যদি ওরকম ঘটে থাকত। তারপর দেখুন, ইওর অনার, আমার লারনেড ফ্রেন্ড, ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁশুলির জেরায় ফরিয়াদী অবশেষে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "দরজা বন্ধ করার কথাটা তাঁর খেয়াল হয়নি।" এত পরস্পরবিরোধী কথা কি এই ধারণাই জন্মে দেয় না যে যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত আত্মরক্ষার কোনও গরজ ফরিয়াদীর ছিল না?

আদালত ভরে গিয়েছিল উকিলে। অনেক সিনিয়র উকিলও মজা দেখতে এসেছিলেন। এবং তার সওয়াল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসে শফিকুলের।

তার সওয়ালের তাঁরা রীতিমত তারিফ করেছিলেন। ফটিক নিশ্চিত ছিল, এ মামলায় সে জিতবেই, এবং তার মক্কেলরা ছাড়া পাবে। বিলকিসকে, তার শ্বশুরকে, আসামীদের বাপ দুজনকে সে বড় মুখ করে বলেছিল সে কথা। কিন্তু জজ সাহেব তার সওয়াল অগ্রাহ্য করলেন এবং ভারতীয় পিনাল কোডের ৩৭৬ ধারায় নির্দেশিত সর্বোচ্চ সাজা দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে আসামীদের দণ্ডিত করলেন।

শফিকুল অবাক। সে একেবারে মুষড়ে পড়ল। এজলাসে সে একবার জজের দিকে চাইল এবং চোখাচোখি হল। জজ সাহেবের শান্ত চোখদুটো, শফিকুলের মনে হল, যেন বলল, "আই অ্যাম সরি।" শফিকুল এবার খান বাহাদুরের দিকে চাইল। তাঁকে ঘিরে একটা জটলা। তাঁর মক্কেলরা খুব উল্লসিত। এজলাস ফাঁকা হয়ে গেল। জজ সাহেব তাঁর নিজের ঘরে ঢুকে পড়লেন। খান বাহাদুর কোনোদিকে না চেয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল। কয়েকজন উকিল শফিকুলকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। এমনও বললেন কেউ কেউ যে খান বাহাদুরের মক্কেল বলেই ওরা জিতে গেল। নইলে আসামীদের পক্ষে আপনি যে-কেস দাঁড় করিয়েছেন তাতে আইনত আপনার মক্কেলদের সাজা হতে পারে না। বেনিফিট অফ ডাউট তো নিশ্চতই পেতো।

কী হতো তা ভেবে আর লাভ নেই এখন। এজলাস যখন একেবারে ফাঁকা, শফিকুল তখন নথিপত্র গুছোতে গুছোতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এবং ভাবল সরল সত্য এই যে সে হেরেছে। এবং বুঝতে পারল, আসলে সে কত কাঁচা। কী পরিশ্রমটাই না করেছে শফিকুল এই মামলাটার পিছনে। প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা একটা অসম্ভব মামলা। তারপর প্রসিকিউশন এই কেসটাকে যতই উন্মোচিত করতে লাগল, ততই সে ধীরে ধীরে তার প্রতিপক্ষের দুর্গটির দেওয়ালে নানা ফাটল বের করতে লাগল। এবং প্রসিকিউশনের অর্থাৎ ফরিয়াদী পক্ষের দুর্বলতম স্থানগুলোতে প্রবল আক্রমণ চালাতে শুরু করল। এবং ধীরে ধীরে খান বাহাদুর খোনকার বজলুর রহমানের মত বাঘা ফৌজদারি উকিলকেও সে কোনঠাসা করে ফেলেছিল। সে ফাঁকা এজলাসটায় একবার করুণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর নথির বাণ্ডিল বগলদাবা করে ক্লান্ত পদে বেরিয়ে পড়ল। বার লাইব্রেরির দিকে যেতে তার ইচ্ছা করল না। সে একে নতুন তায় হেরে যাওয়া উকিল। শফিকুল আন্দাজ করতে পারে এখন সেখানে তাকে নিয়ে উকিলবাবুদের রসনা কত তীব্র এবং কত ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে।

এই মামলার এই রায়! প্রত্যেক আসামীকে দশ বছর করে কারাদণ্ড! অথচ কী আহাম্মক শফিকুল! আগাগোড়া সে ধারণা করে গিয়েছে, সে জিতবে এই মামলায়! জিতবেই। খোয়াব দেখেছে শফিকুল, সে এই মামলায় জিতে গিয়েছে। খোন্‌কারের মত জালুতকে (অর্থাৎ গোলিয়াথ্‌কে) শফিকুলের মত দায়ুদ (অর্থাৎ ডেভিড) ধরাশায়ী করে দিয়েছে। এবং এই আশ্চর্য ঘটনায় শফিকুলের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মক্কেলে মক্কেলে ছেয়ে গেছে তার বৈঠকখানা। নাওয়া খাওয়ার ফুরসৎ নেই তার। গিল্‌টি। জজ সাহেবের একটা কথা, গিলটি শফিকুলকে যেন পাথরের উপর আছড়ে ফেলল। ওর মক্কেল মোহাম্মদ বছিরুদ্দি, মোহাম্মদ মইনুদ্দি এবং মোহাম্মদ মনিরুদ্দি জজের রায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেল। এবং দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল সাজা। এবং তারা নিরপরাধ। নিরপরাধ? হ্যাঁ, এটা যে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা নয়, সে বিষয়ে শফিকুল নিঃসন্দেহ। এগেন্‌স্‌ট হার উইল এবং উইদাউট হার কন্‌সেন্‌ট একথা প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পারেননি। তবু ওদের সাজা হল।

কী করে হয়? এদের বিরুদ্ধে কুঞ্জবাবুর সাক্ষীই ছিল সব চাইতে জোরালো। তিনি জানালা দিয়ে প্রথম আসামী মোহাম্মদ বছিরুদ্দিকে ফরিয়াদী চিন্তামণি দাসীর সতীত্ব বলপূর্বক নাশ করতে দেখেছেন। হাজার জেরা করেও কুঞ্জকে নড়ানো যায়নি। বেশ, তাও যদি হয়, তবে ব্যাপারটা যে বলপূর্বক ঘটেছে কুঞ্জর সাক্ষীতে তা তো প্রমাণ হয়নি। এছাড়া আর সব প্রত্যক্ষদর্শীকেই সে জেরার চোটে শুইয়ে দিয়েছে এবং তাদের মুখ দিয়ে পরস্পরবিরোধী কথা বলিয়ে ছেড়েছে। এমন কি খোদ চিন্তামণিও ঢের অসংলগ্ন কথা বলেছে। যেমন প্রথম দিকে সে এমন ভাব দেখাতে চাইছিল যে আসামীদের সে চেনে না। পরে চিন্তামণি স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সে তিন আসামীকেই চেনে। ওরা যখন চিন্তামণিদের গ্রাম সংলগ্ন মাঠে কুঞ্জবাবুর জমিতে বছরখানেক আগে জন খাটতে আসে, সেই তখন থেকেই চিন্তামণি ওদের চেনে। কুঞ্জবাবুর হুকুমে চাষের সময় সে ওদের ভাত রেঁধে খাইয়েছে। তার স্বামী ওদের কয়েকবার নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে। এমন কি চিন্তামণি আর তার স্বামী আসামী তিনজনকে আড়ং দেখতেও নিয়ে গিয়েছে। পরাণের অনুপস্থিতিতে এই জোয়ান ছেলেরা মাঝে মধ্যে চিন্তামণির বাড়িতে এলে সে ওদের তাড়িয়ে দেয়নি বরং পান খেতে দিয়েছে, সে কথা কবুল করেছে চিন্তামণি।

এরকম অসঙ্গতি চিন্তামণির বর পরাণ বৈরাগীর সাক্ষ্যেও ঢের আছে। ওর বউ-এর সতীত্ব হানি ঘটছে তার চোখের উপর আর পরাণ কোনও বাধা না দিয়ে চুপ করে বসে আছে আসামী দুজনের কাছে, এ বড় অদ্ভুত ঘটনা। পরাণকে আসামীরা হাত-পা বাঁধেনি, তার মুখে কাপড় গুঁজে কণ্ঠ রোধ করে দেয়নি। তবু পরাণকে চেঁচাতে শোনা যায়নি। কেন? না, প্রাণের ভয়ে সে চুপ করে ছিল। চৌকিদারকে তার উঠোনে উপস্থিত দেখেও পরাণ কোনও কথা বলেনি কেন? না, ভয়ে, অপমানে, লজ্জায় সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এবং এসব কথা জজ সাহেব

সবই বিশ্বাস করেছেন। আশ্চর্য !

চৌকিদার বলেছে যে, সে এসে দেখে পরাণ তার ঢেঁকিশালে ঢেঁকির উপর বসে আছে মুখ নিচু করে আর তার ডান পাশে মোহাম্মদ বাঁশরুদ্দিন ওরফে সানা মিঞা এবং বাঁ পাশে মোহাম্মদ মণিরুদ্দিন ওরফে গাজু মিঞা ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে। না, প্রথম দৃষ্টিতে দেখে চৌকিদারের মনে হয়নি যে পরাণকে ওরা জবরদস্তি করে ধরে রেখেছে। আগে কুঞ্জবাবু এবং পরে পরাণ তাকে বলে যে ওকে ওরা জোর করে সেখানে ধরে রেখে তার বউ-এর সতীত্ব নষ্ট করেছে। চিন্তামণির নালিশও তাই। মোহাম্মদ মইনুদ্দিন ওরফে মজনু মিঞাকে চিন্তামণির ঘর থেকে বেরুতে সে দেখেছে। তবে ঘরের ভিতরে কী ঘটেছে তা সে জানে না। এবং চৌকিদার এও বলেছে যে কুঞ্জবাবুই ওকে ডেকে আনেন। নালিশও প্রথম কুঞ্জবাবুই করেন।

এই রকম অদ্ভুত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ নানা ঘটনা উদ্ঘাটন করেছিল শফিকুল। সব ব্যাপারেই দেখা যাচ্ছে কুঞ্জবাবুই এগিয়ে আছেন। সতীত্বনাশ হল পরাণের স্ত্রীর। তাকে ততটা উত্তেজিত দেখা গেল না। নাচন কোঁদন যা করবার প্রথম থেকে শেষ অবধি কুঞ্জবাবুই করলেন।

আসামী তিনজনই সেদিন পরাণের বাড়িতে গিয়েছিল। পরাণ ওদের নেমন্তন্ন খাইয়েছে। নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে কুঞ্জবাবুর পরামর্শে এই মিথ্যে মামলায় পরাণ ওদের জড়িয়ে ফেলে। কারণ কুঞ্জবাবুর সঙ্গে ঐ তিনজনের মনোমালিন্য বাধে। এবং কুঞ্জবাবুকে এক হাটের দিন ওরা তিনজন সকলের সামনে খুবই বেইজ্জত করে। কুঞ্জবাবু তার প্রতিশোধ নেবার জন্যই এই মামলা ঠুকেছেন। ডিফেনসের এই কৈফিয়ৎ জজ সাহেব বিবেচনা করার উপযুক্তও মনে করেননি। কেন ? সে নতুন তাই ? না কি এই পেশার পক্ষে সে অনুপযুক্ত ?

বটতলায় আসতেই "আস্‌সালা-মু আলায়কুম হুজুর" বলে বদরুদ্দিন আর সদরুদ্দিন শফিকুলের সামনে এসে দাঁড়াল।

শফিকুল ওদের দেখে চমকে উঠল। বলল, "ওয়া আলাইকুমস্‌সালাম।"

তারপর বলল, "মামলায় তো হেরে গেলাম।"

বদরুদ্দিন বলল, "আপনার যা করার আপনি তা করিছেন। আমাগের নসিব খারাপ তাই মামলায় হারলাম। হুজুর অ্যাকটা মেহেরবানি আপনারে কত্তি হবে। আপনি য্যামন করে মামলা লড়িছেন হুজুর, পয়সা দিলিউ উকিলবাবুরা অ্যামন করে লড়েন না। ভাবিছিলাম ছাওয়ালরা হয়ত শেষ পর্যন্ত খালাস পাবে। তা আমাগের বদনসিব, দশ বছরের জন্যি উরা চালান হয়ে গেল।"

বদরুদ্দিনের বুক ঠেলে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

সদরুদ্দিন হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল, "আমার ঐ অ্যাক ছাওয়াল হুজুর। ওর মা শুনলি গলায় দড়ি দেবে।"

"চুবো, চুবো ছদু," বদরুদ্দিন বলল, "কান্নাকাটি পরে হবে। আগের কাজডা আগে সারে নি। হুজুর, ছাওয়ালগেরে বাড়ি ফিরোয়ে নিয়ে যাবো বলে বাছুর বেচে কুড়িডে টাকা আনিছিলাম। তার ষোলডা টাকা আর আছে। চার টাকা মুহুরি বাবুরি দিছি। এ টাকা মেহেরবানি করে আপনি ন্যান! আল্লা মালেক আপনার ভালো করবেন।"

"না না", শফিকুল বলল, "ও টাকা তোমরা রাখো—"

সদরুদ্দিন কাঁদতে কাঁদতে শফিকুলের হাত চেপে ধরল। "হুজুর, আপনি নারাজ হবেন না। ছাওয়ালগুলোরে আমরা ছাড়াতি চাই। আপনার পাওনা ফাঁকি দিলি ওগেরে আর ছাড়াতি পারব না।"

শফিকুল বলল, "না না—"

হরি মুহুরি চোখ টিপে বলল, "উরা হাইকোর্টে আপীল করবে। এ জিতা কেস্‌। হাইকোর্টে তো আর মুখ শুকাশুকি নেই। উরা জেতবেই। কিন্তু ডাক্তারের হক্কের ফিস্‌ না দিলে য্যামন রোগ সারে না, ধন্বন্তরী রাগে থাকেন, উকিল মুক্তারের হক্কের ফিস্‌ না দিলি বাবা বড় কাছারি তেমনি বিজায় রাগে যান। তখন মামলা জিতা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিটাদের অ্যাত বুঝোই, তবু বোঝে না। ন্যান উকিলবাবু, যা দেছে ক্ষ্যামা ঘিন্না করে নিয়ে ন্যান।"

তারপরেই সুর পালটে মুহুরি বলল, "আহা, বাপের পিরান তো, কী হচ্ছে তা আমি বুঝি। ন্যান, উকিলবাবু যা দেছে নিয়ে ন্যান। ওগের মনে শান্তি হোক।"

বদরুদ্দিন বলল, "খোদা কসম হুজুর, আমাগের কাছে আর টাকা নেই।"

শফিকুল বলল, "টাকা তোমাদের দিতে হবে না। আমি তো চাইনি।"

মুহুরি মুখ ব্যাজার করে বলল, "আপনি তো বড় আ-বুঝ লোক। উরা স্ব-ইচ্ছেয় আপনারে টাকা দিতি চাচ্ছে। আপনি নেবেন না ক্যান্‌ ? আপনি কি চান যে ওগের ছাওয়ালগুলো দশ বছর ধরে ফাটকে ক্যাবল ঘানিই ঠেলুক। আহা, বাছারা, তালি কি আর বাঁচবে ?"

সদরুদ্দিন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, "হুজুর, মেহেরবানি করেন। আমার ঐ অ্যাকটাই ছাওয়াল।"

হরি মুহুরি বলল, "অ্যাখন বিটারা কাঁদে কী করবি ? যা বাড়ি যা। ভিটে মাটি যা আছে বেচে টাকার জুগাড় কর। হাইকোর্ট্‌ কত্তি হবে, যদি ছাওয়ালগেরে ফিরে পাতি চাস। একেবারে জিতা কেস্‌ বিটারা কর্মদোষে হারে গেলি। অ্যাত করে কলাম বিটারা টাকা আন টাকা আন,

কী কইনি, সেই টাকা অ্যাখন তো আনতি হবে, পেরথমেই যদি উকিল বাবুরি ন্যায্য পাওনা দিতিস তালি কি তোগের এই অবস্থা হয়? বিটারা, ছাওয়ালগেরে নিয়ে ড্যাং ড্যাং কোরে যে অ্যাতক্ষণে বাড়ি চ'লে যাতি পাত্তিস।"

বদরুদ্দি, "হুজুর" বলে জোর ক'রে শফিকুলের হাতে টাকা গুঁজে দিল। "যে করেই পারেন, আমাগের ছাওয়ালগেরে বের করে আনেন। আমরা মুখ্যু লোক, নাংলা চাষা, বুঝিনে। কিন্তু এই মামলায় আপনারে দেখে আমাগের পুরো ভরসা আপনার উপর হইছে। আপনি যা করবেন তা হবে। যা টাকা লাগবে আমরা যেখেন থে পারি জুগাড় করে দেবো।"

আদাব জানিয়ে বদরুদ্দি আর সদরুদ্দি চলে গেল।

টাকা ক'টা হাতে নিয়ে শফিকুল অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল। কেবলই ওর মনে হতে লাগল, কাজটা উচিত হ'ল না। বদরুদ্দি সদরুদ্দির জীর্ণ বিপন্ন মুখে শফিকুল যেন কেবলই সাজ্জাদের মুখখানা দেখতে পেল।

অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য হরি মুহুরিকে বলল, "ওই বেচারিগের উপর অমন করে চাপ দেওয়াটা ঠিক হয়নি আপনার।"

"তা'লি আপনারে কই," হরি মুহুরি বলল, "এই গঙ্গাজলের মত মন নিয়ে আপনি উকালতি করতি পারবেন না। এ বড় কঠিন ঠাঁই।"

হরি মুহুরি একটু থেমে বলল, "উকিল সাহেব, চল্লিশ বছর ধ'রে মুউরিগিরি কত্তিছি। তাতে এই বুঝাড়া বুঝিছি যে সরষে আর মক্কেল, এগের উপর যত চাপ দেবেন তত তেল পাবেন। সব বিটার ঐ এক প্রিক্রিতি। পেরথমেই কাঁদে ভাসায়ে দেবে, আমার কিছু নেই। সব বিটার ঐ এক রা। ওতি যদি গ'লে গ্যালেন তো হয়ে গ্যালো। এই লাইনি আপনারে আর করে খাতি হবে না। নতুন এই লাইনি আইছেন। তাই ক'য়ে রাখি, ক'রে যদি খাতি চান, তাহলি মক্কেলের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা কবেন আর আস্তে আস্তে মুড়া দেবেন। এরে কয় মধু মুড়া। তবে না পয়সা ঘরে ওঠবে। মুড়া না মারলি কোনও শালা কি টাকা বের কত্তি চায়?"

শফিকুল হরি মুহুরির সঙ্গে আর তর্কাতর্কিতে যেতে চাইল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি মনে করেন, হাইকোরটে এ মামলা জেতা যাবে?"

"দ্যাখেন মিঞা সাহেব," হরি বলল, "আমি মুহুরি, উকিল নই। তাহলিউ বাপ ঠাউদ্দার আশীর্বাদে ভালো ভালো উকিলির মুউরিগিরি করিছি। তাই কতি পারি, এ আপনার জিতা কেস্। এ জজের রায় উপরে টে'কবে না। আমারে বিশ্বাস কত্তি মন যদি না চায় তো আপনারে অ্যাকজনের কাছে, যদি চান তো, নিয়ে যাতি পারি।"

শফিকুল জিজ্ঞেস করল, "কে তিনি?"

"তিনি? তিনি ধন্বন্তরী। আইনি অ্যামন মাথা এ জিলায় নেই। তাঁর নাম মন্মথ সরকার। তাঁর কাছে কুড়ি বছর আমি কাজ করিছি। তা সে-ও বছর কুড়ি হয়ে গেল।"

"তা বেশ তো। আপনি এক কাজ করুন। চটপট নকলগুলো বের করে আনেন তো। তারপর সেগুলো নিয়ে যাই আপনার মন্মথবাবুর কাছে। এই সব সময় মনে হয় একজন মুরুব্বি থাকলে ভালোই হয়। কিন্তু উনি কি মতামত দেবেন? আবার ঘা খাবো না তো?"

হরি মুহুরি বলল, "সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উনি আমারে খুবই ভালোবাসেন। তার আগে রায়ের নকলডারে বের ক'রে আনা যাক।"

হরি মুহুরি কাছারি মুখো ফিরল। ক্লান্ত শফিকুল বাড়ি মুখো। ও একবার টাকা কটা পকেটে চেপে ধরল। তার প্রথম রোজগার। কিন্তু শফিকুল তেমন খুশি হতে পারল না। বদরুদ্দি এবং সদরুদ্দির বিপন্ন বিষণ্ণ মুখ দুটো ওর চোখে ভেসে উঠতে লাগল। ছেলেদের ছাড়াবার জন্য বাড়িঘর বেচতে হবে। কথাটা সে মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না। আরও অস্বস্তিকর এই কারণে যে, ওদের দুজনের মুখে শফিকুল তার বাপের মুখটাই দেখতে পাচ্ছিল।

নয়মোন বিবি বিলকিসের চুলে বিনুনি বে'ধে দিচ্ছিলেন। মেয়ের শরীরটা যে এর মধ্যেই এতটা ভেঙে পড়বে, এটা তিনি আন্দাজ করতে পারেননি। এ কি শুধুই শরীরের অসুখ না কি জামাইর সঙ্গে ছবির মনের মিল হয়নি? নয়মোনের ইচ্ছে কিছুদিনের জন্য ছবিকে বাড়ি নিয়ে যান। বিশেষত এই কারণে যে কত্তাবিবি ছবিকে দেখবার জন্য খুবই উতলা হয়ে উঠেছেন।

"কী করবা, ও শাউড়ি?" নয়মোন ছবির বিনুনির গোড়ায় ফিতেটা কষতে কষতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবা কও? দিন কয়েকের জন্য চল না মণি? দাদীজানের কাছে থাকলি শরীরডা ভালো হয়ে যাবেনে। মনডাও খুশি থাকবে।"

ছবি জবাব দিল না। সইফুন পাশে বসে ছিল। "তুমি ছবি বুরি নিয়ে যাও চাচী। আমার মনে হয়, এখেনে অ্যাকা অ্যাকা থা'কে ওর এই অবস্থা হইছে। কিছুদিন ঘুরে আলি ওর ভালই হবে।"

বিলকিস্ বলল, "হ্যাঁ হবে! তুমার গলা ধরে আমি কইছি, না?"

সইফুন বিলকিসের রাগ রাগ ভাব দেখে হেসে ফেলল। বলল, "সব কথা গলা ধরে বলি

তবে জানা যায়, না হলি আর বুঝি জানতি পারা যায় না। না?"

"তা জানা যাবে না ক্যান্? হাত গুনতি জানলিই জানা যায়।" বিলকিস মুখ ভার করে বলল। "আর," সইফুন বলল, "জ্বর বিকারের রুগির মাথার কাছে ব'সে ব'সে কপালে জল পটি দিতি থাকলি কী হয়?"

"তোর মাথা হয়।" ছবি মুখ নিচু করল।

"ছবি বু খায়ও না চাচী।" সইফুন নালিশ করল। "আমি বিকেলে আ'সে পিরাই দ্যাখতাম। বুর ভাত তরকারি থালায় ঢাকা পড়ে আছে। "জিজ্ঞেস করলি কয় যে, খাতি ইচ্ছে হয়নি। এই বড় অসুখি পড়ার আগে পিরায় দিনই বু ভাত ফেলে উঠে পড়িছে। ভাই সাহেবরে কিছু জানাতো কিনা সন্দেহ।"

"কী গো শাউড়ী", নয়মোন বললেন, "এই ক'রে রোগডারে বাধাইছ না কী?"

"না গো বউবিটি," ছবি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, "সইফুনডা বড্ড বাড়ায়ে বাড়ায়ে কথা কয়।"

"তা না হয় ক'লো," নয়মোন বললেন, "তুমার অমন সুন্দর শরীরডে ভা'ঙে পড়ল ক্যান্? মেয়েগের শরীরডেই হ'লো আসল। শরীরডা ঠিক তো দুনিয়া ঠিক। শরীরডারে ঠিক রাখলি তবে না ঘরের কাম কত্তি পারবা। খসমের হক্ পুরো কত্তি পারবা। তবে তো সংসারে সুখ পয়দা করবা। শরীর গেল তো জিন্দগীই বরবাদ।"

"যাও না গো বু," সইফুন বলল, "চাচীর সঙ্গে চলে যাও। সা'রে সু'রে আবার কদিন পরে ফিরে আ'সো।"

বিলকিস ভাবছিল। ওর একটা মন চাইছিল, বউবিটির সঙ্গে বাড়ি চলে যায়। সে-ও জানে বাপের বাড়ি গেলে তার শরীরটা সেরে উঠবে। এই শহরের বাসাটা তার ভাল লাগে না। কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। বাসার সামনেই খোলা নর্দমা। বিশ্রী গন্ধে বমি আসে। আর কত মশা, কত মাছি। তবু ছবি ভাল লাগাতে চেষ্টা করেছিল। ভাল লাগছিলও তার। কেন না ফটিক তখন চুম্বকের গায়ে লোহার মত ছবির সঙ্গে লেগে থাকত সর্বক্ষণ। তখন ছবির একটুও একা লাগত না। ক্রমে ফটিক কাজে বেরুতে লাগল এবং প্রতিদিন ব্যর্থ হয়ে হয়ে ফিরতে লাগল এবং ফটিককে সান্ত্বনা দেবার জন্য সাহস দেবার জন্য ছবি তাকে আগলে আগলে রাখত। ক্রমে ফটিকের সমস্যার জটিলতা বাড়তে লাগল। একদিকে কোনও পসারওলা উকিলই ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না, কেউ ওর সিনিয়র হতে রাজি হলেন না। এই মর্মপীড়ার ভাগ স্ত্রীকে দেওয়া যায় না। অতএব ফটিক মনের দুঃখ মনেই পুষে রাখতে লাগল। আরেক দিকে ফটিকের মনে একটা হীনমন্যতা দেখা দিতে লাগল। নিজের পায়ে দাঁড়াবে এমন একটা অদম্য বাসনা তার ছিল। কিন্তু শহরের বাসায় সংসার খরচ চালাতে হচ্ছিল বিল্‌কিসের টাকায়। বিলকিস্ কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে, ফটিকের জানতে বাকি ছিল না। এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি শফিকুল। কারণ সে জানে বিলকিস যেরকম স্পর্শকাতর মেয়ে, ফটিকের মনে এই নিয়ে যে একটা প্রচ্ছন্ন যন্ত্রণাবোধ আছে, সেটা টের পাওয়া মাত্র বিলকিস তার বাপের বাড়ির মাসোহারা বন্ধ করে দিত। ফটিক জানে তা। এবং যার ফলে তল্পীতল্পা গুটিয়ে তাকে ভাগতে হত শহর ছেড়ে। এবং ঐ শহরে তাকে প্র্যাকটিসের আশা ছেড়ে দিতে হ'ত। এই দুটো স্রোত মিলিতভাবে ফটিক এবং ছবির মধ্যে অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দিচ্ছিল। এই ব্যাপারটা তো কাউকে বলা যায় না। এমন কি বউবিটিকেও না।

বিলকিস কিন্তু বুঝতে পারেনি, দুজনের সরে যাবার কারণটা কী? ফটিক জানে। জানে বলেই ও আজ উকিলের ফিস্‌টা বদরুদ্দি সদরুদ্দির কাছ থেকে "নেব না" "নেব না" করেও নিল। এবং তারই জন্য সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিছুতেই খচখচানিটা যাচ্ছিল না। তবু এটা তার প্রথম রোজগার। এবং সে বুঝতে পারল, এর পরেও সে যা রোজগার করবে, তার সবই আসবে মক্কেলদের গলা এইরকম ভাবে টিপে টিপে।

ফটিককে ঘরে ঢুকতে দেখে নয়মোন আর সইফুন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বিলকিসকে অনেকদিন পরে তাজা-টাটকা দেখে ফটিকের মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। সে তার পাশে গিয়ে বসল। তারপর বিলকিসের হাত দুটো টেনে নিল এবং বিলকিসের দুই হাতের তেলো একত্র করে পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে সেখানে রাখল। বলল, "ছবি, এই নাও আমার ওকালতির রোজগার।"

ছবি খুশি হয়ে বলল, "মামলায় তাহলি জিতিছেন কন্?"

মলিন মুখে শফিকুল বলল, "না ছবি, মামলায় জিতিনি, হেরেছি। কিন্তু তাতে কি, মক্কেলের গলায় পাড়া দিয়ে কী করে টাকা আদায় করতে হয় সেটা আজ শিখে নিয়েছি। ওকালতিতে হাতে খড়ি আমার আজই হ'ল।"

ছবি বলল, "অমন করে টাকা নিতিই বা গ্যালেন ক্যান?"

"ওকালতি ব্যবসায় টাকা যদি উপায় করতে হয় তবে এ ছাড়া পথ নেই।" ফটিক বলতে লাগল, "তিন তিনটে জওয়ান ছেলের, এবং তারা নিরপরাধ, আমি বিশ্বাস করি ছবি, তারা নিরপরাধ, দশ বছর করে সাজা হয়ে গেল। তাদের বাবারা আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল।

আর আমি তাদের কাছে মোচড় মেরে ষোল টাকা আদায় করে নিলাম। জয় মুহুরিবাবুর জয়। তাঁরই কৌশলে টাকাগুলো মক্কেলের ট্যাঁক থেকে সোজা উঁকিলবাবুর পকেটে চলে এল!"

বিলকিস্ খুব ব্যথা পেল। এ যেন তার খসম নয়, অন্য কেউ কথা বলছে। বলল, "এ টাকা কি না নিলিই হ'তো না?"

শফিকুল বলল, "তুমি বুঝবে না। এ টাকা ও টাকা বলে কথা নেই। সব টাকাতেই মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছাপ। টাকা রোজগার না করলে, কতদিন আর অন্যের ঘাড়ে বসে খাব, ছবি?"

"কতদিন আর অন্যের ঘাড়ে বসে খাব, ছবি?" এ প্রশ্নটা দমাস করে ছবির বুকে ঘা দিল। ছবির চোখ ফেটে জল আসছিল। প্রাণপণে সামলে নিল।

বিলকিস্ বলল, "নারাজ হবেন না। বউবিবিটি আমার শরীর খারাপ দেখে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাতি চাচ্ছে। যাব?"

"এ তো ভাল কথা ছবি।" শফিকুল ছবিকে উৎসাহ দেবার জন্য একটু বেশীই আগ্রহ দেখাল। "যাও না, শরীরটা সারিয়ে এসো।"

তাকে পাঠাবার জন্য ওর এত আগ্রহ! কেন, কষ্ট হবে না? ছবির চোখে জল, এবার টলটল করে উঠল। শফিকুলের হাতে টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "রা'খে দ্যান্। আমরা কাল সকালের মোটরেই চলে যাব।"

কাল সকালের মোটরে! শফিকুল হতভম্ব হয়ে গেল। ছবি কি রেগে গিয়েছে? সে কি কোনও ব্যথা দিয়েছে তাকে?

॥ ৬ ॥

রাতের বাতাসটা বেশ ভারি লাগছিল বিলকিসের। তাকে বেশ টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছিল। তার ঘুম আসছিল না। পাশে ফটিক। তার শোবার ভঙ্গী থেকেই ছবি বুঝতে পারছিল সেও ঘুমোয়নি। কিছু একটা ভাবছে। মামলার কথা? না তার কথা? বিলকিস একটা কথা সেই সন্ধ্যে বেলার থেকে ভাবছে। বিলকিস বাপের বাড়ি যেতে চাইল আর লোকটা সংগে সংগে রাজি হয়ে গেল। কেন? সে কি এই সংসারে এতই ফালতু? বিলকিস চলে গেলে কোনও অসুবিধে হবে না? কোনও কষ্ট বোধ করবে না ফটিক? করবে না! রাতটা বড় বিস্বাদ লাগছিল বিলকিসের। এবং অস্বস্তিকর। এবং অসহ্য। ফটিক এখন কী ভাবছে? ফটিক কি তার সংগে কথা বলবে না? বিলকিসই কি তবে কথাবার্তা শুরু করবে আগে?

আচ্ছা, আপনি ও কথাডা কলেন ক্যান? বিলকিস মনে মনে বলল। তারপর নিজেই ফটিকের হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন্ কথাডা? ঐ যে আপনি তখন যে কথাডা কলেন? কোন্ কথা কলাম আর কখনই বা কলাম? বুঝিছি, আপনি অ্যাখন পাশ কাটায়ে যাতি চাতিছেন? না না, পাশ কাটায়ে যাব ক্যান, সত্যিই আমার মনে পড়তিছে না। তুমি আমারে মনে করায়ে দ্যাও না। ঐ যে কাছারির থে আসে আপনি আমার হাতে টাকা তুলে দেলেন, তারপর কলেন যে মক্কেলের গলায় পাড়া দিয়ে টাকা আদায় করিছেন, আমি কলাম, এ টাকা কি না নিলিই হতো না, আপনি কলেন কতদিন আর অন্যের ঘাড়ে বসে খাব? আপনি এ কথাডা কন নি? কইছি ছবি। ক্যান্ কলেন? বাজান কইছেন, উকালতিতি পসার জমাতি দেরি হয়। আর আমার জামাই-বাপের ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় জামাই-বাপ আমার পুরো আল্লার বান্দা। গরিব দুঃখির কথা শুনলি, ওর দেল গলে যায়। বাপেরে দিয়ে আল্লাহ তাঁর খেদমত করায়ে নেবেন বলেই ওরে উঁকিল করিছেন। আর বাপের সংসারে যাতে কোনও মুছিবত না আসে তার জন্যিই আল্লাহ্ আমারে পয়সা কড়ি দেছেন। ছবি তুই আমার মেয়ে ফটিক আমার ছাওয়াল। আমার বাজান আপনারে এই চোখি দ্যাখেন? দ্যাখেন কিনা কন? হ্যাঁ ছবি, দ্যাখেন।

তবে? ছবির বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল।

কী তবে? ছবির কান্না পেতে লাগল।

তবে আপনি ওকথা কলেন ক্যান? কতদিন আর অন্যের উপর বসে খাব—একথাডা ক্যান কলেন? আমার বাপ-মারে আপনি পর পর ভাবেন?

না ছবি। ছি ছি। না না।

আমারেও আপনি পর পর দ্যাখেন। না হলি ওকথা কলেন ক্যান? ছবির বুক বুঝি ফেটে যাবে।

না ছবি, খোদা কসম, আমি তোমারে পর হিসেবে দেখিনে। কী আশ্চর্য। তোমারে আমি পর বলে ভাবব ক্যান? তুমি কি আমার পর?

বিলকিস নিজেকে আর সামলাতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠল। এবং ছবির কান্নার আওয়াজে ফটিক চমকে উঠল।

এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে ফটিক জিজ্ঞেস করল, "কী হল ছবি, কাঁদছ কেন?"

ছবি ফটিকের গলার আওয়াজ পেয়ে লজ্জায় তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা

করল। কিন্তু তার ফলে ওর কান্না বেড়েই গেল।

ফটিক বলল, "কী হয়েছে ছবি, বল না? খোয়াব দেখেছ? ভয় পেয়েছ? শরীর খারাপ লাগছে? কী হয়েছে?"

"আমারে", বিলকিস ফটিককে দু হাতে জড়ায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমারে যাতি দেবেন না, যাতি দেবেন না! আপনারে ছাড়ে থাকতি আমার ভাল লাগে না।"

"আমারই কি ভাল লাগে?" ফটিক ছবির ভিজে চোখ মুছে দিল। মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

ছবি ফটিকের আরও কাছে ঘেঁষে এল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আমি চলে গেলি আপনার অসুবিধে হবে না?"

ফটিক ভাবল, কী ছেলেমানুষি প্রশ্ন।

বলল, "অসুবিধে হবে না? খুব হবে।"

"আপনার মন খারাপ করবে না? কষ্ট হবে না আমার জন্যি?"

ছবির এই সরল প্রশ্নে ফটিকের হাসি পেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এও দেখল, তার সারা দিনের ব্যর্থতার গ্লানি, গরিব মক্কেলদের সরলতার সুযোগ ভাঙিয়ে টাকা নেওয়ার জন্য পাপবোধ, এই সমস্ত কিছু জড়ো হয়ে তার মনের উপর এতক্ষণ জটিলতার ভারি একটা বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল, ছবির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই ভারটা ক্রমশ কমে আসছে।

ফটিক সেই অন্ধকারে ছবির ঠোঁটে একটা চুমু খেল।

বলল, "কেন, তুমি বুঝতে পার না।"

ছবি ক্লান্ত স্বরে বলল, "না। আমি তো ত্যামন ল্যাখাপড়া জানিনে। আপনারে বোঝবো ক্যামন করে? কখনও মনে হয় আপনি খুব কাছে। আবার কখনও আপনি অ্যাত দূরি চলে যান যে আপনার নাগাল পাইনে!"

ফটিকের খুব কষ্ট হল কথাটা শুনে।

বলল, "ছবি, তাহলে বুঝতে হবে, আমারই চালচলনে কোথায় এমন একটা খুঁত থেকে গিয়েছে যার দরুন তোমাকে বোঝাতে পারিনি যে তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি। আমারই দোষ। তুমি চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব, ছবি। খুব মন খারাপ করবে।"

বিলকিসের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

"আমি যে আপনারে বুঝে উঠতে পারিনে", ছবি বলতে লাগল, "সে দোষ আপনার হবে ক্যান? পুরো দোষ আমারই। আপনি কত ল্যাখাপড়া জানেন, কত কী জানেন। সে-সব নিয়ে আমি যদি আপনার সঙ্গে কথা কতি পাত্তাম, তয় দ্যাখতেন আপনার ভালো লাগত। আমার কী আছে যা দিয়ে আপনারে খুশি রাখব। অ্যাদ্দিন শরীরডে ছিল, আল্লাহ তারেও বিগড়োয়ে রাখিছেন, অ্যাখন অসুখে পড়ে তাও আপনারে দিতি পারিনে। আমার না আছে আক্কেল, না থাকল শরীর, আপনি আমার উপর খুশি থাকবেন ক্যান? কিন্তু আপনি ছাড়া আমার যে আর কিছু নেই।"

ফটিক প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু দেখল, ছবির এই বিষণ্ণ উক্তি নিছক ভাবাবেগের প্রকাশ নয়। সত্য বটে, ছবির সঙ্গে সে বহুবিধ বিষয় আলোচনা করতে পারে না। এবং তার জন্য সময় সময় সে ক্লান্ত বোধ করে। এবং ছবির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে সে বেশিদূর যেতে পারে না। এবং এটাও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে শরীর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা বজায় রাখার একটা বড় উপাদান। প্রধান উপাদান বললেও ভুল বলা হয় না। এবং সম্প্রতি কিছুদিন সে ছবির শরীরটা ব্যবহার করতে পারছে না, ফলত সে অতৃপ্ত থাকছে, এটাও ঠিক। ফটিক ছবির ঠোঁটে আবার একটা, এবার বেশ জোরালো চুমু খেল। ছবির দম বন্ধ হয়ে এসেছিল প্রায়। সে ছাড়া পেয়ে হাঁফাতে লাগল। ফটিক ভালোবাসে। সত্যিই খুব ভালোবাসে। কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল ফটিক। কেন ভালোবাসে ফটিক? শুধু শরীরটার জন্য? সন্দেহ নেই, ছবি তার শরীরের দ্বারা তাকে তৃপ্ত করে। ব্যস? আর কিছু নেই ছবির? না না। ছবির প্রখর বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, নম্রতা, ওর সরলতা, ছেলেমানুষি ভাব এই সব নিয়েই ছবি ফটিকের কাছে আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

"এখানে তোমাকে বড্ড একা থাকতে হয়", ফটিক বলল। "তাই না ছবি?"

"জে।" ছবি যেন কত দূরে থেকে জবাব দিচ্ছে।

"আমাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে। তাই না?"

"খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে।"

"যখন একা একা থাকো, তখন কষ্ট হয়?"

"জে, হয়।"

"আমি যে তোমাকে ফেলে কাছারিতে চলে যাই, তুমি তখন ভয় পাও?"

"রোজ পাইনে। যেদিন দুপুরে ঘুমোয়ে পড়ি, ফুটকি আসে ডাকে তোলে, ওর সঙ্গে যাতি কয় সেইদিন আমার ভয় হয়।"

ফটিক যত শুনছে বিলকিসের কথা, তত দুঃখ পাচ্ছে মনে। আরও একটু নজর দেওয়া

উচিত ছিল তার। আসলে ফটিক ভেবেছিল, ছবির সঙ্গে সইফুদ্দিনের নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

"আসলে কি জানো ছবি", ফটিক বিলকিসের মাথায় চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তোমাব এই একা-একা ভাবটাই তোমার এই অসুখটা ডেকে এনেছে। আমারই হয়ত অন্যায়। হয়ত তোমার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, পসার জমানোর ধান্ধায়, আর দেখেছো তো", সে ছবিকে যেন কৈফিয়ৎ দিতে লাগল, "কী কসরৎই না আমাকে করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। জানো ছবি, আমার না, এই মামলাটা লড়ে নিজের উপর একটু বিশ্বাস এসেছে। আমি, ছবি, খুব খারাপ উকিল হব না জানো। অবিশ্যি, তুমি বলতে পারো, হারা উকিলির বড়াই ভালো না। হয়ত ঠিক। হয়ত, যাক্ গে সে-সব কথা।"

বিলকিস বলল, "এ মামলায় আপনারই জিতার কথা।"

ফটিক আবেগে এবার ছবির শীর্ণ দেহটা ওর বুকের ভিতর নিয়ে এল। "তুমি একথা বিশ্বাস কর!"

"জে, হ্যাঁ!"

"তুমি আমাকে একটা চুমু খাবে, ছবি?" খুব ফিসফিস করে ফটিক বলল।

"ন্না।"

"খাও না, ছবি?"

"আমি, আমি ভালো পারিনে।"

"কেন, পারো না?"

ছবি কথা না বলে ঠোঁট দিয়ে ফটিকের ঠোঁটে একটা ঠোকর মারল।

তারপর বলল, "আপনি নারাজ হবেন না। আমি পারিনে।"

"তুমি একটা বুদ্ধু!"

ছবি হঠাৎ চমকে উঠে ফটিকের হাতটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই পারল না। চাপা গলায় মিনতি করতে লাগল, "না। না। আমার শরীর খারাপ। হাঁফ লাগে। ভালো লাগে না। মাফ করেন, আজ আমারে মাফ করেন।"

তারপর আর বাধা দিতে পারল না। নিজেই প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরল ফটিককে।

উত্তেজনার হঠাৎ জোয়ার ফটিকের শরীর থেকে এখন অপসারিত। তার দেহে ক্লান্তি এবং মনে তীব্র অনুশোচনা। তার পাশে বিলকিস নিস্তব্ধ। এবং নিস্তেজ। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল ফটিক। কেন সে বার বার এমন করে? সম্মতি দেয় না তার বিবি এবং তার শরীরে প্রচন্ড চাহিদা। কেন সে বার বার তাদের পথ অনুসরণ করে, যাদের কাজ সে নিরুত্তেজ পরিবেশে মনে করে অন্যায়। ইংরেজদের আইনে মুসলিম বিবাহকে বেচা-কেনার সমতুল্য করে দেখান হয়েছে। কাবীননামা অর্থাৎ দেনমোহরের দলিলকে ব্রিটিশ আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে "এ ডীড অফ সেল" অর্থাৎ বিক্রয় কোবালা। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যে বরপক্ষ কনেকে কিনে নেয়। এবং দেনমোহর পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিবি সহবাস আইনত সোপর্দ হতে পারে। অবশ্য বিবি যদি দেনমোহর স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়, সে আলাদা কথা। আইন পড়তে গিয়ে শফিকুল যেদিন মুসলিম বিবাহ "এ ডীড অফ সেল" বলে জেনেছিল, সেদিন সত্যিই ও মনে একটা ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু এখন? বিলকিসের সঙ্গে সে খসম হিসেবে যে ব্যবহারটা করল তাতে কি এইটাই প্রমাণিত হল না যে বিলকিস তার কেনা বাঁদী? ফটিক যেহেতু তাকে একটা নির্দিষ্ট মূল্যে কিনে এনেছে, তাই বিলকিসের শরীর আর মনের উপর তার অবাধ আধিপত্য আইন মোতাবেক সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এখন ফটিক যখন তখন বিলকিসের শরীরটা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।

"এগেনসট হার উইল" (তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) এবং "উইদাউট হার কনসেনট" (তার সম্মতি ছাড়া)—ওই কথা দুটো তার মনের মধ্যে ঘাই মেরে উঠল। হঠাৎ ফটিকের মনে হল, সে বিলকিসের সঙ্গে একটু আগেই যে ব্যবহার করল তা ইনডিয়ান পিনাল কোডের ৩৭৫ ধারায় "রেপ" বা বলাৎকারের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা আছে, তার সঙ্গেই হুবহু মিলে যায়। তথাপি যেহেতু তাদের নিকাহ "এ ডীড অফ সেল" দ্বারা সিদ্ধ সেইহেতু বিলকিসের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্ন এখানে আদালতগ্রাহ্য কোনও অপরাধের তালিকার পক্ষে অবান্তর বলেই বিবেচিত হবে।

সে যাই হোক, শফিকুল একথা কী করে অস্বীকার করবে যে, সে তার বিবির অসম্মতি সত্ত্বেও তাব শরীরের উপর অত্যাচার করেছে এবং তার বিবির অনিচ্ছাকে বলপূর্বক পদদলিত করেছে। ইওর অনার! শফিকুল খান সাহেব খোনকার বজলুর রহমানের গলার আওয়াজ তার কানের কাছে বেজে উঠতে শুনে বেজায় চমকে উঠল। ইওর অনার, ও নিজেই একজন ৩৭৬ ধারায় অপরাধী। ও আবার অন্যকে ডিফেনড কী করে করবে? ওকে জিজ্ঞাসা করুন, ইওর অনার, ও নিজে ৩৭৬ ধারার আসামী কিনা? রেপ ওয়াজ ডিফাইনড, ইওর অনার, বাই লরড হেল টু বি

দি কারনাল নলেজ অফ এ উওম্যান এগেনস্ট হার উইল...

ইওর অনার, ইওর অনার, ফটিক তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, আমার বিজ্ঞ সহযোগী লারনেড কাউনসেল ফর দি প্রসিকিউশন কেসটাকে কনফিউজ করে দিতে চাইছেন। এটা মাই লরড কোনও মতেই ৩৭৬ ধারার মমলা হতে পারে না। অতএব তার সংজ্ঞাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

আলবাৎ পারে মাই লরড। হিয়ার, প্লিজ লেট মি কোট দি রিলেভেনট ডেফিনিশন, এই যে, ইওর অনার, হিয়ার ইট ইজ এই যে অনুগ্রহ করে শুনুন, "ইফ এ ম্যান ফ্রম হেনসফোরথ ডু র‍্যাভিস এ উওম্যান, ম্যারেড, মেইড অর আদার, হোয়ার শী ডিড নট কনসেনট নাইদার বিফোর নর আফটার, হি শ্যাল হ্যাভ্ জাজমেনট অফ লাইফ অ্যানড অফ মেমবার।"

ইওর অনার, ইওর অনার। প্লিজ প্লিজ শুনুন। এখানে কোনও কেসই নেই ইওর অনার। এখানে উল্লিখিত উওম্যান অর্থাৎ নারী, যার কথা আমার বিজ্ঞ সহযোগী বলতে চাইছেন শী ইজ নো উওম্যান, শী ইজ এ কমোডিটি, কোনও নারী নয়, এখানে উওম্যান বলতে সামগ্রী, ইওর অনার, অবশ্যই মূল্যবান সামগ্রী। যেমন হীরে বা জহরৎ অথবা দামী কোনও মসলা অথবা কোন তাজী ঘোড়া অর্থাৎ এমন কোনও জিনিস যা কেনা-বেচার মাধ্যমে পাওয়া যায়। বিলকিসও তেমন আমার কেনা। আই হ্যাভ এ ডীড স্যর, এ ডীড অফ সেল।

জজ সাহেব চোখ পাকিয়ে বললেন, শো দ্য ডীড।

পেশকার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দলিলটা দিন। ওটা এক্‌জিবিট হিসেবে থাকবে।

ফটিক বিপন্ন হয়ে বলল, ছবি ছবি! কাবীননামা। কাবীননামা।

ফটিকের তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভেঙে গেল। গলগল করে ঘামছে সে। ওর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। ছবি ওর পাশেই শুয়ে রয়েছে। ফটিক ছবির গায়ে হাত রাখল। ছবি ওর হাতটা দুহাতে চেপে ধরল। ফটিক ছবির একেবারে কাছে চলে গেল।

বিলকিসের কানে মুখ ঠেকিয়ে অনুতপ্ত ফটিক ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমার উপর খুব অত্যাচার করি ছবি, না?"

বিলকিস কথা বলল না। নীরবে ওর হাতটা নিয়ে নিজের কপালের উপর রাখল।

ফটিক ওর মাথা টিপতে টিপতে বলল, "আমি বড় লোভী ছবি। নিজেকে সামলাতে পারিনে।"

বিলকিস বিষণ্ণভাবে বলল, "আপনি আজ খুশি হননি, না? আমারই দোষ। আমারই দোষ। দুহাই আপনার, নারাজ হবেন না।"

বিলকিস বিপন্ন বোধ করে ফটিকের কাছে সরে এল। এবং যদিও তার শরীরটা ক্লান্ত এবং সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত তথাপি সে তার খসমের মনোরঞ্জনের জন্য নতুন করে চেষ্টা শুরু কবল। কিন্তু ফটিকেব দিক থেকে কোনও সাড়া পেল না।

করুণস্বরে বিলকিস বলল, "আপনি কি আমার উপর নারাজ হইছেন?"

ফটিক বলল, "না ছবি।"

ছবি বলল, "তয়?"

"কী, তয়?" ফটিকের ঘুম আসছিল। ও একটা বড় বকমেব হাই তুলে ভাবল, আমাদের এবার ঘুমানো উচিত।

"আপনি নিশ্চয়ই নারাজ হইছেন আমার উপর।" ছবি প্রায় কাঁদো-কাঁদো। "আপনি তালি চুপ করে আছেন ক্যান?"

আমাদের এখন ঘুমানো উচিত। ছবি, ঘুম তোমারও দরকার।

"ঘুমিয়ে পড় ছবি।" ফটিক আবার হাই তুলল। "ঘুমোও এখন।"

ছবি খুব দমে গেল। ওর শরীরটাকে উপেক্ষা করছে ফটিক। তাহলে কি ওর রাগ এখনও পড়েনি। "ঘুম আসতিছে না আমার।" ছবি ফটিকের কোলের কাছে সরে গেল।

ফটিক বলল, "চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।"

ফটিক ছবির চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হাই তুলল। একটু পরে ওর হাতটা ছবির চুলের মধ্যে বিচরণ করতে কবতে এক সময় থেমে গেল।

ইওর অনার!

"আমার ঘুম আসতিছে না।" ছবির শরীর একটুও আকর্ষণ করতে পারছে না ফটিককে। ক্রমশ বিচলিত হয়ে উঠছে বিলকিস।

"অ্যাঁ, কী?" ফটিকের তন্দ্রা চট করে ছুটে গেল। সে বিলকিসের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। "কিছু বলছিলে ছবি?"

"ঘুম আসতিছে না আমার!" ছবি কাতরভাবে বলল, "আমার সঙ্গে দুটো কথা কন না?"

"কী কথা ছবি?" ফটিক অন্যমনস্কভাবে বলল। তার কানে তখনও খোনকারের 'ইওর অনার' ভাসছে।

কী কথা! উনি আমার সঙ্গে কী কথা কবেন, তাও আমারেই কয়ে দিতি হবে! হায় আল্লা! ছবির মন বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগল। সে প্রাণপণে ফটিককে তার শরীর সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে চাইল। ভাঙাহাটে ছবি যেন তার না-বিকানো মাল অনিচ্ছুক হাটুরেকে গছিয়ে দেবার

চেষ্টা করছে।

"আমার পিঠটা একটু চুলকোয়ে দেবেন ?"

একটা বড় হাই তুলে ফটিক সেই সময়ে চোখ বুজতে যাচ্ছিল।

"পিঠ ?" ফটিক অনিচ্ছাটাকে প্রবলভাবে চেপে বলল, "হ্যাঁ ছবি, দেবো। পিঠটা খোল ?"

ছবি উঠে বসল। সেমিজের উপরের দিকটা অনেক কায়দা কসরৎ করে খুলল। তারপর আলগা পিঠটা ফটিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ফটিকের নাক ততক্ষণে মৃদু মৃদু ডাকছে এবং ছবির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ছবি অনেকক্ষণ কাঁদল। আর তার কী করার আছে? তার খসমকে সে জাগিযে রাখতে পারছে না। তার প্রতি ফটিকের কোনও আগ্রহই সে জাগাতে পারল না। একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। পুরুষ মানুষ কেবল মেয়েদের শরীরটাই বোঝে। সেই শরীরই ফটিককে টানতে পারল না আজ। অথচ কতদিন না দুজনে রাত কাবার করে দিয়েছে! ঠিকই বলিছে বউবিটি! মেয়েগের শরীল গ্যালো তো জেন্দেগিই বরবাদ। ছবি ভাবল, এই কদিনির মধ্যিই তার শরীলডা অ্যাতো ভাঙ্গে পড়ল যে ফটিকির মনে কোনও সাড়াই জাগাতি পারলো না? তালি আমি অ্যাখন কী করব? ঘুমোয়ে পড়ব?

কিন্তু ছবির চোখে ঘুম নেই, জল থৈ থৈ করছে।

তন্দ্রাটা ছুটে যেতেই ফটিক যন্ত্রের মত ছবির মসৃণ পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ছবি চমকে উঠল। ঘরের ভিতর জমাট শূন্যতা। ছবির মনের ভিতরও অতটাই ফাঁকা। এমন কি ফটিকের সান্নিধ্যও সে শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারছে না। কোথায় ফাঁকটা থেকেই যাচ্ছে এবং কখনও কখনও সেটা বেড়েই যাচ্ছে. যেমন এখন। তাহলে কি তারা ক্রমশ দূরে সরে যাবে, এবং ছবির নাগালের বাইরে চলে যাবে ফটিক? না না না. আল্লাহ, না। খসম যদি দূরে চলে যায়, তবে সে দোষ তার। খসমকে খুশি রাখবার পুরো দায়িত্ব তার। তারই। রাঙাভাই যদি চলে যায়ে থাকে তালি সে দোষ ফুটকি তোর। তুই তারে খুশি রাখতি পারিসনি। তুই তার সঙ্গে মোকামে যাসনি। যখন যাতি চালি তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তাউ তোর উচিত ছিল ছবুর করা। যে স্ত্রীলোক ছবুর করিয়া থাকে আল্লাহ তাহাকে শহীদের তুল্য ছওয়াব দান করেন। আমি ফুটকি তোর মরে যাওয়াটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখিনে। তুই ক্যান মরতি গেলি! ছবি অভিযোগ করল।

ফটিক ছবির পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ ছবির মনে পড়ল স্বামীকে দিয়ে এরকম কাজ করিয়ে নেওয়া নসিহতসম্মত নয়। ছবির নসিহতের কথা মনে পড়ে গেল, "যদিও কোনও সময় আপনাদের স্বামীগণ মহব্বতে পড়িয়া আপনাদের হাত পা টিপিয়া দিতে অথবা অন্য কোনও খেদমত করিয়া দিতে চাহেন, শক্তি থাকিতে তাহা কখনও করিতে দিবেন না।" সর্বনাশ! ছবি কী করে এত বড় একটা জরুরি কথা ভুলে গিয়েছিল! কে জানে তার আজকের দুর্দশা সেই কারণেই কিনা? অবিশ্যি সে কখনও ফটিককে হাত পা টিপে দিতে বলেনি। সে জানে ওটা করতে নেই। কিন্তু ফটিককে দিয়ে মাথা টিপিয়ে নিয়েছে. গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে নিয়েছে। এগুলো যে "অন্য কোনও খেদমতের" মধ্যে পড়তে পারে. এ খেয়াল তার হয়নি। যা হবার তা হয়েছে আর সে কখনও ফটিককে তার খেদমত করতে দেবে না।

সে পিঠটা সরিয়ে নিল। ফটিকের কেন যেন মনে হল, ছবি তার উপর রেগে আছে। সে তার রাগ ভাঙাবার জন্য আবার যেই ছবির পিঠে হাত দিয়েছে. অমনি ছবি সরে গেল। শুধু সরে গেল তাই নয়. উঠে বসে সেমিজের খোলা অংশটা আবার গায়ে চাপাতে শুরু করল।

ফটিক একটু ব্যথা পেল। ছবির রাগের কারণটাও সে ভাল বুঝতে পারল না। সেটা কি এই কারণে যে. ছবি যখন অসুস্থ তখন তাকে ঘুম না পাড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই আগে ভাগে ঘুমে ঢুলে পড়েছিল? তাই যদি হয়. তবে এতে রাগ করার কি আছে? ঘুম এসে গেলে লোকে কীই বা আর করতে পারে? ছবি এখন রাগতে শিখেছে!

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "ছবি. তুমি রাগ করেছ ?"

বিলকিস অতি কষ্টে চোখের জল সামলে বলল, "জে না।"

"জে হ্যাঁ". ফটিক হালকা স্বরে বলল. "তুমি রাগ করেছ।"

"খোদা কসম. রাগিনি।" ছবি বলল. "আপনার উপর কি রাগতি পারি? আল্লাহ তালি যে বিজায় নাখোশ হবেন।"

"তবে কার উপর রেগেছ ?"

ফটিক ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে দিল। তারপর তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে এল।

"কার উপর রেগেছ ছবি ?"

এবার বিলকিস ফটিকের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

"ছবি, তুমি কেঁদো না। বল, কেন তুমি আজকাল এমন কাঁদো। আগে তো এমন করতে না ?"

"আমার ভয় করে। আমার ভয় করে। আপনি যখন দূরি চলে যান, তখন আমার কেবল ভয় করে।"

"আমি দূরে চলে গেলে তোমার ভয় করে! কিন্তু আমি তো শুধু কাছারিতে যাই ছবি। এটা কি দূরে যাওয়া হল ?"

"কাছারিতি যাওয়ার কথা কতিছি নে।" ছবি ঠিক বোঝাতে পারছে না। "আমি কতিছি

দূর হয়ে যাওয়ার কথা। আমার কেবলই মনে হয় আপনার কাছের থেকে আমি যেন সরে যাতিছি। আর আমার খুব কষ্ট হয়। একা লাগে। একেবারে একা। ঘুম আসে না। ঘুমোলিউ ভয় পাই। ফুটকি আসে ডাকে। কষ্ট হয়। আমার খুব কষ্ট হয়।"

বিলকিস নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। ফটিক যত্ন করে ওর চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল।

"বউবিটি কয়, চল ছবি, দিন কতক ঘুরে আসবি। শরীলডাও ভাল হবে।"

ফটিক বলল, "তা বেশ তো, যাও না। যাবেই তো বললে।"

"কিন্তু আপনার কী হবে? আপনারে কিডা দ্যাখবে? আপনার কষ্ট হবে, তাই তো দেল যাতি চায় না।"

"আমার যা হয় হবে।"

"আপনি নারাজ হবেন না!" বিলকিস একটু থামল। "আপনার কথা শুনলি মনে হয়, আমারে আপনি তাড়াতে পাল্লিই বাঁচেন।"

"এসব তুমি কী বলছ, ছবি; ছিঃ!" ফটিক মনে আঘাত পেল। "আমাকে তুমি এই রকম ভাবো!"

বিলকিস বলল, "নারাজ হবেন না, দুহাই আপনার, আপনি আমার উপর নারাজ হবেন না। এখেনে আমার কথা বলার কেউ-নেই। আপনি ছাড়া। তাই দেলের বুঝা নামাতি পারিনে। আপনারেও কিছু কতি পারিনে। না কতি না কতি দেলের যন্ত্রণা জমে জমে এই অসুখডা হইছে। এখেনে থাকলি এ অসুখ সারবে না। ডাক্তারবাবু ছিবিল ছারজন কইছেন। আমি শুনিছি, বাড়ি গেলি সারতি পারে। কিন্তু আপনারে এখেনে একা ছাড়ে যাতি ইচ্ছে করে না। আপনি আমাগের সঙ্গে যাবেন?"

"দেখছো তো ছবি কত ঝামেলা!"

বিলকিস হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর যেন নিজেকেই বুঝ দিচ্ছে এমনভাবে বলল, "হ্যাঁ, ক-ত ঝামেলা। আমার খালি ভয় হয়। যদি আপনার সঙ্গে আর দেখা না হয়, যেই একথা ভাবি, আর যাতি ইচ্ছে করে না। তবু ইবার যাব। শরীলডা না সারালি আপনারে খুশি কত্তি পারব না। শরীলডা সারায়ে আনা দরকার। আমি ল্যাখাপড়া জানিনে। আপনারে আমি ভালোবাসি। আপনি বিশ্বাস করেন। আপনার অনেক কিছু আছে কিন্তু আমার আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। কিছু নেই। বিশ্বাস করেন। খোদা কসম। বিশ্বাস করেন।"

॥ ৭ ॥

হাট পুরোদমে চলছে। বশির দু কেঁড়ে দুধ বেচে মাত্র চার গণ্ডা পয়সা পেল। তাই দিয়ে নুন আর কেরাসিন তেল কিনল। ওর বিবি ঘ্যান ঘ্যান করে লম্বা একটা ফর্দ দিয়েছিল। হাটের দিন এলেই শালীর মুখের বাঁধন খুলে যায়। খালি ফর্দ খালি ফর্দ। হ্যান্ আনবা ত্যান্ আনবা। শালী আমারে ভাবে কী? নবাব খান্‌জা খানের জামাই? না, শাবানা মনজিলের মরহুম আবদুল জব্বার মেন্দা মিঞার পেয়ারের ভাতিজা? ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলো বের করে গুনল।

কেরাসিন ত্যাল কিনতিই শালা পুরো অ্যাক গণ্ডা পযসা বেরোয়ে গ্যালো। দু পয়সা গ্যালো নুনি। থাকল শালার দশটা পয়সা। ও কোনও কিছু না ভেবেই ঝট করে দু পয়সার বিড়ি কিনে ফেলল। ভাবতে গেলে বিড়ি কেনার জন্যি হাত আর উঠোতি পারে না। এবার থাকল মাত্তর দু গণ্ডা পয়সা। সতীশ কম্পাউণ্ডার ওষুধির দাম পাবে। তা গণ্ডা আষ্টেক পয়সা তো বটেই। অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। ছিল অনেক বেশী। শোধ দিয়ে দিয়ে এই দাঁড়িয়েছে। বশির ঠিক করল আর কিছু কিনবে না। দু গণ্ডা পয়সা সতীশ চাচাকেই দিয়ে দেবে।

গয়া ডাকল, "এই বশির শোন্।"

বশির কাছে আসতেই গয়া বলল, "খেলার মাঠে জমায়েত কত্তি দেবে না।"

বশির বিস্মিত হয়ে বলল, "ক্যান্?"

"ক্যান্?" গয়া হাসল, "গমোস্তা শালা মেন্দার সঙ্গে পরামর্শ আঁটে কি কত্তিছে জানো?"

বশির বলল, "না। তুমিই কও শুনি।"

"কোনও খবর রাখো না।" গয়া অবাক হল।

গয়া বলল "সেদিন যে বিরাট ফুটবল খ্যালা হবে। গুপাল বিশ্বেস আর মেন্দার দলের মধ্যি। মেন্দারা নাকি কলকাতায় যায়ে মহমেডান ইস্‌পোর্টিং-ইর পেলেয়ার হায়ার করে আনবে। গুপাল বাবুগের লোকউ নাকি কলকাতায় ছুটিছে। ভালো ভালো পেলেয়ার উরাউ হায়ার করে নিয়ে আসতিছে। সুম্মুন্দিরা কলডা খুলিছে বড় ভালো। এ শালা কায়েতের বুদ্ধি।"

"তালি আমাগের জমায়েতডা হবে কনে শুনি? বাঃ!" বশির আকাশ থেকে পড়ল।

"আরে মোলো, হাটে কাড়া দেচ্ছে শুনে সেই কথাডাই তো তুমারে জিজ্ঞেস কত্তি আলাম।" গয়া বলল।

বশির জিজ্ঞেস করল, "হাটে কাড়া দেচ্ছে উরা? সর্বনাশ! চাচারে দেখিছ?"

"অ্যাকবার মনে হ'লো য্যান্ সুশীল দরজির দুকানে ব'সে থাকতি দেখিছিলাম।"

ওরা দুজন হন্তদন্ত হয়ে সুশীল দরজির দোকানে গিয়ে হাজির হতেই সাজ্জাদ ওদের কাছে ডাকল।

বশির কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বলল, "গয়া কচ্ছে, আমাগের জমায়েত নাকি হতি দেবে না? সেদিন ইশকুলির মাঠে নাকি ফুটবল খ্যালা হবে?"

সাজ্জাদ চিন্তিত মুখে সুশীলের দিকে চাইল। সুশীল তখন একটা কাপড়ের থানের থেকে এক টানে বেশ খানিকটা কাপড় বের করে ফেলেছে। তার সামনে দুটো খদ্দের দাঁড়িয়ে।

সুশীল একজন খদ্দেরের দিকে কাপড়টা একটু ঠেলে দিয়ে সাজ্জাদকে জানাল, ফুটবল ম্যাচ হবে। তারপর খদ্দেরকে বলল, "দ্যাখ্ না, হাত দিয়ে দ্যাখ্। এ কাপড় খুবই মুলাম। পান্‌জাবি যদি কত্তি চা'স, এই ব্যালা করে নে।"

সুশীলের দ্বিতীয় খদ্দের, বেশ ছোকরা, উৎসাহ ভরে বলে উঠল, "কলকাতার ফুটবল আসতিছে! সত্যি সুশীলদা। আমি কুন্ডুগের দুকানের থে শুনে আলাম। অ্যামন আর কখনও হয়নি। অ্যাকটা কাজের মত কাজ হতিছে বটে।"

সুশীল বলল, "ক্যান্ তুমরা শোনোনি চাচা? হাটে তো কাড়া দিতি আইছিল।"

ছোকরাটা বলল, "কাড়া তো গিরামেও দেচ্ছে। আমাগের গিরামে কাল দেবে।"

গয়া জিজ্ঞেস করল, "কোন্ গিরামে?"

ছোকরাটা বলল, "পলেনপুর।"

গয়া বলল, "শুধু হাটেই না, আবার গিরামে গিরামেও কাড়া পেটছে। বশির ভাই, ব্যাপার বড়ই গুরুচরণ।"

বশির বলল, "এ আর কিছুই না, ক্যাবল আমাগের জমায়েতডারে ভা'ঙে দিবার মতলব।"

সাজ্জাদ বলল, "চল দিনি দেখি হাটে কিডা কিডা আইছে।"

জমিরুদ্দি গোটা কতক মুর্গি আর একটা খাসি এনেছিল। বেশ ভালোই দাম পেয়েছে। মেয়ের জন্য কাঁচের চুড়ি দর করছিল।

ওদের দেখেই বলল, "কাড়া শুনিছ?"

ওরা বলল, "না। ক্যান্ কয় কী?"

জমির বলল, "ছিলে কনে তুমরা? অ্যা? বড় খবরটা দিয়ে গ্যালো, আর সিডা তুমাগের কারুর কানেউ ঢুকল না! বলি কানগুলো কি বাড়িতি রা'খে আইছ? না কী?"

গয়া বলল, "নে নে। মাংটামি রাখ। কাড়া দিয়ে ক'লো কী, সেইডে অ্যাখন ক।"

জমির বলল, "ইশকুলির মাঠে ফুটবল খ্যালা হবে। কলকাতার থেকে সব বড় বড় পেলেয়ার আসবে। এই কথাই বিতং ক'রে কলো।"

গয়া বলল, "তুই কখন ইডা শুনিছিস?"

জমির বলল, "হাটে আসতি না আসতিই তো শুনলাম।"

গয়া বলল, "হাটে আইছিস কখন?"

জমির বলল, "তা আইছি। মুরগিগুলোন ব্যাচলাম। খাসিডারে ব্যাচলাম। তা নিহাৎ মন্দ সুমায় আসিনি। তা হ'লো কিছুক্ষণ।"

গয়া বলল, "কাড়াডা ক'বার শুনিছিস, মনে ক'রে ক দিনি।"

জমির বলল, "অ্যাঁ! কাড়া? তা সে পেরথমে আসেই তো শুনলাম। কই, তারপরে আর শুনিছি বলে তো মনে হয় না।"

সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "কাড়াডা কার?"

জমির বলল, "ছিরে সদ্দারের।"

সাজ্জাদ বলল, "ঠিক আছে। কাল আমরা ছিরুরি ভাড়া করব। আমরাউ গিরামে গিরামে কাড়া দেবো।"

জমির বলল, "আমরা কাড়া দেবো! কিসির কাড়া?"

"ঐদিন, ঐ সুমায় ঐ মাঠে," সাজ্জাদ বলল, "আমাগের জমায়েত হবে।"

"কও কি চাচা!" জমিরুদ্দি ঘাবড়ে গেল। "কাজডা কি ভাল হবে?"

"ক্যান!" বশির বলল, "ভালো হবে না ক্যান্?"

"জলে বাস করে কুমিরির সংগে বিবাদ বাধাবার আগে ভা'বে নিয়া ভালো না?" জমির প্রশ্ন করল।

"বিবাদ তো আর আমরা বাধাচ্ছি নে বাপ। আমরা বিবাদ কত্তি যাবই বা ক্যান্?" সাজ্জাদ শান্তভাবে বলল। "বিবাদ বাধাচ্ছে উরা। আমরা আগে ঠিক করিছি, ওখেনে আমরা জমায়েত করব। আমরা সিডা সগলরে জানায়েও দিছি। তা সত্ত্বেও উরা ঐদিন ঐ মাঠেই ফুটবল খেলার ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। ইতারে কী কবা? পায়ে পা ঠেকায়ে বিবাদ বাধাবার ফিকির না? অ্যাখন আমরা আর কী করব? আমরা যদি এর বিহিত না করি তো উরা জো পায়ে যাবে, আমাগের আর কিছুই কত্তি দেবে না! তুই কী কোস গয়া?"

গয়া বলল, "ঠিক বলিছ।"

জমিরদ্দি ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না। আসলে কোনও রকম হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্যে ও থাকতে চায় না। কারণ জমির জানে, যে বড় বড় লোকেদের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে আখেরে গরিবের কোনও লাভ হয় না। ওদের ইজ্জত, মালকড়ি, তদ্বির তদারকের জোরে ওরা বেরিয়ে যাবে। যাবেই, যারা সমাজের মাথা তারা সব সময় রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু গরিব যে তাকে বাঁচাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, দোষে হোক, কি বিনা দোষে হোক, গরিব যদি কোনও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তবে তার আর নিস্তার নেই। একের পর এক ঝামেলা তার উপরই এসে পড়বে। পড়বেই। তার জমি যাবে, গরু মোষ যাবে। তারই আবার জেল-ফাটক হবে। এই কারণেই জমির যেখানে হাঙ্গামা হুজ্জতের ব্যাপার-স্যাপার থাকে, ও তার ধারে কাছে থাকতে চায় না। তেমনি আবার সে বশিরকে ছেড়েও থাকতে পারে না। যদিও ওরা এক বয়সী, তবু জমিরদ্দি বশিরকেই মুরুব্বি বলে মানে।

বশির ইদানীং কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। যত ওর জমিজমা দেনার দায়ে বিক্রি-সিক্রি হয়ে যাচ্ছে, বশির, জমিরদ্দি দেখছে, কেমন যেন খেপ্‌তো হয়ে উঠছে। অথচ এই মানুষটাই ছিল ওদের মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার লোক। সাজ্জাদ চাচাকেও আজকাল জমির কেমন যেন বুঝে উঠতে পারে না। ঈমানদার এই লোকটাকে পাঁচখানা গ্রামের লোক মাতব্বর বলে মানে। সাজ্জাদ, বশির, এরা তো কেউ ফালতু লোক নয়। কাজেই ওরা যখন একটা কথা কয় তখন ভেবেচিন্তেই কয়, কিংবা যখন কোনও কাজ করে তখন বেশ ভেবেচিন্তেই করে। সেইখেনেই হয়েছে মুশকিল। ও আজকাল ভয়ানক দোটানার মধ্যে থাকে। ওর নিজের মন যে কাজ থেকে দূরে থাকতে চায়, জমির যখন দেখে সাজ্জাদ চাচা কিংবা বশির সেই কাজটাই ওদের কাঁধে তুলে নিয়েছে তখন সে আর দূরে সরে থাকতে পারে না। তার মনঃপূত না হলেও সে সাজ্জাদ চাচা আর বশিরের পাশে পাশেই থাকে। সে ভয় পায়, নিজের উপর রেগে যায়, কিন্তু তবুও এদের সঙ্গ ছাড়তে পারে না।

জমিরদ্দি বুঝতে পারছে যে, এবার সাজ্জাদ চাচা আর বশির যা করতে চাইছে, তাতে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বেধে যেতে পারে। জমির তাই চুপ করে ভাবতে লাগল।

জমিরদ্দি বলল, "আচ্ছা, একটা কাজ করলি হয় না?"

বশির একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ কাজ?"

জমিরদ্দি একটু ইতস্তত করে বলল, "অ্যাখনই হাঙ্গামা হুজ্জুতে না গিয়ে, আমাগের জমায়েত কদিন পিছোয়ে দিলি কী হয়? ওগের খেলডা হয়ে গেলি, তারপরই না হয় আমরা আমাগের জমায়েতডা করলাম। ক্ষেতি কী?"

গয়া বলল, "না, ক্ষেতি আর কী? জমিরদ্দি মিঞার জমায়েতডা হবে না, এই যা।"

জমিরদ্দি বলল, "ফুটবল খেলাডা হয়ে যাওয়ার পর আমরা যদি জমায়েত ডাকি?"

গয়া বলল, "আর সেদিন যদি আমি আর অ্যাকটা ফুটবল ম্যাচ খ্যালাই।"

জমিরদ্দি বলল, "ইডা তুমার গা-জুয়ারি কথা।"

গয়া বলল, "পেরথম খ্যালাডা যদি গা-জুয়ারি না হয়, তালি পরের খ্যালাই বা গা-জুয়ারি হবে ক্যান্?"

এবার জমিরদ্দি চুপ করল।

বশির বলল, "বরং চাচা যা করে আমরা যদি তাই করি, তালি ওগের বদমাইসিডা ভাঙ্গে যাবে।"

সাজ্জাদ বলল, "আমরা বরং গিরামে গিরামে এই কথাডা রটায়ে দিই যে, চাষী ও খাতকদের স্বার্থডা যাতে বাঁচায়ে রাখা যায়, চাষী ও খাতক যাতে জমিদার মহাজনের হাতেন্থে বাঁচতি পারে তাই নিয়ে আলোচনার জন্য যে জমায়েত ডাকা হইছিল, সিডা বানচাল করার জন্য সেখেনে কলকাতার খেলোয়াড় দিয়ে ফুটবল খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করা হতিছে। তালি কাজ হবে বলে মনে হয়।"

বশির বলল, "ইডা তো খুবই ভাল কথা।"

জমায়েতের ব্যাপারে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। বশির গয়া ওরা দিনে রাতে গ্রামে গ্রামে বৈঠক করতে লাগল। অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে খেলা দেখার ঝোঁক এবং অন্যদের মধ্যে জমায়েত করার জেদ দুই-ই বাড়তে লাগল। একদিন ছিরু সর্দার জমায়েত হবার কাড়া দিতে গিয়ে মার খেয়ে এল। বশির ওর ব্যানডেজ বাঁধা চেহারাটা গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে বেড়াতে লাগল। চৌধুরী আবু তালেব দুজন বড় নেতাকে জমায়েতে আনা পাকা করে নিল।

বশিরের বাড়িতে বৈঠক বসেছে। পাঁচখানা গ্রামের মাতব্বর এসে জুটেছে। উঠোনে লোক ভর্তি। এবং বেশ উত্তেজনা। আবু তালেব চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বিসমিল্লা হির রাহমানির রহিম। হাজিরান্ চাষী ও খাতক ভাই সকল! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ শোকরিয়া। আজ অনেক দিনির এবং অনেক জনের পরিশ্রমের ফলেই আমরা এখেনে জমায়েত হতি পারিছি। উদ্দেশ্য কী, তা আপনারা সকলেই জানেন। এ অঞ্চলের কৃষক ও প্রজা সকলেই জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারে প্রায় ফৌত হতি বসিছেন। চাষী আর খাতকগেরে আখন

অবস্থা অ্যামনই শোচনীয় হয়ে উঠিছে যে তার সংগে ক্যাবল নাভিশ্বাসেরই তুলনা চলে। কোন প্রতিকারের চিন্টা না করে শ্ধ্ধ্ নসিবির উপর দোষ আর নসিবির উপর ভরসা চাপায়ে ব'সে থাকি তা'লি আমাগের পরিণাম ফরসা হতি বিলম্ব হবে না। ভাই সকল এই মজলিসি যাঁরা হাজির হইছেন তাঁরা প্রায় সবাই ম্সলমান। তাই আ'জ যদি ম্সলমানদের দ্ঃখ দ্র্দশা সম্পর্কে একট্ বেশী আলোচনা হয় তা'লি অম্সলমান চাষী ও খাতক ভাইগণ যেন কিছ্ মনে না করেন। আসলে এই আলোচনাডারে ম্সলমান কি অম্সলমান এই নজরে দ্যাখবেন না, বরং খাতক ও প্রজা এই হিসেবে দেখ্ন! কৃষক ও খাতক আজ এই দ্টো কথারে আর আলাদা করে কওয়ার কোন মানে নেই। আজ যে কৃষক সেই খাতক। আর এই বাংলায় কৃষক এবং খাতকের মধ্যে ম্সলমানরাই সংখ্যায় বেশী।

"ভাই ম্সলমান কৃষক ও খাতকগণ, অ্যাকটা হিসেব আপনাগের সামনে তুলে ধরতিছি। সর্বনাশা স্দ আমাগেব কী করিছে ব্ঝতি পারবেন। ক্রমাগত স্দ দিয়ার ফলে বিগত কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরে ম্সলমানগের হাতের থে দশ হাজারের বেশী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদারী, ৫০ হাজার তাল্ক, ৩ লক্ষ ১৫ হাজার জোত, ৫৩ হাজার লাখেরাজ ও জায়গীর হিন্দ্গের হাতে চলে গেছে আর নগদ টাকা গেছে ৬০০ কোটি ১৫ লক্ষ ৪২ হাজার। ভাই ম্সলমান, যেরকমভাবে আমাগের চলতিছে তার যদি বদল ঘটানো না যায়, যদি আমরা বদল ঘটাতি না পারি, তা'লি হিন্দ্ আর মাড়োয়ারি আমাগের মালিক হয়ে দাঁড়াবে আর বাংলার গোটা ম্সলমান জাতটাই হয়ে ওঠবে ম্টে, মজ্র, দফতরি, খানসামা, আরদালী, পেয়াদা, বরকন্দাজ, চৌকিদার ও খেদমৎকার।

"ইবার বলেন, এই কী আমরা চাই ?"

সবাই বলে উঠল "না, না।"

"তা'লি ভাই হি'দ্ ম্সলমান চাষী ও খাতক নিজির পায় দাঁড়াতি হবে। অ্যাক হতি হবে। দ্যাখাতি হবে এই রক্তচ্ষা মহাজন জমিদারগেরে যে চ্ষে খাবার দিন চলে গেছে। আপনারা জানেন, আর সাত দিন পরে ইশকুলির মাঠে, আমাগের অ্যাক বড় জমায়েত হবে। নিজির খেয়ালখ্শি মত খাজনা বাড়ান আর চলবে না। স্দির নামে খাতকের সর্বস্ব গিরাস করাও চলবে না। এই দ্টো হবে আমাগের প্রধান দাবি। আপনারা শ্নে খ্শি হবেন যে আমাগের জিলার জনপ্রিয় ও মাননীয় লিডার জনাব সৈয়দ নওশের আলী ঐ জমায়েতে বলবেন। আব হাজির থাকবেন বাংলার স্বনামধন্য কৃষক নেতা জনাব আবদ্ল ওয়াহেদ বোকাইনগরী। আপনারা নিজির নিজির গ্রামের লোকজনকে অ্যাক অ্যাকটা দলে জোট বাঁধে আনবেন এবং এক জায়গায় থাকবেন। ইবার এই অঞ্চলের সব চাইতি প্রিয় মৌলবী, যিনি একজন ব্জ্র্গ্, যাঁরে আপনারা সবাই চেনেন, এবং শ্রদ্ধা করেন, আমাগের সেই প্রিয় মৌলবী আব্ তালেব সাহেবরে এই মজলিসি কিছ্ কওয়ার জন্যি আরজ পেশ করতিছি।"

মৌলবী আব্ তালেব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ফেজ-ট্পিটাকে হাত দিয়ে একট্ ঠিক ক'রে নিলেন। বললেন, "আসসালা-ম্ আলায়কুম।" তারপর চোখ ব্জে কিছ্ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সেই আধো অন্ধকার ভেদ করে তাঁর স্রেলা ও ব্লন্দ্ কন্ঠস্বর বেজে উঠল। ছ্রা আলা আবৃত্তি করতে শ্র্ করলেন।

বিসমিল্লা-হির্রাহমা-নির্রাহীম—কর্ণাময় পরম দয়াল্ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি

সাব্বি ইস্মা রাব্বিকা আ'লা লাজি—তুমি বর্ণনা কর আপন প্রভ্র নামের মহিমা, যিনি মহতো মহীয়ান ;

খালাকা ফাসাওয়া—যিনি স্ষ্টি করেন ও পরে সংগঠিত করেন ;

ওয়া আল্লাজি—কাদারা ফাহাদা—যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, পরে পথ প্রদর্শন করেন :

ফাজাআ'লাহ্ গেঃসাআন্ আহ্ওয়া—তৎপরে উহাকে শ্ষ্ক, মলিন করিয়াছেন;

ফাজাআ'লাহ্ গেঃসাআন্ আহ্ওয়া —তৎপরে উহাকে শ্ষ্ক, মলিন করিয়াছেন ;

মৌলবী আব্ তালেবের স্রেলা ও তেজী কণ্ঠের কোরান তেলাওয়াৎ জমির্দ্দিকে খ্ব চাংগা করে তুলল। সে সব সময় নিজেকে দ্র্বল ভাবত, সর্বদাই নিজেকে অসহায় ভাবত। এখন এই গোষ্ঠীর মধ্যে বসে সে বোধ করতে লাগল তার অভ্ত একটা পরিবর্তন হচ্ছে মনে। এই গোষ্ঠী যেন তার দ্র্গ যেন তার বর্ম। এখন তার মনে আর সেই তরাসী ভাবটা নেই। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সে নিজেকে বেশ নিরাপদ বোধ করতে লাগল। নিজেকে বেশ সাহসী মনে হতে লাগল।

মৌলবী আব্ তালেব বলে উঠলেন, "বংগের ম্সলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ! তোমরা আল্লাহ্ পাকের পেয়ারা বান্দা। তবে তোমাদের অবস্থা এইর্প হীন কেন ? দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি উন্নতির পথে ছ্টিয়া চলিয়াছে, বংগের ম্সলমান ! কেবল তোমরা কেন পিছনে পড়িয়া ? সম্দয় বংগদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া ম্সলমানদের হীনতার সংবাদই কেবল পাইতেছি। কেন ? ভ্রাতঃ, উঠ, একবার চক্ষ্ মেলিয়া দেখ দেখি, আজ হিন্দ্ সকল স্থানেই প্রধান, ম্সলমান সকল স্থানেই গোলাম। আজ তোমাদিগকে দেখিয়া ছ্রা আলার আয়াতটিই কেবল মনে পড়ে। যিনি সব্জ তৃণ উদ্গত করিয়াছেন, তৎপরে উহাকে শ্ষ্ক, মলিন করিয়াছেন। হায় বংগের ম্সলমান ! তোমার ভাগ্যগ্ণে আল্লাহ্ পাক তোমাকে সব্জ তৃণর্পে স্ষ্টি করিয়াছিলেন, আর আজ তুমি নিজ কর্মদোষে শ্ষ্ক, মলিন হইয়া গিয়াছ।"

মৌলবী আবু তালেবের সকল কথা সেই মজলিসের সকলে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তাঁর আন্তরিক বেদনা, হৃদয়ের প্রবল আবেগ এবং শব্দের ঝঙ্কার মজলিসে হাজির লোকগুলোর হৃদয়াবেগকে উদ্দীপ্ত করে তুলছিল।

"বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে-বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস, এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই. তবু কেন, তবু কেন এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে? ভ্রাতঃ. একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, একই বঙ্গের, একই অবস্থাপন্ন হিন্দু মুসলমানের কার্যের সমালোচনা করিলে হৃদয় বুঝিতে পারে মুসলমান কত অলস, কত কর্মবিমুখ! আজ হিন্দুদের শত শত কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হইতেছে আর মুসলমানের কিছুই হইতেছে না। এজন্য আমরা হিন্দুকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ নিজের বলবীর্যের উপর আমাদের আত্মনির্ভরতা নাই। আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতা হারা, অথচ সম্মান পাইবার অভিলাষী। হিন্দুদিগের বর্তমান কার্যকলাপ আমাদের অনুমোদিত না হইলেও তাঁহাদের অনেকের অধ্যবসায় স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশভক্তি, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলী আমাদের অনুকরণীয়। তাহাদের একদল লোকের বেয়াদবি, বাচালতা মিথ্যাবাদিতা, ভণ্ডামি, পরজাতি বিদ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি দোষগুলি অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্তু ভ্রাতঃ! সত্যের খাতিরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দু নেতাগণ যেরূপ কঠোর উদ্যম ও যত্ন সহকারে চেতনা সঞ্চারের জন্য সর্বত্র বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতেছেন যদি মুসলমান সমাজের অগ্রণীগণ ইহার ষোল ভাগের এক ভাগ, এমন কি শত ভাগের এক ভাগ করিতেন, তবে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত। ভাই মুসলমান! আইস. আজ একই কেন্দ্রে আমরা একত্রিত হই, একই মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই ভাই ধর্মপ্রাণ মুসলমান, ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ. ভাই স্বজাতি হিতচিকীর্ষু! আইস, আজ অসময়ে মায়ের সেবা করিয়া প্রকৃত সন্তানের কাজ করি।"

আবেগে মৌলবী আবু তালেবের কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করেছে। হাজিরানা মজলিস স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছে। "না ভাই. আর ঘুমের সময় নাই। ভাই মুসলমান. একবার এই অধঃপতিত সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে কেমন করুণস্বরে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। দেখ তৎপ্রতি তোমার যত কর্তব্য আজও অসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বাংলার মুসলমান! একবার তোমার স্কন্ধারোপিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া অভাগিনী বঙ্গমাতার নয়নের তপ্ত বারিধারা মুছাইয়া দাও।"

মৌলবী আবু তালেব দম নিতে একটু থামলেন। তারপর বললেন "বঙ্গের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! পরিশেষে খাদেম উল ইসলাম মহম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের একটি কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

"জাগ হে জাগ হে তবে মুছলেম নন্দন।
সিদ্ধিদাতা বিভুপদ করিয়া স্মরণ
আলস্য ঠেলিয়া পায়
শয্যা হতে তুলি কায়
যাও চলি কর্মক্ষেত্রে করি দৃঢ় পণ
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

"আল্লাহ্ পাক আমাদের নিয়ম-মকসুদ পূর্ণ করুন। এই আশা লইয়া আমি আপনাদিগের খেদমতে আদাব আরজ করিতেছি।"

"মারহাবা, মারহাবা।" মৌলবী সাহেবের বক্তৃতা শেষ হবার সংগে সংগে সবাই তারিফ করে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন গ্রামের মাতব্বরেরা একে একে চলে যেতে লাগলেন। সকলেই বলে গেলেন. তাঁরা যত পারেন লোক নিয়ে আসবেন।

বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলেও বশির উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে লাগল। হুঁকোয় জোর একটা টান দিয়ে সে হুঁকোটা জমিরুদ্দির হাতে সমর্পণ করে দিল।

বশির বলল. "বুঝলি জমির. মনে হয় আমাগের ঘুমডা য্যান ভাঙতিছে?"

জমিরুদ্দি উৎসাহভরে হুঁকোয় টান দিয়ে শুধু বলল. "হুঁ।"

গয়া বলল, "দ্যাখ. অ্যাকটা কথা কই. কিছু মনে করিস নে। সব সুমায় তুরা যদি হিন্দু হিন্দু আর মোছলমান মোছলমান করিস. তালি হয় কি. ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়।"

জমিরুদ্দি কি বলতে যাচ্ছিল, বশির তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল. "বলিছিস ঠিকই। বাঞ্ছারাম আর মোতেরে সেদিন কলাম ভাই আমরা জমায়েত ডাকিছি. তুমরা সব আসো কিন্তু। তা বাঞ্ছা কলো. তুমাগের ব্যাপারে আমরা যায়ে কী করব? মোতের কথা শুনে তো আমি থ হয়ে গ্যালাম। মোতে কয়. তুমরা আমাগের মোছলমান করার মতলব আঁটিছ শুনলাম। আমি কলাম. সে কী? এই জমায়েত ডাকা হইছে চাষী আর খাতকগের জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারের থে রেহাই পাওয়ার উপায় ঠাওরাবার জন্যি। তখন মোতে মাথা চুলকোয় আর কয়. তাই নাকি, তাই নাকি? তা তো জানতাম না। আচ্ছা যাবো।"

"আসবে না কচু।" গয়া বলল। "তুমরা আরও মোছলমান মোছলমান কর। ওগের অ্যাকটারও

পাবা না। ওগের দোষই বা কী? মুখখু চাষা। ওগের ধারণা, বিটারা বড় হিন্দু। তার উপর ওগের জপানো হচ্ছে, খবরদার মোছলমানগের দলে ভিড়ো না। কলেমা পড়ায়ে মোছলমান করি ছাড়বে। ব্যস্, হয়ে গ্যালো। অ্যাখন তুমরা ভাবে দ্যাখো, মোছলমান মোছলমান করি দিন রাত্তির যে অ্যাত কুক্ ছাড়তিছ তাতে ওগের তুমরা আরও সরায়ে দেচ্ছ কি না?"

"সরে গেলি আমরা করব কী?" জমিরুদ্দি ফোঁস করে উঠল। "তা বলে আমাগের দুঃখু-ধান্ধা আমরা কতি পারব না?"

"কতি আটকাচ্ছে কিডা? তুমি মোছলমান, তুমি ভাই মোছলমান ভাই মোছলমান কর, আমি কৈবত্ত, আমি ভাই কৈবত্ত ভাই কৈবত্ত করি, ও ক্যাওট, ও ভাই ক্যাওট ভাই ক্যাওট করুক, নমোরা ভাই নমো ভাই নমো করুক, আর গুপালবাবু পুনুন স্যাঁকরা মেন্দা মিঞ্ঞ উরা পিঠে ভাগ কত্তি বসুক সেই বাঁদরটার মত, আর শাঁসটুকু খাতি থাকুক—"

গয়ার কথা শেষ হতে না হতেই বশিরের বাড়ির বাইরে টর্চ বাতি জেবলে কাদের আসতে দেখা গেল। ওদের মুখের উপর দিয়ে থানার হাবিলদার সাহেব জোরালো টর্চটা ঘুরিয়ে নিতেই ভক্ত দফাদার বলে উঠল, "এই যে গয়াও আছ। তা'লি তো ষোলকলা পুনুনুই হয়ে গ্যালো। হাবিলদার সাহেব তুমাগের থানায় নিয়ে যাতি আইছেন। চলো বাপ সকল, থানায় গিয়ে হাজরে দিতি হবে।"

॥ ৮ ॥

কাগজ কলম সামনে নিয়ে ফাঁকা বাসায় চুপ করে বসেছিল ফটিক। বসেছিল দুপুর থেকে। তা এখন তো বিকেল গড়াতে চলল। পাতায় কালির একটা আঁচড়ও পড়েনি। ভাবছিল। লতিকাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে। এই সংকটে এখন লতিকাই ভরসা। আমার এখন চতুর্দিকে অন্ধকার, মিস পালিত। সাদা কাগজের দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো বলল। এখন একমাত্র আলোর রেখা আপনি। আপনি কি আমাকে এই ঘোর বিপদে সাহায্য করবেন? আমি জানি, আমার এই প্রার্থনাও ধৃষ্টতা। ফটিক সাদা কাগজে লতিকার মুখের সেই পরিচিত অদ্ভুত ধরনের হাসিটা ফুটে উঠতে দেখল। অনেক অনেক দিন পরে। প্রীতি ও বিদ্রূপে সে হাসি সুন্দর আন্দাজে মেশা। যা একমাত্র লতিকার মুখেই ফুটে উঠতে পারে।

আপনি এত হাই-স্টাং হয়ে থাকেন কেন, সব সময়? কলেজ স্কোয়ারের প্যারাগনে সরবত খেতে খেতে লতিকা বলেছিল। বন্ধুরা বন্ধুদের কি কিছু খাওয়ায় না? আপনিই যদি দাম দেন, কই তাতে তো আমি অপমানিত বোধ করব না? তাহলে কেন আপনার গায়ে ফোস্কা পড়বে?

আমি, শফিকুল বলেছিল, গরিব বলে।

লতিকা হেসেছিল। ঠিক এই হাসি। শফিকুল দেখল লতিকা নেই। কিন্তু কাগজটার উপর অদৃশ্যভাবে সেই হাসিটা ছড়িয়ে আছে।

বাজে কথা! লতিকা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমি জানি কেন আপনার এই কমপ্লেকস।

যারা গরিব, তারা তো কমপ্লেকসে ভুগবেই মিস পালিত?

ওসব ছেঁদো কথায় এখানে ডাল গলবে না। লতিকা হাসল। অন্যদের এইসব বলে ধোঁকা দিতে পারবেন। সত্য যে কী, তা আমি জানি।

শফিকুল ভ্যানিলা সরবতে চুমুক মেরে বলল, তাহলে আপনার সত্যটা কী শুনি। কেন আমার গায়ে এত ফোস্কা পড়ে?

আপনি গেঁয়ো বলে। লতিকা ম্যাংগোর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে গেলাসের উপর দিয়েই ওর দিকে সোজা চেয়ে রইল।

শফিকুলের মুখে তৎক্ষণাৎ একটা গরম হল্কা ছড়িয়ে পড়ল। সে দেখল লতিকার চোখ দুটো কেমন অদ্ভুতভাবে হাসছে।

আপনার এই কথায় আমি প্রচণ্ড রকম অপমানিত বোধ করতে পারি, তা জানেন?

লতিকা বলল, বয়ে গেল।

অ্যাঁ! বয়ে গেল! শফিকুল বলল, একটা কমিউন্যাল টেনশন সৃষ্টি করে এখন অম্লান বদনে বলছেন বয়ে গেল! তাজ্জব!

লতিকা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে উঠল। নিন, বলল, এখন ঠিক করুন, এই শরবতের দাম আজ হিন্দু কমিউনিটি দেবে না মুসলিম কমিউনিটি দেবে।

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরই এই ব্যয়ভার বহন করা উচিত ছিল। শফিকুল বলল। কিন্তু তাঁর আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শর্তাধীনে শরবতের দাম মিটিয়ে দেবার অধিকার দেওয়া হল।

লতিকা জিজ্ঞাসা করল, কী শর্ত শুনি?

শফিকুল বলল, এর আগের রাউনডে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ভ্যানিলা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে গ্রিন ম্যাংগো খাওয়ানো হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় সমতা আনয়নার্থে এবার

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এক গ্লাস ভ্যানিলা এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে এক গ্লাস গ্রিন ম্যাংগো পান করানো হোক।

লতিকা বলল, সাধু সাধু! এ ড্যানিয়েল হ্যাজ কাম টু দি জাজমেন্ট।

লতিকাকে লিখলে সে আমাকে সাহায্য করবে না? শফিকুল সাদা কাগজটাকেই যেন জিজ্ঞাসা করলে। কিন্তু কীভাবে লিখবে?

"ফটিক ভাই!" সইফুন ওর কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। "ওহ, বু-রি চিঠি লিখতিছেন বুঝি?" সইফুন উঁকি মেরে দেখল। তার চুলের গন্ধ ফটিককে কিঞ্চিৎ উন্মনা করে তুলল। ছবি!

সে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "না।"

সইফুন আজ একটু সেজে এসেছিল। ফটিক দেখল না দেখে একটু ক্ষুণ্ণ হল।

"ভাই, আম্মা জিজ্ঞেস কত্তিছে, বাড়িতি অ্যাখন চা পানি হবে। খাবেন?"

শফিকুলের মনে পড়ল এক হপ্তা সে ছবির কোনও চিঠি পায়নি। লিখবে লিখবে করে, তারও আর লেখা হয়ে ওঠেনি। ওর মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। ছবি হয়ত রেগে থাকবে। কেন যে ফটিক কোনও কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছে না, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

"ভাই, খাবেন চা পানি?"

শফিকুল ডান হাত দিয়ে কপালের দুটো রগ টিপে ধরে বলল, "চা? হ্যাঁ, তা আনো।"

লতিকা আমাকে ওর বাবার জুনিয়র করে দিতে চেয়েছিল। তবে কি সে আমার অনুরোধে ওর বাবাকে এই দুই গরিব বেচারার ছেলেদের পক্ষে হাইকোর্টে দাঁড় করাতে পারবে না? স্যার এদের হয়ে দাঁড়ালে, এরা নির্ঘাৎ খালাস পেয়ে যাবে। তাই তার বিশ্বাস। আর নিতান্ত বাজে কেসও সে পাঠাচ্ছে না। হরি মুহুরির এক কালের বাবু, মন্মথ উকিল, অসুস্থ এবং তিরিক্ষে মেজাজের লোক, কিন্তু সত্যিই ভালো উকিল, ওকে যেমন গাল পেড়েছেন তেমনি আবার প্রশংসাও করেছেন। তিনি কেস দেখে সন্তুষ্ট। শফিকুলের আত্মবিশ্বাস তাতে আবার ফিরে এসেছে।

আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সইফুন ভাবছিল সে চলে যাবে কিনা? সে যেতেই চাইছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিল না, কেন সেখেনে দাঁড়িয়ে আছে? বুঝতে পারছিল না, কেন তার কান্না পাচ্ছে? বুঝতে পারছিল না আজ তার এত অপমান অপমান লাগছে কেন? লোকটা এত উদাসীন কেন? ছবি বু তাকে বলে গিয়েছে, ফটিক ঠিকমত যেন খাওয়া দাওয়া করে, সেটা যেন সে দেখে। সে তাই বারবার আসে। কিন্তু লোকটা নিজের মনেই দিনরাত ডুবে থাকে। ওই বাজানের সঙ্গেই যা কিছু কথাবার্তা কয়। নাহলে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে হয় বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে আর নাহয় রগ টিপে ধরে চুপ করে বসে থাকে। খালি ভাবে। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে কিনা, মা বাপের তাগাদায় সে তা জানতে আসে। কিন্তু কিচ্ছু বলে না ফটিক ভাই।

"ভাই", সইফুন জিজ্ঞাসা করল "আম্মা জিজ্ঞেস করিছে, চা পানির সঙ্গে কিছু খাবেন? মুড়ি আনে দেবো?"

মন্মথবাবুর মত লোক আর দেখেনি ফটিক। হাঁপানীর রোগী। তবু কত তেজ! ও আর হরি মুহুরি যখন হাজির হল সকালে তখন মন্মথবাবুর শোচনীয় অবস্থা দেখে শফিকুলের তো আক্কেল গুড়ুম। বেদম টান উঠেছে তাঁর। কথা বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে। বুকে বালিশ দিয়ে বিছানার উপর বসে কেবল ফ্ ফ্ ফ্ করে হাঁপাচ্ছেন। দেখলে কষ্ট হয়। শফিকুল ঐ অবস্থায় চলে আসতে চাইছিল।

মন্মথবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন হাঁফানী ফু ফু ফু হাঁফানী ছোঁয়াছে রোগ নয় ফু ফু ফু ছোঁয়াচে নয়। ভয় নেই। তোমাদের ভয় নেই। ফ্‌ফ্‌ ফ্‌ফ্‌ ফ্‌ফ্‌ যা কিছু কষ্ট তা আমার ফ্‌ফু ফ্‌ফু ফ্‌ফু তা আমার। নির্ভয়ে ভ্‌ভ্‌ভ্ বসতে পারো। তা তুমিই বুঝি ফ্‌ফ্‌ফু ফ্‌ফ্‌ফু ফ্‌ফ্‌ফু হরির নতুন বাবু।

শফিকুল বলল, জে।

তারপর এক কথায় দু কথায় শফিকুলের অতীত নিয়ে জেরা শুরু করলেন। সব শুনলেন। প্রচণ্ডভাবে হাঁপাতে লাগলেন। ফটিক বিব্রত হয়ে পড়ল। এই লোকটা এত অসুস্থ জানলে শফিকুল ওঁকে বিরক্ত করতে আসত না। কিন্তু আটাত্তর বছরের এমন এক বৃদ্ধের কাছে এসে পড়েছে সে, যাঁকে বৃদ্ধ এবং অসুস্থ ভাবলেই তিনি চটে যান।

মন্মথবাবু ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতেই নথি দেখতে শুরু করেছেন। পাতা উল্টোচ্ছেন, হাঁপাচ্ছেন, আর কচিৎ কখনো মাথা নাড়ছেন। মাঝে মাঝে বেজায় চটে যাচ্ছেন। ফটিকের বুক দুরু দুরু করছে।

হঠাৎ মন্মথবাবু বলে উঠলেন, গোরু!

শফিকুল ভালো শুনতে পেল না। জিজ্ঞেস করল, জে?

তুমি একটা ফ্‌ফ্‌ফ্‌ফু গোরু। আস্ত গোরু।

শফিকুল বলল, জে!

মন্মথবাবু বললেন, জে-ফে নয়, তুমি পরিষ্কার একটা গোরু। ফফফফফউ।

ওকালতি করতে এসেছ, বড় বড় উকিলদের সঙ্গে টোক্কর দিতে এসেছ, অথচ বাবু

এভিডেন্‌স অ্যাকটটা উলটে দেখোনি! এভিডেনস অ্যাকটের ১৪৩ ধারায় তো বাপু স্পষ্ট বলাই আছে লিডিং কোয়েশ্চন মে বি আসকড ইন ক্রস একজামিনেশন। উকিল হবার শখ! অ্যাঁ! মন্মথবাবু কাতলা মাছের মত খাবি খেতে লাগলেন।

শফিকুল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে আবার চুপও হয়ে গেল। মন্মথবাবু গজগজ করে বললেন, খোন্‌কার লিডিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা যাবে না বলে দাবড় দিল আর তুমি তা মেনে নিলে। কেন? আমি ডিফেন্‌স, আমি অবশ্যই লিডিং কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারব। এভিডেনস অ্যাকটেই তো তোমাকে সে অধিকার দেওয়া আছে। ধান চাল দিয়ে ওকালতি পাশ করেছ?

শফিকুল বলল, না স্যর আমি মেনে নিইনি। ভেবেছিলাম, সাক্ষীদের মুখ যে ইচ্ছে করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, প্রসিকিউশনের এই ইনটেনশনটা জজ সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই ভেবেই স্যর, আমি ওটা আর চ্যালেঞ্জ করিনি।

কচু হবে। মন্মথবাবু বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, কেন হবে, শুনি। মামলায় আপসে আপ কি কিছু হয়? এজলাসটা ফফফফ তোমার মামাবাড়ি নয়। ফফফফ ওটা ব্যাটল ফিল্‌ড। ফফফফফ। যুদ্ধক্ষেত্র। ওখানে প্রত্যেকটা ব্যাপার এসটাবলিশ করতে হয়। খোনকার যেমন তোমাকে ভড়কি মারল, তুমিও যদি সংগে সংগে সেটা একসপোজ করে দিতে তবে খোনকারের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যেত। তুমি একটা আস্ত গোরু। ফফফফ।

"ভাই, আপনার কি মাথা ধরিছে?" সইফুন কিন্তু-কিন্তু হয়ে জিজ্ঞেস করল। "আপনার মাথাটা টিপে দেবো?"

শফিকুল শুনতে পেল না।

তুমি একটা আস্ত গোরু। মন্মথবাবুর এই মন্তব্যে সে রাগ করতে পারল না। সে যেন তারিণী মাস্টারের গলাই শুনতে গেল। তা তারিণী স্যর বেঁচে থাকলে এই বয়সেই পেঁছুতেন। এরপর মন্মথবাবু তাকে আর বিশেষ গালিগালাজ করেননি। যা কিছু চোট তা গিয়েছে খোন্‌কার, জজ সাহেব, এদের উপর দিয়ে।

তারপর জজের রায় পড়তে পড়তে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত সেখানে একটা বিশ্রী নাটক হয়ে গেল। হাঁপানী এত বেড়ে গেল যে মন্মথবাবুর দম আটকে এল। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। মন্মথবাবুর একমাত্র মেয়ে, হরিবাবু বলেছিল, বাল বিধবা, নির্মলা অকস্মাৎ ভিতর থেকে পাখা হাতে বেরিয়ে এসে বাবাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর বুক পিঠ ডলে দিতে লাগল। নির্মলার মাথার কাপড় খসে গেল। শ্যামল একখানা মুখ সেই ঘরের ভিতর যেন ফুটে উঠল। সে মুখ শান্ত এবং কঠিন।

হরি মুহুরির দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে নির্মলা অত্যন্ত শান্তভাবে বললে, আমি আপনাকে কালই বলেছিলাম হরিকাকা, বাবার আজকাল কোনও রকম উত্তেজনা সহ্য হয় না।

হরি আমতা আমতা করতে লাগল, আমি বুঝতি পারিনি মা আমি বুঝতি পারিনি।

আমারই অন্যায় হয়েছে। শফিকুল বুঝল এই চাপা ভর্ৎসনার লক্ষ্য সে-ই। সে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়ল। নির্মলা ওর দিকে এক লহমা চাইল। তারপর ধীরে ধীরে মাথায় কাপড় টেনে দিল।

শফিকুল বলল, চলুন, মুহুরিবাবু, যাই।

মন্মথবাবু প্রচণ্ডভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে হাত তুলে শফিকুলকে দাঁড়াতে বলছেন। সে বুঝতে পারছে মন্মথবাবুর মেয়ে চাইছেন, সে এক্ষুনি বেরিয়ে যাক। অদ্ভুত অবস্থা।

মন্মথবাবু কী যেন তাকে বলতে চাইছেন কিন্তু ফফফু ফফফু হাঁপানীর এই মারাত্মক টান ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় শফিকুল কী করবে বুঝতে পারল না। সে অসহায়ভাবে একবার মন্মথবাবুর দিকে আর একবার তাঁর মেয়ের দিকে চাইতে থাকল।

মন্মথবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁপানীর টানটা একটু কমলে, বলে উঠলেন, ফফফু ফফফু ফফফু প্রসিড। ফফফু ফফফু ফফফু হাইকোরট। হাইকোরট। ফফফু ফফফু ফফফু।

সইফুন আর দাঁড়াল না। ওর দু চোখ তখন জলে ভরে এসেছে। নিঃশব্দে চোখ মুছে সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। শফিকুল কিছুই লক্ষ্য করল না!

সে দুই করতলে মুখ ঢেকে ভাবছিল, কেবলই ভাবছিল। লতিকা! তার এই অসহায় অবস্থা থেকে এই পৃথিবীতে এখন একজনই শুধু উদ্ধার করতে পারে। সে লতিকা। লতিকার সাহায্য সে পাবে না!

মুহুরিবাবু এসে তাকে জানিয়েছিল, কত্তার অর্থাৎ মন্মথবাবুর তাকে খুব পছন্দ হয়েছে। কেস দেখে বলেছেন, হাইকোরটে গেলে এ মামলার রায় নির্ঘাৎ উল্টে যাবে। তার চেয়েও ভাল কথা, মন্মথবাবু শফিকুলের মুখের উপর গোরু গাধা যাই বলুন, মুহুরিবাবুর কাছে জানিয়েছেন যে সে কেসটা দাঁড় করিয়েছে বড় ভালো। এই কথাতে মনের জোর আবার ফিরে পেয়েছে শফিকুল। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যখনই শফিকুলের দরকার পড়বে তক্ষুনি সে যদি কনসালট করার জন্য মন্মথবাবুর কাছে যেতে চায় তো তাতে তাঁর আপত্তি নেই। বরং খুশীই হবেন।

লতিকার সাহায্য সে পাবে। শফিকুলের মন বলছে।

প্রকৃতির জগতে, দেখবেন অনেক পোকামাকড় আছে, লতিকা বলেছিল, যারা আত্মরক্ষার জন্য অনেক রকম উপায় বের করে। শুঁয়োপোকার যেমন শুঁয়ো. গান্ধীপোকার যেমন বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, মানুষের যখন যুক্তি বুদ্ধি আছে, তখন তার উপায়টা মানে পোকামাকড়ের পর্যায়ে হবে কেন?

আপনি কি আমার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন? শফিকুল জিজ্ঞাসা করল।

মনে হচ্ছে আমার মন্তব্যটা ঐদিকেই যেতে চাইছে। কি করি বলুন তো?

শফিকুল বলল, বলে ফেলুন। আমার কিছু করার নেই।

আপনি বড্ড কমপ্লেকসে ভোগেন।

শুনছি।

কেন ভোগেন?

"ভাই চা।" সইফুন এক হাতে চা অন্য হাতে মুড়ির বাটি এনে দাঁড়াল।

আপনাকে সেটা বোঝানো আমার সাধ্য নয়।

আমি ডান্স না ডাফার?

"ভাই, চা। খায়ে ন্যান। ঠান্ডা হযে যাবে।" সইফুন চা আর মুড়ির বাটি টেবিলের উপর রেখে দিল।

আপনি ডান্সও না, ডাফারও না। আপনি মিস পালিত।

"ভাই! চা!" সইফুন এবার গলাটা চড়িযে দিল।

শফিকুলের চমক ভাঙল।

"ওঃ সইফুন। এ কী, চা? বাঃ, বেশ।"

শফিকুল চায়ের বাটিটা ধরতেই হাতে ছ্যাঁকা লাগল।

"অ্যাতো কী ভাবতিছিলেন ভাই? বুর খবর ভালো তো?"

শফিকুল চায়ের বাটিটা ঠকাস করে নামিয়ে হাতে ফুঁ দিতে লাগল।

"হাতে ছ্যাঁকা লাগল?" সইফুন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

"না না ঠিক আছে। তোমার বাজান কবে ফিরবেন?"

সত্যি বলুন তো, কেন আপনার এত কমপ্লেকস?

দেখুন মিস পালিত, আপনাদের সকলের পায়ের তলায় শক্ত মাটি আছে। কারও আছে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড. কারও বা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, কারও উঁচু মহলে কানেকশন। আবার এই তিনই একসঙ্গেই আছে. এমন ভাগ্যবানেরও তো অভাব নেই। এই পজিশন থেকে আমার মত এক অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তুকের যার না আছে পরিবার নিয়ে গর্ব. না আছে বিত্তের প্রোটেকশন. বিচার করা শক্ত। নয় কি আপনিই বলুন।

"বাবা," সইফুন বলল. "দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবে। বুর কী খবর ভাই?"

"ওর শরীরটা এখনও সারেনি।"

এটা ভেবে দেখার মত কথা।

ঐটেই আসল কথা মিস পালিত।

"ছবি বু দিন রাত কী যেন ভাবত। জানেন ভাই। জিজ্ঞেস করলি ভালো জবাব দিত না।"

"তাই বুঝি?"

অনেক ঘটনা যা আপনাদের বিচারে তুচ্ছ নগণ্য, যা আপনারা অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারেন. করেন. আমাদের তা অসম্ভব বিচলিত করে তোলে। আমাদের জীবনে সেই ঘটনাগুলোর প্রভাব এত প্রবল কেন. সেই সম্পর্কে অনেক রকম ব্যাখ্যা আপনাকে দিতে পারব। কিন্তু তাতে আপনাদের আর আমাদের মত লোকের মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান. সেটা তো কমবে না। কমবে কি বলুন?

"জে। আমি অনেক দিন জিজ্ঞেস করিছি. হাসে খালি উড়োয়ে দেছে।"

আই অ্যাম সরি। লতিকার মুখখানা টলটল করে উঠল। আমি ব্যাপারটা এইদিক দিয়ে কখনোই ভেবে দেখিনি।

আমি আপনাকে তার জন্য দোষ দিইনে। আমি শুধু আমার কেসটাকে আপনার সামনে তুলে ধরলাম মাত্র।

"আচ্ছা ভাই. কদিন ধরে কী এত ভাবতিছেন? ভাবে ভাবে আপনার শরীরখান যে কালি হয়ে উঠল।"

আসলে কি জানেন. মানুষের বুদ্ধি আছে এবং সে যুক্তিশীল. আমরা এ দুটো ধারণাকে এত বেশী গুরুত্ব দিই যে ও দুটো ধারণা যেন সেই ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেকের সব-খোল চাবি অর্থাৎ মাস্টার কী। পৃথিবীর তাবৎ সমস্যার দরজা-দেরাজ যেন ঐ চাবিতেই খোলা যায়। আর আমরা শহুরে লোকেরা ভাবি ঐ চাবিটা বুঝি শুধু আমাদের হাতেই আছে।

ঐ চাবিতে সব দরজা খোলা না গেলেও. মিস পালিত—

"ভাই. চা যে জুড়োয়ে গ্যালো," সইফুন বলল।

আমাদের কিন্তু ঐ চাবির উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। ওর চাইতে ভালো আর কী

আছে তা তো জানা নেই।

চা যে জুড়োয়ে গ্যালো। অ্যাতো ভাবতিছেন কী? আমারে ভাবতিছেন?

অ্যাঁ ছবি। তুমি একদম শরীরের যত্ন নাও না।

কিডা ক'লো?

সইফুন বলছিল।

ও বড় বেশী কথা কয়।

"ভাই, চা কিন্তু জুড়োয়ে জল হয়ে গ্যালো।"

চা ওদিকি যে জল হয়ে গ্যালো।

মিস পালিত আমার এই বিপদে আপনার সাহায্য পাব, এটা কি আশা করতে পারি?

"বাটিডে অ্যাখন ঠান্ডা হয়ে আয়েছে ভাই, খা'য়ে ন্যান।"

ঠান্ডা হয়েছে, খায়ে ন্যান।

খাচ্ছি ছবি।

নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন। শুধু এই বিপদে কেন? সব বিপদে।

আপনারে ছা'ড়ে আমি থাকতি পারিনে।

আমিও ছবি। আমিও।

ছাই। দিন রাত তো কাগজে মুখ গুজে থাকেন। কই, আজকাল তো আমারে আর আগের মত দ্যাখেন না।

ছবি, তুমি তো দেখেছ, মামলা হাতে এলে উকিল আর মানুষ থাকে না।

ক্যান্?

তখন মক্কেল আর আইন, এ ছাড়া তার কাছে দুনিয়ায় আর কিছু থাকে না। এ বড় সর্বনেশে পেশা।

চা জল হয়ে গেছে।

হ্যাঁ ছবি তাই।

"এ চা আপনার খাতি হবে না ভাই। আমি যাই গরম করে আনি। আপনি ততক্ষণ মুড়ি খাতি থাকেন।"

যাই, চা গরম করে আনি।

"না না থাক। আমার অসুবিধে হবে না।"

কই, আপনি তো আজকাল আমারে কাছে টানে নেন না?

তোমার যে অসুখ ছবি।

ছাই অসুখ। আপনি বুকি টা'নে নিলি আমার অসুখ ভালো হয়ে যায়, তা জানেন?

সত্যি ছবি?

সত্যি?

"এই চা আপনি খাতি পারবেন ভাই?"

তাহলে এবার থেকে তোমাকে বুকে টেনে নেবো।

তাহলি ন্যান্।

কাছে এস।

"এই চা খাতি পারবেন? দ্যাখেন?" সইফুন চা নিয়ে ফটিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শফিকুল ওকে বুকে টেনে নিল। চায়ের বাটি ছিটকে পড়ে গেল। সইফুন অন্ধকারের আবছা উড়নি গায়ে দিয়ে ফটিকের বুকে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল। ফটিক কেবলই সইফুনের ঠোঁটে গালে নিজের ঠোঁট গাল ঘষতে লাগল।

আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল ছবি ছবি ছবি।

সইফুন ফটিকের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার শরীরে আশ্চর্য সুখকর রমণীয় উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। বুকের রক্ত দ্রুত চলছে। তার কুড়ি বছরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন এবং অভাবনীয়। ক্ষণকালের জন্য ভুলে গিয়েছিল সে কে? সে কোথায়? হঠাৎ তার মনে পড়ল। ছিঃ ছিঃ। কী করছে সে! এক ঝটকায় সে শফিকুলকে সরিয়ে দিল। শফিকুলও অপ্রস্তুত হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। ধড়মড় করে উঠে সে ফটিকের নাগালের বাইরে চলে গেল। সইফুনের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কী সর্বনাশ! সে কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে, না কী? ফটিক দেখল সইফুন তার সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করছে তার। হঠাৎ ফটিক দেখল, সইফুন টলছে। এক্ষুনি পড়ে যাবে। ফটিক হাত বাড়িয়ে সইফুনকে ধরে ফেলল। তারপর মক্কেলরা যে বেঞ্চিতে এসে বসে, সইফুনকে সেখানেই যত্ন করে শুইয়ে দিল।

কী করবে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কী তার করা উচিত? একটা পাখা এনে বাতাস করবে সইফুনকে? জল এনে চোখে মুখে ঝাপটা মারবে? কেন এমন হল? কে দায়ী? বিব্রত শফিকুল সইফুনের কাছে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা বিচার করে দেখতে চাইল। ওর বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে এসেছে যেন। কী হবে সে বিচারে এখন আর কাজ কী? সে ভাবল। যদি কোনও

ক্ষতি সে সইফুনের করে থাকে তার অসংযত ব্যবহারে, তাতে কি তার কোনও ক্ষতিপূরণ হবে?

কিন্তু সইফুন সাড়াশব্দ দিচ্ছে না কেন? ফটিক এগিয়ে গেল। আন্দাজে সে সইফুনের নাকের কাছে হাত দিয়ে টের পেল জোর নিঃশ্বাস পড়ছে। ফটিক আশ্বস্ত হল। সইফুন নিঃশব্দে কাঁদছে। এ কী! এ কী! এ কী! একটা আলো জ্বালা দরকার। ফটিক হ্যারিকেনের খোঁজে ভিতরের ঘরে দ্রুত চলে গেল। দেশলাই জেলে দেখল, চৌকীর পায়ার কাছে হ্যারিকেনটা আছে। সেটা তুলে নিয়ে কানের কাছে এনে ঝাঁকাল। মনে হল তেল আছে। কাঁচটা খুলে লণ্ঠনটা জ্বালাল ফটিক। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে সে। সইফুনের সংগে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল কেন? তার মনে তো সইফুনের কোনও জায়গাই ছিল না। ছবি চলে যাবার পর তার যা কিছু দেখাশোনা সেই করছে। কিন্তু তার সম্পর্কে ফটিক তো সচেতন ছিল না। তবে? ফটিক লণ্ঠন নিয়ে বাইরের ঘরে চলল তার অভদ্র ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে। সইফুন নেই। ঘর ফাঁকা। শূন্য বেঞ্চিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ফটিক। দরজার কড়া খটখট করে কে যেন নাড়াল। দরজা খুলতেই ফটিক দেখল, দাউদ। দাউদ! ফটিকের হঠাৎ মনে হল একটা বড় মাপের আয়নায় সে নিজের চেহারাটাই দেখছে না তো?

॥ ৯ ॥

সারা রাত অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছে সইফুন। মনে অসহ্য যন্ত্রণা। ছবিবুকে স্বপ্নে দেখেছে। ছবিবু তাকে বলছে, তুই অ্যাত চোর ক্যান সইফুন? তখন সইফুনের কান্না আর বাধা মানে না। ফুলে ফুলে কাঁদে। জোরে কাঁদার উপায় নেই। এক বিছানায় ওরা কয় ভাই-বোন গাদাগাদি করে শোয়। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে ও কাঁদছে। কান্না, চেপে কান্না, এইতেই বড় কষ্ট পাচ্ছিল সইফুন। না না, এতে না এতে না, আরও বড় কষ্ট দিচ্ছিল তাকে তার গাল আর ঠোঁটে এক আততায়ী উষ্ণ স্পর্শের স্বাদ। যা কিনা সে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না তার চোখের প্রবল ঢলে। পুড়িয়ে ফেলতে পারছিল না অনুতাপের আগুনে। উড়িয়ে দিতে পারছিল না বুকভরা দীর্ঘশ্বাসে। এ কী হল! এ কী অন্যায়? নিশ্চয়ই অন্যায়। ছবিবু যে জিনিস তার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছে সে তা তছরুপ করেছে। এ অন্যায় এ অন্যায় এ অন্যায়। সইফুনের চোখে ঢল নামে। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদে। আল্লাহ! তারপর হঠাৎ এক সময় তার ছটফটে বোনটা পাশ ফিরতে গিয়ে ছটকা চিংড়ির মত তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে আর তার গালটা দৈবাৎ সইফুনের গালে যেই গিয়ে ঠেকে আর তখনই এক বিপর্যয় ঘটে যায়। ওর গালে কোত্থেকে সেই উষ্ণ স্পর্শ হঠাৎ এসে আততায়ীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। শরীর কাঁপে। একটা খা-খা অতৃপ্তি তার দেলটাকে চোত-বোশেখের মাঠের মত তৃষ্ণার্ত করে তোলে। না, এ কারবালার সেই ভয়াবহ পিপাসা। সন্ধ্যেবেলার সেই রোমাঞ্চক সেই সুখকর উষ্ণ স্পর্শ কখনও তার ঠোঁটে, কখনও তার গালে এসে ভর করে। সে অস্থির হয়ে ওঠে। ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানায়। প্রবল এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে দুমড়ে মুচড়ে এই বিছানা থেকে উপড়ে নিয়ে একটা বুকের আশ্রয়ে গিয়ে ফেলে দিতে চায়। সে বিছানায় উঠে বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে বসে থাকে আর তার দ্রুত নিঃশ্বাসে যেন দরজাটাকে বিদীর্ণ করে ফেলতে চায়। ক্রমে সে শান্ত হয়ে আসে। বিছানায় শোয়া তার অন্য ভাই-বোনেদের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের নানা ধরনের শব্দ, দাঁত কিড়মিড়ি, অস্ফুট কাতরোক্তি এই সব তখন তার কানে বেজে উঠতে থাকে। সইফুন ক্রমশ নিস্তেজ হতে থাকে। তার বুকের ভিতর অন্য ধরনের একটা যন্ত্রণার জন্ম হতে থাকে। না, আমি আর যাবো না, যাবো না। কোনোদিন আপনার সামনে যাবো না। আপনি তো আমারে চোখ তুলেও দ্যাখেন না। অ্যাত দিন ধরে যাই আসি। কই, অ্যাকদিনউ তো আমারে কাছে ডাকে ন্যাননি। ডাকে অ্যাকটা কথাও কননি। আমি য্যান মানুষই না। না না না আর কোনোদিনউ যাবো না। না না না আপনারে না দেখলি মরে যাবো। পারবো না পারবো না, না যায়ে আমি পারবো না। এ আমার কী হলো? সইফুন ঠাস করে বালিসের উপর উপুড় হয়ে পড়ল। তারপর মুখ ঘষতে ঘষতে কাতরাতে লাগল, আল্লাহ এ তুমি আমার কী করলে?

অথচ প্রথম যখন সইফুন ফটিককে দেখে তার তখন ফটিককে একটুও পছন্দ হয়নি। তবে হ্যাঁ, ছবি বুরি দেখা মাত্তর ভাল লেগে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলায় গা ধুয়ে ঘরে এসে চুল বাঁধছিল সইফুন। একটা ছই দেওয়া ঘোড়ারগাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কে এলো? জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখল ফটিক লাফ দিয়ে নামল এবং সইফুনের সংগে তার চোখাচোখি হতে একটু ইতস্তত করে ফটিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মৌলবী সাহেব বাড়িতে আছেন? ফটিকের কথা বলার ঢংটা তাদের চাইতে আলাদা। সইফুনের কানে তা খট করে বিঁধেছিল। কিন্তু সইফুনের স্পষ্ট মনে আছে, সে ফটিকের কথার জবাব না দিয়ে তার মুখের উপর জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর আব্বাকে গিয়ে বলেছিল, বাইরে কে যেন ডাকছে। তারপর সে আবার চুল বাঁধতে শুরু করল। বাইরে শুনল তার আব্বার হৃদ্যতাপূর্ণ উত্তেজিত আওয়াজ।

আস্‌সালামু আলায়কুম।

এবং তারপর সইফুনের কানে ঢুকল আগন্তুকের ধীর এবং বিনীত স্বর।

ওয়া আলাইকুমুস্সালাম।

আসেন আসেন উকিল সাহেব। আপনার ঘর-দুয়োর সব ঝাড়ে মুছে সাফ করায়ে রাখিছি। আচ্ছা! সইফুন বুঝল, ইনিই তাহলি ওগের নতুন ভাড়াটে মিঞা। মিঞারা আসবেন বলে ওর বাপ বাড়িসুদ্ধ সবাইর অ্যাকেবারে মাথা খায়ে ফেলতিছিলেন।

আরে! না আপনারে নিয়ে আর পারা যাবে না। গাড়ির মধ্যি আমার বিবিটির বসায়ে রাখিছেন!

আচ্ছা! খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে সইফুন ভাবল মিঞা তালি অ্যাকা নন বিবিরউ সঙ্গে আনিছেন। ইটা তবু ভাল। কথা কওয়ার অ্যাকটা লোক পাওয়া যাবে। আজ পাঁচ-ছ বছর সে বড় হয়ে উঠেছে, তার এই অপরাধে বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ও বাপ গাড়োয়ান, ঘুড়া খোলো, ঘুড়া খোলো। আস্তে করে গাড়িডারে নামাও। আসো বিবি, নামে আসো। ইডারে তুমার নিজির বাড়ি মনে করবা।

সইফুন আবার জানালা ফাঁক করল। বোরখা পরা অ্যাকটা বিবি কুঁজো হয়ে ছই-এর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। মাটিতে নামার সময় গাড়ির দড়িতে পা আটকে বিবিজান অ্যাকটা হোঁচট খালেন। পড়েই যাচ্ছিলেন। খসম মিঞা দৌড়য়ে গিয়ে ধরে ফ্যাললেন। বিবিজান খসম মিঞারে জড়ায়ে ধরলেন। আব্বাজান, অ,হা বিটির কি খুব চোট লাগিছে বিটির কি খুব চোট লাগিছে বলে অস্থির হয়ে ওঠলেন। গাড়োয়ান নির্বিকারভাবে মালপত্তর একে একে নামাতি লাগল এবং ঘুড়াডা ততোধিক নির্বিকারচিত্তে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে অ্যাকটা ডাক ছাড়ল, তারপর ল্যাজ তুলে ন্যাদ ন্যাদ করে নাদে দিল।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বালিশে মুখ ঘষে ঘষে হঠাৎ-হঠাৎ হানা-মারা উষ্ণ স্পর্শটা সইফুন যখন প্রাণপণে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল, তখন এই দৃশ্যটা ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে আবার জীবন্ত হয়ে উঠল। কেন এমন হল? কেন এমন হল? সইফুনের ছোট বোন জামিলা হঠাৎ কেঁদে উঠল। সইফুন যেন বেঁচে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে জামিলাকে ঠেলতে লাগল, "জামিল জামিল। বাইরি যাবি? ওঠ্ ওঠ।" ঠেলে ঠেলে সে জামিলাকে তুলল। তারপর ঘুমে-ধরা জামিলাকে হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। একটু পরে জামিলা ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সইফুন ফিরল না। উঠোনের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে অনেকক্ষণ ছবিদের বাসাটার দিকে চেয়ে রইল। শফিকুলের ঘরে আলো জ্বলছে। একটা ছায়া ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার ভাবল ছুটে যায়। লোকটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসে। জেনে আসে, কী ভাবছে, কাকে ভাবছে লোকটা। ইচ্ছেটা মনে উদয় হতেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল সইফুন। ঠিক সেই রকম কাঁপুনী, যেমন আরেকদিন তার হয়েছিল। সেইদিনও সে অনেক রাত্রে বেরিয়ে এসেছিল এবং এই রকম আলো জ্বলছিল ছবি বু-র ঘরে এবং এই রকমই ছায়ার খেলা দেখেছিল। সইফুনের পক্ষে মারাত্মক সে খেলা। সেদিন একটা ছায়া ছিল না। দুটো ছায়া ছিল। একটা ছায়া আরেকটা ছায়াকে কাছে টানতে চাইছিল। কিন্তু সে ছায়াটা আসতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু পারল না। একটা ছায়া অন্য ছায়াটাকে জোর করে টেনে আনল। তারপর ছায়াদুটো অবশেষে মিশে গেল এবং আলো নিভিয়ে দিল। হঠাৎ সব অন্ধকার। সইফুন কাঁপছিল থরথর করে। সে ঘামছিল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, জামিলাকে ঠেলে সরিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে। সইফুন থরথর করে কাঁপছে। কেন ঘুমোচ্ছে না লোকটা? কেন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে? আমার জন্য অপেক্ষা কত্তিছে? আমি যাব? না না না। ক্যান্, গেলি দোষ কী? না না না। সইফুন অবসন্ন হয়ে উঠল। চোখ বুজে শুয়ে রইল।

ফুল, ফুল, ও ফুলি! তার বাপের ডাকে জানালায় এসে মুখ বাড়াল সইফুন।

জে! আস্তে করে জবাব দিল।

বোরখার ঢাকনা তুলে ছবি-বু সেই প্রথম চেয়েছিল তার দিকে। তাকে তক্ষুনি খুব ভাল লেগেছিল সইফুনের। সে হেসেছিল। ছবি-বুও হেসেছিল। সইফুন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ছবিবুকে হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। এবং আম্মাকে ডেকে বলেছিল, এই আমাগের নতুন-বু। ইনার জন্যিই আজ কদিন ধরে বাজানের হাতে বাড়িসুদ্ধ লোকের অ্যাত খুয়ার।

ছবি সালাম করতেই সইফুনের মা ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করলেন। বিবি আয়েশার মত হও মা।

সইফুন বলেছিল, ক্যান্ আম্মা, হজরতের অ্যাত বিবি থাকতি শুধু আয়েশার মত হতি কও ক্যান্? বিবি খাদিজা, বিবি সওদা, বিবি হাফসা, বিবি উম্মে কলমা, বিবি জয়নব, তারপর জোয়ারেরা রায়হানা, মেরী, সফিরা, মায়মুনা এই সব বিবিরা কি ভাসে গ্যালেন? হজরতের তের জন বিবি, তুমরা তার মধ্যি আর সবারই ভাসায়ে দিয়ে খালি বিবি আয়েশা হও, বিবি আয়েশা হও এই কথা কও ক্যান্? তুমরা বড় এক চোখো?

সইফুনের মা বোকার মত হাসতে হাসতে বললেন, "শুনলে তো বিটি, আমার মেয়ের কথা। ও ঐ রকম আড়-আড় কথা কয়।"

ছবিও হাসতে লাগল। সত্যিই তো সেও জানে না, কেন তার দাদীদের নানীদের মায়েদের কাছে শুধু আয়েশারই এত কদর?

হজরত নিশ্চয়ই একচোখো ছিলেন না। সইফুন বলেছিল, আব্বা কয়েছেন কোরানে আছে, "কিন্তু যদি ভয় করে যে, তাহাদের (স্ত্রীদের) প্রতি সম-ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটিই বিবাহ কর।" হজরত তো তালি তাঁর সব বিবির সংগে সমান ব্যবহারই করিছেন।

অত শত জানিনে বাপু। সইফুনের মা বললেন, আমি তো আর মৌলবীর বিটি না, তুই হলি মৌলবীর বিটি। এই যে এখেনে অ্যাক হাজীর বিটিও আছে। জবাব যদি দিতি পারে তো সে দিক। আমি ততক্ষণ ওগের খাবার জুগার দেখি। অ্যাতটা পথ আসে বিচারার মুখখান শুকোয়ে একেবারে আমসি হয়ে গিয়েছে।

ছবি বলেছিল, সইফুনের মনে আছে, ক্যান্ যে সবাই আয়েশা হতি কয় তা আমি ঠিক জানিনে। তবে আমার দাদী কয়েছেন, আয়েশার সতীনরাও উনারে খুবই ভালোবাসতেন। বিবি সওদা তাঁর স্বামী সহবাসের পালাডা, যারে বারী কয়, বিবি আয়েশারে দান করে দিছিলেন। সতীনরি কতোটা ভালোবাসলি মেয়েরা একাজ কত্তি পারে, অ্যাখন বুঝে দ্যাখেন। আর আয়েশাই বা কত উঁচুদরের মেয়ে ছেলেন তাও বুঝে দ্যাখেন।

দ্যাখ বু আমার সংগে আপনি টাপনি কবা যদি তালি আর কথাবাত্তারা নেই। সইফুন বলে দিল।

আচ্ছা ভাই, আচ্ছা। ছবি খুশি হয়ে বলল, তুমিই কব।

সইফুন তার মায়ের গলা নকল করে বলেছিল, বু তুমি বিবি সওদার মত হও।

ছবিও কম যায় না। বলেছিল, তা না হয় হলাম। আমার বাড়িডা তালি কোন্ সতীনরি বিলোয়ে দেবো, সিডাউ কয়ে দ্যাও।

সইফুন বালিশে মুখ চেপে কান্না রুখতে রুখতে মনে মনে আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগল, আমারে দিয়ে দ্যাও, ছবি-বু আমারে দিয়ে দ্যাও।

ফটিক ভাইকে সইফুন তো বরাবর এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছে। ওর গম্ভীর ভাব, ভারিক্কি ধরনের চলাফেরা সইফুনের মনে ভয় ও সম্ভ্রম ছাড়া আর তো কোনও মনোভাবের জন্ম দেয়নি। ওকে এড়িয়েই চলত সইফুন। ছবি-বু কতদিন বলেছে, তুই তোর ভাইরি দেখলি পালায়ে যাস ক্যান্। ও কি বাঘ না ভালুক। আমার ভয় করে। য্যামন গম্ভীর। বাপ! সইফুন বলেছিল। ছবি-বু হাসত। বলত, দূর, ওর বাইরিটাই ওরকম। ওর মনডা বিজায় নরম।

সইফুন কখনোই সহজ হতে পারেনি ফটিকের সামনে। ধীরে ধীরে যখন আলাপ হয়েছে, তখনও। তবে আব্বার মুখে যখন তখন শফিকুলের প্রশংসা শোনে বাড়িতে। যদিও দুজনের মধ্যে তর্কই সে শুধু শুনেছে। তা সে এ বাড়িতেই হোক আর ও বাড়িতেই হোক।

তাহলি বাঙালী মুসলমানই বা বাঁচবে কী করে আর তার তৌহিদ আর তমদ্দুনিরই বা বাঁচাবে কী করে? পুজোর বাজনা মসজিদের সামনে যায়ে না বাজালি কি হিঁদুগের পুতুল-গুলোর কানে তা ঢোকে না? কন্ না উকিল সাহেব? মৌলবী জয়নুদ্দি উত্তেজিতভাবে বললেন।

এসব কে সমর্থন করছে? শফিকুল শান্তভাবে বলল। হিন্দুদেরও অনেকে এই অসভ্যতার সমর্থন করে না। আচ্ছা আপনিই বলুন না মৌলবী সাহেব, আমরা মুসলমানরা আমাদের ধর্ম বাঁচাতে তো হৈ হৈ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছি, যাতে আমাদের বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। কিন্তু আমাদের মারমুখী ব্যবহারে যে অন্যদের ধর্মীয় বোধ আক্রান্ত হচ্ছে, কই তার প্রতিবাদ তো কেউ করছি নে। রেল লাইনের ধারে যে মসজিদ, নমাজ পড়ার সময় কই সেখেনে রেলগাড়ি থামিয়ে তো রাখা হয় না।

ফটিকভাই যে কথা বলতে পারে তা তাকে আব্বুর সংগে তর্ক করতে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করত না সইফুন। ছবি-বুও বলে, খালি খালুর সামনেই উনার দেখি মুখি খই ফোটে। আব্বুর সংগে ফটিক ভাই-এর কথাবার্তা মাঝে মাঝে সে শুনেছে। সেগুলো কেমন আলাদা ধরনের। একবার মেয়েদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। ফটিকভাই বলেছিল, মুসলমানদের বড় দোষ হল, মেয়েদের শক্তিকে উপেক্ষা করা। আজকের দুনিয়ায় মেয়েদের অন্দরে বন্দী করে রাখা মানে আমাদের অর্ধেক শরীরকেই পঙ্গু করে রাখা। ওদের শিক্ষা দিয়ে সব কাজে এগিয়ে দেওয়া উচিত। সইফুন শুনল, তার আব্বু আমতা আমতা করছেন। বলছেন, মেয়েগের যে সব কাজে আগোয়ে দেবেন কচ্ছেন তা উরা আগোয়ে যায়ে করবে কী? শফিকুল বলল, চাকরি করবে, ব্যবসা করবে, যুদ্ধ করবে, রাজ্য চালাবে। পুরুষরা যা করে তাই করবে। সইফুনের কথাটা শুনে প্রথমে আজগুবি বলে মনে হলেও, পরে মনে হয়েছিল আজগুবি কেন? ঠিকই তো বলেছে ভাই। ওর আব্বু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, কী কলেন! যুদ্ধ করবে? বোরখার মধ্যি দাঁড়ায়ে যুদ্ধ করবে!

হাঃ হাঃ হাঃ। এত হাসার কী আছে? সইফুন ভাবল। শফিকুল বলেছিল, এত হাসার কিছু নেই মৌলবী সাহেব। তুর্কি, রাশিয়া মেয়েদের মুক্তি দিয়েছে। তারা সেখানে তো দিব্যি

মিলিটারি ট্রেনিং নিচ্ছে। চাকরি করছে। বড় বড় ট্রাকটর চালাচ্ছে। তুর্কিতে তো সইফুনের মত মেয়েরা বোরখা ফেলে বই হাতে ইশ্‌কুল কলেজ ইউনিভারসিটিতে ছুটছে। মাসিক মোহাম্মদীতে ছবি বেরিয়েছে। সে ছবিটা দেখবার জন্য বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল সইফুনের।

বড্ড ইচ্ছে করছিল ছবিটা দেখাবার জন্য ফটিক ভাইকে বলে। ফটিক বলেছিল, বুঝলেন মৌলবী সাহেব এ জমানায় মুসলমান যদি এগিয়ে যাবার জন্য মুসলিম মেয়েদের পাশে টেনে না নেয় তবে মুসলমানের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বুঝে দেখুন, আমরা মেয়েদের কোথায় রেখেছি। আপনার মেয়ে সইফুনের কথা ধরুন। ওর এত বুদ্ধি। ওকে যদি লেখাপড়া শেখানো যেতো তো ও কি আর ইশকুল কলেজে টীচার হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত না? খুব পারতো। ওকালতী পাশ করালে উকিলও হতে পারত। কী পারত না? আপনারই তো মেয়ে। বলুন না? ধরুন, ও যদি আপনার ছেলেই হতো, আর তার আক্কেল বুদ্ধি সইফুনের মতই হত তো কী করতেন? পড়াতেন না তাকে?

আব্বাজান বলেছিলেন, সইফুনের স্পষ্ট মনে আছে, আপনার মত জিন্দা দেল মুসলমানের সংগে আমার যদি আরও বছর সাত আট আগে দেখা হত, তা'লি আর এ ভুলটা করতাম না। বিটিরি আমি পড়াতাম। তাই তো, অ্যাখন আমার মনে হচ্ছে, নিজি মাসটার হয়ে কী করে অ্যাত বড় ভুলটা করলাম। অ্যাঁ।

আমি তোমাকে পড়াবো সইফুন। তুমি কেঁদ না। শফিকুল এগিয়ে এল। সইফুনের চোখের জল আদর করে মুছিয়ে দিল। তুমি এই সময় রোজ এসো। শফিকুল সইফুনের দুখানা হাত চেপে ধরল। সইফুনের এক হাতে চায়ের বাটি, আরেক হাতে মুড়ি। সইফুন বলল, হাত ছাড়েন। চা পানি পড়ে যাচ্ছে, শফিকুল বলল পড়ুক। তুমি এই সময় এসো। সইফুনের শরীর থরথর কাঁপছে। মুড়ির বাটি থেকে মুড়ি সারা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ছে। সইফুন বলল, হাত ছাড়েন ফটিক ভাই, মুড়ি ছড়ায়ে পড়তিছে। শফিকুল বলল, ছড়াক। আমি মুড়ি চাইনে, তোমাকে চাই। তুমি এসো। সইফুন বলল, কনে আমারে যাতি কচ্ছেন। শফিকুল বলল, আমার দেলের ভিতরে। খু উ ব খুশি হল সইফুন। বলল, একটু সবুর করেন, একটু সাঁজে আসি। ছবি খাটে শুয়ে হাসতে লাগল। তুমি হাসতিছ ক্যান্ ছবি বু? একটু অপ্রস্তুত হয়ে সইফুন জিজ্ঞেস করল।

হা হা হা ছবি হাসছে। একটু সাঁজে আসি! হা হা হা হা। সাজে আসি। হা হা হা মুখপুড়ির হা হা হা মুখপুড়ির সখ দ্যাখ হা হা হা হা বলে সাঁজে আসি!

তুমি অত হাসতিছ ক্যান ছবি বু। হা হা হা হা হা হা।

অ্যাত হাসার কী হল?

হা হা হা হা হা হা।

ছবি বু ডানা নাড়তে নাড়তে বিছানা থেকে উঠল তারপর ছোঁ মেরে ফটিককে নিয়ে একেবারে ছাদ ফুঁড়ে আকাশে উড়ল। ছাদের ফাঁকে আটকে গেল শফিকুল। সে বলল, সইফুন সইফুন, ফুল! আমাকে একবার ছুঁয়ে দাও, আঙুল দিয়ে শুধু ছুঁয়ে দাও। তাহলেই আমি তোমার। তাহলেই আর কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

সইফুন প্রাণপণে হাত বাড়াল। হাতের আঙুলটা শফিকুলকে সামান্যর জন্য ছুঁতে পারছে না। সইফুনের উদ্বেগ বাড়ছে। টুল, একটা টুল! সইফুন চেঁচিয়ে উঠল।

ধর। ধর। হাত বাড়িয়ে শফিকুল আর্তস্বরে বলছে।

টুল, টুল, হায় খোদা একটা টুল দ্যাও। সইফুন দেখল ওর হাতের কাছে একটা টুল। টুলটা বেজায় ভারী। ফুল ফুল শিগগির। সইফুন টুলটা নাড়াতে পারছে না। কিছুতেই পারছে না। শিগগির শিগগির ফুল শিগগির। ফুল ফুল ফুল।

পারছে না, পারছে না। সইফুন কিছুতেই টুলটাকে বিছানায় তুলতে পারছে না। হাঁপাচ্ছে সইফুন। গলগল করে ঘাম বেরুচ্ছে। ঘুম ভেঙে হাঁপাতে লাগল সইফুন। কিন্তু ফটিক ভাই তো তাকে চায় না। ফিরেও দেখে না। তবে কেন এমন হল? কেন সেদিন রাতে দুটো ছায়াকে মিশে যেতে দেখে সে এমন পাগল হয়ে উঠল। হ্যাঁ পাগল বই কি? ফটিক ভাই-এর কাছাকাছি গেলে তার কষ্ট হয়। তার কি রকম একটা লাগে যেন। বিশেষ করে ফটিক ভাই যখন একা থাকে তখন তার কাছে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না সইফুন। তার শরীরে রক্ত তোলপাড় করে। গলা শুকিয়ে আসে। ও আর থাকতে পারে না সেখানে। ছুটে নিজের বাড়িতে চলে আসে। সেখানেও নিস্তার নেই। সেই এক অস্বস্তি। বাড়িতে খানিকটা কাজ করে, খানিকটা কাজ ভুলে যায়। কোথাও একা বসে ভাবতে চায়। ফটিকের কথা মনে পড়ে। আবার ফটিক ভাই-এর কাছে যাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে।

না না মৌলবী সাহেব ছেলেদের আক্কেল বেশি, মেয়েদের কম, একথার কোনও দাম নেই। ওসব সেকেলে কথা। হিন্দুদের মধ্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী, ইসলাম ধর্মে আয়েশা, এদের কথা ছেড়েই দিন। এ যুগের কথাই ধরুন, সাহিত্যে বিজ্ঞানে দেশসেবায় কত মেয়ে আজ কত দিকে আপন প্রতিভা ফুটিয়ে তুলেছে। মাদাম কুরীর কথা ধরুন। কত বড় বৈজ্ঞানিক। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতার কথা ধরুন। সরোজিনী নাইডুর কথা ধরুন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের কথা ধরুন। আমরা যদি সুযোগ না দিই, বাড়ির মেয়েদের পায়ে শিকল বেঁধে খাঁচায় ভরে রেখে

দিই, আর বলি যে মেয়েদের আক্কেল পুরুষের আক্কেল অপেক্ষা অর্ধেক, তাহলে ইনসাফ হয় না।

আচ্ছা উকিল সাহেব, সইফুনের বাবা ইদনীং প্রায়ই জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিলেন, আপনার কী মনে হয়, সইফুনির ল্যাখাপড়া শিখোলি হতি পারে?

আলবৎ পারে। শফিকুল বলল। সইফুন তো বেশ ইনটেলিজেন্ট। প্রাইভেটে এনট্রান্স পরীক্ষা দিতেই পারে।

পারে? আপনি কতিছেন, পারে? অ্যাঁ? সইফুনের বাবা আগ্রহের সংগে জিজ্ঞেস করতেন। তালি কি ওরে লাগায়ে দেব?

দেবেন বই কি?

খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সইফুন। ছবি-বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আসো না বু, আমরা পড়াশুনা শুরু করি। বসে বসে দিন আর যাতি চায় না। ছবি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তারপর আর উচ্চবাচ্য করল না এবং ওরা আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সইফুন। খালি সেই এক ঘেয়ে জীবন। রোজ একরকম ভাবে ঘুম থেকে ওঠা। একই ধরনের কাজ করে যাওয়া। দিন শেষ হলে কাজ ফুরোলে আবার সেই শুতে যাওয়া। একেবারে বাঁধা গত। এইভাবেই এক ঢিমে ক্লান্তিকর গতিতে সইফুনের দিন কাটছিল। ছবি-বুরা আসায় একটু নতুনত্ব এসেছিল। কিন্তু তাও কয়েক মাস যেতে না যেতেই ছকে বাঁধা পড়ল। সইফুনদের পাড়াটাও এমন যে অন্য কারও সংগে মেলামেশারও বিশেষ সুযোগ নেই। বাড়িতে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল। মামাবাড়ি ছাড়া গ্রাম দেখেনি সে। কচিৎ কখনো যায় তারা। সইফুনের বাপ কখনো কখনো তার শাদীর চেষ্টা করেন। কিন্তু কি যে হয়, সব ভেস্তে যায়।

কেন, সে কি মেয়ে নয়? ছবি-বু আর সে এমন কিছু ছোট বড় নয়। ওরা এক বয়েসীই প্রায়। ছবি-বু কি তার চাইতে বেশি সুন্দর? বেশি কাজের মেয়ে? তবে? ছবি-বুর যদি শাদী হতি পারে আমার শাদী হয় না ক্যান? এর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। তাই সইফুন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

সইফুনের ভাই ওরই মত কিছু করতে না পেরে এখানে পচছিল। তারপর একটা চাকরি যোগাড় করে বারমায় চলে গিয়েছে। আর সে মেয়ে বলেই পড়ে আছে। অনেক সময় সে মনে মনে চলে যায়। দূরে। কোথাও। কিন্তু কিছুই মনে থাকে না কোথায় যায়? কার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে? আজও বিকেল থেকে তার কোথাও একটা যাবার তাগিদ সে মনে প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছিল। তাই সে সন্ধ্যে না হতেই ছবি-বুর বাসায় গিয়েছিল। ফাঁকা বাসায় ফটিকের বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তেই হঠাৎ ওর মনে সেই ছবিটা ভেসে উঠল। একটা ছায়া আরেকটা ছায়াকে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। সংগে সংগে তার শরীরটা একটা ভূমিকম্পে যেন টালমাটাল হয়ে গেল। সে ফটিকের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে নিজেকে সামলে নিতে চাইল। হঠাৎ সে শুনল বাইরের দরজা খুলে ফটিক ভিতরে ঢুকল। সইফুন তক্ষুনি উঠে পালাতে চাইল। সইফুন শুয়ে রইল। আম্মা তাকে লণ্ঠন পরিস্কার করে আলো জেবলে রেখে আসতে বলেছিল। এখন তো প্রায় অন্ধকার। আলো জ্বালা উচিত। আলোটা জ্বালুক সইফুন। ফটিক ভাই যদি হোঁচট খায়? সইফুন শুয়ে রইল। তার মনে উথাল তুফান। বাইরের ঘরে ফটিক ঢুকল। সইফুন শুয়ে রইল। কী অস্থির কী অস্থির! ফটিক বাইরের দরজা বন্ধ করল। কী অস্থির, কী অস্থির! ফটিক একবার কাশল। এবার সে ভিতরে আসবে। এখনই পালিয়ে যাক সইফুন। সইফুন শুয়ে রইল। যাও, ওঠো। চলে যাও। কী কৈফিয়ৎ দেবে? সইফুন অস্থির। সইফুনের মনে ঝড় বইছে। সইফুন কাঁপছে।

বাইরের একটা চেয়ার নড়ল। বাড়িতে আর কোনও শব্দ নেই। সইফুনের হঠাৎ মনে হল সেই ছায়াটা একেবারে কাছে এসেছে। কী অস্থির কী অস্থির! এবার তাকেও টেনে নেবে। কী অস্থির, কী অস্থির! ইয়া আল্লাহ্! সে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইল। ফটিক ভাই-এর কোনও সাড়া নেই। সইফুন শুয়ে রইল। সইফুন ক্লান্ত হল। সইফুন হতাশ হল। সইফুন উঠে পড়ল। আর আসব না, আর আসব না, আর আসব না। সইফুন অভিমানের তীক্ষ্ণ ছুরি চালিয়ে তার দেলটাকে ফালা ফালা করে চিরল তারপর দ্রুতপদে বাড়িতে চলে গেল।

যাবো না, যাবো না, আর যাবো না। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে কসম খেলো সইফুন। তয় আবার যাই ক্যান্? না যায়ে পারিনে ক্যান? আল্লা গো!

ফটিব ভাই চা পানি খাবেন, ফটিক ভাই চা পানি খাবেন? আম্মা জিজ্ঞেস কত্তিছে। আম্মা জিজ্ঞেস কত্তিছে! তয় তুই আ'সে কলি ক্যান, আম্মা ফটিক ভাই চা পানি খাতি চাচ্ছে। বানায়ে দেব? একথা আম্মারে তালি কলি ক্যান? জানি নে, কতি পারব না। কতি পারব না! বেহায়া, বেশরম! তোর দিকি তো ভুলুক দিয়েও দেখে না। কী, দ্যাখে? ধমকাল সইফুন।

না। কাঁদো কাঁদো স্বরে সইফুন জবাব দিল।

তবে যা'স ক্যান্ মরতি? চোখ পাকালো সইফুন।

ক্যান যাই? সইফুনের চাউনী ভীত এবং বিভ্রান্ত।

হ্যাঁ, ক্যান যা'স?

ক্যান যাই? ক্যান যাই? কাঁদতে কাঁদতে সইফুন বলল, তা কতি পারব না। না যায়ে যে

পারিনে।

তোর শরম হয় না মুখপুড়ি!

শরম? হ্যাঁ হয়। না হয় না। বালিশটাকে দু হাতে শক্ত করে চেপে ধরে সইফুন অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, বুঝাতি পারিনে। বুঝাতি পারিনে। আমি কিছুই বুঝাতি পারিনে। ছাবি-বু আমি কি তুমার সংগে বেইমানি ক'রিছি? আল্লাহ, আমি কি সীমা লঙ্ঘন করিছি? আমি কি গুনাহ্ করিছি? কও, কও, কও। আমি আর সহ্য কত্তি পাত্তিছি নে।

সইফুনের চোখের জল ক্রমেই বন্যার আকার ধারণ করছে। সে আর ফোঁপানি থামাতে পারছে না।

ছবি-বু ছবি-বু তুমি মুসলমানের বিটি। আমার দেলের যন্তন্না তুমার তো বুঝা উচিত। তুমি আমারে দয়া কর। তুমি বিবি সওদার মত হও। তুমার খসমের ভাগ আমারে এটটু দ্যাও। আমি তুমার বাঁদী হব। ফটিক ভাই ফটিক ভাই ফটিক ভা—

সইফুনের একটা ছোট ভাই বিছানা ভিজিয়ে তারস্বরে কেঁদে উঠল। সইফুনের চটকা ভাঙল। চোখের জল মুছে কাঁথা বদলে সে ভাইকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াতে লাগল। ফটিক ভাই ঘুমোচ্ছে, না এখনও পইচারি করছে? বাইরে গিয়ে দেখে আসতে খুব ইচ্ছে করল। সে শুয়ে পড়ল।

॥ ১০ ॥

সেই অবস্থা হ্যারিকেনের আলোয় শফিকুল দেখল দাউদ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আস্সালা-মু আলায়কুম।" ইতস্তত করে দাউদ হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

শফিকুল তার হাতখানা ধরে ক্লান্তস্বরে বলল, "ওয়া আলাইকুমুস্সালাম। এস, ভিতরে এস দাউদ ভাই।"

শফিকুল এগিয়ে যেতেই দেখল মুড়ি আর চায়ের বাটি গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটু অপ্রস্তুত হল। তারপর শান্তভাবে বাটি দুটো টেবিলের উপর তুলে রাখল। সইফুন তার শরীরে এসে এলিয়ে পড়ল। শফিকুল তাকে যত সরিয়ে দিতে চায় সইফুন ততই তার শরীরে মনে অণু অণু হয়ে ঢুকে পড়তে থাকে।

দাউদ বিস্মিত হয়ে বলল, "ব্যাপারডা কী, কন দিনি ফটিক ভাই। সারা ঘরে চা ছড়ানো মুড়ি ছিটোনো। মনে হচ্ছে য্যান এটটু আগেই এখেনে অ্যাকটা যুখ্খু হয়ে গেছে।"

ক্লান্ত শফিকুল বলল, "ঐ বেনচিতে ব'সো। তারপর কী মনে করে?"

দাউদ দেখল ফটিকের স্বরে পরিচিত উষ্ণতা ফুটে বের হল না। মিঞার মুখ চোখ সুবিধের ঠেকতিছে না। দেখলিই মনে হয় এই ছিপে মেয়েমানুষ ঘাই মাত্তিছে। যাকগে যাক। যার ফুড়া সেই সেঁক দিক।

দাউদ বলল, "ঝিনেদায় গিছিলাম। এই ফিত্তিছি। খালেক মুছুল্লি ক'লো, দারোগা আপনার বাপেরে গারদে ঢুকোয়ে দেছে।"

সইফুন সইফুন আমাকে এখন বিরক্ত করো না। বাড়ি যাও।

"কী হয়েছে?" শফিকুল চমকে উঠল। "আব্বুকে কী করেছে!"

"গারদে পুরে রাখিছে।"

"কবে থেকে!" আঃ সইফুন!

"কাল সন্ধ্যেয় বশিরির বাড়ির থেকে ধরে নিয়ে গেছে। অ্যাকা আপনার বাপরেই না। বশির খাদু জমিরুদ্দি আরউ সব কারে কারে। গয়ারে পর্যন্ত ছাড়ে নি।"

"ব্যাপার কী?"

দাউদ বলল, "সিডা ভালো কতি পারব না ফটিক ভাই। কেউ কয় ওগেরে ডাকাতির মামলায় ধরিছে। কেউ কয় বি এল কেস্-এ জড়াইছে। কেউ কয় উরা দাঙ্গা-কাজে বাধাবার উদ্যুগ কত্তিছিলো। খালেক মুছুল্লি ক'লো, চাচা আজ সারাদিন জামিনির চিন্তা করিছেন। জামিন পান নি। আপনি বাড়ি গেলি ভালো হয়। খালেক তাই ক'লো। এই খবরডা দিতিই বাসের থে নামেই এখেনে ছুটে আলাম।"

"তা ভালোই করেছ। তুমি এখন থাকো কোথায়? কী করছ?"

"আমি তো অ্যাখন এখেনেই থাকি। খান সাহেবের মেহেরবানিতি তার ভাতিজার সংগে ডিস্টিক বোডের ঠিকেদারি কত্তিছি। মাস চারেক হ'লো এখেনে আইছি, আর কী? অ্যাকদিন ছবিরি এ বাড়িতি দেখিছিলাম। আর ওর বয়িসি অ্যাকটা মেয়ে।" দাউদ ফটিকের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

আব্বুকে ডাকাতির মামলায় ধরে নিয়ে গিয়েছে। দাঙ্গা বাধাবার উদ্যোগ করেছে তার বাপ! ফটিকের অবাক লাগল। বি এল কেস্! মানে ব্যাড্ লাইভলি হুড্। জনাকয়েক লোক একজনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে দিলেই হল ওর সংসার কী করে চলে হুজুর জানিনে।

ব্যস্ হয়ে গেল সে বি এল কেসের আসামী। কিন্তু সাজ্জাদ মোল্লার সংসার কী করে চলে জানিনে হুজুর, একথা বলার মত একটা লোকও ওদের অঞ্চলে পাওয়া যাবে না। দারোগা পাগল না হলে আবুবুকে এ কেসে জড়াবে না।

"বাড়িটা চিনা ছিল, আর শুনলাম ছবি অ্যাখন নেই, তাই চলে আলাম। ফটিক ভাই, আমি কই কি, আপনি অ্যাকবার বাড়ি যান।"

সইফুন তুমি আর কখনও এভাবে এত কাছে আসবে না। ফটিক এতক্ষণে মনস্থির করে নিয়েছে। আমি অসংযত, অসংযমী সইফুন। এই যে আমার সামনে যে লোকটা বসে আছে, ওর মত। ওকে আমি, ওকে আমি ঘৃণা করি। ও কী করেছে, জানো সইফুন? ওর নিজের বিবিকে ছেড়ে অন্য একজনের বিবিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ওর বিবি সেই জন্যে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

"অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে আসি", দাউদ হাসল। "আসতি পারিনি শুধু ছবির ভয়ে। আপনি পুরুষ মানুষ।" দাউদ, ফটিক দেখল মেঝেটা ভালো করে দেখছে। "আমি জানি, ছবি ব্যাপারডারে যে চোখে দ্যাখে, আপনি ত্যামনভাবে দ্যাখবেন না। আর যাই হোক, আপনি উকিল মানুষ, আমি ফুটোকির মারে ফেলিছি আপনি তো আর এ কথা কতি পারবেন না।"

দারোগা নিজের থেকে আবুবুর মত একজন মান্যগণ্য মোড়লকে হাজতে পুরে রাখবে, এ হতে পারে না। তার কী স্বার্থ? পক্ষান্তরে আবুবু শান্তিপ্রিয় মানুষ, সম্মানিত, ওঁর পক্ষে এমন কোন্ অপরাধ করা সম্ভব যে তার শ্বশুর সারাদিন চেষ্টা করেও তাঁকে জামিনে বের করে আনতে পারলেন না। কী এমন কেস্-এ ওদের জড়িয়েছে! নাঃ তার যাওয়া দরকার।

"আপনি আর দেরি করবেন না ফটিক ভাই, যত তাড়াতাড়ি আপনি ঝিনেদায় যায়ে পৌছোতি পারেন ততই ওগের পক্ষে ভালো। উরা আপনার পথ চেয়ে ব'সে আছে।"

"হ্যাঁ যাব। কাল ভোরের বাসেই যেতাম কিন্তু মুহুরিবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। তাই মেল্ বাসটাতেই যাব ভাবছি।"

"হ্যাঁ, সিডাই ভালো। আর এ বাসডা ঝিনেদায় যখন পৌছোয়, তখন কাছারি খুলার সুমায় হয়ে যায়।"

"আমিউ তাই ভেবেছি। তুমি থাকো কোথায় এখানে? বাসা নিয়েছ?"

"জে। লোন কোমপানির অফিসডে দেখিছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"ওরই দুডো বাড়ি পরে।"

যাবার আগে মিস্ পালিতকে চিঠিখানা লিখে ফেলতে হবে। হাতে একটা মামলা আছে। আসতে যদি দুএকদিন দেরি হয় মুহুরিবাবু যাতে তারিখটা নিয়ে রাখতে পারেন সে ব্যবস্থাও করে রাখতে হবে।

"হ্যাঁ ভালো কথা, ফটিক ভাই আপনি ঝিনেদায় যায়ে ইযাকুবগের বাসায় ওঠবেন। চাচা চাচী ছবি সবই অ্যাখন ওখেনে।"

"কেন", শফিকুলের স্বর কেমন শুকনো শুকনো লাগল। "ওরা এখন ঝিনেদায় কেন?"

"খালেক ক'লো যে চাচা অ্যাখন দুগ্‌গা ডাক্তাররে দিয়ে ছবির চিকিচ্ছে করাতিছেন।"

"ছবির খবর কিছু জানো?" শফিকুল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

"জে না। আমার সাথে ওগের তো আর সম্পক্কো নেই। গিরামে যাতি পারিনে, গেলি আমারে নাকি মা'রে পুতে ফ্যালবে বাইতিদার লোকেরা। বাড়ি যাতি পারিনে, আমার মুখউ কেউ দ্যাখবে না। আমি চোর, আমি খুনী। বাইতিদারে আমি দোষ দিই নে, আমি ওর অ্যাকটা ক্ষেতি করিছি, ওর মেয়েমানুষটারে নিয়ে চলে গিছিলাম, বাইতিদা তার বদলা নিতিই পারে। আমার কওয়ার কিছু নেই। কিন্তু চাচা? তার কাছে তো নতুন অন্যায় কিছু করিনি। চাচা আমারে বাড়ি ঢুকতি দেবে না।"

"মেয়েমানুষ না বাইতির বউ ছিল সে?"

"বউ!" দাউদ জোরে হেসে উঠল। "বউ না হাতি? ও শালী ক'তো যে সে বাউনির রাঁড়ি। বাইতিদা ওরে ভাগায়ে আনিছিল। তারপর আমারে ভর করে বাইতিদার ঘরের থে উড়ল। অ্যাখন আমার কাছের থেও উড়ে গেছে। বাইতির ঘরে ও শালী থাকতো না। আমার আফসোস আমি ক্যান্ ওর ফাঁদে পড়লাম! ফুটোকির সাথে, বাইতিদার সাথে ক্যান্ বেইমানি করলাম! আমি তো বুঝিনি ফুটোকি ম'রে যাবে। আমি অ্যাকটা বুকা, আমি ফুটোকিরি চিনতিই পারিনি। তাই আমি ফুটোকির কাছে চোর হয়ে থাকি। ফুটোকির সাথে বেইমানি করিছি। কিন্তু ফটিক ভাই, আমি বুঝতি পারিনি। আমি আবার আসতাম, ফুটোকির কাছেই ফিরে আসতাম। না আ'সে যাতাম কনে? কিন্তু সে আমারে শেষ মা'র দিয়ে চ'লে গ্যালো। আল্লাহ্ তারে কাছে কাছে খ্যান রাখেন। আচ্ছা, অ্যাখন চলি।"

দাউদ আদাব জানিয়ে চলে গেল। ফটিক অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি শুরু করল। ছবি, ছবি! কোনো রকম পাগলামি করো না। আমি কাল ডাকের বাসেই চলে যাব। এর আগে যে যেতে পারিনি তার কারণ কাজের বোজার চাপ ছিল। সইফুনের ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গিয়েছে।

আমি সব জানি। কার কত কাজ, কী কাজ, আমার ঘ্যান জানতি বাকি আছে? কিছু কইনে তাই, মুখ বুজে পড়ে থাকি তাই. আপনি ভাবেন, আমি বড় বুকা। না?

ছবি ছবি, শোনো!

মিঃ মোল্লা কার এজলাসে সওয়াল করছেন? আপনার বিবির?

মিস্ পালিত, আপনি অনুগ্রহ করে কি ছবিকে বুঝিয়ে বলবেন উকিলের কাজের নেচারটা কী? প্লিজ হেল্প মী।

কেস্টা কী, মিঃ মোল্লা?

ফটিক অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। দাউদের অনুতাপ, তার ব্যথা, ফটিককে একেবারে ডুব জলে ফেলে দিয়েছে। দাউদ তো তেমন দোষী নয়। অন্তত তার তুলনায় নয়। কিন্তু সে কী? প্রকৃতপক্ষে সেই তো অপরাধী। এ ক্রিমিন্যাল্।

কেস্টা কী মিঃ মোল্লা?

আমার মক্কেলদের অন্যায়ভাবে ৩৭৬ ধারায় আসামী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম পানিশমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। আপনার বাবাকে আমার মক্কেলের হয়ে বিনা পয়সায় হাই কোর্টে দাঁড়াতে হবে। আমরা আপীল করছি।

আমার বাবা আপনার মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করবেন। কিন্তু আমাকে তো আপনি আপনার পক্ষ সমর্থন করতে ডাকছিলেন। আপনার কেসটা কী? বিবিকে নেগ্লেক্ট করেছেন?

না, হ্যাঁ। তার চাইতেও বড় ক্রাইম আমি করেছি মিস্ পালিত।

হু ইজ্ শী?

অ্যাঁ?

সেই মেয়েটি কে? সে কি আমি?

ফটিক চমকে উঠে বলল, না না না। হায় খোদা।

ভয় কি, আমি?

সইফুন ফুল, তুমি এমন যখন তখন এখেনে এসো না।

ক্যান্, আলি কি হয়?

তুমি ছেলেমানুষ, তুমি বোঝ না কিছু। আমার নিজের উপর আর বিশ্বাস নেই। তোমার সম্মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মিঃ মোল্লা, আমার সম্পর্কেও কি আপনার অ্যাটিচিউড্ এই?

না না, ছি ছি! কী বলছেন মিস্ পালিত!

কেন নয় মিঃ মোল্লা? অ্যাম্ আই নট্ এ উওম্যান?

উওম্যান! ফটিক চমকে উঠল। ফটিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফটিক প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাইল। একটা নিপাট অন্ধকার তার সামনে। যে লণ্ঠনটা সে জ্বালিয়েছিল তা কখন নিবে গিয়েছে। হয়তো তেল নেই। আরেকটা লণ্ঠন আছে কোথাও এ বাড়িতে। কিন্তু খুঁজে দেখার উৎসাহ পেল না ফটিক।

আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন মিস্ পালিত।

হাতড়ে হাতড়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল ফটিক। সে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত। টেবিলের উপর আড়াআড়িভাবে দুখানা হাত এবং হাতের উপর মাথা রেখে সে ভাবতে বসল। তার বর্তমান অবস্থাটার একটা হিসেব কষতে লাগল।

এক, তার বাবা থানার হাজতে। অভিযোগ কী? জানা নেই।

দুই, তার বিবিকে চিকিৎসার জন্য শ্বশুর ঝিনেদায় নিয়ে এসেছেন। কী অসুখ? জানা নেই।

তিন, তার পকেট গড়ের মাঠ। ছবি এমন কৌশলে সংসার চালাত, তার পকেটে টাকা রেখে দিত যে সে টেরও পেতো না কোথা দিয়ে কী হয়ে যাচ্ছে। এই কদিনেই ফটিক টের পেয়েছে যে ছবি কেবল তার যৌনতৃষ্ণা মেটানোর অফুরন্ত উৎস নয়, ছবি তার অস্তিত্বেরও ভিত্তি।

ছবি ছবি ছবি! কী হয়েছে তোমার? কেন তুমি ঝিনেদায় এসেছ? কেন তুমি আমাকে চিঠি দাও নি? ছবি! থাক আমার মক্কেল। চুলোয় যাক প্র্যাক্টিস্। আমি কাল সকালের মোটরেই তোমার কাছে চলে যাব। আমি তোমাকে ভালোবাসি ছবি। সত্যি ভালোবাসি। হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারিনে।

আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি মিঃ মোল্লা? আমি কি নারী নই?

এক, আমার বাবা হাজতে। দুই, আমার বিবি অসুস্থ, তিন, আমি প্রায় কপর্দকশূন্য, চার, আমি আমার আশ্রয়দাতার মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে আমার অবাধ্য কামনার শিকার করে ফেলেছি। এবং এবং—

সত্যটা উন্মোচন করতে ভয় পাচ্ছিল শফিকুল।

কই, তার জন্য তেমন কোনও অনুতাপও তো বোধ করছিনে।

এই আমি! এই আমার চরিত্র। খোদা!

তাহলে মিঃ মোল্লা, আমার ব্যাপারে পৃথক ফল হল কেন? আমি আগ্লি বলে?

আমি আপনি আপনাকে আমি কী বলে বোঝাবো মিস্ পালিত? আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুব পবিত্র ধরনের ছিল।

হ্যাঁ, তা তো ছিলই। এখনও আছে। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আনটিল আওয়ার ডেথ্। আমার জিজ্ঞাসা তা নয়। একটু স্পষ্ট করে বলি। আমি ছিলাম আপনার ক্লোজ্ ফ্রেন্ড। আপনি ছিলেন আমার ওন্লি ফ্রেন্ড। এবং উভয়েই আমরা যথেষ্ট সাবালক। এমন কি যদি ধর্মান্তর গ্রহণের ইডিঅটিক ফ্যাকড়াটা আপনাদের না থাকত তাহলে মনে হয় আমার বাবা এবং মা মনে যথেষ্ট দুঃখু পেলেও তাঁদের একমাত্র মেয়ের পছন্দে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব পবিত্রতার ফ্রেমটা ভেঙে মাটিতে একদিনের জন্যও নামতে পারল না কেন? নামতেও তো পারত? ভুল বলুন, অপরাধ বলুন, কিছুই ঘটল না কেন?

কেন? কেন শুনবেন মিস্ পালিত? অকস্মাৎ শফিকুল খুব উৎসাহ বোধ করল। এর জবাব খুব সোজা।

আমি যে তখন বিবাহিত ছিলাম।

সইফুন খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর অ্যাখন বুঝি আপনার তালাক হয়ে গেছে?

সইফুন!

সইফুন হাসতে লাগল।

মিস্ পালিত, বিশ্বাস করুন, এটা একটা অ্যাক্সিডেনট। আমি তন্ময় হয়ে ছবির কথা ভাবছিলাম।

তখন আবছা অন্ধকার। সইফুন চা আর মুড়ি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার নাকে আমার নাকে একটা মিষ্টি চুলের গন্ধ এসে ঢুকল। আমি ভাবলাম ছবি। মুহূর্তে কী হয়ে গেল! আমি ছবিকে বুকে টেনে নিলাম। তার মুখে গালে—আমার আমার বাহ্যজ্ঞান তখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত মিস্ পালিত। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি সইফুন আমার বুকে। সইফুনের ধাক্কাতেই আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। আমি আমি আমি--

থাক থাক মিস্টার মোল্লা, আমাকে আর বোঝাতে হবে না। আচ্ছা, আপনার মনে আছে, আমার এক দিদির বাড়িতে আপনার টিউশনি জোগাড় করে দেব বলেছিলাম?

সেই টিউশানি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল, তা আমি কী করে ভুলে যাব মিস্ পালিত।

এর দ্বারা শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে আপনার কৃতজ্ঞতাবোধ অসামান্য। এবার যা বলি, মনে করতে চেষ্টা করুন। সেই দিদির বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাব বলে আমাদের বাড়িতে একটা 'অড টাইমে' আসতে বলেছিলাম। মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, আমার একটু অবাক লেগেছিল।

আপনি কলিং বেল টিপলে আমিই এসে দরজা খুলেছিলাম? মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, মনে পড়ছে মিস্ পালিত, কী অপূর্ব দেখতে লাগছিল আপনাকে, আপনাকে আমি চিনতেই পারছিলাম না। মানে ক্লাসে আপনি শুধু সাদামাটাভাবে যেতেন তো। আপনাকে খুব সুন্দর লাগছিল।

থ্যাংক ইউ ফর দি কম্প্লিমেন্ট। যদিও সেদিন আপনি কিছুই বলেননি। আর কিছু মনে পড়ে?

হ্যাঁ, আমি এক গ্লাস পানি খেতে চাইলাম।

তারপর?

আপনি নিজেই পানি এনে দিলেন।

হ্যাঁ জলের গেলাসটা আমিই আপনার হাতে তুলে দিলাম। তারপর?

পানির গেলাসটা নিতে গিয়ে আপনার আঙুলে আমার আঙুল ঠেকে গিয়েছিল।

মনে আছে তাহলে? তারপর?

আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম মিস্ পালিত।

ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন? কেন?

আপনার হাতে আমার হাত ঠেকে যাবার বেয়াদবিতে।

ও তাই ভয় পেয়েছিলেন।

জে হ্যাঁ।

আমি তারপর কী বলেছিলাম, মনে আছে?

আপনি বলেছিলেন, সেদিন আর দিদির বাড়ি যাওয়া হবে না এবং সেজন্য আপনি দুঃখিত।

আপনার মেমারি খুব শার্প্ মিঃ মোল্লা। আপনি খুব ভালো উকিল হতে পারবেন।

ঠাট্টা করছেন মিস্ পালিত?

না। তারপর?

কেন যাওয়া হবে না, তাও বলেছিলেন।

কী বলেছিলাম?

বলেছিলেন, বাড়িতে আপনি একা আছেন। বাবা মা নেমন্তন্নে গিয়েছেন। এমন কি রাঁধুনী চাকররা পর্যন্ত নেই। ছুটি নিয়ে সবাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে। সকলের হয়ে আপনি একা বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন।

আর কি বলেছিলাম?

আর?

বলেছিলাম, ভাবছিলাম এখন যদি চোর ডাকাত কেউ আসে তো আমার তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। ভাগ্যিস আপনি এলেন।

হ্যাঁ একথা আপনি বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন? আপনার বোধ হয় ভয় করছিল।

ভয় না কচু। আমি তো চাইছিলাম একটা ডাকাত আসুক। দেখি সে কী করে?

আপনি খুব রোম্যান্টিক্ মিস্ পালিত। ডাকাত আসুক! কী আকাঙ্ক্ষা!

যা বলেছেন। আমি মাঝে মাঝে ঐ রকম সব আজগুবি ভাবনা ভাবি। তাই কিছুই পাই না। এই ধরুন না সেদিন ভাবছিলাম ডাকাত আসবে। ডাকাত আসেনি। এলেন আপনি।

আপনিই তো যেতে বলেছিলেন।

অস্বীকার করছে কে? আপনি এলেন। তারপর যতক্ষণ ছিলেন সে কী অস্বস্তি আপনার। যেন আপনিই ডাকাতের হাতে পড়েছেন। এই বুঝি প্রাণ যায়! বাবার লাইব্রেরিতে গিয়ে তবু ধড়ে প্রাণ এল।

কী ওয়ানডারফুল কালেক্শন্। এ রকম আমি দেখিনি।

হ্যাঁ, তারপর যতক্ষণ ছিলেন অন্য দিকে চোখ দেবার অবকাশ আর পাননি।

কতক্ষণই বা ছিলাম তারপর?

পাক্কা দু ঘণ্টা।

তাই বুঝি? দু ঘণ্টা! তবু তো কিছুই দেখা হ'ল না। আমার আবদার রাখবার জন্য আপনাকে সেই দু ঘণ্টা সমানে দফতরির কাজ করতে হয়েছে। আচ্ছা আপনি কেন অত পরিশ্রম করছিলেন?

তাহলে কী করতাম? আপনার মুখের দিকে কতক্ষণ আর চেয়ে থাকতে পারতাম। বইগুলো যখন দিচ্ছিলাম, দেখছিলাম ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্য আপনি কী কসরতই না করছেন! সে কী সতর্কতা! আপনাকে সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরই আধুনিক এক ইসলামী সংস্করণ।

সইফুন বলল, আমারে পালি বুকি টানে নেতেন না ফটিক ভাই?

সইফুন ও ব্যাপারটা হঠাৎ হয়েছে। ও কথা আর বল না।

তিনটে তাস নিয়ে ভাঁজতে বসে গেল লতিকা। তারপর ফটিকের টেবিলে উপুড় করে সাজিয়ে রাখল। ফটিক করতলে চোখ চেপে বসে আছে। তবু সব দেখছে।

তুলে নিন মিঃ মোল্লা একখানা একখানা করে। তুলুন। আপনি দুবার চান্স্ পাবেন। দেখি আপনার পছন্দ। ইওর ফারস্ট্ চয়েস্!

শফিকুল তুলল হরতনের বিবি। বলল, হরতনের বিবি।

কুইন্ অফ্ হার্টস। বিবি বিলকিস। টেবিলে চিৎ করে ফেলুন।

শফিকুল তাসটাকে চিৎ করে ফেলল। বিলকিস্ হাসছে।

সেকেন্ড্ চয়েস্, তুলুন মিঃ মোল্লা।

শফিকুল তুলল।

দেখান আমাদের।

শফিকুল তাসখানাকে টেবিলের উপর চিৎ করে ফেলল।

সইফুন! সইফুন!

বাজে কথা! শফিকুল প্রতিবাদ করল। ও তো রুইতনের বিবি।

সইফুন অত্যন্ত খুশি হয়ে হাতে তালি দিতে দিতে লাফাতে লাগল। বাচ্চা মেয়ের মত। সইফুন! সইফুন!

হ্যাঁ, মিঃ মোল্লা! রুইতনের বিবি। ফারস্ট্ চয়েস্ হরতন, সেকেনড চয়েস রুইতন। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। ব্লেসেড্ ইজ্ শী হু বিয়ারস্ এ ফেয়ার ফেস্।

এবার এটাকে তুলি?

না না মিঃ মোল্লা না। যে পরিত্যক্ত তাকে মুখ লুকিয়ে থাকতে দিন।

তোলেন, ইবারে উডারে তোলেন। উনি কিডা এটটু দেখি। বিলকিস বলল।

না না মিঃ মোল্লা, প্লিজ্ ডোন্ট্ টাচ হার। শী ইজ্ রিজেকটেড অ্যানড্ ইউ হ্যাভ ইওর চয়েস্।

তোলেন ফটিক ভাই, উডারে তোলেন।

প্লিজ্ প্লিজ্ মিঃ মোল্লা লীভ হার অ্যালোন্।

ফটিক একটানে টেবিল থেকে তাসটা তুলে চেঁচিয়ে উঠল, মিস্ পালিত মিস পালিত, ইস্কাপনের বিবি।

শান্তভাবে লতিকা বলল, জানি।

তাহলে এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন?

ভয় নয় মিঃ মোল্লা, ওটা আমার একটা অবসেশন্। ইস্কাপনের বিবি হল গ্রাবুর বিবি। কেউ হাতে রাখতে চায় না। আর আমাকে ছোট বেলায় আমার স্কুলের বন্ধুরা গ্রাবুর বিবি বলে খ্যাপাতো। আমি বেশ আগ্লি কিনা তাই।

বাজে কথা। আপনাকে আমার কক্ষনো খারাপ লাগেনি।

খারাপ লাগেনি আমি জানি। কিন্তু ভালো কি কখনো লেগেছে?

অনেক দিনই লেগেছে। কিন্তু—

পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট করার কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি।

সেটা কি ভাল হত?

সইফুনের ব্যাপারটা কি ভাল হয়েছে?

না।

তবু না ঘটে তো পারেনি।

না, তা পারেনি। সত্যি। আমার সংযমের বাঁধ কীভাবে কখন যে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল, তা আমি আদৌ টের পাইনি।

দ্যাট্ মেকস্ অল দি ডিফারেনস, বিদায় ফটিক মিঞা। বিদায়।

মিস্ পালিত, মিস্ পালিত!

কোনও সাড়া পেল না শফিকুল। ওর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ভূতগ্রস্তের মত উঠে পড়ল ফটিক। কেবলই এ ঘরে ও ঘরে ঘুরতে লাগল। কাকে খুঁজছে? ছবিকে? না। সইফুনকে? না। লতিকাকে? না। বিশেষ কাউকে খুঁজছে না। সব মিলিয়ে একজনকে খুঁজছে। এমন একজনকে যে তিনে মিলে এক। ভীষণ ফাঁকা। বেজায় একা। এক যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি দন্তহীন বুড়োর মত তাকে কেবলই মাড়ি দিয়ে চিবুচ্ছে। সইফুন নেই। ছবি নেই। মিস্ পালিত! ফাঁকা ঘর আর অন্ধকার আর সীমাহীন শূন্যতা।

মিস্ পালিত আপনি যা বললেন তার মানে কী সেদিন আমি বুঝিনি। সত্যিই সেদিন আপনার বাড়িটা কেন ফাঁকা ছিল, কেন—আপনার শরীর থেকে সেদিন বিচ্ছুরিত প্রসাধনের রঙিলা সুঘ্রাণ আমাকে ক্রমাগত মাতাল করে তুলছিল, কেন আপনার বাবার লাইব্রেরি থেকে অত বই বয়ে বয়ে এনে অত কাছে ঘেঁষে এসে অত উৎসাহ নিয়ে দেখাচ্ছিলেন। সেদিন আমি এর একটা ইঙ্গিতও বুঝিনি। খোদা কসম একটুও বুঝিনি। আম্ আই নট এ উওম্যান? আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি নে ছবির সংস্পর্শে আসবার আগে উওম্যান বলতে যা বোঝায় সে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞানই জন্মায় নি। আপনি উওম্যান কিনা তখন, এমন কি সেইদিনও, ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু আপনি আমার বন্ধু এটা আমি দিনরাত্রি মনে রাখতাম। আজও তা আমি মনে রেখেছি।

সইফুনের বেলায় আমার সংযমের বাঁধ ভাঙল আপনার বেলায় ভাঙল না কেন? এর যে কারণই থাক আপনি আগ্লি, কুচ্ছিত, এ কোনও কারণই নয়। আসল কারণ এই যে তখন আমি চাষা, আপনি সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর অধিবাসিনী। আপনি আমার স্বপ্নের প্রতিমা। অনেস্ট্ মিস্ পালিত! আপনি সর্বদাই আমার নাগালের বাইরে ছিলেন। আপনি যেন ফেরেশ্তারই মত আলোকময় এক অস্তিত্ব। আপনার দেহ সম্পর্কে কোনও বোধই আমার জন্মায় নি। সম্ভবত আজও আমি তেমন সচেতন নই। অবশ্য বলতে পারি নে। আজ আর আমার কোনও সংযম নেই। এখন আমি আর সেই বালকটি নেই। আমি এখন স্বর্গচ্যুত আদম।

অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ফটিক আলো জ্বালিয়েছিল, সে জানে না। কতক্ষণ ধরে সে এ ঘর ও ঘর তারপর শুধু শোবার ঘরটাতেই পায়চারি করছিল জানে না। হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তীক্ষ্ন দৃষ্টি সার্চ লাইটের মত ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় এসে আটকে গেল যেখানে দুইবাড়ির সীমানা এসে মিশেছে সেইখানে যেখানে সব চাইতে জমাট অন্ধকার অস্পষ্ট একটা মূর্তি গড়ে রেখেছে সেইখানে। তার রক্তে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। খড়কুটোর মত তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল সেইখানে।

জমাট অন্ধকারটা একটুও নড়ল না। হঠাৎ ফটিকের মনে হল সইফুনও খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওর খুব মায়া হ'ল। মৌলবী সাহেবকে বলতে হবে এবার সইফুনের শাদীর যোগাড় করুন। এইভাবে কেউ জীবন কাটাতে পারে? মুসলমান, তা গ্রামেরই হোক আর শহরেরই হোক, মেয়েদের সম্পর্কে নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে সবাই সমান। না ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, দেওয়া হচ্ছে শাদী। বেচারিরা করে কী?

জমাট অন্ধকারটাকে নরমভাবে ডেকে ফটিক বলল, "সইফুন ঘরে যাও। ঘরে যাও। ঘুমিয়ে পড়।"

তারপরই সে জিনিসপত্র গুছাতে লেগে গেল। নাঃ, ভোরের বাসেই সে চলে যাবে। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। তার আগে হরি মুহুরিকে বলে যাবে তার মামলার দিন পিছোবার ব্যবস্থা করতে।

সইফুনের ঘুম ভাঙতে দেরি হল। চোখ থেকে ঘুম ছাড়ছিল না। শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছে। প্রায় শেষ রাতে ঘুমিয়েছে সে। গত রাত্রের যন্ত্রণায় এখন ভাঁটা পড়েছে। গত সন্ধ্যার স্মৃতিটা এখন অনেক ভোঁতা। আসলে ওর বোধশক্তিটাই ঝিমিয়ে আছে। কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত।

হঠাৎ কেমন করে ঘটে গেল ব্যাপারটা। আদৌ প্রস্তুত ছিল না সইফুন। চুম্বকের প্রবল টানে সে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফটিক ভাই-এর বুকে। তারপর সেই লোকটা বুঝি উন্মাদ হয়ে উঠল। কিন্তু কী উষ্ণতা তার বাহুবন্ধনে! কী তীব্র স্বাদ তার উন্মত্ত চুম্বনে! সইফুনের মনে পড়ল। তবে সে আর গত রাতের মত অত উদ্বেল হয়ে উঠল না। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল। কিন্তু সেই তীব্র সুখের মধ্যেও যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি সইফুন, ফটিক ভাই-এর অবুঝ আক্রমণকে যে সে সীমা লঙ্ঘনের আগেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে এবং কেন সরিয়ে দিল তার জন্য সে পরে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে, আজ এখন সে যখন শান্ত তখন তার জন্য আল্লাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠল।

চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে আম্মার কাছে যেতেই ওর মা বললেন, "ও বিটি যাও ছবিগের ঘরগুলো সাফ ক'রে রা'খে আসো গে যাও। ফটিক বাপ চাবিডে রা'খে গেছে?"

"ফটিক ভাই চাবি রাখে গেছেন? গ্যালেন কনে?"

হঠাৎ ঝড় উঠল সইফুনের মনে। এক তীব্র যন্ত্রণা তার নাভিমূল থেকে ধীরে অতি ধীরে উপরে উঠতে লাগল। তার অন্তরাত্মা ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল। মায়ের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে নিল।

"আজ ভোরে জরুরি ডাকে ঝিনেদায় চলে গেছে। ছবির খুব অসুখ।"

ছবি-বু মরুক! ছবি-বু মরুক! আম্মার সামনে থেকে অতি কষ্টে এক-পা দু-পা করে সরে গেল সইফুন। তারপর চাবি হাতে একেবারে দৌড় দিল। ঘর খুলে ফটিকের বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে সইফুন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলল, ছবি-বু তুমি, ছবি-বু তুমি—। তারপর সে কেঁদে ফেলল।

॥ ১১ ॥

ফটিককে অত সকালে হাজির হতে দেখে বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল। ছবি খুব অবাক। সে ভাবতেই পারেনি, ফটিক আসবে। ইয়াকুব বাড়িতে ছিল না, একটু আগেই কোথায় যেন বেরুল। ইয়াকুবের বাপ, হাজী সাহেবের ভগ্নীপতি, ইসমাইল হোসেন অর্থাৎ দুদু মিঞা ভেরেণ্ডার নরম ডালটা দাঁতের চাপে থে'তো করে বেশ একটা আয়েসী দাঁতন সবে বানিয়ে নিয়েছেন, এমন সময় দেখেন কুটুম, কুটুম বলে কুটুম, সাক্ষাৎ জামাই। উনি ভুলেই গেলেন যে ওঁর গাল ভর্তি দাঁতনের কুচিগুলো ফেলে দেওয়া হয়নি। ফটিকের মুখ থেকে আস্‌সালামু আলায়কুম বের হতে না হতেই দুদু মিঞা ফস করে মুখ থেকে দাঁতন কাঠিটা বের ক'রে নিয়ে এমনই আত্মহারা হয়ে ফটিককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং এমন তোড়ের সঙ্গে সালাম ফেরত দিলেন যে দুদু মিঞার মুখ থেকে ফটিকের উপর শুধু যে শান্তির বাণীই বর্ষিত হল তাই নয় সেই সঙ্গে অজস্র দাঁতন-কুচিও বেরিয়ে এসে ফটিকের মুখে, দাড়িতে, পিরেনে অবিরাম বর্ষিত হতে থাকল।

বিপর্যস্ত ফটিক দাঁতন-কুচির প্রবল বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কী উপায় অবলম্বন করবে কিছুতেই যখন ভেবে পাচ্ছিল না তখন হাঁকডাক শুনে হাজী সাহেব বেরিয়ে আসতেই ফটিক পরিত্রাণের পথ পেয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ দুদু মিঞার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে শ্বশুরকে কদমবুসি করল। এবং দু-হাত দিয়ে সর্ব শরীর থেকে দুদু মিঞার মুখনিঃসৃত দাঁতন-কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে শ্বশুরকে ওর বাপের কথা জিজ্ঞেস করল।

ততক্ষণে ভিতর বাড়িতে খবর রটে গিয়েছে।

নয়মোন ছবির কাছে গেলেন। বললেন, "ও শাউড়ি শুনিছ, জামাই আ'সে গেছেন।"

ছবির মুখ চোখ দেখেই মনে হচ্ছিল সে খুব খুশি হয়েছে।

"শুনিছি। তা অ্যাখন কী করব, বাড়িময় কাড়া দিয়ি বেড়াবো?"

নয়মোন হাসলেন। "অদ্দুর যাবার দরকার নেই। ইবার বিছানা ছাড়ে ওঠো দি'নি মণি। হাত মুখ ধুয়ে সাফসোফ হয়ে ন্যাও। আমি তুমার ফুফুর সঙ্গে জামাইর নাস্তার জুগাড় করে ফেলি।"

"জামাই তো না, য্যান নবাব বাহাদুর! আসামাত্তর খেদমতের জুগাড় শুরু হল। অ্যাখন খালি জামাই আর জামাই। ক্যান আমরা সব কি বানের জলে ভাসে আইছি?" ছবি হেসে ফেলল।

"শাউড়ির যত খুনসুটির কথা! ন্যাও মণি, চটপট বিছানাটা ঠিক করে ফ্যালো।"

হাজী সাহেব দাওয়ায় শতরঞ্চি বিছিয়ে জামাইকে নিয়ে বসলেন। ভিতর থেকে দু-বাটি গরম চা-পানি এসে গেল। দুদু মিঞা ততক্ষণে একটা খাসীর যোগাড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। গামছার উপর গরম বাটি বসিয়ে হাজী সাহেব উস্‌প্ উস্‌প্ করে চা-পানিতে চুমুক দিচ্ছিলেন।

ফটিক বাটিটা ঠাণ্ডা হবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

হাজী সাহেব বললেন, "আল্লার রহমতে কাল সন্ধ্যের মধ্যিই তুমার বাপ আর অন্যাগের জামিন দিয়ে বের ক'রে আনিছি। উরা সব কা'ল রাত্তিরই বাড়ি চলে গেছে।"

শফিকুল জিজ্ঞেস করল, "কাদের কাদের ধরেছিল?"

"সব তুমাগের পাড়ার। বশির, খাদু, জমির, গয়া, এগেরেই ধরে আনিছিল। সবাই তুমার বাপের সাগরেদ।"

"তা ওদের", শফিকুল জিজ্ঞাসা করল, "অপরাধ কী?"

হাজী সাহেব বললেন, "দারোগার ফাজলেমি। আমারে কয় কি, ওসব ধারা-ফারা আমারে বেশি জিজ্ঞাসা করবেন না। সরকারী আইনির বইতি অ্যাত ধারা আছে যে গুণে শেষ কত্তি পারবেন না। ধারার কথা আমারে জিজ্ঞেস করবেন না। আপনাগের গিরামে ফুটবল ম্যাচ হবে। তার আগে ওগের কারুরিই ছাড়া হবে না। দরকার হলি শান্তিভঙ্গ যাতি না হয় তার জন্যি গিরামে ১৪৪ ধারা জারি করে দেব। ছোট দারোগা সুবল গড়াই আড়ালে ডা'কে নিয়ে যা'য়ে ক'লো, শওকৎ আলি দারোগা খালি টাকা চেনে। আপনাগের গিরামের মেন্দা আর গুপাল বিশ্বেস মিঞা সায়েবরে মুটা খাওয়ায়ে গেছে। মেন্দা আর গুপাল সব সুমায় বড় গাছে দড়া বাঁধে। থানায় দারোগা আলিই ভেট। আজ ইডা কা'ল উডা। দিয়েই যাচ্ছে। তা তাগের দিকটা তো দেখতি হবে। তাই তাঁরা যা কয়ে পাঠাচ্ছেন ইনি তাই ক'রে যাচ্ছেন। বড়বাবু কিচ্ছু করবে না আপনি সি আই সাহেবের কাছে যান। তারপর সি আই সাহেবরে নিয়ে খোদ ডি এস পি সাহেবরে ধরেন গে। জামিন হয়ে যাবে। তা তাই হ'লো শেষ পর্যন্ত।"

শফিকুল একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ছবি কেমন আছে? ভাবল শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে। করল না। একটু বাধ-বাধ ঠেকলো তার। হঠাৎ ছাগলের পরিত্রাহি ম্যা ম্যা চিৎকার শুনে ফটিক চেয়ে দেখে মুখে দাঁতন দুদু মিঞা একটা হৃষ্টপুষ্ট খাসীর দড়ি ধরে তাকে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে আনছেন।

একটু পরেই ফটিক অন্দরে যেতেই ছবি এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। ফটিক দু-হাতে ছবিকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

"কী দেখতিছেন অমন ক'রে?" ছবি হাসল।

ফটিক দেখল ছবির হাসি কিছুমাত্র বদলায়নি। এবং হাসলে তাকে আগের মতনই সুন্দর দেখায়।

ফটিক বলল, "কই, তুমি তো তেমন ভালো হওনি?"

ছবি বলল, "ক্যান, আমারে কি খুব রুগা দ্যাখাচ্ছে? আগের মতন?"

"না ছবি," ফটিক হাসতে হাসতে বলল, "আগের চাইতে অনেক ভালো হয়েছ।"

ছবি খুশি হল। "ঝিনেদায় আমার মন টেঁকে না।"

"আমারও ছবি, আমারও।" ফটিক সত্যিই বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। "একা একা আজকাল থাকতে বড় কষ্ট হয়।"

"আমি তা'লি আপনার সঙ্গে চলে যাই। কী কন? বউ বিটির কব?"

ফটিক বলল, "ডাক্তার যদি বারণ না করেন তবে। তাঁর কথাই শুনতে হবে। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিই।"

ছবির মুখের আলো খানিকটা নিবে গেল।

নয়মোন বাইরে থেকে ডাকলেন, "ও শাউড়ি শোনো?"

ছবি বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে নয়মোন আর জয়নবকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ফটিক নয়মোনকে সালাম করতেই নয়মোন বললেন, "ছবির ফুফু।" জয়নবকে সালাম করল ফটিক। ওঁরা দুজনে সেই ঘরেই ফটিকের নাস্তা করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ফটিক সবে নাস্তা খেতে শুরু করেছে এমন সময় ইয়াকুব চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল, "বটে বটে ছবির খসম আয়েছে। দেখি দুলা মিঞার চিহারাখান?"

ইয়াকুব ঘরে ঢুকেই ফটিককে সালাম জানাল। ফটিকের মুখে তখন আণ্ডা পরটা। ও বাধ্য হয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে কাজ সারল।

ইয়াকুব বলল, "আমারও ক্ষিধে লাগিছে। এই বিল্লী, যা আমার নাস্তাউ এখেনে নিয়ে আয়। খাতি খাতিই দুলা মিঞার সঙ্গে ভাবটা জমায়ে ফেলি।"

বিল্লী! ছবির মুখখানা চট করে লাল হয়ে গেল। অতি কষ্টে সামলে গেল ছবি।

"তুমি আমারে বিল্লী ক'লে?"

"অ্যাঁ কইছি বুঝি!"

"জে হ্যাঁ, বিয়াকুব ভাই কইছ।"

"বিয়াকুব ভাই! তুই আমারে বি য়া কু ব ক'লি!"

ছবি নিরীহ স্বরে বলল "কইছি বুঝি? তা'লি শোধবোধ। তুমার নাস্তা আনে দিই, খাও।"

ইয়াকুব বলল, "দ্যাখলেন তো মানে শোনলেন তো! আমারে বিয়াকুব ক'লো। অ্যাখন যদি আমি এই নিয়ে নালিশ জানাই, কোনও ইনসাফ পাব না। সব ঐ নানীর জন্যি। নানী আদর দিয়ে

দিয়ে ঐ বিল্লীটারে মাথায় তুলিছে। আর আপনারউ বলিহারি যাই দুলাভাই, বাছে ষাছে আমাগের বিল্লীটারেই শাদী করলেন! আঁচড় কামড় অ্যাখনউ দ্যায় নি তাই! দিলি বোঝবেন বিল্জ্ বিলকিস বেগম ক্যামন—"

বিলকিস নাস্তা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ইয়াকুবের দিকে চাইল।

ইয়াকুব ভালো মানুষের মত বলে উঠল, "বিলকিস আমাগের সুন্দর মেয়ে।"

"আমাকে বিল্লী বলেছে?" বিলকিস ফটিকের দিকে চাইল।

ফটিক জবাব না দিয়ে চুপ করে খেতে লাগল।

ইয়াকুব বলল, "দ্যাখ ছবি আমাগের দুলাভাই লোক বড় ভালো। এরে বিয়ে ক'রে ভালোই করিছিস। সেই দিব্যকান্তি মার্জিতরুচি মিশিরীয় যুবক—"

"ইয়াকুব ভাই!"

ছবি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বেজায় রেগেও গেল।

"আব্বাস ছোড়াডারে ছবি তো বিয়ে করেই ফেলিছিল। নিতান্ত দিব্যকান্তি আর মার্জিতরুচি কথা দুটোর মানে বুঝিতি পারেনি তাই। তাই না বিললু?"

"ইয়াকুব ভাই! বউ বিটি! ফুফু!"

ফটিক দুজনের কাণ্ড দেশে বেশ মজা পাচ্ছিল। আরও আশ্চর্য, বিলকিস কেমন তরতর করে বালিকা হয়ে যাচ্ছে! কী প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে। ফোঁস ফোঁস করে ফুঁসছে।

নয়মোন আর জয়নবকে ঘরে ঢুকতে দেখে ইয়াকুব নিতান্ত ভালো মানুষের মত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দুলাভাই মিশরে কোন পথে যাতি হয়, জানেন?"

বউবিটি আর জয়নবকে দেখে বিলকিস বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, "দ্যাখো ফুফু তুমার ছাওয়াল যা তা কতিছে?"

"এই শয়তান", জয়নব ছেলেকে ধমকালেন, "এই শয়তান, বড় হলি তবু তোর স্বভাব বদলালো না। ছোট বুনির পিছনে লাগতি লজ্জা করে না!"

"তুমরা তো বিজায় একচোখা।" ইয়াকুব নিপাট ভালো মানুষের মত বলল, "বিল্লীরি জিজ্ঞেস করোদিন কী যা তা কথা কইছি? আমাগের দুলাভাই লোক বড় ভালো, এই কথাডার মধ্যি যা তা কথা কোনডে হ'ল ওরে জিজ্ঞেস কর।"

নয়মোন আর জয়নব এবার বিলকিসের অপ্রস্তুত মুখের দিকে চাইলেন। বিলকিসও অনেকটা চুপসে গেল।

ঢোঁক গিলে বলল, "আহা য্যান ঐ কথাডাই খালি কইছেন?"

ইয়াকুব বলল, "তা'লি, এ'রে শাদী ক'রে ভালোই করিছিস, এইডে কি যা তা কথা হ'ল?"

এবার বিলকিসের পিছোবার পালা। সে জয়নবের পিছনে গিয়ে তাঁর আঁচল নিয়ে খেলা করতে লাগল।

বলল, "না গো ফুফু, কথা ঘুরোয়ে নেচ্ছে।"

ইয়াকুব বলল, "এই তো দুলাভাই সাক্ষী। আমি কলাম দুলাভাই লোক বড় ভালো রে ছবি। এ'রে শাদী ক'রে ভালোই করিছিস। তাই শুনে বিলকিসবিবি চ্যাঁচায়ে পাড়ার লোক জড় ক'রে ফলেন, আমি যা তা কথা কতিছি। ঠিক কি না দুলাভাই? ইডা তা'লি যা তা কথা হল?"

বিলকিসের মনে হল তার এই অবস্থায় ফটিক যেন বেশ মজা পাচ্ছে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ওর মুখখানা।

বলল, "আহা, আমি বুঝি তাই কইছি।"

"তা'লি আমিই বা কোন কথাডা কইছি যারে তুমি যা তা কথা বলে পাড়া মাথায় কত্তিছ?"

ছবি মুখ গোঁজ করে বলল, "কব না যাও।"

ইয়াকুব হেসে ফেলল। "তা'লি হারুয়া বিল্লী, যাও, আমারে একখানা গরম পরোটা আনে দ্যাও।"

ছবি দ্রুতগতি রান্নাঘরে চলে গেল। হাসতে হাসতে নয়মোন জয়নবও। একটু পরে ছবি একখানা পরোটা এনে ইয়াকুবের থালায় রেখে দিল।

"বোঝলেন দুলাভাই", পরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইয়াকুব বিজ্ঞের মত ফটিককে বলতে লাগল, "আমাগের ছবির বিয়ারিংটা একটু ঢিল, নয় তো মেয়ে খুবই ভালো।"

তারপর পরোটার টুকরোয় দুটো কামড় দিয়েই ইয়াকুব বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল, "আল্লাহ্ জান গ্যালো উস্ উস্ উস্ বুক জ্বলে গ্যালো, উস্ উস্ উস্ ও আম্মাজান, ওগো মামী জিব জ্বলে গ্যালো। বিল্লী কী খাওয়ায়ে দেছে। ও বাপ, জ্বলে গ্যালো।"

"কী হলো কী হলো?" নয়মোন আর জয়নব ইয়াকুবের প্রাণভেদী চিৎকার শুনে ছুটে এলেন।

ইয়াকুব জিভ বার করে শোষাচ্ছে আর বিকট আওয়াজ ছাড়ছে। ফটিক শঙ্কিত। ছবি বাচ্চা মেয়ের মতই ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, "নাগো ফুফু, ত্যামন কিছু হয়নি। ভাই-এর পরোটায় একটু লঙ্কার গুঁড়ো ছড়ায়ে দিছি। শুধু শুধু পাড়া মাথায় কত্তিছে। এটটু তেঁতুলগুলো খাবা ইয়াকুব ভাই?"

ইয়াকুব কটমট করে তাকাতেই বিলকিস বলল, "শোধ হয়ে গ্যালো।"

ইয়াকুবের ঐ শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও বিলকিসের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

ইয়াকুবকে যথার্থই ভালো লেগে গেল ফটিকের। তার সুশ্রী চেহারা, তার চটপটে ভাব, তার ছেলেমানুষী, ছবির এবং ইয়াকুবের মধ্যে এই যে সহজ সরল সম্পর্কের প্রকাশ সব মিলে ফটিকের মনে জমা গ্লানিটাকে হাল্কা করে দিল। বিল্লী! ফটিকের মনে পড়তেই সে খুব মজা পেল। কী ক্ষেপেই না যেতে পারে বিলকিস। ছবির এই চরিত্রের পরিচয়টি সে আগে আর পায়নি। যাই হোক, সেই সকালটা তার খুব ভালোই লাগছিল। আর সেই সংগে মনের গভীর তলদেশ দিবে বয়ে চলেছিল এক অনুশোচনার স্রোত। ইয়াকুব আর ছবির মধ্যে যে সম্পর্ক, তার আব সইফুনের মধ্যেও তো এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত! ফটিক মনে মনে স্থির করল, ফিরে গিয়ে সইফুনের কাছে সে ক্ষমা চাইবে। তারপর তার ভয় সংকোচ সব ভাঙাবে। সে এই রকম নির্মল একটা সম্পর্ক গড়ে তুলবে সইফুনের সংগে।

নাস্তা খাওয়ার পর ইয়াকুব ফটিককে নিয়ে তার ঘরে ঢুকল। ছবি এখন সেই ঘরেই শোয।

ঘরে ঢুকে ইয়াকুব জিজ্ঞেস করল, "ভাই সাহেবের কি সিগারেট চলে?"

ফটিক বলল, "না। আজকাল চলে না।"

"আমি যদি খাই, গুরুজন হিসেবে ভাই সাহেবের কি আপত্তি হবে?"

ফটিক হাসতে হাসতে বলল, "কিছুমাত্র না।"

ইয়াকুব ডাকল "ছবি! বিলকিস বেগম!"

ছবি আসতেই ইয়াকুব বলল, "একটা সিগারেট দে।"

ছবি অপ্রস্তুত হয়ে ফটিকের মুখের দিকে চাইল।

ইয়াকুব বলল, "লজ্জা কী। দে। উকিল সাহেবরে তার বিবির সব গুণির কথা জানায়ে দিচ্ছি। তুমিই যে আমারে সিগারেট খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে পাকায়ে দেছো দুলা মিঞা সিডা জা'নে গেছেন। অ্যাখন একটা কাঠি বের করে দ্যাও দিনি মণি!"

ইয়াকুব ঢাকা থেকে বি. এ. পাশ করেছে সদ্য এবং চাকরির সন্ধানে ঘুরছে। ওর বাপ দুদু মিঞা চামড়ার ব্যবসায় বিলক্ষণ দু-পয়সা করেছেন। ঝিনেদা শহরে বেশ খান কয়েক বাড়ি। বসত বাড়িটা পাকা, বেশ বড় এবং ঘাট বাঁধানো পুকুরও একটা আছে। তিন মেয়ের ছোট ছোট অবস্থাতেই শাদী দিয়ে দিয়েছেন। বাকি মাত্র ইয়াকুবের। একটা ভাল সম্বন্ধও এসেছে। মেয়ের বাপ ঢাকায় বড় পদের সরকারী অফিসার। এক মেয়ে। ক্লাস এইট-নাইনে পড়ে। মেয়ের চাচাতো ভাই ইয়াকুবের ক্লাস ফ্রেনড। মেয়েব মায়ের ইয়াকুবকে খুব পছন্দ। ইয়াকুব সাহিত্য চর্চা করে। কবিতা লেখে। ছবি তার ভক্ত পাঠিকা। মেয়ের বাপ কথা দিয়েছেন, ইযাকুব তাঁর মেয়েকে শাদী করতে রাজী হলেই তাকে একটা ভাল পোস্টে ঢুকিয়ে দেবেন। ইয়াকুবের এ ব্যাপারে আপত্তি নেই। তবু শর্তসাপেক্ষ শাদী, এই কারণে তার মনটা খচখচ করছিল।

সিগারেট টানতে টানতে এ-কথা সে-কথায় তার মনের খচখচানিটার কথা ফটিককে জানাবে ভাবল। এই লোকটাকে তার ভাল লেগে গিয়েছে এর মধ্যেই। বিল্লীর লাক ভাল। খসমটা ভালই পেয়েছে।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে ইয়াকুব বলল, "ভাই আপনার সংগে আমার অ্যাকটা কথা আছে। পারসোন্যাল। আসলে অ্যাকটা পরামর্শ চাই।"

বিলকিস উঠে যাচ্ছিল। ইয়াকুব বলল, "বিল্লী বেগম, সরি, বিলকিস বেগম মত্ যাও। বইঠো। ওখেনে ব'সে থাকো। কিন্তু মুরুব্বিগের কথার মধ্যি ফোড়ন কাটবা না। যদি কাটো, তা'লি কেয়ামতের দিনে যখন জাহান্নামে বড় বড় কড়াইতি না-পাকীগের পাক করা হবে তখন আল্লার হুকুমি ফেরেশতারা তুমারে হাশরের ময়দানের থে তুলে নিয়ে গিয়ে এ-কড়াইতি সে-কড়াইতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফোড়ন দিয়ে দেবে নে। বুঝিছ?"

"কবা তো ঢাকাই বিবির কথা," ছবি ফোঁস করে উঠল। "শুনতি আমার বয়ে গেছে। আমি ফুফুর কাছে চল্লাম। ঘরজামাই হবার সাধ হইছে!" মুখ ঘুরিয়ে বিলকিস অন্দরে চলে গেল।

"দ্যাখলেন ভাই!" ইয়াকুব বিপন্ন হয়ে ফটিকের কাছে আবেদন করল, "শোনলেন ভাই আপনার বিবির কথা। এই বিচ্ছুরি নিয়ে আপনি ঘর করেন! উঃ!"

ফটিক ভাবল, আমি কেন মেয়েদের সংগে এমন সহজ হতে পারিনে। সইফুনের সংগে তো এমন সম্পর্ক হতে পারত!

"আপনার সমস্যাটা কী?" ফটিক আসলে উঠতে চাইছিল।

"ভাই প্লিজ, আমারে আপনি কবেন না। আমি অনেক ছোট। তাছাড়া আপনারে আমি যখন মুরুব্বি মানিছি, আমি হলাম আপনার মুরিদ। আমারে তুমি কবেন।"

ফটিক হাসল। বলল, "মুরুব্বি হবার কোনও যোগ্যতাই আমার নেই ভাই। আমি যে কাজে হাত দিই সেই কাজই পণ্ড হয়। যাক সে কথা, উকিল তো বটি অতএব তোমার সমস্যা নির্ভয়ে বল।"

ইয়াকুব বলল, "দ্যাখেন, ব্যবসাট্যাবসা আমার মগজে ঢোকে না। চাকরিই আমাকে স্যুট করে। আমার এক বন্ধু, আমরা একসঙ্গেই বি. এ. পাশ করিছি তার চাচা আমাগের দুজনরেই চাকরিতি দিতে চান। কেবল আমার ক্ষেত্রে একটা কনডিশন। সেটা এই যে তাঁর মেয়েরে শাদী কত্তি হবে।"

"তা এতে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে কোথায়? তুমি কি শাদী করতে নারাজ?"

"না না শাদী কত্তি একটুও নারাজ নই ভাই। আমার আপত্তি কনডিশনে। কেমন যেন একটা হীনতার ভাব আছে এর মধ্যে। তাই না?"

ফটিক জবাব দিল না। কিন্তু তরুণ এই তাজা প্রাণের খচ্‌খচানির স্বরূপটা বেশ বুঝতে পারল।

"তবে ও মেয়েকে শাদী করার দরকার কী?"

ইয়াকুব বলল, "এই কথাটাই ভাই মনের মধ্যি তোলপাড় করতিছে। শাদী করার দরকার কী? সঙ্গে সঙ্গে মনে হতিছে, ইয়াকুব তুমি মুসলমানের ছাওয়াল। ল্যাখাপড়া শিখিছ। কিন্তু মুরুব্বি না থাকলি চাকরি পাবা না। নিজের হিম্মত সম্বন্ধে আপনার মত আত্মবিশ্বেস আমার নেই ভাই। ছাত্তরই তেমন ভাল না। ভাবিছিলাম বি সি এস পরীক্ষে দেব। তা উডা হিন্দুগের অ্যামন একচেটে যে ওখেনে মুসলমানের ছাওয়াল যায়ে কী দাঁত ফুটোতি পারবে?"

ফটিকের ব্যথার জায়গাটা ইয়াকুব অজানতে খুঁচিয়ে দিল।

"আত্মবিশ্বাস!" ফটিক বেদনাভরা গলায় বলে উঠল, "ওটা নিছক মরীচিকা। আত্মসম্মান গরিবের কাছে একটা বহুমূল্য আসবাব। ইয়াকুব তোমার ঘরে তবু দু-দিনের খাবার সংস্থান আছে। আমার তাও ছিল না। কিন্তু দম্ভ ছিল রাজা-বাদশার মত। নিজের পায়ে দাঁড়াব। উকিল হব। শ্বশুর আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। আমি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। বাপের বোঝা হইনি, শ্বশুরের বোঝা হইনি। আমার এক বান্ধবী অকাতরে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। সেই সাহায্যও ফিরিয়ে দিয়েছি। তাঁর প্রাণেও ব্যথা দিয়েছি। কোনও সাহায্য নিইনি। কেন? না নিজের পায়ে দাঁড়াব। তুমি বলছ আত্মবিশ্বাস, আমি তাই ভাবতাম। আমার বান্ধবী, একসঙ্গেই ওকালতি পড়তাম, বলতেন গোঁয়ো ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেকস, এখন দেখছি তিনিই ঠিক। আজ এক বছরের উপর কীভাবে আমার চলছে, জানো? স্রেফ তোমার মামুর মাসোহারায়। নিজের পায়ে দাঁড়াব! হুঃ! আত্মসম্মান নিয়ে থাকব! হুঃ! আত্মবিশ্বাস! হুঃ!"

ইয়াকুব হাঁ করে ফটিকের দিকে চেয়ে রইল। একেবারে নির্বাক।

ফটিক ইয়াকুবের দিকে চেয়ে হাসল।

ক্লান্ত স্বরে বলল, "আমিও ঘরজামাই ইয়াকুব। কোনও শর্ত ছাড়াই। তুমি তো জানো, তোমার মামু কত বড় মাপের মানুষ। আমি ওঁর জামাই নই, ছেলে। সত্যিই ছেলে। তবু আমার মনের খচখচানি যায় না। যখনই ওঁর টাকায় সংসার চলে, তখনই মনে হয় আমি একটা ফেলিওর, এ ড্যাম ফেলিওর। যে নিজে ফেল করে সে অন্যের সমস্যার সমাধান কী দেখাবে?"

ইয়াকুব ফটিকের দু-খানা হাত চেপে ধরে বিষণ্ণ স্বরে বলল, "মাফ করেন ফটিক ভাই! আমি না জানে আপনারে ব্যথা দিয়ে ফেলিছি।"

"আরে না না। তোমার কসুর কী, যে মাফ চাইছ।" ফটিক বলে উঠল। "কসুর যদি কিছু হয়ে থাকে তা বরং আমার। আমার তো এখন মনে হয় ছবির অসুখের মূল কারণও হয় তো আমি। ছবির ধারণা ওকে, ওর বাবা-মাকে আমি আপন করে নিতে পারিনি এবং তার জন্য ছবি নিয়ত নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে। কিন্তু এটা যে আপন করা বা না-করার প্রশ্ন নয়, এটা যে আত্মাভিমানের প্রশ্ন, মেয়েদের পক্ষে পুরুষের এই মনোভাব বোঝা সম্ভব নয়। তুমি ইয়াকুব পুরুষ, তাই কনডিশনাল শাদীর প্রস্তাবে তোমার ইগো চোট খাচ্ছে। তাই তোমার মন এত খচ্‌খচ্‌ করছে। আসলে কি জানো, মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল জীব। নিজের পায়ে ফায়ে দাঁড়ানো ফাঁড়ানো, এইসব ব্রাভাডো মানুষের সমাজে খুব একটা কাজে লাগে না। বরং তুমি কারো না কারো সাহায্যে আগে দাঁড়িয়ে নাও এবং পরে ক্ষমতা হলে অন্যকেও দাঁড়াতে সাহায্য কোরো।"

"হ্যাঁ ফটিকভাই, আমাগের কলেজে ইয়ং মোসলেম অ্যাসোসিয়েশন-এর মেমবর হিসাবে আমরা ভাউ নিয়েছি," ইয়াকুব বলল, "আমাগের তহ্‌জীব তমদ্দুন রক্ষার জন্য এবং কওমের তরক্কির জন্য জান লড়িয়ে দেব।"

"ভাল খুব ভাল। তবে কওমের মত বড় ব্যাপারের কথা আমি বলিনি, আমি বলছি," ফটিক বলল, "তোমার মত, আমার মত রক্ত-মাংসের মানুষগুলোকে সাহায্য দেবার কথা।"

ইয়াকুব বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার হবু শ্বশুরের ব্যাঙ্কিং-এ চাকরি পাচ্ছি, সে তো আমি মুসলমান বলে। কওমের—"

ফটিক বাধা দিয়ে বলল, "তোমার হবু শ্বশুর তোমাকে ব্যাক করবেন তুমি তার হবু জামাই বলে। আর কোনও কারণে নয়। আমি তোমাকে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে বলছি।"

ইয়াকুব একটু লাল হয়ে উঠল। সে চুপ করে গেল। ফটিক ওকে অপ্রস্তুত হতে দেখে বলল, "লজ্জা পাবার কিছু নেই ভাই। ফ্যাকট ইজ ফ্যাকট। এগিয়ে থাকা সমাজের নেতারা যদি বিবেচক

হতেন, দূরদর্শী হতেন, সত্যকে স্বীকার করার মত সাহস এবং পরকে আপন করার মত প্রবল ভালোবাসা যদি তাঁদের থাকত তাহলে পেছিয়ে পড়া মানুষেরা নিজেদেরকে এত বঞ্চিত মনে করত না। চাচা আপন বাঁচা, এই নীতিরও কোনও দরকার হত না। কিন্তু আমাদের বিধিলিপি এই যে তা হবার নয়।"

ইয়াকুব বলল, "আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি চাতিছেন যে হিন্দুরা দেবতা হবে। তারা নিজের যে স্বার্থ তা ছাড়ে দেবে। এ আবার হয় না কি? এ জগতে কেউ কারো স্বার্থ ছাড়ে না। হক আদায় করে নিতি হয়। আমরা যে এই বাংলায় সংখ্যায় বেশী, আমাগের শক্তিও বেশী, আমরা মুর্খামীর বশে তা ভুলে ছিলাম। ঢাকা আমাগের চোখ খুলে দেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির হিন্দুরা মক্কা ইউনিভার্সিটিই কন আর ফক্কা ইউনিভার্সিটিই কন এই ঢাকাই বাংলার মুসলমানের চোখ ফুটোবে, ফুটেছে, তারে জাগাবে, জাগাচ্ছেও। আপনি ঢাকায় গেছেন ভাই?"

"না।" ফটিক বলল, "কলকাতাই আমার আলমা মাটার।"

ইয়াকুব বলল, "ঢাকায় গেলি বোঝতেন, বাংলার মুসলমান কত দ্রুত জাগছে। ঢাকা তাই আমার খুব ভালো লাগে। কলকাতা আপনার কেমন লাগে ফটিকভাই?"

"কলকাতা?" ফটিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। "কলকাতায় গেলে আমি হারিয়ে যাই। শিয়ালদা ইসটিশনে পা দিলেই একটা প্রবল স্রোতে কিছুক্ষণ বেশ ভেসে যাই, এক এক সময় ভাবি, এবার বোধ হয় মোহানায় পৌঁছে যাব। কিন্তু না, প্রতিবারের মত ধাক্কা খেয়ে চমক ভাঙে। চেয়ে দেখি এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর। আর আমি তার মধ্যে শিবু সওদাগরের মত বসে আছি। একেবারে একা। চরটা দেখি প্রতিবারই বাড়ছে। আর যা ছিল একটা প্রবল বেগবতী ধারা তাকে এই বিভাজক বালুর চরটা ক্রমশ দুটো শীর্ণ বেণীতে পরিণত করে তুলছে। চরটা যত বাড়ছে, দুটো স্রোতকে তত ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।"

ইয়াকুব বলল, "কী যে কলেন ভাই, বোঝলাম না।"

ফটিক বিষণ্ণ। বলল, "আমিও বুঝে উঠতে পারিনে। কিন্তু এই ফিলিংটা আমার হয়।"

ফটিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইয়াকুব বোকার মত বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, "যাই বলেন ভাই, ঢাকায় একটা তাজা ভাব আছে। বাংলার মুসলমানের যে একটা চরিত্রও আছে, ঢাকায় সর্বক্ষণ সেটা অনুভব করা যায়।"

হঠাৎ ইয়াকুব একটা আবৃত্তি করল:

স্মার্নার কূলে গ্রীসের দম্ভ সিন্ধু-সলিলে ডালি,
রুদ্র দামাল জিঞ্চু কামাল মুখে দিলে চুণকালি।
দার্দ্দানেলেসে বিজয়-ডঙ্কা তব জয় নির্ঘোষ
ধমনীতে ছোটে তপ্ত শোণিত, খুন-খারাবীর জোশ।
দাঁতে কুটা কাটি বৃটিশ সিংহ মেগে নিল পরাজয়
বিশ্ব মুখরি "জয়তু কামাল" ওঠে রব—জয় জয়!
সে মহা আরাবে যুগের জীর্ণ খেলাফৎ প'ল ধ্বসি'
পচা আচারের বাঁধন টুটিল—মুখোশ পড়িল খসি'।
য়ুরোপের চির-'পীড়িত মানব' নাভিশ্বাসের কালে
নব জীবনের জয়টীকা পরি জাগিল প্রাচীর ভালে।

সত্যিই ইয়াকুব খুব ভাল আবৃত্তি করেছে। ফটিক ইয়াকুবের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তারপর বলল, "মারহাবা মারহাবা! ভালো আবৃত্তি কর তো তুমি।"

প্রশংসায় খুশি হয়ে ইয়াকুব একটা সুখটান দিল হাতের সিগারেটে।

"এই হল গে ঢাকার স্পিরিট ফটিক ভাই, বাংলার নওজওয়ান মুসলিমগের স্পিরিট। কামাল আমাগের নবজীবনের দূত। আমাগের পথ প্রদর্শক। কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই! কবি নজরুল আমাদের মনের কথাডা ক'য়ে দেছেন।"

ইয়াকুব আর ফটিক সারাদিনই প্রায় তর্ক বিতর্কে কাটিয়ে দিল। ফটিকের ইচ্ছে ছিল দুপুরে বাড়ি চলে যাবে। হাজী সাহেব, দুদু মিঞা, ইয়াকুব, নয়মোন, জয়নব, এমন কি ছবির মিনতিভরা দুটো চোখও তাকে আটকে দিল।

কোথায় একটা অস্বস্তির খোঁচা ফটিককে অশান্ত করে তুলছিল। ইয়াকুবরা মনস্থির করেই ফেলেছে যে মুসলিম মেজরিটি বাংলা থেকে হিন্দু আধিপত্য হটাতেই হবে। বাই হুক অর বাই ক্রুক। এবং তাতেই তাদের মুক্তি। অথচ এই সহজ সমীকরণটায় সে কেন সায় দিতে পারছে না?

তাছাড়া আমাগের সামনে একটা সুযোগও আসে যাচ্ছে। ইয়াকুব উৎসাহ সহকারে বলেছিল। সামনেই ইলেকশন ফটিক ভাই। ১৯৩৫-এর গভরমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অ্যাতদিন পরে আমাগের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার প্রচন্ড সুযোগ দেবে। ইয়াকুবের কথা শুনে ফটিকের অবাক লাগছিল। এ আমলের ছাত্ররা কত ভাবে! ইয়াকুব বলছিল, ভোটারদের সংখ্যা বাড়ে যাবে। নতুন হিন্দু ভোটারের সংখ্যা যদি হয় তিন তা'হলি সে জায়গায় নতুন মুসলমান ভোটারের

সংখ্যা হবে চার। আমরা হিসেব কষে দেখিছি। কাজেই ভাই, অ্যাখন মুসলমানগের মুখি অ্যাকটাই নারা হওয়া উচিত, ভাই মুসলমান অ্যাক হও। কওমের কল্যাণে এছাড়া আর পথ নেই।

এছাড়া আর পথ নেই ?

নারা-এ তক্‌বীর—আল্লাহু আক্‌বর। ঢাকায় এছাড়া আমাগের আর নারা নেই।

ছবি তখনও শুতে আসেনি। বিছানায় ফটিক একা। কোনোই সন্দেহ নেই ইয়াকুবের বক্তব্য বা বক্তৃতা আবেগের তোড়ে বেশ জোরালোই ঠেকেছিল তার কাছে।

দীর্ঘদিনের বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত হবার সুযোগ বাংলার মুসলমান আজ পাবে, যদি তারা যে মুসলমান এই আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

একেই ইয়াকুব বলেছিল ঢাকার স্পিরিট্। সম্ভবত এটা মুসলিম কলকাতারও স্পিরিট্। কিন্তু বাংলাদেশের স্পিরিট্ সত্যিই কী এই ? যে বাংলায় মুসলিম মেজরিটি মাত্র নামে ? এই বাংলায় মুসলমান শুধুমাত্র মুসলমান হতে পারলেই তার হক্ আদায় করে নিতে পারবে ?

ছবি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফটিকের কাছে চলে এল। তার হাতে পানের খিলি। চোখ মুখ বেশ উজ্জ্বল।

বলল, "পান খাবেন ?"

ছবিকে দেখেই উঠে বসেছিল ফটিক। ছবি ! ছবি ! ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে আনল। তারপর ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ছবি মিচকি মিচকি হাসতে লাগল।

"পান খাবেন না আমারে খাবেন ? কোন্‌ডারে দেখতিছেন ?"

ফটিক হেসে ফেলল। এ দেখি বেশ কথা শিখেছে।

"আগে তো পানটা খাই। পরের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।"

ছবি হাসল। ফটিকের হাতে পান দিল। এবং ফটিককে পান চিবোতে দেখে পিক্‌দানিটা নিয়ে এল। তারপর ফটিকের দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে লজ্জায় ওর গাল উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠছিল। একটু সামলে নিয়ে ছবি ফটিকের কানে কানে কী বলল। ফটিক স্তম্ভিত। ফ্যাল ফ্যাল করে ছবির দিকে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে অদ্ভুত এক সুন্দর হাসি ফুটে উঠতে লাগল।

"ছবি তুমি মা হবে ? মা !" তার বোকার মত প্রশ্নে অদ্ভুত এক ভালবাসা উথলে উঠল। এবং কেমন এক সুখের আস্বাদে ফটিকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

॥ ১২ ॥

এই প্রথম বিলকিস আগে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই ফটিকের চোখে। ছবি মা হতে চলেছে ! মা ! অ্যাঁ ! আর সে বাপ ! তার বিস্ময় আর বাঁধ মানছে না। ক্ষণে ক্ষণেই সে শিহরিত হচ্ছে। কী করে সম্ভব হল এই আশ্চর্য ঘটনা ! ঠিক তো ? বুঝতে ভুল হয়নি তো ছবির ? দুর্গা ডাক্তার অবিশ্যি ঝিনেদার বড় ডাক্তার। ছবি বলল যে তিনিই বলেছেন, ছবির রোগটোগ ওসব কিছুই না। আসলে ওর বাচ্চা হবে।

ছবির বাচ্চা হবে ! ছবি এখন হামেলা নারী ! ফটিক বুঝতে পারছিল না সে এখন কী করবে ? তার কী করা উচিত ? সে আবেগে অধীর হয়ে একবার ছবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল।

ছবি মিনতি করে বলেছিল, "ছাড়ে দ্যান আমারে। চাপ টাপ লাগে ভাল মন্দ যদি কিছু হয়ে যায় ?" সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ফটিক ছবিকে ছেড়ে দিয়েছে।

"সর্বনাশ ! চাপ লাগেনি তো, ছবি ?"

ছবি ফটিকের মুখের ভাব হ্যারিকেনের আবছা আলোয় দেখে হেসে উঠল খিলখিল করে।

"হাসছ কেন ছবি ?"

"না, কব না।"

"কেন ?"

"আপনি যদি নারাজ হন ?"

"না না, নারাজ হব কেন ? বল তুমি, আমাকে দেখে হাসলে কেন ?"

"আপনারে য্যান ক্যামন বেকুব বেকুব লাগতিছে।"

"তাই বুঝি ?"

"আয়নাডারে আনব ? দ্যাখবেন ?"

ফটিক হেসে ফেলল। "না।"

ছবিও হাসল। "আচ্ছা, বাচ্চা প্যাটের কোন জায়গায় থাকে জানেন ?"

ফটিক বলল, "আমি কী করে জানব ?"

ছবি হাসল। "তালি আর কী উকিল হলেন?"
"কেন? এর সঙ্গে ওকালতির সম্পর্ক কী?"
"উকিল হলি সবই জানতি হয়।"
"তোমার মুণ্ডু। এটা বলতে পারে ডাক্তার।"
ছবি হাসল। কেমন একটা অন্য ধরনের সুখ আজ ছবিকে ধীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।
"আপনার হাতটারে দ্যান?"
"কেন", ফটিক হাল্কা সুরে বলল, "হাত গুনবে না কী?"
"দ্যান না আপনার হাতখানা।" ছবি যেন আজ আবদেরে শিশু। ফটিকের একখানা হাত সে টেনে নিল। তারপর খুব আস্তে করে ফটিকের হাতখানা ছবি তার তলপেটে রাখল। তারপর স্বপ্নের ঘোরে সে যেন তলিয়ে গেল। একটা অহেতুক পুলকে তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।
তারপর অদ্ভুত এক মোলায়েম স্বরে বলল, "এইখেনে। এখেনে থাকে।"
ফটিক তৎক্ষণাৎ তার হাতখানা ছবির উপর থেকে তুলে নিল।
ছবি বলল, "ভয় পালেন ক্যান্?"
"ভয় না ছবি, ভয় পাইনি।" ফটিকের স্বরও আশ্চর্য মোলায়েম। "যদি ওর চাপ লাগে?"
ফটিকের এই ভীত বিচলিত ভাব ছবিকে খুব সুখ দিল। ও ভাবতিছে। বাচ্চার কথা ও-ও ভাবতিছে। একটা আরামের ঘুম যেন ছবিকে ঢেকে দিচ্ছে।
সে ফটিকের কাছে সরে এল। ফটিক আস্তে করে টেনে নিল তাকে। ছবি এখন যেন ট্রেনে বুক করা বেলোয়ারি কাঁচের বাসন। যার গায়ে লেবেল থাকে, 'গ্লাস্, হ্যান্ডল্ উইথ কেয়ার।'
"এখন ক'মাস আপনার কাছে যাতি পারব না।"
"কেন ছবি? তবে যে বললে তোমার এখেনে থাকতে ভাল লাগছে না।"
"লাগতিছে না-ই তো।"
"তবে?"
"অ্যাখন যে হপ্তায় হপ্তায় ডাক্তারবাবুরি দেখাতি হবে।"
"ও তাই! তা থাকো। এখন তাহলে তোমার তো এখেনেই থাকা দরকার।"
"কিন্তু আপনারে অ্যাকা ছাড়ে থাকতি মন চায় না। আপনারে দ্যাখবে কিডা, সেই ভাবনা আমারে অস্থির করে। আপনিউ এখেনে থাকেন। থাকবেন?"
"তা কি করে হয় ছবি। ওখান থেকে চলে এলে পসার হবে না। তা ছাড়া হাতে যে মামলা আছে।"
"এখেনেও তো কোর্ট-কাছারি আছে। অনেক উকিলউ আছে। বাজান অ্যাখন এখেনে বাড়ি তুলতিছেন। গিরামের থে আমারে বার বার আনা নিয়া তো সম্ভব না। ডাক্তারবাবুর বারণ। তাই বাজান ঠিক করিছেন, আমার বাচ্চা হওয়ার আগেই এখেনে বাড়ি তুলে ফ্যালবেন। আপনি এখেনে উকালতি করেন?"
"না ছবি। ওখানে বসেছি যখন তখন ওখানেই পসার জমাবো। আমি বরং এখানে এসে এসে তোমাকে দেখে যাব।"
"তালি তাই করবেন!" ছবির কথা, ফটিক দেখল ঘুমে জড়িয়ে আসছে। "আপনি কাছে না থাকলি", ছবির স্বর ক্রমেই কেমন ক্লান্তি ও ঘুমের ভারে এলিয়ে আসতে লাগল "আমার ক্যামন ভয় করে।" ছবি ফটিকের দিকে পাশ ফিরে, ফটিকের শরীরের উপর একখানা হাত আলতোভাবে তুলে দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।
ফটিক ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে ছবির তৃপ্ত নিদ্রিত মুখখানা দেখছিল। একটুও নড়ছিল না। পাছে ছবির ঘুম ভেঙে যায়। ছবির আলো-আঁধারে লেপা মুখখানা দেখতে ফটিকের খুব ভাল লাগছিল।
আমার এমন কোনও কাজ করা উচিত নয় যাতে ছবি সামান্য আঘাতও পায়। সইফুন!
চমকে উঠল ফটিক। সে কি ছবিকে জানাবে সইফুনের ব্যাপারটা? কিন্তু তার এই বিচ্যুতি কি ক্ষণিকের বিভ্রম নয়? ফটিক ঘাড়টা উঁচু করে ছবির মুখের দিকে চাইল। স্পষ্ট দেখা যায় না। হ্যারিকেনটা একটু দূরে, একটা টুলে, ঢিমে আলো যতটুকু সেই ঘরে ছড়াতে পেরেছে তাতে ছবির মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। আলোর ময়ান দেওয়া অন্ধকার ছেনে এক কারিগর যেন ছবির মুখের একটা সুন্দর ছাঁচ গড়িয়ে ফটিকের বালিশে ফেলে রেখে গিয়েছে। ফটিক খুব আস্তে খুব যত্নে দুই ঠোঁটের ফাঁকে ধরা আলতো চুমুটাকে ছবির কপালে নামিয়ে দিল। সে বাপ হতে যাচ্ছে! ভাবতেই পারছে না।
আমার মনে এখন কি কোনও পাপ পুষে রাখা উচিত? সইফুন! না না, সে তো নেহাৎ একটা ভুল। আর তা ছাড়া সে তো নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। সে কি দেখেনি ইয়াকুব আর ছবিকে? কী অনাবিল সম্পর্ক দুজনের। তবে?
জান ছবি, ফটিক ছবির মুখের দিকে চেয়ে বলতে চাইল, সইফুনের সঙ্গে আমিও ঠিক এই রকম সম্পর্ক পাতাতে চাই। হঠাৎ ওর মনে হল ছবি হাসছে। ফটিক চমকে উঠল। ভীরু!

দৃষ্টিতে ছবির মুখের দিকে সে চাইল। ভাল দেখা গেল না। ফটিক দেখল ছবি হাসছে। ছবির মুখ থেকে অন্ধকারের পলেস্তারা ক্রমেই খসে যেতে লাগল। ছবি হাসছে। ফটিকের বুক ধক্ করে উঠল। ছবি বিড়বিড় করে কী বলছে। কান খাড়া করে ফটিক শুনতে চেষ্টা করল।

ছবি বলল, "ফুফু—"

ফটিক চমকে উঠল। শুনল, সইফুন। ফটিকের শরীরে ঘাম দেখা দিল।

ছবি বিড়বিড় করে বলল, "ফুফু কয় কি জানেন?"

এবার শুনতে ফটিকের আর ভুল হল না।

"ফুফু কয় আমার ইবার ব্যাটা হবে।"

ছবির আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। তবে নাক ডাকার ফুস্স্ ফুস্স্ শব্দটা পাওয়া যেতে লাগল। ছবি ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করতে করতে ফটিকের কাছে সরে এল তারপরে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে লাগল যে ছবির প্রতিটি প্রশ্বাসের আওয়াজ দিয়ে, ফটিকের মনে হল, ছবি যেন ক্রমাগত তাকে বলে চলেছে, আমি ঘুমুলাম, আমার জান মালের সব দায়িত্ব এখন তোমার। মাল, মানে তাদের সন্তান!

ফটিকের খুব কষ্ট হতে লাগল। সে অন্ধকার ছাতের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, যেখানে এত বিশ্বাস, এত নির্ভরতা, সেখানে আমি কী করব? আমার বদ কাজটার কথা ছবিকে বলব? বলে তার মনে আমার মনের যন্ত্রণার বোঝা চালান করে দেব? দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব? আর ছবি পুড়তে থাকবে সে যন্ত্রণায়? নাকি ছবিকে কিছুই বলব না? আমার গোপন পাপের আগুনে আমি একাই দগ্ধ হব। হয়ে শুদ্ধ হব। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছবির সঙ্গে কি তঞ্চকতা করা নয়? বিশেষ করে, এখন, যখন ছবি সন্তান বহনের অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার দ্বারা নিয়ত বিপর্যস্ত, সতত সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত এবং সর্বদাই ক্লান্ত। এবং আমার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল?

কী করব আমি? আমার এখন কী করা উচিত?

শূন্যে অন্ধকার এবং সেখানে ফটিক। তার শরীরে সে অনুভব করছে এক হামেলা নারীর দেহের উষ্ণতা এবং তার মনের নির্ভরতার গুরুতর চাপ। কী, কী করব আমি?

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, ফটিকের মনে পড়ল সুরা বাকারাহ্-এ খোদার বাণী, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে যাইতে পার। ছবি আমার ক্ষেত এবং তার গর্ভে আমাদের উভয়েরই ভবিষ্যতের শস্য। তঞ্চকতার কীট যদি সে শস্যের ক্ষতি করে? তাহলে কি আমার মনের আগুন ক্ষেতের উপর উগরে দেব, এখন যখন ক্ষেতে অঙ্কুর সবে উদ্গত হচ্ছে? হায় আল্লাহ, এতে কি ক্ষেত জ্বলে যাবে না? অঙ্কুর খাক হয়ে যাবে না?

হঠাৎ ফটিকের মনে হল, অনেকদিন পরে সে আল্লাহর দ্বারস্থ হল। আজকাল ওয়াক্তের নামাজগুলোও তার কাজা হয়ে যায়। নামাজ পড়ার তার সময়ই হয়ে ওঠে না। আগে একটা নামাজ কাজা হ'লে, পরের নামাজের সঙ্গে সেটা পড়ে না নিলে তার স্বস্তি হত না। এখন! কী করে যে সময় পার হয়ে যায়! কত বদলে যাচ্ছে ফটিক। আশ্চর্য! সে কি তবে পাপের দিকে চলেছে? মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে খোদার দিক থেকে? আগে পাপ আর পুণ্যের, বদী আর নেকীর সীমারেখা ফটিকের কাছে যত স্পষ্ট ছিল, সে দেখল এখন সেই সীমানাটা তার বিচারবোধের কাছে অনেকটাই ঝাপসা হয়ে এসেছে। এবং সন্দেহ নেই যন্ত্রণাও বেড়েছে। এই যেমন এখন সে ভুগছে এবং পরিত্রাণের পথ খুঁজছে।

হঠাৎ ফটিকের সুরা ইউনুস-এর একটা আয়াত মনে পড়ে গেল। ছাতের নিচে জমা অন্ধকারটাই যেন বেজে উঠল ঃ

আর যখন মানুষের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় তখন সে
শুইয়া, পাশ ফিরিয়া, বসিয়া ও দাঁড়াইয়া
আমাকে ডাকে
কিন্তু যখন আমি তাহার
বিপদ দূর করিয়া দিই, সে এমনভাবে
ভাগিয়া যায়
যেন বিপদে পড়িয়া কখনো আমাকে
ডাকেই নাই।

ফটিক অবাক হল। এ যেন তাকে লক্ষ্য করেই বলা। হ্যাঁ, সে ছাড়া আর অসংযত ব্যক্তি এখানে কে আছে যার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে আল্লাহর এই তিরস্কার?

অসংযত লোকেদের কৃতকার্যসমূহ, নিজেদের কাছে যাহাতে সুন্দর লাগে সেইরূপ করা হইয়াছে।

ফটিকের মনে হল খোদার কাছে তার চালাকী ধরা পড়ে গিয়েছে। তিনিই ওকে ঠেলে দিয়েছেন এমন পরীক্ষার অকূল পাথারে, যার মধ্যে পড়ে সে কেবল হাবুডুবু খাচ্ছে।

ইউসুফের মত ফটিকও সেই অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না। যে স্থলে আমার প্রভু কৃপা করেন তাহা ছাড়া নিশ্চয়ই মানুষের মনের প্রবণতা খারাপের দিকে থাকে।

ফটিকের মনের ভিতরে একটা বিষধর যন্ত্রণা ছোবল মারবার জন্য ধীরে ধীরে ফণা তুলছিল। সে ভয় পেল। পরিত্রাণের জন্য সে আকুলভাবে উচ্চারণ করল সূরা ইউসুফে বর্ণিত ইউসুফের প্রার্থনা।

ফটিক আবৃত্তি করল, "ইন্না আল্লাহা গফুরোররাহিম। নিশ্চয়ই আল্লা ক্ষমাশীল, কৃপার আধার।"

ফণাটা তো নামল না। সে ছোবল দেবার জন্য মাথাটা তুলছে তো তুলছেই। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। প্রভুকে কাতরভাবে ডেকেও কোনও উপশম হল না তার। ফটিক তখন চোখ ফেরালো ছবির দিকে। ছবির মুখে তখন প্রসন্ন ম্লান এক আলো এবং মাতৃত্বের স্বর্গীয় এক তৃপ্তি টলটল করছে। ফটিক ভাবল এইখানেই তার আশ্রয়। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ভুল করেছি ছবি। তুমি আমাকে মাফ করো। এবং আশ্চর্য, ফটিক দেখল ফণাটা নামছে। সে একই কথা বারবার বলতে লাগল আর ছবির কপালে খুব সন্তর্পণে চুম্বনের টিপ এঁকে দিতে লাগল। এবং ফণাটা ক্রমশ নামতে লাগল। গ্লানির বদলে ছবির জন্য ভালোবাসা উথলে উঠতে লাগল। বিশ্বাস কর ছবি, আমি তোমাকেই ভালোবাসি। শুধু তোমাকেই।

হঠাৎ ছবির দুখানা হাত ফটিকের অজ্ঞাতসারে সাঁড়াশীর মত উঠে গেল এবং ফটিকের গলা জড়িয়ে ধরে টেনে তার বুকে এনে চেপে ধরল। ফটিক নিশ্চল পড়ে রইল। সেখানে।

ছবি ফটিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঘুম ঘুম গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি খুশি হইছেন?"

ফটিক মুখ তুলল না, চোখ খুলল না, আস্তে জবাব দিল, "হ্যাঁ ছবি।"

"খু-উ-ব খুশি?"

"খুব ছবি, খু উ ব।"

"ফুফু কয়", হঠাৎ ছবি থেমে গেল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, "ফুফু কী কয়, জানেন?"

ফটিক বলল, "কী বলেছেন ফুফু?"

"না, কব না।" ছবি ফটিকের বুকে মুখ লুকোলো।

"বল না ছবি!"

"নুনা! আপনি আন্দাজ করেন?"

"বল না!" ফটিক মিনতি করল।

"ক'লি কী দেবেন?"

"একটা দারুণ জিনিস আমার কাছে আছে। তাই দেবো।"

"কী জিনিস?"

"তা এখন বলব না।"

"তা'লি আমিউ কব না।"

এতক্ষণে ফটিকের ঘুম আসছে। একটা হাই তুলল ফটিক।

বলল, "বা রে!" আরেকটা হাই তুলল ফটিক। "তুমি ফুফু কী বলেছেন তা আমাকে বলতে চাইলে, তোমারই তো আগে বলার কথা। বেশ বলো না! দেখো তোমার কী হয়?"

ছবি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমার যে শরম লাগতিছে।"

ফটিক বলল, "বেশ তাহলে বলো না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি।"

এবার ছবি ফটিকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল, "ফুফু কয়", ছবি থেমে পড়ল। তারপর বলল, "যাই কন, আপনি উঁকিলই হন আর যাই হন, আপনি একটু মটো আছেন।"

"কী! কী আছি আমি?"

"আপনার একটু বুঝ কম।" ফটিককে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ বেখে খিক্ খিক্ করে হাসল বিলকিস।

"ফুফু এই কথা কয়েছেন?"

"না না।" ছবি তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, "ফুফু ওকথা কবে ক্যান? উডা আমিই কলাম।"

"তুমি বললে!" ফটিক অবাক হল। "তুমি ছবি, অ্যাঁ, তুমি আমাকে মাটো বললে!"

ছবি একটু ভড়কে গেল। বলল, "তা'লি আপনি বুঝতি পারতিছেন না ক্যান।"

"বাঃ!" ফটিক বলল, "কথা থাকল তোমার পেটে আর তা বুঝে নেবো আমি! আমি কি দৈবজ্ঞ ঠাকুর না পীর সাহেব?"

"আপনি য্যান কী? কিচ্ছু বোঝেন না।" ছবি অনুযোগ করল। তারপর লাজুক গলায় বলে ফেলল, "ফুফু কয় আমার না কি বিটা হবে।"

"তাই বুঝি?"

"জে। বাজান তো খুব খুশি। আপনি খুশি?"

"আগে তোমার কথা বল? তারপর আমার কথা বলব।"

ছবি হঠাৎ চুপ করে গেল।

"কী হ'ল ছবি?"
ছবি বলল, "আমি খুশিউ হইছি। কিন্তু ভয়ও লাগতিছে।"
"কেন, ভয় কেন ছবি?"
"ভয় যে ক্যান করে, তা কতি পারিনে। ভয় ভয় করে। আজ আপনি কাছে আছেন, আজ আর ভয় নেই। আচ্ছা, ছাওয়াল হলি আপনি খুশি হবেন?"
"তুমি যদি খুশি হও ছবি, তবে আমি নিশ্চয় খুশি হব।"
"আর ধরেন যদি বিটি হয়, তা'লি কী হবে?"
"তাহলে তুমি যদি খুশি নাও হও, তবু আমি খুশি হব।"
ছবি চুপ করে গেল। একেবারে নড়াচড়াও বন্ধ করে দিল।
"ছবি? ছবি? কী হল?"
ধরা-ধরা গলায় ছবি বলল, "আপনারে আল্লাহ আমাগের সগলের চাইতি দরাজ আক্কেল দেছেন। আপনি আপনি", ছবি কথা শেষ করতে পারল না। ফটিকের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।
"কী হল ছবি? ছবি কাঁদছ কেন?"
ছবি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার না আছে এলেম না আছে বুদ্ধি। কিন্তু আমার মনে হয়, বিটা হবে কি বিটি হবে তা এক আল্লা মালিকই কতি পারেন, তিনিই শুধু সিডা জানেন। কিন্তু এখেনে এক বউবিবিটি ছাড়া আর সবাই বিটা হবে করে নাচতিছে। আমার ভয় করে। খুউব ভয় করে। বিটা যদি না হয়? জানেন এই জন্যি অ্যাক অ্যাক রাত আমার ঘুমই আসতি চায় না।"
"ছবি, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এ তো খোদার হাত। এ নিয়ে আমাদের ভাবার কী দরকার। তুমি ভেবো না। আমাদের দুজনকে আল্লা মিঞা যা দেবেন তাই আমরা খুশি মনে নেবো।"
বিলকিস বলল, "আপনি বিটা ছাওয়াল, আপনার কথা আলাদা। আপনার তো আর মেয়েগের কথা শুনতি হয় না। সবাই দেখি ছাওয়াল চায়। আমার ভয় করে। বাজানের খায়েশ যদি না পোরে?"
"বলছি তো, এ নিয়ে এত চিন্তা করো না। যা চিন্তার বিষয় নয় তা নিয়ে মাটো লোকেরা চিন্তা করে। তা এর মধ্যে মাটো লোক তো শুধু আ—"
ছবি ফটিকের মুখ চেপে ধরল।
"আমারে মাফ করেন", অত্যন্ত লজ্জা পেল বিলকিস। "আমি কিছু ভা'বে ওকথা বলিনি।"
"খুব মিথ্যে কথাও বলনি ছবি", ফটিকের স্বর গম্ভীর হয়ে এল। "কোনও কোনও ব্যাপারে আমি বেশ মাটো আছি। এই মাটো লোকটার কীর্তিকলাপ কখনো যদি তোমার কানে কিছু যায় তবে এই ভেবে সে-কসুর মাফ করো যে সে-কাজটা নিতান্ত মাটো বলেই লোকটা করতে পেরেছিল।"
"না না", ছবি বলল, "কথাডা আমার মুখ ফস্কায়ে বেরোয়ে গেছে। আমার বিয়াদ'ব মাফ করে দ্যান।"
"তোমাকে আমার মাফ করার কিছুই নেই ছবি। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। তোমার উপর আমার অবিচারের বোঝা কত যে বেড়েছে তা আমিই জানি। মাফ তো তোমারই করার কথা।"
বিলকিস নিশ্চিন্ত মনে আবার ঘুমে ঢলে পড়ল। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বিলকিসের মনে হতে লাগল যেন কথা নয়, ফটিক গুন গুন করে ওকে গান শোনাচ্ছে। ফটিক একটা হাই তুলল। পাশ ফিরে শুয়ে বিলকিসের গায়ে হাত রাখল। ওরা তখন এক বালিশে এবং একজনের নিঃশ্বাস অন্যের মুখে আছড়ে পড়ছে। ফটিকের চোখের পাতা বুজে এল। এবং সইফুন এসে দাঁড়াল। সইফুন ওদের দুজনের দিকে চেয়ে হাসছে।
ফটিক বলল, সইফুন, তোমাকে আজ থেকে আমি বিল্লী বলে ডাকব। কেমন?
সইফুন জিজ্ঞেস করল, ক্যান?
ফটিক বলল, কেন? নামটা তোমার ভাল লাগে না?
সইফুন বলল, ও নামটা তো ওর।
ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে সইফুন কেমন এক রহস্যের হাসি হাসল।
সইফুন বলল, আমারে বুঝি ওর জায়গায় বসাবার ইচ্ছে হইছে?
ফটিক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ছি ছি, সইফুন। আমাকে তুমি এই চোখে দ্যাখ?
সে বুঝি আমার চোখের দোষ!
সইফুন হাসছে। সইফুনের চোখ হাসছে। সইফুনের ঠোঁট হাসছে।
সইফুন, সইফুন! তুমি ভুল বুঝেছ।
সইফুনের চোখ হাসছে। ভুল বুঝিছি?
সইফুনের ঠোঁট হাসছে। ভুল বুঝিছি?
সইফুন বলছে, সেদিন আপনি যা করিছেন, তাতে ভুল বুঝার কোনও জায়গা আছে কন্?
সেদিন আমি কী করেছি সইফুন? কী করেছি?

আপনি? আপনি আল্লার হুকুম খিলাফ করিছেন।

না না। সইফুন সইফুন তুমি আমার সব কথা শোনো!

আল্লাহ কইছেন, মোমেন পুরুষগণকে বল যে তাহারা যেন আপন দৃষ্টি সংযত ও নত রাখিয়া চলে।

সইফুনের মুখে বিজয়ীর হাসি।

সইফুন! ফটিক অত্যন্ত কাতর। সইফুন দোহাই তোমার তুমি আমার সব কথাটা শোনো।

হে মোহাম্মদ! সইফুন চিৎকার করে উঠল। মোমেন পুরুষগণকে বল যে তাহারা যেন আপন দৃষ্টি সংযত ও নত রাখে। আল্লার এই হুকুম এই লোকটা খেলাপ করিছে।

সইফুন ফটিকের দিকে আঙুল তুলে হাসছে।

ফটিক ছবির পিঠের আড়ালে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করল।

সইফুন সশব্দে হেসে উঠল।

হে মোহাম্মদ! সইফুনের গলায় যেন বাজ কড়্ কড়্ করে উঠল!

লোকটা লুকিয়েছে। সইফুন হাসতে হাসতে বলছে। লুকিয়েছে লোকটা। তোলপাড় করে খোঁজো। ধরো। হাজির কর আল্লাহর সামনে সেই সীমা-লঙ্ঘনকারীকে।

এইবার ফটিক রেগে গেল। বেরিয়ে এল ছবির পিঠের আড়াল থেকে। ছবি ফটিকের হাত চেপে ধরে থামাতে গেল। কিন্তু পারল না। তার আগেই ফটিক তাকে ডিঙিয়ে পার হয়ে গিয়েছে।

উদ্বিগ্ন ছবি ডাক দিল, ফিরে আসেন। আপনি ফিরে আসেন।

কিন্তু ফটিককে ফেরাতে পারল না বিলকিস।

আমি একাই সীমা লঙ্ঘন করেছি, না? ফটিক রাগে গরগর করছে। আর তুমি কী করেছ?

ছবি মিনতি করল, আপনি ফিরে আসেন। আমার প্যাটে বাচ্চা আইছে। ফুফু কয় উডা ছাওয়াল।

এবং মোমেনা নারীগণকে বল তাহারা যেন তাহাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, ফটিক জিজ্ঞেস করল, এটা কার হুকুম?

বিলকিস উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কাতর স্বরে বলল, আমার প্যাটে বাচ্চা আমার প্যাটে বাচ্চা!

সইফুন হাসছে। সইফুন অম্লান বদনে বলছে, আল্লাহর হুকুম।

বিলকিস অতিশয় উদ্বিগ্ন। ও উঠবার চেষ্টা করছে।

তুমি মেনেছ?

না। সইফুন উপেক্ষার হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এবং আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করিয়া চলে, ফটিক কথাটা ছুঁড়ে দিল, এটা কার হুকুম।

আল্লার আল্লার। সইফুন হাসতে হাসতে চিৎকার করছে।

তুমি মেনেছ?

সইফুন উত্তর দিল, নিজিরি জিজ্ঞেস করেন।

ছবি কাতর স্বরে বলছে, প্যাটে বাচ্চা, উঠিতি পারতিছি নে। এট্টু ধরবেন? আমারে এট্টু ধরবেন?

ফটিক সইফুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ হুকুম মেনেছো?

সইফুন খিলখিল করে হাসছে, জে না।

ছবি ক্লান্ত স্বরে বলল, ওরে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

ফটিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে।

এবং তাহারা প্রকাশ না করে তাহাদের সৌন্দর্য, বেশভূষা ও অলংকার—

আমি সেদিন মাথায় বেশ করে বাস-তেল মাখিছিলাম। সইফুন হাসছে।

আমারে এট্টু ধরেন, আমার প্যাটটা বিজায় ভারি, আমি নিজির থে উঠতে পারতিছি না।

ভালো করে খুপা বাঁধিছিলাম। এলো খুপা। এই দ্যাখেন। সইফুন অদ্ভুতভাবে মাথায় একটা ঝাঁকানি দিতেই এক রাশ সুগন্ধি চুল খ্যাপলা জালের মত ছড়িয়ে গিয়ে ফটিককে চাপা দিল।

এবং উচিত যে, তাহারা আপন চাদর আপন গলা ও বুকের উপর জড়াইয়া দেয়।

আমি কপালে কাঁচপোকার একটা টিপ পরিছিলাম, চোখে সুরমা দিছিলাম।

চুলের জাল ঢাকা ফটিক এক পা সইফুনের দিকে এগিয়ে গেল। সইফুন এগিয়ে এল ফটিকের দিকে এমন ভঙ্গীতে যে সে-ই যেন জাল গোটাচ্ছে। ছবি ভারি পেট নিয়ে প্রাণপণে হামাগুড়ি দিয়ে এগুবার চেষ্টা করছে, পারছে না, এবং হাঁফাচ্ছে যেন আসন্নপ্রসবা এক কুক্কুরী।

এবং ক্রমাগত কাতর মিনতি করছে বিলকিস, আপনি চলে আসেন, আল্লার দুহাই চলে আসেন।

তুমি সেদিন এলোখোঁপা বেঁধেছিলে, না?

ফটিক সম্মোহিত।

আপনার নজরে পড়িছিল?

সইফুন উৎফুল্ল।

এবং নাকে লেগেছিল অদ্ভুত সুন্দর এক গন্ধ।

আমার শরীলির। উডা আমার শরীলির গন্ধ। আপনি টের পাইছিলেন ফটিক ভাই? এট্টুখানি আতর মাখিছিলাম। তারই বাস আপনি পাইছিলেন।

হঠাৎ ফটিক সম্বিত ফিরে পেল। সে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। এবং কড়া ধমক দিল সইফুনকে।

বিলকিস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আর না আর না, দুহাই আপনার, ব্যাগ্যাতা কত্তিছি, ইবার চুপ করেন।

ফটিক অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলল, এবং নারীরা যেন তাহাদের পা জোরে না ফেলে যাহা দ্বারা জানা যায় (তাহা) যাহা তাহারা গোপন রাখে সাজ-পোশাকে। আল্লার এই আদেশও ভঙ্গ করেছ?

জে হাঁ।

বিলকিস গোঙাচ্ছে।

কেন, তুমি আল্লার হুকুম অমান্য করেছ?

জে, আপনার জন্যি, খুদা কসম, আপনার জন্যি। আপনি আমারে দ্যাখবেন, তাই।

বিলকিস প্রচণ্ডভাবে গোঙাচ্ছে।

আপনি আমারে কাছে টানে নেবেন তাই আমি যায়ে আপনার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াইছিলাম।

হ্যাঁ আমি ভেবেছিলাম, বুঝি ছবি। তাই তোমাকে একেবারে বুকে টেনে নিয়েছিলাম।

আর কি করিছেন! ছবি গোঙাতে লাগল।

তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম ছবি।

না, আমারে না।

ঠিক কথা।

আপনি তো আমারে—

সইফুন আমি তোমাকে ছবি ভেবে ভুল করেছিলাম।

সইফুন হা হা করে হেসে উঠল। বলল, আপনি বিজায় মজার মানুষ।

বিলকিস গোঙাতে গোঙাতে বলল, আমি জানতাম। আমি জানতাম।

অসহায় ফটিক একবার ডাকল, ছবি। শোন ছবি।

বিলকিসের গোঙানী থামল না। আমি জানতাম। আমি জানতাম।

ফটিক ডাকল, সইফুন শোনও! সইফুন শোনও!

সইফুন বলল, আমি ভুল করিনি। আপনিউ ভুল করেননি। আমি ইচ্ছে করেই ধরা দিছি। যাতে আপনি ধরা দেন আমি সে-সব কাজ কত্তি কসুর করিনি। আপনিউ জানতেন আমি আমিই। ছবি-বু না। কী জানতেন না? ছবি-বুর প্যাটে হাত দিয়ে কন তো?

ফটিক কাতরে উঠল, ইয়া আল্—লাহ্!

এবং নিজেদের মধ্য হইতে অবিবাহিতাগণকে—এবার সইফুন চেঁচাতে লাগল, এবং বিধবাগণকে এবং নেককার বাঁদীগণকে তোমরা বিবাহ কর—

ফটিকের কলজেয় সইফুন যেন একটা গরম শিক পুরে দিল। সে এই ভয়টাই করছিল।

সইফুন চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, বল, উত্তর দাও, অ্যাখন তুমি কী করিবে? খোদার হুকুম অমান্য করিবে?

বিলকিসের কান্নায় ফটিকের ঘুম ভেঙে গেল। ফটিক ঘামছে। বিলকিসকে জাগিয়ে দিল ফটিক।

"কী হয়েছে ছবি, কাঁদছ কেন?"

ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতেই ছবি ফটিককে জড়িয়ে ধরল।

বলল, "খোয়াব দ্যাখলাম বিটি হইছে। আপনি কি নারাজ হইছেন?"

বিলকিসের সরল ছেলেমানুষিতে ফটিকের মনের তীব্র যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেল। বাকীটা মুছে ফেলার জন্য ফটিক মরীয়া হয়ে উন্মত্ততার জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। বিলকিসের শরীরও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল।

"কিছু হবে না তো?" বিলকিস ভেসে যাওয়ার আগে ভয়ে ভয়ে একবার জিজ্ঞেস করল।

হৃদয়ের সমস্ত মমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ফটিক বলল, "আমার উপর ভরসা রাখ।"

॥ ১৩ ॥

জমিরুদ্দি গজরাচ্ছে। যে জমিরুদ্দি সেদিন রাতে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য হাবিলদারের পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল। থানায় যেতে হবে শুনে ভয়ে যে জমিরুদ্দি কেঁদে ফেলেছিল, তার কোনও কসুর নেই, সে শুধু—এইটুকু বলার পর বশিরের কনুই-এর গুঁতো খেয়ে চুপ মেরে

গিয়েছিল। এবং হাজতবাসের দুদিন কেবল তার মেয়ের কথা বলে বলে বশিরের কান ঝালাপালা করে দিয়েছিল, সেই জমিরুদ্দি আজ গজরাচ্ছে।

জমিরুদ্দির মুখের আর আগল নেই।

"শালার বুনির জাত মারি, সুম্মুদ্দির সাত গুষ্ঠির জাত মারি, শালা—"

"যখন মারবি তখন মারবি। অ্যাখন চুবো।" গয়া বলল, "তামুক সাজ, তামুক সাজ।" বশির বলল, "তা'লি গয়া তোর চাকরির দফা গয়া হল ?"

গয়া বলল, "এখনও হয়নি। কা'ল বাড়ি ফিরার পর গোমস্তা লোক পাঠাইছিল।"

"গিছিলি ?" জমিরুদ্দি খ্যাঁক করে উঠল।

"না যায়ে উপায় আছে ? বিটা আমার মুনিব না ?"

সাজ্জাদ বিষণ্ণ চোখে গয়ার দিকে চাইল। কথা বলল না।

বশির জিজ্ঞেস করল, "কয় কী ?"

গয়া চুপ করে থাকল।

"কী," বশির আবার জিজ্ঞেস করল, "কী ক'লো ?"

"ক'লো ?" গয়া কারোর মুখের দিকে চাইল না। বশিরের চালে একটা লাউ ধরেছে আর তার পাশে যে সাদা লাউ-ফুল ফুটেছে, তার দিকে চাইল।

"ক'লো, এই শালা শুয়োরের বাচ্চা, নাড়েগের সংগে তোর অ্যাত মাখামাখি কিসির। ওগের সংগে হাজত খাটে আ'লি হারামজাদা মুখি অ্যাকটা কথা খসলো না ? দারোগা অ্যাত বার করে জিজ্ঞেস করল, হারামজাদার হারামজাদা তার উত্তর বলতি কী হইছিল যে হ্যাঁ ও বাড়িতি ডাকাতির ষড়যন্ত্র হতিছিল। শুয়োর। তোর মুখির অ্যাকটা কথা খসলি দ্যাখতাম কোন বাপ ওগের জামিন দিত।"

"অ্যাঁ", জমিরুদ্দি লাফিয়ে উঠল, "কী কইছিলাম না, শালা হিন্দুর পো আমাগের পুঙায় বাঁশ দিবার জন্যি আমাগের মধ্যি ঘুর ঘুর কত্তিছে। কইছিলাম কি না ?"

"তোর পুঙাডাই দেখি বেশি জ্বলতিছে। নে চুপ কর। বসে বসে হাত বুলো।" গয়া ঠান্ডা গলায় বলল।

জমিরুদ্দি হই হই করে লাফিয়ে উঠল। বলল, "আমরা মোছলমান, তুই শালা হিন্দু, তোর এখেনে অ্যাত আঠা ক্যান ?"

গয়া তিক্ত হেসে বলল, "গোমস্তাও এই কথা জিজ্ঞেস করিছিলো।"

জমিরুদ্দি থতমত খেয়ে থেমে গেল। বশির তাকে ধমকাল। জমিরুদ্দির গোঁ তবু যায় না। শালা দু-দিন ধরে হাজত বাস হয়েছে। একেবারে বেকসুর। শালা হাজত বাস না দোজখ বাস। শালার গোরুর খুয়াড়ও ওর চাইতি ভাল। এটটু খানি একটা ঘরে জনা কুড়ি লোক। কথা নেই বার্তা নেই, থানায় আট মাইল পথ হেঁটে পোঁছবামাত্র ব্যাটারা তৎক্ষণাৎ তাদের থানার হাজতে ঢুকিয়ে দিল। এর নাম থানায় হাজরে দেওয়া ! সুম্মুদ্দির দারোগা ! ঐটুকুন ঘরে লোক পুরছে তো পুরছেই। বসার জায়গা করতেই সেদিন ওদের বাই জন্মে গিয়েছে। যে ঘরে থাকো সেই ঘরেই হাগো সেই ঘরেই মোতো। শালারা ঢিলা কুলুখ পর্যন্ত করতে দেয়নি। ঐ অ্যাক ঘরে চোর-ছ্যাঁচড় মাতাল দুনিয়ার যত বদমায়েশ এনে জড় করে রেখেছিল। তার মধ্যে ওদের ক-জনকে ঠেসে পুরে দিলে ! যা কিছু ওদের কাছে ছিল, টাকা-পয়সা, বিড়ি-দেশলাই, শালার সিপাইরা সব কেড়ে নিল। খাদু বিড়ি দিতে চায়নি তাই তাকে রুলের গুঁতো খেতে হল। শালার সিপাই তোর গুষ্ঠির জাত মারি। সাজ্জাদ চাচার মত মানী লোকটাকে কী অপমানটাই না করল দারোগা ! গোটা গ্রামের লোক যাকে মোড়ল বলে মানে তাকে বেইজ্জত করছে দেখে জমিরের প্রাণটা ধুকধুক করেছিল। এখন সে লাফাচ্ছে। শালা ওর ক্ষমতা থাকলে থানায় আগুন লাগিয়ে দিত সেদিন। কিন্তু জমির লক্ষ্য করেছিল, গয়াকে অ্যাকটা কড়া কথাও বলছে না দারোগা। কেন ? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র আছে।

কেন তাদের সংগে এত ওঠাবসা করে গয়া ? গয়া তাদের গ্রামের লোক, শুধুই কি তাই ? বুঝতে পারে না জমির। মোতে, ভজন, রামপদ, সুয্যিপদ ওদের বুঝতে জমিরুদ্দির কিছু অসুবিধে হয় না। ও শালারা হিন্দু। উরাউ আমাগের সহ্য কত্তি পারে না, আমরাউ না। শালারা লাঠি শড়কি চালাতি পারে, আমাগের ঘায়েল করার ক্ষ্যামতা রাখে। আমরাও শালাগের ঘায়েল করার ক্ষ্যামতা রাখি। আমরা যিবার দুগগা পিরাতিমে বিসর্জনের বাজনা মসজিদির সামনে থামাবার জন্যি লাঠির ঘায়ে পিরাতিমে ভাঙি, উরা সিবার লাঠির ঘায় ইশকুলির মাঠে কোরবানি বন্ধ করে দেয়। হিন্দু আর মোছলমানের মধ্যি এই রকম সম্পর্ক, এটা বুঝতি অসুবিধে হয় না। জমিরের কাছে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যদিও সাজ্জাদ চাচা, বশির উল্টোপাল্টা কথা বলে থাকে।

"তোরে শালা," খাদু শেখের মত জমিরও অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "কিছুতিই বুঝতি পারি নে।"

গয়া অন্যমনস্ক। বলল, "শালা আমিই কি আমারে বুঝতি পারি।"

বশির বিরক্ত হয়ে বলল, "মাংটামো ছাড়ে ক। অ্যাখন আসল কথা ক। গোমস্তা আর কি ক'লো ?"

"শুনবা তা'লি," গয়ার বলার মধ্যে এক ধরনের হিংস্রতা ফুটে উঠল। "গোমস্তা ক'লো,

হারামজাদা যা বলি তাই শোন, তা'লি তোর চাকরিডে থাকবে। আমি অ্যাকটা হলফনামা মুসোবিদে করি, তুই বোস। তারপর এতে সই দিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি নাড়েগের অ্যাকবার দেখে নিই। ছোট লোকের বাড় বাড়িছে! খাজনা দিয়া বন্ধ কর! সুদ দিয়া বন্ধ কর! নাম পত্তনে সেলামী নেওয়া চলবে না! না! জমি করব খাজনা দেব না! কর্জ নেবো সুদ দেব না। আবদার! জমিদার মহাজন বুড়ো আঙুল চোষবে, না! খালি তুই বাপু, আমার পাশে দাঁড়া, তারপর আমি দেখি, ঐ নাটের গুরু সাজ্জাদ মোল্লা আর তার সাগরেদ ঐ বছরেডারে সাত বচ্ছর ঘানি টানায়ে ছাড়তি পারি কি না? শালাদের ডাকাতির কেসে ঝুলোবো, রেপ কেসে ঝুলোবো, খুনের কেসে ঝুলোবো। ও দুটোর ঝুলোতি পারলিই ব্যস্ ঠান্ডা। আর যারা সে বিটারা তো সব মেকুর। উরা সব পায়ে পায়ে ঘোরবে।"

ওরা সবাই চুপ করে থাকল। এবং নিঃশব্দে তামুক টানতে লাগল।

গয়া বলল, "পুননুও আমারে খুব খাতির করল। ভাব দেখে মনে হল গোমস্তার কথায় রাজি হলি, আমারে কিছু খাওয়াতিউ পারে।"

বশির হুঁকো টানতে টানতে জিজ্ঞেস করল, "আর তুই যদি রাজি না হ'স?"

"বিটা গোমস্তা কলো, আমি যদি রাজি না হই ওর কথায়, শালা আমার চাকরি খাবে, আমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।"

গয়া এবারে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কয়েছে যদি কথা না শুনিস তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো। দেখি তোর কোন্ মোছোম্মান বাপ আসে রক্ষে ক'রে।"

"মোছম্‌মান বাপ! হুঃ!" গয়া তিক্তস্বরে বলল, "এই যে খাদু আমার মোছম্‌মান বাপ! ঐ যে জমির আমার মোছম্‌মান বাপ! মুছলমানদের দলে অ্যাকটা হিন্দু আসে ভেড়ে ক্যান, কি মতলব সে শালার, তার কোন কিনারা কত্তি পাচ্ছেন না আমার মোছম্‌মান বাপেরা। উরা আবার আমারে বাঁচাবেন? তোগের হল মোছম্‌মানের দল, গোমস্তাগের হল হিন্দুর দল, কাঁশেপাড়ার পিদু বিশ্বেসের হল গে খেরেস্তানের দল, সবাই যদি এইভাবেই দল গড়তি থাকি, তা'লি মানুষগের দল হবে কোন্‌টা? হ্যাঁ গো মুছলমান মিয়ারা সিডা কতি পারো?"

জমিরুদ্দি বলল, "অতশত জানিনে। মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর মুখির থে শুনিছি যে, হিন্দুগের সঙ্গে মুছলমানগের মিশ খাওয়া সম্ভব না। ক্যান? না তার পেরধান কারণ এই যে ইরা দুটো আলাদা জাত। হিন্দুরা পয়দা হইছে হিন্দুস্থানে মুছলমানরা পয়দা হইছে আরবে। আমাগের মুছলমানগের আসল দেশ হ'ল গে আরব দেশ।"

গয়া এ কথার কোনও উত্তর দিল না। শালার দেশ হল আরব দেশ! গয়া হাসবে না কাঁদবে · চুপ করে হুঁকো টানতে লাগল। সে এক বেজায় সংকটে পড়েছে। গোমস্তা যে হুমকি দিয়েছে তা মারাত্মক। পেয়াদার চাকরি যাবে সেটা ক্ষতি। শুধু আমদানী নয়, পেয়াদাগিরি তাকে সমাজে একটা ইজ্জৎ দিয়েছিল। চাকরি গেলে সেই ইজ্জৎটাও যাবে। বড় ক্ষতি সেইটেই। সে চাষার ছাওয়াল। হাল ঠ্যালা ওব্যেস আছে। গায়ে গতরে শক্তি আছে আবার ছাত্তরবিরতি পাশ। বিয়ের বাজারে গয়ার তাই বেশ দর উঠেছিল। গয়া ফালতু লোক নয়। তবুও শালার গোমস্তা যদি মনে করে তবে সে শালা গয়ার ভিটে মাটি চাটি করে দিতে পারে। তাকে একঘরে করে দিতে পারে। গোমস্তার এক হুকুমে এই গ্রামে তার ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তার বাড়ি যেখানে সেখেনে মুসলমানদেরই জোট বেশি। হিন্দু যারা ছিল, হয় মরে হেজে গিয়েছে আর না হয় জমি জোত বিক্রিসিক্রি করে এ ধার ওধার উঠে গিয়েছে। বাসের রাস্তা তৈরি হবার পর থেকে আপনা-আপনিই হিন্দু-মুসলমান রাস্তার এপারে ওপারে ভাগ হয়ে গেল। গয়া তখন ছোট। তার বাপ যাচ্ছি যাব যাচ্ছি করতে করতে তার জীবনটা ভিটেতেই কাটিয়ে দিল। গয়া ফটিক বশিরের খেলার সঙ্গী। গয়াব বাপ গঙ্গাধর আর ফটিকের বাপ সাজ্জাদ মোল্লার ছিল একসঙ্গে ওঠা বসা। গয়া ছোট বয়েস থেকেই সাজ্জাদের বাড়িতে তার আপন লোকের মত আনাগোনা করেছে। মাঝখানে কিছুদিন অবিশ্যি ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। ছাত্রবৃত্তি পাশ করে গয়া একদিন বাড়ি ছেড়ে পিটটান দিয়েছিল। এক আমিনবাবুর চাকর হয়ে বেশ কয়েক বছর নানা জায়গায় ঘুরেছে। এবং জমি-জমার সেটেল্‌মেনটের নানা প্যাঁচ ঘোঁচ বেশ ভালোভাবেই শিখেছে। তারপর একদিন যেমন বেরিয়ে গিয়েছিল তেমনিই হঠাৎ গ্রামে ফিরে আসে এবং মেন্দাগের এসটেটে পেয়াদার কাজ নেয়। ওর বাপ আর দেরি না করে বেশ মোটা টাকা পণ নিয়ে গয়ার বিয়ে দেয় কিন্তু নাতির মুখ দেখার আগেই এ জগতের মায়া কাটায়।

পেরথম নাতি হবার সময় গয়ার শ্বশুর মুকুন্দ মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে। নাতি ছাড়া তার থাকতে কষ্ট হয়। জামাইকে তার গেরামে সে জমি দিতে চেয়েছে, টিনের ঘর তুলে দিতে চেয়েছে। কিন্তু গয়ার সেই তার বাপের স্বভাব। যাচ্ছি যাব যাচ্ছি যাব। এদিকে সুযোগ পেলেই বাড়ির চার পাশটা একটু একটু করে দু-এক কাঠা জমি কিনে বাড়িয়েই ফেলেছে। পটেশ্বরী মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি থেকে আসে ছেলে নিয়ে। থাকে দিনকতক। কখনও সোয়ামীকে তাগাদা দেয় তার বাপের দেশে ঘর বাঁধার জন্যে। আবার কখনও এসে বলে, ক্যান তুমি ছাড়তি যাবা আমার শ্বশুরির ভিটে? গয়া হাসে আর বলে, আরে আমিউ তো তাই কই! আমিউ তো তাই কই! তোর বুঝি এ বাড়িডারে ভালো লাগতিছে। পটেশ্বরী বলে, পেত্যেকবার মনে হয়, নতুন বাড়ি।

সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ক'লে বাপ?"

গয়া ম্লান হাসল, "আমি ক'লাম দুদিন হাজতে কাটায়ে এই বাড়ি ফিরাতিছি। অ্যাখন আর কোনও কিছু দ্যাখার মত মিজাজ নেই বাবু। আগে খানিক ঘুমোয়ে নিই, তার পরের কথা পরে। এই বলে কাল তো কাটায়ে দিছি। আজ শালা আবার ডাকবে।"

বশির জিজ্ঞেস করল, "হলফনামাটায় তোরে দিয়ে কী কবুল করাতি পারে বলে মনে হয়?"

গয়া বলল, "দারোগা আমারে দিয়ে যা কবুল করাতি চাইছিল তাই। তুমরা ডাকাতি করার মতলব আঁটতিছিলে। আবার কী?"

জমিরুদ্দি বলল, "কী, গরিবির কথা ফললো কি না অ্যাখন কও? কইছিলাম কিনা?"

বশির বিরক্ত হল। "কী কোস তুই? একটু ঝেড়ে কাশ দিনি?"

জমিরুদ্দি বলল, "যখন সব হিন্দুর এক রা, তখন এই সুমুন্দি আমাগের মধ্যি ঘুরঘুর কর়ে ক্যান? কিছু অ্যাকটা মতলব নিশ্চয় আছে। অ্যাখন বুঝা গেল মতলবখানা কী?"

সাজ্জাদ বলল, "মতলব ধরে ফেলিছ? তবে কয়ে দ্যাও বাপ?"

জমিরুদ্দি বলল, "গয়া শালা তো নিজিই ক'লো। ডাকাতির মামলায় আমাগের ঝুলোয়ে দেবে।"

বশির বলল, "তোর কি ধারণা গয়া আমাগের ডাকাতির মামলায় ঝুলোয়ে দেবে?"

জমিরুদ্দি বলল, "ও বিটা হিন্দু। ওগের অসাধ্যি কাম নেই।"

গয়া আর রাগল না। ও ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল।

বশির বলল, "হাঁরে জমির, আমাগেব খাতকচাষী আন্দোলনে আর থাকব না, এই মুচলেকা দারোগারে কে লিখে দিয়েছে? তুই না গয়া?"

জমিরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

শুকনো গলায় জমির বলল "কিডা ক'লো?"

ঠান্ডা গলায় বশির বলল, "দফাদার।"

জমিরুদ্দি চুপসে গেল। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল।

বশিরের বাড়িটা এতক্ষণ গমগম করছিল। এখন একেবারে চুপ।

এত চুপ যে খাদু শেখ তার মনের কথাগুলো খুব স্পষ্ট শুনতে পেল।

আমি শালারে ছাড়ব না। আমার জমি নেছে পুনুনু। আমার ইজ্জৎ নেছে ঐ পুনুনু। আমি পুনুনুর জান নেবো। খোদা জালেমগের সাজা দিয়ার জন্যিই তৈরি করিছেন আগুন। আর শালা পুনুনুই হল সব চাইতি বড় জালেম। আল্লাহ্ তো নিজিই কইছেন, "এবং নিশ্চয় জালেমদেব জন্য অবশ্যই দুঃখজনক শাস্তি আছে।" খাদুর মনে আছে মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী তাগের গিরামে মাস খানেক আগেই এক মহ্ফিলে একথা বলেছিলেন।

হ্যাজাক বাতিব আলোয় গায়ে আবা কাবা পরা আব মাথায় ইয়া আমামা পাগড়ি বাঁধা মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীকে দারুণ দেখাচ্ছিল। হ্যাজাক বাতির তীব্র আলো। তারপর চারদিকে লোবান জ্বালানো। তারপর মৌলবী সাহেবেব আবা কাবার জেল্লার পরে আলো যেন ঠিকরে পড়ছিল। আর মুখ থেকে বিচিত্র সব ধমকের মত শব্দ ছিটকে বেরুচ্ছিল। দু একটা মনে আছে খাদুর যথা—হা-মী-ম্। যদিও খাদু ভিড়েব মধ্যে মিশে একটু পিছনের দিকে বসেছিল কিন্তু তার যেন কেমন মনে হল মৌলবী সাহেব তার দিকেই চোখ পাকিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

একটু অস্বস্তিবোধ করছিল খাদু। কথাটার মানে কিছুই বুঝল না খাদু। সে মৌলবী সাহেবের দৃষ্টিপথের আড়ালে গিয়ে বসবে বলে যেই একটু নড়েছে অমনি মৌলবী সাহেব অপরিচিত কথার আরেকটা তোপ দাগলেন, আইন-ছী—ন্ কাফ্। একথারও মানে বুঝল না খাদু। কিন্তু সবাই মারহাবা মারহাবা বলে উঠল। তাই ওকেও সকলের সঙ্গে গলা মেলাতে হল। তারপর খাদু এদিক ওদিক করে একটা লম্বা লোকের পিছনে বসে মৌলবী সাহেবের দৃষ্টিব আড়ালে সরে গিয়ে স্বস্তি বোধ করল। মাঝে মাঝে মৌলবী সাহেব উরদু বলছিলেন। কখনও কখনও বাংলা। এইরূপে মহাক্ষমতাবান পরমজ্ঞানী আল্লাহ্ হে মোহাম্মদ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহারা ছিল তাহার নিকটে ওহী পাঠাইয়া থাকেন। শুনতে শুনতে খাদুর ঢুলুনি এসে যাচ্ছিল। অনেক কথা কানে যাচ্ছিল না। আবার সে সজাগ হয়ে উঠছিল। আর যদি আল্লাহ চাহিতেন, তার কানে কথাটা গমগম করে উঠল, তবে অবশ্য সকল মানুষকে এক দলভুক্ত অর্থাৎ মুসলিম জাতিভুক্ত করিতে পারিতেন, খুদাদানে আগর ইয়ে চাহ্‌তে থে, খুদাদানে আ-গর্ ইয়ে চাহ্‌তে থে, মৌলবী সাহেব স্বরগ্রাম চড়িয়ে দিলেন, আল্লা-হো লাজবা আলাহুম উম্মাতান, খাদু ঢুলছিল আর সেই সময় এই শব্দগুলো ধীরে ধীরে তার কানের পর্দায় ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আবার মারহাবা মারহাবা ধ্বনিতে তার চক্ষের চটকা ভেঙে যাচ্ছিল। অ ইন্না জালিমিনা লাহুম আজাবুন আলিম, শব্দগুলো শুনতে শুনতে ঢুলে পড়ছিল প্রায়, এমন সময় তার কানে বাজল, "এবং নিশ্চয় জালেমদের জন্য অবশ্যই দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে।" পুনুনু। পুনুনু স্যাকরাই তো সব থেকে বড় জালেম। এবং নিশ্চয় পুনুনুর জন্যও অবশ্যই দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে। নিশ্চয় তাই। খাদুর ঘুম মুহূর্তে ছুটে গেল। নাহলে আল্লাহর

রাজ্যে ইনসাফ হবে কী করে?

শালারে জানে মারব। শালার বাড়ি পুড়োয়ে দেব। হাজতে বসে নিঃশব্দে খাদু এই প্রতিজ্ঞা করেছে। হাজতে পায়খানা পিসাব মাতালের বমি, এসবের মধ্যে খাদুই ছিল ধীর স্থির এবং নির্বিকারচিত্ত। "এবং নিশ্চয় জালেমদের জন্য অবশ্যই দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে।" কেবল আল্লার এই বাণীটাই সে জপ করে এসেছে। এবং আল্লারই ইচ্ছায় ঐ হাজতেই খাদুর পরিচয় হয় বকু গাজীর এক সাগরেদের সঙ্গে। বকু ও অঞ্চলের নাম করা ডাকাত।

বশিরের বাড়িতে চুপ করে বসে খাদু ভাবছিল কাল সকালেই সে বকু গাজীর সন্ধানে যাত্রা করবে। কোনও আলোচনাই তার কানে যাচ্ছিল না।

গয়া শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "হাঁরে জমির, দারোগা তোরে আমার সম্পক্‌কে কী কয়েছে?"

জমিরুদ্দি রাগতভাবে বলল, "কয়েছে তুই গোমস্তার চর। তুই আমাগের সব কথা কয়ে দিস গোমস্তারে।"

বশির বলল, "তাই যদি হবে তো ওরেউ আমাগের সঙ্গে আটকায়ে রা'খলো ক্যান?"

জমিরুদ্দি বলল, "সিডা আমি কব কী করে?"

বশির ডাকল, "খাদু!"

খাদু বশিরের দিকে তাকালো।

বশির বলল, "তোরে মুচলেকা দিতি কইছিলো দারোগা?"

খাদু বলল, "কইছিলো।"

"তুই দিছিস বুড়ো আঙুলির টিপ্‌ছাপ?"

জমিরুদ্দি বিপন্ন হয়ে খাদুর দিকে চাইল। আল্লার কাছে মাথা খুঁড়তে লাগল। হায় আল্লা, খাদু য্যান্ দারোগারে মুচলেকা দিয়ে থাকে।

খাদু বলল, "না।"

জমিরুদ্দি মরমে মরে গেল। মনে মনে চেঁচাতে লাগল, বশির বশির, আমি ভয় পাইছিলাম খুব। দারোগা শালা অ্যামন উস্তম-কুস্তম কত্তিছিল! বশিরভাই বশির, আমি ভয় পাইছিলাম। কয় কি, আমারে ফাটকে চালান ক'রে দেবে। সাত বচ্ছর ঘানি টানায়ে ছাড়বে। বশির বশির, মুনিয়ার এক গা জ্বর। আমি ফাটকে গেলি ওগের দ্যাখবে কিডা? আমি ক্যামন ভয় পায়ে গ্যালাম। দারোগার ঘরে আমি অ্যাকা, তুই নেই, খাদু নেই, চাচাও নেই। আমি অ্যাকা। আর যেদিকি তাকাই পুলিস। তুই নেই, চাচা নেই, খাদু কেউ কাছে নেই আমি অ্যাকা। দারোগা চোখ পাকাতিছে, দাঁত কিড়মিড় কত্তিছে আর সেই ঘরে মারতি মারতি অ্যাক অ্যাকটা লোকেরে আনতিছে। কারুরি ক্যাঁত ক্যাঁত ক'রে লাথি মাত্তিছে!

জমিরুদ্দি বলল, "দারোগা কী মা'র মারতিছিল লোকগুলোরে। তুই দেখিছিস বশির?"

"হ্যাঁ, দেখিছি।"

"তুই দেখিছিস খাদু? চোখির উপর অ্যামন অত্যাচার দেখিছিস্?"

খাদু নির্বিকার। হবে হবে, আল্লার দুনিয়ায় ইনসাফ হবে। সবুর করলি নে ক্যান, সুম্মুদ্দি? তুই কি জানিস নে আল্লার হুকুম, এবং নিশ্চয় জালেমদের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে দুঃখজনক শাস্তি।

বলল, "দেখিছি।"

সাজ্জাদকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল জমিরুদ্দি, "তুমি দেখিছ, তুমি দেখিছ? চাচা!"

সাজ্জাদ ওর কথার জবাব দিল না। গয়াকে বলল, "তা কী করবা বাপ? কী ভাবতিছ?"

গয়া বলল, "দ্যাখ চাচা, ঐ পিয়াদাগিরি চাকরির জন্যি আমি ভাবিনে। ও আমি লাথি মা'রে ছাড়ে দিতি পারি। উরা বরখাস্ত না করলি আমি নিজিই ইস্তফা দিতাম। ও জন্যি আমি ভাবিনে।"

"তুমরা কেউ ডরালে না!" জমিরুদ্দি অবাক হয়ে খাদু, বশির, সাজ্জাদ এবং সব শেষে গয়ার মুখের দিকে চাইল। "তোর উপর হম্বি তম্বি করিছিল গয়া?"

"করিছিল।" গয়া বলল, "দেখলিই তো, দারোগা শালা ছিল মুসলমান। খাদু যার পাশে বসে গুজগুজ কত্তিছিল তারে আর আমারে একসঙ্গে ডাকে নিয়ে গ্যাল। খাদু তুই জানিস ওর জা'ত কী?"

খাদু বলল, "মুসলমান।"

গয়া বলল, "তাই ক। নিজির জা'ত বলেই উডার মুখি অ্যাত মনের সুখি লাথি মারিছে। শালা দারোগার ধম্মজ্ঞান খুব টনটনে। লাথি মারতি মারতি নামাজের সুমায় হ'ল। এ-ঘরে লোকটা গুঙাচ্ছে তার মুখ রক্তে ভা'সে যাচ্ছে, আর দারোগা সাহেব পাশের ঘরে যায়ে নামাজ পড়তি লাগলেন। কয়েদীরি লাথোতি লাথোতি দারোগা সাহেব নামাজ পড়তি গ্যালেন, আবার নামাজ প'ড়ে আসা মাত্তর তারে লাথোতি লাগলেন।"

জমিরুদ্দি বলল, "আমি দেখিছি। আমি দেখিছি। উডা নাকি ডাকাত: তোগে'র কারু ভয় করেনি? কারুর না! আর আমার হাত-পা প্যাটে সে'দোয়ে যাতি থাকল! আমি, আমি কী দিয়ে গড়া?"

সাজ্জাদ গয়াকে জিজ্ঞেস করল, "চাকরিই যখন ছাড়তি রাজী, তা'লি বাপ তুমার আর ভাবনাডা কী?"

"আমার ভাবনা চাচা," গয়া বলল, "আমি এই গিরামে থাকবো, না ভিটে বেচে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবো, অ্যাথন শুধু এই।"

বশির বিস্মিত হ'ল। "কী কলি? কী কলি তুই গয়া!"

"ভিটে বেচে চ'লে যাওয়ার কথা ভাবতিছিস? এই গিরাম ছাড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি!" বশির বলল, "অ্যাত দিন পরে তোর এই ভাবনা ভাবতি হচ্ছে?"

গয়া বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী? গোমস্তারে বড় ভয় করি চাচা। ওর দুঃসাধ্য কম্ম নেই। ওর হাতে লোক আছে। হিন্দু আছে মুসলমান আছে। আমারে যদি ধরে আগুন দিয়ে পুড়োয়ে মারে তা'লি বাঁচাবে কিডা? তা'লি বুঝে দেখ আমার অবস্থাডা। যদি থাকতি হয় তা'লি গোমস্তা শালার গুলাম হয়ে থাকতি হবে। তা'লি তুমাগের বিরুদ্ধে যাতি হবে। আদালতে দাঁড়ায়ে সাক্ষী দিতি হবে। তখন খাদু শেখ জমিরুদ্দিরা হিন্দুর কলা ফাক কত্তি সবার আগে আ'সে হাজির হবে। আবার শালা গোমস্তার মন জুগোয়ে যদি না চলি তা'লি সে আমার চালে আগুন দেবে। কিন্তু এই গিরামে গয়ার চালে আগুন লাগলি আজ নিবোবার লোক আর আগের মত ঝাঁপায়ে পড়বে না।"

বশির খুব রেগে গেল।

"তোর কি গয়া মাথা খারাপ হয়ে গেল! অ্যাদ্দিন পরে তোর কি ধারণা হতিছে এই গিরামের লোকেরা সব বেইমান! তোর ঘরে আগুন লাগবে আর আমরা দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে তা দ্যাখব?"

"না বশির। আমি তা কইনি। তুই ছুটে আসবি, চাচা ছুটে আসবে তা আমি জানি। কথা সিডা না।" গয়া বলল, "তুই আমার কথাটা বুঝে দ্যাখার চিন্তা কর। অ্যামন অ্যাকটা কিছু ঘটতিছে যা ঠ্যাকাবার ক্ষ্যামতা তোর, চাচার কি আমার মত অ্যাকটা দুটো লোকের কম্ম নয়। আচ্ছা, চাচা, তুমিই কও, আমি ফটিক বশির পাঁচন-বাড়ি হাতে ক'রে যখন ছাগল চরাতি যাতাম, তখন এই গিরামে হিন্দুগের বাস কত ছিল?"

সাজ্জাদ ভুরু কুঁচকে বলল, "তা পঁচিশ ত্রিশ ঘর ছিল।"

"আর আজ," গয়া বলল, "এই গিরামে শুধু আমার ভিটেটাই রয়ে গেছে। আর সবাই অ্যাক অ্যাক করে ওপারে চ'লে গেছে। ইডা হ'ল ক্যান্ চাচা? ওপারে মুসলমান পাড়ার লোকরা অ্যাক অ্যাক করে এই গিরামে উঠে আসে ঘর বাধতিছে। ইডা হচ্ছে ক্যান্? এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর, য্যান সেই বিত্তান্ত। আমরা কি চরডারে আটকাতি পারিছি? অ্যাকই গিরামের মানুষ এভাগ ওভাগ হয়ে গেল। তুমি আমার বাপের বন্ধু। তুমাগের ছিল গলায় গলায় ভাব। আমার মা ম'রে গেল। তুমি আমারে চাচীর কোলে ফেলে দিলে। চাচী আমারে বুকির দুধ খাওয়াইছে কিনা তুমি কতি পারো। আমার বাপের আমলে তুমরা ভাবতি পারিছিলে একটা গিরাম ভাগ হয়ে দুখান গিরাম হবে, আর তার অ্যাকটা হবে শুধু হিন্দুগের গিরাম আর অ্যাকটা হবে শুধু মুসলমানগের গিরাম? ভাবতি পারিছিলে, কও?"

"না বাপ," সাজ্জাদ অপরাধীর মত বলল। আজ গয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তাই ব্যাপারটা সাজ্জাদের চোখে ধরা পড়ল। সব যেন তারই অপরাধ। বাসের রাস্তা বেরুবার পর থেকে সেই যে এপার ওপার লোক চালাচালি দ্রুততর হল, ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক ঠেকেছিল সাজ্জাদের কাছে যে তা নিয়ে প্রশ্নই জাগেনি তার মনে। গয়ার কথার এখন উত্তর খুঁজে পেল না সাজ্জাদ। অথচ সাজ্জাদের আত্মমর্যাদায় বেজায় ঘা লাগল। গয়া, তার গয়া চলে যেতে চাইছে গ্রামের বাস তুলে দিয়ে, আর কিনা যে গ্রামের মোড়ল সাজ্জাদ মোল্লা সেই গ্রাম থেকে! অবিশ্বাস্য সব ব্যাপার ঘটছে! বিনা কসুরে তাকে কিনা দুটো দিন কাটিয়ে আসতে হল হাজতে! আবার সেই জ্বালা উপশম হতে না হতে গয়া বলছে তার বাপের ভিটে ছেড়ে চলে যাবে। এ গ্রামে থাকতে তার আর ভরসা হচ্ছে না। গয়া বলছে একথা! যে গয়া তার বেটার মত। সত্যি বলতে কি তার ছাওয়াল ফটিক, গয়া আর বশিরের মত তার এত কাছের লোক নয়। গয়ার বাপ তার দোস্ত ছিল বলেই শুধু নয়, এরা তার কাজকামেরও সাথী। ফটিক নামেই শুধু এ বাড়ির ছাওয়াল। পাশ দেওয়ার পর মাসটার হবার সময় থেকেই বাপ-বেটার দুনিয়া যেন আলাদা হয়ে গেল। সাজ্জাদের ধ্যান ধারণা ফটিকের ভাবনা চিন্তার থেকে আলাদা হয়ে গেল। ছাওয়াল নিয়ে গর্ব বোধ করে সাজ্জাদ, কিন্তু তাকে বুঝতে পারে না। তাই ফটিককে সে সমীহ করে। উকিল হবার পর ফটিক তো আরও দূরে সরে গিয়েছে। গয়া আর বশিরই তার ছাওয়াল। তার যা কিছু সলাপরামর্শ সব এই দুজনের সঙ্গে। গয়ার মাথা খুব সাফ। দুনিয়ার প্যাঁচ ঘোঁচ গয়া যত বোঝে বশির তার অর্ধেকও বোঝে না।

গয়া তাকে প্রথম থেকেই বলে আসছে, চাচা তুমাগের কামকাজের মধ্যি মুসলমান মুসলমান ভাবটা বড্ড বেশী আসে পড়তিছে। এতে অন্য যারা আছে, আর তুমাগের মতই মহাজন জমিদারের অত্যাচার খতম কত্তি চায়, তাগের কিন্তু দূরি সরায়ে দিবা। কথাডা হচ্ছে প্রজা আন্দোলন। আমাগের এরই উপর জোর দিয়া ভালো। হতি পারে প্রজাগের মধ্যি, চাষীগের মধ্যি, খাতকগের

মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। তাহলিউ ইডা প্রজা আন্দোলন। যখন এই আন্দোলন করব তখন মুসলমান, হিন্দু, খেরেস্তান এইভাবে না দেখে জমিদার চাষী, মহাজন খাতক, এইভাবে কথাবার্তা বলাকি দলে আমরা ক্রেমেই ভারি হব। আর তা না করে যদি বার বার হিন্দু হিন্দু মুসলমান মুসলমান করি তালি অনেক প্রজারে আমরা সরায়ে দেব।

হ্যাঁ, গয়া বলেছিল এ কথা। আর সত্যিই তাই, সাজ্জাদ দেখেছে, গয়া যা ভয় করছিল তাই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল। প্রজা আন্দোলন ধীরে ধীরে হ'য়ে দাঁড়াল মুসলমানদের আন্দোলন। কোরান পাঠ করে জমা'তের কাজ শুরু হয়। মোনাজাত করে জমা'ত ভাঙে। ফলে যাও বা অন্য ধর্মের চাষী খাতক দু-চারটে এসেছিল ওদের সঙ্গে, এই সব সময় তারা বেকুব বনে যেতে লাগল। বেকুব না বনে উপায় কী? কী করবে তারা? মোনাজাতে যোগ দেবে, যা তাদের দস্তুর নয় নাকি একপাশে আলাদা দাঁড়িয়ে থাকবে? এবং দাঁড়িয়ে থেকে বুঝিয়ে দেবে যে তারা এক দুনিয়ার লোক নয়? তাই অন্যরা যারা এসেছিল তারা ধীরে ধীরে সরে গেল। কোথাও কোথাও তো এমনও রটে গেল যে চাষী খাতকের সমস্যার কথা আলোচনা হবে, এই ভড়াকি দিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের জমা'তে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তারপর কলেমা পড়ায়ে জাত মেরে দিচ্ছে। জমা'তের শেষে মোনাজাতে যোগ দেবার ব্যাপারটাকেই জাত মারার ফন্দী বলে রটিয়ে যেতে লাগল। বক্তৃতা শুরু করার আগে কৃষক নেতারা আস্‌সালামু আলাইকুম বলে শান্তি বর্ষণের প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, তাই দস্তুর। জমিদার মহাজনদের খয়ের খাঁরা এটাকেও হিন্দুর জাত মারার ফন্দী বলে রটিয়ে বেড়াতে লাগল। দিন দিন অমুসলমান চাষারা সরে যেতে লাগল কৃষক প্রজা আন্দোলন থেকে। শেষে এই দাঁড়াল যে এই আন্দোলনের নেতা মুসলমান, অনুগামীরাও মুসলমান। বক্তা মুসলমান, শ্রোতারাও মুসলমান।

গয়া বাপের কথাই ফলল। গয়া এই কথাই বলেছিল। সাজ্জাদ অস্বস্তি বোধ করছে। কিন্তু উপায়ই বা কী? এই নিয়ে বশিরের সঙ্গে কথা হয়েছে সাজ্জাদের। সাজ্জাদ বশির চায় সব গ্রামের সব চাষী সব খাতক তাদের সঙ্গে থাকুক। কেননা (১) নজর ও সেলামী আদায়ের জন্য জমিদারের পেয়াদা যে অত্যাচার মুসলমান চাষীর উপর করে, সেই একই অত্যাচার হিন্দু কি খেরেস্তান চাষীর উপরও করে, (২) নাম খারিজ ও পত্তনের জন্য মুসলমান চাষীকেও যে অতিরিক্ত খরচের বোঝা বইতে হয়, অমুসলমান চাষীকেও সেই খরচের বোঝা একই রকম বইতে হয়, (৩) খাজনার চাপ মুসলমান ও অমুসলমান চাষীর বেলায় কম বেশি হয় না, (৪) মহাজনের চক্রবৃদ্ধি সুদের ফাঁস মুসলমান ও অমুসলমান চাষীর গলায় একই রকম জোরে এঁটে বসে, (৫) ধান পাটের দর কমে গেলে হিন্দু চাষী, খেরেস্তান চাষী আর মুসলমান চাষী চোখে একই রকম আঁধার দেখে।

এইসব বালাই দূর করার কথাই তো সাজ্জাদ আর বশির ভেবেছে। সেইজন্যই তো প্রজা আন্দোলনে নেমেছে। এ ছাড়া চাষী খাতকের বাঁচার পথ নেই। তবে তাদের আন্দোলন কেন শুধু মুসলমানের আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল? আফসোস। হিন্দুরা সরে গেল কেন? আফসোস।

বশির আবু তালেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। আবু তালেব যে জবাব দিয়েছিল, তা নিতান্ত উড়িয়ে দেবার মত নয়। অন্তত সাজ্জাদের তাই মনে হয়েছিল। কথাটা গয়াও উড়িয়ে দিতে পারেনি। আবু তালেব বলেছিল, সব জমিদার আর মহাজন একই রকম। একই ভাবে চুষে খায়। কাজেই সেদিকে হিন্দু জমিদারে মুসলমান জমিদারে কোনোই ভেদ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে বাংলাদেশে জমিদার, মহাজন আর আড়তদার বেশির ভাগই হিন্দু। যে কটা মুসলমান জমিদার বা জায়গীরদার বা পত্তনিদার বা গাঁতিদার আছে তাদের আমলারাও সব হিন্দু। কথায় কথায় হিসেব দাখিল করে আবু তালেব। আবু তালেব বলেছিল, যারা জমির মালিক কিন্তু হাল চাষ করে না, জমির খাজনা আদায় করেই যাদের পেট চলে তাদের সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ, বড় বড় সম্পত্তির ম্যানেজার বা এজেন্টের সংখ্যা এক হাজার আর হরেক রকম গোমস্তা আমলা ফয়লা এদের সংখ্যা হল ৫১ হাজার। আর এদের প্রায় সবাই হিন্দু। এরাই নানা প্রভাব খাটিয়ে হিন্দু প্রজা আর খাতককে কৃষক প্রজা আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এরাই নানা গুজব রটিয়ে, কখনো বলছে কলেমা পড়িয়ে জাত মেরে দেবে, কখনো বলছে মুসলমানের হাতের পানি খাইয়ে জাত মেরে দেবে, হিন্দু চাষীদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে প্রজা আন্দোলন থেকে। আবু তালেব আরও একটা মজার খবর দিয়েছিল। হিন্দু বাবুরা আন্দোলন করে, হিন্দু প্রজারা আন্দোলনে আসতে চায় না। হিন্দু বাবুরা বন্দে মাতরম্ করে, আইন ভাঙে, বয়কট করে, বিলিতি জিনিস পোড়ায়, লবণ বানায়, চরকা চালায়, স্বদেশী স্বদেশী করে, বোমা মারে, ইংরেজ তাড়াবার জন্য দলে দলে জেলে যায়, কিন্তু ওদের বলুন, আসুন, আমরা বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করি, আসুন আমরা মহাজনী প্রথা তুলে দেবার জন্য আন্দোলন করি, কেননা এতে প্রজারা বাঁচবে, খাতক বাঁচবে, একজন বাবুভাইকেও সাড়া দিতে দেখা যাবে না। বাবুদের মুখে এক কথা, ইংরাজ তাড়ানো আগে, ইংরাজকে তাড়াতে পারলেই কৃষক প্রজার দুঃখ ঘুচবে। কৃষক প্রজা তখন নাকি দেশের রাজা হবে।

হিন্দু ভদ্দরলোকদের মুখি ক্যাবল অ্যাক কথা। আবু তালেব বলেছিল। আমরা কংগ্রেসী বাবুগের দরজায় গিছি, যে-সব বাবুরা কাউনসিলি যায়ে সাহেবগেরে উল্টোয়ে দিতি চান তাগের

কাছেউ গিছি, আবার যারা বোমা ছোড়েন তাগের কাছেউ গিছি। যাইনি কার কাছে? চাষী যে মরে গ্যালো, খাতক যে ফোত হয়ে গ্যালো। বাঁচান, এগের দিকি নজর দ্যান। দেশ তো এখেনে। একথা কইনি কারে? কিন্তু আফসোস, এই ডাকে আমরা হিন্দু নেতাগের সাড়া পাইনি। আফসোস চাষী খাতকরে বাঁচাবার আন্দোলনে, প্রজা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হিন্দু নেতারা আগোয়ে আসেন নি। বাংলার মুসলমান নেতারাই আগোয়ে আইছেন। তাই আন্দোলনের চিহারাউ এই রকম হইছে।

এ কথার উপর আর কথা কী? গয়া চুপ করে গিয়েছে। এখনও চুপ করে আছে। ওদের সঙ্গেই এখনও আছে। কিন্তু বুঝতে পারছে, সে ক্রমশ খাপছাড়া হয়ে উঠছে। একা হয়ে পড়ছে। রাস্তার এপারে কি ওপারেই কি, কেউ আর আগের মত গয়া কি বাঁশির হয়ে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না। এখন সবাই হিন্দু কি মুসলমান হবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। খাদু কি জমিরুদ্দির কথায় তার রাগ বা অভিমান তত বেশি হয় নি। যত বেশি হয়েছে চিন্তা। হাজতবাসের হুজ্জোতে তার ভবিষ্যৎটা একেবারে যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সে সত্যটাকে দেখতে পেয়েছে। এই মুসলমান গ্রামে মান মর্যাদা নিয়ে থাকার দিন তার চলে গিয়েছে।

"গয়া বাপ." সাজ্জাদ অপরাধীর মত বলল, "আমি বুড়ো হয়ে আইছি। আর কদিন? আমার গোরে যাবার সুময় পর্যন্ত ভিটে ছাড়িস্‌নে বাপ। তারপর তোর যা ইচ্ছে করিস। তোর বাপের শিওরে দাঁড়ায়ে কইছিলাম, গয়ার জন্যি ভাবিস নে গদা, ও আমার। তোর বাপ নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বুজিছিল। আমার এন্তেকালডা হতি দে বাপ। না হলি আমার ওয়াদা পোরবে না। তারপর ফটিকির বাপের ভিটেয় আর তোর বাপের ভিটেয় একসঙ্গে শিয়ালকাঁটা গজাতি দিস্‌।

সাজ্জাদের চাপা হাহাকারে গয়ার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আমি তালি একা না, জমিরুদ্দি মনে মনে বলল, তালি গয়া শালাও ভয় পায়। সেও হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ ১৪ ॥

ফটিকের দরজায় কড়া নড়ে উঠতেই সইফুন চমকে গেল। তবে কি ফটিকভাই ফিরে এলো? তার বুকটা ধক করে উঠল। সদর দরজার কড়াটা আবার খট্‌খট্‌ করে উঠল। সইফুনের শরীর-মন একটা তীব্র প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রইল। সে ছবি-বুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখটা দেখে নিল। ছবি-বু তার চাইতে অনেক সুন্দর। না, তার মুখটা অনেক ভাল। ছাই ভাল। সইফুন ভেজা গালটা মুছে ফেলল। চোখ মুছল। সে কিছুই বুঝতে দেবে না ফটিকভাইকে। তার সঙ্গে কথা বলারও দরকার নেই। কেন এসেছিল এ বাড়িতে? আম্মা কলো আপনি বাড়ি নেই। তাই ঘরখান সাফ কত্তি আইছি। কড়াটা আবার বেজে উঠল। এবার বেশ জোরে। সইফুন মুখটা আবার একবার মুছে নিল। তারপর গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দাউদের চোখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়। এই মেয়েটাকেই সে সেদিন ছবির সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল। কে এই মেয়েটা?

অপরিচিত একজন লোককে সামনে দেখে সইফুন থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি দরজাটা সে বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল।

দাউদ বলল, "আমি দাউদ। ছবির চাচাতো ভাই।"

দরজা বন্ধ করবার আগে সইফুন দাউদকে একপলক দেখে নিল। লোকটাও তার আপাদ-মস্তক দেখে নিচ্ছে। সইফুন খুব লজ্জা পেল। সে মুখ নিচু করে ফেলল।

"ফটিকভাই বাড়ি নেই?"

সইফুন জবাব দিল না। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। এক লহমা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খিল দিয়ে দ্রুত নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। তার বুক ঢিপিস্‌ ঢিপিস করতে লাগল।

আব্বার সঙ্গে দেখা হতেই সইফুন বলল, "বাজান, ছবি-বুর ভাই আইছে। ওগের সদরে দাঁড়ায়ে আছে।" বলেই নিজের ঘরে চলে গেল।

দাউদ প্রথমে বিস্মিত ফটিকের বাড়িতে এত সকালে এই মেয়েটিকে দেখে। ঠিক যেন এক মুঠো শিউলি ফুল, এমনি লাজুক। কিন্তু দাউদ তার চাইতেও বিস্মিত হল মেয়েটির ব্যবহার দেখে। আচ্ছা লজ্জা তো! একটা কথা বলল না, ফটিক ভাইকেও ডেকে দিল না, মুখের উপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল!

"আস্‌সালা-মু আলাইকুম!"

জয়নুদ্দিন বললেন, "আপনি আমাগের বিলকিস বিটির ভাই? তা এখেনে দাঁড়ায়ে আছেন ক্যান্‌? আসেন আসেন, আমাগের বাড়িতি আসেন?"

দাউদ ইতস্তত করে বলল, "ফটিক ভাইর সঙ্গে মোলাকাত কত্তি আইছি। ফটিকভাই বাড়ি নেই?"

"না, ভোরের মটোরে তো ঝিনেদায় চলে গ্যালেন উকিল সাহেব।"

দাউদ বলল, "তা'লি অ্যাখন যাই।"

মৌলবী জয়নুদ্দিন খপ্ করে দাউদের হাত চেপে ধরলেন। "আপনি দেখি ডাকা'ত! যাই বলালই যাই! ক্যান্, ছবি বিটি নেই, তাই? উকিল সাহেব বাড়ি নেই, তাই? ক্যান্ আমরা কি সব ভা'সে গিছি। আমার ছবি বিটির ভাই আইছে, আমার বিটি সইফুন দৌড়য়ে যায়ে ক'লো। সঙ্গে সঙ্গে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতিছি, আবার ফিরে না যায়। চলেন, চলেন। কুটুম আ'সে বাড়ির দরজার থে ফিরে যাবে ইডা কি অ্যাকটা কথা হ'লো? আর ছবি বিটিই বা একথা শুনলি কবে কী? অ্যাঁ।"

মেয়েটির নাম তা'লি সইফুন। খাসা নাম। দাউদ খুশি হল। আরও খুশি হল জয়নুদ্দিনের আন্তরিকতায়। বড় দেল খোলা লোক। এরপর ওদের বাড়িতে না যাওয়াটা ভাল দ্যাখায় না।

তবু বলল, "ভাববেন না আমি বাইরির থে আইছি। আমিউ এখেনে থাকি।"

"বাঃ, বাঃ, তা'লি তো আরউ ভালো।" জয়নুদ্দিন খুব খুশি হয়ে উঠলেন। "পরস্পর বিপদে আপদে, অ্যাক জায়গায় যখন থাকি, অ্যাঁ কী কন্? চলেন, চলেন। একটু চা-পানি একটু নাস্তা খায়ে তারপর যাবার কথা মুখি আনবেন।"

অগত্যা দাউদ মৌলবী জয়নুদ্দিনের সঙ্গ নিল। এবং ওরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে না বসতেই বাড়িসুদ্ধ সবাই জয়নুদ্দিনের হাঁকডাকে সচকিত হয়ে উঠল।

"জামিল! বিটি জামিলা! তোর মারে কি বু-রি ক' একটু চা-পানি বানাক। ছবি বিটির ভাই—"

"জে আমার নাম দাউদ।"

"বিটি জামিলা, তোর বু-রি ক' ছবি বিটির ভাই দাউদ মিঞার জন্যি বেশ ভালো করে চা-পানি য্যান বানায়। আর তোর আম্মাজানরে ক—"

মৌলবী সাহেবের তের বছরের ছেলে বরকতুদ্দিন দু-বাটি চা একটা কাঁসার থালায় করে এনে রাখল। তারপর সালাম জানাল। তারপর মৌলবী সাহেবকে বলল, "আম্মাজান নাস্তা তৈরি কত্তিছে।"

"ন্যান, চা-পানি খান।" সুস্‌প্‌স সুস্‌প্‌স চা-পানির বাটিতে সশব্দে চুমুক দিতে দিতে জয়নুদ্দিন বললেন, "আমার মা'ঝে ছাওয়াল। বাবু। বরকতুদ্দিন। ক্লাস এইটি পরীক্ষে দিল।"

বরকত থালাখানা নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

"বড়", সুস্‌প চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়ে মৌলবী সাহেব বললেন, "ছাওয়াল রেঙ্গুন।—সুস্‌প্—এখেনে তো কিছু—সুপ্‌স্—হলো না। হবে কী ক'রে? এখেনে কেউ কি কারুরি দ্যাখে? বড় ছাওয়াল কানুনগো পা'শ। আ'সে ক'লো, বাজান ডিস্‌ট্রিক্ট বোরডে সারভেয়ার নেবে। দ্যাখেন না চিন্টা করে। খান সাহেব খোন্‌কারই তো ইবার ভাইস চিয়ারম্যান, যদি ধরা-করা করলি কাজটা হয়ে যায়। তা খানসাহেব গিরাজিই করলেন না। অ্যাকটা হিন্দুর ছাওয়াল পোস্‌টোডা পায়ে গ্যালো। মুসলমানরা বাঁচবে বলে মনে হয় না। কেউ কি—সুস্‌প্—কারুরি সুস্‌প্—দেখে?"

উনি দাউদের দিকে চাইলেন। দাউদ একমনে চায়ে চুমুক দিয়ে চলেছে। তার চোখ দুটো শুধু এদিকে ওদিক ঘুরছে।

"তা—সুস্‌প্—বোঝলেন, রেঙ্গুনি গিয়ে যে ছাওয়ালের খুব খারাপ হইছে তা—সুস্‌প্—নয়। বরং এখেনে যা মাইনে তার ছয়-সাত গুণ রোজগার সে—সুস্‌প্—কত্তিছে। ওর আম্মারে লিখিছে যে এক বর্মী মেয়ের সঙ্গে ভাব-সাব হইছে, তারে শাদী করবে। তার নাকি দুকান আছে, বাড়িঘর আর পয়সাও আছে বেশ। সবই—সুস্‌প্—আল্লার মরজি।"

চায়ের বাটিটা খালি করে ঠকাস করে রেখে দিলেন মৌলবী সাহেব।

বললেন, "বড়ছাওয়াল তো এই বাবুরিউ নিয়ে যাতি চায়। কয়, দেশে মুসলমানের ছাওয়ালগের কোনও সুযোগ নেই। এখেনে আলি কিছু অ্যাকটা বরং কত্তি পারবে। তা ওর আম্মার ত্যামন গা নেই। বোঝলেন।"

বাবু থালায় করে রুটি বেগুনপোড়া আর গুড় আনল।

দাউদ দেখল বাবুর মুখটা অবিকল ওর দিদির মত। বিশেষত চোখের লাজুক চাউনিতে দুজনের খুব মিল। ছেলেটার প্রতি ওর কেমন মায়া পড়ে গেল।

বলল, "আপনার এই ছাওয়ালডা যে ছোট, নাহলি আমিই ওরে আমার কাজে ঢুকোয়ে নিতাম।"

মৌলবী সাহেব আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। বললেন, "এই তো খাঁটি মুসলমানের মত কথা। অ্যাক মুসলমান অন্য মুসলমানরে দ্যাখবে, তবে না মুসলমান বাঁচবে। আল্লাহ আপনারে হামেশা নেকীর পথে রাখুন।"

যাকে দেখবার জন্য দাউদের চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাকে আর একবারও দেখতে না পেয়ে দাউদ আশাহত হল।

"আল্লাহ্ আপনার রেজেক বৃদ্ধি করুন।"

এবং মৌলবী জয়নুদ্দিনের সরল ব্যবহার, আন্তরিকতা, তাঁর মেহ্‌মানদারি দাউদের যথেষ্ট ভাল লাগলেও এখন সে যখন কিঞ্চিৎ আশাহত এবং এই বৃদ্ধের অনর্গল বকবকানি তার বিরক্তি উৎপাদন করছে বলে তার মনে হল, তখন সে আর বৃথা সেখানে বসে না থেকে চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

হঠাৎ সে সালাম জানিয়ে খাপছাড়া ভাবে উঠে পড়ল। এবং খুব জরুরি কাজ আছে বলে তক্ষুনি উঠে দাউদ হন হন করে চলে গেল। ব্যাপারটা এমনই দ্রুত ঘটে গেল যে মৌলবী সাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তবে কি অজানতে তিনি দাউদ মিঞার মনে ব্যথা দিয়েছেন? না কি তাকে অপমানসূচক কোনও কথা বলেছেন? তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। দাউদ মিঞা যাচ্ছে দ্যাখ? য্যানো তারে বাঘে তাড়া করিছে?

হঠাৎ মৌলবী সাহেবের খেয়াল হ'ল, দাউদের পায়খানা চাপেনি তো? যাওয়ার গতি দেখে তো তাই মনে হয়। যাক্, মৌলবী সাহেবের বুক থেকে একটা ভার নেমে গেল। তা সে-কথাডা কলিই হ'তো। এখেনেই ব্যবস্থা ক'রে দিয়া যা'তো। উঁকিল সাহেবের বাড়িডে তো খালিই রয়েছে। শরম! আজকালকার ছাওয়ালগেরউ অ্যাত শরম! মৌলবী সাহেব দাউদকে খুব ভালোবেসে ফেললেন। এবং তক্ষুনি তাঁর মনে পড়ল, ঐ যাঃ! দাউদ মিঞার ঠিকানা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি? লোকটা কী কাজ করে, কনে থাকে কিছুই জানা হ'ল না।

প্রথম দিকে দাউদের মনে একটা শূন্যতাবোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কী। কিন্তু একটা অবয়বহীন অস্বস্তি তাকে পীড়িত করে তুলছিল। তার তখন মনে হয়েছিল ওই বাড়িটা থেকে দূরে চলে যেতে পারলেই সে আরাম পাবে। তাই সে হনহন করে এগিয়ে চলেছিল। বাবুর মুখটা ওর মনে পড়ল। ভারি কাঁচ এবং সুন্দর মুখখানা। ঠিক অবিকল ওর দিদির মত। সইফুন। ওর বাপ তো এই নামই বলল। কেমন নিষ্পাপ বিষণ্ন একখানা মুখ। যেন একরাশ শিউলি। কিন্তু ওকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিল কেন? বাপকে গিয়ে খবর দিল। কিন্তু তার সামনে একবারও বের হল না কেন? ছবির বন্ধু যখন, তখন তার একটা খবরও তো নিতে পারত? কেন কথা বলল না তার সঙ্গে?

দাউদের মুখে এমন বদ্ চিহ্ন কিছু কি ফুটে উঠেছিল যা মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বড় আয়না বসানো একটা পান-বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল দাউদ। আয়নায় নিজের মুখখানা বেশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা দেখছে দাউদ, হঠাৎ তার নজরে পড়ল দোকানদার তার কান্ড দেখে মিচকি মিচকি হাসছে। খুব অপ্রস্তুত হল দাউদ।

"অ্যাক প্যাকেট কাঁচি।" দাউদ দোকানদারের সামনে একটা টাকা ছুঁড়ে দিল। "আর অ্যাট্‌টা মাচিস।"

দোকানদার পানে চুন ঘষছিল। পানের খন্দের পাশে দাঁড়িয়ে।

দাউদ তাড়া দিল। "কই!"

"দ্যাখেন দ্যাখেন মিঞা, সুরতটারে আগে ভালো ক'রে দেখে ন্যান।" দোকানদার পান সাজতে সাজতে ধীরে-সুস্থে আয়নার ব্যাখ্যান শুরু করল। "অ্যামন আয়না গুটা যশোর খুলনেয় আর অ্যাকখানউ পাবেন না। এই আয়না হ'ল গে লাট বিবির চুল বাঁধার খাস আয়না। এর জন্ম বিলেতে। কলকাতার চোরাবাজারের থে এই বান্দা কিনে আনিছে। হাউস মিটোয়ে সুরতখানা দেখে ন্যান।"

দাউদের ফরসা মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেল। এবং তার মাথায় চড়াক করে রাগ উঠে গেল। ভাবল এক চড়ে দোকানদারের বদন বিগড়ে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সে সামলে নিল। আসলে তো তারই দোষ। সে হাঘরের মত আয়নায় তার মুখখানা দেখছিলই বা কেন? সইফুনের জন্য! সে কেন তার মুখের উপর অমন করে দরজা বন্ধ করে দিল?

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই-এর বাক্‌স নিয়ে দাউদ পিট্‌টান দিচ্ছিল।

"ও বড় মিঞা!" দোকানদার ডাকল। "ফেরত পয়সাডা নিয়ে যান।"

ছবি নিশ্চয়ই সইফুনকে তার কথা বলেছে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নাহলে সইফুন এ রকম ব্যবহার করত কিনা সন্দেহ। দাউদ জানে, সে শুনেছে, তার আত্মীয়স্বজনরা তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। সে তার চাচার টাকা নষ্ট করেছে বলে নয়, এমন কি কালোজিরেকে নিয়ে সে পালিয়েছিল বলেও নয়। ফুটকি! ফুটকির জন্যই তাকে এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে হ'চ্ছে। ফুটকি মরে বেঁচে গিয়েছে, কিন্তু ফুটকি মরে তার মান-মর্যাদা-ইজ্জত সব জখম করে দিয়ে গিয়েছে।

সইফুন তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল!

দাউদ এ ঘটনাটা ভুলতে পারছে না। আসলে তার আজ যাওয়াই উচিত হয়নি ফটিক ভাইএর বাসায়। খালেক মুন্সি তাকে যে খবরটা পৌঁছে দিতে বলেছিল ফটিক ভাইকে কাল রাতেই তো সে তা জানিয়ে দিয়েছে। তবে আজ সাত সকালে আবার সে বাড়িতে ছুটেছিল কেন?

দাউদ ফটিকের হাত দিয়ে তার চাচার টাকাটা ফেরত দিতে চেয়েছিল। সে-টাকা সে নিয়ে গিয়েছিল। ফুটকি মরেছে। ফুটকিকে সে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কিন্তু তার সংসারে তার মান ইজ্জত ফিরিয়ে আনতে চায়। আজ ফুটকি নেই, মরেছে। কালোজিরে নেই, ভেগেছে। ওদের দুজনের কথা তার মনে পড়ে। ফুটকির অক্লান্ত সেবার কথা, কালোজিরের রাতকাটানোর উন্মাদনাময় অভিজ্ঞতাব কথা কখনো ভুলবে কি দাউদ? কিন্তু আজ তাদের কেউ নেই। শুধু তার জেন্দেগী আছে। সে কি শুধু তার সারা জেন্দেগীভর অতীতের ভুল বা অপরাধ বা গুনাহ্, যাই সে করে থাকুক তার জের বয়ে বেড়াবে? না আল্লার কাছে তার কৃতকর্মের জন্য, তা সে ভুল বা অপরাধ বা পাপ যাই হোক না কেন, মার্জনা চেয়ে নিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবে? দাউদ শাস্ত্রের ধার ধারে না। কোরান, হাদীস, ফেকা, এসব কেতাব থেকে তার দূরত্ব অনেক। কিন্তু সে মুসলমান। সে তার সংস্কার অনুযায়ী জানে যে আল্লাহ্‌র যা অভিপ্রায় তদনুযায়ীই সে চলবে। আর সে জানে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। আর সে জানে আল্লাহ্ মার্জনাকারী। আর যদি আল্লাহ্ মানুষকে তার কৃতকর্মের অনুযায়ী যোগ্য শাস্তি দিতেন তবে জগতে তিনি একটি প্রাণীকেও বাদ দিতেন না কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্ধারিত কাল পর্যন্ত সময় দিচ্ছেন। এবং এর মধ্যে তাকে শোধরাতে হবে। খোদা সকলকেই শোধরাবার সুযোগ দেন। কিন্তু যাহারা ইহার পরে তওবা করে এবং নেক কাজ করে তাহারা রেহাই পাইবে, কেননা, আল্লাহ, নিশ্চয় ক্ষমাশালী, পরম দয়ালু।

অতএব সে ফিরবে। ফিরছে দাউদ। কালোজিরে তাকে সর্বস্বান্ত করে যেদিন আরেকজনের সঙ্গে চলে গেল সেদিন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল দাউদ। নারায়ণগঞ্জের এক হিন্দু গুণ্ডার উপর ভর করে কালোজিরে কলকাতায় পাড়ি মারে। দাউদ ভেবেছিল দুটোকেই খুন করবে। নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ঘাটে মেলটা ফেল করে কলকাতার স্টিমার ধরবে বলে সারারাত বসেছিল। সেই সময় বাইতিদাকে স্বপ্নে দেখে। দাউদকে বলছে, রাখতি পারলি নে দাউদ। তালি শালা ওই শালীর ভাবনা ছা'ড়ে দে। অ্যাখন নিজির ভাবনা ভাব।

সেই থেকে কালোজিরের ব্যাপারে চিন্তা সে আর করে না। তবে প্রথম প্রথম একা বিছানায় কালোজিরে এসে খুব জ্বালাত। তাড়াতে পারত না দাউদ। অস্থির হয়ে উঠত। দাউদ ফুটকির কাছে কাতর হয়ে আশ্রয় চাইত। ফুটকির কাছে ফিরে যেতে চাইত। তার কাছে মাফ চাইত। এর মধ্যে সে যশোরে এসে পড়েছে। খান সাহেব খোনকারের জামাই মেয়ে যশোর আসছিল। পথেই আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এবং খোনকারের কৃপায় জেলা বোরডের ঠিকেদারী। আশ্চর্য দক্ষতা দেখাতে লাগল দাউদ ঠিকেদারী ব্যবসায়ে। এবার সে সরকারী কাজও বের করেছে। হাতে কিছু পয়সাও জমিয়েছে। তার ঠিকেদারী বাগাবার একমাত্র মূলধন, সে মুসলমান। এবং তার অসাধারণ সুন্দর চেহারা। খোনকারের বড় মেয়ে, সাব ডেপুটির বিবি, সাকিনা তার নাম দিয়েছে ইউসুফ। দাউদ তার ইউসুফ ভাই।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও সইফুন তার সঙ্গে একটা কথা বলল না। তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তার বাপকে ডেকে দিল, তার ভাইকে দিয়ে চা-পানি পাঠালো, নাস্তা পাঠালো, কিন্তু একবারের জন্যও তাকে উঁকি মেরে দেখার কৌতূহলও প্রকাশ করল না। সইফুন কি রক্তমাংসে গড়া? সে কি অন্ধ?

দাউদ যখন বাসায় এসে পৌঁছুলো তখন সে বেশ ক্ষুব্ধ আর সত্যি বলতে কি বিভ্রান্তও। বাসায় আসা মাত্র তার কারপরদার বা কম্‌বাইন্‌ড হ্যান্‌ড কাতলা এসে জানাল নাস্তা তৈরি এবং জিজ্ঞেস করল, গোসলের পানি দেবে কিনা?

দাউদ তাকে গোসলের পানি দিতে বলল। বাড়িটা ভালোই পেয়েছে দাউদ। যদিও টিনের চালা। কিন্তু ঘর তিন চারখানা, রসুইখানা গোসলখানা আলাদা এবং বাড়িটার সামনে পিছনে জায়গা আছে। পেয়ারা গাছ, আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, লিচু গাছ, এক সারি সুপারি ও কয়েকটা নারকেল গাছও আছে। শান বাঁধানো ইঁদারার পাশে একটা তুলসীমঞ্চ আছে তবে তাতে তুলসী গাছ নেই। অনেকদিন ধরেই ওটা ফাঁকা পড়ে ছিল। কাতলার কি খেয়াল হতেই একটা মোরগ ফুলের গাছ সেখানে লাগিয়ে দিয়েছে। বেশ দিব্যি বেড়ে উঠেছে সেটা। সদর দরজার বাঁ দিকেই সুন্দর একটা গন্ধরাজ আর একটা ঝুমকো জবার গাছ। করবী ফুলের গাছটা দাউদের গোসলখানার জানলা দিয়ে দেখা যায়।

এই বাসাটাব মালিক আসলে কুরী বাবুরা। ঐ বাবুদেরই কেউ একজন রক্ষিতা পুষতেন এই বাড়িটায়। সেইজন্যই এত শৌখিন। তখন এদিকে মুসলমানদের বাস এত বেড়ে যায়নি। তারপর এ বাড়িটা ভাড়া নেন সেরেস্তাদার তৈয়ব আলি। তারপর বাড়িটা বেশ কিছুদিন খালি পড়েছিল। গাজী গোলাম তাকে এই বাড়িটা বেশ সুবিধেজনক শর্তে জোগাড় করে দিয়েছে। গাজী গোলাম খোন্‌কার সাহেবের ডান হাত।

জামা গেঞ্জি খুলে বারান্দায় টুল পেতে আরাম করে তেল মাখতে বসল দাউদ।

"আস্সালামু আলাইকুম।" খাতা পত্তর আর একটা টেপ ফিতে নিয়ে গাজী গোলামের

ছোট ভাই তাহের মিঞা ঢুকল।

"ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম্‌।" দাউদ নাকের ফুটোয় তেল দিয়ে জোরসে টানল। বলল, "আসেন ভাই।"

তাহের মিঞা বলল, "কালিগঞ্জ-কোটচাঁদপুরির রাস্তার কাজডা ধরিছেন তো বড় ভালো। চল্লিশ ফুট অ্যালাইনমেন্ট, তবে অ্যাখন মাটির কাজ হবে কুড়ি ফুট। পাকা অ্যাখন হবে ছফুট। রাস্তাটা বহু জায়গাতেই অ্যাকেবারে ভাঙে গেছে। অ্যাকেবারে গুড়োর থে মাটি ফেলতে হবে।"

দাউদ বলল, "উঁচুর হিসেবডা কী?"

তাহের মিঞা বলল, "চার ফুট উঁচু তো ছিলই অ্যাখন হবে সাত ফুট। তা'লি ধরেন গড়ে তিন ফুট উঁচু তো হচ্ছেই। কিন্তু কথা তো তা না। চার মাইল রাস্তার মধ্যি ফারলং ছয়েক ভাঙে অ্যাকেবারে মাঠ হবে। তারপর ধরেন কাল্‌ভার্‌ট হবে ছয়টা, চারডে ছোট, দুডো বাইশ ফুট ক'বে। কাজডা খারাপ না।"

দাউদ মনে মনে হিসেব কষতে লাগল।

তারপর তাহের মিঞাকে প্রশ্ন করল, "দু'পাশে ফ্ল্যাংক্‌ কতডা রাখতি হবে?"

"তা পাঁচ দশ ফুট ধরেন।"

"তাহলি মুটামুটি পনের লাখ মাটি হবে।" দাউদ বলল। "কী কন্‌?"

তাহের মিঞা হাসল। "না অত হবে না। চোদ্দ লাখ সি এফ টি বড় জোর দাঁড়াবে।"

দাউদ বলল, "মাটি আনতি হবে কত দুরির থে?"

"পিরায় জায়গাতেই এক শ ফুটির মধ্যিই পাওয়া যাবে। বোঝলেন।" তাহের বলল। "তবে দু তিন ফারলং-এ এটটু দুরি যাতি হতি পারে।"

দাউদ বলল, "মাটির রেট পাইছি, চার টাকা হাজার। কী, কাজডা তুলে দিতি পারবেন না?"

তাহের হাসল। বলল, "আপনি এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে আরেকবার দ্যাখা করেন। বড় ভাই তো কয় লোকডা মুসলিম লীগির অ্যাকজন বড় সাপোরটার। উনি নেক নজরে চালি আর চিন্তা কী? ওঁর সইতিই তো বিল পাস হবে।"

দাউদ বলল, "কথাডা বলিছেন বড় ভালো। গুলাম মিঞারে কন না পি ডব্‌লিউ ডির এস ডি ও সাহেবরে ভালো করে অ্যাকটা দাওয়াত দিতি। খরচা আমার। এস ডি ও মসিউর রহমান বড় অ্যাক রুখা লোক। হিন্দুরা চারিদিক লুটে পুটে খাচ্ছে। হিন্দু অফিসাররা হিন্দু ঠিকেদারদের স্বার্থ রক্ষে করার জন্যি কী না করতিছে। পান খাওয়ার কমিশন পয্যন্ত কমায়ে নেছে তা জানেন? আর আমরা লীগির লোক হয়ে লীগির অ্যাকজন অত বড় মাতব্বরের কাছ থে একটু মদত পাবো না?"

তাহের বলল, "তা তো বটেই। আমি বড় ভাইরি একথা কব।"

"কওয়া কওয়ি নয়," দাউদ বলল, "গুলাম ভাইরি দিয়ে এ কাজডা করায়ে নিতি হবে। আমবা নতুন এ লাইনি নামিছি। কিন্তু দ্যাখেন কাজে কামে মুসলমান ছাড়া কারুরি নিইনে। হিন্দুরা এ লাইনি কাজ ক'রে ক'রে ঘুণ হয়ে গিয়েছে। তাবা যত লাভ রা'খে কাজ তুলে দিতি পারে, অ্যাকেবারে নতুন আ'সে আমরা সিডা ক্যামন করে কবব। কন তো?"

"সিডা তো অ্যাকশ বার।" তাহের উৎসাহিত হয়ে উঠল।

"গুলাম ভাইরি এ কথাডা বুঝোয়ে কবেন।" দাউদ বলল, "মাটি কাটার রেট দিয়েই আগে কাজডা শুরু করি। তারপর রোলারের কাজ, বক্স কাটিং-ইর কাজ, সোলিং-ইর কাজের য্যামন য্যামন সুমায় হবে, আমরা ত্যামন ত্যামন এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে ব'সে ওসবের রেট্‌ ঠিক করে নেবো। উনি বড় ভাইর মত আমাদের পিছনের থে শলা-পরামর্শ মদত দেবেন আর আমরা সামনে থা'কে তাঁরই নির্দেশ মত কাজ ক'রে যাবো। এতে আমাগের চোট খাওয়ার ভয় থাকবে না। ফলে আমরাও আমাগের কওমের খেদমত কত্তি পারব। এস ডি ও মসিউর রহমান সাহেব, জিলা বোরডের সাব-ওভারশীয়ার নাজির হোসেন সাহেব এগেরউ আমবা খুশি করে দিতি পারব। আর তার চইতিউ বড় কথা, আমাগের নীট লাভের ওয়ান পারছেন্‌ট আমরা কওমের খেদমত আর মুসলিম জাহানের তরক্কির জন্যি লীগ ফান্‌ডে জমা দেব।"

তাহের বলল, "আপনি ভাই নিশ্চিন্ত থাকেন, আমি বড় ভাইরি দিয়ে এস ডি ও সাহেবরে দাওয়াত দিয়াতিছি। আর আপনি যা কলেন, এ আমি বড় ভাইরি যায়ে কব। আপনি এই বয়েসের থেই কওমের কথা ভাবতিছেন, একথা শুনলি বড় ভাই খুবই খুশি হবেন। তা'লি অ্যাখন আমি উঠি।"

তাহের মিঞা উঠে গেলে দাউদও গোসলখানায় ঢুকল। দাউদের নিজেরও অবাক লাগে। চাচা তাকে অ্যাত করে বলেও, অ্যাত সুযোগ দিয়েও মাছের ব্যবসায়ে তার মাথা খোলাতে পারেনি। কত লোকসান দিয়েছে। খারাপ কাজ করতেও কি কিছু আর বাকি রেখেছে! কিন্তু ঠিকেদারি ধরবার সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন মাথা খুলছে। যেন এই কাজই সে ছোটবেলা থেকে করে এসেছে। গোসল সেরে সে ধোপদুরস্ত পোশাক পরে নিল। আজ একবার খোন্‌কারের বাড়ি যেতে হবে। বোরডের বাকি টাকাটা তিনি আদায় করে দেবেন বলেছেন আর রিপেয়ারের কিছু কাজও বাকি বের হবে।

বাইকটা নিয়ে উঠোনে নামতেই কাতল ছুটে এল।
বলল, "জে, নাস্তা না খায়েই যে বেরোয়ে যাতিছেন বড় ?"
দাউদ বলল, "খান সাহেবের বাড়ি যাতি হবে। তাড়া আছে। নাস্তা অ্যাখন আর খাবো না।"
"দুপুরে কী করবেন ?"
"কী করবেন মানে !"
"না, খান সাহেবের বাড়ি যাতিছেন, নাস্তা খালেন না। তা দুপুরিউ কি ওখেনে খাবেন ?"
দাউদ বলল, "না, আমি বাড়ি আসব। খানা পাকায়ে রাখবা।"
"জে।" কাতল বলল, "কী পাকাবো ?"
"রোজ য্যামন পাকাও আজউ তাই করবা।" দাউদ বেরিয়ে গেল।

আজকাল খুব একা লাগে দাউদের। সাইকেলের প্যাডেলে প্রথম চাপটা দিতেই কথাটা মনে পড়ল। উইট্‌কপ-এর সীটটা মচমচ করল। ফুটকির কথা মনে হয়। কেন মরল ফুটকি ? দাউদ অবাক হয়। এ মুসলমানের বিটির মত কাম তো না। মুসলমানের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মালে সে কেন নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নেবে যে সে বাঁচবে না মরবে ? সে শুধু সবুর করে থাকবে। কটা দিন সবুর করে থাকতে পারল না ফুটকি ? আজ দাউদ নিজে রোজগার করছে। তার কাজের জন্য কাউকেই কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে না। চাচাকেও না। চাচার কাজে তার যে মন লাগেনি তার কারণ আর কিছুই নয়, সে-কাজে চাচাই ছিলেন মালেক আর দাউদ ছিল হুকুমবরদার। আমি, ফুটকি, কারুর হুকুম মানে চলতি পারিনে। অ্যাখন আমার হুকুম আমি নিজি মানি। নিজিরি অ্যাখন আর কারুর চাইতি ছোট ব'লে মনে হয় না। তাই এ কাজ আমার খুব ভালো লাগে। এই ঠিকেদারি কাজডারে আমি খুব বড় করে তোলবো। আমি বাড়ি তৈরির ঠিকে নেবো ফুটকি। আমি পারবো ফুটকি, এসব কাজ আমি পারবো। আমি অ্যাকটা ইটখুলা বানাবো সইফুন। এ কথা অ্যাতদিন মনে মনে রাখিছিলাম। আজ ক্যাবল তুমারেই কলাম।

তুই আমার উপর অ্যাত নারাজ হলি ক্যান ফুটকি ? তুই ম'রে গেলি ক্যান ? কষ্টই পাস আর দুঃখই পাস তুই তো মুসলমানের বিটি, তুই ক্যাবল সবুর করে থাকবি। মোল্লা মৌলবীগের কথা শুনিস নি ? তাঁরা না হামেশাই কন্, বিবিগণ শুনিয়া রাখ, যদি নেককারিণী হইতে চাও তাহা হইলে খোদার মরজিমত জেন্দেগী কাটাইয়া যাও। খোদার নিবন্ধনে যার যেরূপ অদৃষ্ট ফলিয়াছে, তাহার উপরই শোকর করা একান্ত কর্তব্য। যাহার স্বামী পাগল, বুদ্ধিহীন বা মুর্খ, তাহার পক্ষে সেই যে আকাশের চাঁদ তাহা মনে করিতে হইবে। এবং সবুর করিয়া থাকিতে হইবে। ক্যান্ সবুর করে থাকলি নে। আজ তা'লি তোরে নিয়েই বাসা বাঁধতাম। আমি ভা'লো হয়ে গিছি ফুটকি। আমি জানি নে তুমারে কিডা কি কইছে সইফুন, কিন্তু আমি অত খারাপ লোক সত্যিই আর নেই। অ্যাখন নিজিরি সামলাতে পারি। ফুটকিরি আমি ভালোবাসতি চেষ্টা করিছি। সত্যিই করিছি। কিন্তু ক্যান্ যে সব গোলমাল হয়ে গেছে কতি পারিনে। ওরে আমি ভয় করতাম সইফুন। আর ততই আমি রাগে যাতাম। আর তারপর সব গোলমাল হয়ে যাতো। মনে হত ও আমার চাচার শালী, আর চাচা আমারে টাকা দিয়ে পুষতিছে। ক্যাবল ফুটকির জন্যি। ক্যাবল ফুটকির কথায়। তাই আমার মনে হত আমি যে শুধু চাচার গুলাম তাই না, আমি ফুটকিরউ গুলাম। ক্যান্ মনে হ'তো জানিনে। কিন্তু মনে হ'তো।

আমি আমার বিবির গুলাম ! আমার নিজির হিম্মত কিছুই নেই ! এই চিন্তা, বিশ্বাস কর সইফুন, আমারে পাগল করে দিত। তখন কী যে আমার হ'তো, আর কী যে ক'রে বসতাম, আমি নিজিউ জানিনে। তুমি কারুর শুনা কথায় আমার উপর নারাজ হয়ো না সইফুন। তুমারে আমি আমার সব কথা কতি চাই ? শুনবা সইফুন শুনবা ? আমি বড় অ্যাকা সইফুন, বড় অ্যাকা ?

দাউদ খোনকারের বাড়ি যাবে বলে সাইকেলে চেপেছিল ? হঠাৎ দেখে সে মৌলবী জয়নুদ্দিনের বাসার সামনে এসে পড়েছে। ছলাক করে ওর মুখে রক্ত উঠে গেল। সে ভাবল চলে যায়। কিন্তু নেমে পড়ল। তারপর মৌলবী সাহেবের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাল, ক্রিলিলিং ক্রিলিলিং।

॥ ১৫ ॥

ইয়াকুব বলেছিল ঢাকার স্পিরিট। তার চেহারাটা ফটিক স্পষ্ট ধরতে পারেনি। কিন্তু ইয়াকুবের এই উদ্দীপনার উৎসটা যে কী, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। রাজনীতির স্তরে নবীন এবং তরুণ শিক্ষিত মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধের একটা প্রবল জোয়ার আসছে। তাকেই হয়ত ইয়াকুব বলছে ঢাকার স্পিরিট। এ স্পিরিটটা শুধু ঢাকার হতে যাবে কেন ? বাংলাদেশের সব শিক্ষিত মুসলমানেরই কি এই স্পিরিট নয় আজ ? মাত্রাভেদ হয়ত আছে, চিন্তার স্তরভেদও হয়ত আছে কিন্তু মুসলমানকে আজ যদি বাঁচতে হয়, তার প্রতি অনুষ্ঠিত দীর্ঘদিনের অবিচার, অনাচার অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিকার যদি করতে হয়, তার হক যদি আদায় করতে হয় তবে তাকে মুসলমান হয়েই তা করতে হবে, নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে, এই ধারণাটি আজ শিক্ষিত এবং নতুন গজিয়ে ওঠা

মধ্যবিত্ত মুসলমানের মনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাঁরাও দেখি দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে পুরোপুরি মুসলমান হবার কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে উদ্যত হয়ে উঠেছেন। অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা দুপুরুষে শিক্ষিত এবং পেশাগতভাবে সফলতা অর্জন করেছেন অর্থাৎ বিত্তশালী হয়ে উঠেছেন এবং পরস্পর সাক্ষাৎ হলে "আপনার পরিচয়", এ প্রশ্ন বাংলায় জিজ্ঞেস না করে, খাজা উরদুতে "আপ কী তারিফ" বলতে গর্ব বোধ করছেন, তাঁরা প্রাণপণে তাঁদের বংশলতিকার মূল শিকড়ের সন্ধানে কল্পনাকে উদ্দাম ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন, আরব, তুরস্ক, আফগানিস্তান, খোরাসান, ইরানের ঊষর পথেপ্রান্তরে। তাঁদের ধমনীর রক্ত সৈয়দ শেখ মোগল পাঠানের সাযুজ্য লাভের কল্পনায় ক্রমশ উন্মত্ত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। যাঁর বংশলতিকার শিকড় বাংলা দেশের শ্যামল ও সরস জমিনে প্রোথিত সে যেন অন্ত্যজ। সে যেন অভাগা। এমন কি সে যেন মুসলমানও নয়। হয়ত ইয়াকুব তার তারুণ্যের উত্তেজনায় একেই বলেছে ঢাকার স্পিরিট। এই ধরনের চিন্তার সামনে এলে ফটিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। একটা অস্বস্তি তার আত্মজিজ্ঞাসাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে?

আমার শিকড় কোথায়?

বাসের ঝাঁকুনীতে শফিকুলের চটকা ভাঙল। ধোপাঘাটায় এসে বাস থেমেছে। দেখল সামনের সীট থেকে মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী ততক্ষণে উঠে পড়েছেন এবং তাঁর বিরাট আমামা পাগড়ী এবং জোব্বা সামলাতে সামলাতে কুঁজো হয়ে বাস থেকে নামছেন। বোধ হয় ওকে দেখতে পাননি কিংবা চিনতে পারেননি। শফিকুল ভাবল। একে একে যাত্রীরা সব নেমে যাচ্ছে। দড়াটানা ঘাট। সামনেই কালীদহ। ফটিক ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে যে ধোপাঘাটার এই কালীদহ নাকি এমনই ভীষণ জায়গা যে সাহেবরা অনেক চেষ্টা করেও পুল বানাতে পারেনি। গাড়ি ঘোড়া তাই দড়াটানা বোটে পার করতে হয়। মৌলবী সাহেব নেমে যাবার পর সবাই যখন নেমে গেল তখন ফটিক সবার শেষে বাস থেকে নামল। বোটটা তখন নদীর মাঝ বরাবর। ওপার থেকে আসছে। বোটে দুটো ঘোড়ার গাড়ি, গোটা কতক সাইকেল আর হাটুরে লোকের একটা জটলা।

আমার শিকড় কোথায়? কেন, আমার গ্রামে। জন্মেছি যেখানে? কিন্তু আমি তো এখন উকিল। তবে এখন আমি কী? তুর্কী না তুরানী, আরবী না ইরানী? সৈয়দ না শেখ, মোগল না পাঠান? না বাঙালী? প্রশ্নটা আবার শফিকুলের মাথায় ঘাই মেরে উঠল। খান সাহেব খোন্দকার বজলুর রহমান সহরের এক বিশিষ্ট মুসলমান। তিনি এখন আশরাফ শিরোমণি। জজ সাহেব, ম্যাজিসট্রেট, এস পি, সিবিল সারজন, ইসটিশান মাস্টার, চেকার এবং সমস্তরের লোকদের সঙ্গে ইংরাজীতে, মক্কেল বাড়ির চাকর-বাকর, উমেদার প্রভৃতির সঙ্গে উরদুতে কথা বলেন। মৌলবী জয়নুদ্দিন বলেন, খান সাহেবের একটা পুরো উরদু কথা শেষ করতি যে অন্তত গুটা তিনিক "ইয়ানে" লাগে, সিডা জানেন? না হলি যে বাংলা জবান বেরোয়ে আসতি চায়। 'ইয়ানে'র শলা দিয়ে গুতো মা'রে তারে ফের পেটের মধ্যি ঢুকোয়ে দিতি হয়। মৌলবী সাহেবের কথার ধরনে ফটিক হেসে ফেলেছিল। মৌলবী সাহেব বলেছিলেন, খালি বিবি আর বিয়াই, এগের সঙ্গে খোন্‌কারির বাংলায় কথা কতিই হয়।

খান সাহেব খোন্দকার বজলুর রহমান যেহেতু বর্তমানে কুলীন বা শরীফ মুসলমান অর্থাৎ আশরাফ, সুতরাং সেই হেতু নিশ্চয়ই তাঁর বংশপরিচয় আরব, ইরান, তুর্কী বা আফগানের কোনও বড় শরীফের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ফেলেছে। তা বাঁধুক, এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই শফিকুলের। তার ব্যথা অন্য জায়গায়। যারা তা নয়, যারা স্বীকার করে আমরা এদেশের। আমাদের পূর্বপুরুষ হয় হিন্দু, নয় বৌদ্ধ। মানুষের অধিকার পাব বলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, হ্যাঁ স্বেচ্ছায়। এইটাই তো ভারতের রীতি। তারা? এদেশে তাদের স্থান কোথায়? আবহমানকাল ধরে তো ভারতে ধর্মান্তর গ্রহণ চলে আসছে এবং বহুক্ষেত্রেই তা স্বেচ্ছায়। অনার্যরা আর্য আচার ও ধর্ম গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছে হিন্দুরা। আফগান বা ইরানী বা তুর্কী বা মোগল বিজেতারা আসবার বহু আগেই আরব বণিকদের বাণিজ্যপোতে সওয়ার হয়ে ভারতে এসেছিলেন বুজরুগ্‌ মুসলমান প্রচারকের দল। তাঁদের হাতে ছিল পবিত্র কোরান এবং তরবারি নয়, তাঁদের কণ্ঠে ছিল জাতিভেদের পাঁতি নয়, মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের বাণী—সাম্য শান্তি ভালোবাসা এবং সহিষ্ণুতা। এই হল আল্লাহর প্রিয় রসুলের সুসমাচার। ইসলামের মূল বাণী। হ্যাঁ এই বাণী গ্রহণ করেছি স্বেচ্ছায় আমি বা আমার কোনও পূর্বপুরুষ। যেমন যীশুর বাণী বহন করে ভারতে এনেছেন মহামানব খৃষ্টেরই এক মন্ত্রশিষ্য সন্ত টমাস্‌। ইংরেজ বা ফরাসী বা ওলন্দাজ বা পর্তুগীজ বিজেতারা আসবার বহু বহু আগে। মৈত্রী ও করুণার এই বাণী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন হিন্দু, বৌদ্ধ ও প্রাগার্য আদিবাসীরা। দীক্ষিত হয়েছেন নব ধর্মে। এতে অপরাধ কোথায়? মুষ্টিমেয় কয়েকজন লুঠেরা ছাড়া যে মুসলমান বিজয়ীরাই ভারতে এসেছেন, আপন করে নিয়েছেন এই ভারতকে বিবাহ বন্ধনে, আত্মীয়তায়। মিশে গিয়েছেন এই ভারতেরই মৃত্তিকায়, জনসমুদ্রে, অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছেন ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে।

তবে কেন আমি অঙ্গীভূত হয়ে গেলাম না? যে বিশ্বচেতনায়, সর্বব্যাপী যে আত্মীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপনিষদের হিন্দু কোন দেবতাকেই অর্ঘ্য দিতে বাকী রাখল না, সেই হিন্দুরই অধস্তন পুরুষেরা সাম্য শান্তি সহিষ্ণুতা ও মানবপ্রেমের মহান বাণীকে বাইরের

দরজা থেকেই কুণ্ঠিতভাবে ফিরিয়ে দিল। একি অদৃষ্টের পরিহাস না ইতিহাসের নিষ্ঠুর কৌতুক?

দড়াটানা বোট থেকে সকলের আগে দেওয়ানবাড়ির মেজকর্তা নামলেন। ফটিক দেখেই দ্রুত এগিয়ে গেল এবং সেইখানেই প্রণাম জানাল। মেজকত্তা ওকে সংগে সংগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুশল বিনিময়ের পর জানা গেল, মেজকত্তার বড় জামাই ভূষণ ডাক্তার আসাম থেকে ফিরে এসে ঝিনেদায় ডাক্তারি ফেঁদেছিলেন। এবার নবদ্বীপে গিয়ে বাস করা ঠিক করে ফেলেছেন। মেজকত্তা মেয়ের কাছে যাচ্ছেন ক'দিন থাকবেন।

"তারপর," মেজকত্তা জিজ্ঞেস করলেন, "বাপকে দেখতে যাচ্ছ? যাও। বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। ক্ষমতার দম্ভ এত বেড়েছে যে তা দেখাবার জন্য কটা মানী লোককে হাজতে পুরে দিল! কী যে সব ঘটছে গ্রামে, একেবারে বোধগম্যতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তোমার বাবাকে অপমান যে গ্রামের অপমান, এ বোধটাও আমাদের চলে গেল! যাও বাবা যাও, তোমাকে দেখলেও তোমার বাবা একটু আশ্বস্ত হবেন।"

ফটিক বলল, "আমাদের ডাক্তার জামাই-এর বাসাটা কোথায়?"

গাড়ি, সাইকেল, মানুষ সব বোট থেকে নেমে গেলে দুটো মাঝি বোটের সামনের দিকটায় আড়াআড়িভাবে দুটো বাঁশ শক্ত করে বেঁধে দিল। বাসটা প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিল কয়েকটা।

ফটিক বলল, "মেজোবাবু, আসুন আমরা পথ ছেড়ে দাঁড়াই।"

মেজোকত্তার হাঁটুতে একটু বাতের ভাব হয়েছে। ফটিকের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। আগে বাসটা সন্তর্পণে গিয়ে বোটে উঠল। তারপর যাত্রীরা। এদিকে বোট ভরে উঠছে।

"আমার জামাই-এর বাসা হাসপাতালের কাছে। বক্সীদের বাড়ির সামনে। তারপর তোমার প্র্যাকটিসের খবর কী?"

মোটরের প্যাঁক প্যাঁক হর্নে সচকিত হয়ে ফটিক হেসে বলল, "এখনও হরিমটর চিবোনোর অবস্থাতেই আছি। এখন যাই মেজোবাবু। আদাব।"

মেজোকত্তা বললেন, "কল্যাণ হোক।"

ফটিক বলল, "আমি কাল ফিরব ঝিনেদায়। সন্ধ্যের দিকে হয়ত যেতেও পারি।"

মাঝিরা ততক্ষণে বোট ঠেলতে শুরু করেছে। ফটিক দৌড় দিল।

মেজোকত্তা চেঁচিয়ে বললেন, "খুব ভালো। খুব ভালো। আমি থাকব।"

ফটিক একলাফে বোটে উঠে পড়ল। ফিরে দেখল মেজকত্তা ঘোড়ারগাড়িতে অতি কষ্টে ওঠার চেষ্টা করছেন।

"আস্সালা-মু আলাইকুম!"

ফটিক ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী।

"ওয়া আলাইকুমুস্সালাম।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "সাচ্চা মুসলমান খুদাকে সিওয়া আউর কিসিকে সামনে সর্ নেহি ঝুকাতে। কিঁউ মিঞা তুম মুসলমান হো কর ইতনা নেহী জানতে হো।"

ফটিক মৌলবী সাহেবের দিকে একবার চাইল। আর একবার চাইল বাসযাত্রীদের দিকে। তারপর বাসযাত্রীদের দিকে চেয়ে ভালোমানুষের মত বলল, "ভাই, মৌলবী সাহেব আমাকে যা জিজ্ঞেস করলেন, তার মানেটা আপনাদের কেউ বলে দিতে পারেন? আমি ও ভাষাটা জানিনে।"

একজন চাষী বলে উঠল, "আরে উডা হ'ল মৌলবী সাহেবগের জবান। ও বুঝা কি আমাগের কম্মো!" আর বাকি সবাই "তা যা বলিছ, মৌলুদ মিলাদে উনারা কন আর আমরা মারহাবা মারহাবা কই। ব্যস্!" বলে মাথা নাড়তে লাগল। মৌলবী সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেল। কটমট করে ফটিকের দিকে তিনি চাইলেন।

তারপর বললেন, "আংরেজী পড় কর"—

মৌলবী সাহেব থমকে গেলেন। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "আংরেজী পড়ে কোরআন হাদীস মানে না মুসলমানের ছাওয়াল। হিঁদুর কদমবুসি করে—"

ফটিক সুর করে সুরা আনকাবুতের একটা আয়াত আবৃত্তি করল। তারপর বলল, "কেন কোরআনেই তো বলেছে, এবং আমি মানুষের প্রতি মা-বাপের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য হুকুম করিয়াছি। তা আমি তো আল্লাহর হুকুমই তামিল করছি।"

"ঐ হিঁদুটা তোমার—"

ফটিকের মুখে কোর্আনের আয়াত শুনে মৌলবী সুর পালটিয়ে ফেললেন। এরা আরও সাংঘাতিক! এরা কোরান পড়েছে এবং ইংরেজী পড়েছে। এরা তফ্সির মানতে চায় না। বলে কি, পুরাতন তফ্সির লেখকেরা শত শত গালগপ্প, অযৌক্তিক মতবাদ নিজেদের তফ্সিরে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন। এজমা কিয়াস ফেকা সম্পর্কে বলে, ওগুলো আল্লাহের বাণী নয়। আল্লাহর রসুলেরও কোনও বাণী নয়। ফেকা এক একজন ইমামের ব্যক্তিগত মত মাত্র আর এজ্মা কিছুসংখ্যক মোল্লা মৌলবীর সমবেত সিদ্ধান্ত। এজ্মা কিয়াস্ ফেকা শাস্ত্র নিয়ে মুসলমানে মুসলমানে মজহবী লড়াই নাকি মোল্লা মৌলবীরাই জিইয়ে রেখেছে। এত বড় স্পর্ধা এই আংরেজী পড়নেওলাদের! নাউজ্জ বিল্লাহ্! মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী, যিনি

কওমের খেদমতে পাকা চাকরি ছেড়ে এসেছেন এবং বাংলার অজ্ঞ অন্ধ অধঃপতিত মুসলমানদের চোখ ফোটাতে চেষ্টা করছেন সেই তাঁকে এই আংরেজীওয়ালে ছোকরারা "নায়েব নবী" বলে ঠাট্টা করে! এবং বলে কিনা ফেকা শাস্ত্রের কচকচিতে মজহরী লড়াই উস্কে দিয়ে মৌলবী মোল্লারা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং নিজেদের গোশ্ রুটি প্রচুর পরিমাণে পাকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে! নাউজু বিল্লাহ্! খোদার লানত্ হামেশা এদের উপর পড়ুক!

এই পাকা শয়তানদের সঙ্গে লড়তে গেলে অতি সাবধানে এগুতে হবে। মাথা গরম করা একেবারে চলবে না। তাই মৌলবী সাহেব রণকৌশল বদলালেন।

"তা বাপ, তুমি হাজী আব্বাস নিকিরির জামাই না?" বেশ মিষ্টি স্বরেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"জে।"

মৌলবী সাহেব এবার আরও মধু ঢেলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা ঐ যে, যে হিন্দু ভদ্দর-লোকডারে তুমি মুসলমানের ছাওয়াল হয়ে কদমবুসি করলে তা তিনি তুমার মা না বাপ?"

ফটিকের কান গরম হয়ে উঠল। বোট প্রায় কিনারায় এসে গিয়েছে।

ফটিক বলল, "উনি আমার মা-বাপ দুইই। আপনি বোধ হয় ওঁকে চিনতে পারেননি। উনি আমাদের গ্রামের দেওয়ানবাড়ির মেজকত্তা। আমি তো শুনেছি আপনিও বয়েস কালে ওঁকে মা-বাপ জ্ঞান করতেন। তাই না?"

এবারে মৌলবী সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হাত পা নেড়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় বোট এসে দমাস করে পাড়ে ধাক্কা মারল এবং অসতর্ক মৌলবী টাল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ছিলেন। কোনওক্রমে দুটো লোককে ধরে টালটা সামলে নিলেন কিন্তু আচমকা ধাক্কায় ওর বিরাট পাগড়িটা উড়ে জলে পড়ে গেল এবং মাথাভর্তি টাক বেরিয়ে পড়ল।

একলাফে রেলিং-এর কাছে গিয়ে নদীতে ঝুঁকে পড়ে হৃদয়বিদারী আর্তনাদ করে উঠলেন, "হায় আল্লাহ্!"

বাসটিও সেই সময় হ্যানডেলের পাক খেতে খেতে ভ্রস্ম ভ্রর্র ভ্রস্স্ ভ্রর্র্ করে স্টারট্ নিয়ে ফেলল এবং বোটটাকে কাঁপিয়ে-ডাঙায় উঠে পড়ল। জলে ঢেউ উঠল এবং পাগড়ি নাগালের বাইরে চলে যেতে লাগল।

মৌলবী সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, "ইয়া আল্লাহ্, আমামা! হায় খোদা আমার আমামা! আল্লাহ্‌র প্যারা আমামাডারে যে তুলে আনবে আল্লাহ তারে বহোৎ বহোৎ ছওয়াব দেবেন।"

মৌলবী সাহেবের আকাশ ফাটানো চিৎকারে বাসের যাত্রীরা নদীর কিনারে এসে জমে গেল। এবং জেল্লাদার পাগড়িটাকে ঢেউ-এ ঢেউ-এ দূরে সরে যেতে দেখতে লাগল। আর শোরগোল করে নানা পরামর্শ দিতে লাগল। কেউ বলল, ঢিল মেরে মেরে পাগড়িটাকে কিনারায় এনে ফেল। কেউ বলল, খ্যাপলা জাল ছুঁড়ে মার। এবং একটা আধ-পাগলা হাততালি দিয়ে বলে উঠল, যা শত্তুর পরে পরে।

মৌলবী সাহেব বললেন, "তোলো তোলো, উডারে শিগগিরই পানির থে তুলে ফ্যালো। যে উডারে তুলে আনবে আল্লাহ তার একশডা গুনাহ্ খাতার থে কাটে দেবেন।"

কিন্তু শোরগোল থামিয়ে কেউ জলে নামল না। বাস প'ক্ প'ক্ করে হর্ন্ দিতে লাগল।

"হাজার গুনাহ মাফ হবে তার।" মৌলবী সাহেব যেন নীলাম ডাকছেন।

কিন্তু কেউ জলে নামল না।

"দশ হাজার নেকী জমা পড়বে তার আখেরি খাতায়। জলদি যাও। তোলো পাগড়ি।"

আধ-পাগলাটা হঠাৎ বিপন্ন মৌলবী সাহেবের কাছে এগিয়ে এল।

বলল, "হুজুর গাঁজা খাবো। অ্যাক আনা পয়সা দ্যান তো জলে নামি।"

মৌলবী সাহেব যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

"যাও বাপ, তোলো তোলো। দেবো পয়সা।"

আধ-পাগলা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল, "উঁহু উঁহু তা হবে না। মুখির কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবাজী। ফ্যালো কড়ি মাখো ত্যাল।"

মৌলবী মুখ ব্যাজার করে আধ-পাগলার হাতে একটা এক-আনি ফেলে দিতেই সে জয় মা কালী বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ভিজে সপসপে পাগড়িটা এনে মৌলবী সাহেবের হাতে তুলে দিল। বাসের যাত্রীরা ততক্ষণে ভিতরে উঠে বসে পড়েছে। ভিজে পাগড়িটা হাতে নিয়ে মৌলবী সাহেব বাসে উঠতেই বাস ছেড়ে দিল। তার পাগড়ির হাল দেখে মৌলবী সাহেবের চোখ ফেটে জল আসে আর কী। তার চাইতেও তার কষ্ট হয়েছে সেখানে উপস্থিত মুসলমানের তার পাগড়ি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত মনোভাব দেখে। ছওয়াব পাওয়া, গুনাহ্ মাফ হওয়ার প্রলোভন এবং আখেরি খাতায় দশ হাজার নেকী জমা পড়বে, তাঁর এই আশ্বাস বাক্যও মুসলমানদের নড়াতে পারল না। ইসলামের গতি কী হবে? শেষ পর্যন্ত একটা পাগলা হিন্দু গাঁজা খাওয়ার পয়সা আদায় করে জয় মা কালী বলে পাগড়ি তুলে দিল। জয় মা কালী! আঁ! ইসলাম যে বাংলা দেশে কত বিপন্ন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ দেখতে পেয়ে মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মুসলমান আজ এই অবস্থায় এসে পড়েছে। এর

জন্য দায়ী ওরা! মৌলবী তার জল-টস্ টস্ পাগড়িটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে ধরলেন। তারপর সামনের সীটের দিকে চাইতেই দেখলেন ফটিক নির্লিপ্তভাবে ঢুলছে। ওই আংরেজীবালে শয়তানেরাই আজ ইসলামকে বেশী আঘাত দিচ্ছে। মৌলবী মোল্লার প্রতি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলছে। আর হিন্দুগের পা চাটছে। এইজন্যই মুসলমানদের আজ এই দুর্দশা। নাউজু বিল্লাহে মিন জালিক! ভিজে সপ্‌সপে পাগড়িটা ভারি হয়ে গিয়েছে। একহাতে ঝুলিয়ে রাখতে বড় অসুবিধে হচ্ছে। তাই মৌলবী সাহেবকে বারবার হাত বদলাতে হচ্ছিল।

এই আংরেজীবালে শয়তানদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। এরা ইমামদেরও মানতে চায় না। কথায় কথায় বেয়াড়া সব তর্ক তোলে। ব্যাটারা কোর্‌আন পড়ছে ইসলামকে মারার জন্য। বলে কি, ইমামরা যা বলে গিয়েছেন, তাই সত্য বলে মেনে নিতে হবে, এমন কোনও নির্দেশ আল্লাহ কিংবা তাঁর রসুল দিয়ে গিয়েছেন? কী আন্দাজ বেয়াদবি! অ্যাঁ! বলে কি, ইমামেরা সাধারণ মানুষ মাত্র, ফেরেশ্‌তাও নন, নবী-রসুলও নন। সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁরা ভুল-ভ্রান্তির থেকেও মুক্ত ছিলেন না। তাই ইমামেরা যা বলে গিয়েছেন, তা না মানলেও কিছু আসে যায় না। কোর্‌আন হাদিসই ইসলামের সত্যকার পথপ্রদর্শক। ব্যাটারা কোর্‌আন হাদিস ইমামগের চাইতি তুমরা বেশী বোঝো! না?

অন্যমনস্কভাবে মৌলবী তাঁর ভিজে আমামাটাকে হাঁটুর উপর রেখেছিলেন। ঠাণ্ডা লাগতেই তাঁর হুঁশ ফিরল। দেখেন জোব্বাটা ভিজে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাগড়িটাকে আবার হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। তাঁর এই দুরবস্থার জন্য ঐ ফটিকটাই দায়ী। শয়তান! শুধু ফটিক একা নয়, হিন্দুগের গুলাম আরও আছে। এবং তারা আজকাল কোর্‌আন আউড়ায়। বিভ্রান্ত করে মুসলমানগের। ব্যাটারা সব মোনাফিক। বলে কি, প্রিয় নবীর মৃত্যুর দু তিন মাস আগে একটি আয়াত নাজিল হয় এবং এইটেই কোর্‌আনের শেষ আয়াত। এর পর আল্লার আর কোনও বাণী নাজিল হয়নি। সুরা মাইদাহ্‌র এই তৃতীয় আয়াতেই মানুষকে তাঁর শেষ বাণী শুনিয়ে দেন। তিনি বলেন, "আল্‌ইয়াওমা আক্‌মালতুলাকুম দীনাকুম ও আতমামতু আলায়কুম নো'মাতি ও রাজি'তুলাকুমুল্ ইস্‌লামা দীনা।" অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের ধর্মকে (দীন) পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহদান (নো'মাত) সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করিলাম। এর মানে এই কোর্‌আন এবং হাদিস্ নিয়েই ইসলাম পূর্ণ পরিণত হয়েছে। যা কোর্‌আন এবং হাদিসে আছে তা অনুসরণ কর এবং যা কোর্‌আন এবং হাদিসে নেই তার জন্য নিজের বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিবেকের শরণাগত হও। এই হচ্ছে আংরেজীবালাদের বুলি। ইমামদের তফ্‌সির বাদ দিয়ে কোর্‌আনের ব্যাখ্যা শুনতে হবে আংরেজীবালা ছ্যাম্‌ড়াদের কাছে! বেত্তমিজ! ফেকা এজমা কেয়াসও ইসলামের ভিত্তি।

হাতের মুঠি আলগা হয়ে যেতেই ভিজে পাগড়ি থপ করে মেঝেয় পড়ে ময়লা লেগে গেল। পাগড়িটা ধুলোবালি সমেত মেঝে থেকে তুলে নিতে নিতে মৌলবী সাহেব নিরুপায় ক্ষোভে ফটিকের দিকে চাইলেন। তার আজকের হেনস্থার মুলে ঐ ফটিক। একবার ভাবলেন এই কাদামাখা ভিজে পাগড়িটা ফটিকের মুখে ছুঁড়ে মেরে ওঁর ক্ষোভ মেটান। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলেন।

ইয়াকুব বলেছে ঢাকার স্পিরিট। অর্থাৎ মুসলমানকে নিজের হক্ আদায়ের জন্য আরও জঙ্গী মুসলমান হতে হবে। ফটিক ভাবতে লাগল। এবং ইয়াকুব এ যুগের শিক্ষিত ছেলে। নব্যপন্থী মুসলমান। মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী পিতৃসম শ্রদ্ধেয় কোনও ব্যক্তিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখে ক্ষেপে উঠলেন। কেননা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি হিন্দু। এবং মৌলবী দীন মোহাম্মদ প্রাচীনপন্থী মুসলমান। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর থাকলেও বাঙ্গালী মুসলমানকে এই দুনিয়ায় ঠাঁই করে নিতে হলে হিন্দু সংশ্রব বর্জনীয়, এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উভয়েই দ্বিধাহীন। মুসলমানের এখন নির্ভেজাল সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তহজীব ও তমদ্দুন চাই। নচেৎ তার প্রাণে উগ্রতার সঞ্চার হবে না। এই ব্যাপারেও নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী গোঁড়ামী একমত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। ফটিক জানে। এবং এও জানে তার পক্ষে এই উগ্রতা এই গোঁড়ামী অস্বস্তিকর। তার পক্ষে এর শরিক হওয়া কষ্টকর। যে তহ্‌জীব ও তমদ্দুনের কথা ইয়াকুব বলছে তার ভিত্তি ইসলামের তৌহিদবাদ। অর্থাৎ একেশ্বরবাদ। এবং তার উৎসস্থল আরব ইরান তুরস্ক। এবং ইয়াকুব তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। ঢাকার স্পিরিট? ফটিক তার সামনে বসে থাকা জোব্বাধারী এই লোকটাকে সহ্য করতে পারে না কিন্তু একে তার বুঝতে অসুবিধে হয় না। অপরপক্ষে ইয়াকুবের তারুণ্যের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা ফটিকের অন্তরকে স্পর্শ করে কিন্তু ইয়াকুবকে সে বুঝে উঠতে পারে না। ইয়াকুবের কথাবার্তা খানিকটা তোতাপাখীর মত, সে গ্রহণ করতে যত ব্যস্ত, বিশ্লেষণ করায় তার তত অনীহা। শিক্ষিত মনের যেটা লক্ষণ সংশয় ও জিজ্ঞাসা, ইয়াকুবের সঙ্গে কাল সারাদিন আলোচনা চালিয়ে তার মধ্যে এর অভাব দেখে বিভ্রান্ত বোধ করেছে ফটিক। অথচ ইয়াকুব বুদ্ধিমান। বেশ বুদ্ধি রাখে। তবু যে এরা কী করে বুদ্ধিকে বন্ধক রেখে জিগিরকেই সত্য বলে গ্রহণ করে! আশ্চর্য! ফটিক অবাক। শুধু ইয়াকুব কেন, ও

না হয় ছেলেমানুষ, বার লাইব্রেরির উকিল তার সতীর্থরাই বা কী? মুসলমান উকিলেরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য রক্ষাকবচের দাবীতে ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠেছেন এবং হিন্দু উকিলেরা হিন্দু স্বার্থই ভারতের স্বার্থ, এই বলে নিয়ত টেবিল চাপড়াতে শুরু করেছেন।

মুসলমানরা আলাদা জাতি একটি পৃথক সত্তা, এসব কথা ভেবে দেখার সুযোগ ফটিকের ছেলেবেলায় ঘটেনি। তার কারণ সমাজের যে স্তরে তখন সে মানুষ হয়েছে, সেই তার কৃষিজীবী অস্তিত্বের স্তরে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিভেদের পাঁচিল তেমনভাবে খাড়া হয়ে ওঠেনি। তখন জমির স্বত্ব নিয়ে, বিল বাওড়ের দখল নিয়ে দাঙ্গা কাজিয়া হয়নি যে তা নয়। কিন্তু সে বিরোধের রূপ ছিল ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়ের রঙে সে-বিরোধ রঞ্জিত হয়ে ওঠেনি। এখন, ফটিক, লক্ষ্য করছে, সব ব্যাপারেই ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ছে, মুখ্য স্থান গ্রহণ করছে সম্প্রদায়। সে শফিকুল মোল্লা এইটাই যথেষ্ট নয়, তাকে ঘোষণা করতে হবে, সে মুসলমান। এবং মেনে নিতে হবে যে কওমের স্বার্থই তার স্বার্থ। তবেই তুমি মুসলমান। এটা কেন হবে? ফটিকের মনে প্রশ্ন জাগে। শুধু তাই নয়, তার দেশ আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান— বাংলা দেশ নয়, একথাটা তার মনে পড়লেই জিভে কেমন একটা কটু স্বাদ ছড়িয়ে পড়ে।

আর তখনই তার মনে পড়ে জনাব মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কথা। তারই প্রায় সমবয়সী। কিন্তু কী আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি! সে তখন ল কলেজে সবে এসে ভর্তি হয়েছে। থাকবার জায়গার সন্ধানে কারমাইকেল হসটেলে একদিন সে ঢুঁ মেরেছিল। যদিও ল কলেজের ছাত্রদের হারডিন্জ হসটেলেই ছিল ডেরা। কিন্তু ফটিক মুসলমান, তাই হারডিন্জে তার স্থান হয়নি। উচ্চতম পর্যায়ের শিক্ষাও আমি হিন্দু তুমি মুসলমান এইভাব দূর করতে পারেনি। বরং বিপরীত ঘটেছে। ইংরেজী শিক্ষার যত প্রসার ঘটেছে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তত মাথা চাড়া দিয়েছে। মানবতাবোধের অন্তর্জলী ঘটেছে। ফটিক মুসলমান, এই কারণেই সে হারডিনজে ল কলেজের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থান পায়নি। যেমন অশিক্ষিতদের গেঁয়ো মজলিসে হিন্দুর হুঁকোয় মুসলমান মুখ দিতে পারে না, বিশেষত সেই হুঁকোয় যদি জল ভরা থাকে! মানসিকতা বা মনোবৃত্তির কোনও পরিবর্তনই যে-শিক্ষা ঘটাতে পারে না, তাহলে সে-শিক্ষা আমাদের যেখানে নিয়ে যেতে পারে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছে। বিভেদ এবং বিদ্বেষের রাস্তায়।

হিন্দুর উত্তরাধিকার যে অনেকখানি মুসলমানেরও উত্তরাধিকার—তার প্রমাণ, হিন্দুর অনেক কিছুই আমরা জানি, বুঝি ও উপভোগ করি এবং এই জন্য এই দুঃখও প্রকাশ করি যে হিন্দু কেন আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানতে চায় না?

এই কথা, বাজে কথা। হিন্দুর উত্তরাধিকার যে আমাদের উত্তরাধিকার এ আমরা মানি না।

হৈ হৈ করে উঠল কটা ছেলে। কারমাইকেল হস্‌টেলে উত্তেজনা ফেটে পড়ছে। গম গম করছে বৈঠক।

হিন্দুরা আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না, কারণ, একজন শ্রোতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, কারণ এটা তাদের সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স। হিন্দুরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না। দে হেইট্ আস।

কই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো মুসলমানী থিম্ লইয়া কবিতা ল্যাখেন নাই। আরেকজনের তীক্ষ্ম প্রশ্ন বক্তার দিকে ধাবিত হল। আর দ্যাখেন, নজরুল ইসলাম রে দ্যাখেন। হিন্দুয়ানী ভাবে গদগদ হইয়া গাদা গাদা গান কবিতা এন্তার লিখ্যা যাইতাছেন। এই বেহায়াগিরিই আমাগো খাইছে। কুফ্‌রি কালাম আমাগোর হাড়ে মজ্জায় ঢুইকা গ্যাছে গিয়া। এল্লাইগ্যাই আমরা হিন্দুর কালচারাল গোলাম হইয়া আছি। মুসলমানেরে যদি বাঁইচা থাকতে হয় তো হিন্দুর কালচারাল কন্‌কোয়েস্‌টরে বন্ধ করতে অইব। অ্যাট এনি কসট।

বক্তা শান্তভাবে উত্তেজিত শ্রোতৃবৃন্দের দিকে চাইলেন। তারপর ততোধিক শান্তভাবে সভাকে চুপ করতে বললেন।

ছাত্রবন্ধুরা! এটা কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। সাংস্কৃতিক বোধের প্রশ্ন এটা। এই প্রশ্নের জবাব যদি উত্তেজিত মনের জমিনে পড়ে তবে এর অর্থ ও তাৎপর্য দুইই হারিয়ে যাবে। কাজেই আমি এই প্রশ্নের জবাব দেব কিনা তা নির্ভর করে একটি মাত্র পূর্ব শর্তের উপর। এবং সেটা হল উত্তেজনা পরিহার করে আপনারা আমার বক্তব্য শুনতে এবং বুঝতে রাজী আছেন কিনা। একটুক্ষণ চুপ করে বক্তা বললেন, হোয়েন্ ব্লাড বিগিন্‌স টু বয়েল ব্রেইন বিগিন্‌স্ টু মেল্‌ট্।

সভায় হাসির রোল উঠল এবং সভার উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে এল।

বক্তা শান্ত গলায় বললেন, নজরুল ইসলাম যে হিন্দুর ঐতিহ্য নিয়ে রচনা লিখলেন, আর রবীন্দ্রনাথ যে মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লিখলেন না, তার কারণ সোজা; হিন্দুর ঐতিহ্যে নজরুল তথা মুসলমানের উত্তরাধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানের ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের তথা হিন্দুর উত্তরাধিকার নেই।

সভায় চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল।

বক্তা চুপ করলেন। সভাও আবার চুপ।

আমি জানি, কথাটা অনেকের পক্ষেই পরিপাক করা কঠিন হবে। তবু যা সত্য তা বলতেই হয়। কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করুন।

প্রাণের যোগ নেই বলেই বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এক প্রকার জলবায়ুর মতই সহজ। তা বোঝা কঠিন নয়, তাকে জানতে হয় না, সে নিজেই নিজেকে জানিয়ে যায়, আর আমরা জেনেও টের পাইনে যে জেনেছি। এই দিনের আলোর মতো সহজ সত্যকে যাঁরা অস্বীকার করেন, মাটির বাঁধনকে স্বীকার করতে চান না, শুকিয়ে মরা তাদের ভাগ্যলিপি।

বক্তা সভার দিকে চাইলেন। মুখটা একবার মুছলেন।

বললেন, হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য এ-দুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়—

সভায় গুঞ্জন উঠতে না উঠতেই চুপ হয়ে গেল। ফটিক একটা বেন্‌চিতে বসে ভাবতে লাগল এই চিন্তাশীল দুঃসাহসী লোকটি কে? এর কথাগুলো শুনলে দেওয়ান বাড়ির মেজোকত্তার কথাই মনে পড়ে যায়।

হিন্দু ঐতিহ্য, মুসলিম ঐতিহ্য এ-দুয়ের সংমিশ্রণের দায়িত্ব মুসলমানেরই, হিন্দুর নয়— কেন না, হিন্দুর দুই উত্তরাধিকার নয়। অথচ, বক্তা বলতে লাগলেন, সে-মিলনের জন্য বার বার হিন্দুর দিকেই তাকান হয়েছে, বলা হয়েছে হিন্দু বড় ভাই মুসলমান ছোট ভাই, সম্প্রীতির কথাটি বড় ভায়ের তরফ থেকেই আসা উচিত। কিন্তু প্রশ্নটি আসলে সম্প্রীতির নয়, উত্তরাধিকারের, আর উত্তরাধিকারের ব্যাপকতায় মুসলমান হিন্দুর চেয়ে বড়—মাতৃ-সম্পত্তি ও পিতৃ-সম্পত্তি উভয়েরই সে ওয়ারিস্। মুসলমান যদি এই দুই উত্তরাধিকার স্বীকার করে তবে তার দ্বারা এক বড় সৃষ্টি সম্ভব—আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার মন্থনদণ্ডে মন্থিত করে সে দুই সংস্কৃতিকে এক বিরাট নব সংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারে। এ গৌরব মুসলমানের জন্যই অপেক্ষা করছে তবে সে তা চায় কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

তড়াক করে একজন লাফিয়ে উঠলেন, হিন্দুর উত্তরাধিকার যে অনেকখানি মুসলমানেরও উত্তরাধিকার, এর প্রমাণ কী?

কারমাইকেল হস্‌টেলের স্তব্ধতার প্রকৃতি মুহূর্তে বদলে গেল। এখনও সবাই চুপ। কিন্তু একটা প্রবল উত্তেজনাকে যেন বোতলে পুরে ছিপি এঁটে দেওয়া হয়েছে। ফটিকের মনে হল, এক্ষুনি হয় এই বোতলের ছিপিটা উড়ে যাবে আর না-হয় বোতলটাই ফেটে যাবে।

প্রমাণ, মুখ্যত দুটি বিচার। এক, বক্তা বললেন, সব মুসলমান আরব কি ইরান তুরান থেকে আসেনি। অন্তত শতকরা পঞ্চাশজন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন। এবং দুই, বিদেশাগত বাকি পঞ্চাশজনের প্রত্যেকে যে স্বদেশ থেকে পত্নী নিয়ে এসেছিলেন এমন মনে করা বাতুলতা। অন্তত বিশ জন দেশী পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। এই বিচারের ফলে কেন আমরা হিন্দুর অনেক কিছুই জানি বুঝি ও উপভোগ করি তার কারণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমরা এর প্রতিবাদ করি। একটি ছেলে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হলের অধিকাংশ ছেলে শেম শেম বলে চেঁচাতে লাগল।

আরেকটি তীক্ষ্ম কণ্ঠের চিৎকার উঠল, মুসলমানের ঐতিহ্য ইসলামের ঐতিহ্য। এছাড়া তার আর কোনও উত্তরাধিকার নেই।

অনেকেই মার্‌হাবা মার্‌হাবা বলে চেঁচিয়ে উঠল। হাততালি দিল অনেকে। তারপর অধিকাংশ ছেলেই "নারা-এ তক্‌বীর, আল্লাহু আকবর" ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

এই শান্ত বক্তার যুক্তিপূর্ণ কথা ফটিকের বেশ মনে ধরেছিল। ভাববার মত কথা। বক্তার নাম ফটিক জেনেছিল, জনাব মোতাহের হোসেন চৌধুরী। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে মুসলমান সমাজে মোতাহের হোসেনের মত স্বচ্ছ চিন্তার লোকের এখন আর কদর হবে না। ফটিক নিজেকে দিয়েই তা বুঝতে পেরেছে। যে উন্মাদনা, যাকে ইয়াকুব বলছে ঢাকার স্পিরিট্, যে উগ্রতা আজ মুসলমানদের মনে মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাতে তারা যে এই ধরনের কথাবার্তার অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, সে বিষয়ে ফটিকের মনে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এ ঘটনা খুব দুঃখজনক। ফটিক মৌলবী সাহেবের দিকে চাইল। উনি ঢুলছেন। কিন্তু হিন্দু সমাজেরই ক'জন বা এই কথার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন? কেউ কি বুঝতে চেষ্টা করেছেন মোতাহের হোসেনদের? কেউ না। অন্তত ফটিকের তো তেমন কাউকে নজরে পড়েনি। এক মেজকর্তা ছাড়া হিন্দুরাই কি কম উগ্র হয়ে উঠছেন! নারীরক্ষা আন্দোলন নিয়ে বার্ লাইব্রেরীর আলোচনা এমন জায়গায় পেঁছে যায় আজকাল যার সার কথা এই যে মুসলমানরা পথে ঘাটে ঘুরেই বেড়াচ্ছে স্রেফ হিন্দু নারী ধর্ষণ করার জন্য। এমন কথাও শুনেছে ফটিক যে মুসলমানরা সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য গড়পড়তা বছরে ৭০০ হিন্দু নারী অপহরণ করে। এবং এইসব নারীর গর্ভে পুত্র কন্যা উৎপাদন করে মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে নিচ্ছে। বারের ডাকসাইটে উকিল দিগীন মিত্তিরের জুনিয়র কালিকানন্দ বাড়োরিই এইসব সংখ্যাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। কথায় কথায় টেবিল চাপড়ে কালিকানন্দ বলে, সব শালা মোছম্মানের চার বিবি। প্রতি বিবির গর্ভে যদি চারটে করেউ ছেলে মেয়ে জন্মায় তাহলি এখানেই তো ষোলজন মোছম্মান বা'ড়ে গ্যালো। এ তো ক্লিয়ার অংক মশাই। কালিকানন্দের হিসাবে সব শালা মোছম্মানেরই চার বিবি। মুসলমান সম্পর্কে কালিকানন্দের ধারণা এই।

কিন্তু কালিকানন্দ কি শুধু একা? হিন্দুদেরও কেই বা এমন আছেন যিনি মুসলমানদের মধ্যে ইয়াকুব, মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী আর মোতাহের হোসেন চৌধুরীর পার্থক্য বুঝতে পারবেন? হিন্দুদের চোখেও কি সব মুসলমানই এক মোছম্মান নয়? এইসব কথা যখন ভাবে ফটিক এবং তার স্থান কোথায়, এটা বের করার চেষ্টা করে, তখন সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে এবং বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

॥ ১৬ ॥

ক্রিলিলিং ক্রিলিলিং। দাউদ আবারও সাইকেলের ঘণ্টি বাজাল। কিন্তু কোনও সাড়া নেই ভিতর থেকে। সে হতাশ হ'ল। ঘামতে লাগল। ভাবল চলে যাই। মৌলবী সাহেব বাড়ি নেই, জানা কথা। সেই সুন্দর লাজুক ছেলেটাও নিশ্চয় নেই। থাকলে সেও এতক্ষণ বেরিয়ে আসত। আসলে এটা জেনেই একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল দাউদের মনে। হয়ত সেই মুখখানাকে তাহলে একবার দেখা যাবে সেই আশাতেই দাউদ সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে যাচ্ছিল। এখন হতাশ হ'ল। না, আর এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। দাউদের দিনটা কেমন এক ধরনের বিস্বাদে যেন ভরে যেতে লাগল। একবার ভাবল, সইফুন হয়ত বাড়ি নেই। তাই কোনও সাড়া পাচ্ছে না তার। এই চিন্তায় সে তবু কিছুটা স্বস্তি পেল। সাইকেলের মুখটা ঘোরাতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়াল। সে কেন ধরেই নিচ্ছে, সইফুন তার সঙ্গে দেখা করবে? বরং সইফুন কি উলটোটাই প্রমাণ করেনি? আবার সে দেলের ভিতরে পিঁপড়ের কামড়ের মত একটা ব্যথা টের পেল। সে কি পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও সইফুন তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়নি? হয়ত সে যে দাউদ, এই পরিচয়টা শুনেই সইফুন তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কিছু না বলেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তুমি দাউদ! সর্বনাশ! তোমাকে আমরা চিনি।

বাড়িতেই আছে সইফুন। নিশ্চয় আছে। সে দাউদ বলেই সাড়া দিচ্ছে না। তার মানে তার স্বভাব চরিত্রের কথা সইফুনও জানে। ছবি বলেছে নিশ্চয়ই। নিশ্চয় বলেছে যে দাউদ তার বিবি ফুটকিকে মোকামে নিয়ে যাবার নাম করে চাচার কাছ থেকে টাকা আর বাইতির কস্‌বীটাকে নিয়ে ভেগে পড়েছিল। এবং সেই জন্যই ফুটকি গলায় কলসী বেঁধে পুকুরের পানিতে ডুবে মরেছে। তার মুখটা ক্রমশ একটা তেতো স্বাদে ভরে যেতে লাগল। কী ক'রে এ সাহস পেল ফুটকি? চিরকালই ঘাড়ত্যাড়া মেয়ে! আমাকে সাজা দিবার জন্যিই এই কাজটা ক'রে বসিছে। সবাই ফুটকির জন্যিই চোখের পানি ফেলতিছে। আমার কথাডা কেউই শুনতি চায় না। আমি তো আসামী!

নাঃ সইফুন সাড়া দেবে না। দাউদ সাইকেলের মুখটা ঘুরোলো। দিলে ভাল করত সইফুন। দাউদ তার কৈফিয়ৎটাও শোনাতো তাকে! শুনিয়ে হালকা হতে পারত। দাউদ প্যাডেলে ভর দিয়ে সাইকেলে উঠতে যাবে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এল।

বলল, "বাজানরে খুঁজতিছেন?"

দাউদের উৎসাহ ফিরে এল। বলল, "হ্যাঁ। কী নাম তোমার?"

"জামিলা খাতুন।"

"বাঃ! বাঃ" দাউদ বলল, "খুব ভালো তো তুমার নামডা। তা আমি তুমার বাজানরে খুঁজতিছি, ইডা তুমারে ক'লো কিডা?"

"বড় বু। বড় বু কলো, ছবি-বুর ভাইরি ক'য়ে আয় বাজানরে সন্ধ্যেবেলায় আলি পাবেন।"

জামিলা ছুটে ভিতরে চলে গেল। দাউদ ভাবল, সইফুন জানে যে সে এসেছে। এই ঘটনাটা কেন জানিনে তার নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করল। তবে সে সাড়া দিল না কেন? মুহূর্তে নিবে গেল দাউদ। সে সাইকেলের উপর উঠল। তারপর ক্রিলিলিং করে ঘণ্টা বাজালো। তারপর জোরে প্যাডেল ক'রে খান বাহাদুরের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল।

খোন্‌কার সাহেবের বাড়িতে দাউদ ঢোকামাত্র তার ঠিকেদারীর পারটনার, খোন্‌কার সাহেবের ভাতিজা খোন্‌কার মতিউর রহমান বা মতি মিঞা তাকে দেখে আগেই সালাম জানাল। তারপর এগিয়ে এসে "আইয়ে', তশ্‌রীফ্‌ লাইয়ে' মিঞা সাব্‌" বলে অভ্যর্থনা জানাল। এইতেই দাউদ বড় অবাক হল। জামাই মেয়ের কথা ঠেলতে না পেরেই খোনকার সাহেব যে ওকে আমল দিয়েছেন, সে বিষয়ে দাউদের কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাকে ঠিকেদারী করার পরামর্শ দিয়েছে তাঁরই বড় জামাই। কোনোই সন্দেহ নেই পরামর্শটা তার পক্ষে খুবই হিতকারী হয়েছে। এবং কাজটা ওর এতই ভাল লেগেছে যে প্রাণপাত পরিশ্রমে এই কাজের প্যাঁচঘোচ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে অনেকটা রপ্ত করে ফেলেছে। এবং এরই মধ্যে সে ডিস্‌ট্রিক্‌ট বোরডের কন্‌ট্রাকটর হিসেবে নাম কিনে ফেলেছে। আরও সে এগুতে পারত, যদি তার নিজের টাকা থাকত এবং যদি না এই অপদার্থ মতি মিঞাটাকে তার ঘাড়ে চাপাতেন ডিস্‌ট্রিকট বোরডের ভাইস চেয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্‌কার বজলুর রহমান। মতি মিঞা তাদের ব্যবসায়ে এককড়ার উপকারে আসে না। কিন্তু তার বাদশাহী মেজাজের দাপটে দাউদ থেকে আর সবাই সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। মিঞার কথাবার্তার ধরনও এমন যে সবাই যেন তার বাপের চাকর। একমাত্র চাচার সামনেই মতি মিঞা কেবল মেকুরের মতই

মি'উ মি'উ করতে থাকে। সেই মতি মিঞা তার দেখা পাওয়া মাত্র দু হাত বাড়িয়ে "আইয়ে' আইয়ে' মিঞা সাব্ তশ্রীফ লাইয়ে'" বলে একেবারে উরদু জবানে খাতির করতে লাগল দেখে দাউদ, সত্যি বলতে কি একটু ঘাবড়েই গেল। একেবারে মিঞা সাব্! ব্যাপারডা কী?

"আপ্ কহাঁ থে?" মতি মিঞা দেখি উরদু আর ছাড়ছে না।

"জে, এই দিকি আসব বলেই তো বেরোইছিলাম।" দাউদ সালাম জানিয়ে বলল, "পথে এট্টু কাজ সা'রে তবে আলাম। দেরি তো অ্যামন বিশেষ কিছু হয়নি। তা আজ যে অ্যাত তাড়া?"

"চাচাজীনে," মতি মিঞা উরদুর স্রোত খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করল, "আপনার ইন্তেজারে ব'সে আছেন। বহোৎ জরুরী। আপনার বাসা মে ভি লোক ভেজা হয়েছিল। আপনার লোক বলল কি, আপনি এখানেই রওয়ানা দিয়েছেন।"

"মতি!" খান সাহেবের খাস কামরা থেকে ডাক ভেসে এল।

"জে!" মতি মিঞা দৌড় দিল।

চাচা সাহেবের দরকার। খাতিরের কারণটা বোঝা গেল। ভাবল দাউদ। কিন্তু কী এমন দরকার যে বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন খান বাহাদুর। মতি মিঞা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল।

"যান ভাইসাব্ যান, চাচাজী আপনার ইন্তেজার করছেন।"

একটু চিন্তিত মনেই খান বাহাদুরের খাস কামরায় ঢুকল দাউদ।

"আস্সালা-মু আলাইকুম!"

খান বাহাদুরও সালাম জানালেন। যথারীতি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসেই। এবং চাচার মতই আলবোলার কারুকার্য করা দীর্ঘ নলটাতে আলতো আলতো টান দিচ্ছিলেন খোন্দকার সাহেব।

বললেন, "দাউদ! তারপর তোমার কাজ কাম কেমন এগুচ্ছে? পি ডবলিউ ডি'র কনট্রাক্ট পেয়ে গিয়েছ?"

এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্য খোন্দকার তাকে এমন জরুরী তলব পাঠিয়েছেন! দাউদ অবাক হল। তবে কি মতি মিঞা কিছু নালিশ করেছে? কী নালিশ করতে পারে মতি মিঞা? সে তো তার পাওনার বেশীই ঘরে তুলে নিচ্ছে। এবং কিছু না করে।

দাউদ বলল, "জে, চলতিছে টুকটাক। পি ডবলিউ ডি'র অ্যাকটা কাজই পাইছি। সে পেরায় কিছুই না।"

"কোন্ কাজডা পেয়েছ? যশোর খুলনা রোডের?"

"জে না।" দাউদ বলল, "ঐ কাজডা পালি তো কাজের কাজই হত। উডা যতীন সাহাবাবু পায়ে গেছেন। আমরা কোঁটচাদপুরি অ্যাকটা ছোটখাটো কাজ পাইছি।"

"যশোর-খুলনা রোডের কাজ তোমরা পাওনি! তাজ্জব! খান বাহাদুর আশ্চর্য হলেন। সুপারিনটেনডিং ইন্জিনিয়ার ভট্টাচার্য প্রমিস্ করে গেল! তাজ্জব!"

দাউদের মনে হচ্ছিল, এটা ভূমিকা। খান বাহাদুর আসল কথা এখনও শুরু করেন নি। সে কোনও কথা না বলে চুপ করে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল।

খান বাহাদুর আলবোলার নল টেনেই চললেন। একেবারে আয়েসী ভঙ্গীতে। যেন ওঁর কোনও তাড়া নেই। চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, "শোনো দাউদ। আমি বোরডে ফাইট্ করে শৈলকুপো, ঝিনেদা এবং আগরোর দিকে প্রায় আড়াই লাখ টাকার কাজ স্যাংশন্ করিয়েছি। সব রিপেয়ারের কাজ। এসব রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে নেগলেকটেড্ হয়ে পড়েছিল। তোমার কি ধারণা, তুমি যদি কাজটা পাও তিন মাসের মধ্যে কাজটা তুলে দিতে পারবে? ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কাজ তুলে দিতেই হবে।'

"জে, কাজটা অ্যাক জায়গায় হলি কতি পারতাম।" দাউদ বলল, "জায়গায় জায়গায় কাজ। কী রকম কাজ, চোখি দেখলি কওয়া সহজ হয়।"

খান বাহাদুর বললেন, "ডিস্ট্রিকট বোরডের রাস্তা রিপেয়ার। এর এত দেখাদেখি কী আছে?"

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "জে, খালি তো আর আরথ্ ওয়ারক্ নয়। পাকা রাস্তার যা কাজ সবই তো করতি হবে। জলদি শেষ করতি হলি, সব জায়গায় না হলিউ, পিরায় জায়গার কাজই অ্যাকসঙ্গে শুরু করতি হবে। মাটির কাজ হয়ে যাতি পারে। ফ্যাকড়া বাধবে সোলিং-ই। অ্যাত ই'ট ঠিক সুমায় ওই সব জায়গায় জুগাড় করা যাবে কিনা? আর ফ্যাকড়া বাধবে রোলার পাওয়া যাবে কি না, তাই নিয়ে। বোরডের অ্যাত রোলার নেই।"

"আমি যদি পি ডবলিউ ডি'র রোলার যোগাড় করে দিই?" খান বাহাদুর বলে উঠলেন।

"জে, তা'লি অ্যাকটা ফ্যাকড়া গ্যালো।" দাউদ বলল।

"কোন্ ফ্যাকড়াটা তাহলে তোমার থাকল?" খান বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পেল।

"জে, ই'টের ফ্যাকড়া।"

খান বাহাদুর চুপ করে গেলেন। এবং চুপ করে আলবোলার সুগন্ধি ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। দাউদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "জে, ডিসেম্বরের মধ্যি কাজটা তুলে দিতে হবে?"

খান বাহাদুর অন্যমনস্কভাবে বললেন, "ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কাজটা তুলে দিতেই হবে দাউদ। খুব আরজেনট।"

দাউদ বোকা বনে গেল। আজ সেপটেম্বরের মাঝামাঝি। সবে বর্ষা শেষ হল। মাটিতে এখনও জল। আর দিন সাতেক পরেই রমজান। অকটোবরের তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাবে। তাহলে হাতে থাকল অকটোবরের অ্যাক, নভেম্বরের চার আর ডিসেম্বরের দুই, মোট সাত সপ্তাহ।

"জে, রিপেয়ার কত জায়গায় হবে?"

খান বাহাদুর চটকা ভেঙে বললেন, "অ্যাঁ, রিপেয়ার?"

তারপর হাঁক দিলেন, "মতি!"

মতি মিঞা মুহূর্তে হাজির হয়ে বলল, "জে?"

"এস-ও বাবুকো বোলাও।"

একটু পরেই মতি মিঞার সঙ্গে সাব্ ওভারশিয়ার করালীকান্ত কুন্ডু কোটের উপর কোঁচানো চাদর গলায় বেঁধে ঢুকল। তারপর আভূমি মাথা ঝুঁকিয়ে "হুজুর" বলে উঠে দাঁড়াল। করালীবাবুর গাল দুটো বসা। চুলে কলপ। নাকের নিচে খ্যাংরার মত গোঁফ। এই বুড়ো বয়সে, একগাদা ছেলেপুলে থাকতেও তৃতীয় পক্ষ করেছে। তাই পোশাকে-আসাকে বেশ ফিটফাট। দাউদ দেখছিল। ঘুষ খাবার যাশু, এই করালী। ঘুষ ছাড়া কথা নেই।

খান বাহাদুর সোজা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তো রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে এসেছে?"

করালীবাবুর মুখ শুকিয়ে এল।

করালী বলল, "হ্যাঁ হুজুর। এই ডিসেম্বরেই হিসেব মত আমার সারভিস শেষ।"

"তা আরও কিছুদিন কাজ করার ইচ্ছে আছে, না কাশী বাস করাই সাব্যস্ত করেছেন?"

করালী বলল, "হুজুরই তো অ্যাখন বোরড। দয়া না করলি ছেলেপুলে নিয়ে শুকোয়ে মরতি হবে হুজুর।" বিনয়ের অবতার! পাঁচ-সাত খানা বাড়ি শালার এই শহরে। ইস্টিশনের দিকি জমি কিনে রাখিছে। ধান ভানার কল বসাইছে। ব্যাটা ছিনে জোঁকের রকমখানা দ্যাখ। দাউদ বসে বসে লক্ষ্য করছিল।

খান বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে নতুন কাজ বের হল, ক জায়গায় রিপেয়ার হবে?"

করালী বলল, "আজ্ঞে শৈলকুপের দিকি নয় আর এগার মাইলির মধ্যি পঁচানব্বুই চেন, ভগবান নগর আর কাজীপাড়ার মধ্যি সাতাশি, এগার আর সাড়ে তেত্রিশ চেন্। তারপর গে ধরুন ঝিনেদা টু মাগরো, মধুপুরির কাছে—"

খান বাহাদুর অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "আহা, ডিটেলস্ কে জানতে চাইছে। খুঁটিনাটি নিয়ে আপনি ঠিকেদার এই দাউদ মিঞার সঙ্গে কথা বলবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। কোনো রকম বাগড়া দেবেন না। আপনার আপাতত দু'বছরের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। শুধু একটা শর্তে। এই দাউদ মিঞাকে তাড়াতাড়ি কাজ তুলে দিতে মদত দেবেন। মেজারমেনটের ফ্যাকড়া-ট্যাকড়া বেশী তুলবেন না।"

করালীকান্ত বিগলিত হয়ে বলল, "হুজুর মা বাপ, য্যামনভাবে চলতি কবেন তেমনিই চলব।"

"ঝিনেদা আর মাগরো সাব ডিভিশনের ডি বি রোডের কটা জায়গায় কাজ হবে আর কী কী কাজ হবে?"

করালীকান্ত বলল, "সতেরটা জায়গায় মেজর রিপেয়ার হুজুর, তা ছাড়া প্যাচ্ রিপেয়ার—"

"কাজ কী হবে তাই বলুন?"

"সবই হবে হুজুর, আর্থ ওয়ার্ক, বকস্ কাটিং বার ফুট করে সিংগিল সোলিং ঝামা মেটালিং, ব্রাইনডিং উইথ্ ঘেঁস্, রোলিং—"

"ঠিক আছে," খোন্দকার বললেন, "দাউদ মিঞাকে বুঝিয়ে দেবেন। এখন যান।"

"আদাব হুজুর" বলে করালী বেরিয়ে যাচ্ছিল খোন্দকার ডাকলেন।

"শুনুন, এই কাজটা কে পাচ্ছে ঘুণাক্ষরেও তা যদি ফাঁস হয়—"

করালী বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর, নিজির পায়ে কি কুড়ুল মাত্তি পারি?"

করালী বেরিয়ে যেতেই চাকর এসে চিলম্ বদলে দিয়ে গেল। খান বাহাদুর আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ আলবোলা টানলেন। তারপর মুখ থেকে নলটা সরালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

দাউদ বলল, "জে, সত্যিকারের কাজের সুমায় পাওয়া যাবে সাত কি আট হপ্তা। মাঠের ধান না উঠলি এদিকির মজুর পাওয়া যাবে না। যাক, মাটি কাটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তার মানে একই সঙ্গে অনেক জায়গায় কাজ শুরু করতি হবে। আর ঐ সঙ্গে আমরা যদি কাজের সাইটে পাঁজা পুড়িয়ে নিই, ইঁটির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

দাউদকে বাধা দিয়ে খান বাহাদুর বললেন, "বাস বাস, তবে তো হয়েই গেল। আর কিছু বলার আছে?"

"জে, এ তো অনেক টাকার ব্যাপার।" দাউদ বলল, "যত টাকা গুড়ার দিকি ঢালতি হবে, তা তো নেই।"

"আহ্‌হা," খান বাহাদুর বললেন, "তুমি কেবল কাজ তুলে দেবার কথা ভাব, টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে অ্যাড্‌ভানস করব। এবার হল তো?"

হঠাৎ কী হল? দাউদের সাহস বেড়ে গেল।

বলল, "জে, আমার উপর আপনার যখন অ্যাতই মেহেরবানি তা'লি অ্যাকটা কথা কই। হয় এই কাজডা আমারে পুরো অ্যাকা করতি দ্যান, লাভলুকসান সব আমার, আর নয় মতি মিঞার উপরেই পুরো ছা'ড়ে দ্যান, লাভ-লুকসান পুরো উনার। আপনার মর্জি হলি যদি আমি এই কাজডা পাই তা'লি আমি মতি মিঞারে পি ডবলিউ ডি-র কাজডা ছা'ড়ে দেব। তারপর যার কিসমত যেখানে যারে নিয়ে যায়।"

খান বাহাদুর স্থিরদৃষ্টিতে দাউদের দিকে চাইলেন।

তারপর বললেন, "মতির সঙ্গে তোমার বনছে না মনে হচ্ছে।"

দাউদ শুধু বলল, "জে।"

খান বাহাদুর চুপ করে আলবোলা টানতে লাগলেন। একবার বাঁ হাতটা মুখে বুলিয়ে নিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার মাথায় মুখে হাত বোলালেন।

তারপর বললেন, "মতিকে দিয়ে ঠিকেদারী হবে না। তুমি আলাদাই কর। শুধু একটা কথা মনে রাখবা ডিসেম্বরের পনেরোই হচ্ছে শেষ তারিখ। তার যত আগে কাজ তুলে দিতে পারবে তত ভালো। কী, আর কোনো কথা নেই তো?"

"জে না!" দাউদ বলল, "আপনার মদত আর আল্লার মর্জিতে কাজ উঠোয়ে দিতি পারব আশা করি।"

"শোনো দাউদ!" খান বাহাদুর বললেন। "তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি ঈমানদার মুসলমান।"

আমি ঈমানদার! দাউদ হাসবে না কাঁদবে?

"মনে হচ্ছে, তোমার উপর বিশ্বাস রাখা যায়।"

চাচা একথা বলবে না। এক আধলা দিয়ে চাচা আর বিশ্বাস করবে না।

"যা কাউকে বলি নি, তাই তোমাকে বলছি।"

দাউদের শরীরটা শিউরে উঠল। বিশ্বাস! খান বাহাদুর আমারে বিশ্বাস কত্তিছেন। আমাকে বিশ্বাস করা যায়!

দাউদ কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগল।

"জানুয়ারি মাসে কাউন্সিলের ইলেকশন হবে। আমি ইউনাইটেড মুসলিম পারটির মনোনয়ন পেয়েছি।" খান বাহাদুর জাঁদরেল উকিল, শহরের সেরা শরীফ, খোন্দকার বজলুর রহমান, খাস কামরায় যখন আর কেউ নেই, শুধু সে, কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন অসহায় শিশু হয়ে গেলেন।

"আমাকে তোমাদের ওদিক থেকেই দাঁড়াতে হবে। আমাকে মদত দিতে হবে বাপ। কেন না যশোর সদরের সীটে আমাদের বিরুদ্ধে সৈয়দ নওশের আলি সাহেব দাঁড়াবেন। ওঁকে এ'টে ওঠা শক্ত হবে। মুসলিম লীগ বলেছে, আমার হয়ে যা করবার লীগের ভলানটিয়াররাই করবে। কিন্তু শুধু লীগের উপর ভরসা করে থাকা যায় কী? নিজের লোক না হলে চলে? তুমি আমার নিজের লোক। তোমার উপর আমি আমার ইলেকশনের তদারকির ভারও পুরো ছেড়ে দিতে চাই। বুঝলে দাউদ। তুমি ওদিককার লোক। ওদের তুমি অনেক বেশী চেন।"

ফুটকি! ফুটকি! তুই ক্যান্ আর কডা দিন সবুর করলি নে। আমার ভুলই তোর কাছে অ্যাত বড় হলো?

"লীগের কাজ লীগ করবে। করুক তারা। কিন্তু তুমি দাউদ হবে আমার প্রতিনিধি। আমার চোখ আর কান। সত্যি কথা বলাই ভালো। তোমার সঙ্গে আমার খুব বেশী দিনের পরিচয় নয়। আমি উকিল মানুষ। লোক চরিয়ে খাই। লোক দেখে, কাকে বিশ্বাস করা যায় কাকে যায় না, অল্পবিস্তর বুঝতে যে একেবারে পারিনে তা নয়। তোমাকে দেখে মনে হয়েছে, এই কাজে তোমার উপর নির্ভর করা চলে।"

বাইতিদা একথা বলবে না, চাচা একথা বলবে না। চাচা আমার উপর নির্ভর করেছিল, বাইতিদা আমাকে বিশ্বাস করেছিল। ওরা ঠকেছে।

"তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে দাউদ, তোমার একটা যন্ত্রণাদায়ক অতীত আছে।"

হঠাৎ দাউদের বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হল। সে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। রাখতে চেষ্টা করতে লাগল।

"আমি তোমার অতীত জানতে চাইনি। আমি তোমার কাজ দেখেছি। আর আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছি। ইলেকশনের কাজের জন্য অনেক টাকা তোমার হাতে দেবো। তুমি যদি সব টাকা মেরেও দাও আমার কিছুই করার থাকবে না। ইলেকশনে এই জন্যেই বিশ্বস্ত লোকের এত দরকার। আমি জিততে চাই দাউদ। জেতার জন্য সব কিছু করব। এবং হারলে খুব দুঃখ পাবো। কিন্তু যার উপর বিশ্বাস রেখেছি সে যদি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে, তবে দুঃখের মধ্যেও একটা বড় সান্ত্বনা পাবো।"

ছবি, আমার চাচাতো বুন আমারে কয় খুনে। সইফুন মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দ্যায় বাড়িতে থাকলেও সাড়া দেয় না খান বাহাদুর। আমি কি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারব?

"তুমি ভেবে, দ্যাখ, তুমি এই দায়িত্ব নিতে রাজী আছ কিনা। আমার দিক থেকে বলতে পারি তোমার হাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে জান মাল ছেড়ে দিতে পারি।"

দাউদ মুখ নিচু করে বসে রইল। এবং ভাবতে লাগল, এও কিসমতের খেল। কেউ তাকে

দেখা মাত্র দরজা বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ তার ঈমানদারীর উপর পুরো ভরসা করে তার উপর নিজের তদারকীকে সঁপে দিতে চায়। আল্লাহর দুনিয়ায় সবই সম্ভব। দাউদ এখন কী করবে? হঠাৎ দাউদের মনে হ'ল, আল্লা তাকে একটা সুযোগ দিচ্ছেন, মানুষ হবার জন্য। সে এই সুযোগটা নেবে। সে মানুষ হবে। তখন কি সইফুন মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে। দাউদ আল্লাহর পথ ছেড়ে দিয়েছিল বলে ফটিকের মত মেয়েকে হারিয়েছে। এখন আল্লাহর পথে ফিরে এলে সইফুনকে কি সে পাবে না? আল্লাহ!

দাউদ অবশেষে খান বাহাদুরের দিকে চাইল। খান বাহাদুরও ওর চোখের দিকে চাইলেন।

দাউদ কিঞ্চিৎ ভারি গলায় তাঁকে বলল, "আল্লাহর মর্জি হলি আমি ঈমান রাখতি পারব। আপনি যা আমারে কলেন অ্যাত বড় কথা আজ পয্যন্ত কেউ আমারে কয়নি। তাগের কারুরি দোষ দিইনে। আমিই কিনারের কাছে আ'সে নৌকো ডুবোয়ে ফেলি। আপনি খোদার কাছে আমার হয়ে দোয়া মাঙেন আর য্যান অ্যামন না হয়। ইনশাল্লা আপনি কামিয়াব হবেন।"

দাউদ আর কোথাও গেল না। সোজা বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে এখন একা থাকতে চাইছিল। সে ভেবে দেখতে চাইছিল কোন সম্ভাবনার মুখে এসে সে দাঁড়িয়েছে। সম্ভাবনা বিপুল কিন্তু তার চেহারাটা অস্পষ্ট।

কাতলা এসে বলল, "জে, হঠাৎ আ'সে শুয়ে পড়লেন যে। তবিয়ত ঠিক আছে তো?"

"আছে।"

"আপনারে—"

"খান বাহাদুরের বাড়ির থে ডাকতি আইছিল। এই তো কবা?"

"জে।"

"আর কতি হবে না। আমি জানি। আর দ্যাখো কানের কাছে বকবক না করে, যাও তো বাপ নিজির কাম কর গে।"

"জে। তা'লি একটু শির দাবায়ে দিই।"

"ক্যান, এছাড়া কি তুমার আর কোনও কাম নেই?"

"জে না। আপাতক নেই।"

"ক্যান, খানা পাকানো কি হয়ে গেছে?"

"জে। আমার মতো পাকায়ে নিছি।"

"তুমার মতো পাকায়ে নেছ! আমি কি তা'লি বুড়ো আঙুল চোষবো।" বিরক্ত হল দাউদ।

"জে না। মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেবের বাড়ি দুপুর ব্যালায় আপনার দাওয়াত আছে।"

"কার বাড়িতি দাওয়াত আছে কলি!" দাউদ বিছানার উপরে উঠে বসল।

"জে মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেবের বাড়ি।" কাতলা বলল। "ঐ যে যে-বাড়িতি আজ সকালে নাস্তা খাতি গিছিলেন। তারপর আরেকবার যায়েও ফিরে আইছেন। মৌলবী সাহেব বাড়ি ছেলেন না।"

কাতলার বলবার ধরনে দাউদের মুখ গরম হয়ে উঠল। কিন্তু সে কাতলাকে আর কিছু বলল না। আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। খান বাহাদুর যে পরিমাণ কাজ ওকে দিতে চাইছেন, এখন বোঝা গেল, ইলেকশনের আগেই কেন সেগুলো শেষ করা দরকার। খান বাহাদুরের ভোট পাওয়ার সুবিধে হবে। কিন্তু দাউদের সুবিধেই বা কম কী? আড়াই লাখ টাকার কাজ তিনি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন, তার ব্যবসা থেকে তার অপদার্থ ভাইপোকে সরিয়ে নিচ্ছেন, আর তার চাইতেও বড় কথা, তার উপর ন্যস্ত করছেন অনন্ত বিশ্বাস। দাউদ বিস্মিত, দাউদ হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এসেছে বাসায়। আর বাসায় এসে দেখে বিস্ময়ের আরেক ধাক্কা তার জন্য অপেক্ষা করছে। দুপুরে দাওয়াত ক'রে গিয়েছেন মৌলবী জয়নুদ্দিন! মৌলবী কি নিজের থেকেই দাওয়াত করতে এসেছিলেন, না এর পিছনে অন্য কারও হাত আছে? সইফুন পাঠায়নি তো?

সইফুনকে সকালে ফটিক ভাইএর বাড়িতে দেখার পর থেকে দাউদ কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। যদি না সইফুন ওর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিত, তাহলে কি সইফুনের কথা এত মনে হ'ত দাউদের? যদিও সে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল তবু দাউদ সেই বিষণ্ণ শিউলির মত মুখ-খানার উপর রাগ করতে পারেনি। বরং ঐ মুখ আবার দেখবার পিপাসা জেগে উঠেছে দাউদের মনে। আল্লাহ সেই খায়েশ পুরোবার জনাই এই দাওয়াত পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাই।

দাউদের মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর বরকত তাকে উজাড় করে ঢেলে দিতে চাইছেন। দাউদ পুরানো ভুলে আর জড়িয়ে পড়বে না। তাকে আড়াই লাখ টাকার কাজটা সময়ে তুলে দিতে হবে, সাব ওভারসিয়ার ব্যাটা এখন আর বাগড়া দেবে না। কালই সাব ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে সাইট দেখতে বেরিয়ে যাবে দাউদ। আর এবার সে নিজেই ইঁট পোড়াবে। খান বাহাদুর বলেছেন, টাকার জন্য আটকাবে না। খান বাহাদুর তাঁর ওঠার পথে দাউদের সাহায্য চাইছেন তার বদলে তিনি দাউদের উন্নতির সুযোগও করে দিচ্ছেন। খান বাহাদুর যত উঠবেন, দাউদের উন্নতির পথও তত প্রশস্ত হবে। খান বাহাদুর ডিস্ট্রিক্ট বোরডের ভাইস চেয়ারম্যান আছেন বলেই না তার নির্বাচন কেন্দ্রের রাস্তা মেরামতের জন্য আড়াই লাখ টাকার ঠিকে তাকে দিতে পারলেন। কাজেই খান বাহাদুরের তরক্কির জন্য তাকেও জান লড়িয়ে দিতে হবে। বোরডটাকে হাতের মুঠোয় রাখতে

পেরেছিলেন বলেই না খান বাহাদুরের পক্ষে বিনা টেন্ডারে তাকে এত টাকার কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মুরুব্বীদের পজিশন মজবুত করতে হবে। খান বাহাদুর ভোটে যাতে জেতেন, সে গরজ দাউদেরও বড় কম নয়। খোন্দকার তার মুরুব্বি। যে কাজটা তিনি ওকে হাতে তুলে দিলেন, এই কাজটা হাসিল করে দিতে পারলে দাউদের হাতে কিছু পয়সা জমে যাবে। এক সময় কাজকে ভয় করত দাউদ। নিকিরির ছাওয়াল হয়ে মাছের ব্যবসাটাও করতে পারেনি। কিন্তু কি হল কয় মাসের মধ্যে, দাউদের আক্কেল খুলে গেল। সে ঠিকেদারি শুরু করল। আর কালোজিরেরই পরামর্শে। ঢাকার এক সাহা বড় ঠিকেদার, তার কাছেই কাজের হাতে খড়ি। কালোজিরেই কী করে সাহাবাবুকে যোগাড় করেছিল। দাউদ কাজ শুরু করতে না করতেই ডুবে গেল কাজে। সে পথ পেয়ে গেল। এই কাজটা তার মনের মত কাজ। সে দাঁড়াবে। এই কাজ ধরেই সে দাঁড়াবে, যখন তার আত্মবিশ্বাস এই স্তরে এসে পৌঁছালো, তখনই তাকে সর্বস্বান্ত করে সাহাবাবুর সঙ্গে ভেগে পড়ল কালোজিরে। গহনা দেখেই বোঝা উচিত ছিল দাউদের। এত গহনা কালোজিরে পায় কোথা থেকে।

সাহাবাবু দ্যায়।

ক্যান্ দ্যায় সাহাবাবু?

ও কি ওর বাপের টাকার থে দ্যায়? তুমি রক্ত জল করে ওর হয়ে খাটবা আর ও তুমারে হাত ঝাড়ানি জল দিলিই আমরা তুষ্ট হয়ে যাব। আমারে তুমি তেমনি মেয়ে পাইছ, না! আমি তুমার মত মেনি মুখো নই। আমি সা'র পোরে কয়ে দিছি। ওরে যদি ঐ কটা টাকা দ্যান তালি ওরে আর কাজে পাঠাব না। সা'বাবু তখন ক'লো, ঠিক আছে, ও যা পাচ্ছে পাক, বাকিটা দিয়ে আমি তুমার গয়না গড়ায়ে দিচ্ছি। চাপ না দিলি কিছু পাওয়া যায় না।

তারপরই তার শরীরটা এগিয়ে দিয়ে কালোজিরে দাউদের মনের সব সন্দেহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিত। সেটা যে কালোজিরের ছল দাউদ ধরতেই পারেনি। কালোজিরে ওকে সর্বস্বান্ত করে চলে যাবার পর দাউদের চৈতন্য হল এবং সে দ্রুত যেন সাবালক হয়ে উঠল।

চাপ না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। কালোজিরে কথাটা বলেছিল কিন্তু বড় ভাল। সে আজ চাপ দিয়েছিল বলেই খান বাহাদুর মতি মিঞাকে তার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলেন। আরেকটা উপকারও কালোজিরে তার করে দিয়েছে। তাকে ঠিকেদারির পথে সেই নামিয়েছে।

এত বড় কাজ ডিস্ট্রিক্ট বোরডে এর আগে আর বের হয়নি। অ্যাখন খান বাহাদুরই ধরতে গেলে বোরড। এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ চেয়ারম্যানবাবু বৈদ্যনাথ সরকার এখন ধরতে গেলে ভাইস চেয়ারম্যানের হাতের পুতুল। এর আগে পর্যন্ত বোদে সরকারই ছিল দলে ভারি। হিন্দু মহাসভার জেলা প্রেসিডেন্ট বোদে সরকারের দলই তখন মেজরিটি। তারপর বোদে সরকার হলেন জেলা কংগ্রেসের নেতা। তখনও তার বেশ রবরবা। হিন্দুগেরও পোয়াবারো। চাকরি বলো, ঠিকেদারি বলো, সব কিছু হিন্দুগের একচেটে। গোলাম মিঞা বলেছে দাউদকে। তারপরই পাশার দান উলটে গেল। অসহযোগ নিয়ে কংগ্রেসে দলাদলি চরমে উঠল। বোদে সরকার খান বাহাদুরের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলেন এবং চেয়ারম্যান রয়ে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাকে সমর্থন জানাল না। খান বাহাদুরের প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই বোদে সরকার ডিস্ট্রিক্ট বোরডের চেয়ারম্যান হয়ে রইলেন। কিন্তু এতদিন পরে বোরড এসে গেল খান বাহাদুরের মুঠোয়। বোদে সরকার, শোনা যাচ্ছে, হিন্দু মহাসভার ক্যান্ডিডেট্ হয়ে জেনারেল সীটে কাউন্সিলের ইলেক্শনে দাঁড়াবেন। খান বাহাদুর দাঁড়াবেন একটা মুসলিম সীট থেকে। ইউনাইটেড মুসলিম পারটির প্রার্থী। দাউদকে তারই পটভূমি তৈরি করতে হবে।

আচ্ছা, সইফুনের শাদী হয়ে যায়নি তো? ঝপ করে দাউদের মনে চিন্তাটার উদয় হল। অমন ভালো মেয়ে মৌলবীর ঘরে এতদিন শাদী না হয়ে বসে থাকে না কি? দাউদের মনটা বিষন্ন হয়ে উঠল। এইটেই তো স্বাভাবিক। অথচ এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা দাউদের মাথায় আসেনি! আশ্চর্য! আসলে সইফুনের বিষন্ন মুখটাই দাউদের মনে এত জোরে আঁকা হয়ে গিয়েছে যে সে কেবল সইফুনের মুখখানা দেখবার কথাই ভেবেছে। অন্য কোনও কথা ওর মনেই হয়নি। এখন যতই সে ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে, সইফুন বিবাহিতা। এবং যতই সে একথা ভাবছে ততই তার মনে হচ্ছে, সে যেন এক মস্ত বড় বঞ্চনার শিকার। এবং ততই সে কেমন বিষন্ন হয়ে উঠছে। সইফুনের শাদী হোক বা না হোক, তাতে দাউদের কী! এই কথাটাই সে তার মনকে বোঝাতে পারছে না কেন?

আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

তুমি না কইছিলে, কালোজিরেই তুমার শেষ। আওরাতের খপ্পরে আর মাথা মুড়োবা না।

না না, খুদা কসম্, এই ব্যাপারডা মানে এই সইফুনির ব্যাপারডা অ্যাকেবারে অন্য রকম। কালোজিরের মতো অ্যাকেবারেই না।

বুঝে দ্যাখ দাউদ, অ্যাখন তুমি খোদার ফজলে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নেছো। আবার কোনও ফাঁদে পা দিয়ে ইডাও নষ্ট করো না।

পাগল হইছ। আমি খুব সাবধানে আছি। আমি ইবার উঠে দাঁড়াবো। আল্লাহ্ রাস্তা ধরায়েই দেছেন। আমি যে ভাবেই পারি, এই কাজডা উঠোয়েই দেব। কুণ্ডুবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে

গেছে, সাইট দেখতি কাল সকালেই বেরোয়ে পড়ব।

তাই যাও। আর কোন ফাঁদে প'ড়ো না।

ফাঁদ! ও সইফুন? সইফুন, ফাঁদ না ফাঁদ না।

দাউদ উঠে পড়ল। কাতলাকে বারান্দায় এক বালতি পানি দিতে বলল। কাতলা বারান্দায় পানির বালতি তুলে এনে কাছে একটা জলচৌকিও রেখে দিল। তারপর আড় চোখে তার মিঞার ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগল।

মিঞা দেখি অ্যাকখান নতুন সাবান বার করে আনলেন। মুখি চোখি সাবান ঘষা মিঞার যে আজ শেষই হতি চায় না। মুখ ধুয়ে মুখ মুছে ঘরে যায়ে ঢোকলেন। উঁ! আবার যে দেখি শিস্ দিয়াও চলতিছে। মানে মনে খুব ফুর্তি হতিছে। মৌলবীর বাড়ি যাতি ফুর্তি তো দেখতিছি উপছোয়ে পড়তিছে! কাতলা পেয়ারা গাছের ডগার দিকে চেয়ে দেখল বাড়ির উঠোনটায় ঝিকে হলুদ রঙের বিস্তর প্রজাপতি উড়ছে।

দাউদের সেই বিষন্ন ভাবটা ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস হল, সইফুনের এখনও শাদী হয়নি। তাই যদি হবে, আল্লাহ তা'লি আজ সকালে সইফুনের সংগে তার দ্যাখা করায়ে দেবেন ক্যান্?

আয়নায় নিজের মুখখানা একবার ভালো করে দেখে নিল। ও মুখে অতীতের গ্লানির কোনও চিহ্ন নেই। যেন মেঘ ঝরে যাওয়া আশ্বিনের আকাশ। কোথাও কোনও মলিনতা নেই। দাউদ শিস্ দিতে লাগল।

তোমার সংগে আমার অ্যাত দেরিতি দ্যাখা হ'ল ক্যান্ সইফুন?

আয়নার দিকে চেয়ে দুই হাতের তালু দিয়ে মুখের পাউডার ঘষে ঘষে মিলিয়ে দিতে লাগল দাউদ।

ফুটকির সংগে শাদী হবার আগেই তুমার সংগে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিল।

দাউদ গেঞ্জিটা খুলে মেঝেয় ফেলে দিল। তারপর শিস্ দিতে দিতে আলনা থেকে ফর্সা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি বেছে নিয়ে গায়ে পাউডার ছড়িয়ে সেটা পরল।

তা'লি আমারে কেউ খারাপ কত্তি পারতো না।

সুন্দর একটা চেক্ দেওয়া লুংগি আর মলমলের একটা কলিদার চিকণের কাজ করা পাঞ্জাবি পরল। সুরমা পরব? আতর? নাঃ! বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তারপর সাইকেলটা বের করে তাতে চড়ে বসল দাউদ। মনে মনে আন্তরিকভাবে বলল, খোদা কসম সইফুন তুমারে পালি কেউ আমারে খারাপ কত্তি পারতো না।

ক্রিলিলিং। দাউদ আশা করেছিল কোনও একটা জানালা খুলে যাবে। খুলল না। সে হতাশ হল। ক্রিলিলিং। ক্রিলিলিং। তার তৃষিত চক্ষু বন্ধ জানালাগুলোর উপর দিয়ে বৃথায় ঘুরে এল। দড়াম করে বাইরের ঘরের দরজা খুলে গেল।

মহা উৎসাহভরে মৌলবী জয়নুদ্দিন বলে উঠলেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।"

"ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম্!" দাউদের স্বরে খানিকটা চাপা বিষন্নতা ছড়িয়ে পড়ল।

॥ ১৭ ॥

সাজ্জাদ, কেবল গোটা কয়েক ভাতের গ্রাস মুখে দিয়েছে, দ্যাখে ফটিক ঢুকছে। সে বিস্মিত হল। আবার খুশিও। চাঁদবিবি পাকের ঘরে গিয়েছিল ছালন আনতে। ছালন নিয়ে বেরিয়েই দেখে ফটিক।

চাঁদবিবি ছালনের বাটি মাটিতে রেখেই থপ্ করে বসে পড়ল। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠল। "বাপ ফটিক, তুই ক'নে ছিলি বাপ! তোর বাপেরে যে গারদে পুরে রাখিছিল বাপ্!"

সাজ্জাদ ধমক দিল, "চুপ কর! ছাওয়াল তা'তে পুড়ে বাড়ি আ'লো, আর উনার শোক উথলোয়ে উঠল। আগে একটু জিড়োক, ঠান্ডা হতি দে, তারপর যা কবার কো'স।"

চাঁদবিবি ধমক খেয়ে গলা নামালো। কিন্তু কান্না থামলো না। ছালনের বাটি সাজ্জাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল।

"আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি অ্যামন হ'ত না। আপনারে নিয়ে যাতি পারতো না। আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি উরা চোরগের সংগে আপনারে ফাটকা রাখতো না। আমার ছাওয়াল বাড়ি থাকলি—"

চাঁদবিবির প্যানপ্যানিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল সাজ্জাদ।

বলল, "আমারে রাজা ক'রে দেতো। নে অ্যাখন থামেক তো।"

সাজ্জাদ দেখল ফটিকের মুখ কালো হয়ে গেল। সাজ্জাদ বুঝল তার কথায় ব্যথা পেয়েছে ফটিক। সে অপ্রস্তুত হ'ল। আসলে সে ফটিককে আঘাত দেবে বলে কথাটা বলেনি। চাঁদবিবিকে থামিয়ে দেবার জন্যই কথাটা বলেছিল। সাজ্জাদ নিজেও কষ্ট পেল।

ফটিক অপরাধীর মত বাপকে সালাম করে কিন্তু কিন্তু করে বলল, "পরশু রাত্তিরে খবরটা

পেলাম।”

সাজ্জাদ নরম আওয়াজে বলল, “যাও বাপ, ঘরে যাও। একটু জিড়িয়ে নিয়ি হাতে মুখে পানি দ্যাও। তারপর গোসল করো। খাও। তারপর কথা হবে। আজ থাকবা তো?”

ফটিকের মনে পড়ল ছবি বার বার ব'লে দিয়েছিল, সন্ধ্যের বাসে ফিরে যেতে। বলেছিল, একা থাকতে ভাল লাগে না ছবির। একা থাকতে ভয় করে তার। ফটিককে জড়িয়ে ধরে কেমন নির্ভয়ে ঘুমুলো! ফটিক ছবির কাতর প্রার্থনা শুনে সন্ধ্যের বাসেই ফিরবে, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল। সাজ্জাদের “আজ থাকবা তো?” এই প্রশ্ন ফটিককে খুব বিপদে ফেলে দিল। ভাবল, না বলা উচিত হবে না।

ফটিক সংগে সংগে বলল, “জে। থাকবো।”

“ব্যস্, তা'লি কথা বাত্তারার সুমায় ঢের পাওয়া যাবে। অ্যাখন হাতে মুখে পানি দ্যাও গে।”

ফটিক কৈফিয়তের সুরে বলল, “পরশু রাত্রে যখন খবর পেলাম, তখন আর বাস ছিল না। তাই কাল প্রথম বাসেই ঝিনেদায় এসে পৌঁচেছি।”

“আমার ছাওয়াল,” চাঁদবিবি আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, “আমার ছাওয়াল খবর পালি ছুটে আসবে, এ আমি কইনি? কইনি? কন?”

সাজ্জাদ বিব্রত বোধ করতে লাগল।

“হইছে, হইছে,” সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “বাপেরে একটু জিড়োতি দে দেহি অ্যাখন?”

ফটিক কৈফিয়ত দিল, “তা আপনার বিয়াই বললেন, আপনারা পরশু বিকেলেই জামিন পেয়ে গিয়েছেন।”

সাজ্জাদ বলল, “আল্লার দরগায় হাজার শুকুর্ যে অ্যামন বিয়াই আমি পাইছি। আমাগের জামিন খালাস ক'রে আনার জন্যি দুদিন ধ'রে যা করিছেন, নিজির ভাইর জন্যিউ আজকাল তা কেউ করে না।”

চাঁদবিবির চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করল। সে বারবার আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। আর মিনমিন করতে লাগল, “আল্লার দয়ায় বিয়াই তো ভালো পাইছি, আল্লার দয়ার অ্যাকটা বুঝমান বিয়ান পাইছি, আল্লার দয়ায় অ্যাকটা হাছিনা বিটি পাইছি, আল্লারে কই আল্লা আমরা তো তুমার পথেই চিরকাল আছি চিরকালই থাকবো তুমি এগের ভালো রা'খো আর আমাগের আর কত কষ্ট দিবা। আল্লারে জিজ্ঞেস করি তোর বাপ সন্ধ্যের পর আ'সে ক'ল, দ্যাখ্ অ্যাখনই ঝিনেদায় যাচ্ছি দারোগা সাহেব ডাকিছে—”

সাজ্জাদ এবার ধমক দিল, “তোর সাপের মন্তর থামা দিন। কান্না থামা! আচ্ছা জ্বালা। বাপরে ঘরে যাতি দে। জামা কাপড় ছাড়ুক। এট্টু জিড়োয়ে নিক। তারপর তোর যা কওয়ার আছে ক'স্। আমারে দুটো ভাত দে।”

চাঁদবিবি তাড়াতাড়ি করে চোখ মুছে বলল, “হ্যাঁ বাপ, ঘরে যা। আমি তোর বাপরে খাতি দিয়ি আসতিছি। বিটির খবর কী?”

“এখন তো একটু ভালোই দেখলাম।”

“বিয়াই বিয়ান ভালো আছেন তো?”

ফটিক ঘরে যেতে যেতে বলল, “তা আছেন।”

“আল্লা তাগের খুশি খুশালি রাখেন।”

অনেকদিন পরে ফটিক আবার তার ঘরে ঢুকল। ওদের খাটের উপর যে বিছানাটা ছবি পরিপাটি পেতে রেখে গিয়েছিল, সেটা তেমনই আছে একটা সুজনি ঢাকা। বিছানার উপর খড়কুটো। চড়াই পাখির কান্ড। চালের বাতায় মাকড়শার জাল। যখন এসে ওরা ঘর পেতেছিল, যখন ছবি ছিল, এই ঘরটাই কী আশ্চর্য এক উজ্জ্বলতায় ভরে উঠত। ছবি এবার আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বারণ করাতে আর উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু প্রথমবার ছবি কী জিদ্ই না ধরেছিল! কেউ রুখতে পারেনি তাকে। তাকে ঘর দোর পরিষ্কার করারও সুযোগ দেয়নি। কিন্তু এবার ফটিক যেই বলল, তোমার এই অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয়, ডাক্তারবাবুর বারণ আছে, ক্ষতি হতে পারে। অমনি ছবি চুপ।

ছবি এখন বাচ্চার কথা ভাবছে। জামা খুলতে খুলতে ফটিক ছবির কথা ভাবতে লাগল। ওকে কথা দিয়ে এসেছিল ফটিক, আজ সন্ধ্যায় ফিরে যাবে। ছবি অপেক্ষা করবে। ভয় পাবে। কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠাতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু আব্বা যদি জানতে পারে তবে ফটিককে যেতে বলবে। সে জানে তার উপর তার বাজানের কেমন একটা অভিমান আছে। তেমনি সে আবার এও জানে যে সাজ্জাদ মোল্লার বিবেচনা বোধ অতি প্রখর। সেটাই ফটিকের অস্বস্তির কারণ।

ফটিক পাট করা একটা লুঙ্গি বের করে পরল। তারপর আদুড় গায়ে বদনাটা তুলে নিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেল। মুখে হাতে পানি দিতে দিতে ফটিক ভাবছিল, ছবির স্বপ্ন ছিল ফটিকের রোজগারে সে এই বাড়িটাকে তার বাপের বাড়ির আদলে গড়ে তুলবে। এক পোতায় দুখানা ঘর তাদের। তার শ্বশুর শাশুড়ির ঘরের লাগোয়াই যে তার ঘর, এতে ছবি খুব অস্বস্তি বোধ করত। গলা নিচু করে কথা কইত তারা, এত নিচু যে প্রথম প্রথম ছবির কথা শুনতেই

পেত না ফটিক। পরে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। ছবির কথা ভাবতে ভাবতে ফটিক অন্যমনস্ক হয়ে গেল এবং বদনার পানি মুখে ঢেলে কেবল কুল্লিই করে যেতে লাগল।

ছবির ধারণা তাদের ফিস্‌ফিস্‌ কথাও বুঝি শ্বশুর-শাশুড়ির কানে গিয়ে ঢুকছে। ওদের কথার আর বিরাম ছিল না। এক একদিন ভোর হয়ে যেত। ছবির হাউস ছিল ফটিকের হাতে পয়সা হলে প্রথমেই তাদের জন্য নতুন পোতায় একখানা চৌরী ঘর তুলবে। বেশ বড় হবে ঘরখানা। শ্বশুরের ঘরটাও বড় করে তৈরি করে দিতে হবে। তারপর আরও পয়সা হ'লে ছবি টিন দিয়ে চাল ছাইবে। তারপর? তারপর মজবুত একটা বিশাল খাট করিয়ে নেবে। তাতে নক্‌শাকাটা থাকবে। আয়না থাকবে। না, না, পরক্ষণেই মত বদলেছিল ছবি। আয়না নয়। আয়না থাকবে না। ওর বাপের বাড়ির ছত্রি লাগানো খাটের শিথেনে এবং পথেনে দুটো ছোট আয়না লাগানো ছিল। একদিন বেজায় লজ্জা পেয়েছিল ছবি। তারপর ছোট্ট দুটো পর্দা করে ঢেকে দিয়েছিল। ছবি তাদের দাম্পত্য দিল্লাগীর কোনও রকম সাক্ষী রাখতে চায় না। তাই সে বলেছিল, তার এবাড়ির খাটে সে নানা রকম নক্‌শা করিয়ে নেবে কিন্তু আয়না বসাতে দেবে না। কিন্তু এখন কী করবে ছবি? কী করে তাদের দিল্লাগীর সাক্ষ্য চেপে রাখবে? তুমি না মা হতে চলেছ? ফটিকের হাসি পেল। এটাকে কী দিয়ে ঢাকবে ছবি!

চাঁদ বিবি ছাওয়ালের কান্ড দেখে অবাক। সেই তখনের থে পানি নিয়ে নিয়ে মুখি পুরতিছে আর কেবল কুল্লি কত্তিছে।

"ও বাপ!" চাঁদ বিবি ডাকল। "খাবা না?"

ফটিক মায়ের ডাকে তার দিকে ফিরে চাইল।

"কী ভাবতিছ, মণি!" উদ্বিগ্ন হয়ে চাঁদ বিবি জিজ্ঞেস করল। "গোছল করবা না? ব'সে ভাবলিই প্যাট ভরবে? শরীর তো দেহি আধখানা হয়ে গেছে।"

ফটিক তার দিকে চেয়ে হাসতেই চাঁদ বিবির বুকটা হালকা হয়ে এল। ছাওয়ালের মন তা'লি ভালোই আছে।

ফটিক বলল, "গোছল করেই বেরিয়েছি। তুই খেতে দে।"

"তুই খেতে দে," কথাটা শুনে চাঁদ বিবির প্রাণে সুখের ঢল নামল। তার ফটিক তার ফটিকই আছে। চাঁদ বিবির চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। ছাওয়াল কত দূরে থাকে। কত রকম চিন্তা হয়। ভয় হয়। ভাবে কাছে এসে থাকতে বলে। বুড়ো হয়ে গ্যালাম বাপ, তুই দূরি দূরিই যদি থাকবি তবে ছাওয়াল নিয়ে বউ নিয়ে ঘর করার সুখ কবে পাবো? চিরডা কালই কি অ্যামন অ্যাকা অ্যাকাই কাটবে? ভাবে, ছাওয়ালকে কথাটা বলে চাঁদ বিবি। কিন্তু বলে না। ছাওয়াল উকিল হইছে, ভাত বাড়তে বাড়তে নিজেকেই বুঝ দিতে লাগল চাঁদ বিবি, অ্যামন ছাওয়াল এই দিগরের মোছলমানদের মধ্যি আর অ্যাকটাও নেই। কোট-কাছারি কি গিরামে থাকে যে ছাওয়াল বাড়িতি থাকবে? কোট-কাছারি যেখেনে আছে ছাওয়ালডও সেইখেনেই থাকে। তা অ্যাখন করা যাবে কী? যার য্যামন নছিব। ছুটিতি অ্যাকবার দিন কয়েকের জন্যি ছাওয়াল আর বউ বাড়ি আইছিল। পেরথমে আসেই এ বাড়িতি উঠিছিল। দুদিন থাকতি না থাকতিই বিয়াই আসে মেয়েরে নিয়ে গ্যালেন। বিয়াইর মার বাড়াবাড়ি অসুখ। তা ছাওয়াল এ বাড়িতি থাকবে আর বউ ও বাড়িতি থাকবে, আর বাড়ি যখন পিরায় এ পাড়া আর ও পাড়া, এ আবার হয় নাকি? ফটিকির বাপ ক'লো, ছাওয়ালরে ও বাড়ি যাতি ক। ফটিক ছুটিটা পুরো ও বাড়ি কটায়ে কেবল যাওয়ার আগের দিন আ'সে এ বাড়িতি থাকে গ্যালো। ভালো করে ছাওয়ালডারে বউডারে খাওয়াতিও পারলো না চাঁদ বিবি। তা অ্যাখন করা যাবে কী? কত্তাবিবি ঠিক ঐ সুমায়েই অসুখ বাধায়ে বসলেন। যার য্যামন নছিব।

তবে চাঁদ বিবি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তো। অ্যাখন একটুক্ষণ ঢেঁকিতি পাড় দিলিই চাঁদ বিবির হাঁপ ধরে। শীতির সুমায় কাজ কত্তি বড় কষ্ট হয়। তখন খালি ইচ্ছে হয় বউডা কাছে থাক। ছম ছম করে এঘর ওঘর ঘুরুক ফিরুক। তার সঙ্গে দুটো কথা বলুক। ওতিই চাঁদ বিবির শান্তি। আর কিছু সে চায়ও না। তা অ্যাখন করা যাবে কী? ছাওয়াল উকালতি করবে শহুরে, আর বউডা প'ড়ে থাকবে এখেনে, তা আবার হয় নাকি? সবই বোঝে চাঁদ বিবি। এত বোঝে বলেই কাউকে কিছু বলে না। প্রত্যেকের পাওনাই সে কড়াক্রান্তিতে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু সেও তো আর সকলের মতই মানুষ, মাও তো বটে। তারও তো কিছু পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কই, সেটা তো মেটে না। বা মিটছে না বলে তার যে বড় কষ্ট হয়, একথা তো কেউ বোঝে না। এইসব সময় তার চোখ দিয়ে খালি পানি ঝরে। আল্লাহ্‌! আল্লা আমি আর কিছু জানিনে, শুধু তুমারে জানি। তুমি আমারে ফটিকির মতো অ্যাত ভালো অ্যাকটা ছাওয়াল দেছো, তারে উকিল করিছো আবার ছবি বিবির মতো অ্যামন ভালো অ্যাকটা বউ দেছো, তবু তুমার কী মর্জি; ছাওয়াল বউ নিয়ে ঘর করার সুখটা আমারে দিলে না!

ফটিক ডাক দিল, "আম্মা খাতি দিবি নে?"

চাঁদ বিবির খেয়াল হয়, ছাওয়াল বসে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে যাবার জন্য লজ্জা পায় এবং নিজেকে ধিক্কার দেয়, খালি নিজির চিন্তা!

"যাই বাপ।" চাঁদ বিবি সাড়া দেয় তারপর দ্রুত ভাতের থালা নিয়ে হাজির হয়। খালি ভাত আর কুমড়োর ছালন। ছোট বয়সে কত কি খেতে ভালবাসত ফটিক। এখন হুট হুট করে

আসে। ঘরে প্রায় কিছুই থাকে না। যা পায় তাই খায়। নিজের থেকে আজকাল কিছুই খেতে চায় না। এইটে হ'ল চাঁদ বিবির বড় দুঃখ। উকিল হলি মানুষ বদলায়, না বয়েস হয়ে গেলি বদলায়, চাঁদ বিবি কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। এলেমদার ছাওয়ালের মনের নাগাল পাতি গেলি মায়েরউ এলেম লাগে। কিন্তু চাঁদ বিবির কিছুমাত্র এলেম নেই। বুকভরা শুধু ভালোবাসা আছে। আর আছে খোদা।

ফটিক খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, "আব্বাজানদের ধরল কেন?"

"তা আমি কী করি কবো।" চাঁদ বিবি উত্তেজিত চাপা স্বরে বলল। "সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সারাদিন ধান ভানছি। নছিফা সব গুছোয়ে নিয়ি চলে গেছে। আমি আ'সে গরুরি জাবনা দেবো। তোর বাপ ঢুকল। কয় অ্যাখনই ঝিনেদায় যাবো। ফিরতি রাত হবে। সাবধানে থাকিস্। আমি কলাম, ক্যান্ অ্যাত রাত্তিরি ঝিনেদায় ক্যান্? তোর বাপ ক'লো দারোগা ডাকিছে। আমি কলাম, দারোগা তো আপনারে কখনও ডকে না, তা আজ যে আপনারে বড় ডাকলো। তোর বাপ ক'লো, তা আমি কবো কী করে? আমি কি দারোগার প্যাটে নল বসায়ে কানে ঠ্যাকায়ে রাখিছি। তোর বাপের য্যান্ একটু বিরক্তর ভাব। আমার মনে হ'লো তোর বাপ য্যান্ ব্যাপারডারে ভালো চোখি দেখতিছে না। আমি তোর বাপরে কলাম, তা ডাকিছে কি আপনার অ্যাকারে? তোর বাপ ক'লো, না, বশির, খাদু, জমিরুদ্দি, গয়া এগেরউ ডাকিছে। উরাও যাতিছে। এই কথা শুনে আমার ধড়ে পিরান আ'লো। আমি কলাম, তালি চাড্ডি খা'য়ে যান। তোর বাপ ক'লো, দারোগা হাওলদার সাহেবরে পাঠায়ে দেছে। খাতি গেলি, দেরি হয়ে যাবে। তুই বরং কিছু চি'ড়ে আর শুকনো গুড় যদি ঘরে থাকে তা'লি গামছায় বাঁধে আমারে দিয়ে দে। খিদে পা'লি তাই ফাকাতি ফাকাতি যাবানে। আমি তাই করলাম। পিরেনডা দিতি গ্যালাম, তা নেলে না। তা মন্দ সেই যে গ্যালো, আর ফিরার নাম নেই। সে রা'ত গ্যালো, বাড়িতি আমি অ্যাকা মেয়েমানুষ। ভয়ে ঘুমোতি পারিনে। তোর বাপ বাড়ি নেই, আমি শাদী হ'য়ে নয় বছরের মেয়ে এই বাড়িতি আইছি, কুনুদিনউ এই ঘটনা হয়নি। আমি তো ভয়ে মরি আর আল্লারে ডাকি। আল্লা! আমরা তো কুনুদিনউ তুমার রাস্তা ছাড়িনি তয় ক্যান—"

ফটিক জিজ্ঞেস করল, "আম্মা, তারপর?"

চাঁদ বিবি আঁচলের খু'টে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, "রা'ত গ্যালো, দিন গ্যালো লোকটার কুনু খবর নেই। বশিরির বিবি, জমিরির ছাওয়াল, খাদুর ভাতিজা সবাই আ'সে জিজ্ঞেস করে খবর কী? কনে গ্যালো উরা, কী হ'লো ওগের? আমি কি জানি কিছু যে কাউরি ক'বো? এদিকি আমার দেলে যে কী হতিছে, তা ক্যাবল আমিই জানি। উরা সব চলে গেলি, আমি মনে মনে আল্লারে ডাকি আর ঢেঁকি পাড় দিই। ঢেঁকীতি পাড় দিই আর কই আল্লা আমরা তো তুমার রাস্তা ছাড়িনি, তা'লি তুমি—"

ফটিক বলল, "আম্মা একটু ছালন আন্।"

"আনি বাপ," বলে চাঁদ বিবি উঠে গেল। তারপর কড়াইটা সুদ্ধু নিয়ে এল। হাতায় করে খানিকটা ছালন ফটিকের পাতে ঢেলে দিতে দিতে চাঁদ বিবি বেহেস্তের সুখ দেলে অনুভব করতে লাগল। ফটিক, তার ফটিক সেই আগের দিনের মত তার কাছে আবার ছালন চেয়ে খেল। আল্লা আজ তার ছাওয়ালরে অনেক দিনের পর তার কাছে ফেরত এনে দিলেন যেন।

"আরেকটু ছালন নিবি, বাপ?" চাঁদ বিবি টলটলে চোখে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ফটিকের দিকে চেয়ে রইল। সর্বদাই ভয় এই বুঝি না বলে।

ফটিক একবার মায়ের মুখের দিকে চাইল। আম্মা কাতর চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। ওর মনটা টনটন করে উঠল।

হঠাৎ ফটিক পুরনো দিনের খেলা শুরু করে দিল।

বলল, "কড়াই দেখা আগে। দেখি তোর জন্য কতটা আছে?"

খুব খুশি হয়ে কে'দে ফেলল চাঁদ বিবি। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে মুখে আবার ম্লান হাসিও ফুটিয়ে তুলল।

বলল, "নাই বা থা'কলো আমার জন্যি কিছু। তোর যদি খাতি ইচ্ছে করে খা। আমি তো রোজই খাই। কিন্তু তোরে তো আর রোজ পাব না।"

ফটিক বাধা দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চাঁদ বিবি কড়াইএর সবটুকু ছালন ওর পাতে ঢেলে দিল।

ফটিক জানে তার মা আজ শুধু ভাত খাবে, অবিশ্যি ভাত যদি থাকে। না-হলে অন্য কিছু খাবে, তা না হলে উপোস দেবে। কিন্তু ফটিককে এই ছালন খাইয়ে যে তৃপ্তি পাবে তার মা আর কোনও কিছু দিয়ে ফটিক তার ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না। তাই মায়ের মুখের গ্রাস খেয়ে নিল বলে বেশ কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও বিনা বাক্যব্যয়ে সে খেতে শুরু করে দিল।

চাঁদ বিবি কড়াইটা রান্না ঘরে রেখে এসে ফটিকের কাছে বসল। তারপর একবার নিজের ঘরের দিকে চাইল।

তারপর ফটিকের দিকে সরে চাপা স্বরে বলতে লাগল, "বিয়াই বিকেলের মোটরে খবর পাঠালেন ঝিনেদার থে লোক দিয়ে। তখন জানলাম তোর বাপেরে আর অন্য সবাইরি কয়েদ ক'রে রাখিছে দারোগা। কিছুতিই নাকি ছাড়বে না। শুনে আমার দেল এই ধড়ফড় তো এই ধড়ফড়।

শরীলি এই ঘাম তো এই ঘাম। হাত পা সব থত্থর থত্থর ক'রে কাঁপতি লা'গলো। নছিফা, আর জন্মে আমার বিটি ছিল নিশ্চয়, পানি খাওয়ায়ে, পাখা আ'নে বাতাস ক'রে, বুক ডা'লে দিয়ে দিয়ে তবে আমারে চাঙ্গা ক'রে তোলে। নছিফা সেই রাত্তিরি আমার কাছে আ'সে শুয়েও ছিল। রাত্তিরি আর ঘুম আ'সে না বাপ। সারা রা'ত মনে মনে অ্যাকবার তোরে ডাকি, আর অ্যাকবার আল্লারে ডাকি। অ্যাকবার তোরে ডা'কে কই, ফটিক ফটিক বাপ আমার, তোর বাপেরে কয়েদ ক'রে রাখিছে, তুই তো বাপ উকিল হইছিস্ তবে আয় বাপ, বাপেরে ছাড়ায়ে নিয়ে আয়। আর অ্যাকবার আল্লারে ডাকি। কই, আল্লা ফটিকির বাপ চিরকাল তুমার পথে থাকিছে। কুনুদিন ঈমান নষ্ট করেনি। তা'লি তুমি তারে ক্যান কয়েদে পুরলে? সে নিদ্দুষী। তবু তুমি তার উ'চু মাথাডা নিচু করে দিলে ক্যান? তুমি না মেহেরবান!" চাঁদ বিবি আঁচলের খুট্ দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

ফটিক বলল, "আম্মা, আর কাঁদিস নে।"

চাঁদবিবি বলল, "আমি মেয়েমানুষ, এলেম নেই, দুনিয়ার কিছু বুঝিনে। খালি তোর বাপেরে বুঝি। তার অ্যামন হ'লো। আর তোরে বুঝি। তা তোরে পাবো ক'নে। যদ্দিন তুই ছোট ছিলি তদ্দিন তোরে কাছে কাছে পাইছি। তদ্দিন দেলখান য্যান্ ভরা ছিল। তোর গায় হাত বুলোয়ে কত সুখ পাইছি। কত কথা তখন কইছিস্। ফকিরির কাছে যা শিখতিস আমারে ক্যাবল তা শুনোতি। অ্যাখন কত বড় হয়ে গিছিস, কত এলেম শিখিছিস। কত কথা কওয়ার লোক পাইছিস। তোর মারে আর তো দরকার লাগে না। তোরে আর পাইনে। দেল বড় ফাঁপর ফাঁপর করে বাপ্। বড় কষ্ট লাগে। তোরে কাছে পাইনে বাপ্, তোর বাপেরে কাছে পাইনে, দুদিনির জন্যি বিটি আ'সে বাড়িডারে জাগায়ে দিয়ে গ্যালো। অ্যামন সোন্দর বউ, অ্যামন সোন্দর কথা, আম্মা বলে ডাকলি পিরানডা জুড়োয়ে যা'তো। সে ডাক অ্যাখনও শুনি আর চোখে পানি আ'সে যায়। বিটির কাছে পাবার জন্যি দেলডা উস্থুম্ কুস্থুম্ করে। চোখে পানি আ'সে যায়। তা আমি করব কী? নছিফা ছাড়া বাড়িতি অ্যাকটা কথা কওয়ার মনিষ্যি নেই। তা সন্ধ্যের পর সেও নেই। আমি অ্যাকা। আল্লা য্যান্ কের্মেই আমার আর দুনিয়ার মধ্যি পাঁচিল তুলে দেচ্ছে। কের্মেই য্যান্ আমারে অ্যাকা ক'রে দেচ্ছে। সেই পাঁচিলির একধারে ক্যাবল আমি অ্যাকা আর অন্যদিকি বাপ তুই তোর বাপ দুনিয়ার সগলে। আল্লার কাছে কী গুনাহ্ করিছি বাপ যে অ্যামন হতিছে? তুমি তো এলেমদার হইছ। কও। ক'য়ে দ্যাও।"

চাঁদবিবি আঁচলের খুট দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলতে লাগল।

ফটিকের মনটা টনটন করতে লাগল। এই তার মা! যার জন্য ফটিক আজ ফটিক। তার জীবনে এমন এক সময় ছিল যখন মা ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। মা ছিল সব কিছুর আশ্রয়। সর্ব বিষয়ে তা'কে উৎসাহ দিয়েছে তার এই মা। কী কষ্টে তাকে মানুষ করেছে! ফটিক সব জানে। কিন্তু একথা আজকাল কি তার মনে পড়ে?

ফটিক ভেবে দেখল, না সব সময় তো মনে পড়ে না। কখনও কখনও মনে পড়ে। ফটিক কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেল। আব্বুর সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কোনোদিন মারেন নি, কোনোদিন বকেন নি। তবু বাজানকে সে ভয় পেতো। এবং দূরে দূরে থাকত। সে দূরত্ব আজও আছে, কিন্তু তার মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে আরও। সে নিজের মনের দিকে চেয়ে খুবই অবাক হল। সত্যিই আম্মা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছে, তার জীবনে এখন প্রায় পিছনের সারিতে। বরং আব্বু সেই তুলনায় দু-এক ধাপ এগিয়েই এসেছেন বলতে হবে। ফটিক চুলচেরা বিচার করতে বসল। চিরে চিরে দেখতে লাগল তার মনটা।

সে খেয়ে উঠল। মুখ ধুলো। নিজের ঘরে গিয়ে সোঁদা বিছানাটায় অনেকদিন পরে গা এলিয়ে দিল। কিন্তু তার মায়ের করুণ মুখটাকে মুছে ফেলতে পারল না। একাকিত্বের হাহাকারটাও ক্রমাগত তার কানের পর্দায় ঝড়ের বেগে আছড়ে পড়তে লাগল।

ফটিক দেখল, এক সময় সে আর তার আম্মা, এই দুটো অস্তিত্ব এক হয়ে ছিল। এর ভিতরে এমন ফাঁক ছিল না যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সেখানে ঘটতে পারে। ক্রমে বয়েস বাড়তে লাগল তার। তার ও আম্মার মধ্যেকার ভালোবাসার সেই লাখেরাজ জমিনে ধীরে ধীরে ভাগীদার জুটতে লাগল। তার গোরুচরানোর বন্ধুরা, ইশকুল-কলেজের সহপাঠীরা, শিক্ষকরা, সেই সব মুরুব্বিরা যাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কর্মজীবনের অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা, পরিশেষে তার বিবি এবং আরও আরও। ফটিক দেখল ভাগীদারদের মিছিলের যেন শেষ নেই। মায়ের প্রতি তার ভালোবাসার যে অবাধ ক্ষেত্র ছিল তা আজ ভাগ হয়ে গিয়েছে বহুজনের মধ্যে। মা তাই আগের মত আর একা হকদার নয়। ভাগীদারদের ভিড় তার জীবনে যত বেড়েছে, বেচারী আম্মা ততই পেছিয়ে পড়েছে, উভয়ের দূরত্ব ততই বেড়ে গিয়েছে। ফটিক দেখল জীবনের এই গতি ঠেকানো যায় না। তার আম্মার জন্য খুব কষ্ট হতে লাগল। কীই বা পেয়েছে এই সর্ব বিষয়ে বঞ্চিতা নারী এই জীবন থেকে! সারা জনম তার মা ভারা ভেনেই চলেছে। চাঁদ বিবি আর ঢেঁকি, ফটিক চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করলে এ দুটোকে কখনোই অবিচ্ছেদ্য দেখতে পায় না। এইভাবেই সে ফটিকের সব আবদার রক্ষা করেছে। তার বাপকে বুঝিয়ে ফটিককে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছে। ফটিক উকিল হয়েছে। কিন্তু ফটিকের মা? সেই ভারা ভানানী আজও। এই বৈপরীত্য, এই বিরাট ব্যবধান, এই দূরত্ব ফটিকের মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে এই বিভাজন লক্ষ্য করছিল। এমনকি একই পোতায় বাঁধা ঘর দুটো পর্যন্তও যেন একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ওরা যখন এ-বাড়ি ছেড়ে যশোর যায় রোজগারের ধান্ধায় তখন ছবি তাদের পুরনো বিছানা নিয়ে যায়নি। হাজী সাহেব মেয়ের জন্য নতুন বিছানা দিয়ে দিয়েছিলেন।

ছবি তাদের বিছানা ঢাকবার জন্য একটা সুজনি ফটিককে দিয়ে কিনিয়ে এনেছিল। ছবি যাবার সময় তাদের বিছানাটা পেতে বিছিয়ে রেখে গিয়েছিল। এখন তারই উপর শুয়ে আছে ফটিক। ভাবছে। এখন কেউ যদি তার বাপের ঘরটায় আগে ঢুকে তারপর ফটিকের ঘরে ঢোকে তবে তার স্পষ্টই মনে হবে যে সে একটা সাধারণ চাষার ঘর থেকে বেরিয়ে গরিব কোনও ভদ্র গৃহস্থের ঘরে ঢুকেছে। চাষার বিছানায় তেলচিটে একখানা কাঁথা এলোমেলো করে ছড়ানো। কোনও ছিরিছাঁদ নেই ঘরে। পাশের গরিব ভদ্র গৃহস্থের বিছানার উপরে একটা সুজনি পরিপাটি করে পাতা। গরিব চাষার ঘরটায় এখানে হাঁড়ি, ওকোণে ঠিলে, কোনওখানে শিকেয় ঝোলানো এটা ওটা সেটা। গরীব ভদ্র গৃহস্থের ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা, কোন আসবাবই নেই বলতে গেলে তবু একটা পুরনো টেবিল একটা চেয়ার, আর একদিকে ইঁট পেতে একটু উঁচু জায়গার উপর বসানো রয়েছে ফটিকের অনেকদিনের সঙ্গী টিনের সুটকেসটা যার মধ্যে ঠেসে রেখে গিয়েছে ছবি তার টুকিটাকি যত অকেজো জিনিস। এ ঘরের সব কিছুই গোছানো। সব ছিমছাম। এ যেন দুটো আলাদা ধরনের ঘর নয়, দুটো আলাদা জগৎ।

ফটিক আর তার আম্মা এই দুটো আলাদা জগতে আজ দাঁড়িয়ে আছে। ফটিক তার মায়ের জন্য দুঃখ বোধ করতে পারে কিন্তু এই দুই বিপরীত জগতের ব্যবধান সে কেমন করে কমাবে জীবনই সেই নিষ্ঠুর আমীন, ফটিক ভাবল, যে চেন্ মেপে এই সীমা সরহদ্দ ঠিক করে দিচ্ছে তার রায় আমাদের পীড়িত করে, যন্ত্রণার কারণ হয়, কিন্তু সেই রায় পালটাবার ক্ষমতা মানুষের নেই। তার মা একা! তার মা একা! যত ভাবছিল এই কথা, ফটিক ততই কষ্ট পাচ্ছিল। কিন্তু তার আরও কষ্ট এই কথা ভেবে যে তার মায়ের এই যন্ত্রণার কোনও দাওয়াই ফটিকের হাতে নেই। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ফটিক চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে এই সব ভাবনা ভাবছিল। চোখ খুলতেই সে দেখল আড়ার বাঁশে একটা তক্ষক। তার দিকে চেয়ে আছে। আবার ছবির কথা মনে পড়ল। ছবি তক্ষককে কী ভয়ই না পায়। তক্ষকের ভয় আজও কাটল না ছবির।

ছবি মা হবে। ফটিকের সন্তান কার কোলে মানুষ হবে? ছবির মায়ের কোলে, না ফটিকের মায়ের কোলে? দাবি তো কারোরই কম নয়? এই সব সমস্যার ভালো কোনও সমাধান জানে না ফটিক। মানুষের সংসারকে আজকাল বড় জটিল বলে মনে হয় ফটিকের। হঠাৎ তার মনে হল আম্মাকে সে নিয়ে যাবে তার বাসায়? হ্যাঁ, সেই ভালো। ছবির বাচ্চা হলে মায়ের হাতেই ছেড়ে দেবে তাকে। দাদীর কোলেই মানুষ হবে। তাহলে আর আম্মা নিজেকে পরিত্যক্ত বঞ্চিত মনে করবে না। মাঝে মাঝে নানা নানী তাদের বাচ্চাকে দেখতে আসবে। মাঝে মাঝে নানা নানী তাকে নিয়ে যাবে। কিছুদিন রাখবে নিজের কাছে। কিন্তু কোথায় সে বড় হবে? তার বাপের কর্মক্ষেত্রে ভাড়াটে বাসায়? নাকি দাদা-দাদীর ভাঙা বাড়িতে? নাকি নানা-নানীর কোঠাবাড়িতে? যে বাড়ি বানাচ্ছে তার নানা ঝিনেদায়? কার আদর্শে মানুষ হবে সে? তার আজা সাজ্জাদ চাষীর? তার নানা হাজী আব্বাস ব্যাপারীর? না তার বাপ ফটিক উকিলের?

চাঁদ বিবি খেয়ে দেয়ে, সক্‌ড়ি টক্‌ড়ি সাফ করে পড়ন্ত বেলায় ছাওয়ালের ঘরে ঢুকল। কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "বাপ কি ঘুমোতিছে?"

ফটিক তড়াক করে বিছানার উপর উঠে বসে বলল, "আম্মাজান এদিকি আয়।"

চাঁদ বিবি ছাওয়ালের কাছে এগিয়ে এল। মুখে একটু খুশির ভাব।

ফটিক বলল, "আম্মা, তোরে আমি নিয়ে চলে যাবো।"

চাঁদ বিবি অবাক হয়ে ছাওয়ালের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ যাবৎ চেয়ে রইল। তারপর বলল, "আমারে নিয়ে যাবি! কনে?"

ফটিক আগ্রহভরে বলল, "আমি যেখানে থাকি। আমার যশোরের বাসায়। তোকে আমি আর এখেনে ফেলে রেখে যাবো না। এই বয়সে আর তোকে ভারা ভানে খেতে হবে না।"

চাঁদ বিবি হাসল। তার ছাওয়াল সেই আগের মত পাগলই আছে। হঠাৎ হঠাৎ অ্যামন অ্যামন কথা কয় যার কোনও মানে হয় না। এ যেন সেই ছোট্ট ফটিক, যেন মাঠের থে গোরু চরায়ে সন্ধের বাড়ি ফিরে তারে কচ্ছে, আম্মাজান আমি এরেমের শাহের বেটি জৈগুন বিবির শাদী করব। "আম্মাজান আমি তোরে নিয়ে চলে যাবো।" এটাও ঐ রকম খামখেয়ালের কথা।

চাঁদ বিবি বলল, "তোর বাপ কি তার বাপদাদার ভিটে ছাড়ে নড়বে? আর তোর বাপ না গেলি, আমি কি যাতি পারি? তোর বাপেরে ফেলে, তোর বাপদাদার ভিটে ফেলে আমি কি কুথাউ যাতি পারি বাপ? তোর বাপ মাঝে মাঝে আমারে কয়, দ্যাখ, এই ভিটেয় বসতি তোর আর আমারই শেষ। আমরা দুজনে ফৌত হলি এই ভিটের শিয়ালকাঁটার বন গজাবে। আমি আগে মলি তুই আমার লাশডারে এই উঠোনে কবর দিবি আর পাশে তোর কবরের জায়গা রা'খে দিবি। তুই আগে মলি আমিউ তাই করব। এ ভিটে তালি হাতছাড়া হবে না। এ ভিটে ছা'ড়ে আমরা কনে যাবো বাপ!"

ফটিক হতাশ হল। একটু ভাবলো। তারপর বলল, "আম্মাজান, তোর বউ মা হবে।"

চাঁদ বিবি একটুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ফটিকের দিকে চেয়ে রইল। তারপর "ও আল্ লা হ্" বলে বুকফাটা ডাক ছাড়ল। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পরিত্রাহি ডাকতে লাগল, "ও ফটিকির বাপ! ও ফটিকির বাপ! ও ফটিকির বাপ!"

॥ ১৮ ॥

বাবু মিঞার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল দাউদের। শেষ পর্যন্ত জামিলা এবং তারও ছোট রুকসানার লজ্জাও ভাঙিয়ে দিল দাউদ। জয়নুদ্দিন সাহেবের তো কথাই নেই। ছবি বিটির ভাই যখন, হোক না চাচাতো, তখন সে তো ঘরের ছাওয়াল। আর দাউদের স্বভাবও বড় মিষ্টি। ওতেই বোঝা যায় যে ছবি বিটির ভাই। মৌলবী জয়নুদ্দিন দাউদের ব্যবহারে খুব খুশি।

বললেন, "দ্যাখ বাপ তুমারে তুমিই কচ্ছি, তুমি ছবি বিটির ভাই, কিছু মনে করো না।"

দাউদ বলল, "সে কি কথা? আপনি মুরুব্বি, আমি আপনার ছাওয়ালের বয়িসী, আপনি তুমি কবেন এ তো আপনার মেহেরবানি। এতে আমার মনে করার কী আছে?"

মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "আল্লার রহমত তুমার উপর য্যান সদা সর্বদা পড়ে। আল্লাহ য্যান তুমার রেজেক বাড়ায়ে দ্যান। আজকাল খুব কম ছাওয়ালই মুরুব্বিগের মানতি চায়। অ্যামন ডোনট কেয়ার ভাবে চলে যে কথা কতি ভয় লাগে। তা তুমারে দেখে তো আমার বড় ছাওয়াল মনুর মতই মনে হয়। মনুর বয়েস এই ফাল্গুনি তেইশ হবে।"

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "জে আপনার বয়েস অ্যাখন কত হলো?"

"আমার?" মৌলবী জয়নুদ্দিন হাসলেন, "তা বয়েস হইছে বই কি? এই উনপঞ্চাশ চলতিছে।"

দাউদ বলল, "দেখলি কিন্তু মনে হয় না। আমার বাজানের অ্যাখন অ্যাকান্ন। কিন্তু দেখলি মনে হবে য্যান আপনার চাইতে দশ বছরের বড়।"

মৌলবী জয়নুদ্দিন হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

বললেন, "কেউ কেউ থাকে বয়েস চোরা। হাঃ হাঃ হাঃ!"

দাউদও হাসল। এবং সে উৎকর্ণ হয়ে রইল যদি অন্দর থেকে সইফুনের কোনও কথা ভেসে আসে তা শোনবার জন্য। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল এ বাড়িতে বুঝি আর কোনও মানুষ নেই। তবে কি সইফুনের আমন্ত্রণ এটা নয়?

"আমার বড় ছাওয়াল মইনুদ্দি", মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "ঐ মনু, বিটা আমারে হরবখৎ লিখতিছে, বাজান, আপনি বাবুরি আমার এখেনে পাঠায়ে দ্যান। এই রেঙ্গুনি খাটলি খুটলি দু পয়সার মুখ দ্যাখা যায় তা ছাড়া মান ইজ্জৎ নিয়ে বাস করা যায়। তা আমাগের মনে ওঠে না। অ্যাকটা গেছে ঠিক আছে, ঐ দেশেই বিয়ে থা কত্তিছে তা করো। ছাওয়াল পাওয়াল হলি তো তারা আর বাঙ্গালী থাকবে না। বাবুর মা এই জন্যি বড় নারাজ।"

দাউদ সইফুনের কথাই ভাবছিল। সব কথা ওর কানে ভালো করে ঢোকেও নি।

তবু বলল, "জে। সে তো ঠিকই।"

জয়নুদ্দিন উৎসাহ পেয়ে বললেন, "আমারও সেই কথা। ছাওয়াল পর হয়ে যাবে, এই কথাডা মনে হলি বড় দুঃখু হয়। খোন্দকার যদি একটু নড়ে বসতেন, মনুর কামডা হয়ে য্যাতো। ডিস্ট্রিক্ট বোরডের চাকরিডা যে হিন্দু ছ্যামড়াডা পাইছে তার কোয়ালিফিকেশন নাকি মনুর চাইতি ভালো। ইডা কি অ্যাকটা কথা হলো। কোয়ালিফিকেশন, পাশের নমবর, এসব দেখে যদি লোক নিতি হয়, তালি ক'ডা মুসলমানের ছাওয়াল চাকরিতি ঢোকবে? হিন্দু তো এই লাইনি পাকা ঘুণ হয়ে বসে আছে সেই কবের থে।"

দাউদ বলল, "জে।"

দাউদের মন তার চোখের সঙ্গেই ঘুরতে লাগল। কোথাও যদি সইফুনের দেখা পায়। কখনও সে হতাশ হয়ে পড়ছিল। আবার কখনও কেন জানিনে তার মনে হচ্ছিল সইফুন আছে। কোনও না কোনও দেওয়ালের আড়ালে থেকে সতর্কভাবে তাকে লক্ষ্য করছে। কেন একথা মনে হচ্ছে সে জানে না তবে এই কথা ভাবতেই তার বুকের খুন ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠছে। আর অমনি তার প্রাণে আশা জাগছে। না, সইফুন তাকে নিরাশ করবে না। তার জীবনে যত মেয়ে এসেছে, কেউ তাকে নিরাশ করেনি।

জয়নুদ্দিন বললেন, "আরে একথা তুমি আমি বুঝলি হবে কী? আমাগের মুরুব্বি লীডাররা তা কি বোঝেন? সেইডে হলো আসল কথা। কথাডা তাগেরে বুঝতি হবে। আমরা যে হিন্দুগের চাইতি ল্যাখাপড়ায় পিছোয়ে আছি, ইডা তো দিনির আলোর মত সাফ। তারপর? এই কথা জানায়েই মুরুব্বি লীডারগের কাজ খতম হয়ে গ্যালো। জনসংখ্যায় এই বাংলায় মুসলমানেরা বেশী। ল্যাখাপড়ায় কম। মানলাম। কম্‌পিটিশনে হিন্দুগের সঙ্গে পারা যাবে না। মানলাম। হিন্দুরা নিজের থে মুসলমানগের তরক্কীর পথ তৈরি করে দেবে?"

মৌলবী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বুড়ো আঙুল দুটো দাউদের দিকে এগিয়ে দিয়ে নাচাতে নাচাতে বললেন, "এই কাঁচকলা।"

কে যেন পাশের ঘরে লঘু পায়ে হেঁটে গেল। দাউদের কান শব্দ ধরার জন্য অধীর হয়ে উঠল।

"কিছু করবে না।" জয়নুদ্দিন বললেন, "ক্যাবল নিজির কোলে ঝোল টানবে।"

ঠং। একটা আওয়াজ পেল দাউদ পাশের ঘরে।

"আমাগেরউ অ্যাখন তাই করতি হবে।" মৌলবী বললেন, "হিন্দুগের মতোন নিজির কোলে ঝোল টানতি হবে। কোয়ালিফিকেশন মোটামুটি অ্যাকটা থাকলিই হলো, দেখতি হবে সে মুসলমান কিনা, সেইডেই তার বড় কোয়ালিফিকেশন। ব্যস, তার পরে দ্যাও তারে ঢুকোয়ে। চাকরি বাকরির অন্তত আদ্দেক এইভাবে মুসলমান দিয়ে ভরে দিতি পারলি, তবে বাংলার মুসলমান বাঁচবে। বুঝিছ?"

"জে।" দাউদ সমর্থন করল।

"কিন্তু এই সুজা কথাডা", মৌলবী বললেন, "খোন্দকার মিঞার মতোন লীডার বোঝেন না ক্যান?"

"জে, আজকাল বোধ হয় একটু একটু বুঝতিছেন।"

"ক্যান্ কও দিনি?"

"জে?"

মৌলবী বললেন, "এই যে তুমি কলে খোন্দকার আজকাল এট্টু এট্টু ষ্যান বুঝতিছেন, ক্যান্ তা কতি পারো?"

"জে। না।"

"ইলেকশন। ইলেকশন আসতিছে তো। অ্যাখন দ্যাখবা, খোন্দকার সাহেবের হাত খুব দরাজ হবে।"

"বাজান", বাবু এসে বলল, "দাউদ ভাইরি নিয়ে খাতি আসেন।"

"তাই তো তাই তো", মৌলবী সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "দ্যাখোদিন, কত ব্যালা হয়ে গ্যালো। চলো বাপ চলো।"

পাশের ঘরেই দস্তরখান বিছিয়ে চৌকির উপর খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনটে মাত্র পদ। গোস্, আন্ডা আর মুশুরির ডাল। বড় বড় বাটিতে সব সাজানো। পরিবেশনের জন্য হাজির শুধু বাবু আর জামিলা। দাউদের উৎসাহ বেশ খানিকটা নিবে এল। সে ঘরটার দিকে চাইল। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প একটু উঠোন দেখা যাচ্ছে।

বাবু বলল, "বাইরি পানি আছে দাউদ ভাই। হাত মুখ যদি ধোন্—"

দাউদ বাইরে গিয়ে ভিতরের উঠোনটা দেখতে পেল। কিন্তু একেবারে জনশূন্য। শুধু একটা পাতিহাঁস একটা হাঁসীকে উঠোনময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর হাঁস দুটো পরিত্রাহি প্যাঁক প্যাঁক ডাক ছাড়ছে।

বাবু পানি ঢেলে দিতে গেল। দাউদ বদনাটা কেড়ে নিল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে ফেলল।

"তাড়াহুড়োয় ত্যামন কিছু আর করা গ্যাল না।" মৌলবী কৈফিয়ত দিলেন।

দাউদ বলল, "আর বাকি থাকল কী?"

বাবু বলে ফেলল, "ক্যান্ মাছ।"

দাউদ হেসে ফেলল, "ধরিছে বটে বাবু মিঞা। আমি নিকিরির ছাওয়াল, নিজি মাছের কারবারও করিছি। তবু দ্যাখ কথাডা আমার মাথায় ঢোকেনি। তাহলি বুঝে দ্যাখ, তুমার মাথায় আক্কেল কত ছাফ!"

মৌলবী বললেন, "ইশকুলিউ তো সবাই কয়, ওর বুদ্ধি খুব ছাফ্। কিন্তু করবে কী বড় হ'য়ে? আমি তাই ভাবি।"

দাউদ বাবুর লজ্জায় লাল হওয়া মুখের দিকে চেয়ে অবাক হল। একেবারে সইফুন!

বলল, "মৌলবী সাহেব, বাবু মিঞা অ্যাখনও বেশ ছোট। না হলি আমিই ওর হিল্লে ক'রে দিতি পারতাম। আপনি বাবুর জন্যি ভাববেন না। ইশকুলির পাশটা ওরে কত্তি দ্যান, আমি ওর অ্যাকটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। আমি যদি ক'রে খাতি পারি, ইনশাল্লা, বাবু মিঞাও তা'লি করে খাতি পারবে।"

মৌলবী জয়নুদ্দিন ফ্যালফ্যাল করে দাউদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কতক্ষণ। ওঁর চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। অতি কষ্টে তা চেপে রেখে নিজেকে সামলে নিলেন।

বললেন, "এই অ্যাকজন মুসলমান দ্যাখলাম এতদিন যে খাঁটি মুসলমানের মতোন কথা ক'লো। তুমার উপর বাপ আল্লার হাজার নেয়ামত পড়ুক। তুমি আজ আমারে যা শান্তি দিলে তা আমার বড় বিটা মইনুদ্দিও দিতি পারেনি। তুমি বাঁচে থাকো, তুমি ঈমানের পথে থাকো। আল্লাহ্ তুমারে আল্লাহ্ তুমারে—ও কি ও কি বাপ অ্যাখনই হাত গুটোয়ে নেচ্ছ কী। কিছুই তো খালে না। এই তো খাওয়ার বয়েস। আজ সকালে হুট্ করে আ'লে নাস্তাভাউ ভালো ক'রে খাওয়াতি পারলাম না। তুমি হুট্ করে চলে গেলে। যতই ব্যালা বাড়তি থা'কলো ততই দেলটা ধুক্ ধুক্ কত্তি লাগল। মনে মনে ভাবি ছাবি বিটির ভাই হুট্ ক'রে আ'লো হুট্ করে চলেও

গ্যালো, ভালো করে খাতিরযত্ন করা হ'লো না। নাঃ, ইডা তো ঠিক নয়। বাবুর মারে কথাডা কলাম। তা তিনি আমারে কলেন, আমার নাকি ভীমরতি ধরিছে। দুপুরে তুমারে খাতি না কওয়াটা, কাজডা ঠিক হয়নি। আমি ছুটলাম তুমারে খুজে বার করাত। ভাগ্যিস ইশকুল ছুটি ছিল।"

দাউদ ভাবছিল সইফুনকে কি একবারও দেখা যাবে না! এ'রা কি খুব পর্দা মানেন? তাই যদি হবে তাহলে অত সকালে সইফুনকে ফটিক ভাই-এর বাড়িতে অমন বেপর্দা দেখা গ্যালো ক্যান?

মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "জামিল, বিটি! তোর দাউদ ভাইরি আন্ডা দে।"

দাউদ "না না" বলে আপত্তি জানাল।

জয়নুদ্দিন বললেন, "ক্যান্, খাতি কি খারাপ হইছে?"

দাউদ বলল, "জে না। খাতি খুব ভালো হইছে। বাড়ি ছাড়ে আ'সে ওব্দি অ্যামন খানা খাইনি।"

"তা'লি আর না না ক্যান্।" মৌলবী বললেন, "ইডা তুমার বাড়িই। যখন খুশি আসবা। যা থাকবে খায়ে যাবা। এই তো খাওয়ার বয়েস। এই বয়েসে লুহা খালিউ মানুষ হজম ক'রে ফ্যালে। আর এতো গুটা কতক আন্ডা। দে জামিল। চুপচাপ দাঁড়ায়ে আছিস্ ক্যান্ বিটি। তোর দাউদ ভাইরি দে, আন্ডা তুলে দে।"

প্রচুর ভোজনের পর দাউদ মিঞা ইচ্ছে থাকলেও মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেবের বাড়ি থেকে তক্ষুনি উঠে যেতে পারল না। একটু বিশ্রাম নিতেই হল। বাবু একটা তশ্তরীতে করে সাজা পান এনে দিল। ছোট ছোট খিলি। দাউদ একটা খিলি হাতে নিয়ে দেখতে লাগল।

মৌলবী সাহেব, "আমি এট্টু পরে আসতিছি তুমি ততক্ষণে পানটান খাও" বলে উঠে গেলেন।

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "অ্যাত সুন্দর পান সাজল কিডা?"

বাবু বলল, "বুবু সাজিছে।"

দাউদ খুবই উৎসাহিত হয়ে গোটা তিনেক খিলি একসঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। সত্যিই সইফুন পান সাজে ভালো।

দাউদ বলল, "বাবু মিঞা, তুমার বুবুরি কইও, দাউদ ভাইর এই পান খুব ভালো লাগিছে।"

সত্যিই পানগুলো দাউদের ভালো লাগছিল। এই পানটুকুই যে আজ সইফুন আর দাউদের মধ্যে যোগসূত্র, শুধু এই কারণেই নয়, পানগুলোও ভালো। সইফুনের সঙ্গে একবারও দেখা না হবার জন্য দাউদের মনে যে ক্ষোভ এবং যে অভিমান এ বাড়িতে আসা অবধি জমে উঠেছিল, এই পানের রস যেন সেগুলোকে সিক্ত করে দিল। দাউদ ভাবল সইফুন তাকে খারিজ করে দেয়নি।

বাবু দাউদের মুখে ওর বড় বুবুর প্রশংসা শুনে খুব খুশি হ'ল। বলল, "দাউদ ভাই, পান আর আনব? খাবেন?"

দাউদ বলল, "থাক, থাক। তুমার বুবুর পান যদি ফুরোয়ে গিয়ে থাকে।"

বাবু বলল, "আপনি খাবেন শুনলি ও খুশি হয়ে বানায়ে দেবে!"

বাবুর কথা শুনে দাউদ খুশি হয়ে বলল, "তা'লি আনতি পারো।"

বাবু ভিতরে চলে গেল। দাউদ একা ঘরে বসে সইফুনের কথা ভাবতে লাগল। সে পান খেতে চাইলে সইফুন খুশি হয়ে বানায়ে দেবে! এটা কি খারুর কথা? না সইফুনের কথা? বাবুর কথা বলে দাউদের মনে হল না। এ নিশ্চয় সইফুনের কথা। সে এতক্ষণ বৃথাই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। দাউদ ভেবে দেখল সইফুন যা করেছে তাদের সমাজের মেয়ের পক্ষে এইটেই তো স্বাভাবিক। সকালে সে ফটিকের বাড়ির দরজার কড়া নেড়েছিল। সইফুন দরজা খুলে একটা বেগানা পুরুষকে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাভাবিক কাজ। তারপর তার বাজানকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কই তাকে তো উপেক্ষা করেনি? একটা ভালো মেয়ের পক্ষে যা করা দরকার তাই করেছে। সে কেন আশা করেছিল, সইফুন উল্টোটা করবে? এর কোনও ভালো উত্তর দাউদ দিতে পারল না এখন। সে কেন আশা করেছিল সইফুনের মত ভালো ঘরের একটা বয়স্থা মেয়ে জানালা খুলে তার মুখখানা দেখিয়ে দাউদকে ধন্য করবে? সেই বা ফাঁক ফোকর দিয়ে এত চাইছিল কেন? আসলে সইফুন দাউদের একটা অহংকারে ঘা দিয়েছে। মেয়েমানুষ মাত্রেই তার আকর্ষণে পতঙ্গের মত ছুটে আসে, এমন একটা অহংকার তার বিভিন্ন মোকামের অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এমন কি খোন্দকারের বড় মেয়ে জিনাত বেগম, সত্যিই যে আজ তার এই উন্নতির মূল, সেও তার এই আকর্ষণী শক্তিতে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রথমবার সে কোনও রকম প্রশ্রয় আকার ইঙ্গিতেও তাকে দেয় নি। মতি মিঞার এক বিবিও তার প্রতি ঝুঁকেছিল। দাউদ আল্লার রহমতে আর কোনও ফাঁদে পা দেয়নি। আর দেয়নি বলেই হয়ত আল্লার দয়ায় সে সইফুনের মত মেয়ের সন্ধান পেয়েছে। ফুটকির সঙ্গে সইফুনের এক জায়গায় মিল লক্ষ্য করেছে দাউদ। তার চেহারা এ দুজনের একজনকেও ভজাতে পারেনি। সে-সব দৃষ্টি চেনে দাউদ। মোকামে মোকামে যারা ওর কাছে ধরা দিয়েছে তাদের চোখে প্রথমবারই সেই দৃষ্টি ঝিলিক মেরে গিয়েছে। কালোজিরের চোখে সে ঝিলিক দেখেছে। দেখেছে খোন্দকার সাহেবের বড় মেয়ে জিনাতের চোখে, দেখেছে মতি মিঞার সেজ বিবি সাকিনার চোখে। আগের দিন হলে চরম বোকামী করে ফেলত দাউদ।

আল্লাহ্ এখনও তাকে সামলে রেখেছে। তবুও শয়তান লোভ দেখাতে কসুর করে না। খোন্দকারের বড় মেয়েকে ভাগ্যিস সে আমল দেয়নি। তার সঙ্গে দাউদের সম্পর্ক এখন খুবই ভাল। কিন্তু মাত মিঞার সেজ বিবি সাকিনাকে ফিরিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়নি। তাকে খুব ভয় করে দাউদ। তার ছায়া আর মাড়ায় না। আল্লাহ্ তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলছেন সে বুঝতে পারছে, কিন্তু শরীরের ডাককে বাগ মানানো যে কত কষ্ট তা আল্লাই জানেন। যাক, আল্লাহ্ সহায় ছিলেন বলেই সে সেই পরীক্ষায় কোনও রকমে পাশ করে যায় এবং তার এই প্রথম বিশ্বাস জন্মায় যে সে শয়তানকে তার ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে।

আর দ্যাখ, তারই হাতে হাতে ফল সইফুন। সে নিজেকেই শোনালো।

বাবু পান নিয়ে এল। বলল, "এই ন্যান্ আপনার পান দাউদ ভাই।"

দাউদ বলল, "তোমার বুবুরি মিছিমিছি কষ্ট দিলাম তো!"

বাবু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "ও কিছু মনে করেনি।"

তারপর উস্খুস্ করে বাবু মোলায়েম ভাবে বলল, "দাউদ ভাই আপনারে অ্যাকটা কথা কব?"

তোমার বুবু বুঝি কাতি ক'য়েছে? দাউদ মনে মনে বাবুকে জেরা করল। সে বেশ উৎফুল্ল।

"কওনা?" দাউদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

"বাজানরে যেন ক'য়ে দেবেন না?"

কী সইফুন দেখা করতে চেয়েছে?

"তুমার আমার মধ্যে কথা," দাউদ আল্লার রহমতের কথাই চিন্তা করছিল। এত শীঘ্র তার খায়েশ মিটতে পারে তা সে আশাই করেনি, "আর কাউরি তা কাতি যাবই বা ক্যান্?"

বাবু তবু ইতস্তত করতে লাগল। এবং তার মুখখানা ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

কী এমন কথা সইফুন বলে পাঠিয়েছে, দাউদ ভাবল, যা বলতে বাবু ইতস্তত করছে? দাউদের আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল।

"আরে কওনা বাবু মিঞা, আমি তো ঘরের লোক, আমার কাছে লজ্জা কী?"

"না, এই কাতিছিলাম কি, আপনার সাইকেলডায় এট্টু চড়ব?"

এই কথা! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস দাউদের বুক চিরে বেরিয়ে গেল! আসলে দাউদ সইফুনের কাছ থেকে বড় বেশি আশা করছে। কেন, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না।

দাউদ চুপ করে আছে দেখে বাবুর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল।

তাই দেখে দাউদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আজ না। আজ একটু তাড়া আছে বাবু মিঞা। এর পর যেদিন আসব, হাতে এট্টু সুমায় নিয়ে আসব। সেইদিন তুমি সাইকেলডা নিয়ে এক পাক ঘুরে আ'সো। ক্যামন?"

বাবু খুশি হল। বলল, "জে।"

"দ্যাখদিন তুমার বাজান কনে গ্যালেন?" দাউদ বলল। "ইবার যে উঠতি হয়।"

বাবু গিয়ে মৌলবী সাহেবকে ডেকে নিয়ে এল।

দাউদ বলল, "ইবারে যাতি হবে। কাজ পড়ে আছে অনেক। আপনাগের দোয়ায় শৈলকুপো, ঝিনেদা আর মাগরোর দিকি খানিকটা রাস্তা মেরামতির কাজ পাওয়া গেছে। ডিস্ট্রিক্ট্ বোরডের রাস্তা। মেরামতির কাজ। খোন্দকার সাহেব আজ ডা'কে আমারে কলেন। অ্যাখন বোর্ড্ অফিসি যাবো। অরডার বের করায়ে নিতি হবে। যদি আজ অরডার বের করায়ে নিতি পারি তবে কাল এস-ও বাবুরি নিয়ে ছাইট্ দেখতি যাবো। ফিরতি কদিন দেরি হবে। আমি ভাবতিছি, এই সময় মনু মিঞা থাকলি আমার কত উপ্গারই না হ'তো। আমি মুসলমান ছাড়া পারতপক্ষে কাউরি কাজে লাগাতি চাইনে।"

মৌলবী সাহেব বললেন, "এই তো হ'লো মুসলমানের মত কাজ। আল্লাহ্ তুমার রেজেক বাড়ায়ে দেন।"

দাউদ বলল, "বাবু মিঞা আরউ কয়েক বছরের বড় হলি আমার ঠিকেদারী কাজে লাগায়ে দিতি পারতাম। কিন্তু এখন বয়েস অল্প। বরং ও যাতে ওভারশীয়ারি পাশ হয়ে বেরোতি পারে, আমরা তার চিন্তা অ্যাখন দেখি। আর বড় জোর চা'র বছর।"

মৌলবী সাহেবের চোখ আবেগে ছলছল ক'রে উঠল।

বললেন, "যে কথা কাউরি কইনি আজ তুমারে তাই কই। অ্যাকার রোজগারে আর সংসার চলতিছে না। মেয়ের শাদীউ দিতি পারিনি। বড় ছাওয়াল দেবে ভাবিষ্যতে যদি কিছু পাঠালো তো পাঠালো। তার উপর আর ভরসা করিনে। দিনার দায়ে অ্যাকখান বাড়ি বাঁধা পড়িছে। ক্যান যে আরবী ফারসী পড়াতি গিছিলাম! শোনো বাপ্, বাবুর বয়েস নিতান্ত কম না। তা চোদ্দ তো হ'লোই। ওরে যদি কোনও কাজে অ্যাখন নিয়ে নিতি পারো তো নিয়ে ন্যাও। পরে না হয় পিরাইভেটে ওরে ম্যাট্রিক পাশ করায়ে নেবো। এ ম্যান্ মনে ক'রে না বাপ্ যে এইসব কথা কবো বলেই তুমারে খাতি কইছি। তুমি ছবি বিটির ভাই সকালে আ'লে, কিছু তুমারে খাওয়াতি পারা গেল না, দেলডা ফুক্ফুক্ কত্তিছলো তাই তুমারে দাওয়াত করিছিলাম। কথাডা তুমিই—"

দাউদ বিব্রত হয়ে বলল, "জে, এরকম কথা কলি আর এ-বাড়িতি আ'সি কী করে? আমি

আপনার এখেনে আসে নিজের অ্যাকটা বাড়ি পালাম, ইডা তো আমারই লাভ।"

"বাস তবে আর কথা কী?" মৌলবী সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এই হ'লো মুসলমানের মত কথা। তালি শোনো, রসুলে-করিম হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আস্সালাম্ তো মক্কা ছাড়ে আসে মদিনায় চলে আলেন। সেখেনেই থাকতি লাগলেন। প্রিয় নবীর সংগে তাঁর অনুগত শিষ্যরাও মক্কা ছাড়ে মোহাজের হ'য়ে মদিনায় আলেন। মদিনার আনছারবা তাঁদের আশ্রয় দেলেন এবং যথাসাধ্য সেবা সাহায্য দিতে লাগলেন। মক্কাবাসী মোহাজের আর মদিনাবাসী আনছাররা ভালোবাসার যে আদর্শ স্থাপন করিছেলেন তার তুলনা আর দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও রসুলাল্লাহ্ দ্যাখলেন যে আপন করে নিয়ার অ্যাত চিস্টার মধ্যিও কুথায় য্যানো অ্যাকটা সরু সুতোর মত ফাঁক থাকে যাচ্ছে। আনছারগের সেবাযত্নের মধ্যি থাকে অ্যাকটা সজনতা, পাছে ত্রুটি ঘটে এই ভাবে সদাসর্বদা আনছাররা কাঁটা হয়ে থাকেন। আবার মোহাজেরগের চালাও সেবা নিয়ার মধ্যি থাকে সংকোচের ভাব। যিটা কিছুতিই কাটতি চায় না। তাই আল্লাহ্‌র প্রিয় রসুল অ্যাকদিন গৃহস্বামী আর অতিথিগের ভেদ দূর করার জন্যি সবাইরি ডাকে কলেন, শোনো মদিনাবাসী আনছারগণ, শোনো মক্কাবাসী মোহাজেরগণ! ইসলামের আদর্শ হচ্ছে এই যে প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে তুমরা প্রেত্যেকে জুড়ায় জুড়ায় ভাই বনে যাও। প্রেত্যেকেই অন্যগের মধ্যির থে অ্যাকজনরে ভাই হিসেবে বাছে ন্যাও। এইভাবে আনছার আর মোহাজেরগের ভেদ ঘুচে গ্যালো। ধর্মভাইরা অ্যাকে অন্যরে বিষয় সম্পত্তি রোজগারের হিস্যা দিতি লাগল। সা'দ ইব্‌নে রাবী তো তাঁর দুই বিবির অ্যাক বিবিরি তালাক দিয়ে তার ধর্মভাই সা'দে আব্দুর রহমানের সংগে শাদী দিয়ে ভাই-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার শক্ত প্রমাণ রাখে গেছেন। এরে কয় মুসলমান। এই হ'ল গে বাপ্ মুসলমানের সাচ্চা আদর্শ! আর আজ দ্যাখো? মুখে মুসলমান মুসলমান কলিই কি মুসলমান হওয়া যায়? মুসলমান হতি গেলি ইয়া দরাজ দেল লাগে। তুমার দেল দরাজ আছে বাপ। তুমি একজন সাচ্চা মুসলমান! আল্লাহ্ তুমার হেফাজত করুন।"

দাউদ আর কিছু বলল না। সালাম জানিয়ে সাইকেলে উঠল। তারপর বাড়িটার দিকে একবার চকিতে চাইতেই দেখল জানলার ফাঁকে দুটো চোখ আর একখানা মুখের অস্পষ্ট আদল। দাউদের বুকের রক্ত তড়াক তড়াক করে লাফাতে লাগল।

ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ অফিসে পৌঁছুতেই এস্-ও হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

"আরে মিঞা অ্যাতক্ষণ ছিলে কনে?" কুন্ডুবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন।

দাউদ জিজ্ঞেস করল "ক্যান্ কী ব্যাপার?"

কুন্ডুবাবু বললেন, "কী ব্যাপার মানে? এই কুন্ডু না থাকলি আজ তুমার কাজের দফা গয়া হয়ে গিইছিল। ভাইস্ চেয়ারম্যান সাহেবের মত মুরুব্বি পায়েও কাজ ধরতি পারতে না, যদি এই কুন্ডু না থাকতো। সাহার পো য্যান্ হাওয়ায় খবর পায়। আসেই অ্যাকেবারে খোদ বড়বাবুরি ধরে পড়িছে। মুটা খাওয়াবার লোভ দ্যাখাইছে। তুমার ডাকির দিন যে বড়বাবু সাহেবের ঘরে ঢুকার আগে আমারে ডাক দিছলেন। আসলে সাহার কাছ থে কত খাওয়া যাতি পারে তার অ্যাকটা আন্দাজ জানতি চাতিছিলো। আমি বড় বাবুরি বুঝোয়ে কলাম, এর মধ্যি নাক গলাবেন না। বড় গাছে দড়া বাঁধাবাঁধির ব্যাপার এর মধ্যি আছে। খোন্দকার সাহেব কাজটা তাড়াতাড়ি করায়ে নিতি চান। তাই নতুন ভালো আর ছোট কারুরি দিয়ে কাজটা তুলাতি চান। সাহা কোম্পানী বড় ঠিকাদার। বোরডের কাজ নিয়ার সুময় চাড় দ্যাখায়, কিন্তু কাজ তুলার ব্যাপারে আর ত্যামন চাড থাকে না। আমরাও অত বড় অ্যাকজন ঠিকেদারের সংগে আঁটে উঠতি পারিনে। এই সব কথা ভাবেই চেয়ারম্যান আর ভাইস্ চেয়ারম্যান ঠিক করিছেন, যে-ঠিকেদার অ্যাকেবারে বোরডের বশে থাকবে, তারেই এই কাজ দিযা হবে। আমার মনে হয় উনারা বোধহয় লোক ঠিকউ করে ফেলিছেন। বড়বাবু এতি দমে গেলেন। কলেন, অ্যাঁ লোকউ ঠিক করে ফেলিছেন? আপনি জানেন? ঠিক জানেন? আমি কলাম, সাহার লোকটারে কা'ল আসতি কন না? আমিউ ছা-পুষা মানুষ, আপনিউ ছা-পুষা মানুষ। এই বয়েসে একটা ফ্যাসাদে জড়ায়ে পড়লি শেষে হাতে হেরিকেন নিয়ি না ঘুরি বেড়াতি হয়। দিনকাল সুবিধের না, বোঝলেন। এই কয়ে তো সাহার লোকরি পত্রপাঠ আজকের মত বিদায় করা হইছে। অ্যাখন আপনি যান, খোন্দকার সাহেবের কাছে যায়ে আজই এর অ্যাকটা এমন বিহিত ক'রে আসেন যে আপনার নামে কাজের অরডারটা বেরোয় যায়। দেরি নয়, শুভস্য শীঘ্রং।"

কুন্ডুবাবুর কথা শুনে দাউদ প্রাণপণে সাইকেলে ছুটল খোন্দকারের সন্ধানে।

কাজটা খোন্দকারের কথা শুনে যত সহজে পাবে ভেবেছিল দাউদ, শেষ পর্যন্ত তত সহজে পেল না। শেষ বেলায় বিস্তর ঝামেলা হয়ে গেল। বিস্তর ছুটাছুটি ক'রে প্রায় হাত ফস্কে যাওয়া কাজটার অরডার বের ক'রে আনতে সমর্থ হ'ল দাউদ। কিন্তু তখন তার গলদ্ঘর্ম অবস্থা। সে বাড়ি ফিরেই গোসলের পানি দিতে বলল। সংগে সংগে তাহের মিঞা আর তার বড় ভাই গাজী গোলাম এসে হাজির।

সালাম বিনিময় করার পরই গাজী গোলাম সরাসরি দাউদকে আক্রমণ করল, "মতি মিঞার সাথে বেইমানি করা কি আপনার উচিত কাজ হ'লো ?"

দাউদের কান মুখ গরম হয়ে উঠল। কিন্তু সামলে নিল। গাজী গোলাম যশোরের নাম-করা ঠ্যাংগাড়ে। মুসলিম লীগের অ্যাকজন পান্ডা। গাজী গোলামকে হাতে রাখবে বলেই সে তার ভাই তাহের মিঞাকে কাজে নিয়েছে। তাহের গাজী গোলামের একেবারে বিপরীত চরিত্র। ভদ্র, লেখাপড়া জানে এবং ঠিকাদারীর কাজে বেশ পোক্ত।

দাউদ বলল, "ভাইর কথার মানেডা বুঝতি পারলাম না। যাক আপনারা আমার নিজির লোক। মানেডা বুঝে নিতি সুমায় লাগবে না। মেহেরবানি করে অ্যাখন একটু সুস্থির হয়ে বসেন। আমি আসতিছি।"

দাউদ হাঁক দিল, "কাতলা !"

কাতলা হাজির হল। "জে !"

"চটপট একটু নাস্তা বানা। আর চা পানি বসা।"

দাউদ ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তারপর এক পাঁজা খাতা এনে তাহের মিঞাকে দিল। বলল "তাহের ভাই, দ্যাখেন তো আমাগের হিসেব পত্তরের খাতা এই তো সব ? না আরউ আছে ?"

তাহের মিঞা খাতা পত্তর দেখে বললেন, "না এই সব।"

"তালি ভাই আপনি গুলাম ভাইরি দ্যাখায়ে দ্যান তো, এ পর্যন্ত আমরা যে-সব কাম তুলিছি তার জন্যি মতি মিঞা কত টাকা আমাগের কাজের থে তুলে নেছেন আর তিনি করিছেন কী ? গুলাম ভাই, আপনি তাহের মিঞার বড় ভাই, আপনারে আমিউ বড় ভাই ব'লে মানি। আপনি ততক্ষণ হিসেবডা বুঝতি থাকেন, আমি গোছলডা সা'রে আসি। আ'সে আপনার কথাডার জবাব দিতিছি।"

দাউদ ভিতরে গিয়ে বেশ ক'রে গোসল করল। শরীরডা বেশ ঠান্ডা হতেই ভাবল আল্লাহ আমারে বেশ বাজায়ে নেচ্ছেন। এক সকালেই সইফুনির সংগে দ্যাখা করায়ে দেলেন,, নতুন কাজ দিয়ে রেজেক বাড়ায়ে দেলেন আবার মতি মিঞার মত অ্যাকটা বড় দুষমনও জুটোয়ে দেলেন। মতি মিঞা দুষমন হলিউ সে আমার ক্ষতি ত্যামন করতি পারবে না। ক্যান্না তার মুরব্বি অ্যাখন আমার সহায়। গাজী গুলাম নারাজ হলিই চিন্তার কথা। গাজী গুলামরি হাতে রাখার চিন্টা তারে কত্তিই হবে

দাউদ চুল আঁচড়িয়ে ধোপদুরুস্ত লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে বাইরে এল। দেখল তাহের মিঞা খাতা সব গুছিয়ে রেখে দিয়েছে।

দাউদ বলল, "গুলাম ভাই, কী বোঝলেন ?"

গাজী গুলাম বলল, "বিটা দোহি অ্যাকেবারে শুষে খাইছে।"

তাহের বলল, "লীগির চাঁদার জন্যি কোম্পানীর কাছ থে তিন খেপে আড়াই শ' টাকা নেছে।"

গাজী গুলাম বলল, "অ্যাকটা আধলাউ ঠ্যাহায়নি। আর আমারে সম্পূর্ণ উলটো কথা ক'লো। ক'লো যে আপনি খান বাহাদুরির কানে ওর বিরুদ্ধি যা তা কয়ে কোম্পানীর থে ওরে হটায়ে দেছেন।"

তাহের বলল, "ভাই উনি য্যামন করে শুষতি শুরু করিছেলেন, কোম্পানীর লাটে উঠতি আর দেরি হ'ত না।"

"তাছাড়া আমি উনারে সরাইছি," দাউদ বলল, "এ কথাডাউ ঠিক না। খান বাহাদুর আজ আমারে ডাকায়ে নিয়ে যায়ে কলেন, বোরডের কিছু কাজ বেরোইছে, খুব তাড়াতাড়ি সে কাজ উঠোয়ে দিতি হবে। আমরা যদি ঠিক সুমায় সে কাজ তুলি দিতি পারি তবে সে কাজডা আমাগের উনি দিয়ায়ে দেবেন। কথায় কথায় সুবিধে অসুবিধের কথা উঠল। তখন আমি কলাম, আমাগের হাতে পি ডবলিউ ডিরউ অ্যাকটা কাজ আছে। তখন আমি কলাম, আপনি হয় বোরডের এই কাজডা সম্পূর্ণ আমার নিজির মতোন ক'রে করতি দ্যান, মতি মিঞা পি ডবলিউ ডির কাজটা ওর নিজির মতোন ক'রে করুন, আর না হয় উনি বোরডের কাজডা করেন আর আমি পি ডবলিউ ডির কাজডা করি। যার যার লাভ লুকসান তার তার। তা গুলাম ভাই, ইডা বেঈমানের মতোন কাজ হলো ?"

"না না। ইডা তো সাফ কথা।" গাজী গোলাম বেশ জোর দিয়ে বলল।

দাউদ বলল, "তখন খান বাহাদুর নিজিই কলেন, বুঝতি পারলাম। মতিরি দিয়ে ঠিকেদারী হবে না। ওর জন্যি অন্য কোনও ব্যবস্থা করব। ঠিকেদারী তুমি অ্যাকাই করো। ওরে আমি সরায়ে নিচ্ছি।"

"আসল এইতি মতি মিঞার দেলে খুব চোট লাগিছে।" গাজী গোলাম বলল।

"তা লাগুক ভাই," তাহের বলল, "টাকার দরকার পড়লি মিঞার আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। অ্যাকবার লেবার পেমেনটের টাকার থে খাবল মা'রে টাকা নিয়ে চ'লে গ্যালেন। কন্ তো ভাই অ্যামন করলি ঠিকেদারীর ব্যবসা করা যায় ?"

কাতলা নাস্তা আর চা-পানি দিয়ে গেল। ওরা খেতে লাগল।

গাজী গোলাম বলল, "খোন্দকার ছাব ইলেক্‌শনে দাঁড়াতিছেন, জানেন তো ?"

দাউদ বলল, "শুনিছি।"

গাজী গোলাম বলল, "আপনাগের ওদিকির থেই তো দাঁড়াবেন। এদিকির থে ছৈয়দ সাহেব দাঁড়াবেন। উনার সঙ্গে আঁটে উঠা শক্ত। তা আমরা মদত দিয়ে উনারে উতরোয়ে দিতি পারব। কী কন্ ?"

দাউদ সরলভাবে বলল, "উনি আমার মুরুব্বি, উনি জেতেন তাই আমি চাই। তবে ইলেক্‌শনে হারা জিতা যে কী করে হয় আমার সে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই।"

গাজী গোলাম হাসল। বলল, "ইবার জ্ঞান তালি হবে। খান বাহাদুর আপনার উপর তো খুবই আশা রাখেন।"

দাউদ বলল, "উনি আমারে কইছেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রাস্তার কাজ শেষ করে দিতি হবে।"

"দিতি পারবেন না ?"

দাউদ বলল, "কুন্ডুবাবুর মুখে যা শুনিছি কাজ যদি সেই রকমই হয় তবে মনে হয় উঠোয়ে দিতি পারব।"

"উঠোয়ে দিতিই হবে।" গাজী গোলাম বলল. "ক্যান্‌না ঐটেই হবে খোন্দকার ছাবের তুরুপির তাস। উনি কয়েছেন অ্যাত বচ্ছর কেউ হাতই দ্যায়নি এই সব রাস্তায়। খোন্দকার ছাব চিয়ারম্যান হয়েই এই অবহেলিত না কি য্যান্ কয়, খোন্দকার ছাব বক্তৃতায় পিরায়ই কথাডা কন, খোন্দকার ছাব চিয়ারম্যান হয়েই এই পেরথম সেই সব রাস্তা মেরামতের হুকুম দিয়ে দেছেন।"

দাউদ এতক্ষণে বুঝল এইসব রাস্তা মেরামতের জন্য ক্যান্ খোন্দকার অ্যাত তাড়া দিতিছেলেন। কিন্তু গাজী গুলাম খোন্দকার ছাহেবরি চিয়ারম্যান চিয়ারম্যান কচ্ছে ক্যান্। চিয়ারম্যান তো বদ্যিনাথ সরকার। আজই তো খোন্দকারের চিঠির উপর বোরডের চিয়ারম্যান বদ্যিনাথ সরকারের সুপারিশ লিখিয়ে নিয়ে বোরড আফিস যায়ে কাজের অরডার বের করে আনিছে।

দাউদ বলল. "চেয়ারম্যান তো বদ্যিনাথ সরকার।"

গাজী গোলাম হা হা করে হাসল।

বলল, "সে তো কাল পর্যন্ত আছে। পরশু বোরডের মিটিং। বোদে উল্টোয়ে যাবে। বোরডে ইবার হিন্দুগের শাসন শেষ। অ্যাখন খোন্দকাররেই চিয়ারম্যান করা হবে। সব ব্যবস্থাই হয়ে আছে।"

দাউদ বিস্মিত হল। কিন্তু এতে সে বিচলিত হল না। যা হয় হোক. বোদেই চিয়ারম্যান থাক আর খোনকারই চিয়ারম্যান থাক, তার কী. তার ঠিকেদারী বজায় থাকলেই হল। না না, এ কী বলছে সে ? বোদে সরকার চিয়ারম্যান থাকলি তার কী সুবিধে ? কিছু না। খোন্দকার মুসলমান. তিনি মুরুব্বি. তিনি চিয়ারম্যান হলি মুসলমানের নিশ্চয়ই সুবিধে।

আজ শুধু ভালো খবরের দিন। রাত্রে শুয়ে ঘুম আসছিল না। দাউদের মাথায় নানা ভাবনা এসে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ছ' মাস আগের দাউদ আর আজকের দাউদ ? দাউদের নিজেরই চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। খোন্দকারের মতোন অত বড় অ্যাকজন সমাজের মাথা তার উপর বিশ্বাস করে তাঁর নিজের ভাগ্য সঁপে দিয়েছেন। মৌলবী জয়নুদ্দিন, কী সরল আর কী উদার, তাকে সাচ্চা মুসলমান বলে অভিহিত করেছেন। তাকে পুত্রস্নেহে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন। সইফুন কি তাকে ফিরিয়ে দেবে ?

মৌলবী জয়নুদ্দিনের যা বর্তমান অবস্থা তাতে দাউদ যদি সইফুনের সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব করতে চায়. সে জানে জয়নুদ্দিন হাতে আকাশের চাঁদ পাবেন ! কিন্তু সইফুন ? সে যদি এই প্রস্তাব খারিজ করে ? কিংবা বাপ মায়ের পীড়াপীড়িতে যদি অনিচ্ছায় সম্মতি দেয় ? সে তো আরও খারাপ। ফুটকি তাকে খুব চোট দিয়ে গিয়েছে। সইফুন তাকে চোট দিতে পারে, এমন কোনও কাজ করার বাসনা তার আর নেই। এরা সব নেককার মেয়ে, এদের সঙ্গে যে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় দাউদের তা ভালো জানা নেই। এই জন্যই ফুটকি অমনভাবে নিজেকে নষ্ট করে দিল। দাউদ যেন এখন স্পষ্ট দুটো দাউদ। পুরনো দাউদের খোলসটা থেকে নতুন আরেকটা দাউদ বেরিয়ে আসছে। যে তার অতীতকে মুছে ফেলতে চায়। যে শুধু বর্তমানের ভিত্তির উপরেই তার ভবিষ্যতের সুখের মনজিল গড়ে তুলতে চায়।

ভুল যদি সে কিছু করে থাকে, অন্যায় করে থাকে তবে সে তার জন্য তওবা করছে। সে আন্তরিকভাবে মাফ চাইছে আল্লাহ্‌র কাছে। সে পিছনে আর তাকাবে না. পিছনের জীবনে আর ফিরেও যাবে না। এখন থেকে সুমুখে তাকাবে সে। কেন, সে কি বদলায় নি ? নিজের দিকে তন্ন তন্ন করে চাইল। হ্যাঁ অনেকটাই বদলেছে। না কিছু কিছু বদলেছে। এখন কোনও কোনও রাতে নিঃসঙ্গ বিছানায় রমণী সঙ্গের জন্য সে যেন পাগল হয়ে ওঠে। এ-পাশ ও-পাশ ফেরে। কখনও কামনা করে খোন্দকারের বড় মেয়েকে তার বিছানায়, কখনও বা টেনে আনতে চায় মতি মিঞার সেজো বিবিকে। আবার শরীরের গরম কেটে গেলে সে তার এই অসংযত কামনার জন্য অনুতপ্ত হয়। তওবা করে। এবং তার দেহের ক্ষুধার অসহ্য এই যন্ত্রণার থেকে অব্যাহতি পাবার পরক্ষণেই সে লজ্জা পায়। সে শুধরাতে চায়। কিন্তু সে জানে তার একার পক্ষে

শুধরানো সম্ভব নয়। তাকে ঘর বাঁধতে হবে। শাদী করতে হবে এমন মেয়ে যার কাছে দাঁড়ালে সে নিজেকে অপরাধী মনে করবে না, যে তাকে ভালোবাসবে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করবে। এমন একটা মেয়ের সন্ধানেই তার পিপাসিত মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহই মিলিয়ে দিলেন সইফুনকে।

সে সইফুনের উপযুক্ত হয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। সইফুনকে সুখে রাখার জন্য সে টাকা রোজগার করবে। পরিশ্রম করবে। কোনও বদখেয়ালে সে আর টাকা ওড়াবে না। দাউদের মন বেশ হালকা হয়ে উঠল।

আমি তুমারে সুখি রাখবো সইফুন। ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে অস্ফুট স্বরে কথা কয়টা বলল দাউদ।

॥ ১৯ ॥

শুভ সংবাদটা দেবার জন্য চাঁদ বিবি "ফটিকির বাপ ও ফটিকির বাপ" বলে দাপাতে দাপাতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। সাজ্জাদ নেই। সাজ্জাদরা তখন গয়ার বাড়ির গুয়াল বুড়ির আমবাগানে গিয়ে জড় হয়েছে। সাত-আটখানা গ্রামের মাতব্বররা এসে জুটেছে। এবং জমায়েতে উত্তেজনা। কেউ বলছে, জান কবুল তবু কা'ল শালাগের খ্যালা হতি দেবো না। ঐ মাঠেই আমাগের জমায়েত করবো। কেউ এসে খবর দিচ্ছে বিশ্বেস-কুন্ডু-মা'ড়োবাবুরা লেঠেল এনে রেখেছে। আর ওদের পিছনে আছে মেন্দা। ওদের খেলা ভাঙতে গেলেই দাঙ্গা-কাজিয়া অবধারিত।

নিকিরিপাড়ার নাজিম, এ পাড়ার পীরু সরদার আর দা'রেপুরের দরাব মন্ডল এক মত যে কাজিয়া যদি বাধে বাধুক। লোক লেঠেল ওদেরও কম নেই। কিন্তু খালেক মুছল্লি ঠান্ডা মাথার লোক। বদনপুরির খয়রুল্লা মন্ডল, বাছেরদিঘির লাবু শেখ, গরাণগড়ার নুর আলি, জটাগাছার সলিমুল্লো, আঠারোখাদার গর্জান গাজী ওরা কেউই কাজিয়াদাঙ্গার দিকে যেতে চাইল না। তবে হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওরা একমত হল যে কাল জমায়েত শুধু নয় একটা পেল্লায় জমায়েত ডেকে ওদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ফুটবল ম্যাচ খেলাবার শয়তানী দিয়ে, আর মুরুব্বি লোকেদের গারদে পোরার ভয় দেখিয়ে চাষী-খাতকের দাবিকে গলা টিপে মারা যাবে না।

কালই জমায়েত করতে হবে ওদের শয়তানীর মুখের মত জবাব দেবার জন্য, সে বিষয়ে বৈঠকের সবাই এক মত। বশির যখন ওদের হাজত বাসের বর্ণনা দিচ্ছিল, কীভাবে তাদের রাখা হয়েছিল হাজতে, সেই নাপাকী পরিবেশে তারা নমাজ পর্যন্ত পড়তে পারেনি, তখনই উত্তেজনা চরমে গিয়ে দাঁড়াল। বশির চেষ্টা করেও গোলমাল থামাতে পারছিল না।

সাজ্জাদ উঠে দাঁড়াতেই একে একে দুয়ে দুয়ে সব চুপ করে গেল।

সাজ্জাদ বলল, "আ'জ তুমরা ক্যান্ আইছ এখেনে? ফাটকের থে বের হয়ে আ'সে আমাগের চারখানা হাত গজায়েছে কিনা, তাই দেখতি? না, তার চাইতিউ বড় কোনও কাজ আছে কি না, তাই জানতি? কা'ল আমাগের কাজডা কী? লাঠি মারে কাদের কডা মাথা ফাটানো যায় তাই? না তার চাইতিউ বড় কোনও কাজ আমাগের আছে?"

সাজ্জাদের কথায় চাপা রাগ যেন বেরিয়ে আসছিল।

সাজ্জাদ বলল, "মুসলমানেরে লোকে যে পাঁড় মুখ্যু কয়, তা এই জন্যি। কোনডা কাম আর কোনডাই বা আকাম, ইডা বুঝার ক্ষ্যামতা নেই। খালি লাফায়ে যায়ে লাঠি ধত্তি চায়।"

সাজ্জাদ চুপ করল। একটু থেমে বলল, "আমরা জমায়েত কা'ল করব। অ্যামন জমায়েত যা এদিকির লোক দ্যাখেনি। যে যার গিরাম ঝাঁটোয়ে যদি এই জমায়েতে আনতি পারো, তাতেই ওগের শয়তানির মুখির মতোন জবাব দিয়া হবে। আর বোঝবো, হ্যাঁ তুমরাও মার দুধ খাইছিলে বটে। কী, কাল গিরাম খালি করে লোক আনতি পারবা সব?"

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "পারবো।"

"অ্যাকেবারে মাথা ঠান্ডা রা'খে জমায়েত করতি তুমরা পারবা?"

"পারবো।"

"চাষী খাতক নিজগের বাঁচাবার জন্যি অ্যাক হতি পারবা?"

"পারবো।"

সাজ্জাদ বলল, "তয় আমরা, চাষী খাতকেরা জমিদার আর মহাজনগের হাতের থে বাঁচার অ্যাকটা রাস্তা পাবো।"

"কিন্তু", সাজ্জাদ থামতেই দরাব বলে উঠল, "জমায়েত'ডা হবে কনে? ইশকুলির মাঠে তো ম্যাচ্ খ্যালবে।"

সাজ্জাদ বসে কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। কেউ বলল, গোহাটায় হোক। কেউ বলল, ওতে গোলমালের আশঙ্কা বেড়ে যাবে। কেননা গোহাটের কাছেই ইশকুলের মাঠ। ভিড় হাট ছাড়ায়ে খেলার মাঠে গিয়ে পড়বেই। তখন একজন বলল, তাহলে গাঙ-দিয়াড়ে যেখেনে পাট ওজন হয়, সেই দিকি হোক। বাদবাকী সকলেরই তাতে আপত্তি। জায়গাটা এ্যামন বড় নয়।

খালেক বলল, "এদিক ওদিক যাওয়ার কী দরকার? আমাগের ঈদগার মাঠেই জামা'তডা হোক না। লোক যদি অ্যামন বেশি আসে, ওর চারিদিকিই তো মাঠ, জায়গার অভাব হবে না।"

"ঠিক ঠিক। খালেক মুছল্লির মাথা বড় সাফ।" সকলেই তারিফ করতে লাগল।

বশির উঠে বলল, "তা'লি, এই কথাই ঠিক থাকল তো? আপনারা সব ঈদগার মাঠে হাজির হবেন। উরা খ্যালা শুরু করবে চারডের সুমায়। আমরা দু পহর বেলা হ'লিই হাজির হতি শুরু করব। তা'লি এই কথাই ঠিক থাকল তো?"

সকলেই বলল, "হ্যাঁ ঠিক আছে।"

বশির বসতে না বসতেই খালেক উঠল। একটুক্ষণ চুপ করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"মুছলমান চাষী ও খাতক ভাইয়েরা, আমাদেরগে দেনার দায় আর খাজনার অত্যাচার থে বাঁচানোর ব্যবস্থা করাতি আগোয়ে যাওয়ার জন্যিই সাজ্জাদ মিঞা, বশির মিঞা ও আরউ সব ঈমানদার মুছলমানের ফাটক খাটার মতোন মুছিবতও পুহাতি হলো। ভাই মুছলমান চাষী ও খাতক আমরা যদি পিরাতিজ্ঞে করি যে এর প্রিতিকের আমরা করবই তা'লি ইন্‌শাল্লাহ্‌ কামিয়াব আমরা হবোই ক্যানো না আল্লাহ্‌ মালিক কয়েছেন, তিনি নিশ্চয় নেক্‌কারগণের সঙ্গে আছেন। আর আল্লাহ্‌ এও কয়েছেন যে যাহারা আমার পথে জেহাদ করে নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে আমার আপন পথ সকল অবশ্যই দেখাইব। ভাই আল্লাহ্‌র পথই ইছ্‌লাম। আর ইছ্‌লাম মানে শান্তি। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দেওয়া শান্তিব পথে জেহাদ শুরু করি তাহ'লিই জানবা যে আমরা নেক্‌কামই কত্তিছি। আর নেক্‌ কাম কত্তিছি বলেই আল্লাহ্‌ও নিশ্চয়ই আমাগের সঙ্গে আছেন। চলো ভাই মুছলমান চাষী ও খাতক আমরা আল্লাহ্‌র নামে নারা দিয়ে মহাজন ও জমিদারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করি।"

খালেকের কথা শেষ হতে না হতেই সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আল্লাহু আকবার।"

তারপর অতি উৎসাহ সহকারে যে যার গ্রামে চলে গেল। হঠাৎ বশিরের খেয়াল হল, তাই তো, গয়া তো আসেনি এই জমায়েতে। বিস্মিত হল সে। গয়া এমন তো কখনো করে না।

বশির সাজ্জাদকে বলল, "চাচা, গয়ারে দেখিছ?"

"গয়া?" সাজ্জাদ বলল, "না।"

"আজ যে আ'লো না অ্যাকবারউ?" বশির বলল, "ব্যাপারডা কী?"

"চল্‌দিন ওর বাড়িডা হ'য়ে যাই।" সাজ্জাদ বলল। "ফটিক আইছে।"

"তাই নাকি? তা'লি তো দ্যাখাডা কত্তি হয়।"

"চল, গয়ারেউ নিয়ে যাই।"

গয়ার বাড়ি গিয়ে দেখল বাড়িতে তালা মারা।

"এ যে দোহি তালা মারা!" বশির অবাক হল "কনে গ্যালো?"

সাজ্জাদও অবাক। "কিছু তো কয়নি আমারে।"

গয়ার নিকটতম প্রতিবেশী ইরফান মোল্লা বলল, "গয়া তো তার খুড়িরি নিয়ে আজ সকালে শ্বশুরবাড়ি চ'লে গ্যালো।"

সাজ্জাদ কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে থাকল। "শ্বশুরবাড়ি চ'লে গ্যালো। কা'ল আমাগের জমায়েত, আর গয়া শ্বশুরবাড়ি চ'লে গ্যালো! আমারে তো ক'লো না।"

বশিরের কানে একটু আগেই সোৎসাহে উচ্চারিত "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি বেজে উঠল। ধ্বনি নয়তো যেন গর্জন। আর সেই সঙ্গে গয়ার কথাও মনে পড়ল, দ্যাখ বশির, আমাগের আন্দোলন খাতক আর চাষীর আন্দোলন, কৃষক ও প্রজার আন্দোলন। এর মধ্যে হিন্দুউ থাকবে মোছলমানও থাকবে। কিন্তু তুরা ইডারে কেরমেই মোছলমানের আন্দোলন ক'রে তুলতিছিস। এর ফল ভালো হবে না।

"আল্লাহু আকবর।"

সাজ্জাদ আর বশির দেখল, তাদের গ্রামের ছোট একটা দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে কালকের জমায়েতে সবাইকে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে বেড়াচ্ছে।

গয়ার কথা ভেবে হঠাৎ বশিরের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গয়ার জনশূন্য নিস্তব্ধ বাড়িটা দেখে বশিরের কেমন গা ছম ছম করে উঠল। রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ভ'ক ভ'ক করে মাগরোর মটোর বেরিয়ে গেল। ধুলো থিতুলে ওপারের বাড়িগুলো আবার প্রকট হয়ে উঠল। ওপারে সব হিন্দুর বাড়ি। বশিরের ছোটবেলায় এ পাড়াটা গোটাই হিন্দু পাড়া ছিল। মটোরের রাস্তা বেরোবার সময় হিন্দুগের পাড়ার কিছুটা রাস্তার মধ্যেই পড়ে যায়। তারপর থেকে হিন্দুরা এপারের ভিটে জমি ছেড়ে ওপারে উঠে যেতে থাকে। এক গয়াই গোঁয়ারের মত এদিকেই থেকে গিয়েছিল। আজ তার বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছে বশিরের।

"চল চাচা। হয়ত জরুরী কোনো কাজে শ্বশুরবাড়ি দোড়াতি হয়েছে গয়ারে।" বশির নিজেকেই প্রবোধ দিতে লাগল। "কাল সা'ঝেই আবার ফিরে আসবেনে। না আ'সে যাবে কনে? গয়া কি আমাগের ছাড়ে থাকতি পারবে?"

সাজ্জাদ বাড়ি ফিরেই দেখল আবু তালেব ফটিকের সঙ্গে গল্প করছে।

বশির আর সাজ্জাদকে দেখে আবু তালেব চৌধুরী সালাম জানালেন। তারপর বশিরকে বললেন, "আরে ভাই, আপনি ছেলেন কনে, তামাম গিরাম আপনারে খুঁজে বেড়াতিছি। খবর আছে।"

ফটিক চৌকিটা ওর বাপ, আবু তালেব আর বশিরকে বসতে ছেড়ে দিয়ে নিজে টিনের সুটকেসটার উপর বসে পড়ল। সাজ্জাদ পাট বের করে নেবার পর থেকে আর ছাওয়ালের ঘরে ঢোকেনি। ঘরখানা ছিমছাম। দেখে মনে হল, সে বুঝি অন্য কারো বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। ছাওয়ালের ফুলকাটা বিছানার উপর বসতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

চাঁদবিবি সাজ্জাদকে বউ যে পোয়াতি হয়েছে, সে খবরটা দেবার জন্য হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু সাজ্জাদকে কিছুতেই কাছে পাচ্ছে না। আজকাল কী যে হইছে মদ্দর, সব সুমায় সঙ্গে লোক, সব সুমায় সঙ্গে লোক। একটুও অ্যাকা পাওয়ার উপায় নেই। মানুষ যে দুটো অ্যাকটা জরুরি কথা কবে তার জো নেই। চাঁদবিবির দম বন্ধ হবার জো হল।

আবু তালেব চৌধুরী বললেন, "খবর আছে। ভালো খবর। কাল সারাদিন যশোরে থা'কে, বিস্তর কাজ ক'রে আইছি। কাল সকালেই ছৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে দেখা করে আপনাগের সব বিত্তান্ত তাঁরে কই। তিনি সব শুনে ডি এমরে অ্যাকখানা চিঠি লিখে দ্যান। সেই চিঠি নিয়ে ডি এম-এর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিনাশর্তে আপনাগের উপরের থে কেস তুলে নিতি এস ডি ও-রে হুকুম দ্যান আর আপনাগেরে কার নালিশির উপর গ্রেপ্তার করা হয় আর আপনাগেরে জামিনি খালাস না দিয়ার কারণ কী তা তদন্ত করার ভার একজন ডি এস পি-র উপর তৎক্ষণাৎ দিয়ে দ্যান। জনাব আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী ছাহেব কাল সন্ধ্যের সুমায় ঝিনেদায় আসে পেঁছিয়ে গেছেন। তিনি কা'ল দুপুরির মটোরে ছৈয়দ ছাহেবের সঙ্গে এখেনে পেঁছবেন।"

বশির উত্তেজিতভাবে বলল, "খবর তো সবই ভালো। এদিকি আমরাউ তৈরি। এই ইউনিয়নের সব কটা গিরামের লোক আসবে।"

"লোক বাইরির থেও আসবে।" আবু তালেব বললেন। "আপনাগের যে হাজতে পুরে বেইজ্জত করিছে আর তা যে শুধু শুধু না, কৃষক প্রজা আন্দোলনরি কাবু করার জন্যি, ইডা খুব রটে গেছে। তার ফলে শাপে বর হয়ে গেছে। অনেক লোক জমা হবে। তা জমায়েতের জায়গাডা হবে কনে?"

"আমাগের ঈদগায়।" বশির বলল। "তার চার পাশেই খেত। অ্যাখন ফসলও কিছু নেই। কাজেই লোক ধরবে বেশ।"

"খুব ভালো, খুব ভালো।" আবু তালেব খুব উৎসাহ দেখালেন। "ইডা ভালোই করিছেন। অ্যাখন অ্যাকটা কথা। ছৈয়দ ছাহেব আর বোকাইনগরী ছাহেবের মতোন দুইজন জনদরদী নেতারে অ্যাক সঙ্গে পাওয়া খুবই খুশ-নছিবির ব্যাপার। এই গিরামে খাতির যত্ন করার লোক অনেক আছে ঠিকই, কিন্তু এইসব লীডারগেরে নিয়ে তুললি গিরামের এবং লীডারগের ইজ্জত রক্ষা হয় অ্যামন বাড়ি এই গিরামের কার আছে?"

ফটিক এতক্ষণ চুপ করে ছিল। হঠাৎ সে বলে বসল, "কেন, গরিব এবং খাতকদের বাড়ি উঠলে কিংবা তাদের কাছ থেকে খাতির যত্ন পেলে কি এইসব লীডার তাঁদের ইজ্জৎ হানি হবে বলে মনে করবেন?"

সাজ্জাদ ছাওয়ালের কথা শুনে খুশিই হল। বড় জবর সওয়াল করিছে ছাওয়াল। অ্যাঁ! আসতিছ চাষী খাতকের উদ্ধার করতি, তা খাতির দেখাতি তুমারে কি নিয়ে তুলতি হবে মেন্দাগের শাবানা মঞ্জিলি?

আবু তালেব ফটিকের এই সাফ সওয়ালে মুহূর্তের জন্য বেকুব বনে গেল। তারপর নিজেই হেসে ফেলল।

বলল, "কথাডা আপনি ঠিকই তুলিছেন। দোষ লীডারগের নয়। দোষডা পুরো আমারই। আমার কথাডা ঐভাবে কওয়াডাই ভুল হইছে। মাফ করবেন ভাই। আসলে আমি কতি চাইছিলাম, ওগের বয়েস হইছে। উরা একটু আরাম করে বিশ্রাম নিতি পারেন, অ্যামন কোন্ বাড়ি এই গিরামে আছে।"

ফটিকের মুখেও হাসি দেখা দিল। বলল, "আপনার এই কথাডা খুবই ন্যায্য।"

"জায়গা আছে। জায়গা আছে।" সাজ্জাদ ধীরে ধীরে বলল। "এই গিরামে নেতা আসুক, মুরুব্বি আসুক, পীর আসুক, মৌলবী আসুক, এস ডি ও আসুক, সবারই খাতির পাওয়ার জায়গা তো ঐ মেন্দাগের শাবানা মঞ্জিল। ওগের মেহমান্দারির সুখ্যাত্ সগলেরই মুখি। কিন্তু ওগের মেহমানদারি যতই ভালো হোক, আমাগের কৃষক-প্রজা নেতা শয়তান জমিদারগের বাড়ির থে বেরোয়ে জমায়েতে যা'য়ে কবেন জমিদারগের উচ্ছেদ চাই, ইডা তো ভালো দ্যাখায় না। না কি কন্?"

"সে তো বটেই সে তো বটেই।" বশির এবং আবু তালেব একসঙ্গেই বলে উঠলেন।

"তাই আমি কই কি, শাবানা মঞ্জিলির মতোন অত আরাম না পালিউ, এনাগেরে আমার

বিয়াই হাজী সাহেবের বাড়ি তুলতি পারি।" সাজ্জাদ ফটিককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী কও বাপ?"

ফটিকের এসব আলোচনায় জড়াবার ইচ্ছে ছিল না। বাপের কথাতেও সে লজ্জা পেল। তার বাজান এমনভাবে তার সম্মতি চাইল যেন সেই ও বাড়ির মালিক।

তবু সে বাপের কথায় সায় দিল।

বলল, "হ্যাঁ, ও বাড়িতে ব্যবস্থা হতে পারে। তাহলে আজই খবর পাঠাতে হয়।"

আবু তালেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বশির বলল, "খবর আমি পাঠায়ে দিবানে।"

আবু তালেব বললেন, "আরউ অ্যাকটা কাম করে আইছি। এই জমায়েত যাতে কেউ বন্ধ করতি না পারে, তার জন্যি আমি এস ডি ও-র পারমিশন নিয়ে রাখিছি।"

তারপর আবু তালেব বললেন, "এই জমায়েতডা সব দিক দিয়েই ভালো হবে বোঝলেন। অ্যাখন তো ইলেকশানের তোড়জোর হতি চলিছে, এরই মুখি আমাগের জমায়েতডা প্রজাশক্তির অ্যাকটা নমুনা হয়ে থাকবে। বোকাইনগরী আর ছৈয়দ ছাহেবেরে দিয়ে এ জমায়েতে বলাতি পারাডাউ আমাগের পক্ষে অ্যাকটা বড় কাজ হয়ে থাকলো। প্রজা পারটির ক্যানডিডেটের পক্ষে একটু আগোয়ে থাকা গ্যালো আর কি। ক্যান না, আমাগের বিরুদ্ধে ক্যানডিডেট যথেষ্ট মালদার লোক।"

বশির জিজ্ঞেস করল, "আমাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইছেন কিডা?"

আবু তালেব বললেন, "ডিসট্রিক্‌ট বোরডের ভাইস চিয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান।"

ফটিক বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা! এই সীটে বুঝি উনি দাঁড়াচ্ছেন?"

আবু তালেব বললেন, "জে হ্যাঁ। নবাব নাইট খান বাহাদুর খান ছাহেব এইসব খয়ের খাঁগেরে হটাতি না পারলি কৃষক-প্রজা-খাতক এগের উন্নতির কোনও আশা নেই।"

বশির বলল, "যাই হাজী বাড়িতি খবর পাঠায়ে দিই গে। যদি কন তো ঝিনেদার মটোরে হাজী ছাহেবরেউ খবর পাঠাই উনি য্যান কা'ল চ'লে আসেন।"

সাজ্জাদ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সিডা হলি তো সব চাইতি ভালো হয়। আর তুমি বাপ," সাজ্জাদ ফটিককে বলল, "কালকে থা'কে যাও। পরশু সকালের দিক না হয় চ'লে যায়ো। আসল কথা কি জানো এত বড় বড় নেতা আসতিছেন, আমরা মুখ্যু সুখ্যু চাষাভুষো লোক। ওগের সঙ্গে তো কথা কতি পারবো না। আর উরাউ আমাগের সঙ্গে কী বা কথা কবেন।"

বশির বলল, "ঠিক কথা। এই গিরামের ক্যান, আশেপাশের গিরামের মুছলমানগের মধ্যিও ফটিক ভাইর মতন ল্যাখা পড়া জাননেওয়ালা আর কেউ নেই।"

"উকিলউ না।" সাজ্জাদের কথার মধ্যে এই প্রথম ছেলের জন্য তার যে গর্বের ভাব প্রকাশ পেল, সেটা ফটিক লক্ষ্য করল। এবং তার ভালো লাগল।

আবু তালেব জিজ্ঞাসা করল, "ভাই আপনার সঙ্গে ছৈয়দ ছাহেবের আলাপ নেই?"

ফটিক বলল, "জে, না।"

"তা ভালোই হ'লো," আবু তালেব বলল, "আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়ে যাবেনে। যশোরে ছৈয়দ ছাহেব একচ্ছত্র লীডার। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে রাখা ভালো।"

ফটিক সসংকোচে বশিরকে বলল, "তাহলে তোমাকে আরও একটা কাজ করে দিতে হবে বশির ভাই। আমি আমার মুহুরিবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। এ চিঠিখানা হাজী সাহেবের হাতে দিয়ে তাঁকে বলতে হবে উনি যেন সেখানা আমার বাড়িওয়ালা মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেবের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। হাজী সাহেবকে এও বলে দিতি হবে যে আমি পরশু ফিরব।"

হরি মুহুরিকে ফটিক লিখে দিল ওর ফিরতে তিনদিন দেরি হবে। উনি যেন সব সামাল দিয়ে রাখেন। আবু তালেবের একটা কথা ফটিকের খুব মনে ধরেছে। সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে রাখা ভালো।

বশিরের সঙ্গে সাজ্জাদও তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। ওকে এখন হাটখোলার গিয়ে বসতে হবে। মাতব্বর যারা আসবে তাদের আবার জমায়েতে লোক আনার কথা মনে করে দিতে হবে। সবাই যেন যে যত পারে তত লোক নিয়ে আসে জমায়েতে। সুদ আর খাজনা কমাবার দাবি তুলবে তারা। একথা সবাইকে বলে দিতে হবে। হিন্দুরা কেউ আসবে না। এমন কি যে হিন্দু চাষী ও খাতক তাদের মতোনই গরিব, জমিদার মহাজন বাকি খাজনা আর সুদ আদায়ের জন্য যাদের গলায় গামছা আর বুকে বাঁশ ডলা দিতে কসুর করে না, সেই তারাও সামিল হবে না এই জমায়েতে। কেন না তাদের চোখে, গয়া যারবার করে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, এটা শুধু মুসলমানের আন্দোলন। কোরানের আয়াত আউড়ে তাদের জমায়েত শুরু হয়। শেষ হয় মোনাজাত করে। গয়া প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সভা যদি এই ভাবে শুরু আর শেষ হয়, তাহলে হিন্দু খেরেস্তান মন খুলে সে জমায়েতে যোগ দেবে কি করে? সাজ্জাদ হ'লো মোল্লার ঘরের রাম ছাগল। প্যাটে এলেম নেই এক দানা। তার বাপ কেরামত মোল্লার যেমন এলেম ছিল, তেমনি ছিল মান। তার যখন দু বছর বয়েস তখন বাপ গেল মারা।

মোল্লার ছাওয়াল প্রথমে হ'লো মুখ্যু রাখাল, তারপর সারা জীবন ধরে চাষাই থেকে গেল। তবে সে ঈমানদার মুসলমান। নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। ইসলাম ধর্মের আহকাম শরা আটটা, যথা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম, মকরুহ ও মোফসেদ, এসব মেনে সে চলে। তাই গয়ার কথায় সে বিশেষ গুরুত্ব দিত না। সে নিজে এর মধ্যে কিছু দোষের দেখতে পেতো না। এবং গয়ার মত ছাওয়াল এতে কেন আপত্তি করে তা সে বুঝতে পারত না। কারণ গয়া ছিল তার কাছে সাচ্চা হিন্দু এবং তার ছাওয়ালের চাইতেও বেশী।

গয়া বলত, চাচা প্রজা-খাতক আন্দোলনের বাইরির চিহারাডাই যদি শুধু মুসলমানের মতোন হয়ে দাঁড়ায় তবে অনেকেই ভুল বুঝে বিব্রত হবার ভয়ে সরে দাঁড়াবে। তাহলি কিন্তু কোনোদিনই এর গুড়া শক্ত হবে না। ফলে আজ আমরা যা দাবি করতিছি কোনোদিনউ তা আদায় করতি পারবো না। আমাগের পিঠে ভাগ করতি চিরকাল উরাই, ঐ জমিদার মহাজনরাই আসবে আগোয়ে যাগের আমরা সরাতি চাতিছি। ভাগের নিক্তি সব সুমায় ঐ জমিদার মহাজনগের হাতেই ধরা থাকবে। তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন। পিঠের ভাগ আমরা চাষী খাতকরা আর কখনোই পাব না। গয়ার কথায় ওরা কেউই কান দেয়নি। ওকে অনেকে সন্দেহ করেছে। অপমান করেছে কেউ কেউ। কিন্তু গয়া ওদের সঙ্গেই থেকেছে এতদিন। আজ গয়া নেই। সারাদিন খচ্ খচ্ করেছে সাজ্জাদের মনটা। কাল জমায়েতে থাকবে না গয়া! এখন সাজ্জাদের মনে হচ্ছে, সত্যিই এত বড় জমায়েতডা শুধু মুসলমান চাষী-খাতকের জমায়েতই হবে। পুরো প্রজা-খাতক জমায়েত তো হবে না ঠিকই।

তালি আমাগেরই কি কোনও ভুল হতিছে? এই প্রথম সাজ্জাদের মনে এই প্রশ্ন গভীরভাবে রেখাপাত করল।

বশির বলল, "ও চাচা, যাবা না? বাস আসার সুমায় যে হয়ে আ'লো?"

"অ্যাঁ, তাই নাকি!" সাজ্জাদ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। "চল চল, শিগগির চল।"

সাজ্জাদ বেরোতে যাবে চাঁদ বিবি রান্নাঘর থেকে চাপা স্বরে ডাকতে শুরু করল, "ও ফটিকির বাপ, ও ফটিকির বাপ, এদিকি শুনে যান। কথা আছে। কথা আছে।"

"রাখ তোর কথা!" সাজ্জাদ বিরক্ত হল। "বাড়ি আ'সে শুনবানে। অ্যাখন তাড়া আছে।"

সাজ্জাদ আর বশির বেরিয়ে গেল। ফটিক আবু তালেবের কাছ থেকে প্রজা আন্দোলনের ব্যাপারে এটা-সেটা জেনে নিতে লাগল। এবং ভূমি সমস্যা বিষয়ে আবু তালেবের পরিষ্কার ধারণা দেখে ফটিক সত্যিই রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

আবু তালেব বলল, "বাংলা দেশের রাজনীতির মূল কথাডাই হ'লো ভূমি সমস্যা। জমিদারগের গিরাসের থে জমি নিয়ে যদি চাষীগের হাতে দিয়ে না দিয়া যায় তাহলি জমিরউ উন্নতি হবে না, আর চাষীগেরউ দুর্গতি ঘোচবে না। আপনারে অ্যাকটা হিসেব দিই তালি বোঝবেন আ'জ বাংলা দেশের আসল সমস্যার চিহারাডা কী? বাংলা দেশে খাজনাভোগী পরিবার, যাগের কেউ জমিদার, পত্তনিদার, লাটদার, গাঁতিদার, নানা নামে এ'রা নানা জায়গায় ছড়ায়ে আছেন। ইনাগের সংখ্যা হচ্ছে ছয় লাখ। তা ইনাগের বেশীর ভাগই হচ্ছেন পুঁটিমাছ। রাঘব-বোয়াল হচ্ছেন মাত্তর দশ-এগার জন। বর্ধমানের মহারাজাই বাংলা দেশের সব চাইতি বড় জমিদার। তাঁর জমিদারীর সালিয়ানা আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বর্ধমানের মহারাজা, কাশিমবাজারের মহারাজা, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রকিশোর, নাটোর, ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্য, নসিপুর, দীঘাপাতিয়া, পুঠিয়া, করটিয়া, এই কটা পরিবার মিলে মোট রাজস্বের কম বেশী তিন ভাগের একভাগ রাজস্ব সরকাররে দ্যান। বাংলা দেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রতি বছর চাষীগের কাছ থে যে খাজনা আদায় করেন তার পরিমাণ সাড়ে ষোল ক্যোটি টাকা। তার মধ্যি সাড়ে তিন কোটি টাকা তাঁরা সরকাররে খাজনা ও সেস্ দ্যান, আর জমিদারির ঠাঁট বজায় রাখার জন্যি আমলা-ফয়লা ইত্যাদি বাবদ খরচ করেন পিরায় তিন কোটি টাকা। তা'হলি দ্যাখেন কোনও মুলধন না খাটায়েই এনারা মুনাফা করেন বছরে দশ কোটি টাকা।

"দশ কোটি টাকা!" ফটিক থ হয়ে বসে রইল।

"জে হ্যাঁ, দশ কোটি টাকা।" আবু তালেব বলল। "আর এ হিসেব তো সুজা পথে টাকা আদায়ের। চাষীর কাছ থে নানা ছুতোয় বাড়তি আদায়ের হিসেব এর মধ্যি ধরা নেই। ইবার দ্যাখেন আরউ পরিষ্কার অ্যাকটা ছবি। ময়মনসিংহের মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের সালিয়ানা আয় হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা। এই পরিবারের পোষ্য সংখ্যা কত, তা জানেন? মাত্র দশ-বার জন। অর্থাৎ বছরে তাঁদের প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় হতিছে প'চাত্তর হাজার টাকা। সেই সুমায় বাংলা দেশের চাষীর মাথাপিছু উদ্বৃত্তের পরিমাণ হতিছে মাত্তর ছয় টাকা।"

"বলেন কী!" ফটিকের চোখের সামনে আবু তালেব যেন এক টানে দেশের জানালাটা খুলে দিল। "বাংলা দেশের চাষীর উদ্বৃত্ত থাকে মাথাপিছু বছরে ছয় টাকা!"

আবু তালেব বলল, "আসলে উদ্বৃত্ত কিছুই নেই। আছে ঋণ। ক্যাবল ঋণির বোঝা। ঐ যে উদ্বৃত্তের যে হিসেবডা দিলাম, সে হিসেব কষিছেলেন বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি। উডা ১৯২৯-৩০ সালের ঐ কমিটির রিপোর্টেরই হিসেব। সাধারণত যাগের পনেরো বিঘে জমি আছে পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচজন তাগেরই আয়ব্যয়ের হিসেব

কষে অনেক কসরত ক'রে ঐ উদ্বৃত্ত বের কত্তি হয়েছে।" আবু তালেব হাসল। বলল, "আমিউ চাষীর ছাওয়াল, আপনিউ চাষীর ছাওয়াল, আমরা দুজনেই জানি বাংলা দেশে কজন চাষীর পনেরো বিঘে ক'রে জমি আছে। আর কড়া চাষীর, বিশেষ করে মুছলমান চাষীর পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচজন? জমি কম, মুখ বেশি, অ্যামন চাষীই বেশি। শতকরা ছেষট্টি জনেরই বেশি চাষীর জমি অ্যাক বিঘের থে বারো বিঘের মধ্যি। উদ্বৃত্ত থাকবে কন্ থে? বরং উলটো। আছে দেনা।"

আবু তালেব বলল, "বাংলা দেশে এখন কৃষি-ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে দুই শত দশ কোটি টাকা—এর উপর আছে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদির বোঝা।"

"বাংলার চাষী যে, আজও বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য!"

আবু তালেব বলল, "অবিশ্যি আপনি যদি ইডারে বাঁচা কন।"

চাঁদ বিবি ঘরে একটা লণ্ঠন জেবলে আনতেই ফটিকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ফটিক নিমগ্ন হয়ে ভাবছিল। আবু তালেব অনেকক্ষণ হ'ল চলে গিয়েছে। কিন্তু তার বক্তব্য, তার তথ্য তোলপাড় করে তুলেছে তাকে। চাষীর দেনার দায় পরিবারের প্রত্যেকের মাথায় এখন একশ টাকা। আর এই দেনার বেশির ভাগটাই এসে চেপেছে মুসলমানদের ঘাড়ে। কেন না বাংলায় মুসলিম চাষীর সংখ্যাই বেশি। কোথায় তারা এত টাকা পাবে যে এ দেনা শোধ দেবে? পাট? তাই এদের এত পাট বোনার ঝোঁক। পেটের খোরাক থাক বা না থাক বাংলার চাষীকে পাট বুনতেই হবে। দাদনে ঋণে আষ্টেপৃষ্ঠে যে কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছে তার ফাঁস খোলার একটা মন্ত্রই ওরা জানে, পাট বোনা। দেখছে এ মন্ত্রে আর কাজ হচ্ছে না, বরং নতুন ফাঁসে জড়িয়ে পড়ছে, তবু পাট বুনছে।

চাঁদ বিবি দেখল ছাওয়াল কী য্যান ভাবতিছে। সাড়া শব্দ দিল না। তার সব কাজ হয়ে গেছে। এই সুমায়ের থে ফটিকির বাপ রাত্তির বাড়ি আ'সে খা'য়ে নিয়ার সুমায় পর্যন্ত কুনু কাম থাকে না চাঁদ বিবির। বড় অ্যাকা লাগে, বড় ফাঁকা লাগে তখন। আজ ছাওয়াল বাড়ি আইছে তাই হারিকেন জ্বালায়ে ছাওয়ালের সঙ্গে কথা কতি আ'লো। না হলি সে তো লণ্ঠন জ্বালায়ই না। কুপি জ্বালায়ে হা'তনের উপর বসে থাকে। ছাওয়ালের কথা মনে হয়, কত কথা মনে পড়ে। বউডার কথা মনে হয়। কেমন ছম ছম করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতো বিটি। সারাদিনই হয় ইডা কত্তিছে নয় উডা কত্তিছে। তার কত কাজ করে দিত বউ। কাঁকই চালায়ে মাথার জট ছাড়ায়ে দিত। চুলি ত্যাল মাখায়ে দিত। আম্মাজান আম্মাজান ক'য়ে কত ডাকত। সেই বিটি অ্যাখন মা হবে। আল্লাহ্! ফটিক, তার সেই ছোট ফটিক বাপ হবে। আল্লাহ্। হঠাৎ চাঁদ বিবির দুশ্চিন্তা হল। বিটির উপর কুনু বদ্ দোয়া যাতে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করা হইছে তো?

খুব আস্তে করে চাঁদ বিবি ডাকল, "ফটিক! বাপ!"

দশ কোটি টাকা! চাষীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যখন ঋণগ্রস্ত এবং সেই ঋণের পরিমাণ খাতকদের পরিবারের প্রত্যেকের মাথাপিছু যখন একশ টাকা, তখন কিছুমাত্র মূলধন বিনিয়োগ না করেই বাংলার জমিদারদের নীট আয় বছরে দশ কোটি টাকা! ফটিকের বিস্ময় ক্রমশই বাড়ছিল।

আর এই যে বিপুল অর্থ জমিদারগের হাতে আসে তা কী ভাবে খরচ করেন তাঁরা? আবু তালেব প্রশ্ন করেছিলেন।

জমির উৎপাদন বাড়াবার জন্যি ব্যয় করেন? এই প্রশ্নও আবু তালেবের।

না। জবাবও আবু তালেবের।

চাষীরা যাতে খরার সুমায় জল পায়, হাজার সুমায় মাঠের জল যাতে বেরেয়ে যায় তার জন্যি এস্টেটের থে সেচ দেওয়া বা খাল কাটার জন্যি খরচ করা হয়?

না।

তবে কি এই টাকা জমিদার হুজুররা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে লাগান?

না।

তবে?

এই প্রশ্নটা বুলেটের মত বিদ্ধ করেছিল ফটিককে। তবে! এ টাকা যায় কোথায়!

অনেক দিন আগে, ফটিক যখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছিল, বয়কট, চরকা, এসব নিয়ে মেতে উঠতে উদ্যত হয়েছিল, তখন দেওয়ান বাড়ির মেজোবাবু তাকে যে কথাটা বলেছিলেন, আজ তা মনে পড়ল তার। ফটিক হুজুগে মেতে কোনও কিছু করো না। এমন কি দেশের কাজও নয়। তাতে দেশের কোনও মঙ্গল হয় না। কেন না হুজুগটা তাড়াতাড়ি চলে যায় কিন্তু দেশটা চিরকাল থাকে। বর্জনে দেশের লোকের মঙ্গল করা যায় না। লোকের মঙ্গল হয় নির্মাণে। তাই আমি মনে করি তোমার বয়কট থেকে চরকা বরং ভালো। ওতে অন্তত নিজের কাপড়টা নিজে করে নেওয়া যায়। কিন্তু সব চাইতে ভাল ফটিক, মূলধন সঞ্চয় করা। দেশের লোককে শিল্পে উৎসাহী করে তোলা। নিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করা। ইন্‌ডাসট্রিই একালের ধর্ম। যে দেশ বা যে জাতি এই ধর্ম গ্রহণ করবে তার বিকাশ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ফটিক বলেছিল, আমরা যে পরাধীন। আমাগের হাত-পা যে বাঁধা মাজে কত্তা। তখনও ফটিকের মুখে কলকাতাই বুলি ফোটেনি।

মেজোকত্তা বলেছিলেন, এসব হচ্ছে কুঁড়েমির ছেঁদো কৈফিয়ৎ। অলসদের ছলের অভাব হয় না। ইতিহাস বলে যারা উদ্যোগী তারা সবই পায়, এমন কি স্বাধীনতাও। আমেরিকা তার সাক্ষী। সে কবে স্বাধীনতা পাবে বলে হাত-পা কোলে করে বসে থাকেনি। শিল্প ও কৃষি সে শ্রম ও উদ্ভাবনী বুদ্ধিকে প্রয়োগ করে আগে গড়ে তুলেছে। তাই তার বয়কটটা হল সত্যিকারের সংগ্রাম। আর আমরা সহজে কিস্তিমাৎ করতে চাইলাম। তাই দাঁড়াবার ভিতটা শক্ত করে গড়ে তোলার পরিশ্রমটা সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। শুধু বয়কট শুরু করলাম। তাই আমাদের বয়কট কোনও সংগ্রামের হাতিয়ার হল না। ওদের বয়কটে সত্য ছিল। তার পিছনে নির্মাণের ভিত্তিভূমি ছিল। আর আমাদের বয়কটটা হল ভান।

কথাটা সেদিন ফটিকের খুব একটা ভাল লাগেনি। অনেক তর্ক হয়েছিল।

মেজোকত্তা বলেছিলেন, বাংলা দেশের নেতারা যদি সত্যিই লোকের হিত চান, তবে জেলে যাবার জন্য অত আগ্রহ না দেখিয়ে জমিদার, মহাজন, সাধারণ লোক সকলের শক্তি ও সঞ্চয় একত্র করে ইনডাসট্রি পত্তন করার জন্য নেতৃত্ব দিন। শিক্ষিত মনের সঙ্গে কৃষিকাজকে যুক্ত করতে এগিয়ে আসুন। দেখবে দেশ মুক্তির দিকে এগুবে। পার্শী ভাটিয়া এরা আমাদের চাইতে অনেক বিচক্ষণ। ওরা চুপ করে বসে নেই ফটিক, ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। আর আমাদের পলিটিক্যাল নেতারা মুখে স্বদেশী স্বদেশী করছেন কিন্তু স্বদেশী ইনডাসট্রি গড়ার দিকে সিরিয়াসলি কেউ এগিয়ে এসেছেন? কেউ মূলধন ঢেলেছেন? কর্মই যে ধর্ম এই মন্ত্রে দেশের ছেলেদের কেউ উদ্বোধিত করতে এগিয়ে এসেছেন? বাইরে এরা বাঘ কিন্তু ভিতরে একেবারে পঙ্গু ভিখিরি।

আশ্চর্য! আজ আবু তালেবও এই কথা শুনিয়ে গেলেন। মহারাজা শশীকান্ত আচার্যের কথাই ধরেন। তিনি তো বাংলা দেশের কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী নেতা। এদিকি তো স্বদেশী স্বদেশী বলে ফাটায়ে দেচ্ছেন, কিন্তু তাঁর মত লোকউ যখন আয়ের সিকি ভাগউ মূলধন হিসেবে নিয়োগ করেননি, তখন আর কার দুয়োরে যাবো?

"ফটিক বাপ", অনেকক্ষণ পরে চাঁদ বিবি ছাওয়ালকে আবার ডাকল। ছাওয়ালের সঙ্গে তার খুব কথা কতি ইচ্ছে করতিছিল। জিন ভূতির বা শয়তানের বদনজরের থে বিটি যাতে রক্ষে পায় তার জন্য চাঁদ বিবির ইচ্ছা ছিল বিটির শরীলডা বন্ধ করার কালামের আমল ক্যামন করে কত্তি হয়, সিডা ফটিকরি শিখোয়ে দ্যায়। কিন্তু তার ছাওয়াল ফটিক আবার কত দূরে চলে গেছে। তার সামনে বসে যে অ্যাক মনে ভাবতিছে এই লোকটারে সে ভাল চেনে না। এ তো শহরের উকিল! তাই চাঁদ বিবি একটুও আওয়াজ না করে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলতে লাগল। আর আকুলি বিকুলি মনে সে ডেকে ডেকে তার হারানো ছেলেকে খুঁজতে লাগল। ফটিক! বাপ! ফটিক!

দিগন্তে কালবৈশাখী

॥ ১ ॥

একটা ফৌজদারী বিশ্বাসভঙ্গের মামলা সেকেন্ড্ ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে শফিকুল শেষ পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেল। সোজা সহজ মামলা। পরিষ্কার ৪০৫ ধারার কেস। সেকেন্ড ম্যাজিস্ট্রেট হামিদ সাহেব প্রথম দিকে তার মক্কেলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু অগ্রাহ্য করেননি। আসামী পক্ষের উকিল বাড়োরি বিপদ দেখে হঠাৎ ৪০৪ ধারা উদ্ধৃত করে একটা ফ্যাকড়া বাধিয়ে বসল। বলল, এ মামলায় যেহেতু মুভেবল্ প্রপারটি জড়িত নেই, সেই হেতু এই মামলাটাকে ৪০৫ ধারায় বিচার করা চলে না। ছোকরা ম্যাজিস্ট্রেট ঘাবড়ে গেলেন। বাড়োরি হিন্দু সভার নেতা এবং তার প্রতিপক্ষের উকিল একজন মুসলমান। ছোকরা ম্যাজিস্ট্রেটও মুসলমান। বাড়োরি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করল। স্যর এই আদালতের উচ্চ আদর্শ এবং গরিমাময় ঐতিহ্য হচ্ছে ন্যায় বিচার। এই আদালত আশা করে আপনিও সেই আদর্শের, সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করার আদর্শ স্থাপন করবেন। মামলাটাকে, ইওর অনার, স্ট্রিকটলি আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে রেখেই আপনি বিচার করবেন সে বিশ্বাস আমাদের অন্তত পুরোমাত্রায় আছে। আশা করি, আমার বিজ্ঞ সহযোগী, ফরিয়াদী পক্ষের উকিল, যাকে আমরা একজন ঈমানদার মুসলমান বলে জানি, উনিও আমার আশার অংশভাগী হবেন।

বাড়োরি খুবই ঘোড়েল। তাকে ঈমানদার মুসলমান বলে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে হামিদ সাহেবকে আরও ঘাবড়ে দিল। হামিদ সাহেব শেষে শফিকুলের কথাই শুনতে চান না। শেষে সে যখন সেকেন্ড ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের মক্কেলের অনুকূলে রায় বের করে নিয়ে বার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল তখন তার আর নড়ে বসারও যেন শক্তি নেই।

বেয়ারাটাকে গেলাসটা বের করে দিয়ে শুধু বলল, "পানি!"

বার লাইব্রেরী তখন সরগরম। বরদা আর খালেকুজ্জমানে তখন ফাটাফাটি চলেছে। দিগম্বর মৈত্র, অপেক্ষাকৃত সিনিয়ার উকিল, মাঝে মাঝে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন। বারে বারে পান খাচ্ছেন এবং নিজের অজ্ঞাতেই আবার তর্কে জড়িয়েও পড়ছেন। আর মাঝে মধ্যে বিপন্ন হয়ে দিগম্বর শফিকুলকে সাক্ষী মানছেন, বেশ তো বেশ তো শফিক মিঞাকে জিজ্ঞেস করা যাক না। উনিই বলুন না।

বেয়ারা জল এনে দিল। শফিকুল ঢক ঢক করে গেলাসের জলটা খেয়ে নিল।

খালেকুজ্জমান বললেন, "বরদাবাবু তখনের থে ক্যাবল বলেই চলিছেন মোছম্মানগের অন্যায় আবদার তিনি জান থাকতি মানে নেবেন না। ভালো কথা। কিন্তু মোছম্মানগের আবদারটা যে কী আর সিডা ক্যান্ যে অন্যায়, এই কথাডাই জানতি পারা গ্যালো না।"

বরদাকান্ত বললেন, "আপনাগের সব দাবিই আবদার আর সব আবদারই অন্যায়, এর আর বিতং করে বলার কী আছে? তাহলি যে ঠগ্ বাছতি গাঁ উজাড় করে দিতি হয়!"

"এইটে হল গে টিপিক্যাল হিন্দু মেনটালিটি।" খালেক বললেন, "জানেন কিছুই আপনাগের বলার নেই, তবু জোরে গলাবাজি করেই জিতে যাতি চান: অ্যাঁ!"

বরদা বললেন, "হারা জিতার কোনও প্রশ্নই নেই। মোসলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলোরে আপনি কী কবেন? উডা আবদার ছাড়া আর কী?"

খালেক বললেন, "মোসলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলো কী এমন ছিল যা আপনার কাছে আবদার আবদার ঠেকিছে? সিডা কবেন তো?"

বরদা বললেন, "অযৌক্তিক প্রস্তাবকেই আমি আবদার বলি।"

খালেক বললেন, "তাঁলি কন্না, কোন্ প্রস্তাবডা আঁপনার কাছে অযৌক্তিক ঠেকতিছে?"

"মোসলেম কনফারেনসের", বরদা বললেন, "সব প্রস্তাবই অযৌক্তিক।"

"তালি ইবার কন", নাছোড় খালেক বরদাকে চেপে ধরল, "মোসলেম কনফারেনসের প্রস্তাবগুলো কী?"

বরদাকান্ত কোণঠাসা হয়ে বললেন, "তা বেশ তো, আপনার মুখ থেকেই শোনা যাক না! দিগিনদা শোনেন দেখি, খালেক মিঞার জবানীতে মোসলেম কনফারেনসের প্রস্তাব কতটা যুক্তিপূর্ণ শুনায়!"

খালেক বললেন, "তাহলি শোনেন। তবে সিডা শুনার আগে অ্যাকটা ছোট্ট কথা শুনে রাখেন। কাজে দিতি পারে। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না, কথাডা বলিছেন বিবেকানন্দ স্বামী মহারাজ।"

বরদাকান্ত কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু খালেক তাঁকে কোনও সুযোগই দিলেন না। বলে চললেন, "মোসালেন কনফারেনস যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করিছেন তার মধ্যি তিনটে বিষয়ই ছিল প্রধান। যথা: এক, স্বতন্ত্র নির্বাচন বহাল রাখতি হবে; দুই, পাঞ্জাব আর বাংলায় মুসলমানরে

শতকরা ৫১ডা আসন দিতি হবে আর তিন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমানগের অ্যাক তৃতীয়াংশ আসন দিতি হবে। ন্যান্, অ্যাখন কন দিনি বরদাবাবু, এর মধ্যি কোন্‌টা মুসলিম পয়েনট অফ ভিউ-এর থে আপনার কাছে অযৌক্তিক।"

বরদা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নাউ দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। দ্যাখেন মিঞা সাহেব, এই কথাডা আপনার মুখ দিয়ে শোনবো বলেই আপনারে দিয়ে কবুল করায়ে নিলাম। নাহলি আমি মোসলেম কনফারেনসের এই র‍্যাংক কমিউন্যাল প্রস্তাবউ জানি, আব বিবেকানন্দের বাণীডারেউ জানি। কোনও হিন্দুই এ প্রস্তাবে সায় দিতি পারে না। কেন না হিন্দুর চোখি ভারতভূমির প্রতিটি ধূলিকণাও পবিত্র। সে তাই ভারতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য হাসতি হাসতি এই ভূমিতে তার প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বিভেদের সবরকম চক্রান্ত আমরা বানচাল ক'রে দেবো। আপনাগের এই বিভেদপন্থী মনোভাবকে আমরা দারুণ হেইট করি।"

বাড়োরি এতক্ষণ বসে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। হঠাৎ খালেককে লক্ষ্য করে বললেন, "হোয়াই ডোনট যু গো টু ইওর ওন সয়েল ? আপদ যায় তাহলি!"

খালেক বলল, "এইটেই আমার ওন সয়েল বাড়োরিবাবু। আমি মুসলমান। ইসলাম আমার ধর্ম। মুসলমান ভৌগোলিক প্রতিমারে পুজো করে না। বিশ্বকবি ডঃ ইকবাল বলিছেন, বর্ণ ও রক্তের প্রতিমা ধ্বংস করিয়া ধর্ম ইসলামে আত্মবিলোপ কর—যেন তুরানী, ইরানী, আফগানী ইত্যাদি ভৌগোলিক জাতীযতাসূচক বিদ্বেষাত্মক কিছু অবশিষ্ট না থাকে। তাই এক মুসলমানই একথা জোর দিয়ে কতি পারে, হিন্দুস্তান আমার, বোখারা আমার, ইরান, তুরান আমার। আব আমি সব গুলসানেরই বুলবুল। হিন্দুর মত ঘরের বাইরি পা দিলি আমাগের জাত যায় না। আমাগের ভাবনা চেতনা তাই অ্যাত ইউনিভাবসাল।"

দিগম্বরবাবু এই সুযোগটা আব নষ্ট করতে চাইলেন না। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ক্যান্ আমাগের মুনি ঋষিদের ভাবনা-ধারণাও যথেষ্ট ইউনিভাবসাল্ ছিল।"

খালেক বলল, "সে তো আপনাগের ব্যাদে ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। তখন হিন্দুউ অনেক বড় ছিল। কিন্তু আজকের হিন্দু কি সেই হিন্দু ? বিশ্ব থেকে হিন্দুর দৃষ্টি কবেই স'রে গেছে। তার পরের থে হিন্দুর দৃষ্টি, সৃষ্টি আর কর্ম তো ক্যাবল হুঁকো আর হাঁড়ি আর জাত বাঁচাতিই খরচ হইছে। অ্যাখন সম্বল ক্যাবল চালাকি।"

তর্ক শুনতে শুনতে তন্দ্রা এবং ভাবনায় আচ্ছন্ন হযে পড়েছিল শফিকুল।

ইওর অনার, ইওর অনার, বাড়োরি চিৎকার করে উঠলেন, ইনডিয়ান পিনাল কোডের ৪০৪ ধারায় প্রপারটির ডেফিনেশন্‌টার প্রতি আপনারে অ্যাকবার চোখ বুলোতি অনুরোধ করতিছি স্যার। এই দ্যাখেন স্যার এখেনে স্পষ্ট বলা হইছে মুভেবল প্রপারটি অর্থাৎ কিনা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্র ছাড়া ক্রিমিন্যাল মিস্ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন-এর অপরাধ অনুষ্ঠিত হতি পারে না। আমাব মাননীয় ও বিজ্ঞ সহযোগী উত্থাপিত ৪০৫ ধারার অভিযোগ ঐ একই কারণে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধি দাঁড়াতি পারে না। স্যার, এই মামলার ফরিয়াদী, আমার বিজ্ঞ সহযোগীর মক্কেল শ্রীমতী হরপ্রিয়া দাসী এই মামলার আসামী আমার মক্কেল শেখ বরকতুল্লাহ্ ওরফে বকু শেখের হাতে টাকা পয়সা, গহনাগাঁটি, বাসন কোসন আসবাবপত্র অর্থাৎ এক কথায় অস্থাবর সম্পত্তি বলতি যা বুঝি তার কোনো কিছুই তীর্থযাত্রার কালে বিশ্বাস ক'রে আমার মক্কেলের কাছে গচ্ছিত রাখে যাননি। ফরিয়াদী নিজিই বলিছেন, ইওর অনার, যে তিনি তাঁর ধানের ক্ষেত, যেহেতু বকু মিঞাই বরাবর তা চাষ করে থাকে, এবং তাঁর ক্ষেতের ধান বকু মিঞার জিম্মায় রাখে গিছিলেন। শ্রীমতী হরপ্রিয়া দাসী তীর্থ সারে ফিরে আসে দ্যাখেন তাঁর ক্ষেতে ধান নেই। তিনি অ্যাখন সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে ৪০৫ ধারার মামলা রুজু করিছেন। স্যার, ক্যান্ ধান গাছ বি কল্‌ড্ অ্যাজ অস্থাবর সম্পত্তি? ধান গাছরে কি স্যার মুভেবল বলা যায়? আমি স্যার এই পয়েনটেই এই মামলা খারিজ করে দিতি অনুরোধ জানাতিছি। যত্তো বাজে ব্যাপারে খামাখা আদালতের সময় নষ্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাড়োরির টোপটা ভালমতই গিলে ফেলেছিলেন। শফিকুল যতবার মুখ খুলতে যায়, ম্যাজিস্ট্রেট ততই বলেন, ডোন্‌ট ওয়েসট্ মাই টাইম প্লীজ। দি ক্রাক্স অফ দি পয়েনট হিয়ার ইজ অ্যাজ দি ডিফেনস হ্যাজ পয়েনটেড আউট, হোয়েদার এনি মুভেবল্ প্রপারটি ইজ ইনভলবড্ অর নট্। তার উপরেই ৪০৫ ধারা অর্থাৎ ক্রিমিন্যাল ব্রিচ অফ ট্রাসট-এর মামলা দাঁড়িয়ে আছে। নাউ, ইফ আই হ্যাভ্ টু বিলিভ দ্যাট স্ট্যান্‌ডিং প্যাডি ক্রপ ইজ এ মুভেবল প্রপারটি দেন আই হ্যাভ টু পুট মাই বিলিফ অন এ মুভিং মাউনটেন অলসো। ইজনট্ ইট ?

এবং আদালত হাসিতে ফেটে পড়ল। শফিকুলের কানের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে কিছুমাত্রও ধৈর্য হারাল না। সে শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে স্মিত হাসল। যেন তাঁর বিদগ্ধ রসিকতাটি পরম উপভোগ করেছে।

তারপর বলল, "না ইওর অনার, আমি আপনাকে মুভিং মাউনটেনের উপর আপনার বিশ্বাস ন্যস্ত করতে কখনোই পরামর্শ দেব না। এমন কি দেয়ার আর মোর থিংগস ইন হেভেন অ্যানড

আরথ্ হোরেশিও, হ্যামলেটের এই বহু ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটির পুনরাবৃত্তি করে কোনও অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতেও আপনাকে প্ররোচিত করব না। আমি শুধু ইওর অনার আপনাকে এইটেই দেখাব যে ধানের গাছ সম্পর্কে আমার বিজ্ঞ সহযোগী ডিফেনসের জ্ঞানের বহর কতটা লম্বা।

আদালতে চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বাড়োরি একটু ইতস্তত করলেন। মনে হল বোধহয় তিনি এই কথায় বাধা দিতে চান। কিন্তু না, তিনি বসেই রইলেন। শফিকুল তাঁর দিকে চাইল।

ইওর অনার, তার জন্য আমি আমার বিজ্ঞ সহযোগী মাননীয় ডিফেনসকে বিশেষ দোষ দিই নে। কারণ ওঁরা শহরের লোক, কত ধানে কত চাল হয়, ওঁদের পক্ষে জানা হয়ত সম্ভব নয়। এমন প্রসিদ্ধিও আছে স্যর যে ওঁর জাত ভায়েরা ধান গাছে তক্তা হয়, এই কথাও নাকি বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু স্যর, আমি হেলো চাষীর ছেলে, আমার বাবা এখনও নিজে লাঙল চালান। অতএব ইওর অনার ধান সম্পর্কে আমি, আমার বিজ্ঞ সহযোগীর বিজ্ঞতার প্রতি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ না করেও, অধিকতর যে অভিজ্ঞ, সবিনয়ে অন্তত এই নিবেদনটুকু করতে হয়ত পারি। এই মামলায় আমার বক্তব্য সহযোগী ডিফেনস যদি একটু সংকর্তাব সঙ্গে অনুধাবন করতেন তাহলে কষ্ট করে ইনডিয়ান পিনাল কোডের অতগুলো পাতা উলটে তাঁকে আর ৪০৪ ধারার প্রপারটির কোয়ালিফিকেশনের দিকে নজর দিতে হত না। তার চাইতে বরং মনশ্চক্ষে একবার ধানক্ষেতের দিকে চাইলেই ধান গাছ কখন স্থাবর এবং কখন অস্থাবর, এর উত্তর নিজেই পেয়ে যেতেন। স্যর, ধান স্ট্যানডিং ক্রপ্ ততক্ষণই যতক্ষণ সে স্থাবর। ইমমুভেবল। পাকা ধান কেটে আঁটি বেঁধে মাঠে ফেলে রাখলে তাকে আর স্ট্যানডিং ক্রপ বলা যায় না। পাকা ধানের আঁটি সারটেনলি মুভেবল। বাড়িতে বা খামারের গাদায় রাখা আঁটি বাঁধা খড়কে বিজ্ঞ সহযোগী কি বলবেন? স্থাবর বা অস্থাবর? খামারে তাগাড় করে রাখা পাকা ধানের আঁটিকে বিজ্ঞ ডিফেনস কী বলবেন? স্থাবর সম্পত্তি না অস্থাবর সম্পত্তি? পাকা ধানের আঁটি টাকা-পয়সা, বাসন কোসন, গহনা-গাঁটি, আসবাবপত্রের মতই অস্থাবর নয় কেন, বিজ্ঞ ডিফেনস কি তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন? উনি তা যে পারেন নি ইওর অনার, ওঁর বক্তব্য ঘাঁটলেই আপনি বুঝতে পারবেন। ধানের আঁটি অস্থাবর সম্পত্তি এবং এই মামলায় তা জড়িত। সেই কারণেই আমরা মনে করি এই মামলা ৪০৫ ধারায় আওতায় সুন্দরভাবে পড়ে। কেননা ফরিয়াদী তাঁর এই অস্থাবর সম্পত্তির যে দায়িত্ব বিশ্বাস করে আসামীর হাতে ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আসামী ইচ্ছাপূর্বক এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভঙ্গ করেছে। শুধু তাই নয় ইওর অনার, আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারাও পরিষ্কার ভঙ্গ করেছে। তাই তাকে চুরির দায়েও আমরা অভিযুক্ত করছি।

শফিকুলের এই সওয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অবশেষে মেনে না নিয়ে পারেন নি।

দিগম্বর বললেন, "আহা বন্দে মাতরম তো জাতীয় সঙ্গীত। এতে তুমার আপত্তি থাকা তো ঠিক নয়।"

"দ্যাখেন", খালেকুজ্জমান বললেন, "আপনারা যতই চেল্লাচেল্লি করেন আর যাই করেন, মোছলেম মেজরিটির উপর আপনারা কিছুতেই বন্দে মাতরমরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে চাপায়ে দিতি পারবেন না। মুছলমান মাত্রেই এই পৌত্তলিকতাকে রেজিসট্ করবে।"

বাড়োরি একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"কী অ্যাতবড় কথা! যে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে আজ আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত হচ্ছে। যে বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে শত শত যুবক ফাঁসীর মঞ্চে শহীদ হয়েছে। হাজার হাজার আবালবৃদ্ধবনিতা কারাবরণ করছে, সেই বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে অ্যাত বড় অশ্রদ্ধার কথা বলতি আপনাদের একটুও বাধলো না।"

বাড়োরির চিৎকারে শফিকুলের তন্দ্রা ছুটে গেল। তার মনে হল বেশ খিদে পেয়েছে। সে এক আনা পয়সা বের করে বেয়ারার হাতে দিয়ে বলল, "মুড়ি আর তেলেভাজা এনে দাও তো। খাই।" তারপর সে হাই তুলল। বেয়ারা পয়সা নিয়ে চলে গেল।

দিগম্বর বললেন, "বঙ্কিমের এই অত্যাশ্চর্য রচনাতেও তুমরা পৌত্তলিকতা দেখতিছ! আশ্চর্য চোখ বটে!"

"দোষ কি আমাগের চোখের দিগম্বর বাবু," খালেকুজ্জমান বললেন, "দোষ বঙ্কিমীর কলমের। আচ্ছা কন্ তো, আপনারা তো খুব জাতীয়তাবাদী, ইংরেজ তাড়াবার জন্যি তো আপনাগের কারু চোখি ঘুম নেই। তা যে ইংরেজ আজ আপনাগের অ্যাত চক্ষুশূল, সেই ইংরেজরে বন্দে মাতরমের ঋষি অ্যাকেবারে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজায়ে ঘরে ডাকে আনলেন ক্যান, নাড়ে মার নাড়ে মার করে সিংহনাদ, যত দোষের দুষি আমরা নাড়েরাই, আচ্ছা, তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু হিন্দুগের মধ্যি অ্যামন কারুরি পালেন না ক্যান্ বঙ্কিম যার উপর তিনি হিন্দু রাজ্য গ'ড়ে তুলার ভার দিতি পারতেন? জীবানন্দ না, মহেন্দ্র না, শেষকালে বিদেশী ফিরিঙ্গির হাতে দেশটারে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ডেপুটিগিরি কত্তি লাগলেন। অ্যাঁ! দেশের সম্রাট হলেন ইংরেজ সরকারের ডেপুটি বাবু! বাঃ! বেশ ভালো বন্দোবস্ত!"

দিগম্বর খুব প্যাঁচে পড়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। তারপর তারস্বরে বলতে লাগলেন, "দ্যাখো বঙ্কিমীর মাহাত্ম্য বুঝা অত সুজা না। বুঝলে! আছো তো মক্কার দিকি মুখ ফিরোয়ে, তা

দেশীয়ভাব বুঝবা কি করে? খালি এ'ড়ে তককো!"

"জে না," খালেকুজ্জমান বললেন, "আমরা অ্যাখন আর মক্কার দিকি মুখ ফিরোয়ে নেই। বঙ্কিমবাবুর নির্দেশ মতনই শ্বেতদ্বীপির দিকিই মুখ ফিরোইছি। অবিশ্যি একটু লেট হয়ে গেছে।"

শফিকুল এই তর্কে কান দিচ্ছিল না। কয়েকটা ব্যাপারে সে উদ্বেগের মধ্যে আছে। এক, সইফুন। সইফুনকে নিয়ে তার চিন্তার কারণ এই যে তার মনোভাব ফটিকের কাছে ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এবং প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করছে সইফুন। এবং সেও। তাই সে সইফুনকে এড়িয়ে চলছে। দুই. হাইকোর্টে এতদিন পরে তার মক্কেলের কেসটা উঠেছে। ফলাফলের জন্য সে উদগ্রীব হয়ে আছে। তিন. ছবি। এই রবিবারে তাকে আসতেই দিতে চাইছিল না। কান্নাকাটি করছিল ছেলেমানুষের মত। বেশ সুন্দর চেহারা হয়েছে ছবির। দিন দিনই অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠছে। এই ক মাস ধরে সে নিয়মিত প্রতি শনিবার ঝিনেদায় যায় আর রবিবার শেষ বাসে যশোরে ফেরে। তারপর কয়েকটা রবিবার কিছুতেই তাকে আসতে দিল না ছবি। কিন্তু এই সোমবারে তার মামলা ছিল একেবারে প্রথম দিকে। ছবি কিছুতেই শুনবে না। কেবল বলে. আজ যদি যান ফিরে আ'সে আমার মরামুখ দেখতি হবে। একেবারে পাগল!

বরদাকান্ত দত্ত বললেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন?"

খালেকুজ্জমান বললেন, "আপনারে? না কিছুই না।"

"আহ্ হা আমারে ক্যান?" বরদা বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্ররে।"

"আপনি যদি না শুনে থাকেন তবে দিগম্বরবাবুর কাছে শুনে ন্যান।"

টেবিলে থাপ্পড় মেরে বরদা বললেন, "আপনার কোনও রাইট নেই আমাগের এভাবে ইনসাল্ট করার।"

খালেকুজ্জমান চটে গেলেন। বললেন. "আপনারে আমি কখন ইনসালট্ করলাম? ভালোরে ভালো!"

"আলবাত করেছেন!" বরদা খাপ্পা হয়ে বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্রের ইনসালট্ মানেই সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ির অপমান।"

"আ! বরদা!" দিগম্বরবাবু এক'খিলি পান মুখে পুরে বললেন, "চুপ করো না।"

"দ্যাখলেন তো দিগম্বরবাবু," খালেকুজ্জমান বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "আমার বক্তব্যই প্রমাণিত হয়ে গেল। হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে যদি কোনও বস্তু থা'কে তা'লি বঙ্কিমবাবু হলেন তাঁরই ঋষি। তাঁর মন্ত্র হতিছে বন্দে মাতরম্। ঐ মন্ত্রে ভারতীয় হিন্দুগের মনে প্রেরণা জাগতি পারে। আমি মুছলমান, আমি অন্য কাল্চারে মানুষ, আমার ধর্ম আলাদা, ঐ হি'দুর মন্তর আমি নিতি যাবো ক্যান্?"

"তাহলে যান না মিঞা ছাহেবরা," বরদা বললেন. "সোজা টিকিট কা'টে মক্কায় চলে যান।"

"কোনও প্রয়োজন নেই," খালেকুজ্জমান বলল, "এ দেশটাতেই আমার দিব্যি চলে যাচ্ছে। ইটাও আমার দেশ। কী কন্ শফিকুল ভাই?"

কিন্তু শফিকুল জবাব দিল না। সে তখন ঝিনেদায়। তার অবুঝ বিবিকে সামাল দিচ্ছে। ছবি ছবি আমার কোনও উপায় নেই। কাল আদালত খুললেই আমার মামলা। দুহাত দিয়ে ছবির চোখের পানি সে তখন মুছিয়ে দিচ্ছে।

নড়ে, নড়ে। ছবি কাতরভাবে বলল, হঠাৎ হঠাৎ প্যাটে উডা মুড়া মা'রে ওঠে। আমার ঘুম ভাঙে যায়। আমার ভয় করে। আমার বিজায় ভয় করে তখন।

কেন, তোমার কাছে রাত্তিরে কেউ শোয় না?

বউ বিটি শোয়। ছবি গলা খুব নিচু করে বলল। কিন্তু আপনারে না পালি ভয় যায় না। আমার রাত্তিরি ঘুম ভাঙে যায়। আপনারে খুব পাতি ইচ্ছে করে। আপনি থাকলি ভয় করে না। আজ থা'কে যান। থা'কে যান।

ফটিক অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। বাসের সময় হয়ে গিয়েছে। বাস স্ট্যানড থেকে প্যাঁক প্যাঁক হরন্ দিচ্ছে আর সময় নেই।

ছবি শোনো! খুব নরম করে ফটিক বলল। আগে আমার কথা শুনে নাও। তারপরও যদি থাকতে বলো, থাকব। কাল আমি যদি ঠিক সময়ে কোরটে হাজির হতে না পারি এক মহিলার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, জানো। এখন তুমি বল আমি কী করব?

ছবি ধীরে ধীরে ওর মুখের দিকে চাইল। ম্লান হেসে বলল, জানিনে যান। তারপর আস্তে এগিয়ে এসে ওর বুকে মুখ চেপে বলল, যান। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন!

ভেবেছিল ছবিকে একটু আদর করবে ফটিক। সেই মুহূর্তে বাস ভ্র-র-র-র্ করে স্টারট দিল। ফটিক এক লাফে ঘর থেকে উঠোন। ছবি চাদর চাদর বলে চাদরখানা চৌকি থেকে তুলে নিয়ে ফটিকের গায়ে ছুঁড়ে দিল। ফটিক চাদরখানা এক হাতে জড়াতে জড়াতে বাস স্ট্যানডের দিকে পড়ি মরি দিল দৌড়।

"শাট্ আপ!"

"ইউ শাট্ আপ!"

"আঃ বরদা, খালেক তুমরা শুরু করলে কী, কও দিনি?"

ফটিক চমকে উঠে দেখে তুমুল উত্তেজনা। তার সামনে টেবিলের উপর মুড়ি তেলেভাজা পড়ে আছে। সে ঠোঙাটা তুলে নিয়ে মুড়ি খেতে লাগল।

"মুসলিমস্ আর লাইক দ্যাট।"

"লাইক হোয়াট?"

"লাইক খান বাহাদুর। সব সময় তারা হিন্দুগের পিঠি বিশ্বাসঘাতকের মত ছুরি মা'রেছে।"

"ক্যামন করে?"

"য্যামন ক'রে বোদে সরকারেরে বিট্রে ক'রে রাতারাতি বোরডের চেয়ারম্যান হইছেন খান বাহাদুর।"

"আঃ! বরদা! থামো নারে ভাই। কানের পোকা নড়ে গ্যালো যে!"

"বোদে সরকারের পিঠি ছুরি মা'রে খান বাহাদুর যে চিয়ারম্যান হইছেন, আপনি খোন্দকার সাহেবের মুখির উপর একথা কতি পারবেন?"

বরদা একেবারে চুপ। খান বাহাদুর বরদার সিনিয়ার।

খালেক বললেন, "হিন্দুজ আর লাইক দ্যাট।"

"লাইক হোয়াট্?"

"লাইক ইউ।"

"কী, কী বললেন।"

"ঠিক বলছি। হিন্দুরা আপনারই মতোন। ফ্রম জয়চাঁদ টু উমিচাঁদ অল আর অ্যালাইক। হিন্দুগের ইতিহাস স্বদেশের পিঠি ছুরি মারার ইতিহাস। সৎ সাহস নেই। মনে অ্যাক মুখি অ্যাক। হিপোক্রাট্স!"

বরদা আস্তিন গুটোচ্ছেন দেখে দিগম্বর শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই ছেলে ছোকরাদের নিয়ে আর পারা যায় না। মুখ থাকতি হাতাহাতি ক্যান্ বাপু। এতটা নিচে নেমে আসা তিনি পছন্দ করেন না। উই মাস্ট হ্যাভ ডিগনিটি। আসলে দিগম্বরবাবুকে মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।

"ইউ মাস্ট উইথড্র।"

"উমিচাঁদ না জয়চাঁদ, কাকে উইথড্র করব?"

"শাট আপ, আই সে। আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন কিন্তু!"

"আঃ বরদা! কী ছেলেমানুষী করছ?"

দিগম্বরবাবু দেখছেন, ইলেকশন যত এগিয়ে আসছে, মুসলমান ছোঁড়াগুলো তত বেপরোয়া হয়ে উঠছে। এখন কি মাথা গরম করাব সময়? বরদার কী, হিন্দু পাড়ার মধ্যি বাড়ি, সিকিওরড্ লাইফ।

"থামেন তো দিগম্বরবাবু। আপনি মানুষ না কী? আপনার সামনে ব'সে এই ইনসোলেনট লোকটা এনটায়ার হিন্দু জাতটাকে বিশ্বাসঘাতকের জাত বলে লেবেল মা'রে দেছে, আর আপনি সেই সময় নিশ্চিন্ত মনে বসে শুধু দাঁত খুঁটোতিছেন? আপনার লজ্জা করে না!"

বরদার মন্তব্যে দিগম্বর ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু তাঁর কিছু করার নেই।

বাপু হে দোষটা কি আমার? আমার পিতামহ রায় দিগীন্দ্রচন্দ্র মৈত্র বাহাদুর, গভরমেনট্ প্লিডার, দোষ যদি দিতি হয়, তাঁরে দ্যাও। তিনি রাজসাহী থেকে উঠে আ'সে একটা প্যালেশিয়াল বিলডিং হাঁকড়ালেন। জুড়ি হাঁকায়ে কোর্টে আসতেন। তখন তাঁর নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খা'তো! ছোট লোকদের যে এত বাড় বাড়ন্ত হবে, তারা লেখাপড়া শেখবে, সদাশয় ইংরেজ বাহাদুর যে তাঁর মত রাজভক্ত প্রজার বংশধরগের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে যত ছোটলোকগের মাথায় তোলবেন, ইডা তিনি স্বপ্নেউ ভাবতি পারেন নি। তা'লি কি আর তিনি ঐ সস্তায় জমি পায়ে ঐ জায়গায় ঐ পেল্লায় দীননাথ ধাম গড়ে তোলতেন! স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত দিনেশচন্দ্রের আমলে দান ধ্যান বিলাস ব্যসনে অনেকটা, আর পাঁচ ভাই-এর ভিতরে পারটিশন শুটে বাকি রবরবা অন্তর্হিত হয়। দিগম্বরবাবু জন্মে ইস্তক দেখছেন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। ওঁরই বাপ জ্যেঠারাই একটু সুবিধে দাম পেয়ে মুসলমানগের কাছে ওগের জমি জমা বেচে দিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন। এখন সেই পাতকের ফল ভোগ করতিছেন দিগম্বর এবং তাঁর শরিকেরা। আগে ছোটলোকেরা ওখেনে মসজিদ বানায়নি। বছর কয়েক হ'ল ওরা যখন মসজিদ বানাতি শুরু করল, দিগম্বরবাবু আর তাঁর শরিকেরা ইংরেজের আদালতে স্থায়ী ইন্‌জাংশন প্রার্থনা করলেন। জেলা জজ তখন গোলক ভট্টাচার্জি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টমশন। গোলক ভট্টাচার্জি ইন্‌জাংশন্ ভেকেট করে দিয়ে বদলি হয়ে চলে গেলেন। পরের বছর তিনি রায় সাহেব হলেন। তারপর থেকেই ছোটলোকেরা এমন আস্কারা পেয়ে গেল যে মহরমের বাজনার আওয়াজ বাড়িয়ে দিল। আর সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যে নেই আল্লাহু আকবর শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেলেঙ্কারীর এখেনেই কি শেষ? যেদিন মায়ের সাধের ময়নাটা রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে এই সুমধুর নাম উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ আল্লা হু আকবর বলে আজান দিয়ে উঠল, সেইদিন তাঁর মা অন্নজল ত্যাগ করে বললেন, বাবা এই অধর্মের পুরীতি আর না, আমারে

বিন্দাবন পাঠায়ে দে। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা খসল 'বিন্দাবন পাঠায়ে দে', আর অমনি বিন্দাবন পাঠিয়ে দিলাম, সে যুগ কি আর আছে? তাই ময়নাটারে জলে গোবর গুলে খাইয়ে, ছাতুর দলায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে খাইয়ে এবং সকাল সন্ধ্যা গোঁসাই বাবাজীকে দিয়ে, পড়ো ময়না রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে পড়িয়েও যখন তার মুখ থেকে যবনের আজান থামানো গেল না, তখন দিগম্বর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করবার জন্য জাত খোয়ানো ময়নাটাকে মসজিদে দান করবেন মনস্থ করলেন। দিগম্বর একদিন মসজিদের ইমামকে এই আশ্চর্য ময়নার কথা বললেন। ইমাম সাহেব কৌতূহলী হলেন এবং বাবুদের বাড়িতে গিয়ে স্বকর্ণে যখন সেই রাধাকৃষ্ণ বলা ময়নার মুখে পরিষ্কার আল্ লা-হু আকবর বুলি শুনলেন তখন আল্লাহ্‌র কুদরতের কথা ভেবে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আলহাম্‌দোলিল্লাহ্ বলে ইমাম সাহেব আহ্লাদে ডগমগ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আঁসু ঝরতে লাগল। দিগম্বরবাবুকে বললেন, কত্তাবাবু তা'লি শোনেন, আল্লাহ্ একবার তুর পর্বতে হজরত মুসা নবীরি নিজির মুখি কইছিলেন, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই নামের যিকের হামেশা করিও। এই নামের মর্যাদা অপরিসীম, এর যিকের অমূল্য। জগতের সমগ্র বস্তুর মূল্যও এর সমতুল্য নয় বোঝলেন! তা আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এই পাখিডারে বাড়ি নিয়ে যাবো আর ঐ খোদার যিকেরের নামডা শিখোয়ে দেবো। ইমাম খুশি মনে খাঁচা সমেত পাখিটাকে নিয়ে চলে গেলেন। দিগম্বরের বাড়ির লোকও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পাপ বিদেয় হ'ল। কোন্ আক্কেলে তুই না'ড়েগের ঐ ডাক পাড়তি গেলি! এখন যা, দ্যাখ গে, প্যাঁজ রসুনির গন্ধ শুকতি ক্যামন লাগে। দিগম্বরের মা এই ধরনের কথা বলতে বলতে এখন পা ছড়িয়ে পাখির শোকে কাঁদতে থাকেন।

ছেলেমেয়ে নিয়ে মুসলমান পাড়ায় ঘর করেন দিগম্বর। তাই জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করার নীতি তাঁর নয়। তিনি চান, মুসলমানরা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পরিত্যাগ করুক। তারা জাতীয়তাবাদী হোক। ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মানুক। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠুক। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত নিয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি টেনে আনা কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক শ্রী পদ্ম নিয়ে এত হুহুংকার কেন? এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের "নেড়ে মার নেড়ে মার" এই নিছক সাহিত্যগত একটা সংলাপ নিয়ে খালেকুজ্জমানের মত মুসলমানেরা এত উগ্র হয়ে ওঠে কেন, এটাও দিগম্বর ভালো বুঝতে পারে না। আফ্‌টার অল্ ওটা তো উপন্যাস। আসলে পাতি নেড়েদের রসবোধ বড় কম। সব ব্যাপারেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে টেনে আনা চাই। এইটেই তিনি শান্তভাবে খালেকুজ্জমানকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। ছোকরা একটু রাগী কিন্তু ছেলে খারাপ না। তাছাড়া সে দিগম্বরের পাড়ারই ছেলে। ওকে হাতে রাখারই তিনি চেষ্টা করেন। হচ্ছিল তাদের দুজনের মধ্যে কথা। বরদার তার মধ্যে নাক গলাবার দরকার কী? নাঃ, এমন অক্‌ওয়ার্‌ড অবস্থার মধ্যে এরা তাকে ফেলে! দিগম্বর চুপ করে রইলেন।

"হ্যাঁ, আপনারে উইথ্‌ড্র করতি হবে।"

খালেকুজ্জমান বলল, "বরদাবাবু আপনার কেস্ খুব উইক্। আমি উইথড্র করলিউ জয়চাঁদ থেকে উমিচাঁদের স্বদেশদ্রোহিতার ঘটনা ইতিহাস উইথ্‌ড্র করবে না। ঘরসন্ধানী বিভীষণরে রামায়ণ উইথ্‌ড্র করবে না। বিভীষণের স্বদেশদ্রোহিতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতাকে যে জাতি ধর্মের দোহাই দিয়ে জাস্‌টিফাই করতি পারে, তাগের কাছ থেকে কী আশা করতি পারা যায় কন?"

"আপনি আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। মীরজাফরের বংশধরের মুখি এ কথা মানায় না। আপনারে আপনারে—"

"আঃ বরদা! এটা বার লাইব্রেরি। কুরুক্ষেত্র নয়। ডেকোরাম নষ্ট করো না।"

"আপনার ডেকোরামের নিকুচি করিছে। আপনাগের জন্যিই তো—"

পিওন এসে বলল, "টেলিগ্রাম।"

মুহূর্তে সব চুপ। ·

"কার টেলিগ্রাম?"

"শফিকুল মোল্লা।"

শফিকুলের সাড়া নেই। সে তখন চিন্তায় যেন ডুবে গিয়েছে। ছবি বড্ড অবুঝ হয়ে উঠছে। ছবি কেন বিদায় বেলায় ওকথা বলল?

"আরে ও মোল্লা সাহেব", দিগম্বর ডাকলেন। "মোল্লা সাহেব!"

শফিকুলের চেতনা ফিরে এল।

সে বলল, "আমাকে কিছু বলছেন?"

"আপনার টেলিগ্রাম!"

"টেলিগ্রাম", শফিকুলের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। ছবি! ছবি বলেছিল ফিরে আ'সে আমারে দেখতি পাবেন না! শফিকুলের বুক ধুক্ ধুক্ করতে লাগল। সই করতে হাত কাঁপল।

"কী মশাই, ডারবির টিকিট কিনিছেন না কী?"

সে জবাব দিল না। বুক ঢিপ ঢিপ উত্তেজনা নিয়ে সে খামটা ছিঁড়ে ফেলল।

ঝপ্ করে শফিকুলের মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ল। সে টেলিগ্রামখানা দিগম্বর-

বাবুর হাতে দিল। কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌। অ্যাপেল্যান্টস অ্যাকুইটেড অফ্‌ অল্‌ দি চারজেস্‌। লেটার ফলোস। এল।

টেলিগ্রামখানা জোরে জোরে পড়ে দিগম্বর চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোন্‌ কেস্‌? কোন্‌ কেস্‌?"

"এইটেই আমার প্রথম কেস্‌।" শফিকুল বলল। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর ভার্সাস্‌ মোহাম্মদ বাছরুদ্দী ওরফে শানা মিয়া অ্যানড্‌ আদারস্‌। ৩৭৬ ধারার কেস্‌।"

"আরে বুঝেছি। সেই যে সেই দলবদ্ধ বলাৎকারের কেস্‌। ফরিয়াদী পক্ষের উকিল ছেলেন খান বাহাদুর স্বয়ং।" দিগম্বর বললেন, "ইডা তো সেই কেস্‌?"

"জে।" শফিকুল জবাব দিল। "সেই কেস্‌।"

"দেখি টেলিগ্রামটা।" বরদা চাইতেই দিগম্বর সেটা তার হাতে দিয়ে দিলেন।

"কী হে বরদা, শেষ পর্যন্ত তুমার সিনিয়ারের মত অ্যামন ডাকসাইটে একজন ফজদোরি উকিল, তার কিনা পচা শামুকে পা কাটলো? অ্যাহ্‌!"

খালেকুজ্জমান উঠে এসে শফিকুলের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, "কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ ভাই সাহেব।"

বরদা টেলিগ্রামখানা নিয়ে তার সিনিয়ারের কাছে ছুটে গেলেন। দিগম্বর একটা পান মুখে ফেলে শফিকুলকে অভিনন্দন জানালেন। খবরটা ততক্ষণে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। জুনিয়ার উকিলদের কেউ কেউ অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে শফিকুলের মনে। আর কেবলই ছবির কথা মনে হচ্ছে। ছবি এখানে থাকলে সে এক্ষুনি ছুটে যেতো বাড়িতে। সবার আগে সে তাকেই দিত খবরটা। আর মনে পড়ছে মিস্‌ পালিতের কথা। সে কৃতজ্ঞ, লতিকার কাছে তার ঋণের অন্ত নেই। এমন আনন্দ কোনো দিন পায়নি শফিকুল। তার আত্মবিশ্বাস তার অহমিকাবোধ এবং তার জিগীষা একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এক হয়ে গিয়ে তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে দিচ্ছে। সে যেন ফেটে পড়বে। সে যদি এই আনন্দ কারও সংগে ভাগ করে নিতে না পারে তাহলে সে যেন চৌচির হয়ে যাবে। তার মন ছবির কাছে ছুটে যাচ্ছিল বার বার। কাল মামলা আছে। নাহলে আজ সন্ধ্যার মোটরে সে চলে যেত। খোন্দকারের চাপরাশি টেলিগ্রামটা ফেরত দিয়ে গেল। তার মানে খান সাহেবও দেখেছেন। ভালোই। হঠাৎ শফিকুল উঠে পড়ল। ওর এখনই লতিকাকে একটা তার করে দেওয়া উচিত। ওর কৃতজ্ঞতাটা তাকে জানানো উচিত। যখন বার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে শফিকুল পোস্টাফিসের দিকে যাচ্ছিল তখন তার মনে হচ্ছিল যেন সে উড়ছে। হঠাৎ দিগম্বরের মন্তব্যটা তার কানে সপাৎ করে আঘাত করল। কি হে বরদা, শেষ পর্যন্ত তুমার সিনিয়ারের মত অ্যামন ডাকসাঁইটে ফজদোরি উকিল, তার কিনা পচা শামুকে পা কাটলো? অ্যাহ্‌। শফিকুলের মুখটা বিস্বাদ হয়ে উঠল। সে তাহলে পচা শামুক! এদের কাছে তার মূল্য মাত্র এইটুকু!

॥ ২ ॥

লতিকাকে টেলিগ্রামটা করে দিয়ে শফিকুলের মনে হল আর কিছু করবার নেই। খুব একা একা ঠেকতে লাগল তার। সে যে কত একা তা যেন হঠাৎ টের পেল। পোস্ট অফিসে যে ক'টা মুখ দেখল সে, সব অচেনা। পথেও কোনও চেনা মুখ নজরে পড়ল না। সে কত একা! ছবি এখানে থাকলে এমনটা হত না। সে সবার আগে তার কাছেই ছুটে যেত। বলত, ছবি আমি সেই মামলায় জিতেছি। এই জজ আমার সওয়ালে কান না দিলে হবে কি, হাইকোর্টের জজ আমার যুক্তি মেনে নিয়েছেন। আমার মক্কেলদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন। কিন্তু ছবি নেই এখানে। শফিকুল প্রচন্ডভাবে একজন কাউকে চাইছিল। সে তার আপনার কোনও একজনের সংগে তার আনন্দটা ভাগ করে নিতে চাইছিল। এমন একজনকে সে পেতে চাইছিল, যে তাকে হিংসে করবে না, তাচ্ছিল্য করবে না, যে তাকে বুঝবে। লতিকাই ছিল এসব ব্যাপারে দি বেস্ট্‌। লতিকা, না ছবি? ছবি অবশ্যই খুব খুশি হত। খু উ ব খুশি। কিন্তু লতিকার সংগে ল পয়েনট আলোচনা করা যেত। আলোচনা করা যেত এমন সব বিষয়ে যা তৃপ্ত করত তার মনের ক্ষুধাকে। যা ছবির সংগে করা যায় না। লতিকার সঙ্গ তাকে আরেক ধরনের আনন্দ দিত, যা ছবির কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। লতিকার কালচার, তার বৈদগ্ধ্য, তার আন্তরিকতা, সে অন্য ধরনের জিনিস। শফিকুলের মত লোকের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে তা পাওয়া সম্ভব নয়। লতিকা অন্য গ্রহের মানুষ। ছবি? ছবি তার আটপৌরে অস্তিত্বের ভিত্তি। ছবি তার বিবি। ছবি তার এ দুনিয়ার বন্ধন। লতিকা বেহেশ্‌তের হুরী। স্বপ্ন।

মনের নিক্তির দুটো পাল্লায় দুজনকে তুলল শফিকুল। এদিকে ছবি ওদিকে লতিকা। তারপর দুজনকে ওজন করতে করতে পথ হাঁটতে লাগল। এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার মনে পড়ল মন্মথবাবুর কথা। অমনি তার প্রাণে উৎসাহ আবার জেগে উঠল, হ্যাঁ, মন্মথবাবু। এ খবর শুনলে তিনি খুব খুশি হবেন। কিন্তু হরি মুহুরী নেই। তীর্থ করতে গিয়েছে। এ

অবস্থায় একা সে ও বাড়িতে যাবে কী? যাওয়াটা কি ঠিক হবে? মন্মথবাবুর মেয়ের দু চোখের শীতলতা তার প্রতি যে বিরূপভাব ব্যক্ত করেছিল, তারপর আর তাঁর বাড়িতে যেতে সে ভরসা পায়নি। না, তার একার যাওয়া সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে বরং একটা চিঠি লিখে সুখবরটা জানিয়ে দেবে মন্মথবাবুকে। আর হাইকোরটের রায়ের নকলটা এলে সে সেটা মন্মথবাবুকে দেখিয়ে আসবে। আর ততদিনে মুহুরীও এসে পড়বে তীর্থ থেকে। হ্যাঁ, সেই ভাল হবে। সে বরং মৌলবী জয়নুদ্দিনকে গিয়ে টেলিগ্রামটা দেখাক। তিনি খুব খুশি হয়ে উঠবেন। সইফুন! হ্যাঁ, সইফুনকে সে বলবে। সইফুন একথা শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবে। সে দ্রুত বাড়ির পথে পা বাড়াল।

বাড়ির পথে আবু তালেব চৌধুরীর সঙ্গে তার দেখা। সালাম জানিয়ে তিনি শফিকুলকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

তারপর বললেন, "চলেন, চলেন, বাসায় চলেন, জরুরি কথা আছে।"

চলতে চলতে আবু তালেব বললেন, "ওঃ, আজ আপনারে খুঁজে খুঁজে নাজেহাল হয়ে গিছি। বার লাইব্রেরির থে আপনিউ বেরোইছেন আর আমিউ গিয়ে হাজির হইছি। এট্টুর জন্যি দ্যাখাড়া হয়নি। তারপর আলাম আপনার বাসায়। নেই। আবার কাছারিতি গ্যালাম যদি অন্য কুথাও থাকেন। নেই। আবার বাসায় আলাম। সেই বন্ধ। যাক, শেষ পর্যন্ত আপনারে যে ধরতি পারিছি, সিডাই আল্লার মেহেরবানি।"

ঘর খুলে শফিকুল বলল, "ভাই বসেন। আমি একটা বাতি নিয়ে আসি। চা খাবেন না কি?"

আবু তালেব বললেন, "আরে ওসব পরে হবে। আগে জরুরি ব্যাপারটা সারে নিই। খবর আছে।"

শফিকুল বলল, "কী ব্যাপার! কোনও খারাপ খবর নয় তো?"

"খুব খারাপ।" আবু তালেব বললেন! "আপনাগের গিরামের পুনুনু স্যাকরার বাড়ি জ্বালায়ে দেছে। হ্যান্ড নোট, বন্ধকী তমসুক সব পুড়ে ছাই। পুনুনু স্যাকরারে দা দিয়ে কুপোয়ে দারুণ জখম করে ফেলিছে। ওর বিটার বউরি দুর্বৃত্তরা নিয়ি চলি গেছে। পুনুনুর বাড়িউ লুঠ হইছে। খাদু শেখ থানায় গিয়ে কবুল করিছে, পুনুনুরি জখম করা আর বাড়িতি আগুন দিয়ার সঙ্গে সে জড়িত। তবে অ্যাকটা ডাকাতির দলের সঙ্গে মিশে সে কাজডা করিছে। তাদের নাম সে কতি নারাজ। এই কথা কইছে, আল্লার হুকুমি ইনছাফ পাবার জন্যিই সে এই কাম করিছে।"

শফিকুল জিজ্ঞেস করল, "খাদু শেখ মানে তো সেই খাদু শেখ যে আব্বুগের সঙ্গে হাজত খেটেছিল?"

"জে।"

শফিকুল এবার বেজায় উদ্বিগ্ন হল।

"কাকে কাকে অ্যারেস্ট করেছে দারোগা?"

আবু তালেব বললেন, "এখনও আর কাউরি গ্রেফতার করেনি। তবে জোর গুজব যে বশির আর আপনার আব্বুরি ঝুলোবার তাল কত্তিছে। জমিরুদ্দিরউ ধরতি পারে।"

"পুনুনু স্যাকরার অবস্থা কী? কিছু জানেন?"

"অ্যাখনও জ্ঞান ফেরেনি।" আবু তালেব বললেন। "যদি বাঁচে তো ডানির দিন।"

"কবে ঘটনা ঘটেছে?"

"পরশু। আমার ভয় উরা এই ছুতোয় কৃষক প্রজা কর্মীদের আবার অ্যারেসট করি না বসে।"

শফিকুল একথার জবাব দিল না। চুপ করে ভাবতে লাগল।

আবু তালেব বললেন, "ইলেকশনের কাজ ক্রমেই আগোয়ে আসতিছে। আপনার আব্বা আর বশির আমাগের ওদিকির খুঁটি। অ্যাখন থানায় থানায় আমরা প্রজা সম্মেলন করতি শুরু করিছি। চাষী আর খাতকগের দুরবস্থার কারণ যে জমিদারি প্রথা আর মহাজনী শোষণ সিডা আমরা অ্যাখন বুঝোতি পারতিছি। চাষী খাতকগের সাহস বাড়তিছে। চাষী খাতকের প্রত্যেকটা ভোটের দাম কত, তাও তারা ক্রেমে ক্রেমে বুঝতি শুরু করতিছে। সেই সুমায় এই কান্ড ঘটে গেল। অ্যাখন করা কী? সৈয়দ ছাহেবের কাছে গিছিলাম।"

"তিনি কী বললেন?" শফিকুল জিজ্ঞেস করল।

"তিনি কলেন", আবু তালেব বললেন, "আপনারে কাজে লাগাতি। ওগের গেরেফতার কল্লিই য্যান্ আপনি বেল্ পিটিশন্ মুভ্ করে ওগের ছাড়ায়ে আনতি পারেন।"

শফিকুল বলল, "ঠিক আছে। আমার যা করবার তা করব।"

আবু তালেব বললেন, "তাহলি তো হয়েই গ্যালো। তালি প্রেয়োজন হলি কোরটেই আপনার সঙ্গে দ্যাখা করব। অ্যাখন তবে উঠতি হয়।"

"খুব তাড়া আছে?"

"ক্যান্, কন্ দিনি? অ্যাখন যাব প্রেসে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাগের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলতিছে। পুনুনু স্যাকরার বাড়ি ডাকাতিটা আমরাই করাইছি, এই কথাই রটায়ে ব্যাড়ানো হতিছে। অ্যাকদিক বিশ্বেস কুন্ডুগের দল আবার অন্য দিকি খোন্‌কার মেন্দার দল

আমাগের বিরুদ্ধে আড়ে-হাতে লাগে গেছে। মেম্দা হইছেন খোন্‌কারের খুঁটি। তাই আমরা অ্যাকটা ইশ্‌তেহার ছাপাতি দেবো। বোঝলেন তো? কাজ মাত্তর এই।"

শফিকুল বলল, "ব্যাপারটা আমার ভালো করে জানা দরকার। খাদু হঠাৎ পুনুনু স্যাকরার বাড়িতে কেন চড়াও হল?"

"তয় শোনেন।"

আবু তালেব সমস্ত কাহিনীটা বলে গেলেন। পুনুনুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিল খাদু। পুনুনু খাদুকে সাদা কাগজে টিপ ছাপ করিয়ে টাকা ধার দেয়। যত টাকা নিয়েছিল খাদু, পুনুনু তার টিপ্ মারা কাগজে ডবল টাকা বসিয়ে দেয়। তারপর পুনুনু খাদুকে বলে অ্যাকটা জমি যদি সে পুনুনুকে লিখে দেয় তালি পুনুনুর দেনা শোধ হয়ে যাবে। সেই মত জমি লিখেও দেয় খাদু। কিন্তু তারপরও পুনুনু খাদুর তমসুক ফেরত দেয় না। এই নিয়েই বিবাদ।

"খাদু তার জবানবন্দিতি এই কথাই কয়েছে। এও কয়েছে যে সে বাইরির থে লোক ভাড়া করে আনিছিল। তবে কারউ নাম কয়নি। এদিকি গিরামে তোলপাড়। পুনুনুর বিটার বউরি নাকি লুঠ করে নিয়ে গেছে। আর সবাই মিলে দোষডা চাপাচ্ছে প্রজা আন্দোলনের উপর। এই আন্দোলনই নাকি ছোটলোকগেরে ক্ষ্যাপায়ে তোলছে এবং যার ফলে আইন শৃঙ্খলা ভাঙে পড়ার জো হইছে।"

"তারপর, আমাদের খান বাহাদুরের কাজ কতটা এগোচ্ছে?"

আবু তালেব বললেন, "যতটা খুঁটি আলগা লোকটারে ভাবিছিলাম, তা না। বেশ বুদ্ধি রাখে। জেলা বোরডডা হাতে রাখিছে তো, অ্যাখন আবার প্রেসিডেনট, উডা মস্ত সুবিধে। তার উপর টাকাউ আছে। তারপর ইউনাইটেড মুসলিম পারটির নাম ছাড়ে উনি অ্যাখন মুসলিম লীগ পারলামেনটারি পারটির ক্যানডিডেট হইছেন। এতেও ওঁর খানিকটে সুবিধে হবে। একদিকি খানবাহাদুর মৌলবীগের কাজে লাগাতিছেন, আবার অন্য দিকি দাউদ মিয়ার মত লোকেদেরউ কাজে লাগাতিছেন।"

"দাউদ!" শফিকুল বিস্মিত হল। "কোন্ দাউদ?"

"আপনাগের দাউদ। হাজী সাহেবের ভাতিজা।"

"সে আবার কী কাজে লাগল?"

আবু তালেব বললেন, "আসল কাজডা তো সেই কত্তিছে।"

সত্যিই অবাক হল শফিকুল। দাউদ তার কাছে একটা প্রহেলিকা। একবার তার মনে হয়, লোকটা সরল। আবার কখনও তার মনে হয় খুবই মতলববাজ। শফিকুল লক্ষ্য করছে, ইদানীং মৌলবী জয়নুদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে দাউদের খুব খাতির বেড়েছে। জয়নুদ্দিন প্রায়ই 'ছবি বিবির ভাই', 'আমার বিটির ভাই' বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। এই সরল লোকটাকে সে কিছু বলতেও পারে না। আবার 'ছবি বিটির ভাই' দাউদের এই পরিচয়ে সে অস্বস্তিও বোধ করে। দাউদ সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা কিছু ছিল না। ফুটকির মৃত্যুর পর ছবি শোকে অধীর হয়ে তাকে যা বলেছিল দাউদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তা থেকে দাউদের বিষয়ে ভাল ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই সে দাউদকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু জয়নুদ্দিন দাউদ সম্পর্কে খুবই উচ্ছ্বসিত। তাঁর বিচারে দাউদ একজন সত্যিকারের মুসলমান। কওমের খেদমতে এ রকম জিন্দাদিল নওজওয়ান যত আসে, জয়নুদ্দিনের মতে, তত ভাল। মোসলেম জাহানের তরক্কি তাতে ত্বরান্বিত হবে।

শফিকুল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দাউদ কী কাজ করছে?"

আবু তালেব বললেন, "ও তো জেলা বোরডের ঠিকেদার।"

"তা জানি।"

"তাই দাউদ মিঞা হলেন খোন্‌কারের পেয়ারের বদনা।"

আবু তালেবের বলার ধরনে শফিকুল খুব মজা পেল। মৌলবী জয়নুদ্দিন তো খোন্দকার সাহেবকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সেই খোন্‌কারের বদনা সম্পর্কে তার স্নেহ উথ্‌লে পড়ে। এবং দাউদ মৌলবী সাহেবের কাছে আদৌ গোপন করেনি যে সে খোন্‌কারের লোক। নাঃ, ক্ষমতা আছে তার!

"দাউদ মিঞা কত্তিছে কী, জানেন তো?"

শফিকুল উৎসুক হয়ে উঠল।

"অ্যাখন জিলা বোরডের রাস্তা মেরামত কত্তিছে। কিন্তু বড় সুন্দর অ্যাকটা কায়দা ধরিছে। যে-সব ইউনিয়নির মধ্যি দিয়ে রাস্তাডা যাতিছে, সেইসব ইউনিয়নির মুছলমান মাতব্বরগের ডাকে কচ্ছে যে বোরডের চিয়ারম্যান খান বাহাদুর খোন্‌কার বজলুর রহমান তারে হুকুম দেছেন, পেরথমে গিরামের লোকদের কাজ দিবা আর তাগেরে ন্যায্য মজুরি দিবা আর তাগের পাওনা পাই পয়সা অব্দি মিটোয়ে দিবা আর আমি মুছলমান, আল্লাহর বান্দা, তাই দ্যাখবা য্যানো আমার মুছলমান ভাইরাই সব কাজ পায়। আপনাগের ইউনিয়নির মধ্যি রাস্তা মেরামত হবে। আপনারা অ্যাখন লোক দ্যান্। দাউদ মিয়ার ক্যাপাসিটি আছে বোঝলেন। এর মধ্যিই শৈলকুপো-ঝিনেদার দিকি বেশ কয়েকটা ইউনিয়নির মাতব্বরগেরে হাত ক'রে ফেলিছে।"

শফিকুল হঠাৎ যেন দাউদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ছবির কাছে যে দাউদের কথা শুনেছিল, এ যেন সে দাউদ নয়, সেদিন তার বাসায় এসে যে দাউদ আত্মগ্লানি উদ্‌ঘাটন করে গেল, এ যেন সেই দাউদও নয়। এ দাউদ ধূর্ত, বেশ পরিণত এবং দক্ষ। কিন্তু মৌলবী জয়নুদ্দিনের সঙ্গে তার এত মেলামেশার অর্থ কী? জয়নুদ্দিন বলেছেন, দাউদ একদিন ওদের সবাইকে সারকাস দেখিয়েছে। সইফুন! ঝপ করে অন্ধকারটা সরে গেল তার চোখের উপর থেকে। হ্যাঁ, সইফুন। কোনও ভুল নেই। একটা সাপ যেন শফিকুলের হৃদ্‌পিণ্ডে ছোবল দিল।

শফিকুলের স্বভাবত শান্ত মন প্রচণ্ডভাবে তোলপাড় করে উঠল। তার কানে আর কিছু ঢুকছিল না। সইফুন। সইফুনের জন্য সে চিন্তিত হয়ে উঠল। আবু তালেব তারপর অনেক কিছু বলে গেলেন। মুসলিম লীগ পারলামেনটারি পারটির কোথায় দুর্বলতা। নবাব, নাইটের নেতৃত্বের অসুবিধা। এবং কৃষক প্রজা দলের কোথায় শক্তি। আবু তালেবদের নির্বাচনী মেনিফেসটো। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী এবং মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ। কত কী বললেন আবু তালেব। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত ওদিকের সবজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক মৌলবী আবু তালেবকে তাদের ক্যানডিডেট করেছেন, তাও বললেন। একটা কথাও শফিকুলের কানে গেল না।

"আমাগের দুটো মস্ত সুবিধে আছে, জানেন।" আবু তালেব বললেন। "এক, আমাগের নির্বাচনী ইশতেহার। আর দুই, আমাগের নেতা শের-এ বাংগাল মৌলবী আবুল কাশেম ফজলুল হক।"

সইফুন, সইফুন! সাবধান।

"আর জানেন তো, হক সাহেবের হক কথা।" নিজের রসিকতায় আবু তালেব নিজেই হেসে ফেলেন।

তুমি দাউদকে জানো না সইফুন। ও লোক মোটেই সুবিধের নয়।

আবু তালেব বলে চলেছেন, "বাংলার রাজনীতির সমস্যাডা যে প্রিকিতপক্ষে ডাল ভাত আর কাপড়ের সমস্যা এই কথাডা আমাগের নেতা হক সাহেবই পেরথমে কলেন। এই সুন্দর কথাডা তিনি ছাড়া হিন্দু মুসলমান আর কোনও নেতার মুখ দিয়ে বেরোয়নি, তা জানেন?"

দাউদের পাল্লায় পড়ো না সইফুন। খবরদার খবরদার!

"আমরা তো কোনও লম্বা চওড়া কথা কচ্ছি নে।" আবু তালেবকে কথায় পেয়েছে। "থানায় থানায় যে-সব প্রজা সম্মেলন আমরা করতিছি, তার মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমরা যে লোকেরে ভোট দিয়ে সরকার গড়তি পাঠাবো, তারে কৃষক প্রজার আপন লোক হতি হবে। না হলি চাষীর ডাল ভাত আর কাপড়ের সমস্যার সমাধান আর কেউ করবেন না। বোঝলেন তো?"

সইফুন সইফুন! দাউদ বড় সাংঘাতিক লোক। ও ছবির ভাই বটে, কিন্তু ছবিদের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।

"বোঝলেন তো?"

সে মহা কেলেংকারীর ব্যাপার। তুমি সইফুন ছবি এলে বরং তার কাছ থেকে জেনে নিও।

"আচ্ছা ভাই", আবু তালেব বললেন "অ্যাখন উঠি। প্রেসে যাতি হবে।"

শফিকুলের যেন ঘুম ভাঙল। আবু তালেব এখনও আছে। সে লজ্জিত হল।

আবু তালেবকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে সে নিজের চেয়ারে বসল। প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউনসিলের নির্বাচন এগিয়ে আসছে। খোনকার তাদের ওদিক থেকেই দাঁড়াচ্ছেন। তার বাজান খোনকারের বিরুদ্ধ দলে চলে গিয়েছেন। খোনকারকে সে ভাল চেনে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পেশাগতভাবে তাকেও খোনকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছে। প্রথম মামলাতেই খোনকার আর শফিকুলে লড়াই হয়েছে। এবং সে জিতেছে। মহামান্য হাইকোরট তার মক্কেলের আপীল মনজুর করেছেন। দিগম্বরের ভাষায় পচা শামুকে পা কেটেছেন খোনকার। ব্যক্তিগতভাবে খোনকার সম্পর্কে ভাল মন্দ কোনও ধারণাই তার নেই। নিশ্চয়ই খোনকারেরও তাই। কে এক শফিকুল মোল্লা কোন্ এক মামলায় তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তা হয়তো শহরের সব চাইতে কর্মব্যস্ত উকিলের আজ মনেও নেই। কিন্তু শফিকুলের সব মনে আছে। তাঁর অবজ্ঞাপূর্ণ চাহনী, তাঁর অহমিকা, কিছুই ভোলেনি শফিকুল। কেন? সে অভিজাত নয় বলে? সে নতুন উকিল বলে? খোনকার তাদের ওদিকেরই ক্যানডিডেট হলেন। এবং তাঁর জয়লাভের পথ প্রশস্ত করার জন্যই তার বাজানকে ডাকাতির কেস্-এ জড়িয়ে হাজত খাটাবার তোড়জোড় চলেছে। সাজ্জাদ মোড়লকে চেনেনও না খান বাহাদুর। সে যে শফিকুলের বাপ, তাও তিনি জানেন না। তথাপি শফিকুল আর তার বাপ সাজ্জাদ খোনকারের জয়যাত্রার পথে বিরক্তিকর বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কী? নিছক ঘটনাচক্র? কোথায় ছিল দাউদ, কোথায় ছিল শফিকুল আর কোথায় ছিল সইফুন? ঘটনাচক্রে শফিকুল সইফুনদের ভাড়াটে। ঘটনাচক্রে দাউদ খোনকারের ভাড়াটিয়া ঠিকেদার। শফিকুল যে ছবির খসম, তাও ঘটনাচক্রেরই ফল। তা হলে কী দাঁড়াল? দাউদ সইফুনের দিকে এগুচ্ছে। শফিকুল দাউদের অতীত জানে। সইফুন, সাবধান! কিন্তু সেদিন যখন দাউদ এসেছিল তার কাছে, তখন তাকে কি এক সরল এবং অনুতপ্ত লোক বলে শফিকুলের মনে হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছিল। শফিকুল স্বীকার করছে, সেদিন তার মনে দাউদের প্রতি সহানুভূতিরও সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আবু তালেব দাউদের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে দিলেন, সেটা তো এক ধূর্ত

মতলববাজের। অতি চতুরতার সঙ্গে যে শ্রেণীর লোক অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগোয়, বোঝা গেল দাউদ সেই শ্রেণীরই এক লোক। ওর মুখোস খুলে দেওয়া উচিত। সইফুন: খবরদার তুমি ও লোকটার সঙ্গে মিশো না। সইফুনের এ সর্বনাশ সে হতে দেবে না। শফিকুল বেশ উত্তেজিত বোধ করতে লাগল। যে করেই হোক দাউদের গ্রাস থেকে সইফুনকে বাঁচাতেই হবে।

শফিকুল চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। আব্বা, সইফুন, দাউদ, খোন্‌কার। খোন্‌কার, দাউদ, সইফুন, আব্বা। খোন্‌কার আব্বা দাউদ সইফুন খোন্‌কার আব্বা খোন্‌কার আব্বা। দাউদ সইফুন দাউদ সইফুন। তার প্রতিটি হৃদ্‌স্পন্দন যেন কথাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। খোন্‌কার আব্বা, দাউদ সইফুন। অস্থির হয়ে শফিকুল ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু দাউদ জয়নুদ্দিন মৌলবীর বাড়ির সঙ্গে মেলামেশা করছে, এতে ফটিক এত বিচলিত বোধ করছে কেন?

বিচলিত হয়ে উঠছি কেন? সেকটা দাউদ বলে। ওর পিছনের ইতিহাস জানি বলে।

কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজে যখন ওর সঙ্গে মাথামাখি করছেন তখন তোমার কী বলবার আছে?

বলবার আছে মানে! মৌলবী সাহেব কি জানেন, দাউদ কি চরিত্রের লোক? তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য নয়? বিশেষত দাউদ যখন ও বাড়িতে ঢুকেছে ছবির ভাই বলে পরিচয় দিয়ে. কিছু একটা ঘটে গেলে বদনাম তো ছবিরই হবে।

হ্যাঁ, তা হবে।

তবে? আমার কি উচিত নয় এই সরলপ্রাণ অতিথিবৎসল মৌলবী সাহেবকে সতর্ক করা?

কিন্তু মৌলবী সাহেব যদি উলটো বোঝেন? দেখনি কি দাউদ নানা ছুতোয় এই পরিবারটিকে কত ভাবে সাহায্য করছে? মৌলবী সাহেব সরল মনে সেগুলো গ্রহণ করছেন। বাবুকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। এতে এই অমিতব্যয়ী দরিদ্র পরিবারটির কত সুবিধে হয়েছে। দাউদ কথা দিয়েছে মৌলবী সাহেবকে বাবুকে সে ঠিকেদারির কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। তারপর বাবুর বয়েস বাড়লে তাকে আলাদাভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আর বাবু তো এখন থেকেই রোজগার শুরু করেছে। মৌলবী সাহেবের আর্থিক সাশ্রয় খানিকটা হয়েছে।

কিন্তু দাউদ কি এ কাজ বিনা মতলবে করছে?

যে মতলবেই করে থাকুক, মৌলবী সাহেব যে দাউদের উপর খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, সেটা তো তুমি অস্বীকার করতে পার না?

ওটা তো দাউদের শয়তানী।

এটা যে শয়তানী, তুমি মৌলবী সাহেবকে বোঝাবে কী করে?

বোঝাবো কী করে?

শফিকুল এতক্ষণে যেন একটা ধাক্কা খেল।

দাউদের মতলব যে সত্যিই খারাপ এটা বোঝাবো কী করে?

শফিকুল অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরতে লাগল। সত্যিই তো, ব্যাপারটা ওর নিজের কাছেই আজগুবি বলে মনে হল এখন। আমি কষ্টে আছি। একটা লোক এসে আমার ছেলেকে একটা কাজে লাগিয়ে দিল। নানাভাবে সে আমার উপকার করতে লাগল। তখন কেউ যদি এসে বলে, মিঞা ও লোকটা সুবিধের নয়। ওর মতলব খারাপ। তা সে কথা কি আমিই বিশ্বাস করতাম।

মৌলবী জয়নুদ্দিনের চোখে দাউদ সাচ্চা মুসলমানই শুধু নয়, সে মদিনার আনসার প্রতিম। একদিন মৌলবী সাহেব এসে বললেন, উকিল সাহেব, আপনারে আর কী কব, আমার ছবি বিটির ভাই, দাউদ মিঞার মত লোক আর হয় না। ওর দেলটা যে কত দরাজ তা আর কতি পারব না। আমার বাবুডারে কাজে লাগাইছে, জানেন তো। তা দ্যাখেন ওর আক্কেল। বাবুর ঘুরাঘুরি করতি কষ্ট হবে বলে তারে নতুন অ্যাকটা ব্যালে সাইকেল কিনে দেছে। আমি কলাম, ইডা কি ক'রলে বাপ, অ্যাক কাঁড়ি টাকা ফালতু খরচ ক'রলে! তা দাউদ ক'লো কি জানেন, বাবু আমার ছোট ভাই. ওর কাজের সুবিধে হবে ব'লে সাইকেল কিনে দিছি। এ খরচ ফালতু হবে ক্যান্? দ্যাখেন উকিল সাহেব আমার অ্যাতখানি বয়েস হল, মুসলমানের এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ইডা এই দাউদ ছাড়া আর কারু মধ্যি প্রকাশ পাতি দ্যাখলাম না। আল্লার প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-ছাল্লাম অ্যাকদিন মক্কাবাসী মোহাজের আর মদিনাবাসী আনছারগের ডাকে কলেন, শোন মদিনাবাসী আনছারগণ, শোন মক্কাবাসী মোহাজেরগণ ইসলামের আদর্শ প্রেত্যেক মুসলমান প্রেত্যেক মুসলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে তুমরা জুড়ায় জুড়ায় ভাই বনে যাও। প্রেত্যেকেই অন্যের মধ্যির থে অ্যাকজন ভাই বা'ছে ন্যাও। হজরতের কথা শুনা মাত্তর সপাই নিজির পছন্দ মত ভাই বা'ছে নিল আর প্রেত্যেকেই নিজির ধন দৌলত তার ধম্ম ভাইরি সমানভাবে ভাগ ক'রে দিল। এই হ'ল মুসলমানের আদর্শ। মদিনাবাসী সাদ ইবনে রাবী ছেলেন আনছার। তিনি আবদুর রহমান নামে একজন মোহাজেররে ভাই বলে গ্রহণ করিছিলেন। তাঁর ছিল দুই বিবি। তিনি তাঁর অ্যাক বিবিরি আপসে তালাক দিয়ে তাঁর ভাই আবদুর রহমানের সঙ্গে নিকে পড়ায়ে দিছিলেন। এই হ'ল মুসলমান। এই রকম ভ্রাতৃভাব যতদিন ছিল ততদিন মুসলমান উঠিছে। আমার ছবি বিটি ষ্যামন, তার ভাই দাউদও ত্যামন।

সাচ্চা মুসলমান। তার মধ্যে এই ভাবটা পুরো মাত্রায় আছে। আবেগে মৌলবী জয়নুদ্দিনের চোখ ছলছল করে উঠল।

শফিকুল পাইচারি করতে করতে ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, মৌলবী জয়নুদ্দিনের কাছে দাউদের নামে কিছু বলা কতটা অর্থহীন। সে ছটফট করতে লাগল।

তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

বিচলিত হব না! দাউদের মতলব টের পাবার পরও বিচলিত হব না! জানো, রাস্কেল্টার মতলব?

হ্যাঁ। সইফুন।

এই মেয়েটার সর্বনাশ করবার ফিকিরে দাউদ এখন এইভাবে জাল বিস্তার করেছে। সে বিষয়ে মৌলবী সাহেবকে কি সাবধান করে দেওয়া উচিত নয়?

মৌলবী সাহেবকে কী বলবে?

মৌলবী সাহেবকে?

থমকে গেল শফিকুল। তাই তো, কী বলবে মৌলবী সাহেবকে?

বলব কি, মৌলবী সাহেব আপনি দাউদকে যা ভাবছেন সে তা নয়। আপনি ভাবছেন, দাউদ ফেরেশ্তা, আসলে সে কিন্তু শয়তান।

ক্যান্, আপনি এ কথা কতিছেন ক্যান্?

মৌলবী সাহেবের এই প্রশ্নের জবাবে, সে কী বলবে?

বলবে যে দাউদের অতীত খুব খারাপ? এ তো চুক্লি খাওয়ার মত শোনাচ্ছে। কী প্রমাণ তার হাতে আছে? তার বিবি? তার শ্বশুর? এদের সে জড়াবে? শফিকুলের মন সাড়া দিল না। তবে? শুধু তার মুখের কথা? কিন্তু মৌলবী সাহেব তার কথা বিশ্বাস করতে যদি দ্বিধাগ্রস্ত হন?

ছি ছি। না, সে নিজেকে এখানে নামিয়ে আনতে পারবে না।

তাহলে সইফুনের সর্বনাশ হবে আর সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখবে?

না, সে সইফুনের সর্বনাশ হতে দেবে না। সে বরং তাকেই কথাটা বলবে। হ্যাঁ, সেই ভালো। সইফুন তার কথা অবিশ্বাস করবে না। নিশ্চয়ই না। কিন্তু কোথায় সইফুন। আজ তিন মাসের উপর তার সঙ্গে দেখাই হয়নি। শফিকুলই তো এড়িয়ে গিয়েছে তাকে। হঠাৎ সেই উষ্ণ সন্ধ্যাটা মূর্ত হয়ে উঠল। এক লহমার জন্য সইফুন এসে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। তারপরই স্মৃতিটা মিলিয়ে গেল।

সে তবে এই! সে তবে এই! তীব্র অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে শফিকুল ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। সইফুনকে কে অধিকার করবে? সে না দাউদ? এখন এইখানে সে এনে ফেলেছে নিজেকে! তাই তার দাউদের উপর এত রাগ? তাই দাউদকে সে সরাতে চায়? না না। দাউদ খারাপ, দাউদ খারাপ। আমি সইফুনের ভাল চাই, ভাল চাই। সইফুন সইফুন! একটা অপ্রতিরোধ্য তৃষ্ণা জাগ্রত হয়ে শফিকুলকে কাতর করে তুলতে লাগল।

॥ ৩ ॥

কেন এত আসে লোকটা? তার জন্য। সইফুন বোঝে। কেন দাউদ এলে তার সরে পড়তে ইচ্ছে হয়, কেন তাকে ভাল লাগে না, সইফুন সেটা বুঝতে পারে না। অথচ লোকটা, দাউদ যার নাম, ছবি-বুর যে ভাই, তার সঙ্গ পাবার জন্য কত কী না করে! দূর থেকে সইফুন দেখে, খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। লোকটা তাদের বাড়ির দরজায় এসেই সাইকেলের ঘণ্টি বাজায়। তার চোখ দুটো সারা বাড়িটার উপর যেন বাতির মত ঘোরে। কী এক আশায় তার চোখ মুখ জ্বলতে থাকে। ফর্সা মুখটা টকটকে হয়ে ওঠে। সব দেখে সইফুন। এও দেখে তার ভাইবোনেরা ঘণ্টি শুনে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তাকে ঘিরে কলরব করে। দাউদ তাদের কাছে মস্ত আকর্ষণ। অবাধে তারা তার কোলে পিঠে কাঁধে চাপে। দাউদ তাদের কোনো দিন বিসকুট, কোনোদিন বা লবেনচুষ খাওয়ায়। সন্দেহ নেই দাউদ সইফুনদের পরিবারে একঘেয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্য এনেছে।

তাদের সারকাস দেখিয়েছে একবার, ম্যাজিক দেখাতে নিয়ে গিয়েছে দুবার। বাবুকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে দাউদ। একটা নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে। আব্বু তো দাউদ বলতে অজ্ঞান, বাবু এবং তার অন্য ভাইবোনেরাও দাউদ ভাই ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না। এমন কি তার আম্মা, যে অত লাজুক, আশ্চর্য ক্ষমতা দাউদের, সে আম্মাকেও খালা খালা বলে বশ করে নিয়েছে। কেন? সইফুন জানে, কেন। এমন কি তার সন্দেহ, আম্মাও সে কথা জানে। বুঝতে বাকি নেই তার। দাউদ সইফুনকে পেতে চায়। আম্মার ভাবগতিক দেখে মনে হয়, তার বিশেষ আপত্তিও নেই।

আপত্তি সাইফুনের। আগে সে একদম বের হত না দাউদের সামনে। কথা কইত না। এখন বের হয়। কথাবার্তাও বলে। কিন্তু তার ভাল লাগে না। লোকটার সান্নিধ্যই তাকে কুঁকড়ে

দেয়।

অথচ দাউদের চেহারা ভাল। একটা দিলখোলা ভাব আছে। কিন্তু যেটা সইফুনকে সরিয়ে দেয় তা হল লোকটার চাহনী। ক্বচিৎ চোখে চোখ পড়লে সইফুন তার মধ্যে একটা প্রচন্ড ক্ষুধা দেখতে পায়। যা সইফুনকে ভয় পাইয়ে দেয়। তখন তার মনে হতে থাকে লোকটাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিলেই সে এক হ্যাঁচকায় তাকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে যাবে। আর তখনই সইফুনের দাউদের কাছ থেকে সরে পড়তে ইচ্ছে হয়। ফলে হয় কি, যে সময় দাউদ তার সঙ্গ বেশী করে চায়, ঠিক সেই সময়েই সইফুনের অস্বস্তি বেড়ে যায়। সে কোনও না কোনও অছিলায় দাউদের সামনে থেকে সরে পড়ে।

কিন্তু কেন তার এত অস্বস্তি হয় দাউদকে দেখলে? কেন সে ভয় পায়? অথচ দিন দিন দাউদের মনোভাব পরিষ্কার হয়ে উঠছে। দাউদ ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠেছে। আর ততই সইফুনের মনে আশঙ্কার এক কালো মেঘ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে আছে সে। ঘুম আর আসতে চায় না।

সইফুন আমি তুমারে সুখি রাখব। অন্ধকারে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল। দাউদের মনে হল ঠিক তার মশারির উপর। খোনকার আমারে যে কাজডা দেছেন তাতে আমি কিছু পয়সা করতি পারব। লাভের টাকার থে ওভারশিয়ার, সাব-ওভারশিয়ারগের দস্তুরি বাবদ যদি পাঁচ পারছেন্টও ছাড়ে দিই, তালিউ যা লাভ আমার থাকবে তাতে যশোরে আমি অ্যাকখান কুঠা-বাড়ি বানায়ে ফেলতি পারি। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যি খোন্‌কার আমারে স্পেশাল রেট্‌ করায়ে দেছেন। যতটা কাজ হইছে তা তিনি নিজেই ইনস্‌পেকশন করিছেন। আমি কাজের ছাইটি পাঁচখানা দশখানা গিরামের মোড়ল মাতব্বরগের আনে জুগাড় ক'রে রাখিছি। খোন্‌কার যে ছাইটিই গেছেন সেখেনেই যায়ে দেখিছেন যে মোড়ল মাতব্বরা তাঁর জন্যি অপেক্ষা কত্তিছে। তিনিই সকলের আগে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে আগোয়ে গেছেন। তিনিই আগে ওগের হাতে হাত রাখে মোসফাহ্‌ করিছেন। এতবড় একজন আশরাফ তাগের সংগে অ্যামনভাবে মিশিছেন বলে মোড়ল মাতব্বররা গলে জল হয়ে গেছে। আমি সংগে সংগে ওগের হয়ে খোনকারের কাছে আরজি পেশ করে কইছি, হুজুর আমরা গিরামের লোক অ্যাক পাশে পড়ে থাকি। কেউ আমাগের মানুষ বলে গিরাহ্যি করে না। কেউ আসে ভুলুক দিয়েও দ্যাখে না যে আমরা বাঁচে আছি না নেই? হুজুরির মত লোক এই পেরথম আলেন। তা আপনিই আমাগের ধরতি গেলি মা বাপ। আপনার কাছে অ্যাকটা আরজি পেশ কত্তিছি। আপনি যে আলেন এই কথাডা মনে রাখার জন্যি আমরা অ্যাকটা মিলাদ কত্তি চাই। তার খরচটা কিন্তু হুজুররি দিতি হবে। না বললি শোনবো না। খোন্‌কার তক্ষুনি রাজি হয়ে নগদ টাকা মোড়লগের হাতে তুলে দেন। আমার এই কাজে খোন্‌কার খুব খুশি। এই সব মিলাদে যে-সব মৌলবী আসতিছেন, সইফুন, সবাই কতিছেন, কওমের খেদমতের জন্যি আল্লাহই খোন্‌কাররে মনোনীত করিছেন। এমন শরিফ মুসলমানরে ভোট দিয়ে আরউ উঁচু জায়গায় পাঠালি মুসলমানগের লাভ আরও হবে।

তুমারে আমি কোনও কষ্ট দেব না সইফুন। আমি তুমার জন্যি কুঠা বানাবো। আল্লার বরকতে পয়সার কোনও অভাব হবে না। ইটির ভাঁটা যে-সব করিছি, তাতে খুব ভাল ইট হইছে। রাস্তার কাজে অত ভাল ইট দিলি লোকসান। ডিসট্রিক্ট বোরডের রাস্তার জান বড় জোর তিন মাস। না হলি প্যাচ্‌ রিপেয়ারের কাজ বেরোবে কন্‌ থে? আর আমরাই বা কাজ পাব কনে? ভাল ইট তাই সব বেচে দিচ্ছি। পয়সা আসতিছে বেশ। তুমার কোনও অভাব রাখব না সইফুন'

তার কী অধিকার আছে সইফুনের ভাল মন্দ নিয়ে কথা কইবার? এটা একেবারেই অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নয় কি? এবং অনধিকার চর্চা? শফিকুল নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে তার নিজের কাছেই প্রশ্নগুলোকে ছুঁড়ে মারল। দাউদ যদি সইফুনের সংগে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্যই মৌলবী জয়নুদ্দিনের বাড়িতে যাতায়াত করে থাকে তাতে শফিকুলের কী? বার বার সে নিজেকে এই প্রশ্ন করছে কিন্তু তাতে সে শান্ত হচ্ছে না। তার অশান্তি বেড়েই চলেছে। এবং সেই সংগে মনে একটা তীব্র জ্বালা।

দাউদ লোক ভাল নয়। আপনারা ওকে এখন যেমন দেখছেন মৌলবী সাহেব, ও কিন্তু আদৌ তেমন নয়।

ক্যান্‌, দাউদ দোষডা করল কী? যদি জয়নুদ্দিন ওকে সরাসরি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন?

দাউদ দুশ্চরিত্র। এই কথাটা বলতে পারবে শফিকুল? না, পারবে না। তার পক্ষে বিনা প্রমাণে কারোর বিরুদ্ধে এ কথা বলা সম্ভব নয়।

আপনারেউ তো আমি ভাল লোক বলে জানতাম। কিন্তু আপনি যে চুকলিখোর তা তো জানতাম না। যদি জয়নুদ্দিন এই কথা বলে বসেন, তাহলে আমার ডিফেন্‌স কী আছে? বলব,

আমি একথা শুনেছি? কিন্তু সেটা কি হিয়ারসের পর্যায়ে পড়বে না। শফিকুল উকিল। সে জানে হিয়ারসে ইজ নো এভিডেনস্। শোনা কথার সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না। জয়নুদ্দিনও যদি গ্রাহ্য না করেন তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

উকিল সাহেব, আপনি কলেন, দাউদ দুশ্চরিত্তির। আমি কচ্ছি দাউদ খাঁটি মুছলমান। খোন্কার ওরে নিজির ছেলের মত দ্যাখেন। আর তিনি আপনার মত পাতি উকিল না। বুঝিছেন?

কী বলবার থাকবে শফিকুলের?

দাউদ কী কত্তিছে জানেন? তা'লি শুনে রাখেন। যেখেনে যেখেনে ও রাস্তা মেরামতের কাজ কত্তিছে, সেখেনে সেখেনেই সে গিরামের বেকার মুসলমানগেরে ডা'কে ডা'কে কাজ দেছে। অবিশ্যি যতটা তার সাধ্যি। আজ পর্যন্ত আর কেউ ওর মতন কওমি খেদমত করিছে এই দিগরে? কন্? আপনার মুখির থে দাউদ সম্পক্কে অ্যামন কথা শোনবো, বিশেষ করে সে যখন আমার ছবি বিবির ভাই, ইডা আশা করিনি। ছিঃ। মুসলমান এই যে অন্য মুসলমানের ভাল দেখতি পারে না, এই করেই মুসলমানরা মত্তিছে।

এর জবাবে শফিকুলের কি কিছু বলার আছে? কিছু না।

তবে কি আমি চুপ করে থাকব? সব জেনেও, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে চেপে থাকব এবং তার সুযোগ নিয়ে দাউদ সইফুনকে হাতের মুঠোয় করে ফেলবে! শফিকুলের কলজেয় গরম শিক কে যেন ঢুকিয়ে দিল। সে না না বলে আর্তনাদ করে উঠল।

সইফুন দাউদ সম্পর্কে ওর মায়ের পরিবর্তন যত লক্ষ্য করছে, ততই শংকিত হয়ে উঠছে। সে লক্ষ্য করছে দাউদ এসে যেন তার মায়ের মনের সঞ্চিত স্নেহ ভাণ্ডারের চাবিটা হাতিয়ে নিয়েছে। মনুর জন্য এই চাপা স্বভাবের নারীর অন্তরে গোপনে যে সঞ্চয় জমে ছিল, কী আশ্চর্য কৌশলে দাউদ তার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। মনু একটা চাকরি পেল না বলে দেশে থাকতে পারেনি। তাকে সেই কোন্ বারমা মুলুকে চলে যেতে হল এই দুঃখু আম্মার দেলটাকে টুকরো করে দিয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে আম্মা কখনোই হা-হুতোশ করেনি। এমন কি মনু যেদিন চলে যায়, সেদিন আব্বাজান বরং হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন এবং খোন্কার সাহেবকে খুব গালমন্দ করছিলেন মনুকে চাকরি না দেবার জন্য কিন্তু আম্মাজান একেবারে চুপ। ধীর স্থিরভাবে কেবল মনুর ভালোর জন্য আল্লার কাছে দোওয়া মেগেছিল। তারপর আর সে সম্পর্কে কখনও কোনও কথা বলেনি। তারপর মনু যখন শাদীর কথা লিখল, এক বর্মী মেয়েকে শাদী করছে মনু, তাই নিয়ে আব্বাজান ভাল মন্দ কত কথা বললেন। আম্মা একেবারে চুপ। সইফুনের শাদীর ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত একটা কথাও আম্মা আব্বুকে বলেনি। আল্লা যা করেন তাই হবে। ইদানীং তার শরীরটা ভেঙে পড়ছে। ঘুষঘুষে জ্বর হয়। আম্মা কোনও ডাক্তার দেখাবে না। ডাক্তার বেগানা পুরুষ। আর আম্মা খাঁটি মুসলমানের বেটি, মুসলমানের বউ। কী করে ডাক্তারকে হাত ধরতে দেবে, জবান দেখাবে, বুক পিঠ পরীক্ষা করতে দেবে! না, তা হয় না। আম্মা ডাক্তারকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে না। খালি জল পড়া তেল পড়া আর তাবিজ কবজের উপর দিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে। টাকা লাগবার ভয়ে আব্বুও জোর করে না। বেচারি কোথায় পাবে টাকা।

এমন সময় এল দাউদ। আম্মাকে খালা বলল। জোর করে তার লজ্জা ভাঙাল। আম্মা যেন দাউদের মধ্যেই মনুকে পেল। আর তাজ্জব কাণ্ড করল দাউদ। জোর করে আম্মাকে সিবিল সার্জনের কাছে নিয়ে গেল দাউদ। ওষুধ পত্তর গাদা গাদা কিনে দিল। শুধু তাই নয়, তার খালা-আম্মা ওষুধ খাচ্ছে কিনা নিজে এসে তার তদারক করে যায়। লেডী ডাক্তার বাড়িতে নিয়ে আসে।

আম্মারও খুব দাউদের উপর টান। তাই আম্মা এখন সইফুনের উপর নজর দিতে শুরু করেছে। নিজের উপর কখনোই নজর দেয় না সইফুন। শুধু একটা সন্ধ্যায় একটু সাজসজ্জায় মন দিয়েছিল। ফটিক ভাইয়ের ধ্যান ভাঙবার জন্য। তা সেই সন্ধ্যাটা বিষ না অমৃত, আজও বুঝে উঠতে পারল না সইফুন। ইদানীং আম্মা ওকে কাছে নিয়ে বসায়। চুল আঁচড়ে খোঁপা বেঁধে দেয়। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু সইফুন জানে আম্মা যেদিন একটু বেশী যত্ন নেয়, সেইদিন দাউদ আসে। আর এইখানেই সইফুনের অস্বস্তি।

তুমারে আমি মাথায় করে রাখব সইফুন। তুমার জন্যি বাড়ি তোলবো। অনেক গয়না পরাবো। টাকা? টাকার জন্যি ভাবে না। আমি অনেক টাকা রোজগার করব। আমার অনেক টাকা হবে সইফুন। তুমি ওর জন্যি ভাবে না। আমি এখন কী করে টাকা রোজগার কত্তি হয়, সিডা শিখে গিছি। টাকা করার জন্যি ল্যাখাপড়া শিখার কোনও দরকারই লাগে না। কী লাগে জানো? মুরুব্বির জোর অর্থাৎ তদবীর আর তকদীর আর হিম্মত। তা এই তিনই আমার আছে সইফুন। ইবারের ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের কামডা তুলে ফেলতি পারলিই আমার হাতে কিছু টাকা জমে

যাবে। তুমি যদি চাও তাই দিয়ে তুমার জন্যি আমি এই শহরেই অ্যাকটা মনজিল গড়ায়ে দিতি পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ঐ টাকায় ইবার পি ডাবলিউ ডির অ্যাকটা বড় কাজ করি। খোন্‌কার কয়েছেন, ইবারের ইলেকশনে মুসলমানরাই জেতবে। তাই মুসলমানরাই মন্ত্রী হবে। তাহলি সইফুন আমাগেরই সুবিধে। বড় বড় কাজ পাতি তখন অনেক সুবিধে পাবো আমরা।

তা অ্যাখন তুমার কী ইচ্ছে তাই কও? দাউদ সেই গভীর রাতের অন্ধকারে সইফুনকে সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল। তুমার যা ইচ্ছে তাই হবে সইফুন। তুমি যা বলবা তাই করব। অ্যাতদিন নিজির ইচ্ছেয় চলিছি, আর না। ইবার নিজিরি আর কারউ হাতে ছাড়ে দিতি চাই। সে আমারে চালাক। সে আমারে ভালোবাসুক। তুমি আমারে নিবা সইফুন? তুমি আমার ভার নিবা?

আমি লোক ভাল না? আমারে তুমার বিশ্বাস হয় না? তয় এত সরে থাকো ক্যান্? ক্যান্ অ্যাত সরে সরে থাকো? তুমার আব্বা আমারে ভালোবাসেন। আমার জীবনে আমি অনেক কিছু পাইছি কিন্তু খালা আম্মার মতন কারোরেই পাইনি। খালা আম্মা আমারে য্যামন ভালোবাসেন অ্যামন ভালবাসাউ কারু কাছ থে পাইনি। আমি তুমাগের বাড়ির মধ্যি খালা আম্মারেই সব চাইতি ভালোবাসি।

না না সইফুন না। তুমারে। বেশী ভালোবাসি বোধ হয় তুমারে। কিন্তু তুমি তো সইফুন পাথর। তুমি তো কোনও সাড়া দ্যাও না। আমারে এড়ায়ে যাও। তুমাগের বাড়ি গেলি সবাই আমার কাছে ভিড় করে আসে। কিন্তু তুমি অত তেজ দ্যাখাও ক্যান্? আমি তুমার কী করিছি সইফুন যে তুমি আমারে মানুষির মধ্যি গিরাহ্যি কর না? আমি যদি তুমার আব্বুরি কই, খালা আম্মারে কই, তালি অ্যাক দিনি তুমারে শাদী করে ফেলতে পারি। না না সইফুন। পারিনে। তুমি যদি নারাজ হও তয় আমার অ্যামন সাধ্যি নেই তুমারে শাদী করতি পারি? কিন্তু, তুমি আমার উপর অ্যাত নারাজ হতিছ ক্যান্?

আমার এ বিষয়ে কোনোই দায়িত্ব থাকত না, শফিকুল ভাবল, যদি দাউদ একেবারে অপরিচিত কেউ হত। যদি দাউদের সঙ্গে তার চেনা শোনা না থাকত। যদি দাউদ তার আত্মীয় না হত, ছবির ভাই বলে পরিচয় দেবার কোনও সুযোগ ওর না থাকত। কিন্তু দাউদ মৌলবী সাহেবের বাড়িতে প্রবেশই করেছে ছবির ভাই বলে। কাজেই ও যদি কোনও কেলেংকারী করে ফেলে তবে তার দায়িত্ব ছবি এবং শফিকুলের উপরও এসে পড়বে। ছবি তাকে পরে দুষতে পারে, তুমি তো ছিলে। তবে জেনে শুনে এই কেলেংকারী ঘটতে দিলে কেন? কী জবাব তখন দেবে শফিকুল? আবার কারোর সম্পর্কে হুট করে নালিশ করাটাও তার রুচিতে বাধে। তাকে এই রকম অস্বস্তিকর একটা অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য দাউদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল শফিকুল। তার ক্ষমতা থাকলে সে এই মুহূর্তে দাউদকে এই শহর থেকে বের করে দিত। কিন্তু তাও সম্ভব নয় শফিকুলের পক্ষে। এই শহরের যিনি সব চাইতে পরাক্রমশালী ব্যক্তি সেই খান খোন্দকার বজলুর রহমান বাহাদুরের সব চাইতে কাছের লোক হচ্ছে দাউদ। তাঁর একেবারে ডান হাত। সেই ঘটনাটাও শফিকুলকে দাউদের প্রতি বিমুখ করে তুলল। দাউদের মুরুব্বি খোন্দকার সাহেব! জোড়া মিলেছে ভাল।

হঠাৎ শফিকুলের মনে হল সে কত অসহায়। সে কত আশ্রয়হীন। এই শহরে সে আছে দাউদের চাইতে অনেক বেশী সময়। কিন্তু এই শহরে আজও সে আগন্তুক। সে মিশতে পারল না কারও সঙ্গে। কোনও প্রতিপত্তিশালীকে মুরুব্বি হিসেবে পাকড়াও করতে পারল না যাতে সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

অথচ দাউদকে দেখ। কী বা তার সম্বল? কিন্তু তাতে কী? সে এল অনেক পরে। মুরুব্বি হিসেবে যোগাড় করল খোন্দকারকে। তাঁর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সে দু পয়সা করে নিল। মৌলবী জয়নুদ্দিনের মুখে শুনেছে দাউদ এই শহরে বাড়ি তৈরি করার স্বপ্নও দেখছে। এবং এটা সত্যি যে, হাজী সাহেবের যে-টাকা নিয়ে দাউদ পালিয়েছিল, সেটা সে শোধ করে দিতে চেয়েছে। বাইতির টাকাও দিয়ে দেবে বলেছে। আর সে? শফিকুল মোল্লা বি এ বি এল? এখনও পর্যন্ত এই শহরে তার টিকে থাকার জামিনও কেউ নেই। কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। শ্বশুরের টাকায় সে ওকালতি করছে।

দাউদ সম্পর্কে ভালো মন্দ কিছু বলাই তার সাজে না। কারণ দাউদ সফলতা অর্জন করেছে। আর এই সাফল্যের কারণ, শফিকুল চুলচেরা বিচার করে দেখল দাউদের মূলধন। আর সেই মূলধন হল মুসলিম সমাজের প্রতি দাউদের শর্তহীন আনুগত্য এবং সেই আনুগত্য থেকে লাভ উঠিয়ে নেবার অপরিসীম ক্ষমতা। আর শফিকুল যেন একটা দোলক। কেবলই দুই দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরছে।

দাউদের বিরুদ্ধে তার কী বলার আছে? প্রশ্ন উঠল সইফুনের মনে। দাউদের চেহারা

ভালো। ওর ব্যবহার ভালো। অন্তত সইফুনের অভিযোগ করার কিছু নেই। দাউদ যেরকম তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল, সইফুন তা দেখে মনে মনে প্রমাদ গণেছিল। ভেবেছিল আববা, আম্মা, বাবু আর অন্য ভাইবোনেদের যেমন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে দাউদ, এবার তেমন তার দিকেই হাত বাড়াবে। এতখানি বয়েস হয়েছে সইফুনের কিন্তু পুরুষ সম্পর্কে এতদিন ওর মনে কোনও কৌতূহল জাগেনি। ফটিক ভাই এসেই ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে প্রথম ঝড় তুলল। ভালো কি মন্দ, কী করেছে তা সে জানে না তবে তার মনে মাঝে মাঝে ফটিকভাইএর বুকে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয। যে প্রবল তৃষ্ণায় অহরহ বুক ফেটে কাঠ হয়ে থাকে, ফটিকভাইএর বুকে মুখ গ'জে তার উপশম পেতে ইচ্ছে হয় তার। ফটিক ভাই! ফটিক ভাই! তুমি কী পাষাণ!

না, তার কথা আর ভাববে না সইফুন। ভাববে না! সে কি ইচ্ছে করে ভাবে? রাতে ঘুমুতে পারে না সইফুন। একটা তপ্ত শ্বাস, একটা স্পর্শ তার গায়ে ঠেকা মাত্র সে চমকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় তার। জ্বালা জ্বালা জ্বালা। তার দেলটা পুড়ে পুড়ে খাক হতে থাকে। সে পাগলের মত দৌড়ে চলে যেতে চায়, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ফটিকের বুকে। সে জানে শুধু ওখানেই সে তার জ্বালা জুড়োতে পারে। কিন্তু নিজেকে আটকে রাখে সইফুন। গভীর রাতে সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশীর ভাগ দিনই ফটিকের ঘর অন্ধকার। জানালা বন্ধ থাকে। কখনও জানালা খোলা অন্ধকার। কখনও ঘরে আলো জানালা খোলা। সেদিন আর ঘরে ফিরতে পা ওঠে না তার। ক্বচিৎ সে দেখে জানালা খোলা ঘরে আলো আর একটা লোক, লোকটার ছায়া বলাই ভালো, ভূতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্থির হয়ে। এইসব দিনে ভয় পেয়ে যায় সইফুন। থরথর শরীর নিয়ে দ্রুত ঘরে এসে ঢোকে। শক্ত করে খিল এ'টে দেয়। আর বিছানায় শুয়ে অসহ্য উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। এ রোগ, সে জানে, সারবার কোনও লক্ষণ নেই। বরং বাড়ছে দিনে দিনে।

দাউদ তার এ রোগের ওষুধ নয়, সে জেনে গিয়েছে। তবু আজকাল আম্মা যখন তার চুল বাঁধতে বসে, কাঁকই দিয়ে যত্ন করে জট ছাড়িয়ে দেয় তার দুর্বল হাতে, সেই হাতের স্পর্শে তখন, সইফুন বুঝতে পারে, কী কথা বলতে চাইছে। আম্মাজান যে আজ আবার খানিকটা খাড়া হয়েছে, সে তো দাউদের জন্যই। সে-ই জোর করে আম্মাকে ডাক্তারকে দেখিয়েছে। ওষুধ কিনে দিয়েছে। জোর করে ওষুধ খাওয়াতে শুরু করেছে। এই সূত্রেই দাউদের সঙ্গে তার কথাবার্তা চালু হয়েছে। এমন লোকের সঙ্গে কথা না বলে থাকা কি যায়? আম্মা যে খুশি, তা তার আঙুলগুলোই বলে দেয়। দাউদ তাকে চায়। কিন্তু সইফুন কী করবে? সে তো আর তার নয়। ফটিকের। ফটিকভাই ফটিকভাই তুমি কী পাষাণ! সইফুন হু হু করে কেঁদে ওঠে।

সইফুনরি না পালি আমার কী ক্ষেতি? মেয়ের কি অভাব আছে দেশে? ভাত ছড়ালি কাগের অভাব? এদেশে মুসলমানগের বিযের বাজারে অন্তত না! দাউদ অত্যন্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বলল। এতদিন হয়ে গেল, কিন্তু কই সইফুন তো তার দিকে একটুও ঢললো না। দাউদ আর সইফুনের মধ্যে যে দূরত্বটা ছিল, সেই ব্যবধান সে তো কমাতে পারল না। এখেনেই বড় চোট খায় দাউদ। পুরনো দাউদ মাথা চাড়া দিযে উঠতে চায়। বিশেষত সেইসব রাতে যখন তার বিছানার একদিকটা ফাঁকা পড়ে থাকে এবং শরীরে জাগে ক্ষুধা। তখন সে অস্থির হয়ে ওঠে। সইফুনকে মিনতি করে তার বিছানার সঙ্গী হবার। কিন্তু কোথায় সইফুন? এগিয়ে আসে কালোজিরে! দাউদ অস্থির হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় শূন্য বিছানায় শুয়ে কাটানোর চাইতে কঠিন আযাব আল্লার দুনিয়াতে আর নেই। সইফুন সইফুন! ফুটকিকেও সে কাতরভাবে ডাকে। কখনও সখনও ফুটকি আসে তার বিছানায়। সেই স্মৃতিকে উন্মাদের মত জড়িয়ে ধরে দাউদ প্রায় গোঙাতে থাকে, তুই আমারে অ্যাকটা সুযোগ দিলিনে ক্যান্ ফুটকি। তুই আর কদিন সবুর করলি নে ক্যান্। তোর কোনো অভাবই আমি রাখতাম না।

তারপর ধীরে ধীরে এই যন্ত্রণা যখন কমে আসে এবং দাউদ ক্লান্ত এবং হতাশ, তখন সে বিড়বিড় করে একটানা সাপের মন্ত্রের মত আউড়ে যায়—সইফুন সইফুন সইফুন।

এবং তারপর তার রাগ চড়তে থাকে। সইফুনরি না পালি আমার কী ক্ষেতি? ক্যান্? দেশে কি মেয়ের অভাব আছে? আমি দাউদ মিঞা অ্যাখন আর কারু মুখাপেক্ষী নই। নিজির রোজগারে করে খাই। দু একজন লোকরে পুষার ক্ষ্যামতাও আল্লা আমারে দ'রে দেছেন। খান বাহাদুর খোন্‌কার এই শহরের অ্যাকজন মাতব্বর। আজ তিনি আমার আপনার লোক। নিতান্ত ফ্যালনা নই আমি! তয়? তয় সইফুন আমারে পাত্তা দেয় না ক্যান্? অ্যাত সাহসই বা সে পায় কন্ খে? আজ যদি আমি মৌলবী সাহেবেরে আমার ইচ্ছের কথা জানাই তিনি খুশি হয়েই এ শাদীর ব্যাপারে আগোয়ে আসবেন। খালা আম্মাও খুশি হবেন, আমি জানি। কিন্তু সইফুন? সে কি খুশি হবে? এই কথাডা আমি কতি পারিনে। আমি ওরে বুঝতিই পারিনে। আল্লাহ্! সইফুন ছাড়া আর কাউরি শাদী করতি আমি পারব না।

দাউদের সঙ্গে নিজের তুলনা করল শফিকুল। দেখল সে কত পিছনে পড়ে আছে। দাউদ এই শহরে এসে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় সইফুনদের সে উপকারও করছে। বাবু মিঞাকে নিজের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে দাউদ। ফলে মৌলবী সাহেবের সত্যিই কিছু সাহায্য হচ্ছে। শফিকুলের এমন ক্ষমতা কি আছে? নেই। তার শিকড় কোথাও নেই। গভীর রাতে নাতি হবে শুনে চাঁদ বিবিকে যে কথা বলেছিল সাজ্জাদ, সে কথা হঠাৎ মনে পড়ল শফিকুলের। সে রাতেও তার এইরকম ঘুম আসছিল না। শফিকুল শুনল সাজ্জাদ বলছে প্যানপ্যানানি থামা দিন ঘুমোতি দে। নাতিন নাতিন তো কত্তিছস্, ও নাতিন কি এই ভিটেয় থাকবে। এ ভিটে হল চাষার আর যে আসতিছে তার বাপ হল উঁকিল। ভদ্দর লোকগেরই অ্যাকজন। যারা শহরে থাকে। শ্যাওলার মত ভাসে বেড়ায়। আমরা বাপদাদার ভিটের খুঁটোয় বাঁধা। আমাগের থে উরা কেরমেই দুরি সরে যাবে। নাতি নিয়ে আদর করাব আশা ছাড়। কথাটা খুবই কড়া। কিন্তু সত্য। সন্দেহই নেই যে শফিকুল ভাসছে, এবং এটাও তো ঠিক যে তার বাজান আর আম্মা মরে গেলে হয় ঐ ভিটে বিক্রি হয়ে যাবে আর না হয় সাজ্জাদ যা বলে, শিয়ালকাঁটার গাছ জন্মাবে।

সে ভাসছে, কিন্তু দাউদ নয়, দাউদের এখানে সহায় সম্বল জুটে গিয়েছে। সে মুসলিম লিগের একজন পৃষ্ঠপোষক, দাউদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি। আর সে? যে নিজেই এত দুর্বল সে অন্যকে রক্ষা করবে কী করে? সইফুনকে দাউদের খপ্পর থেকে সে বাঁচাবে কী করে? ছেলেমানুষের মত মৌলবী সাহেবের কাছে নালিশ জানিয়ে?

সে বলবে, মৌলবী সাহেব, দাউদকে বেশি পাত্তা দেবেন না।

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞেস করবেন, ক্যান্ কন তো?

সে বলবে, দাউদ সুবিধের লোক নয়।

মৌলবী সাহেব বলবেন, দাউদ সাচ্চা মুসলমান।

সে বলবে, দাউদ আপনাদের সর্বনাশ করতে পারে।

দাউদ আমাগের যে উপকার কত্তিছে তা আর বলে শেষ করা যায় না।

সইফুনকে দাউদের কাছ থেকে সাবধানে রাখবেন।

সইফুনরে আমি ঠিক করিছি দাউদের সঙ্গে শাদী দেবো।

না না না! দোহাই আপনার ও কাজও করবেন না!

আপনার এত মাথাব্যথা ক্যান্, কন্ তো!

তারপর? তারপর কী বলবে শফিকুল? তার কেন যে মাথাব্যথা সইফুন সম্পর্কে তা কি বলা যায়? না নিজেও ভাল করে জানে? সে শুধু এইটুকু জানে যে সইফুনের কোনও ক্ষতি হবার আশঙ্কা তাকে অস্থির করে তোলে।

দাউদ মিঞারে আমার ভয় করে। ক্যান্, জানিনে। দাউদ মিঞারে আমার ভয় করে। বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চাপছে সইফুন। আমি জানি আম্মা তুমার মনে কী আছে? আমি জানি বাজান আপনার মনে কী আছে? বাবু জামিলা এগের মনে কী আছে তাউ আমি জানি। দাউদ মিঞা। কিন্তু আমারে দাউদ মিঞার কাছে ঠেলে দিয়ে না। ওরে আমার ভয় করে। সেই পেরথম দিন আমি যখন ওরে দেখি ক্যামন করে য্যান্ আমার দিকি তাকাইছিল, আমি ওর চোখে একটা ঝিলিক দেখিছিলাম। সেই দিনির থেই ওরে আমি ভয় করি। যেদিন সকালে পেরথম আসে আমাগের বাড়ির দরজায় সাইকেলের ঘণ্টি বাজালো সেই তখনই আমার বুক কাঁপে উঠিছিলো। তখনই বুঝিছিলাম লোকটা আমার পাছ ছাড়বে না। একে একে বাজান, বাবু, জামিলা, কুট্টি, কুসি ছোট ভাই সবাই দাউদ মিঞার ভক্ত হয়ে উঠল। এমন কি আম্মাও। কী ক্ষ্যামতা দাউদ মিঞার, আম্মারে নিয়ে সারকাস ম্যাজিক দ্যাখায়ে আনিছে! সইফুন তারে অ্যাত ভয় পায়? সে জানে দাউদ মিঞা বশ করার কায়দা জানে। আগে সে দাউদের সামনে বেরই হত না। কথা কইত না। আজকাল কথা কতি হয় নাহলি ভালো দ্যাখায় না। কথা কই। ভালো লাগে না। দাউদ মিঞা চায় আমি ওর কাছে থাকি। কথা কই। তালি সে খুব খুশি হয়। আর দাউদ মিঞা খুশি হলি বাড়ির সকলেই খুশি হয়। কিন্তু আমি খুশি হতি পারিনে। লোকটার সামনে আমি আড়ষ্ট হয়ে পড়ি।

ফটিক ভাইর কাছে গেলি তো অ্যামন হয় না? তখন আর চলে আসতি ইচ্ছে করে না। ফটিক ভাইর কথা শুনতি ভালো লাগে। ওর সঙ্গে কথা কতি ভালো লাগে। অ্যামন কি ওর কাছে চুপ করে দাঁড়ায়ে থাকতিউ ভালো লাগে। ক্যান জানি নে? কিন্তু ফটিক ভাই আমার উপর নারাজ। আমারে অ্যাড়ায়ে অ্যাড়ায়ে চলে। আমি সব বুঝি। ক্যান্ আল্লা ক্যান্ আমার অ্যামন হল? যে আমারে চায় না তারই দিকে আমার দেলডা গড়ায় আর যে আমারে চায় তার দিক থেই মুখ ফিরোয়ে ন্যায়। আমি অ্যাখন করি কী?

আমি কি ছবি-বুর চাইতি খারাপ দেখতি? কাজ কামে কম? তয়? ফটিকভাই আমারে অ্যাড়ায়ে যায় ক্যান্ আর সে যত অ্যাড়ায়ে যায় ততই আমার দেল তারই পিছনে ছোটে ক্যান্?

আল্লা! তুমি আমারে মেহেরবানি কর। আমি যা চাই, আমারে তা পাওয়ায়ে দ্যাও। দুহাই তুমার। এ যন্তন্না আর সহ্য কাত্তি পাত্তিছি না। দাউদ মিঞা খারাপ লোক তা আমার মনে হয় না কিন্তু আমার ওরে ভয় করে। আমি ওরে চাইনে। আমি আমি ফটিকভাইরি চাই।

অসহ্য যন্ত্রণাবোধের মধ্যে সইফুন গভীর রাত্রিতে আল্লার দরবারে তার আরজি পেশ করল এবং বোধ করল তার যন্ত্রণা খানিকটা কমল। সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৪ ॥

সত্য বলতে কি ফটিক কেমন যেন এক ধরনের বিষণ্ণতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে প্রচন্ড উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, সে তার শরিক হতে পারছে না। মনের গভীরে কে যেন তাকে খুঁটোয় বেঁধে দিয়েছে। যেন একটু এগুতে গেলেই টান পড়ছে দড়িতে। ফলে তার ভূমিকাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিছক তার্কিকের। সে যেন শুধু পেশাদার সমালোচক হয়ে উঠেছে। বার অ্যাসোসিয়েশনে মুসলমান উকিলদের দিয়ে খান বাহাদুর বজলুর রহমান চেয়েছিলেন একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে। সেটা হবে একটা আবেদনের মত। যাতে বলা হবে খোন্দকার লিগ ক্যানডিডেট অতএব তিনিই মুসলিম সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। শফিকুল প্রচন্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, লিগ বাংলা দেশে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং লিগের কোনও অর্থনৈতিক কর্মসূচীও নেই এবং লিগের নেতৃত্ব কলকাতার কয়েকজন অবাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী এবং বাংলা দেশের জমিদার ও ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ নবাব নাইট স্যার আর খান বাহাদুর খান সাহেবদেরই মুঠোর মধ্যে। তাই লিগ বাংলার গরিব মুসলমান কৃষক প্রজার বা মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাংলার চাষী খাতক, শ্রমিক ও গরিব চাকুরিজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীরা লিগকে এবং তার ক্যানডিডেটকে তাদের প্রতিনিধি বলে মানতে পারে না।

খালেকুজ্জমান ব্যক্তিগতভাবে শফিকুলের মতই খোন্দকারের প্রতি বিরূপ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সে খোন্দকারকে যেহেতু তিনি লিগের ক্যানডিডেট সেই কারণেই তাঁকে সমর্থন করা মুসলমানের কর্তব্য বলে মেনে নিল। তার মতে মুসলিম জাহানের সংহতি ও উন্নতি একমাত্র লিগের দ্বারাই হতে পারে। কারণ লিগ হল নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। আর যদি মুসলমান সমাজকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করতে হয় তবে সে লড়াই করতে হবে ভারত জুড়ে। এবং তার জন্য একটা মজবুত পলিটিক্যাল হাতিয়ার মুসলমানদের চাই। লিগই সেই হাতিয়ার। যেমন কংগ্রেস হিন্দুদের। শফিকুল প্রচন্ড বিরোধিতা করায় খোন্দকারের লোকেরা প্রস্তাবটা বার অ্যাসোসিয়েশনে তুলল না। কেননা তরুণ মুসলমান উকিলদের বেশ কিছু সমর্থন শফিকুল পেয়ে গেল। ফলে খালেক শফিকুলের উপর রেগেই গেল। এতে শফিকুল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। খালেক আর সে প্রায় একবয়সী এবং সে পড়াশুনা করে। তাই যদিও খালেকেব মতামত সব সময় তার কাছে গ্রহণীয় হত না তবু তাকে শফিকুল পছন্দই করত।

খালেকুজ্জমান বলেছিল, এই কাজডা আপনি ভাল করলেন না। আমাগের মুছলমানগেব মধ্যি কডা লেখাপড়া জানা লোক আছে যে আপনার ইকনমিক প্ল্যান বোঝবে? ওর মানে বুঝার লোক কডা আছে কন? শফিকুল বলেছিল, ইকনমিক প্রোগ্রাম এই ইংরাজী কথাটার মানে? না, কৃষক খাতক প্রজাদের যেহেতু কেউই ইংরাজী পড়েনি, তাই তাদের কেউই এই কথাটার মানে বুঝতে পরবে না। বরং ইসপাহানী আদমজী, ফারুকী, গজনভী, খাজা নাজিমুদ্দিন, এমন কি আমাদের খোন্দকার সাহেবরাই একথার মানেটা যে বুঝবেন সেকথা আমি জানি।

খালেকুজ্জমান বলেছিল, জানেন যদি তাহলি ঐ ফালতু সওয়ালডা তোললেন ক্যান?

তুললাম এই জন্য, শফিকুল জবাব দিয়েছিল, আমাদের চাষী খাতকেরা ইংরেজীর মানে জানে না বটে, কিন্তু তারা যে ডাল ভাতের সমস্যায় পীড়িত, সেই ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবে বোঝে। সওয়ালটা এই জন্য তুলতে হল। খোনকারের এই সমস্যার সমাধানে কোনও বক্তব্য নেই। অথচ যে মুসলমান সমাজের ভোট খোনকাররা কুড়োতে যাচ্ছেন সেই সমাজে শতকরা নব্বই জনেরই ভাত কাপড় জোটে না। কাজেই ভোট দেবার আগে জেনে নেওয়া ভাল খোনকারদের এই ব্যাপারে কী দাওয়াই বাতলাবার আছে।

খালেকুজ্জমান বলেছিল, আমরা যে শত্রুবেষ্টিত সে কথা ভুলে যাচ্ছেন ক্যান্? আজ কাগের জন্যি বাংলার মুসলমানগের এই দুর্দশা? হিঁদুগের জন্যি। হিঁদুগের আধিপত্য খতম না কাত্তি পারলি মুসলমান ওঠবে কী করে? এই হিঁদু আধিপত্য খতম করার জন্যি চাই মুসলিম ইউনিটি। ইডা মানেন তো?

না। স্পষ্ট করে বলেছিল শফিকুল। না মানিনে। মুসলমান জমিদার আর মুসলমান প্রজার ইউনিটিতে প্রজার কোনোই লাভ নেই। আর তাছাড়া হিন্দুদের জনাই মুসলমানদের এই দুর্দশা এই কথাও সর্বাংশে সত্য নয়।

শফিকুল মুসলিম ইউনিটির কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারছে না। এই কথাটির কোনও

আবেদনই তার মনকে স্পর্শ করতে পারছে না।

খালেক শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে বলেছিল, আপনার এই মনোভাব হিন্দু স্বার্থেরই সহায়ক হবে।

কথাটায় সে দুঃখ পেয়েছিল। কারণ খালেকের মত শিক্ষিত লোককেও সে বোঝাতে পারেনি যে, যে মুসলিম ইনটারেসটের কথা খালেক ভাবছে, তা শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত এবং সুবিধাভোগী মুসলমানের স্বার্থরক্ষার কথা। তাদের স্বার্থ শুধু চাকরি এবং পলিটিক্যাল ক্ষমতার হিস্যা বেঁটে নেওয়া। আর শফিকুল ভাবছে সামগ্রিকভাবে দেশটার কথা, যেখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শতকরা আশি নব্বুই জনেরই হাঁড়ি চড়ে না, যাদের পরনে ট্যানা জোটে না এবং যারা ভুগছে নানাবিধ রোগে। এদের জন্য কোনও ব্যবস্থা হবে না। শুধু মুসলিম ইউনিটির ধুয়ো তুললেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হবে। শফিকুল একথা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ নিতান্তই যুক্তিহীন কথা এটা।

এর চাইতে কৃষক প্রজা দলের কথাবার্তা তার কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয়। কিন্তু সেখানেও সংশয় উঁকি মারে। এ দলের নেতৃত্বেও উপস্বত্বভোগীদের ভিড় কম নয়। যদিও প্রজার স্বার্থরক্ষাই এই দল নিজের আদর্শ বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু নেতাদের মধ্যে প্রজা কোথায়? অধিকাংশই হয় জোতদার, নয় উকিল মোক্তার। অর্থাৎ তার মতই উপস্বত্বভোগী। এদের হাতে কৃষক খাতকদের স্বার্থ সত্যই নিরাপদ তো? এই প্রশ্ন উঁকি মারে তার মনে।

আবু তালেব বলেছিল, আপনারে নিয়ে মুশকিল কি জানেন, আপনি গাছে না উঠতিই এক কাঁদির খোয়াব দেখেন। ধাপে ধাপে না আগোয়ে আমাগের উপায় কী? আমরা জানি আমাগের উঁচু মহলে এমন কিছু লোক আছেন যাগের স্বার্থ আর চাষী খাতকগের স্বার্থ এক নয়। সুমায় আলি তাগের ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু আবু তালেব যত উৎসাহভরে এই কথা উচ্চারণ করে শফিকুল ততটা আগ্রহ নিয়ে এই কথাটা গ্রহণ করতে পারে না। কোথাও সে ভিড়তে পারে না। এককালে কংগ্রেসকে সে মনে করত হীরে। কিন্তু সেটা যে হীরে নয় কাঁচ এ উপলব্ধি যেদিন তার হল, সেদিনের মানসিক যন্ত্রণা সে ভুলতে পারে না। একটা ঘটনা তো মর্মান্তিক। এক সময় মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি তুলেছিল। সেই সময় হিন্দু মুসলমানের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার একটা চেষ্টা নেহরু কমিটি করছিলেন। এই মীমাংসার সময় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি পরিত্যাগ করবেন, আপস নিষ্পত্তির আলোচনার শুরুতেই একথা মুসলমানদের স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিতরকার সত্য হচ্ছে এই যে তাতে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের প্রেম ও আস্থার অভাব যে আছে সে কথাটা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

শফিকুলের তরুণ মন এই যুক্তির সারবত্তা সেদিন স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেনি। এবং মিঃ জিন্না, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতারা এই শর্ত স্বীকার করে নিয়েছেন, এই সংবাদ কাগজে পড়ে শফিকুল সেদিন কী খুশিই না হয়েছিল। মিশ্র নির্বাচন বা যুক্ত নির্বাচন স্বীকার করে নেবার পর এই মুসলিম নেতারা বলেছিলেন, যদি প্রাপ্তবয়স্কমাত্রকেই ভোটাধিকার দানের কথা হয়, তাহলে আমাদের আর কোনও কথা নেই। কিন্তু কোনও কারণে তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুধু বাংলা আর পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা এতে ঘোর আপত্তি তুললেন। তাঁদের বক্তব্য, আসন সংরক্ষণের দাবির ভিতর, এমন কি তা নির্দিষ্টকালের জন্য হলেও, স্বতন্ত্র নির্বাচনের বিষধর বীজাণুগুলি সমানভাবে লুকিয়ে আছে, সুতরাং জাতীয়তার উচ্চ ও মহান আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা মুসলমানদের এই প্রস্তাবটাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। শফিকুল এই কথাও মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেস সাময়িক সুবিধার জন্য তো আর আদর্শ ছাড়তে পারে না। কিন্তু সেই কংগ্রেসই আবার যেদিন তপসিলী হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিকে চিরকালের জন্য মেনে নিয়ে 'জাতীয়তার উচ্চ ভাব ও মহান আদর্শ'কে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না, সেদিন শফিকুল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মনে হল এই দুনিয়ায় তার বুঝি আর দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই। কংগ্রেস, তার কংগ্রেস এই করল!

তপসিলী হিন্দুদের হাতে রাখার জন্য যে নির্বাচন পদ্ধতি কংগ্রেস চিরকালের জন্য মেনে নিতে দ্বিধা করল না, তাহলে মুসলমানদেব ক্ষেত্রে মহম্মদ আলির সুপারিশ কংগ্রেস গ্রহণ করল না কেন? এ প্রস্তাব তো বরং অনেক ভালো ছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আলি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে অনুরূপ প্রস্তাবই তো গ্রহণ করতে বলেছিলেন কংগ্রেসকে, এবং তাও "নির্দিষ্টকালের জন্য" অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চালু হচ্ছে, সেই পর্যন্ত। তখন কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করল কেন? শফিকুল আজও তার কোনও যুক্তি খুঁজে পায় না। মোহাম্মদ আলির প্রস্তাব ছিল যুক্ত নির্বাচনের মধ্যবর্তিতায় এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক, যাতে হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থীরা নিজ সম্প্রদায়ের ও অন্য সম্প্রদায়ের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট রেকর্ড করাতে বাধ্য হবেন। তপসিলী হিন্দুরা হিন্দু ব্যবস্থাপক সভার

প্রত্যেক আসনের জন্য চারজন করে প্রার্থী প্রথমে নিজেরাই মনোনীত করবেন, তারপর যুক্ত নির্বাচনের দ্বারা তার মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা হবে।

শফিকুল আজও বুঝতে পারে না, মরহুম মোহাম্মদ আলির ফরমুলার সঙ্গে এই নীতির মূলগত প্রভেদ কোথায়? আর তা যদি নাই থাকবে তাহলে কেনই বা কংগ্রেস মোহাম্মদ আলির ফরমুলা প্রত্যাখ্যান করল? এ কি সুবিধাবাদী নীতি নয়? এবং অদূরদর্শিতা নয়? মুসলমানদের দাবিগুলো সম্পর্কে কংগ্রেস কি আরও বিচক্ষণতা আর বিবেচনাবোধ দেখাতে পারত না? নিশ্চয়ই পারত। তাহলে তো এত বিদ্বেষ সৃষ্টি হত না। কিন্তু পারল না কেন? সে কি কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের হৃদয় এবং বুদ্ধি সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বলে? এর ফলে কংগ্রেস কী পেল? কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের চির অবিশ্বাস। শফিকুল বুঝতে পারল কংগ্রেসের জাতীয়তার আবরণটা ভুয়ো। সেই কারণেই কংগ্রেসের কাছেও হিন্দু স্বার্থটাই দেশের স্বার্থ। শফিকুল দেখেছে অনেক নমস্য লোক আছেন কংগ্রেসে। পূতঃ চরিত্র, শুদ্ধ-বুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু কংগ্রেসে তাঁরা কোনঠাসা। তাঁদের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কংগ্রেস ছেড়েছিল শফিকুল। তারপর থেকে সে আর রাজনীতি করে না।

শফিকুল টের পাচ্ছে, কোথাও তার জায়গা নেই। কোনও কিছুই সে আঁকড়ে ধরতে পাবে না। কেন সে এমন? কেন মুসলিম সংহতির নারায় সে গলা মেলাতে পারে না? কেন সে বিশ্বাস করতে পারে না কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যবিত্ত নেতারা তাঁদের নির্বাচনী ওয়াদা সত্যই পূর্ণ করবেন? কংগ্রেস হিন্দু মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করবে তার এই বিশ্বাসটাও ভেঙে যাচ্ছে কেন? শুধু হিন্দু ইনটারেস্ট নয়, শফিকুল দেখে শঙ্কিত হচ্ছে, বাংলায় কংগ্রেস হিন্দু জমিদার মহাজনের স্বার্থ রক্ষার দিকেই দিনে দিনে ঝুঁকে পড়ছে। এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে কংগ্রেস ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। শফিকুল অসহায় বোধ করছে। শফিকুল যেন এক অতলস্পর্শী বিষণ্ণতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কোনও কিছুতেই উৎসাহ পাচ্ছে না। আজ মামলা ছিল না। তাই ভেবেছিল কোরটে যাবে না। সকাল থেকে বসে বসে আইনের পুরনো নজির ঘাঁটছিল। তাতেও মন বসছিল না তার। যত রাজ্যের এলোমেলো চিন্তায় মনটা এদিক ওদিক ঘুরছিল। আজ চারমাস হল ছবি নেই। ঠিক মত যেতে পারছে না ছবির কাছে। কথা দিয়েও রাখতে পারেনি। ছবির অভিমানের বোঝা ক্রমেই ভারি হচ্ছে।

আজকাল ঝিনেদায় গেলে ছবি অবুঝের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কান্নাকাটি করে। ফটিক কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে তার কাছেই থাকুক, এমন আবদারে অতিষ্ঠ করে তুলছে মাঝে মাঝে। তখন তার বিরক্তিও লাগে। সে প্রকাশ করে না বটে তবে ছবি টের পায়। এবং ভয় পায়। ছবির চেহারারও পরিবর্তন হচ্ছে। মুখখানা কেমন ভরন্ত কেমন ক্লান্ত, কেমন সুন্দর হয়ে উঠেছে। আবার পেটটা কেমন মোটা কেমন বেঢপ হয়ে পড়ছে দিন দিন। এখন ফটিক আর ছবির রাত্রি আর তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে না। ছবি হয় ঘ্যান ঘ্যান করে নয় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফটিক তার মাথার চিন্তাগুলো নামাতে পারে না কোথাও। থামাতেও পারে না। তার কোরটের চিন্তা, বার লাইব্রেরির আলোচনার জের, পলিটিকস, তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা ব্যর্থতা তার মাথায় এসে গুঁতো মারতে থাকে। ফটিক জেরবার হয়ে যায়। এবং ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক। কোথায় চলেছ ফটিক? এই সময় এই প্রশ্নটা বার বার উঁকি দিতে থাকে এবং সে তার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ছবির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সে ফটিকের গায়ের উপর একখানা হাত চাপিয়ে দেয়।

কোথায় যাচ্ছ তুমি ফটিক? প্রশ্নটা ঘাই মেরে ওঠে। সে তার একখানা হাত ছবির হাতের উপর আলগোছে রেখে দেয়।

আপনি কি ঘুমোয়ে পড়েছেন? ছবি খুব আস্তে জিজ্ঞেস করে।

ফটিকের কানে সে প্রশ্ন ঢোকে না। তার মনে তখন বার বার ধ্বনিত হচ্ছে, কোথায় চলেছ ফটিক?

আমি।

আপনি কি ঘুমোয়ে পড়েছেন? ছবি আবার জিজ্ঞেস করে।

আমি?

হ্যাঁ তুমি?

আমি জানিনে। মানে বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গে কথা কতি আজকাল আপনার আর ভালো লাগে না, না? ছবি ফটিকের শরীর থেকে ওর হাতখানা আস্তে টেনে নেয়।

কেন বুঝতে পার না ফটিক?

হিসেবগুলো মেলে না।

কোন্ হিসেব মিলছে না?

কোন্ হিসেব? কোন হিসেবই তো দেখি মেলে না।

যেমন?

এই ঘর, কোনও জায়গায় আমার শিকড় গজালো না কেন? ছিলাম চাষীর ছেলে। লেখাপড়া শিখলাম। আর অমনি আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম পরিবারের থেকে। আমার বাজান ধরেই নিয়েছেন তাঁর এন্তেকালের পর তার ভিটে শিয়ালকাঁটার জঙ্গলে ছেয়ে যাবে।

আমার সঙ্গে একটা কথাও কবেন না? ছবি কাঁদতে শুরু করে। আমি কী কসুর করিছি, কন্? আমারে কি আপনার ভালো লাগে না?

সেদিনই রাতে আম্মা বাজানকে জানিয়েছিল যে তার নাতি হবে। আমার ঘুম আসছিল না। তাই আমি দুজনের কথাই স্পষ্ট শুনেছিলাম। বাজান আম্মার কথা শুনে চুপ করে রইলেন। আম্মা বলল, আপনি খুশি হননি? বাজান বললেন, খুশি? তুই আমার দেলের উপরে হাত রা'খে বোঝ সেখানে কী হতিছে? আম্মা জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি কিছু কতিছেন না ক্যান্? তাতে বাজান বললেন, বেল পাকলে কাকের কী? আমি সাজ্জাদ। আমি হলাম চাষা। আমার নাতি কি আমার লাঙলে আসে হাত ঠ্যাকাবে? কক্ষনো না। তা'লে আর লাফালাফি কিসির জন্যি? নাতি হচ্ছে ভালো কথা। আল্লাহ ওগের সবার উপর তাঁর রহমত নাজিল করুন। এর বেশী কিছু আর চাইবি নে ফটিকের মা, তাহলিই কষ্ট পাবি।

আমারে কি আপনার ভালো লাগে না? এবার বেশ জোরেই ফুঁপিয়ে ওঠে ছবি।

এবং ফটিকের তন্ময়তা ভাঙে।

ছবি ছবি, তুমি কাঁদছ কেন? ফটিক একটু শঙ্কিতভাবেই বলে।

এতে ছবি পাশ ফিরে শোয় এবং কথার কোনও জবাব দেয় না এবং আপন মনে কাঁদতে থাকে। গত কয়েক মাস ধরে অভিনীত দাম্পত্য নাটকের পুনরভিনয় শুরু হয় এবং একাধারে অভিনেতা এবং দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য ফটিক নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

ফটিক ছবির শরীরে আলতোভাবে হাত রাখে। কিন্তু আজ তার এই ভূমিকাটা একটা ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির বেশি কিছু ঠেকে না। তথাপি ফটিক তার মনে ছবির প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে থাকে।

ফটিক বলে, কী হল ছবি, ওদিকে ঘুরে শুলে যে! আমার উপর নারাজ হয়েছ?

ছবি পাশ ফেরে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, এখন তো আর আমারে ভালো লাগে না আপনার।

গত কয়েক মাস বহুবার শোনা সংলাপ। ফটিক হাই তোলে কারণ সেও জানে এর পিঠে তাকে কী বলতে হবে। সে বলে, কে বলল?

ছবি বলে, আমি বুঝি, সব বুঝি।

ফটিক হাই তোলে। তার চিন্তার সুতোটা এবার ছিঁড়ে যায়। এটা তার বিশেষ ভালো লাগে না। কিন্তু পাছে ছবি দুঃখ পায় তাই সে এ ভাব প্রকাশ করে না। সে এখন অভিনেতা।

তুমি ছাই বোঝ।

তা'লি আমি এত কথা কলাম এতক্ষণ, তা সাড়া দেলেন না ক্যান? ছবি অতি কষ্টে ফটিকের দিকে ফেরে। ছবি যে পরিশ্রান্ত তা বোঝা যায়।

বিশ্বাস কর, আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, একটা কথাও শুনতে পাইনি।

আপনার মুখি খালি ঐ অ্যাক কথা। ছবি বলে, অভিমানে।

কিন্তু কথাটা সত্যি। ফটিক উত্তর দেয়। নিরুত্তাপ।

জানেন আজকাল নমাজ পড়তিউ প্যাটে চাপ লাগে। শরীলি কী রকম য্যান্ ঠ্যাকে। ভয় লাগে।

ফটিক নিরুত্তর।

আমি [illegible] মরে যাব। আমার খুব ভয় লাগে, জানেন?

ফটিক [illegible]ত্তর।

আপনি চুপ করে আছেন ক্যান!

এর জবাব কী দেবে ফটিক। বার বার এই একই প্রশ্ন তোলে ছবি। ফটিক হাই তোলে। বারবার সেই একই জবাব দেয় ফটিক। ফটিক হাই তোলে। ছবিকে প্রবোধ দিয়েছে। সাহস দিয়েছে কত! কিন্তু এই একঘেয়ে প্রশ্ন তোলার বিরাম নেই ছবির। নতুন কোনও উত্তরও জানা নেই ফটিকের। ফটিক আজকাল আর জবাব দেয় না। বিরক্তি চেপে নিরুত্তর থাকাই পছন্দ করে। এবং এর ফলে ফটিক আর ছবির মধ্যে এক তিক্ত ব্যবধান গড়ে ওঠে।

কেন এরকম হচ্ছে? যে আন্দোলনই শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা হিন্দু-মুসলমান সংঘাতেরই পটভূমি তৈরি করে তুলছে। কেন এমন হবে?

কেন এমন হবে না ফটিক! মেজোকর্তার কথা তার মনে পড়ে যায়। না হওয়াটাই তো আশ্চর্য। আমাদের মনে একটা ভণ্ডামি আছে যেটা সর্বদাই আমরা ঢেকে ঢুকে রাখতে চাই। এই সংঘাত আমাদের ভণ্ডামির মুখোসটা খুলে দেয় মাত্র।

আপনি কাকে ভণ্ডামি বলছেন?

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সম্পর্কে আমাদের আহা উহুকে।

এটা ভণ্ডামি কেন মেজোবাবু?

মানুষকে তুমি যদি মানুষের মূল্যে বিচার না কর তাহলে তার কাছে পোঁছুবে কী ভাবে? কবীর কী ছিলেন, বলতে পারো? তিনি হিন্দু না মুসলমান? বলতে পারবে? পারবে না। কেননা এ প্রশ্নটাই তোমার মনে আসবে না। কারণ তিনি ছিলেন মানুষ। কবীরকে নিয়ে তুমি যাই কর, তা হিন্দু মুসলিমের মিলন ঘটাবার পটভূমিই তৈরি করবে, উলটোটা করাতে পারবে না। কেন? তিনি মিলনের ক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছেন মানুষ হতে পেরেছিলেন বলে। লালন, চণ্ডীদাস এঁরাও পেরেছেন। এবার তাহলে বুঝে দেখ আমরা পারছি না কেন? পারছিনে তার কারণ আমাদের প্রেম নেই, আছে রাজনীতি।

ফটিক চুপ করে গিয়েছিল। কবীর লালন চণ্ডীদাস সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট ছিল না।

তারপর বলেছিল, কবীর সাধক ছিলেন। তাঁকে তো অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি।

কবীর জোলা ছিলেন। কাপড় বুনে পেট চালাতেন। দুঃখ ধান্ধা কাকে বলে তোমার আমার থেকে কম বুঝতেন না। মেজোকর্তা বলেছিলেন। নিচু জাত ছিলেন বলে মনুষ্যত্বের অবমাননা মানুষকে মানুষের হৃদয় থেকে কত দূরে নির্বাসন দিতে পারে, এই দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতাটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রেমের অভাবেই মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। প্রেমই মানুষকে কাছে টানে। প্রেমই জাত পাত এই সবের ভেদ চিহ্ন উড়িয়ে দেয়। তখন তার সামনে যে সমস্যাই আনো, তা অর্থনীতিরই হোক আর রাজনীতিরই হোক, তার সমাধান সহজ হয়ে ওঠে। আমাদের মনে এই আসল বস্তুটি কি আছে ফটিক? আমরা কে কাকে ভালোবাসি?

আমরা কে কাকে ভালোবাসি? ফটিক ল জারনালের পাতা উল্টোতে উল্টোতে একেবারে অন্য ভাবনায় চলে এল। আমি কি কাউকে ভালোবাসি? আমার বাবা আমার মা আমার বিবি শ্বশুর শাশুড়ি, আমার ইশকুল কলেজের বন্ধু, কাকে?

আমি কি ছবিকে ভালোবাসি? অর্থাৎ এতটাই ভালোবাসি যে ছবির জন্য এখানকার প্র্যাকটিস ছেড়ে আমি ওর কাছে চলে যেতে পারি? এবং সুখী হতে পারি? ফটিক আশা করছিল ওর মনের কাছ থেকে হয়ত উৎসাহব্যঞ্জক কোনও উত্তর পাবে। কিন্তু তার মন সংগে সংগে হ্যাঁ বলতে দ্বিধা করল। এবং পরমুহূর্তেই বিষণ্ণতা তার মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ছবি কি এরই মধ্যে তার কাছে পুরনো হয়ে এল? এই তো তারা ঘর বাঁধল। দু বছরও পেরোয়নি এখনও। ছবি তো তাকে কিছু দিতে বাকি রাখেনি। না, তা রাখেনি। তার টাটকা শরীরটা দিয়ে তার শরীরের তাপ জুড়িয়েছে। এ আকর্ষণ ছবির কিন্তু এখনও ফুরিয়ে যায় নি। আর কী দিয়েছে ছবি? একখানা সুন্দর তাজা মন। উপস্থিত বুদ্ধি। তীব্র আবেগ। সেইটেই কি ছবির ভালোবাসা? যা কি-না অনেক সময় ফটিকের মনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্লান্তি নিঃশব্দে শুষে নিয়েছে। তবে ফটিক ছবির কাছে কী পায় নি? একটা অবয়বহীন অভাব বোধ ক্রমশ ছবির কাছ থেকে ফটিককে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। এবং সেই কারণেই কি ছবির সঙ্গ, ছবির সান্নিধ্য ফটিকের একঘেয়ে লাগছে? তাকে বিরক্ত বিষণ্ণ এবং ক্লান্ত করে তুলছে? ফটিকের মন সংগে সংগে উত্তর দিল, হ্যাঁ। কী চায় ফটিক ছবির কাছ থেকে?

তাও ভাল করে বুঝতে পারে না ফটিক। কিন্তু ফটিক বুঝতে পারে তার পোড়-খাওয়া পরিণত মন আরও একটা পরিণত মনের সঙ্গ চায়। কিন্তু তার এই দাবি কে পূরণ করতে পারে? সইফুন? ছবি যা দিতে পারছে না, তা দিতে পারবে সইফুন? ফটিক চমকে উঠল। সইফুনের কথা উঠছে কেন? তুমি তাকে ভালোবাসো তাই। আমি সইফুনকে ভালোবাসি? মিথ্যে কথা। তাই যদি হবে তবে সইফুনের জন্য এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ কেন? উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি কি সাধে! ঐ রাস্কেল দাউদটার জন্য। আমি জানি মৌলবী সাহেবের সরলতার সুযোগ নিয়ে দাউদ সইফুনের সর্বনাশ করার মতলব আঁটছে। তাই আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। দাউদ তো ওদের উপকারই করছে। কিন্তু কেন তা জানো? জানি। সইফুনকে পাবার জন্য। হ্যাঁ তাই। তাতে তোমার বিচলিত হবার কী আছে? ওরা তো দাউদের ইতিহাস জানে না। তুমিই বা দাউদের কতটুকু জানো? ফটিক নিরুত্তর। আর দাউদ যে সেই সাবেকী দাউদই আছে, তার যে কোনও পরিবর্তন হয়নি, তা তুমি জানো? জানি। সেদিনের সেই খামখেয়ালী লুজ্ ক্যারেকটারের বোকা অলস প্রকৃতির লোকটা আজ অনেক চটপটে, কর্মঠ এবং চতুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে এখনও লুজ ক্যারেকটার আছে সে বিষয়ে তুমি কি সিওর? কয়লার কালো ধুলে কি যায়? এটা কি উকিলের মত কথা হ'ল? ফটিক চুপ। দাউদের মতলব যে খারাপ এ সম্পর্কে কোনও এভিডেন্স পেয়েছ? দাউদের টারগেট সইফুন, এর জন্য আবার এভিডেন্স্ দরকার কী? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। সেইটা যাচাই করার জন্য। দাউদ সইফুনকে শাদী করতে চায় এটা নিশ্চয়ই বদ মতলব হতে পারে না? ফটিক চুপ। তাহলে? ফটিক চুপ। সইফুনকে টারগেট করা ছাড়া দাউদের বদ মতলবের আর কোনও উদাহরণ তোমার জানা আছে? ফটিক চুপ। দাউদের প্রতি তোমার এই ঈর্ষার মূলে কি সইফুন নেই? ফটিক চুপ। আসলে তুমিও সইফুনকে চাও।

না। ফটিক প্রতিবাদ করল। আরেকবার না বলতে গেল, পারল না। দুহাতে মুখ ঢেকে মনে মনে কাতরাতে লাগল, ছবি, ছবি!

সেদিনের আততায়ী সন্ধ্যাটা মুহূর্তে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ফটিক অতিকষ্টে সেই

বিকারের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল। জোয়ার কেটে যাওয়ার পর ক্লান্ত শফিকুল চোখের উপর থেকে হাত সরাল। এবং সংগে সংগে যেন কাঠ হয়ে গেলে। সইফুন ফটিকের ঘরে এসে হাজির হল। সইফুন! স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, সত্যিই সইফুন। কিন্তু কিন্তু এ কী চেহারা সইফুনের! ওর এ অবস্থা করল কে?

তীব্র অনুশোচনায় ফটিকের গলার স্বর বদলে গেল।

বলল, "আমাকে মাফ কর সইফুন। আমি সেদিন তোমার প্রতি খুবই অন্যায় করে ফেলেছি।"

সইফুনের চোখ টলটল করে উঠল। সে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

বলল, "কসুর আপনার না, আমার। আল্লা, তার সাজা আমারে দেছেন। তাই ও-কথা আর কওয়ার দরকার নেই।" একটু থামল সইফুন। "ঝিনেদার থে চিঠি আইছে, ছবি-বুর সাধ দিয়া হবে। আমাগেরে আপনার সংগে যাতি লিখিছে।"

ফটিকের মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেল।

বলল, "খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। নিয়ে যাব তোমাদের।"

"আম্মাজান যাতি পারবে না। আব্বুউ না। শুধু" একটু থামল সইফুন, "শুধু জামিল যাবে। ওরে নিয়ে যাবেন।"

"আর তুমি যাবে না সইফুন?" ফটিক আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল।

"জে না, আমি এখন শাদীর মেয়ে, এখন আর—"

শাদীর মেয়ে! অসহিষ্ণু ফটিক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একলাফে এগিয়ে গিয়ে সইফুনের দুটো কাঁধ চেপে ধরল। "দাউদ!"

"জে। আমার মত আমি এই মাত্তর আম্মাজানরে জানায়ে দিয়ে আসতিছি।"

ফটিকের দিকে চাইল সইফুন। তার দুই গাল জলের ধারায় তখন ভাসছে।

॥ ৫ ॥

দাউদ একখানা বড় আয়না কিনেছে। সেই পানের দোকানের মত বড়। যখনই ফুরসৎ পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখান একবারটি দেখে নেয়। সইফুন তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, একথা শোনার পর থেকে দাউদ তার মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে এ আল্লার মেহেরবানি। আল্লা তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। দাউদ আয়নায় একবার মুখখানা দেখে নিল। এবার সে একবার বাড়ি যাবে। বাপ-মায়ের সংগে দেখা করতে। বড় ভাইয়ের সংগে তার একদিন দেখা হয়েও গিয়েছে। সে তার হাত দিয়ে আব্বার কাছে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেনি। প্রথম বাধা বাইতিদা। ওর সংগে একটা ফয়সালা করে নেওয়া দরকার। আর দ্বিতীয় বাধা এবং সেইটেই প্রধান, তার চাচা। চাচার টাকার জন্য নয়। টাকা সে ফিরিয়ে দেবে। এখনই দিতে পারে। তা নয়। আর তাছাড়া দাউদ জানে টাকাব পরোয়া চাচা করেন না। অনেক টাকা সে নষ্ট করেছে। তা নয়। আসল কারণ ফুটকি। ফুটকি আত্মহত্যা করেই দাউদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। ফুটকি ছিল চাচার পেয়ারের শালী। তাকে দাউদ ফিরিয়ে দেবে কী করে?

সইফুন তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, এ খবরটা শোনা মাত্র দাউদ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে খুব যে একটা অপ্রত্যাশিত ছিল, তা তো নয়। তবে সে আনন্দে ফেটে পড়তে পারল না কেন? সেইটাই তো স্বাভাবিক ছিল, নয় কি? সেইটাই তো সে চাইছিল মনে প্রাণে, নয় কি? তবে? তবে খুশিতে সে ফেটে পড়ল না কেন? সইফুন রাজী হয়েছে। তার আর সইফুনের মধ্যে আর তো বাধা থাকল না কিছু? না, আর কী বাধা? কেন, ফুটকি! হায় আল্লা! দাউদ ভয় পেয়ে গেল। ফুটকি, দাউদ এখন বুঝতে পারল, আত্মহত্যা করে তার কী সর্বনাশই না করেছে! দাউদকে কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। সইফুনকে শাদী করার আগে ফুটকির হাত থেকে তাকে অব্যাহতি পেতে হবে। না হলে সইফুনের ক্ষতি হবে। আয়নায় দাউদ বেশ উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগল। সে ঠিক করল বাড়ি যাবে। সে তার কৃতকর্মের জন্য চাচার কাছে চাচীর কাছে, ছুটকি-ভাবীর কাছে, বাইতিদার কাছে, সকলের কাছে মার্জনা চাইবে। তার পুরানো খাতার হিসেব মিটিয়ে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে দাউদ ফিরে আসবে সইফুনের কাছে। আল্লা হয়ত তাই চান। তার গুনাহের জের যেন সইফুনকে টানতে না হয়। দাউদ তা দেখবে। দেখবে যেন কারও বদদোয়া সইফুনের উপর না পড়ে। সইফুন সইফুন। সইফুনকে সে কোনও কষ্ট দেবে না। দাউদ তার মনের দিকে চেয়ে দেখল, সইফুন সম্পর্কে সেখানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি বিরাজ করছে। এমনটি আর কোনও মেয়ের বেলায় সে অনুভব করেনি। সইফুনের কথা মনে হলে সে শরীরের ডাকে উন্মত্ত হয়ে ওঠে না, যদিও তাকে বিছানায় পেতে তার খুবই ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার চাইতেও বেশি ইচ্ছে হয় সইফুনকে নিয়ে এখানে ওখানে যেতে। তার সংগে বসে বসে বা পাশাপাশি শুয়ে কথা বলতে। সইফুনের ফরমায়েশ খাটতে। তাকে

সকল বিপদ আপদ থেকে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখতে।

তার আরেকটা ইচ্ছেও তার হয়। বাপ হবার ইচ্ছে তার হয়। খুব হয়। দাউদ আয়নাটায় তার মুখখানা দেখে নিল। যেন যাচাই করল, বাপ হলে তাকে মানাবে কিনা? সইফুন হবে দাউদের বাচ্চার মা। কথাটা ভাবতে থাকলেই দাউদের শরীর সুখে শিরশির করতে থাকে।

খবরটা বাবুই দাউদকে দিয়েছিল। দাউদ তখন ঝিনেদা-মাগরোর রাস্তা সারাতে ব্যস্ত। বাড়ি যায়নি। তার গ্রাম চার মাইল দূর এবং তার সাইকেল আছে। তা সত্ত্বেও সে গ্রামে ঢোকেনি। সে মধুপুরেই ক্যাম্প করেছে। এবং যথারীতি সে বিভিন্ন গ্রামের মোড়লদের ডেকে কাজের লোক দিতে বলেছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খোন্দকার বজলুর রহমান সাহেবের মুসালম দরদের কথা বলেছে এবং মাতব্বররা তার কথা মন দিয়ে শুনেছে এবং বেকার লোকেদের এনে রাস্তার কাজে, ইঁট তৈরি, পাঁজা তৈরি এবং তা পোড়াবার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সব ঠিক ঠিক চলছে। দাউদ ভোটের আগে রাস্তা তৈরি করতে পারুক আর না পারুক, এটা ঠিক যে সে খোন্দকারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্তত ঝিনেদা-শৈলকুপার দিকটায় সকলেই এখন খোন্দকার বজলুর রহমানের নাম জানে।

কিন্তু তার নিজের গ্রামের দিকে এসে দাউদ দেখল এখানে আরেকটা বেশ জোরালো স্রোত বইছে। এবং সে স্রোত কৃষক প্রজা আন্দোলনের। দাউদ দেখে অবাক হল যে প্রত্যেকটা মাতব্বরই জানে যে সামনে একটা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে খোন্দকার বজলুর রহমান সাহেব ক্যানডিডেট। আবার দাউদকে এ কথাও শুনতে হল, খোন্দকার তো জমিদার, তিনি চাষীর উপকার আর কী করবেন? দাউদ দেখল, এদিকে খোন্দকারের পক্ষে মাটি বেশ ঢিলে। দাউদ চিন্তিত হল।

কৃষক-প্রজা ক্যানডিডেট মৌলবী আবু তালেবকে দাউদ চেনে। তাঁর মক্তবে দাউদ পড়েছেও কিছুদিন। এ অঞ্চলে তাঁর সম্মান খুব। কিন্তু আরেকজন আবু তালেব কে? যার নাম প্রায়ই মাতব্বরদের মুখে সে শুনছে। তাকে দাউদ চেনে না। মনে হয়, এই লোকটাই নাটের গুরু। আর আছে সাজ্জাদ মোড়ল। ফটিক ভাইর বাপ। আর বাঁশের। সেও সাজ্জাদের সাগরেদ। আর শুনছে তাদের পাড়ার লোকেদের কথা। বিশেষ করে খালেক মামুর কথা। এ'রা এ অঞ্চলের মানী লোক এবং ঈমানদার বলে এ'দের মান আছে। এ অঞ্চলের লোক এ'দের কথাই মেনে আসছে। এ'দের বিরুদ্ধে গিয়ে কারো পক্ষে এই অঞ্চলে মাটি তৈরি করে দেওয়া শক্ত। তার উপর আবার কালোজিবে আর ফুটকি দুজনেই তাকে জখম করে দিয়েছে। দাউদ দেখল, সে এখানে বেজায় কোনঠাসা।

কালোজিরেকে নিয়ে ভেগে পড়ার জন্য তার তেমন ক্ষতি কিছু হত না। তাদের পরিবারেই যা কিছু গণ্ডগোল হত। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুটকি আত্মহত্যা করেই তার অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। দাউদ যে গর্হিত কাজ করেছে, সে রায় উচ্চ রবে ফুটকিই চাউর করে দিয়ে গিয়েছে। তার চরম বেইজ্জতি হয়েছে সেইখানেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা মেরামত দাউদ দেখল যত না শক্ত তার চাইতে ঢের বেশি শক্ত তার নিজের জখমী ইজ্জত মেরামত করা। কিন্তু দাউদকে যেমন রাস্তা মেরামত করতে হবে, তেমনি তার ইজ্জতটাকেও মেরামত করে নিতে হবে। নাহলে এ অঞ্চলে তার মুরুব্বী খোন্দকার ডুবে যাবে। এই সম্ভাবনা দাউদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। মৌলবী আবু তালেব গরিব। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের সংখ্যা দেখে দাউদ ঘাবড়ে গেল।

দাউদ এই বিষয়ে দু-একজনের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যও বটে, আর একটা বড় পেমেন্ট নেবার জন্যও বটে, যশোরে এসেছিল। এবং যথারীতি গতকাল সন্ধ্যায় সইফুনদের বাড়ি গিয়েছিল। সইফুনের আম্মা ভাল আছে, উঠে বসেছে এবং ওষুধে যে কাজ দিয়েছে, তা দেখে দাউদ খুশি হল। জামিলা তাকে আজকাল নানা ফরমায়েশ করে এবং বড়-বু যে তার উপর কত অন্যায় করে, সে সব কথা বিস্তারিতভাবে শোনায় এবং দাউদ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং গম্ভীরভাবে তার সুচিন্তিত রায় প্রকাশ করে। এবং বলাই বাহুল্য সব রায়ই জামিলার অনুকূলে যায়। ফলে জামিলা দিন দিন দাউদের নেওটা হয়ে পড়ছে। দুটো একটা কথা আজকাল সইফুনও বলে। এই ধরনের পারিবারিক জীবনের মোলায়েম অভিজ্ঞতা দাউদের জীবনে বিশেষ ঘটেনি। ছবি যখন ছোট, তখন বছর দুই-তিন জ্বালিয়েছিল। আবদারও কত। তারপর কি করে যেন ওর কানে গেল, চাচা ঠিক করেছেন ছবির সঙ্গে ওর শাদী দেবেন। কেমন এক ধরনের লজ্জা আর সংকোচ যে তার মনে গজিয়ে উঠল, দাউদ আর কিছুতেই ছবির সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারেনি। আজও পারে না। ইয়াকুবই ছিল ছবির প্রকৃত সাথী। তারপর কী যে হল? চাচা মত বদলালেন। ওর আম্মা বলে, চাচীরই ফুসলানিতে। ছবির সঙ্গে দাউদের শাদী হল না। দাউদের মনে ওর চাচার প্রতি কেমন একটা তীব্র বিদ্বেষ বাসা বাঁধল। দাউদ যে এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিল তাও নয়। আজকাল যেন সে কথাটা বুঝতে পারে। হয়ত সেই কারণেই সে চাচার আওতায় মানুষ হতে পারেনি। চাচা ওর ভালোর জন্য যা কিছু করেছেন তার একটাকেও সে ভালো মনে নিতে পারেনি। সে-সবই ভেস্তে দিয়েছে দাউদ।

ফুটকির মত মেয়েকেও সে কষ্ট দিয়েছে। সে কি এই কারণে যে ফুটকি চাচারই পেয়ারের শালী? আয়নাটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল দাউদ। যদি ফুটকি একবার উঁকি দেয়? ফুটকি না সইফুন? কার প্রত্যাশা করছে দাউদ? দাউদ বিভ্রান্ত বোধ করল। আজ যখন সইফুন তার নাগালের মধ্যে, তাকে শাদী করতে চেয়েছে, তাকে শাদী করতে চলেছে তখন দাউদের মনে

বারবার ফুটকি উঁকি মারছে কেন? তখন সে এত বিভ্রান্ত বোধ করছে কেন?

দাউদ ভাই, দাউদ ভাই! কাল অনেক রাতে বাবু হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছিল। বু আপনারে শাদী করবে। বাবু হাঁফাচ্ছে। তার চোখ মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

দাউদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল দাউদ।

জিজ্ঞাসা করল, তুমার বু তুমারে কইছে?

বাবু বলল, না।

সে তখনও হাঁফাচ্ছে।

দাউদ ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

বাবু উত্তেজিতভাবে বলল, আম্মাজান বাজানরে কইছে। আমি স্পষ্ট শুনিছি। আম্মা বাজানরে একটু আগেই কলো, সইফুন দাউদ ভাইপেরে শাদী করতি রাজী হইছে। আপনি ইবার আগোতি পারেন।

তুমার বাজান কী কলেন? দাউদের স্বরেও চাপা উত্তেজনা।

বাবু বলল, বাজান আল হামদো লিল্লাহ্ বলে চেঁচায়ে ওঠলেন। তারপর আম্মারে কলেন, সুরা নিসায় এই কথা কওয়া আছে যে আল্লাহ্ মালিক চান যে তুমাগের বোঝা হালকা করেন, কেননা মানুষরে অত্যন্ত দুর্বলা করে ছিষ্টি করা হইছে। বলেই আব্বা নাক ডাকায়ে ঘুমোয়ে পড়লেন। আর আমি টুক আস্তে করে সাইকেলডারে বের করে নিয়ে আপনারে খবরডা দিতি আলাম।

দাউদ এবার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

দাউদ চুপ করে আয়নার দিকে চেয়ে বসে রইল।

তুমার বু তুমারে কিছু কয়েছে?

বাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলল, বু একথা কবে আমার সাথে? হুঃ! বু-রি আপনি চেনেন না। কী দেমাকী মেয়ে। আমাগের বলে মানুষ বলেই গিরাহ্যি করে না!

দাউদ আয়নার দিকে চেয়ে হাসল। বড় ম্লান সে হাসি। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। বাবুকে বিদায় দিয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম আসেনি। প্রথম দিকে উত্তেজনায় এবং আনন্দে। আল্লা আবার তাকে অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আনন্দ তার উবে যেতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনে ধীরে ধীরে কালবৈশাখীর মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠতে থাকল। একটা ভয় সুক্ষ্মদেহ ধারণ করে তার মেরুদাঁড়ার মজ্জা বেয়ে নামতে লাগল। ফুটকি। ফুটকি কি তার এত সুখ সহ্য করবে? ফুটকি কি প্রতিশোধ নেবে?

দাউদ আয়নার দিকে এমন আগ্রহ ভরে চেয়ে আছে যেন ফুটকি তাতে ভেসে উঠবে দাউদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য। দ্যাখ ফুটকি, দাউদ কাতর প্রার্থনা জানাল, গুনাহ্ যদি হয়ে থাকে তা আমার। সইফুন নিদ্দুষী। তোরই মত নিদ্দুষী। ওরে তুই কষ্ট দিসনে।

দাউদ ঠিক করল ফুটকির সঙ্গে সে মোকাবেলা করে নেবে। কী করে নাগাল পাবে ফুটকির? দাউদ ঠিক করল সে বাড়ি যাবে। এবং ফুটকির কবর দেখে আসবে। মধুপুরের হাটে হঠাৎ একদিন নেয়ামতের সঙ্গে দাউদের দেখা হয়ে যায়। নেয়ামতের তখন খুবই খারাপ অবস্থা। সে তখন আশে-পাশের কয়টা হাটে মেসিনটা বয়ে এনে শুধু রিফুন সেলাই করে কোনও মতে চালাচ্ছে। ভাইকে দেখে নেয়ামত প্রথমে কথাই বলতে চায়নি। কলোনীওরেকে নিয়ে দাউদ পালাবার পর নেয়ামতের দোকান লুঠ হয়ে যায়। হাটে সে আর বসে খেতে পারেনি। কিন্তু দাউদ এ সুযোগ ছাড়েনি। হাটের পর বড় ভাইকে দাউদ তার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারপর আণ্ডা পরোটা আর চা-পানি খাইয়ে তার রাগ ভাঙায়। অনেক কথা দুই ভাইয়ের মধ্যে হয়। দাউদ তার কাজের কথা বলে। তার আগেকার কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে। বাইতির সঙ্গে দেখা করতে চায়। দাউদ বাড়ি ফিরতে চায়। তার চাচার টাকা শোধ করে দিতে চায়। ভাই যেন এ বিষয়ে তাকে একটু মদত দেয়।

ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করেছিল নেয়ামত। তা সত্ত্বেও সে দোনামনা করছিল। তখন দাউদ বলল, নেয়ামত যদি ভালো করে দর্জির দোকান চালাতে পারে, তাহলে তার জন্য যা টাকা লাগে দাউদ দিতে পারে। এই কথায় নেয়ামত বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। এবং বলেছিল অবশ্যই সে দাউদের জন্য চেষ্টা করবে। নেয়ামতের হাত দিয়ে সে তার দুই আম্মা আর ছুটকির জন্য শাড়ি কিনে পাঠিয়েছিল। আব্বুকে কিছু টাকাও।

নেয়ামত আর সবই করেছে এ পর্যন্ত। তার আব্বাকে মধুপুরে এনে দাউদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছে। দাউদ তার কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছে। রহমান নিকারি ছাওয়ালকে শুধু মাফই করেনি, দাউদের পরিবর্তন, তার কাজ কামের নমুনা দেখে তাজ্জবও হয়ে গিয়েছে। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ছাওয়ালের দৌলতে সেও হয়ত একদিন হাজী হতে পারে। তারও বাড়িতে বড় ভাই-এর মত একটা দহলিজ দাউদ তৈরি করে দেবে। তারও বাড়ি হাজী বাড়ি হবে। অতএব বাড়ি যাওয়ার রাস্তা দাউদের খোলা হয়ে গিয়েছে। শুধু তার চাচা আর বাইতি, বাকি আছে এই দুইজন। এঁরা যদি তার গুনাহ্ মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাও তাকে মেহেরবানি করবেন এবং ফুটকির রাগও তিনিই মিটিয়ে দেবেন। চাচা আর বাইতিরা গ্রামে নেই, তাই ওদের সঙ্গে কথা বলতে রহমান বা নেয়ামত পারেনি। হাজী সাহেব ঝিনেদায় বাড়ি তুলছেন আর বাইতি

বেরিয়েছে যাত্রা গাইতে।

দাউদ ভুলেই গিয়েছিল যে খোন্দকারের সংগে আজ তার দেখা করার কথা আছে। হঠাৎ মনে পড়তেই সে আয়নার সামনে থেকে উঠে পড়ল। তার মনে আবার উৎসাহ ফিরে আসছে। সইফুন তাকে শাদী করতে রাজী হয়েছে, এইটেই আসল কথা। তার কেন যে ধারণা হয়েছিল, সইফুন রাজী হবে না, কে জানে? এ কথা সত্যি যে সইফুনদের বাড়িতে এতদিন যাতায়াত করা সত্ত্বেও দাউদের সংগে আজও সইফুনের ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপ তেমন হয়নি। সইফুন সরে সরেই থেকেছে। এবং সত্যি বলতে কি, তাতে সইফুনের প্রতি দাউদের আকর্ষণ বেড়েই গিয়েছে।

দাউদ আয়নার দিকে একবার চাইল। তারপর ডাক দিল, "কাতলা!"

"জে।" কাতলা এগিয়ে এল। তার হাতময় ময়দা।

দাউদ সস্নেহে কাতলার দিকে চাইল।

"দ্যাখ কাতলা ভাবতিছি তোরে এ বাড়ির বাবুরচির কাজের থে ছাড়ায়ে দেব।"

কাতলা ঘাবড়ে। গেল। "ক্যান্, আমার রান্না কি আর খাওয়া যাচ্ছে না?"

"আরে না বিটা না, তোরে আমি ছাইটে নিয়ে যাব। তুই সেখেনেই থাকবি।"

"তা'লি এ বাড়ি থাকবে কিডা?"

"সেইডেই তো কতি চাচ্ছি। এ বাড়ি দ্যাখাশুনা করার জন্যি একটা ভালো লোক দ্যাখেক দিন। বিটি ছাওয়াল হতি হবে। কাজে কম্মে ভালো। বাড়ির লোকজনেরে ভালো করে দ্যাখাশুনো কত্তি পারে। ঝগড়া টগড়া করবে না। অ্যামন লোক চাই। বুঝলি।"

কাতলা বলল, "বুঝিছি। আপনি শাদী কত্তিছেন।"

দাউদ খুশি হল। "কী করে বুঝলি?"

কাতলা বলল, "বোঝলাম। কারে শাদী কত্তিছেন, তাউ বুঝিছি।"

"তাও বুঝিছ?" দাউদের খুশি উপচে পড়তে লাগল। "কওদিন শুনি?"

কাতলা বলল, "ঐ মৌলবী ছাবের বিটিরি।"

দাউদ এবার হেসে ফেলল। "বিটা আবার হাত গুনতি শিখিছে।"

"হাত গুনতি লাগবে ক্যান?" কাতলা বলল, "চোখ চায়ে থাকলিই তো সব বুঝা যায়।"

দাউদ বলল, "তোর বিটা বড় বুদ্ধি। তাই তো তোরে আর বাবুরচির কামে আটকায়ে রাখতি চাইনে। তোরে ইবার ঠিকেদারির কামে লাগায়ে দেব। তোর মাথা দেখতিছি আমার চাইতিউ ছাফ। এখন দ্যাখেক দিন খুঁজে পা'তে, একটা ভালো কাজের লোক যাতে পাওয়া যায়।"

"জে, দ্যাখবানে।"

"হ্যাঁ দেখিস বিটা, আবার ঝগড়াটে টগড়াটে না হয়। ঝাড়া হাত-পা হলিই ভালো। বাড়ির লোকের মতনই থাকবে। বুঝিছ? এখন গোছলের পানি দ্যাও।"

দাউদ গোসল করতে করতে সইফুনের কথাই ভাবতে লাগল। এবং এই কথা ভেবে সে সত্যিই অবাক হল, কেন এতদিন সইফুন সম্পর্কে মনে এতটা দুশ্চিন্তা পোষণ করেছিল। আর সইফুন তাকে শাদী করতে রাজী, বাবুর মুখ থেকে এ কথাটা শুনে কাল রাতে তার মনে এত আশংকাই বা দেখা দিল কেন? সইফুন কেন তাকে পছন্দ করবে না? খসম হিসেবে সে কি খারাপ? অতীত নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চায় না দাউদ। সে ভুল করেছিল, সে তওবা করেছে, আল্লা তা গ্রহণ করেছেন। তা না হলে সইফুনকে তিনি মিলিয়ে দিতেন না। তা না হলে সইফুনকে তিনি রাজী করাতেন না। দাউদ ভাবছিল, এই উপলক্ষে শোকর গুজারি করার জন্য সে তার বাড়িতে মৌলবী ডেকে একদিন কোরান-খতম পড়াবে কিনা। তাহলে দু-চারজন এমন লোককে দাওয়াত করা যায়, যাদের কাছ থেকে সে উপকার পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও উপকার পাবার আশা রাখে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চিফ্ ইন্জিনিয়ার ব্যাটা হিন্দু, এই ব্যাপারে তাকে নেমন্তন্ন করার মানে হয় না। তাকে বরং সাহেবী কায়দায় একটা ভেট্ পাঠিয়ে দেবে। দাউদ দেখেছে হিন্দু অফিসাররা সাহেবদের মতই বড়দিনের সময় ভেট পেলে খুব খুশি হয়।

মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে দাউদ মনে মনে হেসেই ফেলল। তুমি হাজার টাকা ঘুস দিয়েও যে ফল না পাবা, বড়দিন ষাট সত্তর টাকা খরচ করে একটা ভেটের ডালি সাজায়ে পাঠাও, তাতে তার দুনো কাজ পাবা। কয়েক থুকা আঙুর, একটা দুটো আনারস, বড় বড় মর্তমান কলা, গুটা কতক বিলাতী ফল, কেক বিস্কুট, এক বোতল বিলিতি, একটা আট দশ সেরী পাকা রুই কিংবা একটা খাসী। শালার দিশী সাহেবগুলো ওতেই খুশি। শালারা ভাবে আমাগের সাহেব বলে মানতিছে। খুশি হয়। তখন যত ইচ্ছে ওগের মাথায় হাত বুলোও। মনে মনে দাউদ এ কথা আওড়ায় আর মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

সেই রকম একটা ভেটের ডালি পাঠাবে নাকি চিফ্ ইনজিনিয়ার মুখারজি সাহেবকে? না কি স্রেফ এক বোতল বিলিতি আর একটা খাসী পাঠিয়ে দেবে? কিন্তু এখন তো বড়দিন না। তাহলে কোন্ উপলক্ষে সে মাল পাঠাবে। উপলক্ষ ছাড়া কিছু পাঠানো তো ঘুস? ওরে বুবাস! মন্দ তাহলি একেবারে ত্রিভুবন ছুটিয়ে দেবে না! নাঃ! দাউদ ওর তালিকা থেকে মুখারজি সাহেবের নাম কেটে দিল। পি ডবলিউ ডি-র নতুন এস ডি ও সালাম সাহেবকে নিয়ে

দাউদের বেশি দুশ্চিন্তা নেই। এর আগেও তাঁকে দু-একবার দাওয়াত খাইয়েছে দাউদ। তা ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার কাজ দেখে খুশিও হয়েছেন এবং তিনি সে-কথা তাকে বলেওছেন। তাছাড়া কওমের খেদমত করার বাসনায় সালাম সাহেব যে উম্মুখ তার প্রমাণ দাউদ শিগ্‌গিরই পেতে চলেছে। যশোর-খুলনা রোডে যে কাজটা বেরুবে, সেটা এবার দাউদের কপালে নাচছে। সালাম সাহেব মদ খান না। ইসলামের আহ্‌কাম মেনে চলেন। সেদিকে কোনও নড়চড় হয় না। তিনি ঘুস নেন না। ঠিকেদারদের কাছ থেকে শুধু পারছেন্টেজ্‌ খেয়ে থাকেন। পাঁচ পারছেন্ট্‌ বাঁধা বরাদ্দ। তার বেশি না। লোভ তাঁর শরীরে আল্লা মোটে দেননি। তার বাড়িতে খতম পড়া হবে, ওয়াজ-নসিহত হবে, এই উপলক্ষে দাওয়াত পেলে খুশিই হবেন সালাম সাহেব। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হেড ক্লারক নকীব মিঞাকেও আনা যাবে। আর হ্যাঁ, ট্রেজারীর হেড্‌ কেরানী ওবাইদুল মিঞাকেও বলতে হবে। গাজী গোলামের উপর সব ভারটাই চাপিয়ে দেবে দাউদ।

গোসল শেষ করে মাথা মুছতে মুছতে হঠাৎ বলে উঠল, "বাবু মিঞাগেরে সেদিন বাড়িসুদ্ধু দাওয়াত দিলি ক্যামন হয়?"

খুব উৎসাহ বোধ করল দাউদ। আসলে ওরা এলেই তো সে সব থেকে খুশি হয়। কী এতক্ষণ আজে বাজে কথা চিন্তা করছিল দাউদ। ঠিকেদারি করতে করতে এই কদিনের মধ্যেই, দাউদ দেখল, তার মাথাটা কেবল ফন্দী ফিকিরেই ভর্তি হয়ে উঠেছে। কিসে দু-পয়সা ঘরে আসবে এছাড়া আর অন্য চিন্তা নেই। আশ্চর্য! তার এতক্ষণ ধরে সযত্নে তৈরি করা দাওয়াতের তালিকার দিকে তার যেন এখন নজর পড়ল। সব তার কারবারের লোক। কাকে হাতে রাখলে দু পয়সা ঘরে আসার ব্যবস্থা হবে কেবল তাদের নামেই তালিকা ভর্তি। সেখানে সইফুনের নাম নেই, বাবু-জামিলের নাম নেই, তার খালা-আম্মার নাম নেই, মৌলবী জয়নুদ্দিনের নাম নেই! বলিহারি যাই!

কিন্তু দাওয়াত দিলেই কি ওরা আসবে? বিশেষত সইফুন? নিশ্চিন্ত হতে পারল না দাউদ। আর সইফুন না এলে তো সবই বৃথা। তাই তার মনে হল এখন এসব কিছুই করে কাজ নেই। পরে হবে। বরং হ্যাঁ, সে এক কাজ করতে পারে। আবার তার মাথায় বেশ ভালো একটা বুদ্ধি এল। এবার সে নেয়ামতের সঙ্গে ব্যবস্থা করে বাড়ি যাবে। তার আব্বা আর আম্মাকে যশোরের বাসায় নিয়ে আসবে। দিন কতক রাখবে। সেই তখন সে একদিন দাওয়াত দেবে সইফুনদের।

লুঙ্গি আর কামিজ পরে মুখে পাউডার ঘষছিল দাউদ। এই বুদ্ধিটা তার বেশ মনে ধরল। এবং তার মনে হল, সইফুন এতে বোধহয় আপত্তি করবে না। দাউদ সইফুনের উপর তার কোনও ইচ্ছা অনিচ্ছাকে খাটাচ্ছে, সইফুন এটা যেন মনে না করে। এটা সে চায় না। ফুটকি তাকে চরম শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। দাউদ চায় সইফুন নিজের ইচ্ছায় তার ঘরে আসুক। তার ঘর, তার মন, ভরে তুলুক। সইফুনকে সে কোনও কষ্টে রাখবে না। তাকে সে কুটোটিও ভাঙতে দেবে না।

সইফুন! মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে দাউদ আয়নাটাকেই যেন বলল, তুমার জন্যি আমি বাঁদী রাখে দেবো। তুমারে কোনও কষ্ট দেবো না। এই কথা যখনই সে সইফুনকে বলতে যায়, দাউদ বোধ করে, ফুটকি আস্তে করে এসে দাঁড়ায়। আর নিঃশব্দে হাসতে থাকে। আজও তাই হ'ল। দাউদ বোধ করল, ফুটকি হাসছে। দাউদ অকস্মাৎ খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ সে একটা অস্বস্তির ভিতর কাটাল। তারপর ঠিক করে ফেলল, সে একজন পাকা মৌলবীকে ডেকে আনবে ওয়াজ্‌-নসিহতের জন্য। তারপর আবার কী ভেবে ফুটকির জন্য আল্লার কাছে দোয়া মাগল। তারপর ফুটকিকে বুঝিয়ে বলল, তুই বেহেশ্‌তি হ ফুটকি। আমায় ছাড়ে দে। সইফুনরি নিয়ে আমারে সুখি হতি দে।

দরজার কড়া খট্‌খট্‌ করে নড়ে উঠতেই দাউদের চমক ভাঙল। কাতলা দরজা খুলে দিল। গাজী গোলাম।

"কী, দাউদ মিঞা ফিরিছেন না কি?"

"জে। কাল রাত্তিরিই ফিরিছেন।"

দাউদ ঘরের ভিতর থেকেই সাড়া দিল, "আস্‌সালামু আলায়কুম গুলাম ভাই। আসেন আসেন।"

"ওয়া আলাইকুম্‌স্‌সালাম।" বলে গাজী গোলাম দাউদের শোবার ঘরেই ঢুকে পড়ল। "তারপর, কন দেখি খবর টবর কী?"

"কাতলা!" দাউদ হাঁক দিল। গাজী গোলামকে তার শোবার ঘরে হুট করে ঢুকতে দেখে দাউদ বিশেষ খুশি হল না। তার কেমন যেন মনে হল ঘরে সইফুন আছে। তার যেন পর্দা নষ্ট হল।

"জে।" কাতলা এসে দাঁড়াল।

দাউদ বলল, "যা যা একটা কুর্‌সি নিয়ে আয়। বাড়িতি একটা লোক আলি খাতির করতি শেখোনি!"

গাজী গোলাম দাউদের সৌখীন বিছানায় থ্যাপ্‌ করে বসে পড়ে বলল, "খাতির দ্যাখানো অ্যাখন রাখেন। কুর্‌সি ফুর্‌সি কিচ্ছু আনতি হবে না। খবর কী ওদিককার অ্যাখন তাই কন? আপনাগের ওদিকি নাকি খবর ভালো না।"

দাউদ বলল, "জে। সেই খবর দিতিই তো আলাম। কিন্তু আপনারা এ খবর পালেন কন্‌ থে?"

গাজী গোলাম বলল, "বোরডের মেম্বার মেন্দা মিঞার কাছ থে। তিনি আইছেলেন বোরডের মিটিংই। খোন্কার ছাহেবরে কয়ে গেছেন, ওগেব উদিকি খোন্কার ছাহেবরে নাকি দাঁত ফুটোতি হবে না। খোন্কার ছাহেব যান অথৈ জলে পড়ে গেছেন। আমারে কলেন, দাউদ মিঞা যদি ফিরে থাকে, তালি তারে এখেনে একেবারে সংগে করে নিয়ে আসো শিগগির। আসলে, যা বোঝলাম, ঐ মেন্দা মিঞার কথায় ওঁর বিশ্বাস হয়নি। বিটা খোন্কাব ছাহেবের ছাপোরট দিয়ার ওয়াদা দিয়ে তলে তলে নিজিই চিয়ারম্যান হবার চিষ্টা করিছিল।"

গাজী গোলামের প্রতি বিরক্তি খানিকটা কমল দাউদের। ওকে বিছানার উপর বসে পড়তে দেখে দাউদের মেজাজটা খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। সইফুন ছাড়া এই বিছানায় আর কেউ উঠবে একথা ভাবতেও পারে না দাউদ। কিন্তু সে বিরক্তি গাজী গোলামের কথায় উবে গেল।

জিজ্ঞাসা করল দাউদ, "খান বাহাদুরির মিজাজ অ্যাখন ক্যামন?"

দাউদকে এবার একটা বড় পেমেন্ট্ নিতে হবে। কাজের মেজারমেন্ট্ হয়ে গিয়েছে। বিলও জমা দেওয়া হয়েছে দু মাস হয়ে গেল। চিফ্ ইন্জিনিয়ারের সই পর্যন্ত হয়ে আছে। টাকার অংকটা বড় বলেই চেয়ারম্যানের স্যাংশন্ দরকার। দাউদ শুনেছে বোরডের তহবিলে এখন অত টাকা নেই বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে একটু চিন্তায় পড়ল।

চিন্তা না করে উপায় কী? চব্বিশ হাজার টাকার বিল! এক আধ টাকা নয়। এ টাকা আটকে গেলে রাস্তার কাজই শুধু আটকে যাবে না, তাব সব খোয়াবও মিলিয়ে যাবে।

"খান বাহাদুরির মিজাজের কথা জিজ্ঞেস কত্তিছেন? অ্যাখন তিনি যারে সামনে পান তারেই গিলে খান, অ্যামন অবস্থা! আমরা চুনোপুঁটি, পিরানডা আমাগেরই যায়!"

সর্বনাশ, তাহলে কি টাকার কথাটা পাড়া যাবে? দাউদ একটু বিপন্ন বোধ করল।

"আপনাগের ওদিকি নাকি কৃষক প্রজার লোকেরা খোনকার ছাহেবরে হারাবার জন্যি আড়ে-হাতে লা'গে গেছে?" গাজী গোলাম দাউদের মুখের দিকে চাইল।

দাউদ বলল, "এদিকি এই তো ক্যাবল আলাম। দিন কতক বায়ে চায়ে না দেখলি বোঝবো ক্যামন করে যে প্রিকিত জোর করা কতডা আছে? তা মেন্দা মিঞা তো ওদিকির অ্যাকজন তালেবর লোক। উনি তো শুনি আমাগের ওদিকি খান সাহেবের শক্ত খুঁটি। উনি কন কী?"

"উনি পেরথমে আসেই তো অ্যাক চোট ভয় ধবায়ে দেছেন উনারে।" গাজী গোলাম বলল। "তারপর যা কলেন তা এই, ঐদিকি আপনার নাকি খুবই বদনাম।"

দাউদের মুখ কালো হয়ে গেল। গাজী গোলাম লক্ষ্য করল।

"বিটা বুড়ো ক্যাবল দেহি এই কথাই খালি কয়। কয়, খান বাহাদুর আপনি আর লোক পালেন না! শেষে কিনা দাউদির উপর আপনারে নির্ভর করতি হ'ল? উডা তো মহা বাউগোরা। নামকরা বদমাইশ!" গাজী গোলাম বলল, "আরও বলে কি, ওই আপনারে ডুবোয়ে ছাড়বে।"

দাউদ অথৈ জলে পড়ে গেল। সর্বনাশ! মেন্দা যা বলেছে, তা কি বিশ্বাস করেছেন খোন্কার?

গাজী গোলামকে সে বলল, "আমার চাচার সঙ্গে মেন্দার ঝগড়া, তা সেই ঝালডা আমার উপর ঝাড়ে দিল। আমি তো মেন্দার কোনও ক্ষতি করিনি। আর খান বাহাদুরির জন্যি কী করিছি বা কী কত্তিছি তা আপনি তিনার ডা'ন হাত আপনি নিজিই সিডা শৈলকুপার ছাইটি যায়ে দেখে আইছেন। খোন্কারও দেখিছেন। আমি যে খান বাহাদুরির ছাইট্ ইন্স্পেক্শনে যাতি কতাম, তা এই জন্যি। উনি যে কয়বার গেছেন, আপনি নিজিউ তো দেখিছেন, ক্যামন ভিড় জমায়ে ছাড়িছি। মোড়ল মাতব্বরগের ডাকে আনিছি। উরা তো খান বাহাদুরির মত অ্যাত বড় একজন আশরাফের সঙ্গে, অত বড় একজন লিডারের হাতে হাত ঠ্যাক্য়ে মোসাফাহ্ করতি পা'রে জীবনডারে সাত্থক বলে ভাবিছে। আমি ইডা কতি পারি, ওদিকি আর কারউ দাঁত ফুটোতি হবে না। আর এদিকি এই তো ক্যাবল আলাম। কাজে ত্যামন করে হাতই ঠ্যাকাতি পারিনি। এদিকির কথা এখনই কব কী করে? তার উপর আবার পেমেন্ট্ আটকায়ে গেছে। কাজ আগোবেই বা কী করে?"

গাজী গোলাম বলল, "আরে মেন্দা মিঞা অন্য মতলবে ঘুরতিছেন। আপনি যে ঠিকেডা পাইছেন, উনি অ্যাখন তাতে খাবল মাত্তি চান। আপনার কাজের থে খানিকটে কাজ কাটে মেন্দা মিঞা তাঁর জামাইরি দিয়ার জন্যি খান বাহাদুরির কাছে সুপারিশ করিছেন। মেন্দা মিঞার আসল মতলব হ'ল এই।"

"তা একথা শুনে খান বাহাদুর কী কলেন?"

আগ্রহভাবে গাজী গোলামের মুখের দিকে চেয়ে রইল দাউদ।

গাজী গোলাম বলল, "মেন্দা মিঞারে হ্যাঁ-উ কননি খান বাহাদুর, আবার না-উ কননি। উনি চলে যাবার পরই খোন্কার মিঞা আমারে কলেন, এক্ষুনি আপনারে তার কাছে নিয়ে যাতি।"

হ্যাঁ-উ কননি না-উ কননি? তার মানে কি? দাউদের ভাবনা দ্রুত তালে এগিয়ে চলল। দেখল, সে এখন সম্পূর্ণ খোন্কারের অধীন। কাজেই খোন্কার যা হুকুম করবেন তাকে তাই তামিল করতে হবে। তার ঠিকের ভাগ যদি মেন্দার জামাইকে দিয়ে দিতে হুকুম করেন খোন্কার, তবে দাউদ জানে তক্ষুনি তাকে তা দিয়ে দিতে হবে। তার সব ইচ্ছে ওলোট পালট হয়ে যাবে।

ঠিকের পরিমাণ কমে গেলে রোজগারের পরিমাণ কমে যাবে। ভেবেছিল, শাদীর আগেই সইফুনের জন্য একটা পাকা মন্‌জিল্ তৈরি করে ফেলবে এবং সইফুনকে সেটা দেন মোহর দেবে। তবে কি সব ভেস্তে যাবে? মেন্দার প্রস্তাবে সরাসরি না করে দেননি খোন্‌কার। কেন? এইটেই বড় চিন্তায় ফেলেছে দাউদকে।

"আরে মিঞা," গাজী গোলাম বলল, "চটপট চলেন। খান বাহাদুর আপনার জন্য বসে আছেন।"

দাউদের আত্মবিশ্বাস আরও একটু বহরে খাটো হয়ে এল।

শুকনো গলায় বলল, "দাঁড়ান, পুশাকডা এট্‌টু বদলায়ে নিই।"

॥ ৬ ॥

আবু তালেব যা আশংকা করছিলেন, তাই হ'ল। খাদু শেখকে ডাকাতি, ঘরে আগুন দেওয়া, নারীহরণ এবং খুনের প্রচেষ্টা, এই ক'টা সুস্পষ্ট অপরাধ ঘটাবার অভিযোগে দায়রায় চালান করা হল। এবং এইসব অপবাধ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা এবং ষড়যন্ত্রের দায়ে বেছে বেছে সাজ্জাদ, বশির, জমিরুদ্দি, খালেক, নাজিম, এদেরও গ্রেফতার করা হল।

শফিকুল ভেবেছিল খোন্দকার ফরিয়াদী পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ওরফে পুনুনু স্যাঁকরার পক্ষ হয়ে লড়বেন। কেন না এই মামলার তদ্বির করছেন মেন্দা। কিন্তু তা হল না। দিগীন মিত্তির মামলাটা নিলেন এবং খোন্দকার তাঁর পরামর্শদাতা হলেন। শফিকুল প্রমাদ গণল। একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। দিগীন মিত্তির আর খোন্দকার এক হয়ে যে মামলা লড়েন, তাঁর সামনে এ জেলায় দাঁড়াবে কে? আবু তালেব আর শফিকুল সৈয়দ সাহেবের কাছে ছুটল। সৈয়দ সাহেবও চিন্তায় পড়লেন। দেড় মাসের মাথায় ইলেক্‌শন। সৈয়দ সাহেব আর আবু তালেবের মাথায় সেই চিন্তা। আর শফিকুল ভাবছে তার বজানের কথা। সে উকিল অথচ তার বাজান হাজতে। সে উকিল হয়েও তার বাজানকে জামিনে বের করে আনতে পারছে না। সৈয়দ সাহেব শফিকুলকেই আসামীপক্ষে দাঁড়াতে বললেন। এবং সেই সংগে একটা চাল চালতে পরামর্শ দিলেন। শফিকুলকে বললেন, সে একটা চিঠি লিখে খোন্দকারকে অনুরোধ করুক এই মামলাটার আসামীর পক্ষে দাঁড়াতে। দেখা যাক কী জবাব তিনি দেন। হ্যাঁ তিনি করবেন না, জানা কথা। হয়ত চিঠির উত্তরও দেবেন না। তা হোক। যাই উনি করুন না, সেটাকে ইলেকশনে ওর বিরুদ্ধে হয়ত কাজে লাগানো যাবে।

এ'রা যাই করুন, শফিকুল দেখল, তাতে ইলেকশনে এ'দের কতটা লাভ হবে, সেই কথাই খালি তুলছেন। যেন খাদু কি তার বাজান ফাঁসিতে লটকালে ইলেকশনে যদি এ'দের লাভ বেশী হয়, তবে এ'রা হয়ত চাইবেন যে, তবে ওরা ফাঁসিতেই ঝুলুক। শফিকুল বিরক্ত হল। আবু তালেব সৈয়দ সাহেবের কথায় খুব উৎসাহ বোধ করল। শফিকুল সাফ বলে দিল ওতে কোনোদিক থেকেই কোনো লাভ হবে না। এই মামলার সংগে পলিটিক্‌সকে জড়াতে তাঁর ইচ্ছে নেই। এদের গ্রেফতারের পিছনে পলিটিক্যাল মতলব আছে, সে কথা মানছে শফিকুল। কিন্তু সেটা যখন প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যাবে না, তখন ওকথা ভেবে আর লাভ কী? তাব চাইতে কাজের হবে, এই মামলায় খাদু ছাড়া আর যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের কারোরই যে এর সংগে যোগ নেই, এই কথা প্রমাণ করা। খাদু যেহেতু কবুল করেছে, সে একটা গ্যাঙের সংগে পুনুনুর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল এবং সে তার কথা ফিরিয়ে নিতে রাজী নয়, অতএব তার ব্যাপারে অন্যভাবে অগ্রসর হতে হবে। তার কথা সৈয়দ সাহেব এবং আবু তালেব দুজনেই শেষ পর্যন্ত মানলেন, কিন্তু ভাব দেখে মনে হল, কথাটা তাঁদের মনঃপুত হয়নি।

দুদিন ধরে ফটিক বেল পিটিশন মুভ্ করার চেষ্টা করল। পারল না। সরকারপক্ষ প্রবল আপত্তি তুললেন। ফরিয়াদীর অপহৃতা পুত্রবধু এখনও নিখোঁজ। তার সন্ধান পাবার জন্যই আসামীদের কাস্টোডিতে রাখা দবকাব। এটা একটা ভাইটাল্ ব্যাপার। দায়রা জজ সরকারপক্ষের আপত্তি মেনে নিলেন। এবং খাদু ছাড়া অন্যান্য আসামীদের জামিনের জন্য যে আবেদন শফিকুল দাখিল করেছিল, জজসাহেব তা খারিজ করে দিলেন।

এই উপলক্ষে শফিকুল এবং দিগীন মিত্তিরের সংগে প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেল। শফিকুলের বক্তব্য ছিল দুটো। এক আসামীর জবানবন্দী। তাতে সে সাজ্জাদ ইত্যাদি আসামীদের নাম কোথাও করেনি। তার মক্কেলরা যে এই অপরাধের সংগে জড়িত এমন প্রমাণ পুলিসও দাখিল করতে পারেনি। কারণ এদের কেউই তার সংগে জড়িত ছিল না। এ পর্যন্ত কোনও গোল নেই। কিন্তু খাদু বলেছে, তার সংগে লোক ছিল। তারা কারা, খাদু সেকথা কিছুতেই বলছে না। পুলিস বলেছে তাদের হাতে বিশ্বাস করার মত প্রমাণ এবং সাক্ষী আছে যে ধৃত আসামীরাই খাদুর মদতদার। শফিকুল পুলিসকে চ্যালেনজ করেছিল, তাদের হাতে যদি সাক্ষী প্রমাণ থাকে তো তারা পেশ করুক। দিগীন মিত্তির এক কথায় তা উড়িয়ে দিলেন। এখন সেসব সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করলে তদন্তের ক্ষতি হবে। শফিকুলের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, আসামীদের অ্যালিবাই।

ঘটনার সময় খাদু ছাড়া অন্যদের কেউই গ্রামে ছিল না। নির্বাচনী মিটিং-এ বিভিন্ন জায়গায় ব্যস্ত ছিল। সব চাইতে বড় কথা, ফরিয়াদী পূর্ণচন্দ্র ওরফে পুনুনু খাদুকে যেমন নির্দ্বিধায় সনাক্ত করেছে অন্যদের কিন্তু তেমন করতে পারেনি। কিন্তু তার এ যুক্তিও জজ সাহেব গ্রহণ করেননি। আসামীদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করে তাদের জেল হাজতে রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তার এই ব্যর্থতা তাকে অত্যন্ত দমিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না যে, তার বাজান জেল হাজতে আটক রয়েছে। আর উকিল হয়েও সে তার বাপকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। এই ভাবনা তাকে অস্থির করে ছাড়ছে। বার লাইব্রেরি সে চষে ফেলল, যদি সে তার লড়াইয়ের কোনও নতুন সূত্র পায়। কিন্তু লাইব্রেরির তাক ভর্তি সাজানো বাঁধানো বইগুলো তাকে কোনও সাহায্য দিল না। আম্মার মুখখানা কেবল মনে পড়ছে তার। চাঁদবিবি বড় মুখ করে বলেছিল, তার ছাওয়াল বাড়ি থাকলে সাজ্জাদকে পুলিস হাজতে পুরতে পারত না। চাঁদবিবি দুনিয়ার কিছুই জানে না। আইন-কানুনের মারপ্যাঁচ যে কোথা দিয়ে ঘোরাফেরা করে তা চাঁদবিবি বুঝবে কি করে? কিন্তু তার আব্বু? পুলিস হাজতে ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। কিন্তু কোনও রকম চাঞ্চল্য বা ভয় তাঁর মধ্যে দেখেনি শফিকুল। বশিরকেই বরং হম্বি-তম্বি করতে দেখল। বলল, মেন্দা খোন্‌কার মিঞাকে জেতাবে বলেই তাদের এই মামলার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। সাজ্জাদ শুধু বলেছিলেন, আল্লাহ্‌ যা করাবেন তাই হবে। তুই বেশী ছটফট করিস নে। তার মানে তার বাপ তার মনের যন্ত্রণা টের পেয়েছে? ফটিক তার আম্মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। আনতে চেয়েছিল। কিন্তু চাঁদবিবি আসেনি। গোরু বাছুর দেখবে কে?

হাজী সাহেবও ঘুরে গেলেন একবার। বলে গেলেন, মামলার খরচ তার। এবং শুধু বলা নয় তার ব্যবস্থাও করে গেলেন। চাঁদবিবির জন্য শফিকুল যেন কোনও চিন্তা না করে, সে আশ্বাসও দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ শফিকুলের মাথায় একটা চিন্তা ঝিলিক মেরে গেল। পুনুনুর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে আড়াই মাস আগে। ডাকাতির পরদিনই খাদু থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে এবং সে এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত, এই মর্মে থানায় জবানবন্দী দাখিল করে। পুলিশ তার দুদিন পরে পুনুনুর এজাহার নথিভুক্ত করে। পরে একটু সুস্থ হবার পর পুনুনু তার কথা বদলায়। কি খাদু শেখের স্বীকারোক্তিতে আর কি পুনুনুর প্রথম এজাহারে, যা কিনা মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর সমান, কোথাও সাজ্জাদদের নাম নেই। শুধু তাই নয়, পুলিস এতদিন এদের গ্রেফতারও করেনি। খাদুর মামলা দায়রায় চালান দেবার ঠিক আগে-আগে পুলিস এদের গ্রেফতার করেছে। এফ আই আর-এ তো ওদের কারো নামই ছিল না। তবে শফিকুলের মক্কেলরা জামিন পাবে না কেন? দিগীন মিত্তির বিরোধিতা করছেন আর খোন্দকার তাকে মদত দিচ্ছেন বলে? এই কেস্‌টার ব্যাপারে সে মন্মথবাবুর পরামর্শ নেবে স্থির করল।

মৌলবী জয়নুদ্দিন এসে অনুযোগ করলেন, "ব্যাপারটা কি কন্‌ দিনি উকিল সাহেব! অ্যাঁ, নাওয়া-খাওয়া যে অ্যাকেবারে ছাড়ে দেলেন। বলি, আরশিতি এর মধ্যি ভুলুক দিয়ে নিজির চিহারাখান কি দেখিছেন অ্যাকবার? চোখ মুখ যে শুকোয়ে উঠল, তার কী? বিটি আসে আমাগেরে কবে কী?"

শফিকুল ম্লান হাসল। জবাব দিল না।

"না না, হাসলি চলবে না।" মৌলবী জয়নুদ্দিন বলে উঠলেন, "কাল রাত্তির আপনি কিছুই খান নি। রাত্তিরির খানা জামিল ষ্যামন দিয়ে গিছিল, আজ বিয়ানে আবার থালা ভর্তি খানা ত্যামনই ফিরোয়ে নিয়ে গেছে। ছবি বিটির খালা তাই দেখে খুব দুঃখু কান্তিছিলো। খোঁজউ নিতি ক'লো। কন তো ব্যাপারডা কী? শরীর-টরির ভালো আছে তো?"

এবার শফিকুল আর চুপ করে থাকতে পারল না।

বলল, "বড্ড ঝামেলায় আছি। আবুদু, বশির, ওদের কাউকেই জামিনে বের করে আনতে পারলাম না। জামিনযোগ্য মামলাতেও যদি জামিন না পাই, তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? অথচ আমি জানি, খোন্‌কার দাঁড়ালেই জামিন হয়ে যেতো।"

"কথাডা বড্ড শক্ত।" জয়নুদ্দিন বললেন, "জবাব দিয়া মুশ্‌কিল। তবে কি জানেন, অ্যাখন মুছলমানগের সুমায়ডা বড্ড খারাপ যাতিছে। ইছলাম বিপন্ন। বোঝলেন। আমাগের পক্ষে সুমায়ডা বড়ই সাংঘাতিক। আল্লাহ মালিক যা করেন।"

"আস্‌সালামু আলায়কুম।" আবু তালেব দুজনকেই সালাম জানিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ফটিক এবং মৌলবী জয়নুদ্দিন দুজনেই বলে উঠলেন, "ওয়া আলাইকুক্‌স্‌সালাম।"

মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসু চোখে আবু তালেবের দিকে চাইতেই শফিকুল পরিচয় করিয়ে দিল, "জনাব আবু তালেব চৌধুরী, আমাদের ওদিকের একজন বড় কৃষক নেতা। আর ইনি হলেন আমার আশ্রয়দাতা জনাব মৌলবী জয়নুদ্দিন সাহেব।"

"বুঝিছি।" মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "আপনিই খানবাহাদুরির বিরুদ্ধি ইলেকশনে দাঁড়াইছেন?"

আবু তালেব হো হো করে হেসে উঠলেন।

বলল, "জে না। আমি ইলেকশনে দাঁড়াইনি। তবে যিনি দাঁড়াইছেন তিনিউ আবু তালেব। তিনি হলেন মৌলবী আবু তালেব আর আমি হলাম আবু তালেব চৌধুরী।"

শফিকুল একটু অবাক হল। মৌলবী সাহেব তো খোঁজ রাখেন বেশ।

মৌলবী সাহেব মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কাজডা ভাল হয় নি। মৌলবী সাহেব হয়ে আজকের জমানায় হিন্দুগের মদত কেউ দিতি পারে, এ আমি ভাবতিউ পারিনে। আ্যাখন ইউনিটি চাই। মুছলমানগের মধ্যি শক্ত ইউনিটি চাই। না হলি ইছলাম বিপন্ন হবে। এই কথা কতিছিলাম।"

শফিকুল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবু তালেব ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ইউনিটি তো আমরাও চাই।"

"তাই না কি?" মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "তাহলি আর কথা কী? আপনারা মৌলবী ছাহেবরে উইড্র কত্তি কন। খান বাহাদুরার ভাই বলে বুকি জড়ায়ে ধত্তি কন। মুছলমানে মুছলমানে ইউনিটি হয়ে যাক। মুছলমানের আ্যাক ক্যানডিডেটই দাঁড়াক। তালি লোকে বোঝবে যে হ্যাঁ, মুছলমানরা আ্যাখন আ্যাক হইছে। মুছলমান আবার আগোয়ে যাবে।"

শফিকুল এই সরল বিশ্বাসী লোকটার কথাবার্তায় উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল। মৌলবী জয়নুদ্দিন খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান সাহেবকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। প্রায়ই আফসোস করতেন, মুসলমান হয়ে তিনি মুসলমানকে দেখেন না। তাঁর ছেলে মনু মিঞা ডিসট্রিক্ট বোরডে চাকরি না পাওয়ার ফলে দেশ ছেড়ে বর্মা মুলুকে চলে যেতে বাধ্য হল। এই আফসোস কতদিন যে করেছেন জয়নুদ্দিন তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর আজ সেই মৌলবী সাহেবই খোন্দকারকে কেমন অনায়াসে সার্টিফিকেট দিয়ে যাচ্ছেন।

"বোঝলেন মিঞা," মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, "আ্যাখন মুছলমানে মুছলমানে লড়াই করার মানেই হল হিন্দুগের সুবিধে করে দেওয়া। আ্যাখন আমাগের খুব হিসেব করে কাজ করার সুমায় আসে গেছে। ইছলামের সামনে আজ বড় বিপদ।"

আবু তালেব হাসতে হাসতে বললেন, "আমি আপনার সাথে একমত।"

"এক মত!" মৌলবী সাহেব খুব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "তবে আর কথা কী? আল্লাহর তরফের থে ইরশাদ হইছে যে এখেনে আ্যামন করে আপনার সাথে আমার দ্যাখা হবে। এর কি আর নড়চড় হতি পারে। তালি আমি খোনকাররে জানায়ে দিই যে গোল মিটে গেছে। মৌলবী সাহেব উইড্র কত্তিছেন? কী কন?"

"দ্যাখেন মৌলবী সাহেব, আপনি একজন শ্রদ্ধেয় লোক," আবু তালেব ঠোঁটের হাসি বজায় রেখে বলে চলল, "আপনারে কই, নিজেগের মধ্যি রেষারেষি আমাগেরউ পছন্দ হয় না। আপোসে যদি আ্যাকজন সরে দাঁড়ান, তালি সব চাইতি ভাল হয়। আমরাউ সিডা চাই। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, সরে দাঁড়াবেন কিডা? যাঁর পিছনে টাকার জোর বেশী তিনি? না যাঁর পিছনে আদর্শ এবং সমর্থকের জোর আছে তিনি?"

মৌলবী জয়নুদ্দিনের উথলে ওঠা উৎসাহ এই প্রশ্নে অনেকটা চুপসে গেল। তিনি আমতা আমতা করতে থাকলেন। দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলোলেন।

তারপর বললেন, "দেখতি হবে, কারে দিয়ে কাজডা ভাল হয়। ইবার মুছলমানরা কাউনছিলি মেজরিটি হবে বলে শুনতিছি। তালি তারাই তো মন্ত্রী হবে। তাই না? তালি তো চৌকশ লোকই পাঠাতি হয়। তাই না? যারে তারে তো মন্ত্রী হবার জন্যি পাঠানো যায় না। আসল কথা হলো কওমের খেদমত। এই কাজ কাউনছিলি যায়ে করার মত এলেম যার আছে, তারেই আমাগের পাঠাতি হবে। খোনকার এই সেদিন কথাটা কলেন। তা মিথ্যে তো আর কন নি।"

অনেকক্ষণ হাবুডুবু খাবার পর হঠাৎ ডাঙায় পা ঠেকলে লোকের মনের অবস্থা যেমন হয়, শেষের কথাটা বলতে পেরে মৌলবী জয়নুদ্দিনেরও সেই রকম বোধ হতে লাগল।

তিনি উৎসাহিত হয়ে কথাটা দোহরালেন। "কাউনছিলি যায়ে মুখ খুলতি হবে তো। দেখতি হবে, যারে পাঠাবো তার সে এলেম আছে কিনা। কেননা কওমের ভবিষ্যৎ কাউনছিলিই ঠিক হবে।"

"মৌলবী সাহেব," আবু তালেব ধীরভাবে বললেন, "খোনকারের কথাটা শুনতি খুব ভাল। কিন্তু আসলে উডা অচল আধুলী। ক্যান, তা আপনারে কই। কাউনসিলি আগে কি মুসলমান ঢোকেনি? ঢুকিছে। এমন কি মন্ত্রীউ হইছে। মান্যবর আলহাজ্জ সার আবু মোহাম্মদ আবদুল করিম গজনভী সাহেবের মতন মুসলিম নেতা কি সেচমন্ত্রী হন নি? মান্যবর খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব কি শিক্ষা দফতরে ওজারতি করেন নি? নবাব কে জি এম ফারুকী কি কৃষি ও সমবায় দফতরের মন্ত্রী ছিলেন না? কাউনসিলি যায়ে কথার চোটে তুবড়ি ফাটাবার এলেম এনাদের কি কম ছিল? না, ছিল না। বরং ঐ এলেমডাই ছিল, আর কিছু ছিল না। তাই মুসলমান চাষী মুসলমান সেচমন্ত্রীর আমলে চাষের জল পায়নি। প্রচণ্ড খরায় ক্ষেতের ফসল খানিকটা গজায়ে উঠে ঝামড়া-পুড়া হয়ে মাঠেই ঝরে গেছে। মুসলমান সমবায় মন্ত্রীর আমলেই শত শত মুসলমান চাষীর বন্ধকী জমি মহাজনের হাতে চলে গেছে। যে সুমায় বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান এবং কলকাতা ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যানসেলারও মুসলমান এবং তাও আবার সার হাসান সোহরা-ওয়ারদির মতন আ্যামন একজন সুযোগ্য ভাইস চ্যানসেলার, সেই সুমায়উ মুসলমানের ছাওয়ালেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কী সুবিধে পাইছেন, তা মৌলবী সাহেব, আপনার মত একজন আলেমই আমার

চাইতি ভাল কতি পারবেন।”

আবু তালেবের কথা খন্ডন করতে পারছিলেন না দেখে জয়নুদ্দিন এতক্ষণ মনে মনে গরম হচ্ছিলেন। আচ্ছা ত্যাদড় লোক তো। অ্যামনভাবে কথা কয় যে তার আর কাটান দেবার জো থাকে না। কিন্তু যে মুহূর্তে আবু তালেব তাঁকে একজন আলেম বলে মেনে নিল অমনি তাঁর সব রাগ জল হয়ে গেল। লোকটা জানে শোনে বেশ। বেশ আদবতমিজ দুরস্ত।

মৌলবী জয়নুদ্দিন বলে উঠলেন, “ইডা আপনি লাখ কথার অ্যাক কথা কইছেন। নাজিমুদ্দিনির কথা আর কবেন না। দিনাজপুরির শিক্ষা সম্মেলনে আমি গিছিলাম। নাজিমুদ্দিন শিক্ষামন্ত্রী। উনিউ গিছিলেন। উনি কলেন, সরকারী চাকরির সংখ্যা যে নিতান্তই অল্প, মুছলিম যুবকেরা যেন সে কথাডা ইয়াদ রাখেন। অতএব চাকরি পাব না বলে তারা য্যানো উচ্চশিক্ষা থেকে নিজেগেরে বঞ্চিত করে না রাখেন। শুনিছেন কথা। জমি জিরেত বন্ধক রাখে কি বেচে দিয়ে ছাওয়ালরে বি এ এম এ পাশ করালাম। অ্যাখন মন্ত্রী কচ্ছেন যে তারা য্যানো চাকরির ভরসায় ল্যাখাপড়া না করে। তালি মুছলমানের ছাওয়ালগুলো ল্যাখাপড়া শিখে করবে কী? ঘুড়ার ঘাস কাটবে?”

শফিকুল এতক্ষণ এ'দের কথা শুনছিল। সে ভাবল, চাকরি। ঘুরে ফিরে সেই চাকরি। এই চাকরিই না আজ হিন্দু মুসলমানে গুঁতোগুঁতির প্রধান কারণ। আর তার জন্যই রাজনীতির এত আড়ম্বর! এত বিদ্বেষ! এত জল ঘোলা! অনেক অনেক দিন আগে মেজোবাবু তাকে বলেছিলেন, ফটিক মিঞা, দেখবে হিন্দু আর মুসলমান, এদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা যত বাড়বে, সাম্প্রদায়িকতাও তত বাড়বে। কারণ হিন্দু আর মুসলমান এই দুই শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হবে চাকরি আর রাজনীতির সীমাবদ্ধ পরিসরে। এই গুঁতোগুঁতি কেবল চেয়ারের দখল নিয়ে। হয় কেরানীর চেয়ার আর না হয় মন্ত্রীর চেয়ার। এই তো। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকে, চেতনাকে, বোধকে দেশের বৃহত্তর আঙিনায় প্রসারিত করে না দিই, সমগ্র দেশকে যদি দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং নিরানন্দের কবল থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে না যাই, তেমন বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ না করি, এবং তাকে কাজে রূপ দেবার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সুযোগ আদায়ের যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু আর মুসলমান শুরু করেছে, এর মধ্যে কোনও কল্যাণ আমি দেখতে পাইনে, এ বিভেদকেই বাড়িয়ে দেবে। এবং এমন একদিন আসতেও পারে যেদিন হিন্দু মুসলমানের গলায় আর মুসলমান হিন্দুর গলায় সত্যি সত্যিই ছুরি বসাতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু তাতেও কি এ সমস্যার সমাধান হবে ফটিক? না। কারণ চাকরির সংখ্যা কখনোই অসীম করা যাবে না, রাজনৈতিক মসনদের সংখ্যাও না।

আবু তালেব হাসলেন। বললেন, “তালি বুঝে দেখেন।”

“বুঝে আর দ্যাখব কী?” মৌলবী জয়নুদ্দিন বললেন, “হাডে হাড়ে বুঝতিছি। বড় ছাওয়াল মনু চাকরি চাকরি করে দেশছাড়া হয়ে গেল।”

আর দ্যাখ ফটিক, আমাদের নেতাদের কান্ড। যেখানে মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, ওঁরা সেইখানে মিলন মিলন করে চেঁচাচ্ছেন। মেজোবাবুর গলার ধীর স্বরটা শফিকুলের মনে বেজে উঠল। এটা স্রেফ ভন্ডামী। স্রেফ চালাকি। যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় নেমে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে মিলনটা হয় কি করে? তবে কি হিন্দু মুসলমানে মিলনের ক্ষেত্র নেই? শফিকুল জিজ্ঞেস করেছিল। মেজোবাবু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আছে। তবে তা আছে সমগ্র দেশের আঙিনায় ছড়িয়ে। দেশ থেকে অভাব, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা এবং নিরানন্দ দূর করার ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যেই সহ-যোগিতার আহ্বান আছে। মিলনের ক্ষেত্র তৈরি হবে সেখানে, যেখানে কর্মের উদ্যোগ আছে। উপর থেকে রাজনীতির যাদুদন্ড নেড়ে এ কাজ সমাধা করা যাবে না। নিজেকে যুক্ত করতে হবে কর্মের সঙ্গে এবং কাজ শুরু করতে হবে নিচের থেকে।

“বাংলার কৃষকের অর্থাৎ মোসলেম জনসাধারণের প্রধান সমস্যা হচ্ছে রোগ ও ঋণ।” আবু তালেব বললেন।

শফিকুলের, বাংলার কৃষকের অর্থাৎ মুসলমানের, এই কথাটা কানে খট্ করে লাগল। সে আবু তালেবকে বলে উঠল, “বাংলার কৃষকের অর্থাৎ হিন্দু কৃষকেরও প্রধান সমস্যা হচ্ছে রোগ ও ঋণ।” তার কথায় খানিকটা ঝাঁঝ ফুটে উঠল। “হিন্দু কৃষক কি আপনাদের চোখে কৃষক নয়?”

আবু তালেব শফিকুলের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসলেন। বললেন, “জে। ঠিকই কইছেন। হিন্দু কৃষকউ কৃষক এবং তারউ প্রধান সমস্যা হতিছে রোগ ও ঋণ।”

শফিকুল বলল, “তাহলে এই কথাটা আপনারা বলেন না কেন? এদিকে তো আপনারা বলে চলেছেন, বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান, হাকিম হিন্দু কয়েদী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান।”

“জে বলি।” আবু তালেব কথাটা শান্তভাবে বললেন। “প্রজা আন্দোলনরে গড়ে তুলার জন্যি কথাডা ঐভাবে পাড়তি হয়।”

“কিন্তু কথাটা তো আংশিক সত্য। সবটা না বললে লোকে কি বুঝবে? বুঝবে বাংলার হিন্দুমাত্রই জমিদার আর মুসলমান মাত্রই প্রজা। হিন্দুমাত্রই মহাজন আর মুসলমান মাত্রই

খাতক। কিন্তু একথা তো সত্য নয়।"

"আলবত সত্যি"। মৌলবী জয়নুদ্দিন বেশ জোর দিয়ে বলে উঠলেন। "বাংলার হিন্দুগের আশি পারছেনট্ হচ্ছে জমিদার আর বিরেনব্বুই পারছেনট্ হচ্ছে সুদখোর মহাজন। ইরাই তো আমাদের শুষে খাচ্ছে। তা সে কথাডা কতি দোষ কী?"

"দোষ কিছু নয়", শফিকুল বলল। "দোষ আপনাগের দেখার বা বলার, যা বলেন তাই। মৌলবী সাহেব, বাংলার হিন্দুদের শতকরা আশিজন জমিদার নয়, জমিদারদের শতকরা আশিজন হিন্দু, তেমনি হিন্দুদের শতকরা বিরানব্বই জন সুদখোর মহাজন নয়, কাবুলী মুসলমানও এদেশে সুদ আদায়ের জন্য আমার আপনার গলায় গামছা দিয়ে টানাটানি করে, আর তখন শরা-শরীয়ত খেলাপ করার জন্য তাদের মাথায় আল্লাহর আযাব নেমে আসে না, সে যাই হোক, সত্য হচ্ছে এই যে শতকরা বিরানব্বই জন হিন্দু সুদখোর নয়, সত্যটা বোধ হয় এই যে সুদখোর মহাজনদের শতকরা বিরানব্বই জন হিন্দু, তাই না?"

আবু তালেব শুধরে নিলেন, "জে। তাই বটে।"

মৌলবী জয়নুদ্দিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, "আরে ও অ্যাকই কথা। হিন্দু মাত্রই সুদখোর।"

"জে না।" শফিকুল বলল "না মৌলবী সাহেব। এক কথা নয়। হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজন সংখ্যায় কত হবে? মোট হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগই হোক বড় জোর? কী বলেন আবু তালেব সাহেব?"

আবু তালেব বললেন, "জে। তাই হবে। কি সামান্য বেশীউ হতি পারে।"

"তবে", শফিকুল বলল, "এইবার বলুন, শতকরা আশি পঁচাশি ভাগ হিন্দুই প্রজা, খাতক এবং চাষী কি না?"

"জে।" আবু তালেব স্বীকার করলেন। "তা সত্যি।"

"তাহলে আপনারা প্রজা আন্দোলন গড়ার জন্য নির্বিচারে এই যে নিরন্তর বলে চলেছেন, বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান, এতে কি একথা মনে হয় না যে বাংলার চাষী খাতক প্রজা, এদের মধ্যে হিন্দু নেই।"

আবু তালেব কী বলতে যাচ্ছিলেন, মৌলবী জয়নুদ্দিন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

বললেন, "আমাগের অ্যাত সুক্ষ্ম বিচারে যাওয়ার দরকারডা কী, আমি তো সিডাই বুঝিনে। উরা কি কোনও বিষয়ে আমাগের রেয়াত করে। তবে আপনারে কই উঁকিল ছাহেব। আমাগের আর অত সুক্ষ্ম বিচার করার দরকার নেই। টিট্ ফর ট্যাট, আমি তো মনে করি, মুছলমানগের বাঁচতি হলি হিন্দুগের সাথে অ্যাখন এই সম্পক্কো পাতাতি হবে। টিট্ ফর ট্যাট। সব হিন্দুরি জমিদার আর মহাজন বলা হইছে বলে আপনি নারাজ হতিছেন কিন্তু হিন্দুরা যখন ইসকুল পাঠ্য বইর মধ্যি সব মুছলমানেরে চোর বানায়ে দ্যায়, কই কোনও হিন্দুরি তো তা নিয়ে কথা কতি শুনিনে? বছর দুই আগে আমি খুলনেয় আমার শালার বাড়ি গিছিলাম। গরমের ছুটিতি তার মাজে মেয়ে হুগলীর থে বাপের বাড়ি আইছিল। অ্যাকদিন সকালে উঠে শুনি আমার শালার মেয়ের ঘরের নাতিডে বেশ জোরে জোরে পড়তিছে, মুছলমান হইলেও হুশেন শাহো সেই টাকাগুলি লইয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহা প্রভুর হস্তে অর্পণ করিলেন। গল্পডার নাম বোধহয় সততার পুরস্কার কিংবা ঐ কছমের কিছু একটা হবে। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হোছেন শাহ বাহমনীরী নিয়ে এই গল্পডা ফাঁদা হইছে। ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছেলেন বলেই নাকি তাঁর বংশের নাম হইছে বাহমনী। শুনিছেন কথা! মুছলমান হইলেও হোছেন শাহ, অ্যাত বড় অ্যাকটা সততার কাজ করে ফেলিছেন। এখেনে "মুছলমান হইলেও" এ কথাডা বলা ক্যান্? তার মানে মুছলমানের পক্ষে যিডা সাধারণ অভ্যেস, সেই অসততা আর পরস্বাপহরণের লোভ হোছেন শাহ দমন কত্তি পারিছেন। তালি বুঝে দ্যাখেন মুছলমান সম্পক্কে হিন্দু লেখকের ধারণাডা কী? মুছলমান হইলেও! আঁ! কথাডা মনে পড়লি আমি আর রাগ সামলাতি পারিনে। শুধু এই অ্যাকখান ইসকুল পাঠ্য বই নয় উঁকিল ছাহেব। আরউ আছে।"

মৌলবী জয়নুদ্দিন এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তাঁর গলার দুটো রগ ফুলে উঠল।

"বঙ্গবাণী কি লিখিছিল জানেন? বঙ্গবাণী তো দেহি স্বদেশীওলাগের গীতা বেদ বাইবেল। রামপুরির নবাব কাশী হিন্দু ইউনিভারছিটির অ্যাককালীন অ্যাক লক্ষ টাকা দান এবং বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বৃত্তি দেবেন বলে ঘোষণা করিছেলেন। তা সেই খবরডা বঙ্গবাণীতি কী ভাবে ছাপা হইছিল জানেন? আমি মুখস্থ করে রাখিছি। এই শোনেন। মুছলমান হইলেও তিনি অর্থাৎ কিনা রামপুরির নবাব ছাহেব, সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে পারেন বলিয়া তাঁহার নিকট বিধর্মী বলিয়া কেহ হেয় বা তুচ্ছ নয়। আচ্ছা কন, এই লেখাডা পড়লি যে-মুছলমানের শরীরি মানুষির চামড়া আছে তার খুন টগবগ করে ফোটবে কি ফোটবে না? কই, কোনও শিক্ষিত হিন্দু তো বঙ্গবাণীর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেনি। তালি কি মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাববার দায় হিন্দু সম্প্রদায় অ্যাকা মুছলমানগের উপরই ছাড়ে দেছেন? মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিবার দরকার হিন্দুগের নেই। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবার শিক্ষে দেছেন কারা? হিন্দুরা! হায় আল্লাহ! মুছলমানগের সম্পক্কে

হিন্দুগের মনে সত্যিকারের ধারণাডা যে কী সিডা এই 'মুছলমান হইলেও' কথাডার মধ্য দিয়েই ফুটে বের হতিছে। ওগের সংগে আমাগের কী করে মিল হবে, কন্? হাতে হাত মিলোতিউ যে দুখোন হাত লাগে।"

মৌলবী জয়নুদ্দিনের মর্মবেদনা এমন আন্তরিকভাবে ফুটে উঠল যে শফিকুলের আর তর্ক করতে ইচ্ছে করল না। কেননা শফিকুল তো জানে যে মৌলবী সাহেবের এই আবেগের পিছনে যে তথ্যগুলো রয়েছে তা অকাট্য। যেদিন থেকে মুসলমানরা ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছে, মধ্যবিত্ত সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, সেইদিন থেকেই শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের কাছ থেকে শিক্ষিত মুসলমান আঘাত খেতে শুরু করেছে। তার নিজের জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। তাকে হেড মাস্টারের স্থায়ী পদ দেওয়া হয়নি, তাকে হারডিনজ হসটেলে সীট দেওয়া হয়নি। তার একমাত্র কারণ তো এই যে সে মুসলমান।

নিচের দিকে যেখানে এতটা ফাঁক সেই ফাঁক বুজোবার চেস্টা না করে পলিটিকসের ময়দানে মিলন মিলন বলে আওয়াজ তুললে কী ফল হবে? শফিকুল ভাবতে লাগল। এটা তার কাছে একটা বড় প্রহেলিকা। তবু অন্ধ বিদ্বেষ সমাধান আনতে পারে না। সে এটা বোঝে। বিদ্বেষ বিচার-বিবেচনাকে খেয়ে ফেলে। তাই শফিকুল বিদ্বেষকে এড়াতে চায়। এড়িয়ে চলে।

আবু তালেব মৌলবী সাহেবকে একটু হেসে বললেন, "আমরা কিন্তু আমাগের কথার থে সরে গিইছি। কথাডা ছিল, নিজিগের মধ্য খেয়োখেয়ি কীভাবে বন্ধ করা যায়।"

মৌলবী সাহেব কথাটা লুফে নিলেন।

"মুছলমানরে যদি বাঁচতি হয় তালি সবাইরি অ্যাক হয়ে লড়তি হবে। মুছলমানরে মুছলমান হতি হবে। আমাগের শত্তুররা য্যান্ আমাগের দুর্বলতার সুযোগ নিতি না পারে। অ্যাকতাই বল। বোঝলেন তো।"

শফিকুল জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের শত্রু কে?"

মৌলবী সাহেব বললেন, "হিন্দু। এতে আবার সন্দেহ আছে না কি?"

শফিকুলের হঠাৎ কেন যেন স্যার আবদুর রহমানের একটা উক্তি মনে পড়ে গেল। সে তখন মাস্টারি করে, কথাটা সেই তখন শুনেছিল। সেই থেকে কথাটা মনে গেঁথে আছে। স্যার আবদুর রহমান কোনও একজন হিন্দু নেতার মুখের উপর বলেছিলেন, লুক হিয়ার, ইউ ফরগেট দ্যাট ইউ হিন্দুজ হ্যাভ গট ওনলি ওয়ান এনিমি, দি ব্রিটিশারস, টু ফাইট, হোয়ার অ্যাজ উই মুসলিমস হ্যাভ গট টু ফাইট থ্রি এনিমিজঃ দি ব্রিটিশারস অন দি ফ্রনট, দি হিন্দুজ অন দি রাইট অ্যানড দি মোল্লাজ অন দি লেফট। দেখুন আপনার হিন্দুরা এ কথাটা ভুলে যান যে আপনাদের শুধু একটা শত্রু, ব্রিটিশ, তার সংগেই আপনাদের লড়াই করতে হবে, সে ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের লড়াই করতে হবে তিনটে শত্রুর সংগেঃ আমাদের সামনের শত্রু ব্রিটিশ, ডাইনের শত্রু হিন্দু আর বাঁ দিকের শত্রু মোল্লারা। আজ শফিকুলের মনে হল স্যার আবদুর রহমানের কথার তাৎপর্য সে যেন বুঝতে পারছে। তার সামনের শত্রু ব্রিটিশ, তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হবার পথে প্রধান বাধা হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষার পথ জুড়ে তো হিন্দুরাও দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত সেই শ্রেণীর হিন্দু যারা তাদের সম্পর্কে "মুসলমান হইলেও" ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু মৌলবী জয়নুদ্দিনের সামনে আর কোনও শত্রু নেই। শত্রু একটাই। হিন্দু। এবং এই মনোভাব আজ অধিকাংশ মুসলমানই পোষণ করেন। শফিকুল এই কারণেই কারও সংগে মিলতে পারে না। তার কাছে মেজোকর্তা কি শত্রু? না না। সে একথা ভাবতেও পারে না।

আবু তালেব বললেন, "অ্যাট্টা সুজা কথা আপনারে জিজ্ঞেস করি, এই ইলেকশনে একই কেন্দ্রে যেখেনে দু তিন জন মুসলিম ক্যানডিডেট দাঁড়ায়েছেন, সেখেনে অ্যাকতাডা হবে কিসির ভিত্তিতি?"

তারিণী মাস্টার কি আমার শত্রু? ফটিক নিজেই তার প্রশ্নের জবাব দিল, না না।

"কিসির ভিত্তিতি মানে? অ্যাকজন মাত্র ক্যানডিডেট সেখেনে থাকবেন আর সবাই উইড্র করবেন।"

মন্মথবাবু কি আমার শত্রু? না না।

"যিনি থাকবেন, তিনিই বা ক্যান থাকবেন? আর যাঁরা উইড্র করবেন, তাঁরাই বা ক্যান উইড্র করবেন? এর নিরিখডা কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?"

"নিরিখডা খুবই সুজা। মুছলমানের স্বার্থ যে দ্যাখবে, শুধু সে-ই ক্যানডিডেট হবে।"

"আপনি যত সুজা ভাবতিছেন মৌলবী সাহেব, ব্যাপারডা আসলে অত সুজা না।"

মিঃ পালিত আমার শত্রু? না না না।

"ব্যাকা দেখতিছেন কনে, তালি সিডা কন?"

"অ্যামন কোনও ক্যানডিডেটের কথা ভাবতি পারেন আপনি যিনি আপনারে কবেন যে তিনি মুসলমানের স্বার্থ দ্যাখবেন না? সব্বাই তো কবেন যে তিনিই মুসলমানের স্বার্থ সবার চাইতি বেশি দ্যাখবেন। তাই না?"

"আরে তিনি কলিই তো হ'লো না—"

মিস্ পালিত? মিস পালিত কি আমার শত্রু?

"আমাগেরউ বিচার করে দেখতি হবে যে কিডা ভালো আর কিডা মন্দ?"

মিস পালিত তো হিন্দু। মিস পালিত কি আমার শত্রু? এই প্রশ্নটাই ফটিকের কাছে হাস্যকর লাগল।

"বিচার তো করবেন বোঝলাম। তা ক্যানডিডেটের বিচার যে করবেন, কী দেখে?" আবু তালেব জিজ্ঞাসা করলেন। "ক্যানডিডেটের ছুরৎ দ্যাখবেন? তার খানদান দ্যাখবেন? না তার প্রোগ্রাম দ্যাখবেন?"

এই কারণেই শফিকুল হিন্দুমাত্রকেই "এনিমি অন দি রাইট" বলে ভাবতে পারে না। নিশ্চয় এমন হিন্দু আছে "আমাদের শত্রু কে" একথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র জবাব দেবে, কেন, মুসলমান। এবং তাদের সবাই যে মতলববাজ একথা ভাবারও মানে হয় না। মৌলবী জয়নুদ্দিনের মত সোজা-বুঝের লোকও যথেষ্ট আছেন হিন্দুদের মধ্যে। যাঁরা ভীত, ত্রস্ত মুসলমানদের ভয়ে।

মৌলবী জয়নুদ্দিন এবার প্যাঁচে পড়ে গেলেন। কী জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না।

মোল্লাজ আর অন আওয়ার লেফট। শফিকুল মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, তাঁরা আছেন। কিন্তু এই বিভেদ সৃষ্টির দায় কি একমাত্র মোল্লাদের? শফিকুলের মন এই সহজ সমীকরণে সাড়া দিল না। তার চাইতে মেজোকর্তার উক্তিটাই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকরি এবং রাজনীতি, এই দুই-এর অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব।

"প্রোগ্রামই হল ক্যানডিডেটের ভালো মন্দ যাচাই করার প্রিকৃত কষ্টি পাথর।" আবু তালেব বললেন, "মৌলবী সাহেবই যখন কথাডা তুলিছেন তখন তাঁর কাছেই আমাগের আরজ যে আপনিই সালিশ হন, দু পক্ষের প্রোগ্রাম দ্যাখেন, বিচার করেন, তারপর আপনার বিচারে যে ক্যানডিডেটরে নীরেস ব'লে মনে হবে তারে উইড্র করতি কন। কী কন্, ফটিক ভাই।"

মৌলবী সাহেব "ইডা ভাবে দ্যাখার কথা, ইডা ভাবে দ্যাখার কথা" বলে চিন্তিত মনে মাথা নাড়তে লাগলেন।

তখন আবু তালেব শফিকুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওগের জামিনির কন্দুর কী করলেন?"

শফিকুল বলল, "এখেনে আর কিছু হবার নয়। হাইকোরটে মুভ করতে হবে। কলকাতায় যেতে হবে বুঝলেন?"

"তা'লি ভাই আর দেরি করবেন না," আবু তালেব বললেন, "আপনি কলকাতায় চলে যান। যায়ে যা করবার চটপট সা'রে ফেলেন। ইলেকশানের আগে আপনার বাজান, বশির আর অন্যাগের বের করে আনতিই হবে।"

মৌলবী সাহেব এবার একটু অস্বস্তিতে পড়লেন। দাউদ বলেছে শফিকুলের বাপ ওদিকের একজন পান্ডা এবং খোন্দকারকে হারাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। অতএব তার মুক্তি মানেই খোন্দকারের বিপদ বাড়া। এই মুহূর্তে তিনি চাইছিলেন না যে খোন্দকারের বিপদ বাড়ুক। কেন না তিনি দাউদের মত ছেলেকে ঢালাও ঠিকের কাজ দিয়েছেন। এবং সোয়াস্তির কথা যে শেষ পর্যন্ত সইফুন দাউদকে শাদী করতে রাজী হয়েছে। তথাচ সাজ্জাদ মোল্লার মত একজন ঈমানদার মুসলমান বিনা দোষে হাজতে পচছে, এটাও তার দেল সায় দিচ্ছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর দেলটা খচখচ করতে লাগল।

॥ ৭ ॥

মেহমানদারি দেখাচ্ছে বটে দাউদ। আজ ওর বাড়ি ভর্তি। বিরিয়ানির খোশবুতে বাড়িটা ম ম করছে। শহরের দুজন নামকরা বাবুর্চিকে সে কাজে লাগিয়েছে। ওরা গাজী গোলামেরই লোক। রসুইখানার তদারক গাজী গোলাম নিজেই করছে। এতক্ষণ হাঁকডাকে বাড়িটা সরগরম করে রেখেছিল। একটু আগে "এই আসতিছি" বলে সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেল গাজী।

বাজান, বড় আম্মা আর ছুটকি ভাবী কালকেই এসে গিয়েছে। নেয়ামত আসতে পারেনি। আর আসেনি ছোট আম্মা। তার আর নেয়ামতের নিজের মা। এরা পরে একদিন এসে সইফুনকে দেখে যাবে। আজ দেখবে বড় আম্মা আর ছুটকি। ছুটকি এসেছে, এতেই খুব খুশি হয়েছে দাউদ। ছুটকিকে দেখে তো মনে হয় না, তার কোনও রাগ আছে দাউদের উপর। বরং দাউদ ভাই-এর পয়সায় সে যে এতবড় একটা শহর দেখতে আসতে পেরেছে, তাদের গ্রামের, তাদের বাড়ির একঘেয়ে জীবন ছেড়ে, এই জন্যই দাউদ ভাই-এর উপর বরং খুশিই হয়ে উঠল ছুটকি।

দাউদ তার বৈঠকখানা আর অন্দরকে পর্দা দিয়ে একেবারে আলাদা করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আজ বাড়িটাকে দেখে দাউদের মনে হচ্ছে এটা একটা গেরস্থ বাড়ি। ইচ্ছে ছিল আম্মা ভাবী এরা আসবার আগেই কাতলা তাদের খেদমত করার জন্য এক বাঁদী যোগাড় করে আনতে পারবে। খোনকারের বাড়িতে যে-সব মেয়ে ঝি-গিরি করে তাদেরকে খোনকারের পরিবারের লোকেরা বাঁদী বলে ডাকে। সেই থেকে দাউদের বাঁদী পোষার সখ হয়েছে। বিশেষ করে সইফুনের জন্য। তাই সে কাতলাকে এত করে তাগিদ দিয়েছে। আজ সইফুন এই বাড়িতে প্রথম আসবে। এসেই যদি

দেখে ফাই ফরমা'স খাটার লোক সব সময় হাজির আছে তাহলে হয়ত দাউদ সম্পর্কে সইফুনের ধারণা আরও একটু ভালো হত। দাউদ যে নিতান্ত হেঁজিপেঁজি লোক নয়, বাঁদী পোষার হিম্মত রাখে সেটা সইফুন টের পেত। কাতলাডা [illegible] একেবারে অকম্মার ধাড়ি। শুয়োর! দাউদ বেশ বিরক্ত হল তার উপর। গাজীকে সে আজ বলেছে বাঁদীর কথা। গাজী কথা দিয়েছে যোগাড় করে দেবে। নিশ্চিন্ত হয়েছে দাউদ। গাজীর কথার দাম আছে। কাতলাটা শুয়োর!

রোদ বাড়ছে। বড় আম্মা সেই তখন থেকে পানের বাটার সামনে বসে খালি সুপারি কাটছে। সামনে ডাঁই করা পানের খিলি। কাতলা ঘুরে ফিরে এক একবার সে ঘরে ঢুকছে তত্ত্বতালাশ নিতে। দাউদের কড়া হুকুম তার আম্মা আর ভাবীর যেন কোনও অযত্ন না হয়। কিন্তু মুশকিল এই যে কাতলা যতবার সে ঘরে ঢুকছে ততবার বড় আম্মা বেগানা মরদ দেখে লজ্জায় জড়সড় হয়ে ঘোমটা টেনে দিচ্ছে। এবং কাতলার প্রশ্নের উত্তরে কিছুমাত্র জবাব দিচ্ছে না। শুধু মুখ ফিরিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকছে। এ আবার ক্যামন ধারা ব্যাপার! লোকটা হুট হুট করে এই ঘরেই বা অ্যাত ঢুকাতেছে ক্যান! বড় আম্মা এমন কি ভাবীরও জড়সড় ভাব দেখে কাতলা অপ্রস্তুত হয়ে সরে পড়ছে।

এ বাড়িতে সব থেকে স্বস্তিতে আছে রহমান। এক কাশিটা ছাড়া আর সব কিছুই তার পছন্দ হয়েছে। এক রহমানই স্বচ্ছন্দে কাতলাকে হুকুম করে যাচ্ছে। তার বড়ভাই যেভাবে নফরাকে হুকুম দেন সেই কায়দায়। বেশ বাড়িতে আছে দাউদ। পাকা বাড়ি। বেশ বেশ। এই রকমই পছন্দ তার। বারান্দায় একখানা জলচৌকির উপর বসে একমনে গড়গড়া টানছে। আর উঠানের একপাশে যেখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে বাবুর্চিরা বড় বড় ডেগে রসুই করছে সেই দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মাঝে মাঝে বাতাসে বিরিয়ানির খোশবু যখন তার নাকে এসে লাগছে তখন হঠাৎ করে তার বড়ভাই এর বাড়ির কথা মনে পড়ছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যে এই বাড়ির মালিকের বাপ সে সম্পর্কে অতমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছে। আর আশ্চর্য তক্ষুনি তার কাশি আসছে দাউদের সব দিকে পরিবর্তন দেখে রহমান খুব খুশি। আল্লাহ কখন কারে কী যে দ্যান তা আগের থে কওয়া যায় না আল্লাহর বরকত কখন যে কার উপর ক্যামন ভাবে আসে পড়ে সিডাউ কেউ কতি পারে না। দাউদ ব্যস্ত ভাবে তার সামনে ঘুরছে ফিরছে একে তাকে হুকুম দিচ্ছে। রহমান তা দেখছে আর অবাক হচ্ছে। অথচ এই ছাওয়ালের জন্যই না কত চিন্তা তাকে করতে হয়েছে। সেই ছাওয়াল অ্যাখন ক্যামন সুন্দর ঘুরে গেছে। হাতে পয়সাও হয়েছে [illegible] মনে হয়। ভুড়ুক ভুড়ুক গড়গড়া টানছে রহমান। মাঝে মাঝে কাশির দমকে অস্থির হয়ে উঠছে আর জলচৌকির উপর বসে বসে সুখস্বপ্ন দেখছে। ছাওয়াল কইছে এক মৌলবীর মেয়েরে নাকি এখানে শাদী করবে। তা করুক! অজ দাওয়াত খাতি তারা আসবে। আসুক! ছাওয়ালের [illegible] যদি খুশি হয় হোক। রহমানও তাতে খুশি হবে। খালি ছাওয়াল য্যান গরিবের বাপ মারে না ভোলে বাস এই হল কথা। আর কওয়ার কী আছে? আর হ্যাঁ ছাওয়াল তারে যদি হজ করায়ে আনতি পারে অ্যাকবার আল্লাহ তা কী হবে তবে সে আরও খুশি হবে। ছাওয়ালের আরও তরাক্কির জন্য আল্লাহর দরগায় দোয়া মাগবে রহমান। তবে এ খায়েশ কী পুরবে? তারপর [illegible] যদি বড়ভাইর বাড়ির মতন করে বানায়ে দিতি পারে ছাওয়াল তবে আরও খুশি হবে সে। রহমান স্বপ্ন দেখতে থাকে হজ থেকে ফিরে এসেছে সে। দাউদ বাড়িতে [illegible] ফেলছে। তাকে আর বিলবাওড়ে জাল বাইতে যেতে হচ্ছে না। সে এখন [illegible] কেবল হেলান দেওয়া চেয়ারে বসে আছে। গড়গড়ার লম্বা নলটা তার মুখে। [illegible] সবাই তামাক টানছে আর হাজী হাজী বলে তাকে খুব খাতির করছে। [illegible] আহ আর কিছু চায় না রহমান। না আল্লাহর কাছে আর ক্যা [illegible] আছে। ব্যস!

কিন্তু আল্লাহর [illegible] পেশ করার আগেই রহমানের কাশিটা শুরু হয়ে গেল খক্ খক খক আল্লাহ [illegible] খোক খোয়াক খোয়াক আল্লাহ আমারে আল্লাহ আমারে ওহ খ খো ওহ খ [illegible] আর য্যান এই বুড়া কালে আর য্যান খক খক খক্ জান টানে খক খক [illegible] খক খোয়াক [illegible] দিন গুজরান ওহ্থ খে! ওহখ খো দিন গুজরান [illegible] খোয়া খোয়া খোয়া ওহ বাপ খক খক খক বাপ খক খক খক বাপ হুঁ হু [illegible] হুঁ হুঁহ হুঁহ! বুক চেপে ধরে রহমান কাশতে লাগল। ওর চোখ দিয়ে পানি নাক দিয়ে সর্দি আর মুখ দিয়ে [illegible] ঝরতে লাগল। কাতলা ছুটে এল। রহমান সামলে নিল নিজেকে। কিছুক্ষণ হাঁফাল। তারপর গড়গড়াটায় টান দিল বার কয়েক। ধোঁয়া বের হল না।

তারপর কাতলাকে বলল "তামুক।'

কাতলা ছিলিম পালটে দিল। রহমান ভুড়ুক ভুড়ুক গড়গড়া টানতে টানতে হাজী হবার তার বড়ভাইয়ের মত মান্যগণ্য মাতব্বর হবার ফেঁসে যাওয়া স্বপ্নটা আবার মেরামতে মন দিল।

ছুটকির মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এটা বুঝি স্বপ্ন। কেন না সকালে সেই ঘুম থেকে উঠে আর এখন ইস্তক তাকে কুটোটি ভাঙতে হয়নি। এ স্বপ্ন! অথচ গোসল করা এমন কি নাশ্তা

খাওয়া পর্যন্ত হয়ে গেল এবং এই সাত সকালেই এবং তাকে হেঁসেলে ঢুকতে হল না, নাশ্তো পাকাতে হল না! এ খোয়াব! নিশ্চয়ই খোয়াব! খোয়াবে ছাড়া অ্যামন ঘটনা ঘটে নাকি! ছুটকি দরজাটা চুলের মত ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রেখে রাস্তা দেখছিল। হঠাৎ দাউদ দুম করে ঘরে ঢুকে পড়তে সে অপ্রস্তুত হল।

দাউদ ইতস্তত করে বলল, 'বড় ভাবী, অ্যাটটা কথা আছে।"

ছুটকি বলল, "কন্।"

দাউদ বলল, "এখেনে না। আমার ঘরে চলেন অ্যাকবার।"

ছুটকি বলল, "তয় তাই চলেন।"

দাউদের পিছু পিছু ছুটকি তার শোবার ঘরে গেল। বেশ পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে। ছুটকি বুঝল দাউদ ভাইয়ের আসল মেহমানরা এই ঘরে এসেই বসবে। হঠাৎ বড় আয়নাটার ভিতর নিজেকে সবটা দেখতে পেয়ে সেইখানেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং হাঁ করে আয়নার দিকে চেয়ে রইল। এমন জিনিস সে আগে আর কখনও দেখেনি। এতদিন তার ধারণা ছিল তার বড়-বুর বাড়িতেই দুনিয়াব সব কিছু চিজ্ আছে। কিন্তু এ কী তাজ্জব! এ রকম আয়না এবং এত বড়, এ তো ছুটকি তার বড়-বুর বাড়িতেও দেখেনি! এর আগে গ্রাম ছেড়ে সে বাইরে যায়নি কখনও। তাদের গ্রামের লাগোয়া গ্রামেই ছুটকির শ্বশুরবাড়ি। দুখানা গ্রাম না বলে একখানা গ্রাম বলাই ভাল। তাব অভিজ্ঞতার কাছে তার বড়-বু নয়মোনের বাড়িটাই ছিল আশ্চর্য একটা জগৎ সকলের চাইতে আলাদা। কত রকমের বাসন। পিতলের কাঁসার আবার নক্শাকাটা কাঁচের, চীনে মাটির। থালা গিলাস বাটি। হাজী সাহেবের বাড়ি বাতিই আছে কত রকম। পোশাক। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে তো। তাই ছুটকি ধরেই নিয়েছিল, ওগুলো শুধু তাব বড়-বু নযমোনের বাড়িতে থাকার জন্যই তৈরি হয়েছে। গ্রামের বাকি সবার বাড়িতে সব একই রকম। বড়-বুর বাড়িটাই শুধু আলাদা। কাজেই নয়মোনের বাড়ির আসবাবগুলোর সঙ্গে তাদের দুনিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই এইটেই সে ধরে নিয়েছিল এবং খুশ ছিল। শুধুমাত্র দেখবার জন্য এবং নেড়েচেড়ে একটা অদ্ভুত ধরনের সুখ পাবার জন্য ছুটকি স্বেচ্ছায় তার বড়-বুর জিনিসগুলোর হেফাজত করার ভার গ্রহণ করেছিল' ছুটকি একটু লাজুক। তার লোভও কম। তাই কোন জিনিস পেতে তার কখনও ইচ্ছে হয়নি। জিনিসগুলো যে নাড়াচাড়া করতে পারছে, এতেই সুখী ছিল ছুটকি। তাই কখনও কিছু সে মুখ ফুটে চায়ওনি। সে নিয়েছে ফুটকি। অনেক জিনিস নষ্ট করেছে সে। চুরিও করেছে অনেক কিছু। চাইলেই পেত তবু ফুটকি চুরি করত! বড়-বু কি হাজী সাহেব কারও কাছে কিছু চাইতেই তার লজ্জা হত না। কেননা হাজী সাহেব ফুটকিকে খুবই ভালবাসতেন। হাজী সাহেবের আসকারা পেয়েই না ফুটকি অত দেমাগী হয়ে উঠেছিল। না হলে আজ' আয়নার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফুটকির কথা মনে পড়ল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজ এসব তো তোরই হত! ছুটকি আবার আয়নাটায় উঁকি দিল। দাউদের নজব ছুটকির দিকে ছিল না। সে ভাবছিল অস্বস্তিকর কথাটা কীভাবে ছুটকির কাছে পাড়া যায়। মববার আগে ফুটকি কী আচরণ করেছিল, সেটা জানবাব জন্য কাল বাত থেকে হঠাৎ তার মনে কেমন একটা প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠেছে। একেবারেই হঠাৎ। আসলে ফুটকি মরার আগে খাবাপ দোয়া টোয়া কিছু করে গিয়েছে কি না, দাউদ ছুটকির কাছ থেকে সেইটাই জানতে চাইছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-কথা আর তুলতে পারল না।

একটু কেশে দাউদ বলল, "উম্‌ম্ আচ্ছা বড় ভাবী আপনি কি নারাজ হইছেন? একেবারে ছাফ ছাফ কবেন। আমি এই যে উম্‌ম্ আবার শাদী কর্তিছি, আপনি কি নারাজ হইছেন?"

ছুটকি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এ আবার কী কথা! এমন কথা তো তাকে জিজ্ঞেস করবার নয়। মদ্দগের মরজির উপরেই তো দুনিয়া চলে। আপনাব মরজি হইছে আপনি শাদী কর্তিছেন। দাউদের এ প্রশ্নের কী জবাব হতে পারে ছুটকি বুঝতেই পারল না! সে নারাজ হতে যাবেই বা কেন, আর সে নারাজ হলে বা না-হলে তাতে দাউদেরই বা কী যাবে আসবে? একথা তাকে আর এই ঘরের চৌকাঠকে জিজ্ঞেস করা একই কথা।

ছুটকিকে চুপ করে থাকতে দেখে দাউদ ধরে নিল, ছুটকি নারাজ হয়েছে।

দাউদ কাতরভাবে বলল, "ভাবী, আপনি বিশ্বাস করেন সেদিন কাজডা আমি খুবই খারাপ করিছি, কিন্তু খোদা কছম আমার কোনও হাত ছিল না। আমার পরে সেদিন শয়তান ভর করিছিল।"

দাউদের কাতরোক্তিতে ছুটকির চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

"আপনি বিশ্বাস করেন," দাউদ বলল, "শয়তানই আমারে ফুটকির কাছের থে সরায়ে নিয়ে গেছে। আমার ঘাড়েও যেমন শয়তান ভর করিছিল ফুটকির ঘাড়েও তেমনি শয়তান ভব করিছিল।"

ছুটকি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "যা নছিবি ছিল তা হয়ে গেছে, যা নছিবি আছে তাই হবে। পুরনো কথা ভুলে যান দাউদ ভাই। আপনি যে শাদী কত্তি রাজী হইছেন, এ খবর শুনে আমরা খুশি হইছি। আমিউ খুশি হইছি।"

ছুটকি চলে যাচ্ছিল, দাউদ বলল, "ভাবী আরেকটু দাঁড়ান।"

দাউদ পায়ের উপর বসে পড়ে একটা চামড়ার সুটকেস্ খুলে দুটো ছোট ভেলভেটের কৌটো বের করল তারপর সুটকেসে চাবি দিয়ে উঠে পড়ল।

দাউদ বলল, "দ্যাখেন তো ভাবী কোনডারে আপনার পছন্দ হয়।"

ছুটকির সামনে কৌটো দুটো দাউদ খুলতেই ছুটকি দেখল একটার মধ্যে একটা নাককড়াই আরেকটার মধ্যে একটা নাকছাবি। দুটোই সোনার। মটরের দানার মত নাককড়াইটা তার পছন্দ হল। দাউদ ভাই তার বিবির জন্যি কিনিছে? সে নাককড়াইটার দিকে আঙুল তুলল।

বলল, "এইটে বেশ সোন্দর।"

দাউদ বলল, "তয় উডা আপনি ন্যান।"

কী বলল দাউদ ভাই! ছুটকি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখে দাউদ ঢাকনা খোলা নাককড়াইয়ের সুন্দর ভেলভেটের কৌটোটা হাতে নিয়ে হাতখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

"ন্যান্ ভাবী, উডা আপনার।" ছুটকি ভুল শুনছে না! "উডা নাকে পরেন তো দেখি।" দাউদ ভাই তাকে একটা সোনার নাককড়াই দিচ্ছে! সোনার গহনা! এবং ছুটকি জেগে আছে। তার নাকে বিরিয়ানির খোশবু এসে লাগছে। লোকজন উঠোনে কথাবার্তা বলছে। আব্বু একটানা কেশে যাচ্ছেন। তার মানে খোয়াব নয়, হায় আল্লা, সত্যি! দাউদ ভাই তাকে গহনা দিচ্ছে! আল্লা দাউদ ভাইরি ম্যান্ ভালো বিবি দ্যান! সে ইতস্তত করে নাককড়াইটা নিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট খুশি তার দেলডারে ঝড়ো পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে চলল। আমার গয়না! আমার গয়না! সুনার! সুনার! সুনার!

"ন্যান্, ইবার ঐ আয়নাডার সামনে যায়ে উডা পরেন তো দেখি।"

এবার লজ্জা পেল ছুটকি।

"পরেন, পরেন। আমি দেখি।"

ছুটকি লজ্জা সত্ত্বেও আয়নার সামনে গিয়ে নাককড়াইটা নাকে পরে ফেলল। তার মনে হল তার সুরতই য্যানো পালটায়ে গেছে। সলজ্জ হাসিতে তার মুখের বাহার আরও খুলে গেল। দাউদ বলল, "এবার এই কৌটোটাও ন্যান্। ইডা যারে পরাবার তারে আপনিই পরায়ে দেবেন।"

হঠাৎ সাইকেলের ঘণ্টি বেজে উঠল এবং বাবু আর জামিলার গলা শোনা গেল। দাউদ বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "উরা সব আসে গ্যালো বোধ হয়। আপনি বড় আম্মারে তৈরি হতি কন।" দাউদের গলায় উত্তেজনার আভাস ছুটকির কান এড়াল না।

বাবু জামিলাকে তার বাইকের রডে বসিয়ে আগে এসে পৌঁছুল। দাউদ খুব ঘটা করে বাবুকে সালামু আলাইকুম বলে অভ্যর্থনা জানাল। বাবু এবং জামিলা দাউদকে দেখে খুব খুশি হল।

বাবু বলল, "ওয়ালাইকুম সালাম দাউদ ভাই। উরাউ সব রওনা হয়ে গেছে। ঘুড়ার গাড়িতি আসতিছে। আব্বু সাথে আছেন।"

দাউদ বলল, "আরে আসো আসো বাবু মিঞা ভিতরে আসো। আসেন জামিলা বিবি তস্রিফ রাখেন।"

জামিলাকে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে চলল। এখন দাউদের মন অত্যন্ত হালকা। ছুটকির সঙ্গে কথা বলার পর একটা বড় ভার যেন তার কলিজা থেকে নেমে গিয়েছে। ছুটকি দাউদের উপর নারাজ হয নি, এটাই বড় কথা। সইফুনকে নিশ্চয়ই ওদের পছন্দ হবে। আর না হলেই বা কী? সইফুন তো আর তাদের গ্রামের বাড়িতে বাস করতে যাবে না। তাকে তো শহরেই থাকতে হবে। আজকে কথাবার্তায় ওদের বাড়ির কথা উঠবে। দাউদের কথাও নিশ্চয়ই উঠবে। ফুটকির কথা উঠবে?

দাউদ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে জামিলাকে নিয়ে তার বড় ভাবীর জিম্মায় দিয়ে এল। বাবুর সঙ্গেও ছুটকির আর তার আম্মার আলাপ করিয়ে দিল। তারপর আবার বাইরে এল। মেহমানদের সব আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। ফুটকির কথা উঠবে? দাউদের অস্বস্তি ঘাই মেরে উঠল। আব্বুকে ভালোই চেনে দাউদ। বেশি কথা বলেন না। ওর মুখ থেকে কিছু বেরুবে না। কিন্তু জেনানা মহলে? তার বড় আম্মা? বড় ভাবী? বড় ভাবীর মুখ দিয়ে এমন কিছু বেরুবে না যাতে তার ইজ্জৎ কোন রকমে জখম হতে পারে। দাউদ সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'ল। ছুটকির সঙ্গে আজ তার আলাপে সেটা বুঝে গিয়েছে দাউদ। কিন্তু বড় আম্মা?

গাজী গোলাম আসতেই দাউদ এগিয়ে গেল।

দাউদ জিজ্ঞেস করল, "কী গুলাম ভাই, মেহমানরা সব আসবেন কখন?" গাজী গোলাম পান চিবোচ্ছিল। একপাশে গিয়ে পানের পিচ ফেলে ঠোঁটটা মুছে নিল। বাবুর সাইকেলের দিকে নজর দিয়ে হাসল। বলল, "এই তো দেখি মেহ্মানগের আসা শুরু হয়ে গেছে।"

বড় আম্মার পেটে মোটে কথা থাকে না। কি বলতে কী বলে ফেলবে আল্লাই জানে। দাউদের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল।

গাজী গোলাম বলল, "তবে আর আপনি ভাবতিছেন ক্যান্? ওভারশীয়ার ছাব্ তো আপনাগেরই ছাইটি গেছেন ইনস্পেকশন কত্তি।"

"হ্যাঁ, তাহের ভাই সাথে আছেন। উনারা সাড়ে বারোটার মটোরে ফেরবেন। বাসের থে নামেই সুজা এখেনে চলে আসবেন। ত্যামন কথাই আছে।"

"তয় আর চিন্তা কিসির?" গাজী গোলাম বলল, "আজ ছুটির দিন। অপিছার মিঞা ছাবরা একটু ব্যালা অব্দি গড়াতে থাকেন। গড় পাড়তি গড় পাড়তি পিঠির দিকটা যখন পেরেশান হয়ে যায় তখন তিনারা বিছানায় উঠে বসেন। বোঝলেন তো। সুমায় হলি সব মিঞাই আসে জোটবেন।"

ফটিকির কথা কি উঠবে? দাউদ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। নাউ তো উঠতি পারে?

"কী ব্যাপার কন দিনি দাউদ ভাই? আজ আপনার মুখখান অ্যাত ভার ভার দেখতিছি ক্যান?"

উঠবেই। দাউদ ভাবল। ফটিকির কথা না উঠে পারে না। কিন্তু খালাম্মা, সইফুন যখন শুনবে তখন কী করবে?

"দ্যাখেন গুলাম ভাই," দাউদ ইতস্তত করে বলল, "আপনার সাথে আমার অ্যাকটা জরুরি কথা আছে। কথাটা কব কব করতিছি—"

"আর কতি হবে না, আর কতি হবে না," গাজী গোলাম বলল। "আমি বুঝিছি।"

দাউদ অবাক হল। "আপনি বুঝিছেন।"

গাজী গোলাম বলল, "বুঝিছি কি আজ? ঘটনাটা যেদিন ঘটিছে, সেই দিনির থেই বুঝিছি। আমার কি চোখ নেই?"

আশ্চর্য নজর তো গাজী গোলামের। তার আর সইফুনের ব্যাপারটা প্রথম থেকেই ধরে ফেলেছে!

গাজী গোলাম সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, "ও নিয়ে আপনি আর অযথা ভাববেন না। মেন্দার চাপে পড়ে খান বাহাদুরির আপনার খানিকটে কাজ ওর জামাইরি দিতি হয়েছে। ইলেক্শনের সুমায় এই রকম অনেক কন্ট্রাকেই হাতে রাখার জন্যি অনেক কিছু কত্তি হয়। আপাতত আপনার কিছু ক্ষেতি হবে বটে, তা ভাববেন না, খান বাহাদুর হাতে থাকলি ও ক্ষেতি পুষোয়ে যাতি বেশি সুমায় লাগবে না। পি ডবলিউ ডি'র এই বড় কাজডা আপনার কপালেই নাচতিছে। খান বাহাদুর নিজি এস ডি ও র কাছে আপনার নাম সুপারিশ করিছেন।"

ওহ্, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দাউদ। গাজী গোলাম এই লাইনি ভাবতিছে। তা ভালো।

"আপনি খান বাহাদুরির ইজ্জৎ সেদিন নিজির ক্ষেতি করেউ রাখিছেন," গাজী গোলাম বলল, "ইডা আপনি খুব ভালো করিছেন। খান বাহাদুর মুছলিম লীগির পারলামেন্টারি পারটির মদত যখন পাইছেন তখন উনারে কেউ রুখতি পারবে না। এ আমি কয়ে দিলাম। যারা নিজিগেরে মুছলমান বলে মনে করে তাগের সব ভোট খান বাহাদুর পাবেন, এ আমি কয়ে দিলাম। হিন্দুগের দালাল যারা, তারা মুছলমানের ভেক ধরে হিন্দুগের পয়সায় যতই ইলেক্শন লড়ুক, মুছলমানগের ভোট তাগেরে আর পাতি হবে না। এ আমি কয়ে দিলাম। মেন্দা হাতে আসে গেছে। ইবার ওগের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে বলেই খানবাহাদুর আশা কত্তিছেন।"

গাজী গোলাম কৃষক প্রজা পারটিকেই হিন্দুদের দালাল বলছে। দাউদও এতদিন তাই বলেছে। মধুপুরে ক্যাম্প করে বুঝল অংকটা এতটা সোজা নয়। শৈলকুপোর দিকে যে-কথায় লোককে বশ করা গিয়েছে, এদিকে সে-কথায় কাজ হবে না। মৌলবী আবু তালেবকে শৈলকুপো-ঝিনেদার দিকে তেমন বিশেষ কেউ চেনে না, তাই ওদিকে হয়ত তাঁকে হিন্দুর দালাল ফালাল বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঝিনেদা থেকে মাগরোর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মৌলবী আবু তালেব ঈমানদার মুসলমান। এবং গরিব মুসলমান। এবং মহা সম্মানিত এক মৌলবী। আলেম। তাঁকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। তা ছাড়া লোকে ক্যানডিডেটের নাম শুনে বা তাঁর স্বভাব চরিত্র বিচার করে বা দলের ইশ্তাহার দেখে ভোট দেয় কি-না, সে বিষয়েও দাউদের সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অবিশ্যি ভোট সম্বন্ধে এর আগে তার মাথা ঘামাবার দরকার পড়ে নি। গাজী গোলাম তার চাইতে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। একজন ওস্তাদ। সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহই নেই।

গাজী গোলাম বলল, "আপনি ফিকির করবেন না। খান বাহাদুর আপনারে ঠিক পুষোয়ে দেবেন। তিনি আমারি নিজির মুখি কইছেন, আমার জন্যি দাউদ মিঞা লোকসান খাওয়াও কবুল করে নেছে। কাম দেখলিই বুঝা যায় কে বিশ্বাসী আর কিডাই বা অবিশ্বাসী। দাউদ মিঞারে আমি আমার ফ্যামিলির লোক বলেই মনে করি। মেন্দারে কাজডা ছাড়ে দিয়ে আপনি খোন্দকারের চোখে খুব উপরে উঠে গেছেন, বোঝলেন ভাই ফ্যামিলির লোক, খোনকার এ ইজ্জত বিশেষ কাউরি দ্যান না। ঐ জন্যিই আপনার বিল পেমেন্ট অত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। নাহলি, ডিস্ট্রিক্ট্ বোরডের তবিলির অ্যাখন যা অবস্থা তাতে অ্যাক দু বচ্ছরেউ আপনি টাকাগুলোন পাতেন কি-না সন্দেহ। আমি তো সবই জানি।"

দাউদ কাজটা অত সহজে ছেড়ে দিয়েছে কি সাধে? টাকাটা পাওয়া তার জরুরি ছিল। বোরডের তবিলের অবস্থা সেও জানে। কিন্তু তার চাইতেও তার বড় অস্বস্তি ছিল তাদের অঞ্চলের লোকের খান বাহাদুরের প্রতি বিরূপ ভাব। তারা কিন্তু খান বাহাদুরকে চোখেও দেখে নি। তার নির্বাচনী ইশ্তাহারে কী আছে তাও জানে না। তবে তারা খান বাহাদুরের উপর বিরূপ কেন?

না মেন্দা তাকে মদত দিচ্ছে বলে। মেন্দাকে এ অঞ্চলের লোক ভালো চোখে দেখে না। তাই বা কেন? তাদের পাড়ার সঙ্গে মেন্দাদের অনেকদিনের অসদ্ভাব। তাই মেন্দা যদি মৌলবী আবু তালেবকেই সমর্থন করত, তাহলে নিকিরিরা গিয়ে খান বাহাদুরকে ভোট দিত। এবার সে ভোটের ব্যাপারে খানিকটা মাথা ঘামিয়েছে এবং শহরে বসে হিসেব কষে ভোটের তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা করেনি। যারা ভোট দেয় তাদের সঙ্গে অনায়াসে মিশেছে বলেই এইসব রহস্য জানতে পেরেছে। কিন্তু খোন্দকারের বাড়িতে, সে দেখেছে, এই পদ্ধতিতে ভোটের মাপজোক করা হয় না। ভোট বিষয়ে বড় বড় তালেবররা খাতা কলমে হিসেব কষতিছেন, ক্যাবলই হিসেব কষতিছেন। আর সে যখনই যায় তখন শোনে মৌলবী আবু তালেবের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। সাজ্জাদ মোল্লারে গেরেফতার করায়ে মেন্দা যে ভুলডা করিছেন, তার ফল খান বাহাদুরিরি পাতি হবে। তার বড় ভাই নেয়ামতই তাকে বলেছে। সাজ্জাদ মোল্লা নিজেই ও অঞ্চলে মানী লোক। তার উপর আব্বাস নিকিরির বেয়াই। বশির ইউনিয়ন সালুটির প্রেসিডেন্টের ভাগনে। বশিরির গ্রেফতারে তাই সালুটির লোকেরা মেন্দার উপর খেপে আছে। মেন্দা যেখেনে তাই তারা সেখেনে নেই। ভোট দেওয়া বা না-দেওয়ার ব্যাপারটা য্যান নদীর পানি। কখনোই সুজা পথে চলে না। কিন্তু গাজী গোলামরা এসব কথা বোঝে না। এদিক দিয়ে ব্যাপারটা দেখতেও চায় না। তাই সে এসব কথা কিছুই গাজী গোলামকে বলল না। গাজী গোলামরা অনেক ইলেকশন লড়েছে। ওরা হাসবে। বিশ্বাস করবে না। ভাববে মেন্দা ওর কাজ ছিনিয়ে নিয়েছে, তাই সে মেন্দার নিন্দে করছে। দাউদ কাজটা যে ছেড়ে দিয়েছে তাতে খোন্দকারের উপকার কতটা হবে, সে জানে না। সে এইটুকু জানে যে তার দুশ্চিন্তা অনেকটা লাঘব হবে।

দাউদ বলল, "আপনার আর খানবাহাদুরির অনেক মেহেরবানি।"

রহমান আবার কাশতে শুরু করল। খক্ খক্ খক্ খক্ খেবায়াক খেবায়াক। সারা বাড়িতে সেই কাশির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দাউদ এবার একটু ইতস্তত করে বলল, "গোলাম ভাই, আমি শাদী কর্তিছি।"

গাজী গোলাম লাফিয়ে উঠল প্রায়।

"কন্ কী মিঞা! অ্যাঁ! ভালো ভালো। তা কনে হতিছে শাদী?"

"মৌলবী জয়নুদ্দিনের মেয়ে। সইফুন।"

"আরে সে তো বড় মেয়ে। অত বড় মেয়েডারে শাদী করবেন?"

"ক্যান্, একথা কতিছেন ক্যান্?" দাউদের কপাল কুঁচকে এল।

"আরে মিঞা, বিবি আর মুরগি, যত ছোট তত তার সোয়াদ। হাঃ! হাঃ! হাঃ!"

একটা ঘোড়ার গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াল।

দাউদ চাপা উত্তেজনায় বলে উঠল, "ভাই, আপনি ওদিকটা দ্যাখেন, আমি এদিকটা দেখতিছি। উরা বোধ হয় আসে গ্যাল।"

"বুঝিছি," গাজী গোলাম বলল, "এদিকডারে বুঝি ভরসা করে আমার হাতে ছাড়ে দিতি আর দেল চাতিছে না। তা শাদীডা হবে কবে? ইলেকশনের আগে না তো?"

"না না," দাউদ বলল, "ইন্‌শাল্লাহ্ খান বাহাদুর জিতে নেন আগে। শাদীতি উনারে তো থাকতি হবে।"

খক্ খক্ খক্ খেবায়াক্ খেবায়াক্ খেবায়াক্। বাজানের কাশির আওয়াজে দাউদের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। এখন বাড়ি ফাঁকা। এবং গভীর রাত। বাজানের কাশির শব্দ মাঝে মধ্যে উঠেই যেটুকু আওয়াজ তুলছে, তা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। দাউদও শুয়ে আছে বিছানায়। তার চোখে ঘুম নেই। খুব পরিশ্রান্ত সে। তবু তার চোখে ঘুম নেই। তেমন কোনও ভাবনাও নেই। শুধু একটা সুখ-সুখ ভাব। দাউদ আজ পুরো নিশ্চিন্ত। তার নাকছাবি গ্রহণ করেছে সইফুন। সইফুনকে পছন্দ হয়েছে তার বড় ভাবীর। ছুটকির। ফুটকির প্রসঙ্গ ওঠেনি। একবারও ওঠেনি। কী আশঙ্কাতেই না দিনটা কেটেছে দাউদের। অস্বোয়াস্তিতে সে কাঁটা হয়ে ছিল। যাক, আল্লাহর মেহেরবানিতে ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কেটে গিয়েছে। সে এখন নিশ্চিন্ত। ছুটকি নিজের হাতে সইফুনের নাকে নাকছাবি পরিয়ে দিয়েছে এবং সইফুন আপত্তি করেনি। দাউদ খুশি, মেহমানরাও সবাই খুশি। ওর শাদীর খবরটাও গাজীর মুখ থেকে চাউর হয়ে গিয়েছে। দাউদ প্রথমে শিঁটিয়ে ছিল। কিন্তু মৌলবী জয়নুদ্দিনই যখন খুশি মনে সেটা মেনে নিলেন তখন সে ভাবল, ভালই হল। দাউদ পাশ ফিরে শুলো। সইফুন কি এই বিছানায় এসে বসেছিল? চকিতে কথাটা তার মনে খেলে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে শিহরণ। আল্লাহ্ আজ তার সব খায়েশ পুরিয়ে দিয়েছেন। সে বাপ-মাকে আনতে পেরেছে তার বাসাতে। ছুটকি ভাবীকে আনতে পেরেছে। এনেছে সইফুনকেও। আবার পি ডবলিউ ডি-র এস ডি ও, ডিসট্রিক্‌ট্ বোরডের হেড ওভারশীয়ার, ট্রেজারির হেড ক্লারক, এদেরও এনেছে এবং দাওয়াত খাইয়েছে। এবং তারা খুশি মনে ফিরে গেছেন। সইফুন তার ঘর করতে রাজী হয়েছে। তার দেওয়া নাকছাবি পরেছে। যা চেয়েছে দাউদ, আজ সারাদিনে তাই পেয়েছে সে। আল্লাহ্ তার সব আরজিই মনজুর

করে দিয়েছেন। শুধু একটা আক্ষেপ। সইফুনের সঙ্গে নিরালায় তার যদি একবারও, কয়েক লহমার জন্যও, দেখা হত। শুধু সে আর সইফুন। শুধু একটা কথা যদি সে শুনত তার মুখ থেকে! শুধু একটা কথা! কি শুধু একটু হাসি' ব্যস্। তাহলেই আর কোনও ক্ষোভ থাকত না। অাচ্ছা, একদিন সইফুনকে কি এ বাড়িতে আনা যায় না? একা? সইফুন গররাজী হবে? থাক তবে। আল্লার মনে যা আছে তাই হোক। নিকাহের পরেই সে না হয় দুলহানির সঙ্গে জুলুয়া সারবে।

জুলুয়া! হঠাৎ দাউদের ফুটকির মুখটা মনে পড়ল। শাদীর দিন আক্‌তখানি পড়ার পর এই বড় ভাবীই তাকে ফুটকির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ফুটকি তখন দুলহানি। কাপড় ঢাকা দিয়ে বসে আছে মুখ নিচু করে। আয়না ধরেছিল ছবি। কী তার উৎসাহ! এই ফুটকি দ্যাখ দ্যাখ, আমার ভাইয়ের সুন্দর মুখখানা দেখে নে শিগগির। সেই দুপুরের আলোয় একখানা আয়না চকচক করে উঠল। আর সে আয়নায় ফুটে উঠল ডাগর দুটো লাজুক চোখ আর ঠোঁটে একটু হাসি। আয়নাটা মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জুলুয়ার দৃশ্যটাও। আর এ কী। হঠাৎ দাউদের কলিজাটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ তার চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কেন? আগে তো এরকম হয়নি? দাউদ নিঃশব্দে বিছানার উপরে উঠে বসল। চোখের কোণা মুছে ফেলল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আনমনে সেটা ফুঁকতে লাগল। খুক্ খক্ খুক্ খেঁয়াক্ খেঁয়াক্। বাজান বড্ড কাশছে।

॥ ৮ ॥

"ভাই মুছলমান!" মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরীর বুলন্দ্ কণ্ঠস্বর রাত্রির অন্ধকারে গম্‌গম্ করে উঠল। সেই মহ্‌ফিলে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মনে হচ্ছিল এ বুঝি গৈবী আওয়াজ। আসমান থেকে আসছে। তারা রোমাঞ্চিত হল।

"ভাই মুছলমান! সেই দিনটার কথা মনে কর!"

মৌলবী সাহেবের কোরান তেলাওয়াত করবার পদ্ধতিটি বেশ নাটকীয়। এ বিষয়ে এই অঞ্চলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্তরে স্তরে তিনি শ্রোতাদের আবেগকে জাগিয়ে তুলতে থাকেন, তারপর এক সময় তাকে এমন তুঙ্গে তুলে দেন যে প্লাবনের গতিতে সেই উন্মত্ত আবেগ তার শ্রোতৃবৃন্দকে কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

"ভাই মুছলমান! আজ আরেকবার সেই দিনটার কথা ইয়াদ কর।"

মৌলবী সাহেব একবার তাঁর শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারা সম্মোহিত। জনমণ্ডলী একেবারে মুগ্ধ। আল্লাহ্‌র করুণার কথা স্মরণ করামাত্র তাঁর চিত্ত ভরে উঠল। মনে মনে আকুল প্রার্থনা জানালেন মৌলবী. ইয়া মালিক! এই অজ্ঞ অধমগেরে তুমি হামেশা তুমার পথে রাখ।

"খেয়াল রাখো সেই আখেরী দিনটারে কোরআন মজিদ যারে কয়েছে স্মরণীয় দিন।"

একটু থামলেন মৌলবী। তারপর শ্রোতারা তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হতে শুনল, সুরা অাল্ হাদীদের এক সুরেলা আয়াত।

"ইয়াওমা তারাল্ মুমেনীনা অল মুমেনাতা ইয়াস্ আ—"

শ্রোতারা এর এক বর্ণও মানে বুঝতে পারল না। কিন্তু মৌলবীর কণ্ঠনিঃসৃত সুরেলা আবৃত্তি সমবেত সকলের আবেগকে উদ্দীপ্ত করতে লাগল।

"নুরোহুম্ বাইনা আইদিহীম্ অ বেয়াইমানেহিম্—"

কেউ কেউ আবেগে দুলতে লাগল।

"বাশ্‌রাকুমোল ইয়্যাওমা, জান্নাতোন্ তাজরী—"

এ কোরানের কথা! এ খোদ আল্লাহ্‌র কথা। সেই নিরক্ষর চাষীদের কারও কারও মনে এই কথা উদয় হওয়া মাত্র চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

"মিন্ তাহ্‌তিহাল আন্‌হা-রো খা-লেদীনা ফীহা—"

আফছুছ! আফছুছ! কারও কারও মনে তীব্র অনুশোচনা হল, তারা আল্লাহ্‌র ভাষার মানে বোঝে না বলে। আফছুছ! আফছুছ!

"জা-লিকা হাওল ফাওজোল্ আজীম।"

মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী এবার থামলেন। গোটা ইউনিয়নের মুসলমান এই ওয়াজ-মহফিলে এসে হাজির হয়েছে। মৌলবী সাহেব সার সার জ্বালানো হ্যাজাগবাতিগুলোর আলোতে সেই আসরে হাজির প্রায় সব লোককেই দেখতে পাচ্ছিলেন। একটু দূরে বিছানো গালিচার উপরে বসে আছেন সপার্ষদ খান বাহাদুর খোন্দকার রজলুর রহমান। মেন্দা মিঞাও তাঁর পাশে।

কেউ কিছু বুঝল না তবু সোৎসাহে সবাই "মারহাবা মারহাবা" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

"ভাই মুছলমান!"

মৌলবীর বুলন্দ্ আহ্বান আবার ধ্বনিত হল। তার জেল্লাদার আমামা পাগড়ি থেকে,

নকশাদার সাটিনের জোব্বা থেকে হ্যাজাগ আর ডেলাইটের উজ্জ্বল আলো ক্রমাগত ঠিক্‌রে পড়ে সেই আসরে হাজির গ্রামের মানুষগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। রাত্রিকালে এত আলো তারা কখনোই দেখতে পায় না। কেরোসিনের কুপি বা টেমি বা ল্যাম্‌পো তাদের ঘরের অন্ধকার কিছুমাত্র দূর করতে পারে না। হেরিকান কেনবার এবং জ্বালাবার বিলাসিতা অনেকেরই সামর্থ্যের বাইরে। তাই আলো দেখলেই ওরা ছুটে আসে। পঞ্চাশটা হ্যাজাগবাতি আর ডেলাইট্‌ গোপালপুরের ফুটবল মাঠে টাঙানো বিরাট সামিয়ানার ভিতরটায় আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল। পিরু শেখ এমনিতে রাত্রিবেলা তার বিবিকেই তিন হাত দূর থেকে দেখতে পায় না। কিন্তু অ্যাখন! আরেব্বাস! দেহিছ কান্ড! ওই দ্যাহ, কত দূরি ব'সে রইছে তার গরানগাছার মিতে পিরু সরদার! উই ওই কুণায়! কিন্তু ওই দ্যাহ, তাকে অ্যাকেবারে দিনির আলোর মত ছাফা দ্যাহা যাতিছে! হ্যাজাগ আর ডেলাইট্‌গুলোর দিকে চেয়ে পিরু শেখ তারিফ করল, কী কলই না বানাইছে কোম্‌পানি!

"ভাই মুছলমান! কোর্‌-আনের এই আয়াতে আল্লাহ্‌ পরওয়ারদিগার, তুমাগেরে একটা দিনির কথা ইয়াদ্‌ করায়ে দিতি চাচ্ছেন। তুমরা সিডা খেয়াল করো।"

মোলবী সাহেব একটু থামলেন। আবার বললেন।

"ভাই মুছলমান! কোর্‌-আনের যে আয়াতটা এই মাত্তর তেলাওয়াত করলাম, তার মধ্যি দিয়েই আল্লাহ্‌ মালিক তুমাগেরে একটা খোশ্‌খবর জানায়ে দেছেন।"

মোলবী আবার থামলেন।

"তুমরা সব খেয়াল ক'রে আল্লাহ্‌ পাকের সেই খোশ্‌খবর শোনো।"

মোলবী সাহেবের ইচ্ছে ছিল ব্যাখ্যাটা উরদু জবানে করেন। কিন্তু তিনি ভালো রকম জানেন, যারা এই মহ্‌ফিলে এসে জমেছে, এদের কেউ এক বর্ণও উরদু বোঝে না। এখানে দীন ইসলাম প্রচার করা এবং মুসলমানদের ঈমানের হেফাজত করা, তার হাওয়ালাদার হওয়া যে কত শক্ত তা বাইরের লোক কী বুঝবে!

"ভাই মুছলমান!"

মোলবী এবার পুঁথির ভাষা ধরলেন।

"একটি স্মরণীয় দিন! যেদিন প্রত্যেকে দেখিতে পাইবে, মোমেন পুরুষ এবং মোমেনা বিবিগণের নূর তাহাদের সামনে, এবং তাহাদের ডাহিনে (এবং বামে) ধাবমান রহিয়াছে। তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলা হইবে, আজ তোমাদের জন্য বেহেশ্‌তের খোশ্‌খবর—যাহার বাগ-বাগিচা ও মহলের ভিতরে সতত বহিয়া চলিয়াছে সুশীতল নহরের পানি!"

মোলবী একটু থামলেন। তারপর ভরাট গলাটা আবেগে একটু চড়িয়ে দিলেন। "তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে—ইহা অতি বড় সাফল্য।"

"ভাই মুছলমান! আল্লাহ্‌ মালিক তুমাগের কতিছেন, তুমাগেরে তিনি চিরকাল বেহেশ্‌তে রাখে দেবেন।"

আল্লাহ্‌ তাদের বেহেশ্‌তে রেখে দেবেন, সেই আলোর প্লাবনের মধ্যে বসে, নিত্য যাদের অন্ধকারে বাস সেই তাদের, মোলবীর আশ্বাস বাক্যটা আদৌ অবিশ্বাস্য বলে মনে হল না, কেন না তারা তাদের সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে সেদিন হ্যাজাগ ও ডেলাইটের অফুরন্ত নূর প্রত্যক্ষ করছিল। এই আলো, এই নূর, এ তো মিথ্যা নয়। নিজের চোখেই তো তা দেখছে। তাই মোলবীর আশ্বাস তাদের প্রাণের জমাট আবেগে এক ধরনের তীব্র আনন্দের সৃষ্টি করল। তারা অধীর হয়ে "মারহাবা মারহাবা" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

"খামোশ!" মোলবী সাহেবের এক হুংকারে মুহূর্তের মধ্যে মহ্‌ফিল স্তব্ধ হয়ে গেল।

"আল্লাহ্‌র কথা অ্যাখনও শেষ হয়নি। অ্যাখনও বাকি আছে।"

মোলবী ক্রুদ্ধ চোখে একবার শ্রোতাদের দিকে চাইলেন। তারা অপ্রস্তুত হল। তারা জড়সড় হয়ে উঠল।

"যেদিন মোনাফিক নর-নারীগণ মোমেনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন। আমরা যেন আপনাদের নূরের আলো লাভ করিতে পারি। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইয়া আলোর সন্ধান কর। এই সময় মোমেন ও মোনাফিক, এই উভয় দলের মধ্যে এক পাঁচিলের আড়াল পড়িয়া যাইবে। এই পাঁচিলের ভিতরের দিকে আছে রহমত ভান্ডার অর্থাৎ বেহেশ্‌ত এবং বাইরের দিকে আছে আযাব-কেন্দ্র অর্থাৎ দোযখ।"

"দোযখ!" হিংস্রভাবে শব্দটা উচ্চারণ করলেন মোলবী।

এবং মোলবীর সেই হিংস্র ক্রুদ্ধ মুখ হাজিরান মজলিসের অনেককেই ভয় পাইয়ে দিল।

"ভাই মুছলমান! কেয়ামতের কথা ভাবো। আখেরাতের কথা ভাবো। খেয়াল কর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আছ্‌ছালামের কথা। আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী কয়েছেন, কেয়ামত যখন আসবে তখন এই দুনিয়াডারে আল্লাহ্‌ তায়ালা উঠোয়ে নেবেন আর সাত আছমানরে তিনি গুটোয়ে নেবেন। আর আল্লাহ্‌ মালিক কয়েছেন শুধুমাত্র একটা ভীষণ আওয়াজ (শিঙার ফুঁক) হইবে, সংগে সংগে সকলকে আমার দরবারে হাজির করিয়া দেওয়া হইবে।"

মোলবী ক্রমেই হিংস্রতর হয়ে উঠছেন। এবং শ্রোতাদের উদ্বেগ ততই বাড়ছে। সভা নিস্তব্ধ। পিরু শেখ যেন স্পষ্টই দেখল, নায়েবের পেয়াদা তার গলায় গামছা বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে

কাছারিতে হাজরে দিতে। যখনই মৌলবীর হুংকার ধ্বনি থামছে তখনই পঞ্চাশটা হ্যাজাগ আর ডেলাইটের সমবেত সোঁ-সোঁ ধ্বনি জাগ্রত হয়ে উঠছে এবং সেই আওয়াজ সকলের মনে একটা ঝাপসা আতঙ্ক যেন জাগিয়ে তুলতে শুরু করেছে।

"যখন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ঐ দিনটি আল্লাহকে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠিন হইবে। কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে যে-দিন প্রথম শিঙার ফুঁক সারা দুনিয়াকে তোলপাড় করিয়া তুলিবে। তারপরেই আসিবে পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ দ্বিতীয় শিঙার ফুঁক। সেদিন অনেকের দেল ধড়ফড় করিতে থাকিবে, তাহাদের চক্ষু থাকিবে অবনমিত।"

বেজায় অস্বস্তি হচ্ছে ওদের। এমন কি সব কথা ভালো না বুঝলেও মৌলবীর চোখ মুখের ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের হিংস্রতা কেয়ামতের দিনটাকে যেন সকলের চোখের উপর আলগা করে তুলে ধরল। পিরুর দেল সত্যিই ধড়ফড় করতে শুরু করল।

"আই মুছলমান! ইবার হিসেব-নিকেশ!"

মৌলবী যেন মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নায়েব হয়ে উঠলেন। ডাকসাইটে নায়েবের মতই তাদের গলায় গামছা দিয়ে হুংকার দিচ্ছেন, এবার হিসেব-নিকেশ। অন্তত পিরুর তাই মনে হল।

"হিসাব-নিকেশ শেষ হওয়ার পর সমস্ত লোক হাশরের ময়দান হইতে পুল-সিরাতের উপর আসিয়া যাইবে। এবং বেহেশতী ও দোযখী আলাদা হইয়া যাইবে। দোযখীরা অর্থাৎ যাহারা পাপী, পুল-সিরাত হইতে নিচে জাহান্নমে পড়িয়া যাইবে আর বেহেশ্‌তীরা পুল-সিরাত পার হইয়া বেহেশ্‌ত এলাকায় আসিয়া পৌঁছিবে। হাশরের ময়দান খালি হইয়া গেলেই আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার কুদরতের হাত দিয়া হাশরের মাটি হইতে একখানা রুটি বানাইবেন এবং বেহেশ্‌তী মেহমানগণ পুল-সিরাত পার হইয়া সর্বপ্রথম আল্লহ্‌র তরফ হইতে ঐ রুটির জেয়াফৎ খাইবেন। ভাই মুছলমান, সেই রুটির যে কী সোয়াদ, হায় হায়, যে না খাইয়াছে সে বুঝিবে না। আর দোযখীরা তাহা কখনোই বুঝিবে না।"

মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী আবার চুপ করলেন। সামনে রাখা একটা পাত্র থেকে একটা লবঙ্গ তুলে মুখে পুরে দিলেন। দুটো লোক নিঃশব্দে এক একটা করে হ্যাজাগ-বাতি দড়ি আলগা করে নামিয়ে আনছে, পাম্প্‌ করছে, বারনারের মধ্যে পোকার দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে, ম্যান্‌টাল্‌টা ক্ষণকালের জন্য জ্যোতিঃহারা হয়ে খানিকটা লালচে হয়ে উঠছে, এক মুহূর্ত, তারপরেই আবার দপ্‌ করে পূর্ণতেজে জ্বলে উঠছে। ডে-লাইট্‌ বাতিগুলো নিচের দিকটা যেন একটা বড় সড় কাঁচের মোচা। আর তার ভিতর থেকে বের হচ্ছে পাঁচশ বাতি, হাজার বাতির নুর। আল্লাহ্‌র নুর কত বাতির কে জানে?

"ভাই মুছলমান, খেয়াল করো!" মৌলবী সাহেবের সুরেলা কণ্ঠস্বর, গৈবী আওয়াজই যেন গমগম করে উঠল। "বেহেশ্‌তের কথা খেয়াল করো। আল্লাহ্‌ মালিকের কথা খেয়াল করো! জাহানে রব্ব্‌-এর কথা খেয়াল করো। আ—র—"

মৌলবী এবার ধীরে ধীরে তাঁর নিজের মুখখানা পুরো মহ্‌ফিলের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিলেন। যারা ক্লান্ত হয়ে ঢুলে ঢুলে পাশের লোকের গায়ে গিয়ে পড়ছিল, তাদেরকে ঠেলা দিয়ে তারা জাগিয়ে দিল। তারা আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে মৌলবীর দিকে টাল্‌মালু চাইতে লাগল।

"আর—"

মৌলবী এবার ক্যান্‌ডিডেট্‌ খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমানের দিকে চাইলেন। "আর খেয়াল কর কেয়ামতের কথা। কেযামতের দিন, শেষ বিচারের দিন। খেয়াল কর সে-কথা। খেয়াল কর নেকির-মনাকির এই দুজন ফেরেশ্‌তার কথা যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তুমাগের সামনে আসে দাঁড়াবে আর জিজ্ঞেস করবে তুমাগের ঈমানের কথা। খেয়াল কর! কী জবাব দিবা?"

"যারা ঈমানরে বেঈমানির সাথে বদল করে নিয়েছে তাগের কী হবে, অ্যাকবার খেয়াল কর। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয় নবীরি ডাকে কইছেন—"

—"ভাই মুছলমান! সে কথা খেয়াল কর!"—

"হে মোহাম্মদ! তোমার নিকটে কি (সমগ্র জগত) আচ্ছন্নকারী সেই (কেয়ামতের) বার্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে? কত মুখ সেদিন লাঞ্ছিত হইবে"—

—"ভাই মুছলমান! খেয়াল কর!"—

—"দোযখের পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত হইবে।"

খেয়াল কর! খেয়াল কর! এই শব্দ দুটো ওদের কানে দুরমুশের মত ঘা দিচ্ছিল। মহ্‌ফিলের ঘুম ধীরে ধীরে ছুটে যেতে লাগল।

"তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"—

খেয়াল কর! খেয়াল কর!

তাদের ভয়চকিত দেলের মধ্যেই মৌলবীর হুংকারের প্রতিধ্বনি বেজে উঠতে লাগল। খেয়াল কর! খেয়াল কর!

তোস্‌কামিন আয়্‌নেন্‌ অনিয়াহ্‌।

"তাহাদিগকে ফুটন্ত নহর হইতে (আগুনের মত গরম শরবত) পান করানো হইবে।"

খেয়াল কর! খেয়াল কর! ওরা ভীত হয়ে পড়তে লাগল। অসহায়ভাবে চাইতে লাগল হ্যাজাগ-বাতি ডেলাইট্-এর আলোর দিকে। কিন্তু সেখান থেকে বিচ্ছুরিত নূর ওদের ভয় ভাঙাতে পারল না। ওরা তার মধ্যে দেখতে পেল খোদার ভীষণ ভ্রূকুটি। আগুনের মত গরম শরবত পান করানো হবে! হায় আল্লাহ্!

"তাহারা তো জারি ঘাস," মৌলবীর বুলন্দ্ কণ্ঠের ভিতর দিয়ে ওদের ভয়ার্ত কানে পৌঁছুতে লাগল, "জারি ঘাস!"

মৌলবী কটমট করে তাদের দিকে এখন চাইলেন।

"তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত এবং বিশ্রী কণ্টকময়! এই রকম যে জারি ঘাস, তাহাই হইবে খাদ্য।"

"ভাই মুছলমান! দোযখী যাহারা তাহারা তো জাবি ঘাস ব্যতীত অন্য কোনও খাবারই পাইবে না।"

খেয়াল কর! খেয়াল কর!

না! না! না! আল্লাহ্ না!

"যাহা শরীরকেও পুষ্ট করিবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করিবে না।"

খেয়াল কর! খেয়াল কর!

"যারা বেঈমান", মৌলবী তাঁর কণ্ঠস্বরকে এবার একখানা লিকলিকে বেতে পরিণত করে ফেলেছেন যেন। "যারা বেঈমান," ছপাৎ করে এক ঘা কোঁড়া যেন পড়ল পাপীর পিঠে।

"যারা নাফরমান!" ভাঁটার মত মৌলবীর চোখ ঘুরছে হাজিরানা মজলিশের প্রত্যেকটি লোকের মুখে মুখে। সবাই এখন মৌলবীর দৃষ্টির বাইরে থাকবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে।

"যারা মোনাফিক!"

"ভণ্ড! মোনাফিক! যাহারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামতের উপর ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু আসলে তাহারা মোমেন নহে, ইহারাই মোনাফিক! ভণ্ড!"

মোনাফিক! ছপাৎ।

ভণ্ড! ছপাৎ।

মোনাফিক! ভণ্ড! ছপাৎ ছপাৎ! মৌলবীর কোঁড়া সমানে চলেছে।

"যারা মোরদুদ্!" ছপাৎ।

"ইছলামত্যাগী!" ছপাৎ।

"কাফের।" ছপাৎ।

"ইছলামত্যাগী কাফের! মোরদুদ্!" ছপাৎ ছপাৎ ছপাৎ!

বাতিগুলো থেকে এখন কেমন [illegible] স্ হিস্স্স্ আওয়াজ বেরুচ্ছে! খোদার লানত? দোযখের আহ্বান? ওরা ভয় পেতে লাগল।

"ভাই মুছলমান!"

মৌলবী একটু থামলেন। হিস্স্স্ হিস্স্স্। বাতিগুলো ফুঁসছে।

"ভাই মুসলমান! দোযখের আযাব এগের উপরেই পড়বে! যারা মোনাফিক, মোরদুদ, কাফের তাগের উপরেই খোদার গযব না'মে আসবে। কেয়ামতের কথা খেয়াল কর।"

মৌলবী আবার চুপ, হিস্স্স্স্স্স্, যেন দম নিচ্ছেন। হিস্স্স্স্স্—

আমাগের মধ্যি কেউ কি অ্যামন আছে? —হিস্স্স্স্স্—আমাগের মধ্যি কেউ কি অ্যামন আছে?—হিস্স্স্স্স্—ওরা ত্রস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল।

হিস্স্স্স্স্—

না আল্লাহ্ না না না।

হিস্স্স্স্স্—

"এরাই দোযখী হবে!" ছপাৎ।

কারা দোযখী হবে? তার মধ্যে কি আমরা আছি? না, আল্লাহ্ না!

হিস্স্স্স্স্—

"অতএব ভাই মুছলমান! কাঁদো!" গৈবী আওয়াজে ওরা যেন নির্দেশ পেল। পথ পেল। অনেকক্ষণ ধরে ওরা একটা উদ্বেগের মধ্যে ছিল। বিভ্রান্তির এবং অস্বস্তির মধ্যে ছিল। কী করবে বুঝতে পারছিল না। এতক্ষণে একটা নির্দেশ পেল।

"ভাই মুছলমান! কাঁদো!"

ওরা আর বিলম্ব করল না। অনেকেই কাঁদল। এবং দেলের বোঝা হালকা করল।

এরা সব আল্লাহর পথে আছে। আংরেজীবালাদের কোনও আসর এদের উপর পড়েনি। মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী একবার মজলিসের দিকে চাইলেন। কাপড়ের, লুঙ্গির কিংবা গামছার খুঁট আর পিরেনের হাতা দিয়ে সব চোখ মুছছে। তাঁর নিজের হৃদয়েও গভীর আবেগের সঞ্চার হল। আকুলভাবে তিনি মনে মনে বলে চললেন, ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রহমানু, ইয়া রাহীমু, ইয়া মালিকু! এ সব তোমারই অনুগ্রহ, এ সব তোমারই অনুগ্রহ। তুমিই তোমার বান্দাদের তোমার পথে রেখেছ। তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। এ রকম হয় না। আল্লাহর রহমত আজ নাজিল হয়েছে এই মজলিসের উপর। এরা সবাই আল্লাহর পথে আছে।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতেই নজর পড়ল খোন্দকারের দিকে। ভয় নেই. মনে মনে তিনি তাঁকে অভয় দিলেন। এরা আপনার পথেই আছে। ভয় নেই ভয় নেই। আপনি আল্লাহ্'র পথ ধরে থাকেন। ঈমানের নুর জ্বালায়ে রাখেন। ইনশা আল্লাহ্ আপনিই কামেয়াব হবেন।

"ভাই মুছলমান। থামো।"

মৌলবী নতুন উৎসাহে হাঁক পাড়লেন।

ওরা আবার সচকিত হয়ে উঠল। কান্না থামল। চোখ মুছতে মুছতে অসহায়ভাবে মৌলবীর মুখের দিকে চাইতে লাগল।

"আওর শোচলে! সমঝ্ লে! বেঈমানি কা নতীজা আব ক্যায়া হোগা?"

মৌলবী হঠাৎ উরদু ছাড়লেন। ওরা মানে বুঝল না। একটা আবছা ধারণা এই করে নিল যে ওদের বিপদ এখনও কাটেনি। আল্লাহর খোশ্-নজর ওরা এখনও লাভ করেনি। বেঈমান কথাটা ওরা বুঝতে পারল। মৌলবী কি ওদের বেঈমান বলে মনে করছে? কেন? কী ওরা করেছে? মহ্ফিল আবার অস্বস্তিতে ভরে উঠল।

মৌলবীর নিজের অস্বস্তিও ওদের কারও চাইতে কম নয়। এমন ঈমানের রজ্জু শক্ত হাতে ধরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর আজকাল ভয় হয়। তাঁর ভয় হয়? হ্যাঁ হয়। তিনি দুনিয়ার রকম-সকম কিছুই বুঝতে পারেন না। যেমন তাঁর বিবিরা কেবল মেয়েই বিয়োয় কেন? তিন তিনটে বিবি তাঁর। কিন্তু কোনোটারই যদি বিন্দুমাত্র আক্কেল থাকে! জানে যে এ জমানায় মেয়ে পার করা শক্ত। বিশেষ করে তাঁর মত লোকের, যার টাকা নেই। তবু তিন বিবিতে পাল্লা দিয়ে কেবল মেয়েই পয়দা করে চলেছে। এখন সাত সাতটা মেয়ে তাঁর ঘরে। তিনটের শাদীর বয়েস কবেই পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনোটারই শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এই জমানায় যে কী হয়েছে! একটু ভাল পাত্র হলেই জানতে চায়, মেয়ে লেখাপড়া জানে কি না? আরে জানবে না কেন? ওঁর দুই বড় মেয়েকে তিনি নিজে আরবী-ফারসীতে তালিম দিয়েছেন। নিজে তাদের কোর্আন শরীফ, তরজমা, তফছির, এমন কি রাহে নাজাত, তাম্বিহল, গাফেলিন ইস্তক পড়িয়েছেন। কিন্তু না, এ জমানার মিঞাগের আবার এ এলেম না-পছন্দ। আরবী-ফারসী-উরদু ওনাগের কাছে এলেম নয়, এলেম হল গিয়ে আংরেজী আর বাংলা। কুফ্রী কালাম, এলমে বেদীন এসব না হলি মুখি কিছু রোচে না! কোথায় যাচ্ছে জামানা! নাউজু বিল্লাহি মিন্ জালিক! আংরেজীবালাদের উপর খোদার লানত পড়ুক! শরা শরীয়ত মানে না আজকালকার ছোকরারা! আংরেজী শিখতিছেন! বাংলা শিখতিছেন! হিন্দুগের গুলাম হবার সাধ জাগিছে।

"ভাই মুছলমান!"

এক গর্জনে মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী মহ্ফিলকে কাঁপিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি এখন ক্ষিপ্ত।

"আল্লাহর কথা শোনো।"

আবার তারা চমকে উঠল। হিস্স্স্স্স্স্। আবার তারা বাতির চাপা হিংস্র সেই একটানা গর্জন শুনতে লাগল।

"তোমাদের কী হইয়াছে যে মোনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের দুই প্রকারের মত পাওয়া যাইতেছে?"

হিস্স্স্স্স্—

"অথচ তাহারা যে অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহার কারণে আল্লাহ তাহাদের মুখ উলটা দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

হিস্স্ হিস্স্স্স্স্—

"আর যাহারা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে", মৌলবীর স্বর হিংস্রতায় ধারাল হয়ে উঠল, "তাহাদের জন্য জাহান্নমের দাউদাউ আগুনই যথেষ্ট।"

হিস্স্স্স্স্—

ওরা এবার দারুণ ভয় পেতে লাগল। কারণ মৌলবীও এবার বেজায় ক্রুদ্ধ।

"যে-সব লোক আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব।"

মৌলবী যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, কেয়ামতের দিনে আংরেজীবালা ছোকরাদের ধরে ধরে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ওরাই মোনাফিক। কাফের তবু ভাল, তারা সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের চিনতে এবং চেনাতে অসুবিধা হয় না। হিন্দু কাফের। তাকে চিনতে বা চেনাতে কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু মোনাফিক। ওরা আরও খারাপ। ওরা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু সুন্নত পালন করে না, শরা-শরীয়ত মানে না, মোল্লা-মৌলবী নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে! ওরা আরও সাংঘাতিক। ওরাই আসল বদমাইস!

"তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব।" মৌলবী কথাটা আবার উগ্রে দিলেন।

হিস্স্স্স্স্—

"যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে—"

মৌলবী অত্যন্ত উল্লসিত। এতেও মোনাফিকরা রেহাই পাবে ভেবেছো? ব্যাটারা কী আন্দাজ বদমাইসি শুরু করেছে। যা নয় তাই বলে যাচ্ছে আল্লাহর পথে যারা আছে, যারা অন্যদেরও রাখতে চায় আল্লাহর পথে, সেই তাদের বিরুদ্ধে। বলে কি, এই মোল্লা মৌলবীরা নিজের গোস্‌ত্‌ রুটির ব্যবস্থার জন্যই এ কাজ করছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে! পাজী! বদমাইস। আল্লাহর নাম ছড়ায়ে বেড়াচ্ছি নিজির গোস্‌ত্‌-রুটির ব্যবস্থা করার জন্যি! পাজী। দোযখী সব! দাঁড়াও. তুমাগের দ্যাখ্যাতিছি মজা!

"যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে, তখন সেই জায়গায় অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে।"

মৌলবী থামলেন। হিস্‌স্‌স্‌ হিসসসসসস। একবার সবাইকে দেখে নিলেন। প্রত্যেকে ভয় পেয়েছে। তাঁর দেলে উল্লাস উপছে পড়তে লাগল। নাফরমানি করার নতিজা বোঝ অ্যাকবার!

"যারা মোনাফিক, যারা বেঈমান আখেরাতে তারা দোযখের এই আযাবই পাবে।"

মৌলবীর ঘৃণাই যেন হিস্‌ হিস্‌ হিস্‌ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে হ্যাজাগ্‌ আর ডে-লাইটের বাতিগুলো।

"ভাই। মুছলমান! এই দোযখের কথা খেয়াল কর। আযাবের কথা খেয়াল কর!"

মৌলবী ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠছেন। এই অংরেজীবালারা বলে কি, আমরা মৌলবীগিরি করে ব্যাড়াতিছি ক্যান্‌? না, নিজিগের গোস্‌-রুটির বন্দোবস্ত করে নিবার জন্যি? বাঁধা মাইনের সরকারী মাদ্রাসার কাজ ছাড়ে দিয়ে গিরামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতিছি ক্যান? পোলাও কোরমা খাবার জুগাড় করার জন্যি? আমার বাড়ি বিবিরা বয়স্থা মেয়েরা ট্যানা পরে থাকে, দিনির পর দিন তাগের ভাত জোটে না। কটা লোক সে-কথা জানে? তা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দাগেরে রাখার জন্যি গিরামে গঞ্জে ঘুরি। যা জুটবার আল্লাহই জুটোয়ে দ্যান। তবু ঐ আংরেজীবালা শয়তানরা কয়, পোলাও-কোরমা খাবার জন্যি এই কাজ করি! তামাসা করি! অ্যাঁ তামাসা! আল্লাহ! দোযখে থাকবে উরা চিরকাল। অগুনি পুড়বে উরা চিরকাল।

"ভাই মুছলমান। খেয়াল রাখো, নিশ্চয় দোযখ শিকার ধরার জন্যি তৈরি হয়েই আছে।"

হিস্‌স্‌স্‌স্‌স্‌—

"এক ফুটাউ পানি পাবে না খাতি!"

হিস্‌স্‌স্‌সসস একটানা আওয়াজ করে চলেছে বাতিগুলো।

"গলা শুকোয়ে সর্বদাই কাঠ হয়ে থাকবে। ছাতি ফাটবে ভীষণ তিষ্টায়। ঠাণ্ডা পানি খাবার জন্যি দেল ধড়ফড় ধড়ফড় কত্তি থাকবে। তখন তাগের কী দেওয়া হবে?"

"জানো তুমরা কেউ?"

মৌলবীর ভাঁটার মত চোখ এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। ওরা কেউ সে-চোখে চোখ মেলাতে ভরসা পেল না।

"যখন সেই নাফরমান"

হঠাৎ মৌলবীর চোখের উপর দিয়ে আংরেজীবালাদের মিছিল যেতে শুরু করল।

যখন সেই মোনাফিকের দল"

ফটিকের মুখখানা সেই মিছিলের প্রতিজনের মুখে ভেসে উঠল।

"খালি চিৎকার দেবে পানি পানি"

মহফিলের দেল ভড়পাতে লাগল।

"তখন তাগের খাতি দেওয়া হবে শুধু ফুটন্ত পানি আর দোযখীগের পুঁজ। পুঁজ!"

মৌলবী যেন জিনিসগুলো প্রত্যেকের মুখের ভিতরে গুঁজে দিলেন।

ওরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওরা সবাই চাষী। দোযখের আযাব ওরা জানে না। তবে চোত-বোশেখের তেষ্টার কষ্ট জানে। চোত-বোশেখে মাঠে ওরা সবাই লাঙল দেয়। তখন ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। দেল ধড়ফড় করে। তাই ওরা জানে ঠাণ্ডা পানির দাম কত। সেই পানি মিলবে না দোযখে? মিলবে ফুটন্ত পানি। হায় আল্লাহ! মিলবে শুধু পুঁজ? না না না। আল্লাহর গুনাহ্‌ মাফ করো। মৌলবী সদয় হও।

"ভাই মুছলমান! এই আযাব আসতিছে। সাবধান। সাবধান। মোনাফিকীর শরীক হয়ো না। কিডা মোনাফিক? তাগের দেখতি কী রকম? দেখতি তারাউ মুছলমানের মত। কথাবার্তা খুব মিঠা মিঠা। তারাউ মিটিং করে। তারা মুছলমানেরে ভাগ কত্তি চায়। আরে মুছলমান মুছলমান। সব মুছলমানই আল্লার বান্দা। তার আবার উঁচু নিচু কী? জমিদার পিরজা কী? আমগাছ আম গাছ। তার আবার উঁচু নিচু কী? উঁচু ডালে আম ঝোলে, আল্লাহই অ্যামনধারা বানাইছেন, তাই বলে কি একথা কওয়া যায় যে আমগাছের ঐ ডগার দিকটা আমগাছ নয়? ক্যাবল গুড়ার দিকটাই আমগাছ? জমিদার যদি আল্লাহর বান্দা হয়, সে কি মুছলমান নয়? এই কথা ধন্দ ধরাবার কথা। এই কথা মোনাফিকের কথা বেঈমানের কথা। আল্লাহই সব কিছু পয়দা করিছেন। ভাই মুছলমান! খেয়াল কর। খেয়াল কর আল্লাহর কথা। নিশ্চয় আমিই তাহাকে পথ দেখাইয়াছি, এই অবস্থায় যে, সে হয় শোকরদার অনুগত (মুছলমান) হইয়াছে অথবা নাফরমান কাফের হইয়াছে। তালি বুঝে দ্যাখ, মুছলমানগের মধ্যি কারা জমিদার আর চাষীর ছওয়াল তুলতিছে। আল্লাহ

কইতিছেন হয় শোকরদার অনুগত থাক অর্থাৎ মুছলমান থাক, আল্লাহর রাস্তায় থাক আর না হয় নাফরমান কাফের হও। এর মধ্যি ভেদাভেদ, জমিদার, চাষী, বড়লোক, গরিব, এ তো আল্লাহর কথা নয়, তালি এই ছওয়াল ওঠে ক্যান্ ? তোলে কিডা? কারা?"

মৌলবী দম নেবার জন্য একটু থামলেন।

"ভাই মুছলমান! যারা এই ছওয়াল তুলতিছে, তারাই মোনাফিক। তাগের চিনে রাখ। তাগের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহ্‌রে অস্বীকার করবা না। হাঁ খবরদার। তাগের কথায় কান দিবা না। হাঁ খবরদার। কোনও কাজেই তাগের সংগে থাকবা না। হাঁ খবরদার!"

ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওরা এখন নির্দেশ পাচ্ছে। এতক্ষণ ছিল বিভ্রান্ত। অসহায়। অকূলে ভাসছিল ওরা। এবার যেন কূল পেল।

"যদি থাক—"

আবার এ প্রশ্ন উঠছে কেন? ওরা অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল।

"যদি থাক", একটু থেমেই মৌলবী হুংকার ছাড়ল, "তাহলি দোযখী হবা! হাঁ খবরদার!"

না না আল্লাহ না। ওরা আঁতকে উঠল।

"ভাই মুছলমান! তুমরা দোযখী হতি চাও?"

ওরা চুপ।

অসহিষ্ণু মৌলবী হুংকার দিলেন, "বল হ্যাঁ কি না।"

ওরা তবু চুপ।

মৌলবী হুংকার ছাড়লেন, "কও না।"

নির্দেশ পেয়ে ওরা বাঁচল। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "না।"

"ভাই মুছলমান! তুমরা আল্লাহ্‌র পথে থাকতি চাও, না শয়তানের পথে?"

আবার ওরা চুপ। সুজা কথা কও মৌলবী, কী কতি হবে কও। ঘোরপেঁচ কি আমরা বুঝি?

"তুমরা আল্লাহর পথে থাকতি চাও? কও, হ্যাঁ।"

হ্যাঁ এই তো বেশ সাফ কথা! ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যাঁ।"

"না কি শয়তানের সংগে চলতি চাও? কও, না।"

"না।" ওদের আর্তস্বর শোনা গেল।

"মোনাফিকগের দলে থাকতি চাও? কও, না না!"

"না না।"

"মোমেনগের দলে থাকতি চাও? কও, হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" সমস্বরে ঘোষিত হল।

"ভাই মুছলমান!" মৌলবীর কণ্ঠস্বর এখন মোলায়েম। তাতে প্রীতি ঝরে পড়ছে। কে বলবে যে এই কণ্ঠস্বরই একটু আগে ছিল ভয়ংকর ক্রোধের ভাণ্ডার। এবং ঘৃণা ঝরে ঝরে পড়ছিল। এবং ওদের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু এখন মহফিলের মন থেকে অস্থিরতা উদ্বেগ ধীরে ধীরে উবে যেতে লাগল। মৌলবীর মোলায়েম স্বরই যেন তাদের কাছে বয়ে আনল খোদার রহমত। অভয় বার্তা। বুঝতে পারল অনুগত থাকলে আর তাদের উপর দোযখের সেই ভয়ংকর আযাব নেমে আসবে না। তারা অনুগতই থাকবে। মৌলবী তাদের বড় ভরসা।

"ভাই মুছলমান! তয় ইবার হাসো। ক্যান্ না অ্যাখন তুমরা শুনবা খালি বেহেশ্‌তের খবর। আল্লাহ কয়েছেন ফি জান্নাতিন আলেয়্যাতে অর্থাৎ দুনিয়ায় নেক-কাজের বদলে তাহারা এক উচ্চ বেহেশ্‌তে থাকবে। তুমরা যারা এই দুনিয়ায় নেক-কাজ করবা তারা ছরাছর বেহেশ্‌তে চলে যাবা। আর তাই ভাই মুছলমান! ইবার তুমরা হাসো!"

এবং হাজিরান মজলিসের সকলে হালকা মনে হাসল। মৌলবী এমনভাবে চাইলেন ওদের দিকে যেন এক্ষুনি তাঁর জোব্বার জেব থেকে দরাজ হাতে ফুল-বাতাসা বের করে সেই মজলিসে মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দেবেন।

"ভাই মোমেন মুছলমান! বেহেশ্‌তে যায়ে বসবার জন্যি পাবা পালংক। আর সে কী পালংক? অমন মণিমুক্তা খচিত পালংক আমাগের মেন্দা মিঞাগের বাড়িতিউ নেই। তুমরা যাতে আয়েশ করে ঠেস দিয়ে বসতি পার, তার জন্যি থাকবে নরম গদি আর জেল্লাদার তাকিয়া।"

ছেঁড়া মাদুর নয়? পাটি নয়? মাটি নয়? একেবারে পালংক! পরু নরম গদি! তাকিয়া! ইয়া আল্লাহ। ইয়া রহমান্। আল্লাহকে ওদের পরম দয়ালু বলে মনে হল।

"আর তুমাগের খেদমতের জন্যি হামেহাল হাজির থাকবে খুবছুরত সব ছোকরা। আর তারা পানির পেয়ালা আর বদনা ও পবিত্র শরাবের পেয়ালা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। যত খুশি খাও। আর থাকবে হরকিছিমের ফল আর পাখির গোস্‌ত। যত ইচ্ছে তত খাও।"

ওদের চোখে বেহেশতের ছবি ভাসতে লাগল। জমিদারের পেয়াদা কি মহাজনের দালালের তাগাদা নেই, হাজাশুখার উদ্বেগ নেই, লাঙল ঠেলার পেরেশানি নেই। বেহেশ্‌ত! বেহেশ্‌ত!

"আর?"

এবার অতি প্রসন্ন নেত্রে মহ্‌ফিলের দিকে চাইলেন মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী। যেন সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি দেবার আগে তিনি ওদের তৈরি হবার জন্য সময় দিচ্ছেন।

"অ হুরোন্ ঘীনোন্ !"

"ভাই মুছলমান ! কোর্আনে কয়েছে অ হুরোন্ ঘীনোন্। বেহেশতে আছে হুরপরী। এই রকম ছুরত তুমরা দুনিয়ায় কারো ঘরেই দেখতি পাবা না। এগের জওয়ানী চিরকাল থাকে। এই সব খুবছুরত হুরপরীরা হামেশা তুমাগের খিদমত করবে।"

ওদের আশা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বেহেশ্তই ওদের কাম্য, এটা ওরা ঠিক করে ফেলল। পিরু শেখের চোখে পানি এসে গেল। ওর বিবি অ্যাখন বুড়ি। পায়ে হাজা, হাতে কড়া, সারা শরীরে পাঁচড়া আর দাদ ! সে বেহেশ্তে যাবে। সে মোমেনদের দলে থাকবে। মৌলবী যা কয় শোনবে। বেহেশতে তাকে যেতেই হবে।

"ইন্না—আন্শালাহুন্না এন্শা হান্। আমি হুরপরীদিগকে এক বিশেষরূপে সৃজন করিয়াছি।"

"ফাজাআল্না হুন্না আব্কারা। আমি তাহাদিগকে যুবতী ও চিরকুমারী করিয়া রাখিয়াছি।"

"ওবোরান্ অৎরাবা। তাহাদিগকে মনোমোহিনী ও সমবয়স্কা করিয়া রাখিয়াছি।"

মৌলবী ওদের যেন এক অবিশ্বাস্য গান শুনিয়ে চলেছেন।

আমরাউ কি পাব ? আমরাউ কি পাব এই সব হুরপুরী ? সকলের দেলেই এই প্রশ্ন হুড়পাড় করতে লাগল।

"তুমরা যারা নেক-কাজ করবা, তুমরা যারা আল্লাহর পথে থাকবা, এই সব পুরস্কার তারাই পাবা। আমীন্।"

মৌলবী থামলেন. মুহূর্তে মহ্ফিলে এক আনন্দধ্বনি উঠল, "মারহাবা মারহাবা।"

পিরু একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

একটা গুনগুন ধ্বনিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল মজলিসে। মৌলবী ওদের একটু সময় দিলেন যাতে ওরা এতক্ষণ মুখ বুজে বসে থাকার পর দু-চারটে কথা বলে হালকা হতে পারে। কেউ কেউ উঠে পিসাব করতে গেল। তারপর হঠাৎ মৌলবী হাঁক দিলেন, "খামোশ !"

অমনি একে একে সব চুপ করতে লাগল।

মৌলবী বললেন, "হাজিরানে মোমেন ভাইসব ! আজ আমাগের বহোৎ খুশনছিবীর কারণে আমাগের এই মজলিছি মোমেন মুছলমানগণের প্যায়ারা ক্যান্ডিডেট খানবাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান ছাহেব হাজির আছেন। তিনি ডিস্ট্রিকট বোরডের চিয়ারম্যান হয়েই কওমের খেদমত শুরু করে দেছেন। যদিও জানি, সব সাচ্চা মুছলমান তাঁরেই ভোট দেবেন, তবু আমি তাঁরে আপনাগের খেদমতে দু-চার কথা পেশ করার জন্যি তাঁর কাছে আপনাগের তরফের থে আরজি রাখতিছি। আসেন খান বাহাদুর।"

খোন্দকার বজলুর রহমান মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে চুস্ত শেরোয়ানী। মাথায় রুমী টুপি।

একবার মজলিসের দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, "আস্সালামু আলায়কুম।"

মজলিস থেকে আওয়াজ উঠল, "ওয়ালেকুম্ ছালাম।"

॥ ৯ ॥

"কী করবেন খোন্দকার সাহেব কাউনসিলি যায়ে ? কী তিনি করতি চান ? সিডা আপনাগের ভালো করে জানে নিতি হবে। খোন্দকার সাহেব পঞ্চাশটে হ্যাজাগ ডে-লাইট্ জ্বালায়ে রাত্তির মিটিং কত্তিছেন। বড় বড় মহফিল মজলিসির পিছনে মুঠো মুঠো টাকা খরচ কত্তিছেন। মৌলবী ভাড়া করে আনে তাঁরে দিয়ে ভোট দিয়ার জন্যি ফত্ওয়া দিয়াতিছেন। কিন্তু আসল কথাডারে মুখ দিয়ে আর খসাতি পারাতিছেন না। কী তিনি করবেন কাউনসিলি যায়ে ? এর জবাব আপনারা কেউ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিছেন ?"

আবু তালেব জনতার দিকে চাইলেন। ঝিনেদার ফুটবল মাঠে মিটিং। লোক তেমন কিছু না হলেও একেবারে মন্দও হয়নি। রোদ যত হেলে যাচ্ছে, সভার লোকও ধীরে ধীরে তত পাতলা হয়ে উঠছে। আবু তালেব দরদর করে ঘামছেন। তাঁর গলা শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু তাঁর উৎসাহ বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

"আমরা বারবার খোন্দকার সাহেবেরে এই কথা জিজ্ঞেস করিছি, কী আপনি করতি চান. সেই কথাডা কন্ ? আমরা শুনি। আমরা বুঝি। যদি দেখি আমরা যা কত্তি চাতিছি, আপনার কাজ তার চাইতি ভালো, যদি দেখি আমাগের ইশ্তেহারের থে আপনার ইশ্তেহারে গরিব চাষী খাতকের বেশি উপকার হওয়ার সুযোগ আছে, আমরা আমাগের ক্যান্ডিডেট তুলে নেব। আপনি একাই থাকবেন। আর তা যদি না হয়, গরিব চাষা গরিব খাতক, তাগের কোনও উপকার যদি কত্তি না পারেন, তালি আপনি সরে যান। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি আমাগের কিছু জানালেন না। আপনারা কিছু জানেন ?"

জনতা সাড়া দিল না। কী জানতে চাইছেন আবু তালেব তা পরিষ্কার বুঝতেই পারল না কেউ।

"আপনারা জানেন কিছু?" আবু তালেব হাঁক পাড়লেন।

মিঞা কতি চান কী? জনতা বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল। অস্বস্তিতে ভুগতে লাগল তারা। দু-এক জন সভা ছেড়ে চলেও গেল।

"কাউন্সিলি যায়ে খান বাহাদুর আপনাগের কোন্ উপকার করবেন, তা কি আপনারা জানেন? বলেন হাঁ কি না?"

হ্যাঁ, এতক্ষণে মিঞা পথে আলেন। ইবার তবু জানা গেল, কী উনি শুনতি চান।

ওরা একযোগে জবাব দিল, "না, না।"

"খোন্দকার মিঞা কি তা কইছেন কোনও জমায়েতে? হাঁ কি না?"

"না।" জনতা এতক্ষণে একটু স্বস্তি পেল।

"আপনারা এর আগে আপনাগের বিপদে আপদে খোন্দকার মিঞারে আপনাগের পাশে আসে দাঁড়াতি দেখিছেন কোনও দিন?"

"না না।" জনতা সমস্বরে ধ্বনি দিল।

ক্যান্‌ডিডেট মৌলবী আবু তালেব বক্তা আবু তালেব চৌধুরীর একটু পিছনে তোবড়ানো একটা টিনের চেয়ারে বসে পাশের এক মাতব্বরের সঙ্গে মাথা নিচু করে কথা বলছিলেন। উনি পাশের গ্রামের এক মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী। মৌলবী আবু তালেবেরই সাকরেদ। শফিকুল দূর থেকে তাঁর ফেজ টুপিটার টিকি নাড়া দেখছিল। এই লোকটাকে সে এক সময় বাঘ বলে মনে করত। এখন তাকে মনে হচ্ছে একটা শিশু। ভোট চাইছেন না তো, যেন বড়দের কাছে লবেনচুষ ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন!

মৌলবী সাহেবরে অনেক ভাবে চিন্তেই ক্যান্‌ডিডেট দিয়া হইছে। বোঝলেন? উনি এদিকির চিনা লোক। আবু তালেব চৌধুরী শফিকুলকে বলেছিলেন। লোকে উনারে মানে। আরেকটা ভাল ফল পাওয়া গেছে এই যে বহু মাদ্রাসার মৌলবী আর ছাত্তর তাঁরে ছাপোরট্ দিয়ার জন্যি নিজির থেই আগোয়ে আসতিছে। তারা যে কী খাটান খাটতিছে তা আর কী কব? খোন্‌কার দেদার পয়সা ঢালেউ কূল পাচ্ছেন না। ওগের য্যামন ধনবল আমাগের ত্যামন জনবল। ইবার দ্যাখেন, কার জিত হয়?

"আমরা একথা আগেউ কইছি, আজউ খোন্‌কার মিঞারে কতি চাই, আপনিউ যখন নিজি জমিদার হয়ে কৃষক প্রজার ভালো কত্তি চান, ভালো কথা খুব ভালো কথা, তা'লি বিসমিল্লা বলে কাজডা আপনার জমিদারির থেই শুরু করে দ্যান। আমরা কৃষক প্রজা দলের পক্ষের থে যে প্রোগ্রাম রাখিছি, ভাই চাষী খাতক মুসলমান, সিডা আপনাগের সামনে পেশ কত্তিছি। সিডা শোনেন।"

আবু তালেব চৌধুরী একবার হাতের তালু বুলিয়ে মুখটা মুছে নিলেন। চারদিকে চাইলেন।

"আমরা কইছি, কৃষিজীবী মানুষির স্বার্থে," আবু তালেব গলার স্বর উঁচু পর্দায় তুলে যেন ধমক মারলেন, "শোনেন সকলে, বুঝতি চিন্তা করবেন,—"

শফিকুল দেখল, অগোছাল ভিড়টা হঠাৎ যেন জমাট বেঁধে উঠল। যারা গুনগুন করে কথা কইছিল তারা চুপ করে গেল।

"আপনাগের রুজি রোজগার, আপনাগের ছাওয়াল পাওয়ালের জেন্দেগী দাঁড়ায়ে আছে এর উপর। আপনারা বাঁচবেন, না দিনার দায় ফৌত হয়ে যাবেন, সেই সওয়াল দাঁড়ায়ে আছে এই ইলেক্‌শনের উপর। ইডা খ্যালার জিনিস না। ইডা ইয়ারকির জিনিস না।"

আবু তালেব একদল শিশুকে যেন অমনোযোগের জন্য ধমকাচ্ছেন। অন্তত শফিকুলের তাই মনে হল। ভিড়টা ফিসফাস আওয়াজ বন্ধ করল। একটু যেন কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না না শিশু নয়, পশু। যেন পোষমানা সব সারকাসের জীব। আর আবু তালেব মেডেল পরা লিক্‌লিকে ঢাউস এক ছপটি হাতে সেই সারকাসেরই রিং মাস্টার যেন। শফিকুলের মনে এই উপমাটাই ভাল লাগল।

"কৃষিজীবী মানুষির স্বার্থেই মানে চাষীর স্বার্থে এই আপনাগেরই স্বার্থে এবং জমিতি কৃষকের অধিকার অর্থাৎ আপনাগেরই অধিকার কায়েম করার জন্যি বেঙ্গল টেনান্‌সি অ্যাক্ট অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনডারে খোল নলচে বদলায়ে দিতি হবে। এই আমাগের দাবি। আমাগের চাষাগের বড় দাবি হচ্ছে এই।"

"না!" আবু তালেব গর্জন করে উঠলেন। "শুধু এই অ্যাকটা দাবিই না। আরউ আছে।"

আবু তালেব যেন তাঁর শত্রুকে বধ করার জন্যে বন্দুকে বারুদ গাদছেন।

"আরউ আছে।" যেন আবু তালেবের গলা না। বন্দুকের দ্যাওড়।

আবু তালেব আরেকটা দ্যাওড় করলেন, "নজর ও সেলামী আদায়ের যে অধিকার জমিদাররা গ কত্তিছেন, তা নাকচ কত্তি হবে। এই আমাগের সুজা কথা! খোন্দকার মিঞা তার জমিদারিতি কি আমাগের এই দাবি মানবেন? জিজ্ঞেস করেন তারে!"

"ভাই চাষী ও খাতক! ভাই গরিব হিন্দু মুসলমান! আপনারা কন, ইডা আপনাগের দাবি কি না? ইডাই তো আপনাগের দাবি? সবাই একসঙ্গে কন, হ্যাঁ।"

সমস্বরে আওয়াজ উঠল, "হ্যাঁ।"

"নাম খারিজ নাম পত্তনের জন্যি আলাদা খরচ চাষী দেবে না, তার এই অধিকার মানে নিতি হবে। ভাই চাষী খাতক! ভাই গরিব হিন্দু মুসলমান! আপনারা কি সিডা চান সবাই অ্যাকসঙ্গে কন, হ্যাঁ চাই।"

আবার রিং মাস্টার ছপটি মারলেন। সপাৎ।

ভিড় সোৎসাহে আওয়াজ দিল, "হ্যাঁ চাই।"

আপনারা তো কৃষকের পারটি। বেছেটেছে একজন চাষীকে ক্যান্ডিডেট আপনারা করলেন না কেন? প্রশ্ন করেছিল শফিকুল।

দুটো কারণে করিনি। সরলভাবে জবাব দিয়েছিলেন আবু তালেব। কাউন্সিলি যায়ে বসার মত এলেমদার চাষীর সন্ধান পাইনি। আরেকটা মুশকিলউ ছিল।

কী মুশকিল? জিজ্ঞেস করেছিল শফিকুল।

মুশকিলটা ছিল এই যে, তাতে চাষীগেরই সমর্থন পাওয়া যাতো না। এক ইউনিয়নির মাতব্বরকে দাঁড় করালি অন্য ইউনিয়নির মাতব্বর ভাবতো আমিই বা কম কিসির? তারা তখন তারে হারাতি আড়ে হাতে লাগে যাতো। যে জাত অধঃপাতে যায় তার ব্যায়রাম অনেক রকম। এই সব ভাবেই আমরা মৌলবী সাহেবরে ক্যান্ডিডেট করিছি।

"ভাই চাষী ও খাতক!"

শফিকুল দেখল সভাটা এক একবার পাতলা হয়ে আসছে। আবার মাঝে মাঝে বেশ ভিড় জমে উঠছে। কিন্তু আবু তালেবের উৎসাহ তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

তিনি সমান জোরে বলে চলেছেন, "ভাই চাষী ও খাতক! পাটের কথা ধরেন। পাট চষে আজ আর প্যাট ভরে না। খালি দিনা বাড়ে। তবু চাষীগের পাট চষাতিই হয়। ধার করে দিনা করে আমরা পাট বুনাতিছি। অর মহাজন যা দাম ধরে দেচ্ছে তাতে চাষের খরচউ উঠতিছে না। সুদিব টাকা দিতি ঘটি বাটি ইস্তক কোরোক হয়ে যাতিছে। কন্ ইবার—"

রিং মাস্টার ছপটিতে আছাড় মারল।

"আপনারাই কন্, এই অবস্থা কি চলাতি দিতি চান? কন্, না।"

"না না!"

"তালি ভাই, আসেন আমাগের সঙ্গে। থাকেন আমাগের সঙ্গে। চাষীর সঙ্গে চাষীর, খাতকের সঙ্গে খাতকের জোট বাঁধেন। আমাগের ইশ্তেহার সমর্থন করেন। আমাগের ক্যান্ডিডেটরে ভোট দিয়ে আইন সভায় পাঠান। কেননা, চাষীরি বাঁচাবার আইন সেখেনেই তৈরি হবে। সেখেনে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক, যদি জমিদার মহাজনের দল ভারি হয় তালি তারাই তাগের কোলে ঝোল টানবে আর যদি আমরা গরিব চাষী খাতকের দলরে, কৃষক প্রজাগের দলডারে, ভারি করাতি পারি তয় আমরা আমাগের কোলে ঝোল টানাতি পারব।"

সভায় লোক প্রায় নেই। এমন কি মৌলবী আবু তালেবও উসখুস করতে লাগলেন। কিন্তু বক্তা আবু তালেবের ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার সভা ভরে উঠল। মৌলবী আবু তালেবের ধড়ে আবার প্রাণ এল। ইলেকশনে দাঁড়ান ইস্তক তাঁর কলজের ধুকপুকি বেড়ে গিয়েছে।

"পাটের দাম অ্যামনভাবে বাঁধে দিতি হবে যাতে চাষী মার না খায়। এই আমাগের দাবি। হ্যাঁ। চাষীর ঘাড়ের থে ঋণির বুঝা কমায়ে ফেলাতি হবে আর তার জন্যি দরকার হলি সরকাররে টাকা জুগাড় করে আনাতি হবে। এই আমাগের দাবি। হ্যাঁ। ঋণগ্রস্ত চাষীগের দুরবস্থা লাঘব কত্তি হবে। চাষীগের উপর কোনও নতুন কর বা সেস্ না বসায়েই প্রাইমারী শিক্ষারে অবৈতনিক ও আবশ্যিক কত্তি হবে। প্রত্যিটি চাষার ছাওয়াল য্যান বিনে পয়সায় লেখাপড়া শিখাতি পারে। এই আমাগের দাবি। হ্যাঁ। কন্ ভাই, ইডা আপনারা চান কি না? গলায় বেশ জোর দিয়ে কন, হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ।" গোটা তিন চার কণ্ঠ এখান ওখান থেকে এলোমেলোভাবে সাড়া দিল।

আবু তালেব গর্জন করলেন, "কন্, হ্যাঁ!"

সভা গর্জন করে উঠল, "হ্যাঁ।"

"এই হল কৃষক প্রজা দলের দাবি। এই হল আপনাগের দাবি। ইডা সব সুমায় মনে রাখবেন।"

মাঠ প্রায় ফাঁকা। আবু তালেবের চেরা-চেরা আওয়াজটাকে বাতাস যেন শুষে নিতে লাগল।

সভায় লোক সমাগমের বহর দেখে শফিকুল রীতিমত ক্ষুণ্ণ হল। এবং আশ্চর্য হল আবু তালেবের মনোভাব দেখে। মিটিং-এ লোক হল কি না, এটা যেন কোনও ব্যাপারই নয় তাঁর কাছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন, তাঁদের প্রোগ্রাম যেহেতু ভাল, তাই তাঁরা জিতবেনই। তার মনে হতে লাগল মৌলবী আবু তালেব নন, ক্যান্ডিডেট যেন তিনি নিজেই। শফিকুলের মনে হল, এইভাবে ছেড়ে দিলে মৌলবীর পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। জিতবেন খোন্দকার বজলুর রহমান খান বাহাদুর, যাঁরা জয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য তার বাজানকে, বশিরকে, খালেক মুছল্লিকে, তাদের ওদিকের আরও বাছা

বাছা কয়েকজন মাতব্বরকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে হাজতে পোরা হয়েছে। হঠাৎ তার মনে হল, শুধু তো খান বাহাদুরই নন, ঐ সঙ্গে জিতবে তো মেন্দাও, এমন কি দাউদও জিতবে। দাউদ! খপ্ করে স্বভাবত শান্ত শাফকুলের মাথায় একটা বুনো রাগ উঠে গেল। হ্যাঁ, দাউদেরও জিত হবে। সর্বত্রই দাউদের জিত! এমন কি সইফুনকেও দাউদ জিতে নিল। তার তো উচিত ছিল সইফুনকে রক্ষা করা। কিন্তু কই, সে তো এগিয়ে যেতে পারল না?

সইফুন এসেছিল তার কাছে। হ্যাঁ, এ কথাও বলেছিল তার কাছে যে সে দাউদের সঙ্গে শাদীতে রাজী হয়েছে। তখন শফিকুল যদি জোর করত, না সইফুন না, এ হতে পারে না, জোর দিয়ে বলত যদি একথা, তুমি আমার সইফুন, তুমি আমারই, সেদিন যদি জোর করে সইফুনকে বুকে টেনে নিত, যদি বলত, যাও সইফুন তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নাও, তাহলে সইফুন কি তা করত না? নিশ্চয়ই করত। তবে শফিকুল সেদিন এগিয়ে গেল না কেন? বলল না কেন, সইফুন আমি তোমাকে শাদী করব। ছবি? হ্যাঁ ছবি। ছবির জন্যই পারেনি সে সইফুনকে রক্ষা করতে। যদি সে শাদীই করত সইফুনকে, কী বলত ছবি? কিছুই না। কিছুই না? হয়ত মুখে কিছুই বলত না কিংবা কাঁদত হয়ত। অথবা রুদ্রমূর্তিই হয়ত ধারণ করত ছবি। ঠিক জানে না শফিকুল। কিন্তু এটা সে নিশ্চিত জানে, যে বিশ্বাস, যে নির্ভরতা তার উপর ন্যস্ত করে পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে ছবি, সেটা তার মন থেকে চিরদিনের মত উবে যেত। এটাকে সমীহ না করে পারেনি শফিকুল। আর তাই সে সইফুনের সর্বনাশ ঠেকাতে এগিয়ে যেতে পারেনি।

আর দাউদ সইফুনের সেই সর্বনাশ করতে এগিয়ে এসেছে শফিকুলেরই নির্বীর্যতার সুযোগ নিয়ে। সেই দাউদই আবার তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মৌলবী আবু তালেবকে হারাবার জন্য। চাষী খাতকের সর্বনাশ করার জন্য দাউদ খোন্‌কারকে জেতাতে চাইছে। আমার কি কিছু করার নেই! দাউদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমার কি কিছু করা উচিত নয়? ক্রমশ নিজেকে আলস্য থেকে, নিষ্ক্রিয়তা থেকে, শফিকুল আশ্চর্য হয়ে অনুভব করতে লাগল, মুক্ত করার একটা ইচ্ছা তার মনে জেগে উঠছে। এবং একটা উপযুক্ত ইন্ধন, একটা প্রবল ক্রোধ তার ধমনীতে, তার রক্তে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে এবং তাকে জড়তা মুক্ত করে তুলছে।

শফিকুল সংকল্প করল, সে কৃষক প্রজা দলের পক্ষে প্রচারে নামবে। এবং সেদিনই সে কথাটা আবু তালেব এবং মৌলবী সাহেবকে জানিয়ে দিল। বুড়ো মৌলবী, মৌলবী আবু তালেব কথাটা শুনে শফিকুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, "ফটিক রে! আমি তোর উস্তাদ। দেখিস বাপ, আমার মানটা য্যান্ থাকে।"

পরদিনই ফটিক আবু তালেবকে সঙ্গে নিয়ে ঝিনেদার ফৌজদারী ও মুন্‌সেফ কোরটের বার অ্যাসোসিয়েশনের মুসলিম মেম্বারদের সঙ্গে দেখা করল। এবং দুই দলের কর্মসূচী নিয়ে হিন্দু মুসলমান দুই তরফের উকিলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্ক সারাদিন চালাল। এবং কিছু উৎসাহী সমথর্কও পেয়ে গেল। তাদের মধ্যে ফৌজদারী কোরটের কাজী দিলওয়ার হোসেন এবং মুনসেফ্ কোরটের কাসেম জোয়ারদার এবং নির্মল ভুইয়াঁকেই তার সব চাইতে ভাল লেগে গেল।

দিলওয়ার ও কাসেম দুজনেই তরুণ এবং সদ্য কলকাতা ফেরত। তাই এখনও তাদের কথাবার্তায় কলকাতার তাজা গন্ধটা ভুরভুর করছে। দুজনেই বুদ্ধিমান এবং প্রচণ্ড উৎসাহী। নির্মল ভুইয়াঁ প্রায় শফিকুলেরই বয়সী। এরা তিনজনেই পরামর্শ দিল যে পরিষ্কার এবং দীর্ঘ আলোচনার জন্য সন্ধ্যাবেলায় কোথাও বসা যাক। এবং নির্বাচনী সংগ্রামের জন্য একটা রণকৌশল স্থির করা যাক। যে কথা সেই কাজ। সেই সন্ধ্যায় হাজী সাহেবের নতুন বাড়ির দহলিজে বৈঠক বসল।

মৌলবী আবু তালেব আর হাজী সাহেবও সেই বৈঠকে হাজির হলেন। একটা জরুরি কাজ পড়ায় নির্মল ভুইয়াঁ হাজির হতে পারলেন না। আবু তালেব ক্যান্‌ডিডেটের সঙ্গে দিলওয়ার এবং কাসেম মিঞার আলাপ করিয়ে দিলেন।

মৌলবী আবু তালেব বললেন, "বাপ সকল, এই বুড়ো বয়সে এগের অনুরোধেই ক্যান্‌ডিডেট হইছি। হয়ে বুঝতিছি কী গুখুরীই না করিছি। অ্যাখন ছাড়ে দে মা কাঁদে বাঁচি অবস্থা। হারে গেলি মান ইজ্জৎ নিয়ে অ্যামন টানাটানি হবে যে গিরামে আর বাস করা যাবে না।"

শফিকুল বলল, "আমরা যে হেরেই যাব, আপনি এ কথা মনে করছেন কেন?"

"মনে কত্তিছি ক্যান্!" মৌলবী সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "খোন্‌কার ক্যামন মহফিল জমাতিছে জানো! অ্যাক অ্যাক আসরেই পঞ্চাশটা করে হ্যাজাগ জ্বলতিছে। তালি বুঝে দ্যাখ তার মিটিংই লোক জমতিছে ক্যামন?"

"কিন্তু সে সব জমায়েতের বক্তব্য কী জানেন?"

"জানব না ক্যান্? ইস্‌লাম বিপন্ন আর মুসলিম সংহতি চাই আর কাফের মুনাফেকগেরে ভোট দিও না। এই। ব্যস্। সুজাসুজি কথা। আবু মিঞা প্রোগ্রাম ট্রোগ্রাম কত কি কতিছেন। উরা কিন্তু কোর-আনের আয়াত আউড়োয়েই বাজিমাত করে যাচ্ছে।"

আবু তালেব হাসলেন, "বাজিমাত তো মিটিং-ই হবে না। হবে ভোটের বাক্সোয়। যার বাক্সো ভরবে, বাজিমাত সেই করবে।"

"কথাডা আমরাউ শুনিছি।" দিলওয়ার হোসেন বললেন। "আপনাগের বিরুদ্ধে ওগের বড় চারজ্ এই যে, আপনারা মুসলিম সংহতি নষ্ট কত্তিছেন। আর আপনাগের নেতা মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের এগেনেস্টে চারজ্ হচ্ছে এই তিনি হিন্দুগের টাকা খায়ে মুসলমানগের মধ্যি বিভেদ বাড়ায়ে দেচ্ছেন।"

দিলওয়ার হোসেন এমন শান্তভাবে কথাডা বলল যে আচমকা সবাই চুপ করে গেল। শফিকুলের নাকে তার শ্বশুরের নতুন কোঠার দরজা জানালার রঙের গন্ধ ভুর ভুর করে ঢুকছিল। কাল তার এই জন্য বারবার ঘুম ভাঙছিল। ছবি খুব ঘুমিয়েছে কাল। আজ সারাদিন গিয়েছে ছবির সাধ খাওয়ানোর পালা। হাজী সাহেব দুটো দাওয়াত একসঙ্গে খাইয়ে দিলেন। একটা গৃহপ্রবেশের আর একটা তাঁর মেয়ের সাধ খাওয়ানোর। মৌলবী আবু তালেব এবং আবু তালেব মিঞা দিনের বেলা আসতে পারেননি। ইলেক্শনের কাজ ছিল। সন্ধ্যেয় এসে ওঁরা জমেছেন। সারাদিন বাড়িতে হইচই। আম্মাকে অনেক কষ্টে আনতে পেরেছে ফটিক। সাজ্জাদ এখনও খালাস পায়নি। চাঁদ বিবির তাই আসবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ছাওয়ালের মুখ শুকনো, না গেলি সে দেলে আরউ চোট পাবে। তাই চাঁদ বিবি মনের দুঃখু মনে চাপেই বিয়াই বাড়ি আয়েছে।

আম্মাজান এসেছে শেষ পর্যন্ত, ফটিক এতেই খুশি। বাজান এখনও হাজতে এইটাই তার বড় দুঃখ। তার জামিনের আরজি সে কিছুতেই মনজুর করাতে পারছে না। আরেকটা পিটিশন সে মুভ করে এসেছে। পুলিস এখনও চারজশীট দাখিল করেনি। মানে করতে পারেনি। এদিকে এরা চাষী, একমাত্র রোজগেরে লোক। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে এদের রুজি রোজগার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদের পরিবারে হা হা রব উঠেছে। আশা করি হুজুর সবদিক বিবেচনা করে অবিলম্বে এদের জামিন মনজুর করবেন। হুজুর যে শর্ত দেবেন, আমার মক্কেলগণ তাই পালন করবেন। এই আরজি পেশ করে এসেছে শফিকুল। ও আশা করছে, এতে কাজ হবে। নাহলে এবার সে হাইকোরট করবে।

"তালি ভাই, আমাগের কথাটা শোনেন।" এই বলে আবু তালেব আয়েশ করে বসবার জন্য জানালায় ঠেস দিতে গেলেন।

হাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "রঙ লাগবে! রঙ লাগবে! সরে বসেন। ঐ তাকিয়াটায় না হয় ঠেসান দ্যান। জানলায় না, জানলায় না। রঙ এখনউ কাঁচা আছে। জামায় লাগলি আর ওঠবে না!"

আবু তালেব যেন সাপের মাথায় পা দিতে যাচ্ছিলেন, এক লাফে সরে বসলেন।

বললেন, "উঃ, বড্ড বাঁচা বাঁচায়ে দেছেন। পিরেন আমার এই অ্যাকটাই।"

বউ-এর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না চাঁদবিবির। দেল পুড়ে খাক্ হতি থাকে। বড্ড তারে কাছে পাতি ইচ্ছে করে। তবু ফটিককে কোনও দিনই মুখ ফুটে কিছু বলে নি। যা বলার মাঝে মাঝে আল্লাকেই বলে। ফটিক তার আম্মার সহ্যশক্তি দেখে অবাক হয়ে যায়। তার আম্মা যে ছবিকে কত ভালবাসে এবারই তার প্রমাণ পেল ফটিক। পোয়াতী বউ খোলা খাবে তার জন্য নরম মুচি যোগাড় করে রেখেছিল। তার গোটা কতক পোঁটলায় বাঁধল, নোনা তেঁতুল, বরইর আচার বউ-এর জন্য বানিয়ে রেখেছিল চাঁদ বিবি, মিনমিন করে কাঁদতে কাঁদতে সে-সবও বেঁধে নিল। তারপর ফটিক দেখল তার আম্মা চালের বাতায় কী সব আতিপাতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাসের সময় হয়ে এসেছে। ফটিক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কী খুঁজিস্, ও আম্মা? এই যে বাপ, পালাম বোধ হয়। কনে যে কী থুই কিছুই মনে থাকে না। দারেপুরির পীর ছাহেবের এক মুরিদ গিরামে আইছিল। তারে দিয়ে গুটা কতক তাবিজ তদবীর বউয়ির জন্যি করায়ে রাখিছি। দ্যাখ দিনি বাপ্ ইডা কী? চাঁদবিবি ফটিককে একটা নকশা এগিয়ে দিল।

"আপনার ঐ দুই চারজের জবাবই অ্যাখন দিতিছি দিলওয়ার সাহেব।" আবু তালেব বললেন, "শফিকুল ভাই, আপনিই সেদিন আমারে ইংরেজী কাগজখানা পড়াইছিলেন যাতে বাংলার অবিসংবাদিত কৃষক-প্রজা নেতা মৌলবী আবুল কাশেম ফজলুল হকের সেই বিবৃতিটা ছাপা হইছিল। তাতে হক সাহেব এই কথাই কইছেন, হিন্দুরা টাকা দিয়ে আমারে সাহায্য করেন, এই অভিযোগ যাঁরা আমার বিরুদ্ধে তোলেন, তাগের আমি সিডা প্রমাণ করতি কই। তাঁরা সিডা করেন না। করেন না, কেননা তাঁরা জানেন ইডা মিথ্যে এবং শুধুই কুৎসা।"

আবু তালেব তাঁর ঝুলিটা হাতড়াতে লাগলেন। তারপর তার ভিতর থেকে একটা বাসি অমৃতবাজার বের করে বললেন, "অ্যাই! এই যে, এই দ্যাখেন।"

চাঁদবিবির কাছ থেকে গোটা কতক চিরকুট নিয়ে ফটিক পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় একটা তাবিজের নক্শা। ফটিক পড়ে দেখল তাতে আরবীতে হজরতের নাম ও তাঁর বংশাবলী লেখা আছে। যথাঃ মুহম্মদ ইব্নে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদুল মান্নাফ। মুহম্মদের পিতা আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহের পিতা আবদুল মুত্তালিব, আবদুল মুত্তালিবের পিতা হাশিম এবং হাশিমের পিতা আবদুল মান্নাফ। এর পর লেখা আছে একটা আয়াত পাক। এই হল তাবিজটার মন্ত্র। এই তাবিজে কী হয়? না মহানবীর নাম ও তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষদের নাম এবং কোরানের আয়াত পাকটি যাবতীয় জ্বরের মহৌষধি। নকশা ও আয়াত পাকটি লিখিয়া, ফটিক নির্দেশনামাটিও পড়ল, গলায় ধারণ করিলে জ্বর নামিয়া

যাইবে।

"এই দ্যাখেন", আবু তালেব কিঞ্চিৎ ভাংগা ভাংগা গলায় অমৃতবাজার থেকে হক সাহেবের বিবৃতি পড়তে শুরু করলেন: "মাই ফাইট্ ইজ্ উইথ ল্যানডলরডস, ক্যাপিটালিসটস্, অ্যানড হোলডারস অব ভেসটেড ইনটারেসটস। জমিদার, পুঁজিপতি এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষকদের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। দি ল্যানডলরডস আর নাইনটি ফাইভ পারসেনট হিন্দুজ অ্যানড ক্যাপিটালিসটস অ্যানড আদারস নাইনটি এইট পারসেনট হিন্দুজ। জমিদার শ্রেণীর শতকরা ৯৫ শতাংশই হিন্দু এবং ধনী-মহাজনদের শতকরা ৯৮ জনই হিন্দু। সাহায্য দিয়া তো দূরের কথা, তাঁরা আমার পথে সব রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যি কোমর বাঁধে বেরোয়ে পড়িছেন। আমি বরং আশংকা করি যে, অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর বিত্তশালী হিন্দু-মুসলিম জমিদার, পুঁজিপাত ও অন্যান্য ধনী মুসলমানগের সংগে হাত মিলোয়ে আমাকেই কুপোকাত করার চিন্তা করবে। অল ইনডিয়া লেভেলে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগির মধ্যি যে নির্বাচনী সমঝোতা হইছে, সিডা কি প্রমাণ করে না যে, হক সাহেবের কথা ষোল আনা সত্যি?"

ফটিক তার আম্মার হাত থেকে আরেকটা চিরকুট নিল।

আবু তালেব তার ঝোলার মধ্য থেকে আরেকটা ইংরাজী খবরের কাগজ বের করল।

আরেকটা তাবিজ। ফটিক পড়ল, গর্ভরক্ষার অদ্বিতীয় তদবীর। একজন পরহেজগার মুত্তাকী লোক দ্বারা তাবিজটি কোনও চান্দ্র মাসের প্রথম পনেরো দিনের যে কোনও এক শুক্রবার সূর্যোদয়ের সংগে সংগে লিখিতে হইবে এবং রোগীর কোমরে মাদুলীর মধ্যে উত্তমরূপে ভরিয়া বাঁধিয়া দিবে। ইন্‌শা আল্লাহ্ এক বৎসরের মধ্যেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।

"হক ছাহেব, এই যে এখেনে কইছেন", কিঞ্চিৎ উদ্দীপনাভরে কাগজখানা মেলে ধরলেন আবু তালেব। "দিস্ ব্রিংগস্ টু মি দি কোয়েশ্চেন, হোয়াট আই অ্যাম ফাইটিং ফর্? এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমি কিসের জন্যি লড়তিছি?

"তালি বোঝলেন তো, ফজলুল হক কিসির জন্যি লড়াই কত্তিছেন? ফজলুল হক, বাঙ্গালীর রুটির সমস্যা অর্থাৎ কিনা ডাল-ভাত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্যিই লড়াই কত্তিছেন। ফজলুল হক প্রজাস্বত্ব আইনির খোল নলচে পাল্টায়ে বাংলা দেশের গরিব চাষীগের দুর্দশার হাত থে বাঁচাবার জন্যিই লড়াই কত্তিছেন।"

কাসেম জোয়ারদার বললেন, "তা ধরেন, এ দাবি তো উরাউ কত্তি পারেন, না কি পারেন না?"

আবু তালেব বললেন, "কত্তি পারেন, নিশ্চয়ই পারেন।"

কাসেম বললেন, "তাহলি? তাহলি আর আপনাগের বৈশিষ্ট্য কী থাকবে?"

"কিচ্ছু না কিচ্ছু না।" আবু তালেব বললেন, "মুসলিম লিগ পারলামেনটারি বোরড যদি এই প্রোগ্রাম মানে নেয় তাহলি আমাগের আর আলাদা অস্তিত্বেরই বা দরকার কী? আমরা সরে দাঁড়াব।"

আবু তালেব একটু থামলেন। মৌলবী সাহেব আর হাজী সাহেব ঘরের এক কোনায় বসে তামাক টানছেন। ঘরে কেবল গড়গড়ার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আবু তালেব একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা ভাই, ইবার কন দিনি, উনারা কি এই দাবি কোনও দিন করিছেন?"

দিলওয়ার বললেন, "কাসেমের যত আজুড়ে কথা। ওর কথা ছাড়ান দ্যান দিনি। আঁড়ে তক্কো করা ওর স্বভাব।"

আবু তালেব বললেন, "তা ক্যান্? ভালো কথাই তো উনি কইছেন। তা কাসেম ভাইরিই আমি জিজ্ঞেস কত্তিছি, কৃষক প্রজা পারটি যে-সব দাবি নিয়ে ভোটারগের কাছে আগোয়ে যাচ্ছে, খোন্‌কাররা কি সেই সব দাবি তোলছেন?"

কাসেম হাসলেন, "ইবার আপনি আমারে জোড়নে ফেলিছেন।" কাসেম আবার হাসলেন। বললেন, "কবুল কত্তিই হবে যে উরা এসব কথার ধার দিয়েও হাঁটতিছেন না।"

"ক্যান্ তা জানেন?"

এই প্রশ্নের মুখে পড়ে কাসেম একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর আবার হাসলেন।

"না, জানিনে।"

"তালি ভাই শোনেন।" আবু তালেব নড়েচড়ে বসলেন।

"কথাডা খুব সুজা। বাংলা দেশের মুসলিম লিগ পারলামেনটারি বোরডের যাঁরা মেম্‌বার আছেন তাঁরা বাংলা দেশেরউ কেউ না আর বাংলার গরিব চাষী খাতকেরউ কেউ না। কারণ, এই বোরডের আটাশজন মেম্‌বারের মধ্যি এগারোজন হলেন অবাঙালী। যাগের কারউ বাড়ি ইস্‌পাহান, কারউ বাড়ি তেহরান, আবার কারউ কারউ বাড়ি বাদাকসান, সমরকন্দ কিংবা বোমবাই, করাচি, উত্তরপ্রদেশ। আবার ইডাউ বুঝে দ্যাখেন, ইরা কারা? বোরডের মেম্‌বারগের শতকরা উননব্বুই জনই হলেন জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের লোক। তালি কার স্বার্থ উনারা হেফাজত কত্তিছেন। কন? চাষীগের, খাতকগের, গরিবির না জমিদার বড়লোকের? বড়লোকের, ধনীর, জমিদারের—এগেরই স্বার্থ উনারা রক্ষে কত্তিছেন এবং করবেন। সেই জন্যিই কৃষক প্রজা পারটির কর্মসূচী কি দাবি, ওগের প্রোগ্রাম কিংবা দাবি হতি পারে না। কারণ আমাগের দাবি যে উনাগেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে।"

নফরা একটা বড় থালার উপর চায়ের কাপ সাজিয়ে নিয়ে দহলিজে হাজির হল। আর ছোট ছোট চিনে মাটির তসতরিতে বড় বড় রসগোল্লা।

হাজী সাহেব হাঁক দিলেন, "ও আবু তালেব মিঞা! ন্যান, ইবার গরম পানিতি গলাডারে ভিজোয়ে ন্যান দিনি। তারপর যা কবার কবেন।"

"তা যা বলিছেন! ইডার বড্ড দরকার ছিল।"

আবু তালেব এবং অন্যান্যরা সসপ সসপ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন।

সসপ সসপ—

"উনারা কতিছেন আমরা," আবু তালেব বলে চললেন,

সসপ—

"মুসলিম ইউনিটি ধ্বংস কত্তিছি।"

স—সপ।

"বাজে কথা।"

সস—প সসপ—

"আমরা কই, ইউনিটি"

সসপ স—সপ—

"আমরাউ চাই। তবে সিডা"

স—সপ স—সপ—

"হতি হবে চাষী খাতকের উঠোনে। জমিদার ধনীর"

স—স—প—

"দহলিজি নয়।"

কথাটা দিলওয়ার আর কাসেমের খুব ভাল লাগল।

দিলওয়ার বললেন, "ইডা আপনি লাখ কথার অ্যাক কথা কইছেন।"

আবু তালেব খুশি হলেন। দু তিন চুমুকে চা এবং চার গেরাসে চারটে রসগোল্লা শেষ করে মুখ মুছে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।

হাজী সাহেব বললেন, "রসগোল্লা আরউ দিক। নফরা!"

আবু তালেব, দিলওয়ার, কাসেম একযোগে না না করে উঠলেন।

হাজী সাহেব বললেন, "রসগোল্লায় আবার না ক্যান? অ্যাঁ? নফরা!"

"জে!" নফরা এসে হাজির হল। "যা, আরউ রসগোল্লা আন। এ হল জীবন ময়রার রসগোল্লা। একেবারে এক নম্বর।"

মৌলবী আবু তালেব বললেন, "আঠাবো খাদার গদা কুবি আর ঝিনেদার জীবনে, রসগুল্লা এগের মত এই দিগরে আর কেউ বানাতি পাবে না।"

"হ্যাঁ যা কতিছিলাম," আবু তালেব বললেন, "ঢাকার নবাব বাহাদুর খবরের কাগজে কইছেন তিনি নাকি জমিদারি প্রথারউ উচ্ছেদ চান। হক সাহেব একথা শুনে সাফ কয়ে দেছেন, তিনি একথা বিশ্বাস করেন না। হক সাহেব কইছেন, নবাব বাহাদুরগের এই আওয়াজ যে ফাঁকা নয়, সিডা তালি তাঁরা প্রমাণ করে দ্যান। এবং এখনই ইচ্ছে করলি তাঁরা সিডা কত্তি পারেন। তার জন্যি নতুন ইলেকশন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

কাসেম মিঞা জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যামন করে, ক্যামন করে?"

শফিকুল এতক্ষণ নিস্তেজ হয়ে বসেছিল। এবার উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

"হক সাহেব কইছেন", আবু তালেব বললেন, "বর্তমান বেঙ্গল কাউনসিলির আয়ু ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ মারচ পর্যন্ত বাড়ায়ে দিয়া হয়েছে। বাংলা দেশে গভরনরের পরিষদে তো নবাব বাহাদুরির দলের লোকেরাই অর্থাৎ কিনা জিন্না সাহেবের যাঁরা সমর্থক তাঁরাই দলে ভারি। তা তাঁরা এতই যদি কৃষক দরদী তালি তাঁরা এই কাজটা করে দ্যান না? তাঁরা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনডারে এইভাবে সংশোধন করে দ্যান। যথাঃ (ক) জমি হস্তান্তরের সুমায় জমিদারগের জমি কিনার অগ্রাধিকার বিলোপ করা হবে; (খ) নজরানা ও সেলামী প্রথার উচ্ছেদ করা হবে; (গ) জমিদারগেরে খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা লোপ করা হবে। বাংলা দেশের কেবিনেটের মুসলমান মেমবাররা সত্যিই যদি ইডা চান, তাহলি এখনই এই সংশোধন সমুহ কার্যকর তাঁরা কত্তি পারেন। যিডা দরকার সিডা হল সরকার পক্ষের থে অ্যাকটা সংশোধনী বিল উত্থাপন—"

নফরা এক থালা রসগোল্লা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

হাজী সাহেব খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "ন্যান ন্যান, টপাটপ মুখি পোরেন। তারপর—"

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর বাড়িতে ধুপ করে একটা শব্দ হল।

আর তক্ষুনি অ্যাকটা চাপা আর্তনাদ বাইরে ভেসে এল, "বিয়ান বিয়ান। হায় আল্লাহ এ কী কল্লে! বিবি আছাড় খাইছে গো, আহ হা, অ্যাকেবারে বালাতির উপর পড়ে গেছে।"

"কী হল? কী হল?" বলে হাজী সাহেব এক লাফে ভিতরে ঢুকে গেলেন। তাঁর গায়ের ধাক্কা লেগে রসগোল্লার থালা ছিটকে গেল। ঘরময় রসগোল্লা গড়াগড়ি দিতে লাগল।

কী হল? ফটিক কিছু বুঝতে পারছিল না। তার আম্মা অমন করে চেঁচিয়ে উঠল কেন?

তার শ্বশুরই বা ভিতরে ছুটলেন কেন? ছবির কিছু হল না কি? তারও কি এখন ভিতরে যাওয়া উচিত?

হাজী সাহেবের আর্তনাদ কানে ঢুকতেই ফটিক বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে পড়ল। এ নিশ্চয় ছবি। ছবিরই কিছু হয়েছে। ছবি পড়ে গিয়েছে! সর্বনাশ। ফটিক দ্রুত অন্দরে ঢুকে গেল।

॥ ১০ ॥

"হায় আল্লাহ্!"

হাজী সাহেব মেয়ের অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন। আর সেই চিৎকার শুনে ফটিক ছুটে এল অন্দরে। ছবি শানবাঁধানো টিউকলতলায় পড়ে আছে। নিস্পন্দ। মুখখানা যন্ত্রণায় কালো। চাঁদবিবি হাউমাউ করছে, হায় আল্লাহ্, এ কী হ'ল? বউ অ্যাকেবারে বালতির উপর আছাড় খায়ে পড়িছে। নয়মোন মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছেন। ছবির সারা মুখে ওর এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। ফটিক দেখল একটুও নড়ছে না ছবি। তার কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

নয়মোন হাজী সাহেবকে বললেন, "শিগ্‌গির ডাক্তাররে ডা'কে আনেন।"

নয়মোনের কলজে মেয়ের অবস্থা দেখে ধড়ফড় ধড়ফড় করছে।

হাজী সাহেব আর্তস্বরে বললেন, "ওরে বিটি আমার বাঁচে আছে তো?"

নয়মোন তাঁর দিকে করুণ চোখে তাকালেন।

"আপনি যান, আর দেরি করবেন না, ডাক্তারবাবুরি শিগ্‌গির ডা'কে আনেন।"

হাজী সাহেব আর দ্বিরুক্তি না করে দৌড় দিলেন। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলেন। তারপর থপ্ করে ছবির মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

তারপর সংজ্ঞাহীন মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন কঠিন বিপদ থেকে মুক্তিলাভের দোয়াঃ আল্লাহ্ আমাদের সহায় এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ও তিনিই আমাদের দয়ালু প্রভু ও হিতার্থী প্রতিপালক।

তারপর নয়মোনকে বললেন, "আমি ডাক্তার আনতি গ্যালাম। দেখিস্ ফিরে আ'সে য্যান বিটিরি দেখতি পাই।"

হাজী সাহেব চলে গেলেন। নয়মোন চোখ মুছতে মুছতে শফিকুলকে বললেন, "বাপ, ছবিরি কোলে ক'রে এট্টু ঘরে তুলে দ্যাও।"

ফটিক বিনাবাক্যে ছবিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ছবি বেশ ভারি। ফটিক সাবধানে ছবিকে নিয়ে ঘরের দিকে চলল। ছবির কাপড় থেকে খুন আর পানি টপ্ টপ্ করে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

চাঁদবিবি সমানে কাঁদছে। আর বলছে, "হ্যাঁ বাপ, বিটি আমার বাঁচবে তো? হায় আল্লাহ্, এ কী হল? ও বিয়ান, বউ আমার বাঁচবে তো? হায় আল্লাহ্, এ কী করলে!"

নয়মোন একটা পাটি পেতে দিলেন। ছবির রক্তাক্ত অচেতন শরীরটা ফটিক সেই পাটির উপর শুইয়ে দিল। ফটিকের বেশ হাঁফ ধরে গিয়েছে। তার পিরেনটা পানি আর খুনে ভিজে উঠেছে। ফটিক একবার ছবির মুখের দিকে চাইল। চোখ বুজে আছে ছবি। ছবি কি মরে গেল?

"ও বাপ ও বাপ, বউবিটি বাঁচে আছে তো?"

ফটিক এবার ওর আম্মার দিকে চাইল। চাঁদবিবির মুখে একরাশ উদ্বেগ। চোখ দিয়ে জল ঝরছে অবিরল। ফটিকের চোখও কর কর করতে লাগল। সে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। ফটিক রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছে। কী ওর করা উচিত, বুঝতে পারছিল না। কাজেই উদ্বেগ বাড়ছিল। বাইরের ঘরে যে বসে আছে কয়েকজন তাও ভুলে গিয়েছিল।

আবু তালেব আস্তে করে ডাকলেন, "ফটিকভাই!"

ফটিক এগিয়ে গিয়ে দহ্‌লিজে ঢুকল।

মৌলবী সাহেব, আবু তালেব, কাসেম, দিলওয়ার সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? কী হইছে? আপনার বিবি না কি জবর আছাড় খাইছেন!"

ফটিক বলল, "জে।"

"তারপর?" ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন।

ফটিক বলল, "বেহোশ হয়ে গিয়েছে। আব্বা ডাক্তার আনতে ছুটেছেন।"

এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফটিকের হতবুদ্ধির ভাব কিছুটা কমল। ওর মনে হল, এখন ওর ভিতরে থাকাই বোধ হয় ভাল।

ফটিক বলল, "আমি এখন একটু ভেতরেই থাকি।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।" সবাই বলে উঠলেন।

কাসেম মিঞা আর দিলওয়ার মিঞা বললেন, "আমরা উঠি।"

আবু তালেব বললেন, "আমি আছি। দরকার হলি খবর দেবেন।"

মৌলবী আবু তালেব বললেন, "আমিউ বসতিছি। ডাক্তার আসুক। কী কয়, শুনে যাই।"

ফটিক বলল, "বেশ তো বেশ তো!"

তারপর দ্রুত ভিতরে ঢুকে গেল। এবং একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে নয়মোনকে প্রশ্ন করল, "এখন আছে কেমন?"

ফ্যাকাসে মুখে নয়মোন বললেন, "আল্লাহ্ই জানেন। খুন তো দেখি বন্ধ হয় না। কী হবে! ও বাপ?"

নয়মোন ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। ফটিক এই প্রথম নয়মোনকে কাঁদতে দেখল। এবং তাতেই বুঝল অবস্থাটা কী পরিমাণ গুরুতর।

"ছাবর বাপ দেখি", মুছতে মুছতে হতাশাক্লান্ত স্বরে নয়মোন বললেন, "অ্যাখনও আসে না। অ্যাত দেরি কত্তিছে ক্যান? আল্লার মনে যা আছে তাই হবে। আল্লা!"

নয়মোন দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। ফটিক অন্ধকারে উঠোনে পায়চারি করতে লাগল। শ্বশুর এখনও কেন আসছেন না! বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে না কি? এর পর ছবিকে বাঁচানোর সময় পাওয়া যাবে তো? ছবি কি বাঁচবে? ছবি কি মরবে? মরে যাবে ছবি? তার ছবি! না না। ফটিক যেন আর্তনাদ করে উঠল। তার অন্তরের আর্তস্বরটা তার কানে এতই জোরে বেজে উঠল যে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, এবং চারপাশে চেয়ে দেখল, কেউ চেয়ে দেখছে কি না? না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফটিক। কেউ শোনেনি। মাথার উপর চাইল। অঘ্রানের আকাশ। সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষ। তাই ঝলমল করছে কিছু নক্ষত্র। ছবি কি মরছে? ও কি সত্যিই মরে যাবে? এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব যেন ওর চোখের উপরে ভেসে উঠল। ছবি মরছে! বেজায় ভয় পেল ফটিক। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তার অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। এবং তার অস্থিরতা বাড়তে থাকল। ডাক্তার ডাকতে সে কি বেরিয়ে পড়বে এখন? না কি অপেক্ষা করবে শ্বশুরের জন্য। তিনি কি অস্বাভাবিক দেরি করছেন না ডাক্তার আনতে?

ফটিক একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। পিছনে আবু তালেব এসে দাঁড়ালেন।

ফটিকের কাঁধে হাত দিয়ে শান্তভাবে আবু তালেব জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি কোনও খেদমতে লাগতি পারি? যদি কিছু করার থাকে, কন্। আমি এখুনি সে কাজ করে দিচ্ছি।"

"তাহলে ভাই আপনি", শফিকুল বলল, "এগিয়ে গিয়ে দেখবেন, ওঁর ডাক্তার আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন?"

"হাজী সাহেব, কোন্ ডাক্তারির ডাকতি গেছেন জানেন?"

"বোধ হয় দুর্গা বোসকে।"

"আচ্ছা", আবু তালেব বললেন, "আমি দেখতিছি।"

এবং তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। ফটিক ভাবল সে গেলেই ভাল হত। আসলে সে এখন একটু দৌড় ঝাঁপ করতেই চাইছিল। চুপচাপ এই বাড়ির ভিতর আটকা থাকতে তার ভাল লাগছিল না। ছবি মরছে? এই ঘটনার মুখোমুখি সে হতে চাইছিল না। কেননা এই ঘটনার জন্য সে নিজেকেই দায়ী করতে চাইছিল। আবার কেন যে নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় ওঠাতে চাইছে, তার কারণও খুঁজে পাচ্ছিল না।

কাল রাতের ঘটনা যতবার মনে ভেসে উঠতে চাইছে, ততবারই ফটিক তাকে ঠেলে ঠেলে অতল থেকে অতলে পাঠিয়ে দিতে চাইছে। কিছুতেই তার মুখোমুখি হতে চাইছে না।

আমি তো অ্যাখন আপনার চক্ষুশূল! আমি জানি আপনি আমারে অ্যাখন আর দেখতি পারেন না?

কী, একথা বলে নি ছবি? বলেছে। কাল রাতেই বলেছে। আজকাল হামেশাই বলে। ফটিক অস্থির হয়ে উঠল। ডাক্তার আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কথাটা ছবি কি খুব মিথ্যে বলে? আমি কি এগিয়ে দেখব, ডাক্তার আসছে কি না? কথাটা ছবি কি খুব মিথ্যে বলে! নাঃ, আমিও এবার যাই। অবিলম্বে ডাক্তার আসা দরকার। কথাটা ছবি কি খুব মিথ্যে বলে? ছবি আজকাল অবুঝ হয়ে উঠছে। ওর অভিমানও খুব প্রখর হয়ে জেগে উঠেছে এখন। ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আজকাল খুবই কাঁটা হয়ে থাকে ফটিক। কখন কোন কথায় ছবি রেগে উঠবে আর কোন কথায় চোখ দিয়ে তার পানি গড়িয়ে পড়বে, তা এক মুহূর্ত আগেও শফিকুল বুঝতে পারে না। সে জানে এই অবস্থায় তার উচিত ছবিকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখা। এবং সে তা চায়ও। খোদা কসম সে তাই চায়। কিন্তু কী করলে আর কী বললে যে ছবিকে প্রফুল্ল রাখা যায়, সেই জিনিসটাই তার জানা নেই। কথায় কথায় ঘটনা তিক্ততার দিকে গড়িয়ে যায়।

তবে কি ছবিকে তোমার ঝগড়াটে মেয়ে বলে মনে হয়?

না না। ছবি মোটেই ঝগড়াটে মেয়ে নয়। তবে—

তবে কি ছবিকে তোমার বদমেজাজী মেয়ে বলে মনে হয়?

না না। ছবি তো তিরিক্ষে স্বভাবের মেয়ে নয়। নরম মিষ্টি ধাতেরই তো মেয়ে সে।

তবে তুমি এখন ছবিকে এত ভয় পাও কেন?

না না। ঠিক ভয় নয়। পাছে ছবি আমার কাছ থেকে নতুন করে কোনও আঘাত পায়, তাই তাকে এড়িয়ে চলতে চাই।

আমি তো অ্যাখন আপনার চক্ষুশূল। আমি জানি আপনি আমারে অ্যাখন আর দেখতি পারেন না।

ছবির এই অভিযোগ কি মিথ্যে? কথাটা ছবি কি খুব মিথ্যে বলে?

"ও বউ ও বউ! বিটি ও বিটি! ও বিয়ান ও বিয়ান! বিটি আমার চায় না ক্যান?"

আম্মার বিলাপ শুনে ফটিক সেইদিকে দৌড় দিল।

"ও আম্মা, কী হল।"

"বাপ ফটিক!" চাঁদবিবি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

"আমরা তো কুনদিন আল্লার রাস্তা ছাড়িনি বাপ। তয় আমাগের নছিবিই শুধু আল্লাহর গজব অ্যামন বার বার পড়ে ক্যান? আমরা গরিব, সেই জন্যি?"

ফটিক বলল, "আম্মা চুপ কর চুপ কর। অস্থির হোস্নে।"

"আসেন, আসেন ডাক্তারবাবু, আসেন আপনারা!"

হাজী সাহেবের গলা শুনে চাঁদবিবি ঘোমটা টেনে ফোঁপাতে ফোঁপাতে সরে পড়ল। নয়মোন মেয়ের কাছ থেকে নড়লেন না। তিনি ঘোমটার বহর বাড়িয়ে দিলেন।

হাজী সাহেবের পিছু পিছু দুজন ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। ছবিকে পরীক্ষা করে দুজনেই বললেন, "একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেখানে ভর্তি করে দিতে হবে। বাড়ি রেখে এ রোগী ভাল করা যাবে না।"

দুর্গা ডাক্তার বললেন, "নেবার ব্যবস্থা এক্ষুনি করে ফ্যালো আব্বাস। আমি লিখে দিচ্ছি। কী বল, নির্মল?"

নির্মল ডাক্তার একটা সিরিন্জে ওষুধ ভরে ছবিকে একটা ইনজেকশন দিলেন। তারপর বললেন, "সেই ভাল, কাকা। আপনারা রোগীকে ডুলি কি পালকি যাতে হোক চড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। আমি ওদিকেই যাচ্ছি। হাসপাতালের ডাক্তারকে খবর দিয়ে দিচ্ছি।"

হাজী সাহেব অসহায়ভাবে একবার এ ডাক্তারবাবু আরেকবার ও ডাক্তারবাবু দুজনের মুখের দিকেই টালুমালু চাইছিলেন। আর দুজনের কথা বুঝবার চেষ্টা করছিলেন।

এবার দুর্গা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মনে করেন ডাক্তারদাদা? কোনও আশা আছে?"

দুর্গা ডাক্তার বললেন, "এটা অপারেশানের কেস। ভরা পোয়াতী পড়ে গিয়েছে। ভালো ব্যবস্থা হাসপাতালে করাই সম্ভব। আমি এর বেশী আর কিছু বলতে পারি না। তুমি বরং ঐ নির্মল যা বলল, পালকি কি ডুলির ব্যবস্থা কর। আমার জননীর যেন ঝাঁকিটাকি না লাগে। জামাইবাবাজী কোথায়, আব্বাস! তাকে একটু ডাকো।"

ফটিক কাছেই ছিল। এগিয়ে গেল। নির্মল ডাক্তার ছবির নাড়িটা একবার দেখলেন। তারপর গোছগাছ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

হাজী সাহেব বললেন, "এই যে ডাক্তারদাদা, এই যে জামাই।"

নির্মল ডাক্তার বললেন, "কাকা, তালি আমি আগোলাম। আপনারা চটপট আসে পড়েন।"

"হ্যাঁ যাও। তাহলে চিঠির আর দরকার নেই। রতনকে বলো, ও একটা বেড যেন রেডি করে রাখে। ইমারজেন্সি অপারেশনের জন্যও যেন তৈরি থাকে।"

নির্মল ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

দুর্গা ডাক্তার হাজী সাহেবকে বললেন, "আব্বাস, কাহারদের আড্ডায় তুমি কাউকে পাঠিয়ে দাও। একটা পালকি নিয়ে আসুক চটপট।"

ফটিক বলল, "আমি যাই।"

দুর্গা ডাক্তার বললেন, "না বাবাজী, তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ও ব্যবস্থা আব্বাস মিঞাই করবেখন।"

হাজী সাহেব বললেন, "সেই ভাল। আমি এক্ষুনি পালকি আনায়ে নিচ্ছি।"

তিনি দহলিজের দিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন।

দুর্গা ডাক্তার ফটিকের কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলেন। ফটিকের কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত গম্ভীর এবং শান্ত গলায় বলতে লাগলেন, "বাবাজী, তোমাকে দেখে বেশ পোড় খাওয়া লোক বলে মনে হয়। তাই তোমাকেই কথাটা বলি।"

ফটিকের বুক ধুকপুক ধুকপুক করতে লাগল। জজ সাহেব এখনই যেন তার ফাঁসির রায় বলবেন।

"অবস্থা একটু জটিল বাবা!" দুর্গা ডাক্তারের স্বরে সহানুভূতি আছে কিন্তু তাতে ভাবপ্রবণতা নেই। "ইন্ এনি কেস্, একটা দুঃখ তোমাদের পেতেই হচ্ছে। কেন না, বাচ্চার যা অবস্থা, ওকে বোধ হয় বাঁচাতে পারা যাবে না। ওটা নষ্ট হবে। মায়ের কথাটাই এখন ভাবতে হবে।"

ছবির মুখখানা ফটিকের চোখে ভেসে উঠল। সরমে রাঙা হয়ে উঠেছিল ছবির মুখ। তার কানে কানে ফিসফিস করে খবরটা দিয়েছিল ছবি। তার বাচ্চা হবে। তারপর যেন মিশিয়ে গিয়েছিল মাটিতে।

দুর্গা ডাক্তার এখন বলছেন, "ওটা নষ্ট হবে।"

দুর্গা ডাক্তার তার কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছেন। ফটিক টের পাচ্ছে তার

কাঁধে দুর্গা ডাক্তারের হাতের চাপ।

ওটা নষ্ট হবে।

ফাটক শুনছে দুর্গা ডাক্তারের কথা। এবং সে এও জানে যে দুর্গা ডাক্তারের কথা মানেই এই বিষয়ে শেষ কথা। অথচ সে কোনও চাঞ্চল্য তো বোধ করছে না। না শোক, না দুঃখ।

আপনারে য্যান ক্যামন বেকুব বেকুব লাগতিছে। খিলখিল করে হাসছিল ছবি।

তাই বুঝি? সে বলেছিল।

আয়নাডারে আনব? দ্যাখবেন? ছবি বলেছিল। মাঝখানে একটু ফক্কড় হয়ে উঠেছিল ছবি। বেশ বড় হয়ে উঠেছিল যেন। সাহস বাড়ছিল।

"আমাদের এখন প্রথম এবং প্রধান চেষ্টা হবে," দুর্গা ডাক্তার তেমনি সংযত স্বরে বলে চলেছেন. "বুঝলে বাবাজী, জননীকে রক্ষা করা।"

কার কথা বলছেন দুর্গা ডাক্তার? নিশ্চয়ই এমন কারও কথা, যার সঙ্গে ফটিকের বোধ হয় বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। নিশ্চয়ই তাই। না হলে এমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে সে শুনে যাচ্ছে কেমন করে?

আচ্ছা, বাচ্চা প্যাটের কোন জায়গায় থাকে, জানেন? একদিন অত্যন্ত লাজুকভাবে জানতে চেয়েছিল ছবি। আমি কী করে জানব? সে জবাব দিয়েছিল।

তালি আর কী উকিল হলেন? ছবি বলেছিল। শুনেছ মেয়ের কথা!

কেন? এর সঙ্গে ওকালতির সম্পর্ক কী?

উকিল হলি সবই জানতি হয়। ছবি হেসেছিল। কত সাহস বেড়েছিল তার।

"এবং সে কাজটাও," দুর্গা ডাক্তার ধীরভাবে বললেন, "না বাবাজী, তোমাকে আমি ভয় দেখাব না বা ভরসাও দেব না. তোমাকে শুধু বলব যে বাস্তব অবস্থাটা কী? এবং সেটা—"

এতক্ষণে ফটিক একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। এত ভণিতা করছেন কেন ডাক্তারবাবু?

"সন্দেহ নেই সেটা একটু দুরূহ কাজ।" দুর্গা ডাক্তার বললেন, "কেস্‌টা একটু শক্ত হয়ে পড়েছে বাবাজী। প্রথম পোয়াতী! তুমি তোমার শ্বশুরকে বা আর কাউকেই এখন বলো না। বুঝলে?"

"জে।" ফটিক নিজের স্বর নিজের কানে শুনে একটু ববং অবাকই হল। সে ভেবেছিল, সে বুঝি বোবাই হয়ে গিয়েছে। এখন দেখল, না তো! সে তো দিব্যি কথা বলতে পারছে। তবে সে যে ভেবেছিল, সে বোবা হয়ে গিয়েছে! সেই ভাবনাটাই ছিল আজগুবি।

"জে। বুঝেছি।"

কথাটা আবার বলল ফটিক। এবং আবার শুনল। তার মানে সে সত্যিই বোবা হয় নি। তার মানে ছবিও আছাড় খায়নি। ওটাও তার আজগুবি ভাবনা। তার বাচ্চাও নষ্ট হয় নি।

ফুফু কয় আমার ইবার ব্যাটা হবে। ফটিক স্পষ্ট ছবির কথা শুনতে পেল।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি, হবে। ফটিক তাকে ভরসা দিল। নিশ্চয়ই হবে।

এমন ভরসা সে আগে দেয়নি কেন? তাহলে তো ছবি আর এত যন্ত্রণা পেত না।

বাজান তো খুব খুশি।

খুশি তো হবারই কথা ছবি। কত আশা করে তাঁরা রয়েছেন।

আপনি খুশি হইছেন?

আমি আমি ছবি, সত্যি বলতে কি. ঠিক বুঝতে পারছি নে।

"বাবাজী, বাড়িতে এখন ঠান্ডা মাথার একটা লোক দরকার।" ডাক্তারবাবু বললেন, "যাকে শক্ত শক্ত সিদ্ধান্ত অতি দ্রুত নিতে হবে। এবং সেই সিদ্ধান্ত বেঠিক হলেই একটা লোকের প্রাণ সংশয় হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি।"

"আমাকে! আমাকে কেন?"

"তোমার শ্বশুরের এখন যা মানসিক অবস্থা, তাতে তার কাছ থেকে এই ব্যাপারে স্থৈর্য আশা করিনে। তুমি যেন স্থৈর্য হারিয়ে ফেলো না। বিচারবুদ্ধিকে খোলা রেখো।"

আমি ছবিকে একবার দেখব। হঠাৎ তার মনে এই ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। আমি ওর সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলব। কাল রাতের ঘটনার জন্য আমি ছবির কাছে মাপ চাইব। প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠল ফটিকের মনে। ওর ইচ্ছে হল ছবিকে একবার জাগিয়ে দিতে ডাক্তারবাবুর কাছে অনুরোধ জানায়। ফটিকের উপর প্রচন্ড অভিমান করেছে ছবি। তাই তার কাছ থেকে চলে যাবার জন্য সে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ফটিকের এতটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে নিরিবিলিতে ওরা দুজন যদি কথা কইবার সুযোগ পায়, তাহলে সে ছবির রাগ ভাঙাতে পারবে। তাকে বোঝাতে পারবে ফটিক যে সে তাকে ভালোবাসে। আমি তোমাকে ভালোবাসি ছবি। সত্যিই। ছবি জানে সে ছবিকে ভালোবাসে। এবং ফটিকও জানে সে আসলে ছবিকেই ভালোবাসে। অথচ এই কথাটা বলতে গেলে এত ফাঁপা লাগছে কেন? যেন ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করছে।

ছবি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। সইফুন সম্পর্কে আমার মনে দুর্বলতা হয়ত ছিল কিন্তু ভালোবাসা ছিল না। ফটিক ছবিকে এই কথাটিই বলতে চায়। কাল এই কথাটাই সে তাকে বলতে চেয়েছিল। কিন্তু কী যে ঘটল! দুজনেই এত রেগে উঠল! ব্যাপারটাই বড় বিশ্রী হয়ে

গিয়েছে।

"বাবাজী, মা জননীকে বাঁচাবার ব্যাপারে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতে পারে।" ডাক্তারবাবু বললেন, "হাসপাতালে গেলেই বোঝা যাবে ক্ষতি কতটা হয়েছে। জান তো সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া ডাক্তারদের চরিত্রে নেই। উকিলদেরও না। ফাঁসির হুকুম বেরিয়ে যাবার পরও তোমরা আপীল কর। ডাক্তারদেরও ঐ স্পিরিট্। তাই তোমাকেই বলছি মহড়া নিতে।"

হাজী সাহেব ঘামতে ঘামতে বাড়িতে ঢুকলেন।

এবং ঢুকেই হাঁক দিলেন, "পাল্কি! পাল্কি!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আনো পাল্কি, ভিতরে আনো। মা জননীকে তুলে দাও।"

পাল্কি ভিতরে এল। একেবারে ছবির ঘরের সামনে। নয়মোন এর মধ্যেই বোরখা পরে একেবারে তৈরি। পাল্কি আসা মাত্র, তিনি ভিতরে বিছানা পেতে দিলেন। ছোট্ট কুঁজোয় জল ভবে রেখে ছিলেন। ঝালর দেওয়া হাতপাখা গুছিয়ে রেখেছিলেন। একটা পোঁটলায় ছবির জামা-কাপড় সব গুছিয়ে নিলেন। বলা তো যায় না, যদি দরকার লাগে।

ফটিক আর কাউকে ছবির কাছে এগুতে দিল না। যেমন করে ওর অচৈতন্য দেহটা কলতলা থেকে তুলে এনেছিল, তেমনি পাঁজাকোলা করে ছবিকে তুলে নিল। ছবির ভারি শরীরের সমস্ত স্পর্শটুকু ফটিক যেন তার সমগ্র অনুভূতি দিয়ে বন্দী করে রাখতে চাইছিল।

আচ্ছা, বাচ্চা প্যাটের কোন্‌দিকে থাকে, জানেন?

ফটিক ছবির মুখের দিকে চাইল। সেই আবছা আলোয় তাকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না।

আমার ভয় করে, ভয় করে, জানেন। ছবি কত রাতে ধড়মড় করে জেগে উঠেই তাকে জড়িয়ে ধরত। কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করত, বিটা যদি না হয়, যদি বিটি হয়? আপনি কি নারাজ হবেন? এই প্রশ্ন বার বার তাকে জিজ্ঞেস করত। ফটিক একঘেয়ে প্রশ্ন শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কেন তার এত ক্লান্তি? ইদানীং সে ভালো করে শুনতোও না। কেন এত অমনোযোগ? ফটিক আজ ছবির অসাড় ভারি দেহটা বুকে তুলে নিয়ে বুঝতে পারছে কত নিষ্ঠুরতাই না সে করেছে ছবির সঙ্গে। ফটিক ছবিকে নিয়ে পালকির কাছে এগিয়ে গেল। আরেকবার চাইল ছবির শান্ত এবং নিথর মুখখানার দিকে। কে একজন আলো ধরল। হ্যারিকেনের আলোয় ছবিকে কেমন ম্লান দেখাচ্ছে। কেমন যেন হলদে হলদে।

দ্যাখেন, দ্যাখেন, ক্যামন নড়তিছে। ছবি ফটিকের হাতখানা নিয়ে নিজের পেটের উপর রাখল।

আর তোমার বাচ্চার জন্য কোনও দুশ্চিন্তা করতে হবে না ছবি!

ফটিক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তোমার বেটা হবে না বিটি হবে, আর ও নিয়ে অনর্থক ভেবো না।

"বাবাজী", দুর্গা ডাক্তার বললেন, "মা জননীকে সাবধানে নামিও। দেখো, যেন ধাক্কাধাক্কি না লাগে!"

ফটিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ছবির দেহটা পালকির ভিতর শুইয়ে দিল। নয়মোন আগেই উঠে বসেছিলেন। ফটিক ছবির মাথাটা নয়মোনের কোলে তুলে দিল। নয়মোন হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করলেন। কাহাররা দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর পাল্কি কাঁধে তুলল।

"সাবধান, সাবধান বাবা সকল!" হাজী সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "মোটে দৌড়বা না, বুঝিছ, অ্যাকেবারে পায়ে পায়ে হাঁটে হাসপাতালে যাবা। একেবারে আমার সঙ্গে সঙ্গে। আগেউ না, পিছোনেউ না।"

দুর্গা ডাক্তার তাঁর টমটমে চড়ে আগেই চলে গেলেন হাসপাতালে।

পালকি নামাতেই দুটো লোক স্ট্রেচার নিয়ে এল। আর পট করে ছবিকে পালকি থেকে স্ট্রেচারে তুলে ভিতরে নিয়ে গেল।

নয়মোন আর বাড়ির একটা চাকর বাইরেই পালকির কাছে দাঁড়িয়ে রইল। হাজী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকলেন। পিছনে ফটিক।

হাসপাতালের সারজেনের ঘরে তারা নির্মল ডাক্তার দুর্গা ডাক্তার দুজনকেই পেল।

দুর্গা ডাক্তার বলছেন, "দ্যাখ রতন! মা জননী আমার ভাইঝি, আমার মেয়ে।"

রতন বললেন, "আপনি যখন এতদূর পর্যন্ত এসেছেন, তখনই তা বুঝেছি।"

"কী করি বাবা। বয়স হয়েছে। এখন বিশ্রাম করতে চাই। কিন্তু পুরনো সম্পর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। আপদ বিপদ হলেই দৌড়োয় আমার কাছে। এ বিটি তো আমার হাতেই মানুষ। এই যে আব্বাস হাজী, ওর গ্রামে যাওয়ার শক্তি এখন আর নেই। আব্বাসকে বললাম, ভাই আব্বাস, আর তোমার বাড়ি পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা নেই। তুমি এবার অন্য কারও উপর নির্ভর কর। তা আব্বাস করল কি, বিটিকে আমার হাতে চিকিৎসার জন্য রেখে দেবে বলে ঝিনেদায় বাড়িই তুলে ফেলল।"

দুর্গা ডাক্তার একবার হাজী সাহেবের দিকে চাইলেন।

বললেন, "আব্বাস, তুমি জামাই বাবাজীকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা কর। রতন আগে বিটিকে দেখুক। তারপর কী ঠিক হয়, তোমাকে আমরা জানাচ্ছি।"

"ডাক্তারদাদা!" হাজী সাহেব আর কিছু বলতে পারলেন না। ওঁর গলা বুজে এল। চোখ টলটল। ঠোঁট দুটো থথর থথর করে শুধু কাঁপছে।

দুর্গা ডাক্তার বললেন, "বউমা এসেছেন। তাঁর কাছে যাও। তুমি শক্ত হও। যাও, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। চলো রতন। নির্মল এসো।"

চারিদিক নিস্তব্ধ। ফটিকের নাকে লাইজলের গন্ধ এসে লাগছিল। এবং আয়ডোফরমের। কচিৎ কোনও ঘর থেকে চাপা কাতরোক্তি কানে এসে লাগলেই ফটিক চমকে উঠছিল। ছবি! পালকিতে নয়মোন বসে আছেন। হাজী সাহেবকে এত অস্থির হতে ফটিক আর কখনও দেখেনি। হাসপাতালের মাঠ তিনি যেন চষে বেড়াচ্ছেন।

আমি ছবির সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে ফটিক। প্রথম মা হতে চলেছে ছবি। আর আমি কি-না এই ব্যাপারটার কোনও গুরুত্বই দিইনি! কত রাতে ভয় পেয়ে শিউরে উঠেছে ছবি। তার কাছ থেকে ভরসা চেয়েছে ছবি। আর ফটিক? নিজের মনটাকে সে মেলে ধরল। সে কোথায় ভরসা দেবে, তা নয় সে কেবল উপেক্ষাই দেখিয়ে এসেছে। কেন?

এই প্রশ্নের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। কেন?

কে যেন ককিয়ে উঠল। ছবি! ছবির গলা। ফটিকের বুক ছ্যাৎ করে উঠল।

আর এ রকম হবে না ছবি। তোমার কসম। আমাকে শুধরাতে একটা সুযোগ দাও।

হাজী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালের বারান্দায় উঠে পড়লেন। আবছা আলোয় ঢাকা করিডরটায় উঁকি দিয়ে দেখলেন। তারপর নেমে এলেন। নয়মোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। পালকির উপর ঝুঁকে পড়লেন। রুদ্ধকণ্ঠে তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "কী কো'স? ছবির গলা না?"

নয়মোনের কলজেটাও সেই তখন থেকে ধুকপুক করছে। বারবার মনে হয়েছে এই বুঝি ফেটে যাবে। কিন্তু নয়মোন তা কাউকেই বুঝতে দিতে চান না। এখন পা ছড়িয়ে কাঁদার সময় নয়, এখন শুধু কাজ করতে হয়। মেয়েকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরতে হবে তো?

নয়মোন বললেন, "পাটিডে বিছোয়ে দেবো? এট্টু বসবেন? বসেন না? পাখা দিয়ে বাতাস করি! সেই তখনের থে ক্যাবল তো পার উপরই বইছেন।"

হাজী সাহেব বললেন, "তুই বো'স। তুই বো'স।"

তারপর আবার দ্রুত এগিয়ে গেলেন। ডাক্তারদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল যেন। হাজী সাহেব লাফে লাফে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠলেন। পিছনে ফটিক।

"শোনো আব্বাস!" দুর্গা ডাক্তার বললেন, "যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। বাচ্চাটা মারা গিয়েছে। রতন বলছে, মা জননীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই ভালো।"

রতন ডাক্তার বললেন, "অন্য কেউ হলে ওঁকে নিয়ে এখানেই ডেলিভারি করিয়ে দিতাম। এমনিতে বিশেষ অসুবিধে নেই। কিন্তু ধরুন যদি হেমারেজ শুরু হয়, তখন? এখেনে ব্লাড পাব কোথায়?"

"আমারও মনে হল কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ভালো!" নির্মল ডাক্তারও এই পরামর্শ দিলেন।

হাজী সাহেব ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাচ্চাটা নেই। আজই না ছবির সাধ খাওয়ানো হ'ল! আল্লা!

"তাহলে তাই করো আব্বাস!" দুর্গা ডাক্তার বললেন। "আর সময় নষ্ট না করে সকালের বাসেই কলকাতায় রওনা হয়ে যাও।"

"তা'লি দাদা, আপনিউ আমাগের সঙ্গে চলেন!" হাজী সাহেব দুর্গা ডাক্তারের হাত চেপে ধরলেন। "ছবিরি এই অবস্থায় অ্যাকলা কলকাতায় নিয়ে যাতি সাহস হয় না।"

হাজী সাহেবের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল।

"বিটা বলেন বিটা আর বিটি বলেন বিটি, আমার ঐ অ্যাক ছবি। ওরে আপনারা বাঁচায়ে রাখেন দাদা!"

"অস্থির হয়ো না আব্বাস। মাথা ঠান্ডা রাখো। ব্যবস্থা একটা করছি।"

দুর্গা ডাক্তার এক লহমা ভাবলেন। তারপর নির্মল ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

"নির্মল, বাবা! তুমি এই কাজটা কর। তুমি ওদের সঙ্গে কাল কলকাতায় চলে যাও।"

"কিন্তু আমার রোগী?"

"আমাকে নাম ধাম সব দিয়ে যাও। তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত, আমি সব সামলে রাখবো। বয়েস হয়েছে তাই। নইলে আমাকেই যেতে হত। ফ্যামিলির ডাক্তার। তার দায়িত্বই আলাদা।"

নির্মল ডাক্তার রোগীর সঙ্গে কলকাতায় যেতে রাজী হওয়ায় হাজী সাহেব ভরসা পেলেন।

"আর হ্যাঁ, শোনো!" দুর্গা ডাক্তার বললেন, "এখনই পালেদের অফিসে যাও। বলো গে রোগী যাবে। ফারস্ট্ কেবিনটা রিজার্ভ করে ফ্যালো। আর চুয়াডাঙ্গার গিয়ে স্ট্রেচারে করে রোগী নামাবে। ফারস্ট্ কিংবা সেকেন্ড ক্লাসে করে যাবে। রোগীকে সর্বদাই শুইয়ে নিয়ে যাবে। নির্মল ভাল বুঝবে কোথায় রোগী নেবে? মেডিকেলে না কারমাইকেলে, কোথায় নিতে চাও নির্মল?"

"চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে। ওখানে বামনদাস মুখুজ্জে আছেন। আমার স্যর। এই জেলার ছেলে সুবোধ আছে। আমার বন্ধু।"

"ব্যস্ ব্যস্ আর কোনও কথা নয়। কারমাইকেলে কেদার দাস, গোবরায় সুন্দরী দাস আর সেবাসদনে বামনদাস। বাঃ! তা বাবা দাসানুদাস, একটা অ্যাম্বুলেন্স্ ডেকে সোজা চলে যাবে।"

দুর্গা ডাক্তারের কথায় সবাই হেসে ফেললেন। আবহাওয়া হালকা দেখে হাজী সাহেবের প্রাণেও জল এল।

"কিন্তু দাদা, ছবি আছে কেমন?" হাজী সাহেব বলে উঠলেন, "সে এই ধকল সামলাতে পারবে তো?"

রতন ডাক্তার বললেন, "এখনও ওর শরীরে যুঝবার শক্তি বেশ ভালোই আছে। সেইজন্যই তো এত তাড়াহুড়ো করছি। পেশেন্টের এখন যা কন্ডিশান তাতে কলকাতায় পোঁছুতে অসুবিধে হবে না।"

"ছবি বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু!" ফটিক হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

ছবির কাছে মার্জনা চাইতে হবে। ছবির বেঁচে থাকা দরকার।

"এত তোড়জোড়, এই সবই তো ওকে বাঁচাবার জন্যই।" রতন ডাক্তার জবাব দিলেন।

ফটিক কি আর তা বোঝে না? বোঝে। কিন্তু সে ওর প্রশ্নের একটা স্পষ্ট জবাব পেতে চাইছিল। অর্থাৎ ছবি যে মরবে না, এই কথাটাই সে ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে জেনে আশ্বস্ত হতে চাইছিল। কেন না ছবিকে তার দরকার। বড় দরকার।

॥ ১১ ॥

আবু তালেব চৌধুরী ঝিনেদার হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সেই তখন থেকে কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় নাকুড় কুড় কুড় নাকুড় ডগড়-কাড়র অবিশ্রান্ত বোল শুনে যাচ্ছিলেন। কখনও তাঁর ভ্রম হচ্ছিল, এ বুঝি বা মহরমের বাজনা। মহরম! হঠাৎ আবু তালেবের খেয়াল হল, দূর, এখন মহরম কী? কুড় কুড় নাকুড় কুড় কুড় নাকুড় গিজিতাঘ্ গি গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাকুড় কুড় কুড় নাকুড়। এ তবে কীসের বাজনা? বিসর্জনের বাজনায় এদেশে ঢাক, ঢোল আর কাঁসি বাজে। ডগর আর কাড়া এমনভাবে হিঁদুরা বাজায় না। তা হলে? হয়ত কোনও পয়সাওলা মিঞা সাহেব শাদি কত্তি চলিছেন রোশন চৌকি বাজায়ে। নাক্ কুড় কুড় কুড় কুড় নাকুড় কুড় কুড় নাকুড় কুড় কুড় নাকুড় গিজ্ গিজ্ তা গিজ্তা গিজা গিজ্তা গিজা গিজ্তা গিজা।

আর সন্দেহ রইল না আবু তালেবের। তাসা পারটিও যখন বের হয়েছে তখন আর কোনও ভুল নেই। এ মুসলমানের মিছিল। মিঞা সাহেব শাদি কত্তি চলিছেন। পায়জামার উপর ঝলমলে আচকান, পায়ে ইস্টাকিন আর নতুন জুতো, মাথায় পাগড়ি, তার উপর দিয়ে জরির ঝালর গড়িয়ে এসে দুলহা মিঞার মুখ ঢাকে দিয়েছে। সঙ সাজে মিঞা ঘোড়ার উপর জবুথবু হয়ে বসে আছেন। সদাই এই-পড়লাম এই-পড়লাম ভাব। পিছনে বাদ্যি বাজতিছে। এর পরে হয়ত গেটে-বোম্ও ফাটবে। মনশ্চক্ষে দৃশ্যটা দেখছিলেন আবু তালেব এবং হাসছিলেন মনে মনে। একটু পাশ ফিরতে পারলে ভাল হত। কিন্তু উপায় নেই। দু পায়েই প্লাস্টার করা। আজ তিন হপ্তা তিনি এই হাসপাতালে পড়ে আছেন। প্রথম প্রথম উদ্বেগ বোধ করতেন। চলে যেতে চাইতেন। তাঁর উপর কত দায়িত্ব। ডাক্তারবাবু ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়েসুজিয়ে তাঁকে শুইয়ে রেখেছেন। তিনি পরে জেনেছেন খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন। মস্ত ফাঁড়া কেটেছে তাঁর।

দুর্ঘটনা। বশির বিশ্বাস করে না। কিন্তু বশির তো সঙ্গে ছিল না। আবু তালেব একাই ছিলেন সওয়ার। আর গাড়ি চালাচ্ছিল ফুলরির খেতু গাড়োয়ান। কিন্তু সে তো ঘটনাস্থলেই মৃত। নতুন তৈরি উঁচু রাস্তার উপর দিয়ে আসছিল খেতু গাড়োয়ানের গাড়ি। এক দিনে ছ'টা মিটিং করে মাঝরাতে ঝিমোতে ঝিমোতে ঝিনেদায় ফিরছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত আবু তালেব। মাঝপথে এই দুর্ঘটনা। খেতুর ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে উঁচু বাঁধ থেকে গাড়ি সুদ্ধ নিচে লাফ মারে। কেননা হঠাৎ খেতুর ঘোড়ার মুখে একটা মোটর গাড়ির দুটো হেড লাইট জ্বলে ওঠে। আর ক্রোঁওও ক্রোঁওও করে বেজে ওঠে জোরালো একটা বিশ্রী হর্ন্। গ্রামের ঘোড়া এতেই ভয় পেয়ে দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ মারে। অতএব এটা একটা দুর্ঘটনাই। মোটর গাড়ির আরোহী ছিলেন লিগ বোরডের ক্যান্ডিডেট খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান। এটাও একটা যোগাযোগ। বশির বিশ্বাস করে না। খোনকার মিঞা মৃত গাড়োয়ান এবং অচৈতন্য সওয়ারি এই দুজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে এনে হাসপাতালে ভরতি করে দিয়ে যান। পরে খেতুর পরিচয় পাওয়ার পর তার দাহকার্য, শ্রাদ্ধশান্তি এবং ঘোড়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন কিছু টাকা খান বাহাদুর এক নির্বাচনী মিটিং-এ প্রকাশ্যে খেতুর বউকে দান করেন। সব খবর পান আবু তালেব এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে। আর কি করার আছে? আল্লাহ্। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। দিনে এমন হাজারটা দীর্ঘশ্বাস তিনি ছাড়েন।

আবু তালেবকে খোনকার নাকি সনাক্ত করতে পারেননি। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তাঁর

পকেটের কাগজপত্র দেখে তাঁকে সনাক্ত করলে তখন নাকি খোনকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। এবং স্বাভাবিক ঔদার্যবশত আবু তালেবের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যান। ঢালাও হুকুম দিয়ে যান খরচ সব তাঁর। এটা যে খোন্‌কারের ভালোমানুষি তা বিশ্বাস করে না বশির অথবা সাজ্জাদ মোল্লা অথবা খালেক মুছল্লি। এমন কি কাসেম আর দিলওয়ার হোসেন উকিলরাও তা বিশ্বাস করেন না। কেননা, সেই মোটরে খোন্‌কারের সংগী ছিল দাউদ আর গাজী গোলাম। এই ব্যাপারটাই বুঝতে অসুবিধে হয় আবু তালেবের। কী করে তা সম্ভব? কেননা আবু তালেব জানেন, ওরা দুজনেই তাঁকে বিলক্ষণ চেনে। দাউদ আর গাজী গোলাম বারবার তাঁর কাছে এসেছে মৌলবী আবু তালেবকে উইড্র করাবার জন্য। মৌলবী আবু তালেবকেও ওরা মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছে। গাজী গোলাম তাঁকেও টাকা দেখিয়েছে। কাজেই খান বাহাদুর যদি নাও চিনতে পারেন, ওদের তো তাঁকে চিনবার কথা। অজ্ঞাতপরিচয় কেন? আবু তালেব এ রহস্যের কিনারা করতে পারেন না।

ন্যান মিঞা ন্যান। ও সব বড় বড় কথা শুনার সুমায় আমার নেই। গাজী গোলাম বলছিল। কত টাকা হলি মৌলবী সাহেবরে তুলে নিতি পারেন, সেই কথাডাই কন। মৌলবী সাহেব কত চান আর আপনিই বা কত চান, সাফ তাই কয়ে দ্যান। খোন্‌কার সাহেব জেতবেনই, এতে আর কোনও ভুল নেই। তয় আমরা মৌলবী সাহেব যাতে সরে দাঁড়ান, তার জন্যি এত টাকা ঢালতি যাতিছি ক্যান? তার কারণডাউ খুব সাফ। আমরা চাই খোন্‌কার আন্‌কন্‌টেস্‌টেড হয়ে বেরোয়ে আসেন। তালি হিন্দুরা বোঝবে মোছলমানগের মদ্যি ইউনিটি আছে। উরা ভয় পাবে। বোঝলেন? ঐ মৌলবীডারে দাঁড় করায়ে আপনারা মস্ত ভুল করিছেন। ওরে চেনে কিডা? খোন্‌কারের মত অ্যাত বড় অ্যাকটা শক্ত ক্যান্‌ডিডেটের সামনে কি মৌলবীর মত চুনোপুঁটি দাঁড়াতি পারে? অ্যাঁ! কন্‌, কত টাকা?

আবু তালেব গাজী গোলামের মত এমন অমায়িক বদমায়েশ আগে আর কখনও দেখেনি। দাউদকে ওর সংগে দেখে তাই তো মনে হয়েছিল, সেও গাজী গোলামেরই দোসর।

দাউদ বলে কি, আমি আপনাগের ওদিকিরই লোক। গুলাম ভাইর কথাডা আপনারে ভালো করে ভা'বে দেখতি কই। ইলেকশন তো আর রোজ হয় না। এ সুযোগ কখনও-সখনও আসে ভাই। মৌলবী গররাজী নয়। আমি খুব ভালো কোয়াটারের থেই খবরটা পাইছি। মৌলবী কিছু টাকা পালি পথ ছা'ড়ে দিতি অমত করবে না, এ আমি আপনারে কয়ে দিলাম। ওরা দুজনেই খোন্‌কারের গাড়িতে ছিল. তয় উরা আমারে সনাক্ত করল না ক্যান?

গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা নাকুড় নাকুড় গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা কুড় কুড় নাক্‌ কুড় কুড় নাক্‌ কুড় কুড় নাক্‌। তাসা পারটির শোর যেন ধীরে ধীরে দূরে চলে যাচ্ছে। আবু তালেবের খুব পাশ ফিরতে ইচ্ছে করছিল। কেননা প্লাস্‌টারের মধ্যে চুলকোচ্ছে। ওঁর কাছে একটা পালক ছিল। সেটা প্লাস্‌টারের ভিতর ঢুকিয়ে এদিক ওদিক ঘোরালে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। সময়ও কাটে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই পালকটা ওঁর হাত থেকে নিচে পড়ে গেল।

আবু তালেব যতটা পারলেন, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। পালকটাকে দেখতে পেলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে চিত হয়েই শুয়ে থাকতে হল। যদিও কোনও ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেওয়া তাঁর স্বভাবে নেই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি কীই বা করতে পারেন? হাত পা বেঁধে তাঁকে যদি কেউ ফেলে রেখে দেয় তো কী করতে পারেন তিনি? আজ তিন হপ্তা তিনি হাসপাতালে পড়ে। শৈলকুপার ওদিকটায় সবে মাত্র তাঁদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শক্তির উৎসগুলিকে একত্র করে আনছিলেন, এমন সময় এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। নাঃ, তিনি আর ও নিয়ে ভাববেন না। কেননা ফল কি হবে তাঁর জানা।

হ্যাঁ, একটা ভাল খবর এই যে শফিকুল ইলেকশনের দু হপ্তা আগে বশিরদের জামিনে বের করে আনতে পেরেছেন। বেচারী শফিকুলের কথা ভেবে খুব দুঃখ হল তাঁর। একদিকে বিবি কলকাতায় মর-মর, অন্য দিকে বাজান হাজতে। খুব লড়ছেন। খালি কলকাতা আর যশোর দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে তাঁকে। এবং তিনি বশিরদের বের করে এনেছেন। ভালো করেছেন। না হলে হয়ত মৌলবী আবু তালেবের মাথা খারাপ হয়ে যেত। তাঁর দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মৌলবী যেদিন ওঁর সংগে দেখা করতে এলেন হাসপাতালে সেদিন কী হুলুস্থুলু কাণ্ড।

মৌলবী আবু তালেব কেবলই বুক চাপড়ান আর বলতে থাকেন, হায় হায়, আমাগের ঘুড়া, গজ, নৌকো থাকল হাজতে, আমাগের মন্ত্রী থা'কল জখম হয়ে হাসপাতালে, তা'লি আর আমি অ্যাকা বড়ে কোন্‌ ভরসায় লড়ব? হায় আল্লাহ্‌!

হাসপাতালের রোগীরা মৌলবীর ঐ ধরনের হাবভাব দেখে হাসতে লেগেছিল। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অদ্ভুতভাবে সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর বললেন, আবু, তুমি মন খারাপ ক'রো না। আল্লার মনে যা আছে তাই হবে। আমরা আমাগের কাজটুকু করে যাবো। লড়ে যাবো।

আবু তালেব মৌলবী সাহেবের হাত দুটো ধরে বলেছিলেন, যাই ঘটুক, আপনি ঈমানের মান রাখবেন, উইড্র করবেন না।

মৌলবী উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, উরা এই কথা রটায়ে বেড়াচ্ছে। পাজী, বদমাইশ! রাস্কেল। ওগের টাকা আছে, ভাড়াটে লোকজন আছে। কিন্তু আমাগের আছে ঈমান। আল্লাহ্ যা চান আমরা তাঁর সেই হুকুমই তামিল করতি আগোয়ে আইছি। হারি বা জিতি, আমরা আমাগের পথের থে সরব না।

তারপর থেকে মৌলবী আবু তালেব বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কাজে। আবু তালেব হাসপাতালের বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে সব খবরই পান। অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ব্যবহারে। আবার নিজেই লজ্জিত হয়েছেন। দু হপ্তা আগেও তাঁর কোনও ভরসাই ছিল না। তারপর একদিন সাজ্জাদ খালেক বশির আর অন্য সবাই তাঁর কাছে এসে হাজির। সব জামিনে ছাড়া পেয়েছে। হাতে যেন চাঁদ পেলেন আবু তালেব। কাজ পেলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শে ওরা সব ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন দিকে। বশির গেল শৈলকুপায়।

বশির কেন এত গোঁয়ারের মত বলে বেড়াচ্ছে যে এটা দুর্ঘটনা নয়! আবু তালেব বশিরের একগুঁয়েমি দেখে অবাক হয়ে যান। ঐ গাড়িতে দাউদ আর গাজী গোলাম, শুধু যদি এই দুইজন থাকত, তবু না হয় অন্য কিছু ভাবা যেতো। কিন্তু গাড়িতে তো খান বাহাদুরও ছিলেন। এটা কেন বুঝতে চাইছে না বশির? গ্রামের ঘোড়া আচমকা ভড়কে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা বাধায় তা হলে খান বাহাদুর কী করবেন?

গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় নাক্ কুড় কুড় নাক্।

হঠাৎ আবু তালেবের কানে তাসা পার্টির বাজনা আবার বেশ স্পষ্ট হয়ে ঢুকতে লাগল। হাসপাতালের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে মিছিল। এদিকি শাদির মিছিল আসে ক্যান?

পাশের বেডে নিবারণ বাবুই। তাকে দেখতে এসেছে একজন। সেই বলল যে এটা খোন্কারের বাজনা। খোন্কার জিতিছে তাই তারে নিয়ে মিছিল বের হইছে।

আবু তালেবের কানে কথাটা যেতে তিনি থ মেরে গেলেন।

কুড় কুড় নাক্ কুড় কুড় নাক্ কুড় কুড় নাক্ কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় নাক্ গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা।

বশির আর খালেক এসে ঢুকল। তাদের দিকে আবু তালেব অপরাধীর মত চেয়ে রইলেন। যেন গোটা ব্যাপারটার জন্য তিনিই দায়ী।

খালেক মুখ কালো করে বলল, "এক হাজার বাহাত্তর ভোটে জিতিছে। ঝিনেদা আমাগের পথে বসায়ে ছাড়িছে। ঝিনেদায় আমরা অ্যাট্টা ভোটউ পাইনি। তেমনি আমাগের ওদিকি খোন্কার দাঁত ফুটোতি পারেনি।"

আবু তালেব জবাব দিলেন না। শূন্য দৃষ্টিতে ছাতের দিকে চেয়ে রইলেন।

"আস্সালামু আলায়কুম।"

মৌলবী আবু তালেব শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঢুকতেই খালেক আর বশির দুজনেই টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"ওয়া আলাইকুমুস্সালাম।"

মৌলবী সাহেবকে সালাম জানিয়ে ওরা সবাই বসতে অনুরোধ জানাল। তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন।

"আল্লাহ্র মনে যা ছিল, হইছে।" মৌলবী অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "আল্লাহ্র কাজই কত্তিছি, এই কথা মনে করেই আমি প্রজা পারটির তরফের থে ক্যানডিডেট হইছিলাম। আল্লাহ্ অ্যাক হাজার বাহাত্তর ভোটে আমাগেরে হারায়ে দেছেন। আল্লাহ্র মনে যা ছিল, হইছে। তুমরা যে আমার উপর শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখে গেছ, সেইডেই আমার পক্ষে সব চাইতি খুশির খবর।"

"আপনি যা করিছেন, তার জুড়া মিলা ভার।" খালেক আবেগ ভরে বলে উঠল।

গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়।

মৌলবী কি বলতে গেলেন কিন্তু বাজনার শব্দে মৌলবীর কথা ডুবে যেতে লাগল। হাসপাতালের খুব কাছে এসে গিয়েছে মিছিল। আবু তালেবের দুই পায়েই, প্লাস্টারের খোলার ভিতরে বেজায় সড়্ সড়্ করছে, আবু তালেবের খুব চুলকোতে ইচ্ছে করছে। তাঁর অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ করকর করছে। মাত্তর এক হাজার বাহাত্তর ভোট! হায় আল্লাহ্!

কুড় কুড় কুড় গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় গিজিতাঘ্ গি গিজতা গিজা গিজতা গিজা।

বশির রাগে ফেটে পড়ছিল। তার দাঁত কস্কস্ করছিল। আমাগের গিরামে যায়ে অ্যাকবার মিছিল বের করে দ্যাখ। সুমুন্দির বাজনারে যদি ক্যালায়ে না ফেলি তো কী কইছি। মনে মনে গরগর করতে লাগল বশির। শালা খুনে—

হঠাৎ বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। আর বশিরের চোখ গোল হয়ে উঠল এবং মুখের কথা মুখেই আটকে রইল। সে দেখল খোন্কার ঢুকছেন। আর তার পিছনে গাজী গোলাম, দাউদ আর ঝিনেদার সিনিয়ার উকিল কাজী আখতার হোসেন।

"আস্সালামু আলায়কুম, মৌলবী সাহেব!"

খান বাহাদুর সালাম জানালেন।

"ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম।"

মৌলবী সাহেব বললেন।

"অস্‌সালামু আলায়কুম, আবু তালেব মিঞা!"

"ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম!"

ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল আবু তালেব। লোকটাকে এই মুহূর্তে তিনি ঠিক সহ্য করতে পারছিলেন না। লোকটা চলে গেলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু খোনকার চলে যাবার কোনও লক্ষণই দেখালেন না। তিনি একটা টুল নিয়ে আবু তালেবের কাছেই বসে পড়লেন। তাঁকে দেখবার জন্য ঘরে ভিড় ভেঙে পড়ল। তিনি গাজী গোলামকে ভিড় সরিয়ে দিতে বললেন। গাজী গোলাম আর দাউদ ভিড় সরাতে লাগল। দাউদের মনে আজ সব চাইতে ফুর্তি। সব দিক থেকেই তার সুবিধা হয়েছে। খান বাহাদুর জিতেছেন তারই জোরে। মেন্দা একেবারে ডুবিয়ে ছেড়েছেন। ওদিকটায় ওরা এত খারাপ করবে, দাউদও ভাবেনি। ভালোই হয়েছে দাউদের পক্ষে। তার কদর বুঝতে পেরেছেন খোনকার। এবং সে কথা তিনি কবুলও করেছেন। যশোরে ফিরেই এবার সে শাদির তোড়জোড় শুরু করে দেবে। আল্লাহ্‌ তার সব গুনাহ্‌ মাফ করে দেছেন। সে শুধু তারই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে।

"কেমন আছেন, আবু তালেব মিঞা?"

খান বাহাদুর আবু তালেবের একখানা হাত টেনে নিলেন।

আবু তালেব কথাটার সরাসরি জবাব দিলেন না। তিক্তভাবে শুধু হাসলেন।

"তা'লি অজ্ঞাতপরিচয় লোকটারে চিনতি পারিছেন অ্যাখন?"

খোনকার একটু অপ্রস্তুত হলেন। হাসলেন।

"আপনি তো আমার হাতে দড়ি দিয়ার ব্যবস্থা করিছেলেন। নিচে নামে দেখি গাড়োয়ানটা মরে গেছে ঘুড়ার লাথি খায়ে। আর গাড়ির ভিতর আপনি! আমরা তো চমকে গেলাম। সর্বনাশের মাথায় বাড়ি!" আপনার অবস্থাও ভালো ঠেকল না। ইলেকশনের মিটিং ছিল। থা'কলো তা মাথায়। আপনারে আর গাড়োয়ানের লাশটারে নিয়ে ঝিনেদা থানায় আলাম। সেখেনে রিপোরটটা কোন মতে লিখোয়ে দিয়ে বড় দারোগারে তুলে নিয়ে সটান হাসপাতালে চলে আলাম। আপনারে ভর্তি করে দিয়া হল। ডাক্তার যখন কলেন, জানের ভয় নেই, তখন ধড়ে প্রাণ আ'লো। তারপর য হয়েছে, সব কলাম। খালি আপনারে চিনিনে, এইটুকু মিথ্যে কথা কতিই হল। আপনি আমার বিরুদ্ধ ক্যান্‌ডিডেটের খুঁটি। আমার গাড়ির হরন্‌ শুনে আর হেড লাইটির রোশনি দেখে আপনার গাড়ির ঘুড়া চমকায়ে গিয়ে গাড়ি খানায় ফেলিছে, এ কথাডা লোকে সরলভাবে যাতে ন্যায়, তার জন্যিই ইডা করতি হয়েছে। যাই হোক, আপনারে এই অবস্থায় ফেলে রাখার জন্যি আমার গাড়ি যে দায়ী সে কথা আমি ভুলতি পারিনি। কন্‌, কী করতি পারি?"

"আ'জ?" আবু তালেব একবার মৌলবীর আর একবার খোনকারের মুখের দিকে চাইলেন। তারপর অত্যন্ত তিক্তভাবে বললেন, "আ'জ আর কিছু করার নেই।"

খোনকার কথাটা বুঝলেন। মৌলবী সাহেবের দিকে ফিরে তাঁর চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আবেগভরে মৌলবী সাহেবের হাত দুখানা চেপে ধরলেন।

তারপর বললেন, "আছে, আছে। অনেক কিছু করার আছে। বাংলার মুসলমান অ্যাখন সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যি দিয়ে যাতিছে। অ্যাখন আর মুসলমানগের মধ্যি ভেদাভেদ করলি, হিন্দুগের লবজে যাগেরে খাজা আর প্রজা কয়, সেই তাগেরে তার অ্যাখন আলাদা আলাদা রাখলি চলবে না। বাংলার মুসলমান ধ্বংস হয়ে যাবে। অ্যাখন আমাগের কথা খাজা পারটি আর প্রজা পারটি, এই দুই পারটি ঝগড়া ভুলে অ্যাক হও। আমাগের খাজা নাজিমুদ্দিনির আছে লিডারশিপ্‌, আপনাগের প্রজার আছে শক্তি। তাই মুসলমান মুসলমানে শক্ত ঐক্য গড়ে তুলতি হবে। ইউনাইটেড্‌ উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড্‌ উই ফল্‌। কথাডা কি ভুল কলাম, মৌলবী সাহেব?"

মৌলবী সাহেব খোনকারের আবেগময় ভাষণে একটুও টললেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "ইডা তো ভা'বে দ্যাখার কথা। ইডা তো ভা'বে দ্যাখার কথা!"

আবু তালেব বলল, "ঐক্যের কথা শুনতি খুবই ভালো। আর ঐক্য চায় না কিডা? আমরাউ তো এই কথাই কয়ে আসতিছি। কিন্তু ওই সঙ্গে ঐক্যের ভিত্তি কী হবে, আমরা তার সুনির্দিষ্ট একটা প্রোগ্রামও রাখিছি।"

"সে প্রোগ্রাম আমি দেখিছি। চমৎকার প্রোগ্রাম।" খোনকার বললেন, "আমি ওই প্রোগ্রাম ইন্‌ টো টো নিয়ে কাউনসিলি যাব। এই আমি ওয়াদা করলাম। তবে আর ঝগড়া কাজিয়া ক্যান?"

মৌলবী আবু তালেব বললেন, "আপনি যদি আমাগের প্রোগ্রাম মানেই ন্যান, তয় আর ঝগড়া থাকবে ক্যান। খাজারা যদি প্রজাগের প্রোগ্রাম মানে ন্যান, তয় খাজা প্রজা অ্যাক হতি পারে। তা আপনি যদি এ ওয়াদা আরউ আগে দেতেন তয় আর অ্যাত পেরেশান আপনারউ হ'তো না আমাগেরউ না। আপসে আপনিই দাঁড়ায়ে যাতি পারতেন।"

বশির এতক্ষণ ফুঁসছিল। এই লোকটা আর তার চেলাচামুণ্ডাগের দেখে অবধি তার পিত্তি জ্বলে গিয়েছে। তার উপর এতক্ষণ ধরে প্যাঁচাল পাড়তিছে।

সে ফস্ করে বলে ফেলল, "হয়। তা'লি আর আমাগেরউ বারবার হাজত খাটতি হ'তো না, আর আবু ভাইর ঠ্যাং জুড়াউ আর সুমায় মত ভাঙার দরকার পড়ত না।"

খোনকারের মুখের উপর এমন কথা কেউ বলতে পারে, না শুনলে খোনকারের বিশ্বাস হত না। তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

খোনকার নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললেন, "যা হইছে তার জন্যি আমি দুঃখিত। আমি গাড়োয়ানের বিবির খেসারত দিছি। আবু তালেব মিঞা যদি খেসারত চান তবে তাও দেব। কিন্তু অ্যাকটা কথা বরাবরের মত ঠিক হয়ে যাওয়া ভালো।"

এবার খোনকার গলাটা তুলে বললেন, "দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তার উপর কারউ হাত থাকে না।"

বশির বলল, "আমরা কিন্তু অন্য কথা শুনিছি।"

"অন্য কথা আমরাউ শুনতিছি। সেই কারণেই এর অ্যাকটা ফয়সালা হয়ে যাওয়া দরকার।" খোনকার এবারও অত্যন্ত সংযত হয়ে কথা বললেন।

"বেশ, আমি আবু তালেব মিঞারেই সরাসরি জিজ্ঞেস করি আপনি কি ইডারে অ্যাক্-সিডেন্ট্ ছাড়া আর কিছু সন্দেহ করেন?"

"না, তা করিনে। আমি মনে করি উডা অ্যাক্সিডেন্ট্।" আবু তালেব শান্তভাবে জবাব দিলেন।

"আর বারবার দুবার, ঠিক ভোটের আগেভাগে, কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও আমাগের নিয়ে হাজতে পুরা, ইডারে কি কবেন?" চাপা রাগে কাঁপছে বশির। সে আবু তালেবের কথা পছন্দ করেনি।

খোনকার বশিরের কথাকে আমলই দিলেন না।

আবু তালেবকে বললেন, "আপনি খাঁটি মুছলমানের মত কথাডা কইছেন। বড় খুশি হলাম।"

"তয় বাকী কথাডাও শুনে ন্যান।" আবু তালেব শান্তভাবে হাসলেন। "বশিরগের এই অভিযোগ যে ঠিক, সিডা আমি বিশ্বাস করি। ওরা প্রজা পারটির কর্মী বলেই ওদের হ্যারাস্ করা হয়েছে। আর আপনি যে আমাগের প্রোগ্রাম মা'নে নেলেন, এই কথাডায় আমি পুরো সন্দেহ করি। কেননা, এই প্রোগ্রাম আপনারা কাজে লাগাতিই পারেন না। আপনি দু দিন আগেউ এই প্রোগ্রাম নিয়ি উচ্চবাচ্য কিছুই করেননি, আজ জিতে আসেই সেই প্রোগ্রাম লুফে নেচ্ছেন, এর কারণ কী? বড় ভয় ধবায়ে দেলেন খান বাহাদুর!"

খান বাহাদুর হেসে উঠলেন। সেই ঘরে উপস্থিত সকলেরই মনে হ'ল খোনকারের হাসিটা শিশুর মত সরল।

"আপনাগের হ'লো গে বাদুড়ির দশা। আলো জ্বললিই ঝটাপটি শুরু হয়। যাই হোক, ইডা হ'লো হাসপাতাল। এসব কথা আলোচনার ভালো জায়গা ইডা নয়। সিডা তো মানেন?"

আবু তালেবও হাসল। "তা মানি।"

"তা'লি আল্লাহ্‌র ইচ্ছেয় তাড়াতাড়ি সা'রে ওঠেন। তারপর আমার গরিবখানায় অ্যাকবার পায়ের ধুলো য্যানো দ্যান। তখন মনের সুখি কথা কওয়া যাবে। এই প্রশ্নের জবাব তখন দেবো। আজ উঠি।"

গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাক্ গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাক্ গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাক্—

হাসপাতাল থেকে মিছিলটা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আওয়াজটা একেবারে মিলিয়ে গেল। মৌলবী আবু তালেব, খালেক মুছল্লি, বশির, ওরাও চলে গেল। অত্যন্ত অবসন্ন লাগছে আবু তালেবের। তিনি চোখ বুজে পড়ে রইলেন বিছানায়। কিন্তু তাঁর কানের পর্দায় খোনকারের তাসার বিজয়ী আওয়াজ অনবরত বাজতে লাগল।

গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা—

শহরের সরু রাস্তা জুড়ে চলেছে খোনকারের বিজয়-মিছিল। থেকে থেকে জিগির উঠছে আল্লা হু আকবার!

গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা আল্লা হু আকবার কুড় কুড় কুড় গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা—

আগে আগে চলেছে হাতে পাকা লাঠি লেঠেলের দল আর ডান হাতে লিকলিক বেত বাঁ হাতে ঢাল ঢালীর দল।

আল্লা হু আকবার গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় মুসলিম লিগ গিজতা গিজা গিজতা গিজা জিন্দাবাদ গিজতা গিজা গিজতা গিজা—

মাঝখানে চলেছে খোনকারের মোটর ফুল দিয়ে সাজানো।

গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় নাক্ কুড় কুড় নাক্—
খোনকারের গাড়ি ক্রমশই ভরে উঠছে ফুলের তোড়ায়।
গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাক্ গিজিতাঘ্ গি কুড় কুড় নাক্—
মোড়ের মাথায় গাড়ি দাঁড়াচ্ছে কুড় কুড় কুড় আল্লা হু আকবার গিজিতাঘ্ গি শীতের বিকেল কুড় কুড় কুড় মুসলিম লি ই গ্ গিজিতাঘ্ গি কেউ কেউ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে গাড়ির ভিতর কুড় কুড় কুড় জি ন্ দা বা আদ গিজিতাঘ্ গি খোনকার সেই সব হাত ধরে ঝাঁকি দিচ্ছেন গিজতা গিজা গিজতা গিজা গাড়ির সামনের সীটে গাজী গোলাম পাশে দাউদ কুড় কুড় কুড় দাউদ স্বপ্ন দেখছে কুড় কুড় কুড় সইফুন সইফুন কুড় কুড় নাক্ আল্লা হু আ ক বা র গিজিতাঘ্ গি দারুণ একটা খুশি পেঁচিয়ে উঠছে দাউদের নিশ্চিন্ত দেলে গিজিতাঘ্ গি গিজিতাঘ্ গি মিছিলের মুখে লেঠেল উঠছে লাফ দিয়ে হে-ই শির বাঁচাও গিজতা গিজা গিজতা গিজা মুসলিম লি ই গ কুড় কুড় কুড় খবরদার ঢালী লাফিয়ে উঠছে হাঁক দিয়ে হাতে লিকলিক বেত কুড় কুড় কুড় জিন্দাবাদ গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা আল্লা হু আকবার কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়।

খেলার মাঠে প্রচুর ভিড় আর নিরবচ্ছিন্ন উল্লাসের ধ্বনি। কেবল আল্লা হু আকবার আর জিন্দাবাদ। মুসলিম লিগ জিন্দাবাদ। মিছিলটা ময়দানের জটলায় এসে মিশতেই মুহূর্তের মধ্যে উৎসাহী দর্শকরা এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলল। নেচেকুঁদে একে অন্যে অন্যের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তুমুল কলরব বাধিয়ে তুলল। হঠাৎ বোমের আওয়াজ শোনা গেল। খোনকার মঞ্চের কাছে হাজির হওয়ামাত্র অতি উৎসাহীরা তাঁর দিকে ছুটে গেল। কেউ মোসাফ করছে, কেউ বা আলিঙ্গন। গাজী গোলামের নির্দেশে ভলান্টিয়ার ছুটে এসে মারপিট ধাক্কাধাক্কি করে উন্মত্তপ্রায় সমর্থকদের কবল থেকে অতি কষ্টে নাস্তানাবুদ খোনকারকে উদ্ধার করে তাঁকে গোল করে ঘিরে রাখল। আরেক দল ভলান্টিয়ার গাজী গোলামের নির্দেশ মত সবাইকে গুঁতিয়ে, ধাক্কা মেরে মঞ্চের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিল। মঞ্চটার চারপাশ ফাঁকা হয়ে যেতেই মৌলবী দীন মোহাম্মদ দৌলতপুরী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বুলন্দ কণ্ঠে সকলকে সালাম জানালেন।

"আচ্ছালামু আলায়কুম!"

তখন সভায় রীতিমত গোলমাল চলছে। ভলান্টিয়ার বাহিনী "বসেন ভাইসকল, বসেন। বসে যান বসে যান!" বলে সেই ক্ষিপ্ত ভিড়কে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

"আচ্ছালামু আলায়কুম!" মৌলবী সাহেব আবার সালাম জানালেন।

"চোপ্ চোপ!"

"বসেন! বসে পড় না!"

"চোপ! চো ও প্!"

"আচ্ছালামু আলায়কুম!"

এতক্ষণে ভিড়টা সাড়া দিল, "ওয়ালেকুম্ ছালাম।"

"অল-হামদু লিল্লাহ! ভাই মুছলমান! আজ আমাগের আনন্দের দিন।" মৌলবীর ভরাট জোরালো আওয়াজ ভিড়ের মধ্যে গমগম করে বাজতে লাগল।

"আজ বাংলার মুছলমানের মুক্তির দিন। আজ আল্লাহ্র দরবারে শোকর গুজারি করার দিন। নারা এ তকবীর—"

"আল্লা হু আকবার!" ভিড় চিৎকার করে উঠল।

"হাঁ! আল্লা হু আকবার! ভাই মুসলমান! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শোকরিয়া। আসেন আজ আমরা প্রথমেই শোকরানা নামাজ পড়ি।"

নামাজ শেষ হলে মৌলবী মোনাজাতে বসলেন। তাঁর সঙ্গে মাঠভরতি আর সকলে।

মৌলবীর সঙ্গে সকলেই পড়তে লাগলেনঃ আল্লাহুম্মা আন্তাচ্ছালামু...ইয়া জাল্ জালালেওয়াল্ একরাম। হে প্রভু! তুমিই শান্তি এবং তোমা হইতেই শান্তি। আমাদিগকে বেহেশতে দাখেল করিও, হে প্রভু! তুমিই উচ্চ ও বরকতপূর্ণ। হে দয়াময়! তুমিই বুজুর্গ ও জ্ঞানী।

মৌলবী উঠলেন। সবাই তখন ঠিক হয়ে বসল।

মৌলবী বললেন, "ভাই সকল। এখন আপনাগেরে মোবারকবাদ জানাবেন মুছলিম লিগের বিজয়ী প্রার্থী আমাগের সকলেরই পেয়ারা দোস্ত, খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান।"

তালির চোটে কান প্রায় ফেটে যাবার দাখিল।

খোন্দকার উঠলেন। আবছা মাঠে একটা হ্যাজাগ বাতি এসে গেল তাঁর সামনের টেবিলে। আরও গোটা কতক হ্যাজাগ ভিড়ের মধ্যে মধ্যে টেবিলের উপর বসিয়ে দেওয়া হল। হিম পড়তে শুরু করেছে। মাঘের হাওয়া হানা মারছে। সবাই জড়সড় হয়ে বসল।

"আচ্ছালা-মু আলাইকুম!"

ভিড় উত্তর দিল, "ওয়ালেকুম ছালাম!"

"ভাই সকল!" মৌলবীর তুলনায় খোনকারের গলার স্বর অনেকটা ম্যাটম্যাটে। চেরা-চেরা।

'আপনারা আমার মত নগণ্য অ্যাক কওমের বান্দারে ভোট দিয়ে আপনাগেরে খেদমত করবার যে সুযোগ আমারে দেছেন, তার জন্যি আমি লিগ বোরডের পক্ষের থে আর আমার তরফের থে আপনাগের সবাইরি মোবারকবাদ দিতিছি।"

আবছা আবছা ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন নারা তুলল, "নারা এ তকবীর—"

সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভিড় গর্জন করে উঠল, "আল্লা হু আকবার।"

"মুছলিম লিগ বোর্ড্ জিন্দাবাদ!"...

"মুছলিম লিগ বোর্ড্ জিন্দাবাদ!"

"খান বাহাদুর খোন্দকার বজলুর রহমান—"

"জিন্দাবাদ!"

"ভাই মুসলমান! আপনারা সবাই জানেন, আজ ইসলাম কী আন্দাজ বিপন্ন। আমরা মসজেদে নামাজ পড়ব, সেখেনে কাফেরগের বাজনা বাজবে। আমাগের ইচ্ছেমত আমরা আল্লাহুর উদ্দেশে কোরবানি করব, না আমাগের তাউ করতি দিয়া হবে না। কোন্ পশু আমরা জবেহ্ করব, তা নাকি আমরা ঠিক করতি পারব না। তা ঠিক করে দেবে কাফেরবা। এই তো এখানকার মুছলমানগের অবস্থা। মুছলমানগের কাছে সব চাইতি বড় হল ধর্ম। সব চাইতি বড় হল ইছলাম। ইছলামের স্বার্থ। আমরা ইছলামের ঝান্ডা উঁচু রাখবার ইরাদা করেই আপনাগের কাছে ভোট চাতি আইছিলাম। ইছলামের ঝান্ডা উঁচু রাখবার জন্যিই ভোট আপনারা দেছেন।"

যতটা পারলেন খোন্দকার ততটাই নিজের চেরা গলাটাকে উঁচুতে তুলে দিলেন।

"ভাই মুছলমান! ভোট আপনারা দেছেন! রায় আপনারা দেছেন। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানি, আপনাগের ভোটের রায় তাঁর দিকিই পড়িছে। ভাইসব মুছলমানেরা, বাংলার মুছলমানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান মুছলিম লিগ, আপনাগের ভোট লিগ ক্যানডিডেট্‌রেই জিতোয়ে দেছে।"

"মুছলিম লিগ—"

"জিন্দাবাদ!"

"ভাই মুছলমান! আপনারা জানেন, বাংলার মুছলমানদের আর কোনও ভরসা নেই।"

"আল্লা হু আকবার!"

"ভাই মুছলমান! তেমনি আপনারা এও জানেন, লিগ ছাড়া মুছলমানগের আর কোনও দল নেই। থাকবে না। থাকা উচিত নয়। লিগ কমজোর হয়ে গেলি মুছলমানরাও কমজোর হয়ে পড়বে।"

ঘন ঘন হাততালি পড়ল।

"ভাই মুছলমান! লিগ যত শক্ত হবে, মুছলমানগের আখেরও ততই মজবুত হবে।"

"হিয়ার হিয়ার!"

"মারহাবা! মারহাবা!"

ঘন ঘন করতালি।

"ভাই মুছলমান, হুঁশিয়ার! মুছলমানগের মধ্যি ভেদ ঘটায়ে ইছলামের শক্তির কমজোর করার চক্রান্ত চলেছে।"

"শেম্ শেম্!"

"হিন্দুগের কাগজ, বর্মন স্ট্রিটের বাংলা আর বাগবাজারের ইংরাজী, এই দুখান কাগজ মুছলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তি যাতে মাথা তুলতি না পারে, তার চেষ্টা সমানে চালায়ে যাচ্ছে। বর্মন স্ট্রিটের ভেঁপু, কৃষক প্রজা পারটির মুখি চুমকুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। তার নাম তারা দেছে প্রজা পারটি। আর তারা লিগ বোরডের কী নাম দেছে জানেন?"

খোনকার থামলেন। সভার দিকে তাকালেন। মাঠে অন্ধকার নেমে এসেছে। কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে। ভিড়, লোক, মুখ সব আবছা হয়ে উঠছে।

"তারা লিগ বোরডরে কয় খাজা পারটি!"

খোনকারের উক্তি শুনে ভিড় "শেম্ শেম্" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

"ভাই মুছলমান!" খোনকার গলা চড়িয়ে দিলেন।

"আমিউ তাগের শুনোয়ে দিতি চাই, যদি তাঁরা ভাবে থাকেন, বাংলার মুছলমানেরে খাজা পারটি আর প্রজা পারটি, এই ভাবে ছাপ মারে তাঁরা ভাগ ক'রে দেবেন তারপর নিজিরা নিশ্চিন্তি নিয়ি পিঠে ভাগ করতি বসবেন, এই যদি ভাবে থাকেন তাঁরা, তবে তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করতিছেন। তাঁরা দিনির ব্যালা খোয়াব দেখতিছেন। এ খোয়াব ভাঙতি বেশী সুময় লাগবে না।"

"হিয়ার! হিয়ার!"

"আমি তাগেরে কতি চাই, মুছলমানরে ভাগ করা যাবে না। আমি তাগেরে কতি চাই, মুছলমান খাজা প্রজা এ ভেদ-রেখা মানে না।"

"মারহাবা! মারহাবা!"

"আমি উম্মেদ রাখি যে খাজা নেতা আর প্রজা নেতা, সব মুছলমান নেতাই এখন ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে যায়ে ইছলামের স্বার্থের কথাই বড় করে দ্যাখবেন এবং বৃহত্তর স্বার্থের কথা,

ইছলামের স্বার্থের কথা, মুছলমানের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে নিজেগের দলাদলি মিটোয়ে নেবেন। যে নেতা তা করবেন না, বাংলার মুছলমান, নবজাগ্রত মুছলমান, তাঁরে আস্তাকুঁড়ি ছুড়ে ফ্যালবে।"

করতালিতে মাঠ মুখর হয়ে উঠল।

"আর আমি কতি চাই তাগেরে, সেই সব ইছলামের দুশমনরি, দাঁত বার করে হাসার সুযোগ বাংলার মুছলমান আপনাগেরে দেবে না।"

হাততালি।

"বাংলার খাজা আর বাংলার প্রজা মিলে যাবে আর খাজা প্রজার মিলিত শক্তি আবার বাংলার রাজা হবে ইন্‌শাল্লাহ্‌।"

"আল্লা হু আকবার!"

"আর আমি এ কথাউ কয়ে দিতি চাই, হুঁশিয়ার, খবরদার, কেউ এতে বাধা দিতি আ'সো না, মুছলমানে-মুছলমানে মিলনের পথে, ভায়ে-ভায়ে মিলনের পথে, তা সে তুমি হিন্দুই হও আর মুছলমানই হও, বাধা দিতি আ'সো না। যদি বাধা দিয়ার চিন্টা করো—তা হলি—মুছলমানের জাগ্রত স্বার্থ—সে বাধা ফুঁয়ে উড়োয়ে দেবে ইন্‌শাল্লাহ।"

"আল্লা হু আকবার।"

গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা কুড় কুড় কুড় কুড় কুড়। নাক্‌ কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় নাক্‌—

সভা থেকে আবার মিছিল বের হল।

গিজতা গিজা গিজতা গিজা গিজতা গিজা—

মাঠ খালি হয়ে গেল। এক কোনায় দাঁড়িয়ে মৌলবী আবু তালেব, খালেক মুছল্লি আর বশির খোনকারের বক্তৃতা শুনছিল। বশির রাগে কস্‌কস করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল খোনকারের মুখে মারে দুই চড়। ব্যাটা জালেম! কিন্তু তার আগেই বশিরের চোখ বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠল।

মৌলবী আবু তালেব বিড়বিড় করে বকতে বকতে বাঁ হাতে নিজের কান চেপে ধরলেন আর ডান হাত দিয়ে সমানে নিজের গালে চড় মারতে লাগলেন।

খালেক মুছল্লি বলে উঠল, "মৌলবী ছাব্‌, করেন কী, করেন কী?"

মৌলবী আবু তালেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "মুছলমানের চেতনা জাগাতি গিছিলাম! প্রোগ্রাম নিয়ি ভোট চাতি গিছিলাম! কইছিলাম, আমাগের ভোট দ্যাও, আমরা বিনা সেসে প্রাথমিক শিক্ষা দেবো। তা শালারা শোনবে ক্যান? কইছিলাম, আমাগের ভোট দ্যাও, প্রজাস্বত্ব আইনির জুলুমির হাত থেকে যাতি বাঁচাতি পারো, আইনডা আমরা সেই দিকি চোখ রাখে সংশোধন করব। সুম্মুন্দিগের কানে সে কথা ঢোকবে ক্যান? কইছিলাম আমাগের ভোট দ্যাও, তুমরা যাতে মহাজনের সুদির হাতের থে রেহাই পাও, আমরা সেই রকম আইন পাস করব। এ সব কথা কি মুছলমানরা বোঝে? গুখুরি করিছি! গুখুরি করিছি!"

মৌলবী খালেকের চোখের দিকে চাইলেন। খালেক দেখল সে চোখ অস্বাভাবিক রকম জ্বলছে।

"বাংলার মুছলমানের সমস্যা শুধু দুটো। এক, মছজেদের সামনে বাজনা, আর দুই, খোলা মাঠে গোরু জবেহ্‌। ব্যাস্‌! তার আর কোনও সমস্যাউ নেই। দাবিউ নেই। সব সুম্মুন্দিই দুধে ভাতে আছে। ভাই মুছলমান," মৌলবী ভ্যাঙাতে শুরু করলেন খোনকারকে, "ইছলামের স্বার্থ মানেই মছজেদের সামনে বাজনা বন্ধ। আর কোরবানির ঢালাও অধিকার। আমি তুমারে তাই দেব, তুমি আমারে ভোট দ্যাও। এই কথা কলি আমরা ভোট পাতাম। গুখুরি করিছি। গুখুরি করিছি।"

বশির মনে মনে বলল, ঠিক, ঠিক কথা কতিছে মৌলবী।

খালেক ভাবল, হায় আল্লাহ্‌, মৌলবীর মাথাডা কি খারাপ হয়ে গ্যালো?

॥ ১২ ॥

ফি বছরের মত খোনকারের মনজিলে এবারও ঈদের পারটিটা বেশ জমিয়ে বসেছে। অন্যবারের চাইতেও এবারের জাঁক কিছুটা বেশী। এবার খানবাহাদুর ভোটে জিতেছেন। কলকাতা থেকে সানাইঅলা আনা হয়েছে। নহবৎ বসেছে। জেনানা মহলের জন্য ম্যাজিকঅলাও এসেছে। তাই দাউদ মৌলবী জয়নুদ্দিন আর সইফুনকেও নিয়ে এসেছে। খোনকারের আদরের মেয়ে বেগম সাকিনারই আমন্ত্রণে। সাকিনা সইফুনের হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। যাবার সময় দাউদকে বলল, ইউছুফ তোমার মাল এখন আমার জিম্মায় থাকল। সাকিনা বরাবর ওকে ইউছুফ বলেই ডেকে আসছে। তুমি এখন মেহমানদের খবরদারি কর। তা খুব খাটল দাউদ। আর দুদিন বাদেই শাদি। খান বাহাদুরের বাড়ি, খান বাহাদুরের দলের, সবাই দাউদকেই আপন করে নিয়েছে।

কেবল মতি মিঞা নারাজ। সে-ই কেবল দাউদকে এড়িয়ে চলে। খান বাহাদুরের বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় নানা রঙের আলোর রোশনাই, সানাই-এর মিঠে সুর দাউদের দেলে এক রিমঝিম মায়াবী স্বপ্ন যেন বুনে দিচ্ছিল। আর দুটো দিন! দুটো দিন! নিজের মনকে ধৈর্য ধরতে বলল দাউদ। তারপর লেগে পড়ল খান বাহাদুরের মেহমানদের খেদমতে।

খান বাহাদুরের জুনিয়ার বরদাকান্ত ধুতি শার্ট আর তার উপরে গরম কোট পরে, গলায় মাফলার জড়িয়ে খোশমেজাজে গল্প জুড়ে দিয়েছেন তাঁর বারের সতীর্থদের সঙ্গে।

খালেকুজ্জমান বললেন, "এই ইলেক্শনের ভার্ডিক্ট খুব ক্লিয়ার। মুসলমান মেম্বারই মেজরিটি হয়েছে। অতএব তাগেরই মিনিস্ট্রি ফর্ম্ করতি ডাকা উচিত।"

বাড়োরি বললেন, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। কী বলেন?"

"তার মানে?" খালেকুজ্জমান বাড়োরির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

দিগম্বর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ খালেক, এই যে তুমরা কোর্মা রাঁধো, তা হাড়গুলোরে মাংসর থে বা'ছে ফেলে দিতি পারো না? তুমাগের বুড়োরা ঐ হাড় চিবোয়ে খাতি পারে?"

"দিগম্বরদার খালি খাওয়ার চিন্তা।" বরদাকান্ত এক পায়ের উপর অন্য পাটা তুলে সেটা নিশ্চিন্ত মনে নাচাতে লাগলেন।

"সিনিয়রের বদনাম ক'র না বরদা।" দিগম্বর বললেন, "কাম্ টু দি পয়েন্ট। কোর্মা সম্পর্কে যে পয়েন্ট্ রেজ্ করিছি, আগে কও সেটা রিলেভেন্ট কিনা?"

"আপনি যে প্রতি বছর খান বাহাদুরির বাড়িতি আসে পোলাও কোর্মা সাঁটায়ে যান তা ভাবী আপনারে একঘরে করেন নি?" শুকুর মিঞা ফোড়ন কাটলেন। উনি দেওয়ানী কোর্টের উকিল।

"শুকুর তুমি মুসলমান, তাই তুমি আমাগের হোলি মাদার গঙ্গার পাওয়ার জানো না," দিগম্বর বললেন। "তুমার বউদির কাছে গঙ্গাজলের অফুরন্ত স্টক আছে। একেবারে নদে শান্তিপুরির থে আনা। স্বামীরি শুদ্ধু করে নিতি এক সেকেন্ডও তাঁর লাগে না।"

"খালেক মিঞা, তাহলে শুনুন," বাড়োরি বললেন, "আমি বললাম, মুসলমান মেম্বার মেজরিটি, আর গভর্নর আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে ডেকে এনে গদিতে বসিয়ে দিলেন, ইট্ ইজ্ নট্ সো ইজি।"

খালেকুজ্জমান কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্বরে বললেন, "রেজাল্ট্টা দেখে কথা কন্। আমি কলাম মুসলমানরা মেজরিটি আর আপনি তা মা'নে নেবেন, আমি অ্যামন কথা কবই বা ক্যান্। লুক্ অ্যাট্ দা রেজাল্ট্স্। আইন পরিষদে টোটাল মেমবার হচ্ছেন আড়াই শ'। তার মধ্যি মুসলমানরা পাইছেন অ্যাকশ বাইশ, বর্ণ হিন্দু চৌষট্টি, তপশিলী হিন্দু পঁয়ত্রিশ, ইওরোপীয়ান পঁচিশ আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান চার। আনন্দবাজারে পুরো রেজাল্ট ছা'পে দেছে, পড়ে দ্যাখবেন।"

বাড়োরি বললেন, "সো হোয়াট?"

বরদাকান্ত বললেন, "দিগম্বরদার সাহস আছে। খান বাহাদুর বলেন, এ বাড়িতে উনিই প্রথম হিন্দু, যিনি খানা খেয়েছেন।"

"সো হোয়াট্!" খালেকুজ্জমান তেতে উঠলেন, "মুসলমান্স্ আর হান্ড্রেড অ্যানড টোয়েনটি টু। অ্যানড দে আর দা মেজরিটি।"

"সে অ্যাক দস্তুরমত ইতিহাস।" দিগম্বর বললেন।

হঠাৎ খান বাহাদুর এসে পড়তেই সব আলোচনা থেমে গেল।

খান বাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, "ওয়েল্ দিগম্বরবাবু, বাড়োরি, বরদা সব কোই মৌজ মে হ্যায় তো? খালেক, শুকুর ইউ আর অল রাইট্?"

"বিলক্ষণ বিলক্ষণ!" দিগম্বর উৎসাহভরে বলে উঠলেন। "সব ঠিক আছে। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আপনার বাড়ি প্রথম খানা খাওয়ার ইতিহাস ওগেরে শুনোচ্ছিলাম।"

খান বাহাদুর হা হা করে হেসে উঠলেন।

"দ্যাট্স্ হিস্টোরি অল রাইট।" খান বাহাদুর একটুখানি থেমে তারপর বললেন, "বাট্ দ্যাট্ ইজ্ হিজ্ স্টোরি।" এবং সঙ্গে সঙ্গে খান বাহাদুর দিগম্বরবাবুর বুকে আঙুলের এক খোঁচা দিলেন।

খান বাহাদুরের বলার ধরনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

খান বাহাদুর বললেন, "দিগম্বর ইজ্ অ্যান ইন্কারিজিবল্ রিফরমড হিনডু।"

বাড়োরি ফোঁড়ন কাটল, "হ্যাঁ, খালি পোলাও কোর্মা খাওয়ার ব্যাপারেই।"

"মিথ্যে কথা!" দিগম্বর বললেন। "সিবার ভালো বিরিয়ানী হইছিল।"

আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

এই কোণ থেকে এত হাসির গররা উঠছে দেখে একে একে কয়েকজন এসে জমে গেলেন। তার মধ্যে জেলার সব থেকে সিনিয়ার এবং সম্মানিত উকিল রায়বাহাদুর ভুবনমোহন বাঁড়ুজ্জে এবং খোন্কারের বন্ধু এবং সমবয়েসী সমশের আলি চৌধুরীও ছিলেন।

সমশের আলি এতক্ষণ এই সব হালকা রসিকতা খুব উপভোগ করছিলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, "খান বাহাদুর, কলকাতার থে তো ঘুরে আ'লে। মিনিস্ট্রি মেকিং-এর কী খবর, কও

দিনি শুনি ?"

খান বাহাদুর বললেন, "আওয়ার চান্সেস আর্ ব্রাইট্। দিস্ মাচ্ আই ক্যান্ সে।"

রায় বাহাদুর বললেন, "প্রভাইডেড্ ইউ ক্যান্ ব্যাগ্ ফজলুল হক। আমি হক সাহেবকে চিনি। হি ইজ্ অ্যাজ্ স্লিপারি অ্যাজ্ ইল্। একেবারে পাঁকাল মাছ। বুঝলে হে বজলুর, পাঁকাল মাছ।"

"পাঁকাল না, পাঁকাল না, রায়বাহাদুর!" সমশের আলি বললেন, "ফজলুল হক হলেন বহুরূপী।"

"দ্যাট্ উই নো ভেরি ওয়েল্।" খান বাহাদুর নিশ্চিন্ত মনে বললেন। "বাট্ হোয়াট্ হি উইল্ ডু? উই আর মোর্ দ্যান্ সিক্স্টি। সে অলমোস্ট সেভেন্টি। অ্যান্ড্ দে আর নট্ ইভেন্ ফিফ্টি—"

সমশের আলি বাধা দিয়ে বললেন, "ওরা দাবি করছে ওরা আটান্ন আর তোমরা ষাট।"

খান বাহাদুর বললেন, "লেট্ দেম্ ডু হোয়াট্ দে লাইক টু ডু, বাট্ দ্যাট্ উইল নট্ চেন্জ্ দা ফ্যাক্ট্।"

সমশের আলি বললেন, "দি হাউস্ ইজ্ ডিভাইডেড্। এইটেই হ'ল ফ্যাক্ট্। তোমরা যদি সত্তরও হও, কী করে মিনিস্ট্রি গড়বে ? ভুলে যেও না কংগ্রেস ৬৪ এবং সিডিউল্ড্ কাস্টের সংখ্যা ৩৫। এ ছাড়া ইন্ডিপেনডেন্ট্ হিন্দু, মুসলিম এবং তফসিলী একটা বড় ফ্যাক্টার। নয় কি ?"

"ইয়েস্ ইয়েস্, উই নো।" খান বাহাদুর বললেন। "উই নো ইট্ ইজ্ নট্ ইজি।"

"হকের পক্ষেও সহজ নয়।" রায় বাহাদুর বললেন, "হাউসের যা অবস্থা কোয়ালিশন ছাড়া মিনিস্ট্রি করা সম্ভব নয়। লিগের একটা সুবিধে এই যে, গভর্নর্ অ্যানডারসনের তারা কন্-ফিডেন্সের লোক। এবং তারা ইওরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্দের পুরো সাপোর্ট্ পাবে।"

"তাহলিউ তো হয় না রায়বাহাদুর!" সমশের আলি বললেন, "লিগ ধরেন সত্তরই। ২৫ ইওরোপীয়ান। হ'ল পচানব্বুই। চার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্। নিরানব্বুই। ধরেন একশই হ'ল। এখনও অ্যাট্লিস্ট্ ছাব্বিশটে চাই। ইন্ডিপেন্ডেন্ট্ মুসলমান পাঁচটারেই পাক। দশটাই পাক। নাঃ হয় না।"

"কোয়ালিশন কোয়ালিশন।" রায় বাহাদুর বললেন। "আমার হিসেব হয়েই আছে। হয় থোড় বড়ি খাড়া আর নাহয় খাড়া বড়ি থোড়। হয় কংগ্রেস প্রজা, নয় কংগ্রেস লিগ, আর না হয় আনন্দবাজারের ভাষায় খাজা প্রজা কোয়ালিশন।"

সমশের আলি বললেন, "কংগ্রেস প্রজা কোয়ালিশন মানে লিগের শবাধারে শেষ পেরেকটা ঠুকে দেওয়া।"

"ডোন্ট্ ওরি, দ্যাট্ উইল্ নেভার হ্যাপেন্।" খান বাহাদুর শান্তভাবে বললেন। "কংগ্রেস হককে হজম করতে পারবে না। ইউ উইল সি, হকেরে কংগ্রেসই আমাদের কোলে ঠেলে দেবে।"

"তুমি বড় ওভার কন্ফিডেন্ট্ খান বাহাদুর।" সমশের আলি হাসলেন। বললেন, "আমি কংগ্রেস হলি লিগিরি মুছে ফেলার এই চমৎকার সুযোগটা কিছুতেই নষ্ট করতাম না। ফজলুল হকরে ব্ল্যাংক চেক লিখে দিতাম। হক প্রধানমন্ত্রী হতি চায়। তারে তাই করে দিতাম। হক তাতেই তুষ্টু হত। হক পাওয়ারে আর মুসলিম লিগ অপজিশনে। মুসলমানদের বিভেদ ক্রমশই বা'ড়ে যা'তো। প্রজা পারটি আর কংগ্রেসের দুমুখী আক্রমণ বাংলার লিগির নাভিশ্বাস উঠোয়ে দিত। তুমি যদি ভা'বে থা'কো কংগ্রেস এই অপারচুনিটি মিস্ করবে তো খুব ভুল করবা। রায় বাহাদুর আপনি কী কন?"

"এখন কংগ্রেসের সামনে এই একটা পথই খোলা," রায় বাহাদুর বললেন। "হককে দিয়ে লিগের প্রভাব খর্ব করা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কংগ্রেস এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে কিনা জানিনে। বাংলার কংগ্রেসে পলিটিশিয়ানের সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগই তো ভন্ডুল মাস্টার।"

"রায় বাহাদুর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতি পারেন," খান বাহাদুর বললেন, "এ কাজ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন তা বলি। এই ইলেক্শনের রেজাল্ট্ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে কংগ্রেস স্রেফ হিন্দুর পারটি। ডঃ আর আমেদ হা'রে গেছেন। হুমায়ুন কবির হা'রে গেছেন! ব্যাপারটা কনে গিয়ে ঠেকিছে বুঝতি পারতিছেন!" খান বাহাদুর এবার কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। তাই ইংরাজী ছেড়ে সরাসরি মাতৃভাষা ধরেছেন। "কংগ্রেস এখন মুসলমানের চোখি সাস্পেক্ট্। মুসলমানরা ইবার তাগের মন তৈরি করে ফেলেছে। তারা মিলিট্যান্ট্ ন্যাশনালিজ্ম চায়। অতএব কংগ্রেসের সঙ্গে যে পারটিই কোয়ালিশন করবে মুসলমানের কন্ফিডেন্স্ সে অবধারিত হারাবে। হক খুব চতুর নেতা। তিনি এটা জানেন। আপনাগেরে তাই আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে ফজলুল মিঞা আর যাই করেন না কেন, রাজনৈতিক আত্মহত্যা করার পাত্তর তিনি নন।"

গাজী গোলাম এসে "হাকিম সাহেব আ'সে গেছেন" বলে এত্তেলা দিতেই খান বাহাদুর,

রায় বাহাদুর এবং তাঁদের পিছনে উকিলদের গোটা দলটাই শশব্যস্তে হাকিম সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

মেয়েদের মহলে এবার ম্যাজিক শো দেখানো হবে। হাকিম গিন্নীর অপেক্ষায় ছিল সবাই। হাকিম সাহেব সস্ত্রীক এসে পোঁছাতেই খান বাহাদুর দাউদকে বললেন, হাকিম গিন্নীকে অন্দরে পোঁছে দিতে। অন্যান্যবার এই কাজটা মতি মিঞা করত। হাকিম গিন্নীকে সাকিনা বেগমের হাতে জিম্মা করে দিয়ে আসতে না আসতেই গাজী গোলাম দাউদকে ডাকল।

বলল, "মতি মিঞা খুব চোট খাইছে, বুঝিছেন। তবিয়ৎ ভালো নেই কয়ে ঘরে ঢুকে গেছে। ব্যাপারডা বুঝিছেন তো?"

দাউদ বলল, "না।"

"ব্যাপারডা কিছুই বোঝলেন না!" গাজী গোলাম বলল। "অথচ অ্যাত বড় অ্যাকটা ব্যাপার ঘটে গেল। আপনার হুঁশ থাকে কনে?"

"খান বাহাদুর হাকিমির বিবির ইবার আপনারে দিয়ে অন্দরে পাঠাইছেন। বলি সিডা খিয়াল করিছেন তো, না কি?"

দাউদ গাজী গোলামের ব্যাপার দেখে হেসে ফেলল।

বলল, "জে। সিডা খিয়াল করিছি।"

গাজী গোলাম বলল, "এই কাজডা বরাবর তাঁর ভাতিজা মতি মিঞা করিছে। আর ইবার করলেন আপনি। তার মানে খান বাহাদুর আপনাবে বেশ নেক নজরে রাখিছেন।"

গাজী গোলাম একটু থামল। কথাটা শুনে খুব খুশি হ'ল দাউদ।

গাজী গোলাম বলল, "ভালো কথা ভাই। কতি ভুলেই গিছিলাম।"

দাউদের মনে হ'ল, গাজী গোলামও তাকে খাতির করছে। তার ভিতর থেকে ফুর্তি উপচিয়ে পড়তে চাচ্ছিল।

"আপনার বাড়িতি আপনার বাঁদী তাহেররে দিয়ে পাঠায়ে দিছি। লোক ভালো। কাজেরউ। আমার বুনির বাড়ি কাজ করিছে। ছোট একটা ছাওয়াল আছে। তা ভালোই, ভাগবে টাগবে না। আমার বুনই ওরে পাবনার থে আনিছিল। মিজাজ ভালো। বিশ্বাসী।"

দাউদ খুব খুশি হ'ল। সইফুন নিশ্চয়ই খুশি হবে। সইফুনকে সে কুটোটি ভাঙতে দেবে না। খোনকারের বাড়িতে বিবি বেগমরা যে রকম থাকে তা সইফুনকে দাউদ সেই রকম রেখে দেবে। সইফুন যা চাইবে তাই তাকে এনে দেবে দাউদ। সইফুনের জন্য সে টাকা রোজগার করবে। পি ডবলিউ ডির একটা বড় কাজ দাউদ পেয়েছে। এই মাত্রই ক'দিন আগে। সইফুন খুব পয়মন্ত মেয়ে। তা ছাড়া, খোনকার ইলেক্‌শানে জিতে যাওয়ায় তার খুব সুবিধে হবে। সে ইঁটের ভাঁটা শুরু করে দিয়েছে। মনে মনে আঁচ করে রেখেছে যশোরে একটা সিনেমা হলও বানাবে। সইফুন মহল। সে স্টেশনের দিকে একটা জমি দেখে রেখেছে। শাদির পরই সইফুনের নামে বায়না করে ফেলবে। খোন্‌কারের বাড়ির লনে মায়াবী আলোব ভিতর দিয়ে বারবার যাতায়াত করছিল দাউদ। আর নানা রকম মতলব আঁটছিল।

মেহমানরা তখন খেতে বসেছেন। গাজী গোলাম আর দাউদ তদারক করছে। মেয়ে মহলে খাওয়া শুরু হতে তখনও দেরি আছে। ম্যাজিক শো হচ্ছে তখন। সাকিনা খবর পাঠিয়েছে ম্যাজিক শো শেষ হলে দাউদ যেন তার সঙ্গে দেখা করে। তাই দাউদ মেহমানদের দেখাশুনা করতে করতে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল।

ম্যাজিক দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছে সইফুন। এত কাছ থেকে সে আর কখনও ম্যাজিক দেখেনি। বারবার সে খেলা দেখে বোকা বনে গিয়েছে। এবং অভিভূত। আর তার ভালো লেগেছে সাকিনা বুবুকে। এমন মানুষ যে থাকতে পারে দুনিয়ায় সইফুনের ধারণা ছিল না। সে এখানে আসা ইস্তক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে সাকিনা বেগম সারা বাড়িটা ঘুরেছে। একটুও কাছছাড়া করেনি। ওর বোনেদের সঙ্গে ভাবীদের সঙ্গে আম্মা চাচী খালা ফুফু সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তারপর ম্যাজিক দেখা হয়ে গেলে নিজের ঘরে এনে বসিয়েছে। শুধু কি তাই, বাক্স খুলে একটা আড়াই পেঁচি মপচেন ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ঈদের সওগাত। ম্যাজিক! ম্যাজিক!

ম্যাজিক শো শেষ হয়ে যাবার পর সাকিনা বেগম দাউদকে ডাকার জন্য বাড়ির ছোকরা এক চাকরকে পাঠিয়ে দিল। সে আবার এমনই বেআকুব যে গাজী গোলামের সামনেই ওকে বলল, "দাউদ মিঞা অন্দরে আপনার ডাক পড়িছে, চলেন তাড়াতাড়ি।"

গাজী গোলাম ওকে চোখ মারল। ভাবখানা এই, ক্যামন কইছিলাম না? অনেক দূর যাবেন মিঞা, অনেক দূর।

দাউদ একটু অপ্রস্তুত হল। সে গাজী গোলামের মুখের দিকে চেয়ে লাজুকভাবে হাসল।

গাজী বলল, "যান মিঞা যান। আমি এদিকটা দেখতিছি।"

ছোকরাটা ওকে নিয়ে একেবারে সাকিনা বেগমের ঘরে নিয়ে গেল। দরজার পাল্লা ভেজান ছিল। দাউদ দাঁড়িয়ে গেল। সত্যি বলতে কি দাউদের এখন অস্বস্তি হচ্ছে। তার উন্নতির মূলে এই সাকিনা! দাউদ অনেক প্রলোভন দমন করেছে, করতে পেরেছে বলেই না সে আজ যা তাই

হতে পেরেছে। আল্লাহ্‌ই তাকে পথ বাতলায়ে দেছেন। আর কোনও ভুল সে করেনি।

ছোকরাটা দরজায় ঘা দিতেই সাকিনা বেরিয়ে এল। দাউদকে দেখে হাসল।

বলল, "ইউছুফ, দি লাকি ডগ! আ'সো ভিতরে আ'সো।"

দাউদ ইতস্তত করছে দেখে সাকিনা হাসল।

বলল, "ভিতরে লোক বসায়ে রাখিছি তুমার জন্যি। আ'সো।"

এই কথায় দাউদের দেল তোলপাড় করতে লাগল। সে সাকিনার পিছনে ঘরে ঢুকল এবং হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিল তাই। সইফুন। সইফুনও ওকে দেখে জড়সড় হয়ে সরে বসল। আর দাউদ সেই শীতেও ঘেমে উঠল। এবং ওদের এই অবস্থা দেখে সাকিনা খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপর বলল, "ইউছুফরি জোলেখার কাছে পৌঁছয়ে দিলাম। শুনলাম দুজনের মধ্যি ভাবসাব কিছুই হয়নি। ইডা ঠিক না।"

খুব হাসছে সাকিনা। ওদের অবস্থা দেখে সে আর হাসি সামলাতে পারছে না।

সাকিনা হঠাৎ একটা ফার্‌শী বয়েৎ পড়ে দিল।

"আকস্‌ কে মরা বকোশ্‌ত বায্‌ আদম্‌ পেশ্‌।
মা নাকে দেলাশ্‌ বসোক্‌ত্‌ বর্‌সাশ্‌ তায়েখেশা॥"

সাকিনা হাসতে লাগল। সইফুন বাপের কাছে ফার্‌শী পড়েছে। শেখ সাদী তার অপরিচিত নয়। তার মাথাটা আরও ঝুঁকে এল লজ্জায়। সাকিনা খুব মজা পেয়েছে। খুব হাসছে সে।

দাউদ এতক্ষণে খানিকটে সামলে নিল।

বলল, "ছোট ব্যালায় চাচা অনেক চিষ্টা করেউ ল্যাখাপড়া শিখোতি পারেনি। অ্যাখন আপনি যদি আমার সামনে দাঁড়ায়ে সুমানে কশ্‌ত্‌ গশ্‌ত্‌ চালায়ে যান আর অ্যাকজন মুচকি মুচকি হাসতি থাকেন, তয় আমি বিচার করি কী? হাসির কথা কি না তাউ তো বুঝতিছি নে যে হা'সে ওঠবো।"

দাউদের কথা শুনে সাকিনা জোরে হেসে উঠল, এমন কি সইফুনও হাসি চাপতে পারল না। সে ফিক করে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"ভালো রে ভালো।" দাউদ একটু রাগ দেখাতে চাইল। "আমারে নিয়ে দুজনে তো ভারি রগড় পাইছেন। হয় মানেটা কয়ে দ্যান, নয় আমি এই চললাম।"

"ইঃ, চললাম! ভারি আমার চলনেওয়ালা আলেন। যাও দেখি!" সাকিনা ঘাড় বেঁকিয়ে বলল। "অ্যামন অ্যাকটা সুযোগ করে দিলাম, কুথায় তার জন্যি আমার গুলাম হয়ে থাকবা, না উলটে আমার উপরেই চোটপাট!"

"তা কথাডার মানেডা কবেন তো?" এবার দাউদের সুর নরম হ'ল।

"তা আমারে ক্যান্‌?" সাকিনা হাসতে হাসতে বলল। "মৌলবীর বাঁটর গোঁফ দেখে মনে হচ্ছে মানেটা ও জানে। ও তো তুমার আপনার লোক। ওরেই জিজ্ঞেস কর না?"

সইফুন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নিচু স্বরে বলে উঠল, "আমি কিছু জানিনে। আমি জানিনে।"

"তয় তো মামলা মিটেই গেল।" দাউদ সইফুনের রকম দেখে হেসে ফেলল। "ইবার আপনি কন্‌?"

"তয় আপনারা শোনেন।" সাকিনা দাউদের বলার ঝোঁকটা নকল করল। "মানেডা দাঁড়াবে এই রকম। যে আমারে দ্যাখা দিয়ে মারিছে সেই লোকটা আবার আমার সামনে আ'সে দাঁড়ায়েছে। তার প্রেমাগুনে আমি পুড়ে মরিছি, তাই মুখ দিয়ে বাক্যি সরতিছে না। ন্যাও হ'লো তো? মনের কথাডা আমি টানে বের ক'রে দিলাম। তবে মনের কথাডা যে কার, সিডা তুমরা আপোসে ঠিক করে ন্যাও। আমি আপাতত বিদেয় হচ্ছি।"

খুব হাসছিল সাকিনা। ওর কথা শুনে দাউদও এবার হাসল এবং সইফুনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

"কথাবার্তা তাড়াতাড়ি সারবা কিন্তু," সাকিনা হাসছে। "খাওয়ার জায়গা হলিই ডাক পড়বে। তখন আর দেরি করা চলবে না। তা'লি সব জানাজানি হয়ে যাবে।"

সাকিনা হাসছে।

"ইউছুফ আর জোলেখা। দুজনে মানাবে ভালো।"

সাকিনা হাসছে।

সাকিনা বলল, "ইউছুফ! খুশি তো?"

দাউদ তখন সইফুনকে দেখছিল। সে মুখ ফেরালো না। মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

সাকিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর একটা উরদু শের্‌ আবৃত্তি করল।

"না মোড়্‌ কর্‌ বে-দরদ্‌ কাতিল্‌ নে দেখা"

খুব হালকা চালে শুরু করেছিল সাকিনা। কিন্তু প্রথম চরণটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আর ওর গলাটাও বেশ ভারি হয়ে গেল।

"না মোড়্‌ কর্‌ বে-দরদ্‌ কাতিল্‌ নে দেখা।"

সাকিনার দৃষ্টি উদাস হয়ে এল। এবং সজল।

সাকিনা হাসছে।

"না মোড় কর্ বে-দরদ্ কাতিল্ নে দেখা
তড়প্‌তী রহী নীম্‌জান্ ক্যায়সে ক্যায়সে।"

সাকিনা হাসছে।

"ইউছুফ", সাকিনা বলল, "এর মানেটাও বড় মজার। আমি যখন কলেজে পড়ি, এর অ্যাকটা কাঁচা তরজমাও করিছিলাম।"

সাকিনা হাসতে হাসতে সেটাও আবৃত্তি করল।

"আততায়ী একবার দেখিল না ফিরে,
আধমরা কী ভাবে যে ধড়ফড় করে।"

সাকিনা হাসতে লাগল।

বলল, "বাংলা তরজমাটা শুনলি কি একথা মনে হয় না যে, উর্দু শেরটারে বিস্‌মিল্লাহ্ ব'লে কেউ এই সদ্য আড়াই পোঁচ্ দিয়ে জবেহ্ করিছে, আর সিডা মাটিতি পড়ে ধড়ফড় ধড়ফড় কত্তিছে। তা'লি বুঝে দ্যাখ ইউসুফ্, কসাইর হাতের কী গুণ!"

হাসতে হাসতে সাকিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস সে চাপল। তারপর চলে গেল ওদের ডাইনিং হলে। মেয়েদের খাবার ব্যবস্থা সেইখানেই হয়েছে।

দাউদ সইফুনকে শুনিয়ে বলল, "সাকিনা বেগম আমার যা উপকার করিছেন, তা আপন বুনিউ কবে না। আমার আ'জ যা কিছু হইছে সব উনার জন্যি।"

দাউদের শরীর সির্‌সির করছিল। তার স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। কিংবা এটাও সে স্বপ্নই দেখছে। এত কাছে সইফুন! স্বপ্ন। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় সইফুনকে! স্বপ্ন। কতদিন সে স্বপ্ন দেখেছে, এমনই একটা সাজানো ঘরে বসে আছে সে আর সইফুন। নিশ্চয়ই এখন জেগে নেই দাউদ। সে স্বপ্ন দেখছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দাউদ।

ম্যাজিক দেখছে সইফুন। ম্যাজিক! এই ঘরখানা ম্যাজিক! এমন সাজানো ঘর, এমন পরিপাটি, এমন নানান ধরনের আসবাব, এ কখনো সত্যি হয়? এক্ষুনি হয়ত হুস্ করে উড়ে যাবে সব, মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। আজ ঘণ্টাখানেক ধরে কত আজগুবি জিনিসই না সে দেখল। ম্যাজিকঅলা কত অসম্ভব সব জিনিসই না এখান থেকে সেখান থেকে টেনে টেনে বের করে দেখালেন। তারপর এক সময় হুস্ করে উড়িয়ে দিলেন সে-সব। এও উড়ে যাবে। এই ঘর, বিছানাপত্তর, আসবাব, সব আবার মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। ঐ লোকটাও যাবে? ঐ যে, যে দাঁড়িয়ে আছে খাটের বাজুতে? তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে? সইফুনের মাথার ভিতরে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম আওয়াজ হচ্ছে।

সইফুনের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করছে দাউদের। সে কি একটু ছোঁবে সইফুনকে? ডাকবে সইফুনকে?

সইফুনের অস্বস্তি হচ্ছে বেজায়। এই লোকটার সঙ্গে একা এক ঘরে থাকা ঠিক হচ্ছে না। কেউ যদি দেখে ফেলে তো কথা হবে। সইফুনের শরীরটা এদিকে আবার কেমন চনচন করে উঠছে। কী হচ্ছে সে ভালো বুঝতেও পারছে না। পুরুষ মানুষকে সে বুঝতে পারে না। একবার সে পুড়েছে। কী পাগলামি চেপেছিল তার মাথায়, সে অসম্ভবের পিছনে ছুটতে গিয়েছিল। শুধুই কি তাই, সে এটা পর্যন্ত বুঝতে পারেনি যে, সে একটা অসম্ভবের পিছনে ছুটছে। বুঝেছে অনেক পরে। কিন্তু উঃ সে কী যন্ত্রণা! না, সে কথা সইফুন আর মনে করতে চায় না। এখন আরেকটা পুরুষ এসেছে তার জীবনে। প্রথমে সে পাত্তা দেয়নি। অনেকদিন সইফুন মুখ ফিরিয়ে ছিল। এমন কি একদিন সাহায্য চাইতে গিয়েছিল, আশ্রয় চেয়েছিল একজনের কাছে। কোনও সাড়া পায়নি সইফুন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সে এই লোকটার দিকে ফিরেছে। কিন্তু খুব সন্তর্পণে। সইফুনের অস্বস্তি হচ্ছে এখন।

তুমি না সইফুনরি চাইছিলে? হয়, চাইছিলাম। তা পায়ে তো গেছ? পাইছি, পাইছি। তয়, চুপচাপ দাঁড়ায়ে আছ ক্যান? তুমার না জরুরি কথা ছিল ওর সঙ্গে? ছিল ছিল। তয়, যাও! কও সে কথা! কব? কওয়া কি ঠিক হবে? যদি খোয়াব ভা'ঙে যায়? কী অ্যামন কথা যে কলি পরে খোয়াব ভাঙে যাবে? ফুটকির কথা? কার কথা! ফুটকির কথা। ফুটকির কথা এই ব্যালায় কয়ে ফ্যালা ভালো। তুমি অ্যাকটা ডাকা'ত! ক্যান? কী সাহস তুমার! আর কোনও কথা পা'লে না? ফুটকির কথাটা অ্যাখন কবা?

খবরদার না। ক্যান্, কলি দোষ কী? না না। তুমি কি নিজির পায় কুড়ুল মাত্তি চাও? দুলহানিরি কি ওকথা কতি আছে? কিন্তু শাদির পর? তখন তো ও সবই জানবে? জানুক। তখন শাদি হয়ে যাবে। তখন তো ও সবই জানবে দাউদ। খবরদার দাউদ, আগে কিছু কবা না। কিচ্ছু না।

দাউদকে আস্তে আস্তে মানিয়ে নিয়েছে সইফুন। আম্মাজানের এত ইচ্ছে। আব্বুর এত ইচ্ছে। বাবু জামিল এমন কি ছোট ভাইবোনগুলোও কেমন দাউদের দলে ভিড়ে গেল! তা ছাড়া, দাউদ কত উপকার করেছে তাদের। আর সবুর করেছে কত! এত সবের বিরুদ্ধে একা সইফুন

কত আর লড়বে? কতদিন আর লড়তে পারে? আর তা ছাড়া, এত লড়ালড়ির দরকারই বা কী? শাদি তো তারে কত্তিই হবে? এই লোকটারে না হোক, অন্য কাউরি? তয়? তা'লি এই লোকটাই বা নয় ক্যান্? এ বরং ভালো। ক্যান্ না, এই তারে চাতিছে। সুন্দর চিহারা। খোনকারের বিটি এরে কয় ইউছুফ। ইউছুফ! আর উনি জুলেখা! দেলে কুট এক কামড় খেল সইফুন। ঈর্ষার কামড়। সাকিনা বুবুর নজর পাড়ছে এর উপর। হঠাৎ সইফুনের মনে হ'ল দাউদ নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু নয়। ইউছুফ! এক অসতর্ক নারী যেন অকস্মাৎ আবিষ্কার করল তার আঁচলের গিটে বাঁধা আছে এক মহামূল্যবান মণি। সইফুন এই প্রথম সতর্ক হ'ল। সজাগ হয়ে উঠল। সে দাউদের দিকে চাইল। সত্যিই দাউদ খুব সুন্দর। না, সে একে হাতছাড়া করবে না। কিছুতেই না। তার কলিজা তড়পাতে লাগল। কিন্তু হাতছাড়া হয়ে যেতে কতক্ষণ! কত মেয়ে ঘুরছে ওর চারদিকে। আর সে এত বোকা, এমন লোককে সে শুধু অবহেলা করে এসেছে! নিতান্তই তার কপাল জোর যে দাউদ এখনও তারই আছে। সইফুন উদ্বেগ বোধ করতে লাগল।

কামড়া ভালো কত্তিছ না দাউদ, কয়ে ফ্যালো। সাফসোফ হয়ে ন্যাও, তারপর যা থাকে নসিবি। বিপদ আর বাড়ায়ে না। অ্যাক জেন্দেগীতি অ্যাক ফুটকিই কি যথেষ্ট নয়? তুমি অত ফুটুক ফুটকি কত্তিছ ক্যান? আমি যে ঘর পুড়া গোরু তাই। মেয়েলোকেরে চিনা মুশকিল। শাদির পর যখন জানাজানি হয়ে যাবে তখন কী হবে? বিবির গুসা হবে। আবার কী হবে। দুচারদিন মুখ ভার থাকবে আবার কী হবে? বিবিরি গয়না দিবা, কাপড় দিবা, এদিক ওদিক নিয়ে যাবা। বিবিগেরে বশ মানাতি তুমি জানো। ভয় করে, ভয় করে। অ্যাখন যে ভালোমানুষি দেখাতিছ তার নতীজা কি জানো? কাজীর কাছে শাদি পড়াতি বিবি যদি নারাজ হয় তখন? হায় আল্লাহ। না না তয় অ্যাখন সে কথা থাক।

হঠাৎ দাউদ দেখল সইফুন ওর দিকে চেয়ে আছে। দাউদের কলিজা তড়াক করে লাফ দিল। সে খাটের ধারিতে বসে সইফুনের চোখের দিকে সোজা চাইল।

সইফুনের শরীরে সমস্ত রক্ত তোলপাড় করে উঠল। এই নিরালা ঘরে, পরিষ্কার ধবধবে বিছানা, বিছানার ভুরভুরে গন্ধ, দাউদের সান্নিধ্য সইফুনের ভুলে থাকা একটা তৃষ্ণাকে প্রচণ্ডভাবে জাগিয়ে দিল। ওর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। ওর নাকের ডগা হাতের তালু ভিজে উঠছে। এই সেই সর্বনাশা তৃষ্ণা যা আরেক সন্ধ্যায় তার হিতাহিত ভুলিয়ে দিয়েছিল। দাউদ তার। দাউদ তার। তার দেলে এই কথা বাজতে লাগল।

হঠাৎ সইফুন শুনল দাউদ তাকে বলছে, "অ্যাকটা কথা তুমারে জিজ্ঞেস করি, সাফ জবাব দিবা।" অমনি দরজা খুলে গেল। সাকিনা হাসতে হাসতে ঢুকল।

"উঁহু, আর না। কথা যথেষ্ট হইছে। বসে বসে মিঞার কথা শুনলিই বিবির পেট ভরবে না। চলেন, খানা-ঘরে চলেন।"

সইফুনকে নিয়ে গেল সাকিনা। দাউদ দেখল একটা সুযোগ আল্লা তাকে দিলেন। কিন্তু সে তাকে কাজেই লাগাতে পারল না। আফসোস। তার বলা উচিত ছিল ফুটকির কথা। কেন সে বলল না। সইফুনকে নিয়ে শান্তির জীবন সে কাটাতে চায়। সে চায় না তার আর সইফুনের মধ্যে কোনও আড়াল থাকুক। এমন কোনও গোপনীয়তা সে রাখতে চায় না যা তার আর সইফুনের মিলিত জীবনে কখনও কোনও অঘটন ঘটায়। কেন ফুটকির কথা সইফুনকে বলল না দাউদ? কেন সে পিছিয়ে গেল? এই সুযোগটাই না সে প্রথম দিন থেকে খুঁজছিল? সুযোগ হাতে এসেও ফসকে গেল। নাঃ। কাল সে বলবেই। কাল দুপুরে সে যাবে সইফুনদের বাড়ি। সেখানেই বলবে। কী সুন্দর চোখ সইফুনের। তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না।

॥ ১৩ ॥

বাড়ি ফেরবার পথে মৌলবী জয়নুদ্দিন খুব বকবক করছিলেন। দাউদ এক্কার ছই-এর ভিতরে বসেছিল। সইফুনের গা ঘেঁষে। আর জয়নুদ্দিন বসেছিলেন গাড়োয়ানের পিছনে।

মৌলবী বললেন, "খান বাহাদুর যা কলেন, কথাডা ঠিক। অ্যাখন মুছলমানগের আর ঢিলে দিলি চলবে না। অ্যাকেবারে অ্যাক হয়ে যাতি হবে। মুছলমানগের আর অ্যাখন তুমি জমিদার আমি প্রজা, তুমি মহাজন আমি খাতক, এভাবে দেখলি চলবে না। দেখলি ক্ষেতিই হবে। অ্যাখন মুছলমান তো মুছলমান। অ্যাক ডাকে সকলরে উঠে আসতি হবে। তবে যদি ইছলামরে বাঁচানো যায়। ঠিক কথা। অ্যাকেবারে খাঁটি কথা।"

গাড়ির ঝাঁকানিতে সইফুন বারবার দাউদের গায়ে এসে পড়ছিল। দাউদও। গোটা শহরটাই এখন অন্ধকারে ঢাকা। মাঝে মাঝে দু-একটা মোড়ে রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের টিম টিম বাতি জ্বলছে। বাতির কাছ দিয়ে গাড়িটা যাবার সময় দাউদ কয়েকবার লক্ষ্য করেছে সইফুনের মুখটা আবছা আলোয় টলটলে হয়ে উঠেছে।

সইফুনের উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। দাউদের গায়ে তার গা ঠেকছে আর তার শরীরের খুন কলজেয় এসে আছড়ে পড়ছে। খুব তেষ্টা পাচ্ছে সইফুনের। গাড়িটা দড়াম করে খানায়

পড়ল। সইফুনের মাথা ঠুকে গেল দাউদের মাথায়। লোকটার মাথাটা কী শক্ত! লোকটার হাতে ওর হাত ঠেকল। কলজের খুন লাফিয়ে উঠল। নিজের হাতটা সরিয়ে নিতে চাইল সইফুন। পারল না। লোকটার ভারি হাতখানা তার হাতটাকে মুঠো করে ধরল। সইফুনের বুক তখন ফেটে পড়তে চাইছে যেন।

"খান বাহাদুর তুমার খুব প্রশংসা করলেন।" গাড়িটা অল্প একটু লাফাল।

সইফুন আর দাউদে ব্যবধান প্রায় নেই।

"খান বাহাদুর কলেন, কাজে কামে তুমার য্যামন আঠা, তুমি উন্নতি কত্তি পারবা। বেশ ভালো লাগল শুনে।"

সইফুনকে বুকে চেপে ধরতে খুব ইচ্ছে করছিল দাউদের। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রাখল।

"খান বাহাদুর তো খুবই উমেদ রাখেন যে বাংলায় ইবার মুছলমানগের গরমেনট হবে। হলি তো খুবই ভালো। বাংলার মুছলমান তালি চাকরি বাকরি হিন্দুগের কাছ থে কাড়ে নিতি পারবে।"

দাউদ আস্তে করে সইফুনের হাতখানা সেই ছই-এর অন্ধকারে তুলে নিল তারপর নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরল। সে টের পেল সইফুন কেঁপে উঠল কিন্তু হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। আর দুটো দিন! আর দুটো দিন! দাউদ নিজেকেই আশ্বস্ত করতে লাগল।

সইফুনদের বাড়ি থেকে দাউদ যেন উড়ে চলে এল তার বাসায়। কাতলা দরজা খুলে দিল।

গলা খাটো করে সে দাউদকে বলল, "তাহের ভাই কাজের লোকরে দিয়ে গেছে। বিবির আবার অ্যাকটা ছাওয়ালও আছে।"

দাউদ যেতে যেতে বলল, "শুনিছি বাপ শুনিছি।"

কাতলা বলল, "পাকের ঘরের পাশে যে কুঠরিডে, সিডাই ওবে ছাপ করে দিয়ে দিছি।"

"দেখে তোর কী মনে হ'ল? মানায়ে টানায়ে চলতি পারবে তো? ক্যান্ না বাঁদী য্যামন নতুন, বেগমউ তো তেমনিই নতুন।"

দাউদের চোখে সইফুনের নরম মুখটা ভেসে উঠল।

"জে পারবে। খুব পারবে। আমার তো ভালই লাগিছে।"

একটা বাচ্চা খুঁত খুঁত করে কেঁদে উঠল। এবং একটু পরে একটা বিবি ঘোমটা টেনে বাচ্চাটাকে পিসাব করাবার জন্য বাইরে নিয়ে গেল। দাউদ খুশি হ'ল। ঠান্ডায় বাচ্চাটা পরিত্রাহি চেঁচাতে শুরু করল।

"পয় পরিস্কার আছে, কী কোস্?"

"জে তা আছে।"

খুশি মনে দাউদ ঘরে ঢুকল। গরম জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গির উপর একখানা আলোয়ান জড়িয়ে হাত মুখ ধুতে এল দাউদ। কাতলা রোজকার মত সব গুছিয়ে রেখেছে। জলচৌকি, পানিভরা বালতি, বদনা, সাবান, তোয়ালে সব ঠিকঠাক।

দাউদ মুখেচোখে বেশ করে সাবান মেখে বদনা তুলে নিল। মুখ ধোবে।

"দাউদ মিঞা! হায় আল্লা!"

দাউদের হাত থেকে বদনা পড়ে গেল।

"কে? কে?"

দাউদ দু হাতে আঁজলা আঁজলা জল বালতি থেকে নিয়ে চোখের সাবান ধুয়ে ফেলতে লাগল। চেনা চেনা গলা! দাউদ তোয়ালে দিয়ে চটপট মুখ মুছে ফেলল। তার হাত কেন কাঁপছে? এ কী! এ যে দুলি বিবি! চাটমোহরের সেই দুলি বিবি! না আল্লাহ্, না না! সে বদ্‌খোয়াব দেখছে।

"দাউদ মিঞা! এ তুমার বাড়ি! তুমার বাড়িতি আমি বাঁদীগিরি কত্তি আইছি! আল্লাহ্!"

দুলি বিবির কাঁখে ছেলে। দুলি বিবি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল দাউদের দিকে।

দাউদ বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। তার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে। দুলি বিবি! দুলি বিবি এখানে কেন? কিছুই বুঝতে পারছে না দাউদ। সে জেগে না ঘুমিয়ে, তাও না। তার বড্ড গরম লাগছে।

"তুমি? তুমি এখেনে ক্যান?"

দাউদ কেমন নিস্তেজ গলায় প্রশ্নটা করল। আর দুদিন বাদে আমার শাদি। তুমি এখেনে ক্যান? দুলি বিবি? তার চাটমোহরের ইয়ার মোকছেদ ভাইর বিবি। দাউদের মনে পড়ল। দাউদ বলত রসের ভাবী। কিন্তু সে তো অতীতের কথা। দুলি বিবি এখন এখানে কেন? দুলি বিবি তার প্রথম যৌবনের ভুল। তার প্রথম পাপ। কিন্তু সে তো বদলে গেছে। খোনকারের বিটি সাক্ষী, সে বদলে গেছে। মতি মিঞার বিবি সাক্ষী, সে বদলে গেছে। সে তো আল্লার পথে ফিরে এসেছে। আল্লা মিঞা তো তার গুনাহ মাফ করে দেছেন। আল্লা তো তারে সইফুনরি দেছেন। তবে?

সইফুনের কথা মনে পড়তেই দাউদের মাথায় দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে গেল। এ ষড়যন্ত্র। সইফুনকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র।

দাউদ রাগে দিশ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এক লাফে দুলি বিবির চুলের মুঠি চেপে ধরল। এবং তার চুল ধরে টানতে লাগল।

"শয়তান ছিনাল বেরো বেরো বেরো!"

দুলি বিবি এক হাতে বাচ্চা আর এক হাতে বারান্দার খুঁটি চেপে ধরল প্রাণপণে।

"আমি শয়তান আর তুমি ফেরেশ্তা জিব্রাইল? না? তুমি আমার সব্বোনাশ করে চাটমোহর থেকে পালায়ে গেলে। আমার প্যাটে ছাওয়াল আলো। খসম আমারে তালাক দিল। তার পরের থেই লোকের বাড়ি বাঁদীগিরি কর্তিছি। তুমার বাড়িতি আমি এমনি আইছি! আল্লাই পোঁছয়ে দেছেন। এই যে আমার কোলে, এই দ্যাখ তুমার ছাওয়াল।"

দুলি বিবি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

দাউদের উত্তেজনা একেবারে কমে গেল। তার মুঠি আলগা হয়ে গেল।

না না, আল্লা না। এ সত্যি নয়! এ খোয়াব! বদ্খোয়াব!

"ভাবিছিলে পার পায়ে যাবা! আল্লার দুনিয়ায় কল্লামি ক'রে পার পাওয়া শক্ত। আমি পথে পথে ঘুরিছি। কেউ আমারে জায়গা দ্যায়নি। দিনির পর দিন খাতি পাইনি। মিসকিন্ ভিখিরির মত ভিখ্ মা'গে মা'গে খাইছি। আর আল্লারে ডাকিছি। ছাওয়ালডারে কতবার ভাবিছি ফেলে দিই টান মা'রে। তা বাপেরে দ্যাখা ওর নসিব ছিল। তাই রয়ে গেছে।"

দুলি বিবি দুঃখে অপমানে ফুঁসতে লাগল।

মাঝে মাঝে ওর মাথা খালি হয়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না দাউদ। কী ঘটছে? কে এই বিবি? বদ্খোয়াব! বদ্খোয়াব! সে কখনও চাটমোহরে যায়নি। সে কোনও গুনাহ্ করেনি। না না, সে ভুল করেছে। কিন্তু সে তো তওবা করেছে! আল্লা তাকে শুধরাবার সুযোগ তো দিয়েছেন! সইফুনকে দিয়েছেন! তবে? দাউদ এত অবসন্ন বোধ করতে লাগল যে আর দাঁড়াতে পারল না। জলচৌকিতে বসে পড়ল।

কাতলা শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হঠাৎ গোলমাল শুনে তড়াক-লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। দাউদেব রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর বাঁদীটা যা বলল, তাও শুনল। কী ঘটছে সে কিছু বুঝতে পারছিল না। একবার সে তার মনিবের দিকে চাইছিল আর একবার নতুন বাঁদীটার দিকে।

বাচ্চাটাও ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথমে। ভয়ও পেয়েছিল একটু। এখন তার ঘুম ছুটে গেল। সে আর তার মায়ের কোলে থাকতে চাইল না। নিচে নামবার জন্য হাঁচোড় পাচোড় করতে লাগল। আর সেই সঙ্গে পরিত্রাহি চিৎকার।

দাউদ মুখ তুলে ছেলেটাকে দেখল। তার ছাওয়াল! না। দাউদ বেজায় ভয় পেয়ে গেল। মিথ্যে বলছে দুলি বিবি। এ ষড়যন্ত্র। দাউদের সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্র। সে খুব ভয় পেল। উঠে পড়ল দাউদ। সে পালাতে চায়। এই দুঃস্বপ্ন থেকে সে পালাতে চায়। দাউদ দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজায় দড়াম করে খিল এঁটে দিল। তারপর বিছানায় বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ক'কিয়ে উঠল। কাঁপতে থাকল অসহ্য যন্ত্রণায়।

ফুটকি তোর মনে এই ছিল!

দাউদ গোঙাতে লাগল পশুর মতন। কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দাউদ কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এটা বুঝতে অসুবিধে হল না যে দুলি বিবির আবির্ভাব তার সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে, তার যাবতীয় সুখ স্বপ্নকে ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল।

দুলি বিবি! তার চাটমোহরের প্রথম নেশা! একদিন না দেখলে তার জান যেন বেরিয়ে যেত।

আর আজ? তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে দাউদ। তার কাছ থেকে পালাতে চাইছে।

ও ছাওয়াল আমার না!

দাউদ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। তার অবসন্নতা কেটে গেল। আবার সে উত্তেজিত।

এ কারও শয়তানী! আমার সর্বনাশ করার জন্যি কেউ দুলি বিবিরি এখেনে পাঠাইছে। এ ঐ বিটা গুলামের শয়তানী! হায় আল্লাহ্।

দাউদ এখন উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ। দ্রুত পায়চারি করছে ঘরের ভিতর। দুলি বিবি! দুলি বিবি তার জীবনের ভুল, তার পাপ। অভিশাপ হয়ে সে আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে।

"এ ফুটকির কাম।" দাউদ বিড়বিড় করতে লাগল। "ফুটকি! তোর দেলে কি একটু দয়া নেই। ওহ্ হোহ্ হো।"

এখন উপায়? আজ বাদে কাল তার শাদি। শহর সুদ্ধ সবাই জানে একথা। এখন উপায়? সইফুন যখন জানবে, দাউদ কী? তখন? না না, আল্লা না। দাউদ আর ভাবতে পারে না। একটা শক্ত ফাঁস দাউদের গলায় জোরে আটকে গিয়েছে। তার মনে হল, তার আর নিস্তার নেই।

হ্যাঁ আছে। হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেল দাউদ। এই দুঃস্বপ্নটাকে যদি মুছে ফেলতে পারে দাউদ? তাহলে? হ্যাঁ, তাহলে আর কোনও ঝামেলা থাকে না। তবে কি সে তার পাপের

প্রমাণ একেবারে মুছে দেবে? কিছুই জানবে না সইফুন। শাদি হবে তাদের। তারপর? পরিণামের কথা ভাবলে এখন কেঁপে ওঠে দাউদ। দাউদ কি ভেবেছিল কালোজিরেকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পরিণাম এমন হবে? দাউদ কি ভেবেছিল, চাটমোহরে দুলি বিবিকে নিয়ে সুখ মিটোবার জের এ পর্যন্ত ধাওয়া করবে?

দুলি বিবিকে কী করে মুছে ফেলা যায়? কেন, সে টাকা দেবে দুলি বিবিকে। খোরপোশ দেবে। চলে যাক দুলি বিবি। এই শহর থেকেই চলে যাক। এই রাতেই চলে যাক। দাউদ ক্ষতি করেছে দুলি বিবির? বেশ সে খেসারত দেবে তাকে। হাঃ! একটা পথ দেখতে পেল দাউদ। তখন মাথাটা সে খামাখা গরম করতে গেল কেন? হাতের কাছে এমন একটা সহজ সমাধান থাকতে সে কিনা এমন একটা বিশ্রী কান্ড করে বসল। কাতলাডা কী মনে করল কে জানে? দাউদ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। তার এখন মাথা ঠান্ডা রাখা খুব দরকার।

দাউদ বিছানার উপর এসে বসল। সে এখন অনেক শান্ত। এবং স্থির। দাউদ ধরেই নিল, দুলি বিবি তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে। কাল সকালেই সে ওদের বিদায় করে দেবে। কাতলা দাউদের খুব অনুগত। তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হবে না। সে জানে। ধীরে ধীরে দাউদের মনটা হাল্কা হয়ে উঠতে লাগল। সে ঠিক করল সইফুনকে কোনও কথা শাদির আগে বলবে না। যা বলার, প্রয়োজন হলে সবই বলবে। তবে শাদির আগে একটা কথাও নয়। ফুটকির কথা সইফুনকে বলতে তেমন অসুবিধে নেই। যাই ঘটে থাকুক, ফুটকি যে বেঁচে নেই, এইটেই সব চাইতে বড় সুবিধে। এই কারণেই সইফুন দাউদের শত অপরাধ মাফ করে দেবে। কিন্তু দুলি বিবির কথা! ওরে ব্বাপ! এ অপরাধ মাফ করবে না সইফুন। হয়ত দুলি বিবির ছাওয়ালের বাপ যে সে-ই, এই আজগুবি কথাটাও বিশ্বাস করে বসবে।

নাঃ, এসব কোনও কথাই তুলবে না দাউদ। যা হয় হবে। দাউদ একটা সিগারেট ধরাল।

কিন্তু দুলি বিবির মতলব কী? দাউদ সতর্ক হয়ে উঠল। ও যেন এখন সেই রকম পশু, যে টের পেয়েছে শিকারীর উপস্থিতি।

আমি ওর ছাওয়ালের বাপ, একথা ব'লল ক্যান? দুলি বিবি কি আগে থাকতিই জানতো যে সে আমার বাড়ি কাম কত্তি আসতিছে? কেউ কি ওরে শিখোয়ে দেছে একথা কতি? অজস্র প্রশ্ন তার মনে কিলবিল করতে লাগল। দাউদ অন্যমনস্কভাবে সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু তা'লি দুলি বিবি আমারে দ্যাখা মাত্তর অমন চমকায়ে উঠল ক্যান? না, দুলি বিবি জানতো না। ইডা যে আমার বাড়ি তা জানতো না। আমার সংগে যে দ্যাখা হবে, তাউ জানতো না। দাউদ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হ'ল।

তবে কি একথা সত্যি যে আমিই ওর ছাওয়ালের বাপ? মিথ্যে কথা! তবে দুলি একথা বলল ক্যান? বলল ক্যান যে, এই জন্যিই ওর খসম ওরে তালাক দেছে। বের করে দেছে বাড়ির থে।

অন্তত দুলি বিবির একথা যে সত্যি তা আর প্রমাণ করার দরকার করে না। দাউদ আরেকটা সিগারেট ধরাল।

তয় কি দুলি বিবি ওকথা কইছে বিনা মতলবেই? কথাডা সত্যি বলেই? আমিই ওই ছাওয়ালডার বাপ?

না না! দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। প্রমাণ কি? ইডা বাজে কথা, মিথ্যে কথা।

কিন্তু আর কোনও কথাই দুলি যদি মিছে না কয়, ইডাই বা মিছে কবে ক্যান্?

দাউদ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সব মিথ্যে।

কিন্তু যদি সত্যি হয়? যদি বাচ্চাটা আমারই ছাওয়াল হয়?

দাউদ এবার একেবারে অসহায়। আবার ওকে পথে বের করে দেবে দাউদ? সে আবার এসে বিছানায় বসে পড়ল।

আমি তো দুলি বিবিরি টাকা দোব। ভালো টাকা দেবো। ওগের তো আর আগের মতন ভিক্ষে করে খাতি হবে না। কি দুলির কারু বাড়ি বাঁদীগিরিউ কত্তি হবে না।

দাউদ আরেকটা সিগারেট ধরাল। ঘরটায় অনেক ধোঁয়া জমেছে। দাউদ উঠে জানালা খুলে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে থাকল খোলা জানালায়। শীতের হাওয়া চোখে মুখে লাগছে। চাঁদটা মাথার উপর থেকে অনেকখানি নেমে গেছে। এখন সেটা দাউদের একেবারে চোখ বরাবর। তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল, চাটমোহরে তার বুকের তলায় পড়ে যে দুলি ছাড়ে দ্যান, ছাড়ে দ্যান বলে প্রথম দিন ব্যাগাতা করেছিল এবং তারপর তাকে বিছানায় পাবার জন্যে যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, এ সে দুলি নয়। সে দুলির সুরত ছিল কত চটকদার। এ দুলি বিবি যেন তার ছিবড়ে। তিন বছরে লোকের কত বদল হয়! ফুটকি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বদলে যেতো। আর কালোজিরে? হ্যাঁ, অমন যে কালোজিরে সেও বদলাবে ক'বছর পরে। সইফুন? হ্যাঁ, সইফুনও বদলাবে। সইফুনের জন্য দাউদের খুব কষ্ট হতে লাগল। সইফুন আর তার নাগালের মধ্যে নেই। সইফুনকে নিয়ে ঘর বাঁধার যে স্বপ্ন, দাউদ বিপন্ন হয়ে দেখল, তা ওই চাঁদটার মতই দূরে সরে যাচ্ছে। দাউদ তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু এখন আর দাউদের দুলি বিবির উপর রাগ হচ্ছে না। সত্য বলতে কি, অন্য কারো

উপরেই রাগ হচ্ছে না। সে নিজেই জবলছে। এমনটা হতে পারে দাউদ ভাবেনি। আজ দুলি ফিরে এসেছে অতীত থেকে, কাল ফটিক যে কবর থেকে উঠে আসবে না, তার নিশ্চয়তা কী? কাজেই দাউদের ওই মতলবে কাজ হবে না। দুলি বিবিকে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, সে নিয়ে চলে গেল। এত সহজে, দাউদ দেখল, অতীতের মহড়া নেওয়া যায় না। তবে কি সে পালাবে? পালিয়ে কই সে তো বাঁচতে পারেনি! যেখানেই গিয়েছে দাউদ অতীত সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করেছে চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে, তারপর সুযোগ মত অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে।

বাঁচতে তো পারেনি দাউদ? বাঁচাতে তো পারেনি তার স্বপ্নকে, সাধকে? কাজেই দুলি বিবিকে টাকা দিয়ে বিদায় করলেই তার পাপ মুছে যাবে না। পাঁচ বছর দশ বছর পরে তা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে আরও বিকট মূর্তিতে। দুলি যাবে, তার ছাওয়াল আসবে। আল্লাহ্!

আগে ক্যান্ ইডা বুঝতি পারি নি!

দাউদ অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করল। এই ছাওয়াল আমার? আমি ওর বাপ! আমি বাপ!

কিডা ক'লো? বাজে কথা! দুলি আমারে প্যাঁচে ফেলাতি চাচ্ছে। আমি ওরে ছাড়ে দিলি, এই কথা ছড়ায়ে ব্যাড়াবে। গাজী শোনবে। গাজী খোন্‌কাররে কবে। সর্বনাশ হবে আমার! মোতি মিঞা দাঁত বার করে হাসবে।

না না, দাউদ তা হতে দিতে পারে না। এত বড় কথা কয় দুলি, কোন্ সাহসে? তার জানা দরকার। এবং দুলির মুখ বন্ধ করা দরকার। দাউদ আর বিলম্ব করল না। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। পাকের ঘরের দরজা বন্ধ। সেই দিক দিয়েই দুলির ঘরে ঢুকতে হয়। দরজায় অসহিষ্ণু হয়ে টোকা দিল দাউদ। কেউ সাড়া দিল না। আবার টোকা দিল দাউদ।

"কিডা?" ভয়ে ভয়ে সাড়া দিল দুলি বিবি।

"আমি দাউদ।" আস্তে জবাব দিল দাউদ। "দরজা খোলো।"

"এত রাত্তিরি কী মতলব?"

এবার দাউদ রেগে গেল। তবু সে নিজেকে সংযত করল।

"জরুরি কথা আছে।"

বেশ একটু সময় গেল। দাউদ অধৈর্য হয়ে উঠল।

"দরজা খোলো। কথা আছে।"

দুলি কী ভেবে দরজা খুলে দিল।

"উডা যে আমার ছাওয়াল, প্রমাণ কত্তি পারো।"

দারুণ উত্তেজিত দাউদ। দুলি বিবি দাউদের মুখ সেই অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু তার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিল। সে দুটো জবলছিল।

দুলি বিবি বলল, "পারি। উঠোনে চাঁদের আলো আছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। আমি প্রমাণ আনতিছি।"

দাউদ প্রবল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। সে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। দুলি ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এল।

বলল, "ঘরে অতবড় অ্যাকখান আয়না আছে যখন, তখন নিজির সুরত নিশ্চয়ই দ্যাখো। ন্যাও। ইবার মিলোয়ে ন্যাও। দ্যাখো। গার রং দ্যাখো, চোখ মুখ দ্যাখো। নিজি দ্যাখো আর পাড়ার লোকজন ডাকে দ্যাখাও। তারাউ আ'সে বলুক। শোনো তারা কী কয়?"

না আর সন্দেহ নেই। ঘুমন্ত ছেলে কোলে নিয়ে জলচৌকিতে বসে আছে দাউদ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে তাকে। এখনও দেখছে। নাঃ কোনও সন্দেহই নেই। অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল দাউদ। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল। কর্তব্যও সে ঠিক করে ফেলেছে। আজই সে কাজী ডেকে এনে নিকাহ্ করবে দুলিকে। কোনও সমস্যা থেকেই সে আর পালাবে না। তাকে বেকায়দায় ফেলতেও দেবে না কাউকে। তারপর যাবে সইফুনের কাছে। বলবে তার এক বিবি আছে, ছাওয়াল আছে, তাদের ছেড়ে সে পালিয়ে এসেছিল। আজ তারা এসে পড়েছে। সইফুন যেন তারে মাফ করে।

॥ ১৪ ॥

এ কী হল! আবু তালেবের মুখে কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ফটিক। প্রজায় আর লিগে কোয়ালিশন! ফজলুল হক আর নাজিমুদ্দিনে মিলন! তখন বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছিল ফটিক। কষ্ট সে এখনও পাচ্ছে। এখন, যখন সে শুয়ে আছে ছবির পাশে। কলকাতার এক ভাড়াটে বাসায়। গ্যাসের আলো এসে পড়েছে ছবির কাতর মুখে। চোখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার গাল বেয়ে। বিড়বিড় করে কি বলছে ছবি ঘুমের ঘোরে। ছবি এখন শুধু কাঁদে। আড়াই মাস হল হাসপাতাল থেকে ওরা ছবিকে বাসায় এনেছে। কিন্তু তাকে পুরো সুস্থ করে তুলতে পারে নি। নরমোন আর হাজী সাহেব কদিন হল দেশে ফিরে গিয়েছেন। ছবিকে একটু ভালো করে নিয়ে ফটিকও ফিরবে।

রাত বাড়ছে। নোনাপুকুরের মেরামতি কারখানায় ট্রামগাড়িগুলো এসে ভিড় করছে। স্যাঁক্ সাঁ আ। একটা তীক্ষ্ন শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা ছিঁড়ে গেল। হ্যাঁ, এই ট্রামটা ঢুকল। এটা ফটিকের একটা খেলা। রাতে তার যখন ঘুম আসে না, যখন সে শোকার্ত ছবিকে সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং নানা চিন্তায় বিপর্যস্ত, তখন ফটিক এই খেলাটা শুরু করে। স্যাঁক্ সাঁ আ। এই শব্দ শুনলেই সে ঠাহর করতে চেষ্টা করে ট্রামটা কারখানায় ঢুকছে না বের হচ্ছে।

আবু তালেব ফটিককে বেকার হসটেলে নিয়ে গিয়েছিল। ঈদ রি-ইউনিয়ন। কলকাতায় ওকালতি পড়তে এসেই ফটিকের ঈদ রি-ইউনিয়নের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। হিন্দু ছাত্ররা যেমন হসটেলে হসটেলে সরস্বতী পুজোর নামে মেতে উঠত, গান বাজনার জলসা, বক্তৃতার আসর বসাত, তেমনি তার পালটা হিসেবে শুরু হয়েছিল ঈদ রি-ইউনিয়ন। মুসলমান ছাত্রদের হসটেলে। ফটিকের মজা লাগত। ইসকুলে সে সরস্বতী পুজো দেখতে আসত। একবার সে অঞ্জলি দিতেও এসেছিল, কিন্তু ওর ক্লাসের একটি ছাত্র সেটা ফাঁস করে দেওয়ায় পণ্ডিত মশায়ের নির্দেশে তাকে কান ধরে বার করে দেওয়া হয়।

স্যাঁক্ সাঁ আ। এটাও ঢুকল? হ্যাঁ, ট্রামটা ঢুকল।

বেকার হস্টেলের ঈদ রি-ইউনিয়নে প্রধান বক্তা ছিলেন মৌলবী এ কে ফজলুল হক। তিনি সেদিন উদ্দীপনাময়ী ভাষণে বাংলার মুসলমান আর ইসলামের স্বার্থে ব্যক্তিগত বিবাদ মিটিয়ে ফেলে প্রজা এবং লিগ কোয়ালিশন জাতির সামনে যে কার্যসূচী রেখেছে তার পিছনে বাংলার সব মুসলমানকে কাতার দিয়ে দাঁড়াতে বললেন। হক সাহেব বললেন, প্রজা-লিগ কোয়ালিশনই বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সব চাইতে ভালভাবে রক্ষা করবে।

হক সাহেব বেশ আবেগভাবেই বলে উঠলেন, আমি আর স্যার নাজিমুদ্দিন ; যিনি অ্যাসেম্বলীতে এসে শিগ্গিরই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন, যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারি, যদি ঢাকার নবাব আর জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ একসঙ্গে কাজ করতে পারেন, যদি জনাব আজিজুল হক আর জনাব সানাউল্লাহ্ একসঙ্গে কাজ করতে পারেন, তাহলে অন্য মুসলিম মেমবাররাও কেন এসেম্বলীতে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন না? না পারার কোনও কারণ নেই।

একথা বলেছেন স্বয়ং ফজলুল হক। বেকার হসটেলে তিনি আসর গরম করে দিয়েছিলেন সেদিন। আর ফটিক নিজের কানে শুনেছে এ কথা! রাজনীতি কত অসম্ভবকেই না সম্ভব করতে পারে! রাত বাড়ছে। ছবি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরল।

এ কোন্ ফজলুল হক? ফটিক নিজেকেই প্রশ্ন করল। ইনি কি সেই ফজলুল হক যিনি পরিষ্কার ভাষায় এতদিন বলে এসেছেন, মুসলমান জনসমষ্টির শতকরা নব্বইজনের বেশি হলেন কৃষক! সুতরাং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রস্তুত যে কোনও পরিকল্পনায় কৃষকদের স্বার্থকেই প্রধান বিষয়বস্তু করা উচিত। তা না করে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে মুসলিম ঐক্য ও সংহতির কথা বলা ক্ষতিকারক।

সেই ফজলুল হকই আবার আজ কেমন অম্লান বদনে বলছেন, আমি আর স্যার নাজিমুদ্দিন যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারি, ঢাকার নবাব আর জনাব শামসুদ্দিন যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারেন......তবে অন্য মুসলিম মেমবাররাই বা এসেম্বলীতে একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন না কেন? এটা কি নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলব নয়? ফটিক প্রশ্ন করল। আবার নিজেই বলল, এর উত্তর তো আপনিই আগে দিয়েছেন হক সাহেব, তাই নয় কি?

ছবি ঘুমের ঘোরে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। ও কি কাঁদছে? ফটিক উৎকর্ণ হ'ল। খুব ভালো খবর আছে, জানেন ফটিক ভাই, খুব ভালো খবর। উৎসাহভরে আবু তালেব বলেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন আগে। সৈয়দ ছাহেব কলেন, কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন হ'তি চলিছে। সব একেবারে পাকা। খালি সইডা হতি যা বাকি। ইবার হিন্দু মুস্লিম সমস্যার একটা সুরাহা হবে।

কথাটা মনে ধরেছিল ফটিকের। এই উগ্রতা, এই অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, এই পরিবেশের মধ্যে সে হাঁফিয়ে উঠেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কী পরিমাণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সকলে। খবরের কাগজগুলো এমন মাত্রাছাড়া চিৎকার শুরু করেছে যে রক্তমাংসের মানুষ, ব্যক্তি মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদ চিহ্নের অতল গহ্বরে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এখন কোনও ব্যক্তি আর কোনও ব্যক্তিকে খুন করছে না, কোনও দুর্বৃত্ত পুরুষ আর কোন নারীকে ধর্ষণ করছে না, এখন এক সম্প্রদায় খুন করছে অন্য সম্প্রদায়কে, এক সম্প্রদায় ধর্ষণ করছে অন্য সম্প্রদায়কে। এখন যেদিকে তাকান যাক না কেন, সেইদিকেই শুধু হিন্দু কর্তৃক মুসলমান হত্যা, এখন শুধু মুসলমান কর্তৃক হিন্দু রমণী ধর্ষণ। এখন যেন মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করাকে মুসলমানরা এবং গোরু কোরবানি বন্ধ করাটাকেই হিন্দুরা জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ধরে নিয়েছে। গোরুর গলায় ছুরির কোপ থামানোর জন্য মানুষের গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধা করছে না কেউ। গোরুর জীবনের চাইতে মানুষের জীবনের কদর কমিয়ে দেয় যে মনোবৃত্তি তাকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে দেখে ফটিক শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। আর, এত সব কেন? না, নির্বাচনে ভোট পাবার জন্য। আর সেই কারণেই ফটিক বিভ্রান্ত বোধ করে। কোথাও যেন তার দাঁড়াবার জায়গা নেই। এই কথা তার মনে হয়। এবং সে বিপন্ন হয়ে পড়ে। সে তার বোধের দিগন্তে আসন্ন এক কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ আয়োজন দেখতে পাচ্ছে।

এবং ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ছে। তাই ফটিক কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশনের সম্ভাবনার কথাতে এত উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। এমন কি আবু তালেবের সঙ্গে এ বিষয়েও একমত হয়েছিল যে একমাত্র এই কোয়ালিশন সরকারের পক্ষেই হিন্দু মুসলমানের উত্তেজনা প্রশমন করা সম্ভব। কেন না এই কোয়ালিশন হিন্দু মুসলমান দু দলের আস্থাই অর্জন করতে পারবে।

কিন্তু সে সম্ভাবনা এক ফুঁয়ে উড়ে গেল! ফটিক স্তম্ভিত। স্যাক্ সাঁ আ। একটা ট্রাম এবার বেরিয়ে গেল। আমাগের লিডার এ কী করলেন! সেদিন আর্তনাদ করে উঠেছিলেন আবু তালেবও। আল্লাহ্ এ কি করলে। আর্তনাদ ছবিও করে। ছবির আর্তনাদ তাকে রাতের পর রাত শুনতে হয়। কিন্তু এই হাহাকারের কোনও জবাব দিতে পারে নি ফটিক। সান্ত্বনাও না। সে শুধু ছবিকে নীরবে বুকে টেনে নিয়ে শুয়ে থাকে। তার কেবলই মনে হয়, তার কিছু বলা উচিত ছবিকে। এতে যে ছবির কোনও হাত নেই, ছবির কোনও দোষ নেই সে তাকে এটা বোঝাতে চায়। তার শোককে ফটিক অসম্মান করছে না, উপেক্ষা করছে না, ফটিকের ইচ্ছে হ'ত ছবিকে তা জানায়। কিন্তু ছবির অস্থিরতা, তার যন্ত্রণার তীব্রতা ফটিককে বোবা করে দিত।

দল হিসেবে আমরা মুছে যাব। আবু তালেব বলছিলেন বেকার হসটেল থেকে ফিরতে ফিরতে আর ছটফট করছিলেন। আমরা কব কী লোকেরে? আমাগের লিডার কি একথা কন্ নি যে যাগের হাড়ভাঙা খাটুনির ফল অন্যে ভোগ করে, সেই সব কৃষক ও প্রজাগের স্বার্থ সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্যের কথা উঠতিই পারে না কারণ তাগের স্বার্থ একই সুতোয় গাঁথা? তিনি কি একথা কননি যে, এই আর্থিক দাবির ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলমান এক জায়গায় আসে মেলবেন এবং একসঙ্গে থাকলিই তাঁরা জয়লাভ করবেন? আমাগের লিডার ফজলুল হক কি একথা কননি যে এই কাজে জিন্নাপন্থী লিগ বোরড কৃষক প্রজা সমিতির সাথে সহযোগিতা করবেন, একথা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে শক্ত। ক্যান্ না জিন্নাপন্থীগের স্বার্থ আর কৃষক প্রজাগের স্বার্থ এক নয়। আর আমাগের লিডার কি-না সেই তাগের সাথেই গাঁটছড়া বাঁধলেন? সেই জিন্নাপন্থীগের সাথে? লোকে কবে কী? আর আমরাই বা লোকেরে কী কব?

কেন, ফটিক সেই অন্ধকারকে বলল, এখন সমগ্র মুসলিম বঙ্গ ঐক্য চায়, কাজেই কর্মসূচী নিয়ে ছোটখাট ভেদাভেদ আমাদের মিটিয়ে ফেলা উচিত, ঐক্যের স্বার্থে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কর্মসূচীও কোরবানি করতে হবে, এই কথা জোর গলায় বলবেন। কথার কি অভাব আছে আমাদের? নিজের উপরই কেমন হিংস্র হয়ে উঠছে ফটিক। মাঝে মাঝে সে এমনি ক্ষেপে যায়।

"আমারে কন", ছবি ঘুমের ঘোরে ককিয়ে উঠল।

ফটিক যেন কাঠ হয়ে গেল। এই বুঝি ছবি জেগে উঠল। ঘুমোও ছবি ঘুমোও। ঘুমোতেই শুধু শান্তি।

"আমারে কন, আমারে কন, ক্যামন তারে দেখতি ছিল?"

যে নেই তার কথা আর জেনে কী হবে ছবি! ফটিক ছবির চুলে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ফটিক তার মুখ দেখেনি। একবার তার ইচ্ছে হয়েছিল দেখার। সিস্টার যখন তাকে ডেকে বললেন, কী দেখবেন না কি বেবিকে? খুব কৌতূহল হযেছিল তার। সে প্রায় হ্যাঁ বলে ফেলেছিল, কিন্তু তক্ষুনি ছবির কথা মনে হল। সে যখন জানতে চাইবে, তখন? এমন ছিল তেমন ছিল বলে ছবির যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে দেবে? না না। তাহলে? ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাবে যে সে দেখেনি? না না। ছবিকে সে মিথ্যে স্তোক দিতে পারবে না। তাই সে নিজেও দেখল না তাদের প্রথম সন্তানের মুখ। শুধু ছবির কথা ভেবে। একটা প্রবল প্রলোভন সে ত্যাগ করল। কিন্তু ছবি কি বুঝবে সে কথা?

ছবির মুখের দিকে চাইল ফটিক। সে বিড়বিড় করে বকছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনেক পুতুলের ভিড়ে ছবি নিজের পুতুলটা হারিয়ে ফেলেছে যেন, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। ফটিককে খুঁজে দিতে বলছে। কিন্তু ফটিক কোনরকম সহযোগিতা করছে না। ছবি তার ব্যবহারে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ফটিকের কেমন শ্বাস কষ্ট শুরু হল। এমনিই হয় আজকাল।

কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন কী করে ভ্যাস্তায়ে গেল? শোনেন তা'লি। মনসুর সাহেব কইছেন। আবু তালেব তারপর আনুপূর্বিক এক বিবরণ দিলেন।

ব্যারিস্টার জে সি গুপ্তের বাড়িতে ডিনার। সেখানে চূড়ান্ত শর্তাবলী উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে। প্রজাপক্ষে ছিলেন লিডার হক সাহেব, সৈয়দ নওশের আলী, জনাব শামসুদ্দিন, জনাব আশরাফুদ্দিন, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী, খান বাহাদুর হাশেম আলী, জনাব হুমায়ুন কবির, ডঃ আর আমেদ আর জনাব আবুল মনসুর আহমদ। কংগ্রেস পক্ষে ছিলেন শরৎ বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, জে এম দাশগুপ্ত, কিরণশংকর রায়, সন্তোষকুমার বসু, ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও জে সি গুপ্ত। শর্তাবলী আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে, তাই তা নিয়ে আর কথা উঠল না। খানাপিনা শেষ হল। সবাই ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। সকলের মনেই ফুর্তি।

আবু তালেব বললেন, বোঝলেন তো? লিগ হ'ল দুই দলেরই কমন এনিমি। ইলেকশনে কামিউন্যাল জিগির তুলে যেভাবে উরা কামিয়াব হইছে তাতে তারে ঠেকাতি না পারলি আর সকলেরই সর্বনাশ।

আবু তালেবের বিবরণ শুনতে শুনতে শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিমের একটা বক্তব্য হঠাৎ ফটিকের মনে পড়ে গেল। নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন কাগজে, তাতে তিনি বলেছেন, যেখানে নির্বাচকমণ্ডলী অজ্ঞ, ধর্মান্ধ ও মধ্যযুগীয় আদর্শে আস্থাবান আর প্রার্থিগণ স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারপূজক সেখানে নির্বাচনের ফলাফল যাহা হওয়া উচিত বাংলার অনেক জেলাতে তাহাই হইয়াছে। নির্বাচকগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান দান করা হয় নাই, সেই সব বাস্তব বস্তুর ভিত্তিতে দল গঠনের ব্যবস্থাও হয় নাই। তাহারই কারণে বহু অযোগ্য লোক নির্বাচিত হইয়াছে। কেহ লিগ বোরডের নামে, কেহ মুসলিম স্বার্থের নামে, কেহ বা গো-কোরবানির নামে, আবার কেহ বা ইসলাম জোশ্ বজায় রাখিবার নামে নিজেদের জন্য ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য আসনগুলি নিরাপদ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একবারও গোটা সমাজের কথা ভাবেন নাই। প্রতিযোগী প্রার্থীদের যোগ্যতার কথাও চিন্তা করেন নাই। নতুবা ডঃ আর আমেদ, মিঃ হুমায়ুন কবির, মিঃ আবদুস সামাদ, মিঃ ইয়াসিন, মিঃ মজীদ বক্স্, মিসেস মোয়াযেদজাদার মত উচ্চশিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীর অদূরদর্শী লোকের প্রভাবের নিকট কখনই পরাজিত হইতেন না।

জনাব রেজাউল করিমের কথা ফটিক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। কেননা সেও এই জিনিসই ঘটতে দেখেছে। সে অবশ্য নির্বাচনে তেমন কোনও ভূমিকাই নিতে পারেনি। আবু তালেবকে মদত দেবার ইচ্ছে যদিও তার ছিল। তার তখন কী শোচনীয় অবস্থা! বিবি মর মর কলকাতায়। বাপ হাজতে আটক যশোরে। তারপর উঠল খাদু শেখের মামলা। একবার কলকাতা, একবার যশোর, এই শুধু করেছে সে। কিন্তু নির্বাচনে কোনও ভূমিকা না নিলেও সে-সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া সে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছে। আর তাতেই সে ভয় পেয়েছে। কারণ সে দেখেছে নির্বাচনী প্রচার হিন্দুকে কেমন আরও হিন্দু এবং মুসলমানকে কেমন আরও মুসলমান করে তুলছে। সে দেখেছে শিক্ষিত ভদ্র মুসলমানও কেমন নির্বিচারে এক ধরনের হিন্দুবিরোধী উন্মত্ততাকেই ইসলাম বলে গ্রহণ করছেন। মৌলবী জয়নুদ্দিনের মত নিরীহ লোকও ইসলামের নামে কেমন উগ্র হয়ে উঠছেন। এবং শিক্ষিত হিন্দুও বিচারবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে মার মার করে উঠছেন। ফটিক তাও লক্ষ্য করেছে। এবং উদ্বেগ বোধ করেছে। তুমি মুসলমান হলেই চলবে না। আমার নারায় তোমাকে গলা মেলাতে হবে। তুমি যদি তা না মেলাও তবে তুমি সন্দেহভাজন, তবে তুমি জাতিদ্রোহী, তুমি হিন্দুর চর। তুমি শত্রু! এই হল মুসলিম রেনেসাঁর লজিক। তাই এই উগ্রতাকে বেজায় ভয় পায় ফটিক।

সে কতখানি মুসলমান, তার পরীক্ষা কারও কাছেই দিতে রাজী নয় ফটিক। না। এ তার বিবেকের প্রতিবাদ। ধর্মের বাটখারায় মানুষকে মাপার ওজন সব সময় নির্ভুল থাকে, এ বিশ্বাস নেই ফটিকের। তার নিরিখ সে মনুষ্যত্বের ওজনেই ধার্য করতে চায়। তাই যখনই মুসলমানত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে উগ্রস্বরে তার কাছ থেকে শর্তহীন আনুগত্য দাবি করতে থাকে, তার মনুষ্যত্বকে সামূহিকতার প্রবল চাপে নিষ্পেষিত করতে উদ্যত হয়ে ওঠে, সে তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বা সমূহের কাছে তার বিবেক বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। এ তার যন্ত্রণা। কিন্তু তার আরও বড় যন্ত্রণা এই যে সে বিদ্রোহ করতেও ইতস্তত করে। ভয় পায়। কারণ সে তাহলে যাবে কোথায়? কোথায় সে আশ্রয় পাবে? মুসলমান তাকে সন্দেহ করবে হিন্দুর চর বলে আর হিন্দু তাকে নিধন করতে দ্বিধা করবে না তার নামটা মুসলমানী বলে। তার ধর্ম ইসলাম বলে।

ফটিক অসহায়ভাবে দৃষ্টি মেলল ছাতের দিকে। অন্ধকার।

কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন ছিল ফটিকের শেষ ভরসা। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খোয়াব। খোয়াব!

সৈয়দ নওশের আলি হোটেলের থে বেরোয়ে যাবার আগে আমাকে ডাকে ক'য়ে গেলেন, আবু মিঞা আজ বাঙালীর জীবনে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটবে। আবু তালেবের স্বর সেই অন্ধকারেও ফটিকের কানে বেজে উঠল। সৈয়দ সাহেব কলেন, ইন্‌শাল্লাহ্ আজ কংগ্রেস আর কৃষক প্রজা ম্যাগ্‌না কার্‌টায় সই করবে। বাংলার হিন্দু মুসলমানের জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে, আবু মিঞা। এরপর হিন্দু মুসলমান আর অ্যাকে অন্যের গলায় ছুরি মারতি লাফায়ে ওঠবে না, এই আমি কয়ে দিলাম। এই চুক্তি হিন্দু মুসলমান সবার স্বার্থ দ্যাখবে।"

ফুফু কয় আমার বিটা হবে। ছবি বলেছিল।

বাচ্চা প্যাটের কোনখানে থাকে জানেন? ছবি জিজ্ঞেস করেছিল।

নড়ে, নড়ে, উডা নড়ে! ছবি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

খোয়াব! খোয়াব! ফটিক আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ছবির গায়ে অতি যত্নে সে তার একটা হাত রাখল।

ছবির সাধের আগের দিন সকালের বাসেই ঝিনেদায় পৌঁছেছিল ফটিক। কী খুশিই না হয়েছিল ছবি। সারা দুপুর ফটিককে জড়িয়ে ধরে শুয়ে কত গল্প করেছিল ছবি। তার ছাওয়ালের গল্প। ছবিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিল তার ছেলেই হবে। আর তাই-ই তো হয়েছিল! ফটিকের কেমন শ্বাস কষ্ট হচ্ছে।

জে সি গুপ্তের বাড়িতে ডিনার একটা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করল। এবার শর্তাবলীতে সই করার পালা। শর্তের কথা আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সব নেতাই তা মেনে নিয়েছেন। কৃষক-প্রজা দল মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। ফজলুল হকই প্রধানমন্ত্রী হবেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে না। যুক্ত কর্মসূচীকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাবে।

যুক্ত কর্মসূচীর মুসাবিদাটাও নেতারা মেনে নিয়েছেন। কারণ কংগ্রেস ও কৃষক প্রজার নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের প্রধান প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলোই তার মধ্যে আছে। আকাশ নির্মেঘ, বাতাস অনুকূল এবং সমুদ্র শান্ত। তবু তরী ডুবে গেল। ভাগ্যের পরিহাস? অদূরদর্শিতার পরিণাম?

ফটিক অনেক সময় ছবির পাশে শুয়ে, যখন তার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না, একটা বোবা যন্ত্রণা যখন তার ঘুম কেড়ে নেয় তখন, ভাবতে চেষ্টা করে, যে-কোয়ালিশন ভূমিষ্ঠ হতে পারল না, সেই অজাত মুখটা কেমন দেখতে হ'ত? কল্পনায় সেই মুখটাকে আঁকতে চেষ্টা করে ফটিক। কিন্তু কোনও পরিষ্কার আদল তার ভাবনায় ফুটে ওঠে না। অনেক চেষ্টা করেও সে যেমন তার মৃতজাত পুত্রের মুখখানাকে ভাবতে পারে না। কেন সে সেদিন দেখে নিল না?

জে সি গুপ্ত নেতাদের ইশারা পেয়ে শর্তাবলী পড়ে শোনালেন। ১. স্বরাজ দাবির প্রস্তাব গ্রহণ (কারোর কোনও আপত্তি নেই)। ২. রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি (কারোর কোনও আপত্তি নেই)। ৩. প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন (কারোর কোনও আপত্তি নেই)। ৪. মহাজনী আইন পাশ (কারোর কোনও আপত্তি নেই)। জে সি গুপ্তের পাঠ সমাপ্ত হলে নেতারা সবাই হাততালি দিয়ে কার্যসূচীকে অভিনন্দন জানালেন। সবাই এটাকে একটা ঐতিহাসিক সনদ বলে মেনে নিলেন। এবার সই হবে। হঠাৎ আবুল মনসুর সাহেব উঠলেন। তাঁর একটু বক্তব্য আছে। তিনি বললেন, তিনি কোনও সংশোধন আনছেন না। তিনি শুধু চাইছেন যে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি এই দফাটাকে দুই নম্বর থেকে চার নম্বরে নামিয়ে আনা হোক। আর চার নম্বর দফাটাকে দুই নম্বরে তুলে আনা হোক। কেননা লাট সাহেব যদি বন্দীমুক্তির প্রশ্নে ভেটো প্রয়োগ করেন তবে মন্ত্রিসভাকে আত্মসম্মানের খাতিরে পদত্যাগ করতে হবে। (কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই কথাটা সমর্থন করলেন)। তখন মনসুর বললেন, সেই অবস্থায় আইনসভার পুনর্নির্বাচন হতে পারে। (তা পারে। কংগ্রেস নেতারা সায় দিলেন)।

যে ছবি দুপুরে এত ভালো মেজাজে ছিল, সেই ছবিই কেমন বদলে গেল রাত্তিরে। এত বলা সত্ত্বেও সইফুনরা এল না কেন, এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেই কথাই কোথায় পৌঁছে গেল। আর রাগের মাথায় ছবি আর সে কী হিংস্রই না হয়ে উঠল দুজনে। সাধের দিন ফটিক আর ছবির মধ্যে একবার দেখাও হয়নি। সকাল থেকেই আবু তালেবের সঙ্গে ইলেকশনের কাজে ঘুরেছিল ফটিক। ছবি কি তারই জন্যে আছাড় খায় নি?

আবুল মনসুর বললেন, যদি এখনই আবার নির্বাচন হয় আমরা হেরে যাব। মুসলিম লিগের কাছে আমরা হেরে যাব। কারণ সবাই জানেন, নির্বাচনের সময় তারা কৃষক-প্রজা পারটিকে কংগ্রেসের লেজুড় বলে আখ্যা দিয়েছে এবং কৃষক-খাতকের কল্যাণের সমস্ত ওয়াদাকে ভাঁওতা বলে অভিহিত করেছে। এখন যদি আমরা কৃষক-খাতকের হিতের জন্য কোনও আইন পাশ না করেই রাজনৈতিক ইসুতে পদত্যাগ করি তাহলে মুসলিম লিগের সেই মিথ্যে অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

কিন্তু, আফসোস, আবু তালেব হতাশভাবে বলেছিল, কংগ্রেসের নেতারা এ যুক্তি মানলেন না। তাঁরা কলেন, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির প্রশ্নটা জাতীয় সম্মান অসম্মানের প্রশ্ন। বিশেষত আন্দামান দ্বীপে অ্যাখন শত শত রাজবন্দী অনশন ক'রে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে ঝুলতিছেন এই প্রশ্নের সাথে কৃষক খাতকের অর্থনৈতিক প্রশ্নের তুলনাই চলতি পারে না।

প্রজা দল যা মানেন কংগ্রেসই সিডা মানেন। তা সত্ত্বেও দু নম্বর দফারে চার নম্বরে নামায়ে আনতি, নীতিগত কারণে নয়, কৌশলগত কারণেও কংগ্রেস রাজী হলেন না। এমন কি ইডাও কংগ্রেসরে কওয়া হ'ল, বেশ তালি না হয় বন্দীমুক্তির দাবি দু নম্বরেই থাকল। কিন্তু ইড আপনারা কন যে লাট সাহেব ভিটো দিয়ে বন্দীমুক্তির সরকারি দাবি নাকচ করে দিলি আপনারা মন্ত্রিসভারে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ কত্তি বাধ্য করবেন না। পদত্যাগ করার আগে মহাজনী আইনডারে অন্তত পাস করায়ে নিতি দেবেন। না, তাতেও কংগ্রেসের নেতারা রাজী হলেন না। বৈঠক ভাঙে গেল। আফসোস! আফসোস!

ফটিক অন্ধকারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই এখন আফসোস। হ্যাঁ আফসোস। ছবির সঙ্গে ঝগড়া না করলেই ভাল হত সেদিন। ছবির শোকার্ত ভারি নিঃশ্বাস ফটিকের গালে আঘাত করছে। ভিতরের আগুন বুঝি বেরিয়ে আসছে তাতে।

হক সাহেবরে বুঝোয়ে সুজোয়ে হুমায়ুন কবির আর মনসুর সাহেব মাঝরাত্তির শরৎবাবুর বাড়িতি নিয়ে গ্যালেন। যায়ে দারোয়ানরে ডা'কে কলেন, শরৎবাবুরি যায়ে কও হক সাহেব আইছেন। খুব জরুরি।

স্যাঁক্ স্যাঁ আ আ। ঢুকল না বেরুলো? বেরুলো।

মিসেস বোস খবর পায়ে বেরোয়ে আলেন। কলেন, বোস সাহেবের সাথে অ্যাখন দেখা হবে না। তাঁর বিজায় মাথা ধরিছে। ওষুধ খায়ে তিনি ঘুমোয়ে পড়িছেন। আজ কিছুতেই দেখা হ

সম্ভব নয়।
স্যাঁক্ স্যাঁ আ আ।
দা চাইল্ড ইজ্ ডেড।
ছবি ককিয়ে কে'দে উঠল।
স্যাঁক্ স্যাঁ আ আ।
মুসলিম লিগের লোকেরা ওত পেতেই ছিল। হক সাহেবরে অ্যাকেবারে ব্ল্যাংক্ চেক্ আগোয়ে দিল। ক'লো, তিনি যা কবেন সেইডেই শেষ কথা। তিনিই মোসলেম বঙ্গের অবিসংবাদী লিডার। আর আমাগের লিডার কপাত ক'রে টোপডারে গিলে ফ্যাললেন। প্রজা-লিগ কোয়ালিশন সই হয়ে গেল। আমাগের কারুরি ভা'বে দ্যাখারউ সুময় দিয়া হ'ল না।
দা চাইল্ড ইজ্ ডেড। সেবাসদনের সারজন ডাক্তার মিত্তির প্রায় অচৈতন্য ছবির পেটে হাত দিয়েই নির্মল ডাক্তারকে একথা বলেছিলেন। আর ছবি? বে'চে আছে? ফটিকের মনে তখন শুধু ছবির চিন্তা।
শোন নির্মল, (ডাক্তার মিত্তিরকে দেখতে পাচ্ছে ফটিক) তোমার কেস্ আমি ভর্তি করে নিচ্ছি। প্রসূতির ক্ষতি যত কম হয়, এখন ভাই সেইটেই আমার দেখার বিষয়।
ছবির কেস্ শেষ পর্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়াল। বাচ্চা নেই।
নাতির শোকে অস্থির হয়ে উঠলেন হাজী সাহেব। তেমনি অবুঝ ছবি। ঘন ঘন ফিট হতে থাকল তার। তিন সপ্তাহ পরে হাসপাতাল থেকে যে ছবিকে তারা নোনাপুকুরের এই বাসায় এনে তুলেছিল সে ছবিকে এখন আর চেনা যায় না।
গ্যাসের আলো এসে ছবির মুখে পড়েছে। ফটিক সেই দিকেই চেয়েছিল। গত আড়াই মাসে অনেকটাই সেরে উঠেছে ছবি। শুধু যদি ওর কান্নাটা থামত!
স্যাঁক্ স্যাঁ আ আ।
ছবি কাঁদছে। সে জেগে উঠেছে। ফটিক নিঃশব্দে ওর মাথায় হাতখানা রাখল। পরক্ষণেই ওকে জড়িয়ে ধরল ছবি।
"কন্, আমার কী দোষ?" ছবি কাঁদতে কাঁদতে ওকে জিজ্ঞেস করল।
ফটিক কথা না বলে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল।
"আমার কী দোষ? আমার কী দোষ? কন্ কন্?"
ছবি এখনও সেই ছেলেমানুষই আছে। তাই সে দুঃখের কারণ হিসাবে এখনও একজন দোষীকে খুঁজছে।
শিশুটি মারা গিয়েছে ছবি। সে আর ফিরবে না।
ফটিকের ইচ্ছে হল এই অমোঘ সত্যটি নিষ্ঠুরের মত ছবির মুখের উপর সে ছুঁড়ে দ্যায়। এই আঘাতে যদি ছবি তার শোকের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে।
তুমি দোষী নও ছবি। আদৌ দোষী নও। সব দুঃখের পেছনে একজন দোষীকে থাকতেই হবে, একথা তোমাকে কে বলল ছবি? যে সব ঘটনায় আমরা শোক পাই তাপ পাই, প্রচণ্ড আঘাত পাই, সব সময়েই কি তা কারও দোষে ঘটে ছবি? না ছবি, তুমি শান্ত হও। তুমি দোষী নও। মুখে ফটিক একটা সান্ত্বনার কথাও ছবিকে বলতে পারে না। সে বোবা হয়ে যায়। কথাগুলো এত হাল্কা লাগে যে তা আর তার বলতে ইচ্ছে হয় না। তার জন্য যন্ত্রণা পায়।
শিশুটি মারা গেছে ছবি।
কংগ্রেস-প্রজা কোয়ালিশন মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। কিন্তু তার জন্য কাকে দোষী করব আমি? হক সাহেবকে? কংগ্রেসকে? কাকে?
একটা তীব্র যন্ত্রণা অস্থির করে তুলেছে ফটিককে।
যা যায় ছবি, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। সে মারা গিয়েছে' সে মারা গিয়েছে।
"আমি কী নিয়ে থাকব? আমারে কন। কষ্ট কষ্ট কষ্ট। আমার বড় কষ্ট!"
ছবি কাতরাতে লাগল।
আমারও ছবি, আমারও বড় কষ্ট। আমিও নিঃস্ব ছবি। তোমাকে কী দেব? আমার কী আছে? কোনও কাতারে গিয়ে সামিল হবার মত অন্ধ বিশ্বাস আমার নেই। আবার একা দাঁড়াবার মত আত্মবিশ্বাসও আমার নেই। এ যে কী যন্ত্রণা, যে পায় শুধু সেই বোঝে ছবি।
হিস্টিরিয়া রোগীর মত ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল ছবি। চমকে উঠল ফটিক। কী করতে চায় ছবি? ওর চোখ মুখ দিয়ে একটা মরীয়ার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। ছবি! ছবি!
গায়ের আঁচল ছুঁড়ে ফেলে দিল ছবি। শেমিজ টেনে নামিয়ে দিল।
"—দ্যাখেন! দ্যাখেন!" কেউ যেন টিপে ধরেছে ছবির গলাটা তেমনি ধরা-ধরা।
ফটিক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ছবির অনাবৃত দুটো সুপুষ্ট স্তন গ্যাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আর তার বোঁটা দিয়ে দুধ গড়িয়ে ওর বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে।
ছবি এবার হাউ হাউ করে কে'দে উঠল।
"আমি কী করব? আমি কী করব? কন্ কন্ কন্! আমারে যে পাগল করে তোলে!"
ফটিক স্তম্ভিত হয়ে ছবির সেই আঠাল ভিজে বুকের দিকে চেয়ে বসে রইল। ছবির

যন্ত্রণার উৎস কোথায় সে তম্মুহূর্তে বুঝতে পারল। ছবি ফুলে ফুলে কাঁদছে। ছবির মুখ ভিজে, তার বুক ভিজে। ফটিকের চোখ দুটো করকর করতে লাগল। কাছেই বসে আছে ছবি তব কত দূরে। শূন্যতা কাছের মানুষকেও কত দূরে সরিয়ে দিতে পারে!

না, ফটিক আর ছবিকে একা ফেলে রাখবে না। তাকে কাছে টেনে আনবে। সে আর একা হয়ে পড়বে না। ছবিই তাকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু ছবির কাছে সে পৌঁছুবে কি

কাছে এসো ছবি!

ফটিক ছবির কাছে পৌঁছুবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শূন্যতার পাথারে সাঁতার দিতে পড়ল। দুজনের ব্যবধান সে কমিয়ে আনবেই।

"কাছে এসো, ছবি!" ফটিক অনেকদিন পরে তাকে ডাক দিল।

একটা ক্ষতিকেই শেষ ক্ষতি বলে ধরে নিয়ো না ছবি।

"কাছে এসো ছবি!" ফটিকের গলা ভারি হয়ে এল। তার চোখের পাতাও।

ছবি এবার ফটিকের দিকে চাইল। যেন এই ডাকটাকে চিনতে পারল। যেন সে তাকে চেনবার চেষ্টা করছে।

ফটিকের কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

ছবি দেখল ফটিকের চোখ দুটো জলে টলটল করছে।

ফটিক ছবির একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, "এসো, ছবি।"

ছবি ফটিকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে দু-হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ফটিক একটুও বাধা দিল না। পরম যত্নে সে ছবির মাথায় গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তারপর এক সময় ফটিক খুব মৃদু স্বরে বলল, "ছবি, তোমার বাচ্চা হবে। তুমি ভেবো না। ডাক্তার বাবুরা বলেছেন।"

ছবি ফটিকের বুক আরও ভিজিয়ে দিতে লাগল। সে তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে।

কাঁদো ছবি। ছবিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরতে ধরতে ফটিক নিঃশব্দে বলল। তুমি কাঁদলে হাল্কা হবে। কাঁদো।

ছবি কাঁদছে। আর কান্নার দমকে ছবির শরীর থরথর করে কাঁপছে।

তোমার বাচ্চা আবার হবে ছবি। তোমার বুকের দুধ নিষ্ফল ঝরে পড়বে না। তুমি মা হবে ছবি। আর তখন তুমি এই শোক, এই তাপ, এই জ্বালা ভুলে যাবে। হ্যাঁ ছবি তাই হবে। তাই হয়। কিন্তু আমি? আমার কী হবে ছবি? কোলে বাচ্চা এলেই তো তুমি জুড়োবার জায়গা পেয়ে যাবে। দাঁড়াবার জায়গা পাবে। কিন্তু ঘড়ির পেনডুলাম আমি, আমার দাঁড়াবার জায়গা কোথায়?

ছবির চোখের জলে ফটিকের বুক ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু ফটিকের দাউ দাউ জ্বালার উপশম তো হচ্ছে না। ছবিকে সে আরও কাছে টেনে নিল। সে ছবিকে কাছে চাইছে। কাছে।

কোথায় আমার ঠাঁই ছবি? এ যে আমার কী কষ্ট তুমি তা বুঝবে না। কেউ কী বুঝবে

"কষ্ট, আমার বড় কষ্ট, ছবি!"

ফটিকের কণ্ঠ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা এই আর্তস্বর ছবিকে বিচলিত করে তু তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে নিল সে। তারপর তার মুখের দিকে চাইল। ফটিকের চো মুখে কী অপারিসীম বিষণ্ণতা! ছবির মনে হল ফটিকও বড় অসহায়। সহসা ছবির খেয়াল হ সে একা নয়, ছাওয়ালের জন্য ফটিকও কষ্ট পাচ্ছে। ফটিকও কষ্ট পায়?

ফটিক তাহলে দূরে সরে যায়নি? সে তার কাছেই আছে। এই বোধ তাকে খুব ভরসা দিল

"ছবি!" ফটিক ডাকল, "ছবি!" এ ডাক ছবির চেনা।

ছবি ফটিকের হাত দুটো তুলে নিল। তারপর প্রাণপণে কান্না চাপতে চাপতে হাত দুটো তার বুকে চেপে ধরল। বলল, "দ্যাখেন দ্যাখেন। অ্যাকেবারে আগুন।"

তারপর বলল, "আমার ভয় করে। ভয় করে। আপনি আমারে দূরি ঠেলে দেবেন না।"

ফটিকের মাথাটা, মুখটা ধীরে ধীরে নেমে এল ছবির উত্তপ্ত বুকে। ছবির দরাজ স্তন দুটো থেকে যেখানে নতুন দুধ উপছে পড়ে জায়গাটাকে সততই ভিজিয়ে রেখেছে। সেই চটচটে আঠায় ফটিক মুখ ঘষতে লাগল। আর বলতে লাগল, "তুমি আমাকে ধরে রেখো ছবি। ছেড়ো না। কিছুতেই ছেড়ো না।"

সমাপ্ত